ঐতিহাসিক উর্দূ শরাহ কামালাইন ও জামালাইনের অনুকরণে

তাফসীরে জালালাইন

আরবি-বাংলা

প্রথম খণ্ড ▪ পারা : ১

এতে রয়েছে

মূল মতন। সরল অনুবাদ। প্রতিটি রুকূ'র সারসংক্ষেপ। রসমে উসমানী ও তাফসীরে জালালাইনের ইমলার ভিন্নতা। হাদীস-তথ্যসূত্র। তাহকীক ও তারকীব। আয়াত, সূরা ও রুকূ'র পূর্বাপর যোগসূত্র। ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। মাসআলার বিবরণ। শানে নুযূল। ফাসাহাত-বালাগাত। উল্লিখিত স্থান, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মানচিত্র। পরীক্ষা-উপযোগী নমুনা প্রশ্ন

ইসলামিয়া কুতুবখানা ▪ ঢাকা

আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মহল্লী (র.)
[৭৯১- ৮৬৪ হি. ১৩৮৯- ১৪৫৯খ্রি.]
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস-সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯- ৯১১ হি. ১৪৪৫- ১৫০৫ খ্রি.]

تفسير الجلالين

তাফসীরে জালালাইন

আরবি-বাংলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পারা • দ্বিতীয় পারা • তৃতীয় পারা • চতুর্থ পারা • পঞ্চম পারা

অনুবাদকবৃন্দ

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাদ, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ

মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী
সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, জামিয়া হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম
[বড় কাটারা মাদরাসা] বড় কাটারা, ঢাকা

মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী
উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা বিভাগ

সম্পাদনায় : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থের নাম
তাফসীরে জালালাইন (প্রথম খণ্ড)
[আরবি-বাংলা]

প্রকাশক
মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অলংকরণ
মাওলানা এনামুল হাসান

প্রচ্ছদ ও ইনার ডিজাইন
ইসলামিয়া গ্রাফিক্স ডিজাইন

বর্ণবিন্যাস
ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম

মুদ্রণ
ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
২৪/এফ শিরিশ দাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশনায় :
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)
৭৮০.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের আরজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নবী ছিলেন সাইয়িদুল মুরসালীন, রাসূলে আরাবী (সা.)। যাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

ঐশীবাণী পবিত্র কুরআন এমনই এক মহাগ্রন্থ যার মহিমা অতুলনীয়, অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়; যা ভাষা অলংকারে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, শব্দের গাঁথুনী, যথাযথ প্রয়োগ, ভাবের মাধুর্য ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এটি এমন এক গ্রন্থ যা গদ্যাকারে সুবিন্যস্ত; তবে কবিতার অন্তমিল, ছন্দ ও স্বাদ তাতে একেবারে অনুপস্থিত নয়। কুরআন এমন এক মৌলিক গ্রন্থ যার মাঝে ইলমের সকল শাখা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু তা বিজ্ঞানবিষয়ক হাজারো তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার। এটি ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির প্রায় অধিকাংশ মৌলিক ইতিহাস ও তা থেকে গ্রহণীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা এই কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ অর্থে ও সাহিত্য বিচারে পবিত্র কুরআন কোনো সাহিত্য-গ্রন্থ নয়; কিন্তু সে যুগে আরব বিশ্বের বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা স্পষ্টভাবে ব্যর্থতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং বলেছে- لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ "এটি কোনো মানুষের কথা নয়"। যারা পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন; তখন তারা সত্যের সন্ধান পায় এবং পবিত্র কুরআনের স্বাদ উপলব্ধি করে ও বরকত লাভে ধন্য হয়।

আমরা বিশ্ব ইতিহাসের সোনালী পাতায় চোখ বুলালে দেখতে পাব যে, একদিন মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও শিক্ষার বাস্তবায়নে এবং রাসূলে আরাবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে। রাসূল (সা.) হাজারো নির্যাতন নিপীড়ন ও কষ্ট-যাতনা সহ্য করে দীর্ঘ তের বছর মক্কায় ইসলাম প্রচার করার পর মাত্র স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেন মাত্র একজন সাথি হযরত আবূ বকর (রা.)–কে সঙ্গে নিয়ে। আর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন দশ হাজার সাহাবীকে নিয়ে। তার দু'বছর পর বিদায় হজে আগমন করেন এবং আরাফার ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তখন লক্ষাধিক সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজের আশি দিন পর যখন তিনি এই নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান এবং আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তখন তাঁর সাথিদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। এর মাত্র তেরো বছর পর খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।

এমনকি তদানীন্তনকালে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী শক্তিতে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম সেখানেও ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও সুমহান শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন ও রাসূলে আরাবী (সা.)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে।

কিন্তু খুবই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, যখন থেকে মুসলিম জাতি পবিত্র কুরআনের নীতি-আদর্শ ও সুমহান শিক্ষা ভুলে গেছে এবং রাসূলে আরাবী (সা.)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে, তখন থেকেই মুসলমানদের পতন শুরু হয়েছে। বর্তমানে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইতিহাসের পরাশক্তি ও বিজয়ী দল মুসলিম জাতি আজ পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। হারাচ্ছে নিজের দেশ ও জাতি। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া ও সোমালিয়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে মুসলিম-জাতিকে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে পুনরায় পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাগ্রহণ এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে এর মর্মবাণী অনুধাবন করা পূর্বশর্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তাফসীর বহু পূর্বেই রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) কর্তৃক রচিত সংক্ষিপ্ত ধাঁচের তাফসীর হচ্ছে 'তাফসীরুল জালালাইন'। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন-গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ, বাহ্যিক দিক থেকে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশের সকল কওমী মাদ্রাসাগুলোতে খুবই গুরুত্ব সহকারে জালালাইন শরীফের দরস প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যায়ে এ গ্রন্থটির পাঠ দান করা হয়। আমাদের দেশে এ যাবত জালালাইন শরীফের আংশিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও মৌলিকভাবে সুন্দর, স্বার্থক ও পরিপূর্ণ কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই 'ইসলামিয়া কুতুবখানা-ঢাকা' সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম জালালাইন শরীফের মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে কয়েক বছর আগেই। যা ছাত্র-শিক্ষক সকলের নিকট খুবই সমাদৃত হয়েছে। এরপরও আমরা পুনরায় পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও যথাযথ সম্পাদনা করে আবার নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ! অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেহনত-মোজাহাদা, যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তা-ফিকির, যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে পুনরায় গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত, তাফসীরকারদ্বয়ের প্রদত্ত তাফসীরের আরবি ইবারত, সহজ সরল অনুবাদ, জালালাইন ও তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা এবং 'রুকূ' ভিত্তিক প্রশ্নাবলি সংযোজন করে প্রথম খণ্ড দুই কালারে প্রকাশ করা হলো। আশা করি সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং কুরআন গবেষকরা এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। কিতাবটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে শিক্ষক মহোদয় ও সচেতন শিক্ষার্থীদের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সে মোতাবেক পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও অধিকতর মানোন্নয়নের অঙ্গীকার রইল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ খেদমতকে কবুল করুন এবং নাজাতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন।

বিনীত
প্রকাশক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

উপক্রমণিকা

الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী রচিত কোনো তাফসীরগ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়; যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায়। তাফসীরগ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবন করা যাবে।

ছাত্রজীবন থেকেই তাফসীরে জালালাইনের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের খ্যাতিমান উস্তাদ, মুহাক্কিক আলেম মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনায় জালালাইনের সর্ববৃহৎ আরবি শরাহ আল্লামা সুলাইমান জামাল প্রণীত الفتوحات الإلٰهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ওরফে 'হাশিয়াতুল জামাল' মুতালার সুযোগ হয়েছিল। একটু আধটু যাই বুঝেছিলাম তাতে এ অনুভূতি হয়েছিল যে, উর্দু কামালাইন আর আরবি হাশিয়াতুল জামাল কিছুতেই একটি অপরটির বিকল্প হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কিতাব 'হল' করতে হলে হাশিয়াতুল জামালের কোনো তুলনা হয় না। ফারাগাতের কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনি শিক্ষাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা দেওভোগে দরসী খেদমতের সুযোগ হয়। প্রথম বছরই আমার দায়িত্বে আসে সেই প্রিয় কিতাব তাফসীরে জালালাইনের প্রথম খণ্ড। আরবি-উর্দূ শরাহ ও নানা তাফসীরগ্রন্থের সাহায্যে এক বছর যথাসম্ভব শ্রম দিয়ে পড়ালাম। পরের বছর চিন্তায় এলো সহায়ক গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তগুলো যদি সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে মুতালা করতে সহজ হবে। এ চিন্তা থেকেই প্রথমে উলূমুল কুরআন তথা কুরআন ও তাফসীর সংক্রান্ত একটি ভূমিকা তৈরি করি, যা 'মুকাদ্দামায়ে জালালাইন' নামে ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। তারপর মূল কিতাবের ব্যাখ্যা ও তাকরীর লিখতে শুরু করি। হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতুস্ সাবী, কামালাইন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীর মাজেদী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [-মুফতী শফী (র.)] ও মা'আরিফুল কুরআন -[আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] ইত্যাদি তাফসীরগ্রন্থ ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাধ্যমে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অল্প-বিস্তর করে লেখা চলতে থাকল। কিছুদিন পর বাজারে এলো আরেকটি উর্দু শরাহ 'জামালাইন'। তাও সংগ্রহ করলাম। যেহেতু কোনো একটি উর্দু শরাহ অনুবাদ করে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই সবগুলো শরাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যে কথা ও বিশ্লেষণগুলো যথার্থ, পরিচ্ছন্ন ও ছাত্রদের জন্য উপযোগী এবং জরুরি মনে হয়েছে, সেগুলোই কেবল সযত্নে সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এভাবে দীর্ঘ তিন বছরে তিলে তিলে সম্পন্ন হয় প্রথম তিন পারার ব্যাখ্যা।

অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি

কুরআন, উলূমুল কুরআন, ইজাযুল কুরআন ও জামউল কুরআন-সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও মুফসসিরগণ প্রসঙ্গে আলোচনা।

কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত এবং কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের চার কালার মানচিত্র।

ইমাম মহল্লী (র), ইমাম সুয়ুতী (র) ও তাফসীরে জালালাইন পরিচিতি।

বন্ধনী ও ভিন্ন ফন্টের মাধ্যমে ভিন্ন কালারে কুরআনের আয়াত চিহ্নিতকরণ।

কুরআনের আয়াত ও তাফসীরের যথাসম্ভব নির্ভুল ও সহজবোধ্য অনুবাদ।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা। এতে রয়েছে–

- কুরআনের বক্তব্য বোধগম্য ও সহজ করণার্থে সংযুক্ত তাফসীরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
- দুর্বোধ্য শব্দাবলির তাহকীক ও জটিল বাক্যের তারকীব।
- রসমে উসমানী ও তাফসীরে জালালাইনের লিখনী পদ্ধতির ভিন্নতা উল্লেখ।
- কেরাত ও কারীগণের নাম বিশেষ করে ইমাম হাফস (র)-এর কেরাত উল্লেখ।
- ইসরাঈলী রেওয়ায়েতগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক তাফসীর সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- তাফসীরে জালালাইনের উল্লিখিত হাদীসের মূল উদ্ধৃতি ও মান নির্ণয় করে হাদীসের মতন উল্লেখকরণ।
- তাফসীরুল জালালাইনের বিভিন্ন নুসখার ভিন্নতা ও শুদ্ধতা চিহ্নিতকরণ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা। এতে আছে-

- আয়াত, সূরা ও রুকূ'র পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখ।
- সূরার নামকরণের কারণ, অবতীর্ণ-স্থান, প্রেক্ষাপট, সারমর্ম, ফযীলত ইত্যাদি উল্লেখ।
- সংক্ষেপে রুকূ'র সারসক্ষেপ উল্লেখ।
- সংশ্লিষ্ট আলোচনার অধীনে আয়াতের নির্ভরযোগ্য তাফসীর প্রদান।
- কামালাইনের অনুসরণে আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আলোচনা।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট শানে নুযূল উল্লেখ।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার বিবরণ।
- আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধান প্রদান।
- আয়াত-সংশ্লিষ্ট কুরআনের ভাষা-অলংকার উল্লেখ।
- বিভিন্ন জনপদ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও মানচিত্র প্রদান।
- 'কুরআন ও বিজ্ঞান' শিরোনামে বিজ্ঞানমূলক আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান।
- প্রতিটি রুকূ'র শেষে পরীক্ষা-উপযোগী নমুনা প্রশ্ন সংযোজন।

সূচি নির্দেশনা

ক্রমিকনং	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	**প্রথম আলোচনা :** আল কুরআনুল কারীম	اَلْبَحْثُ الْأَوَّلُ : اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ	১৫
২.	**দ্বিতীয় আলোচনা :** উলূমুল কুরআন	اَلْبَحْثُ الثَّانِيْ : عُلُوْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ	৩২
৩.	**তৃতীয় আলোচনা :** ইজাযুল কুরআন	اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ : اِعْجَازُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ	৬৪
৪.	**চতুর্থ আলোচনা :** কুরআন সংকলন	اَلْبَحْثُ الرَّابِعُ : جَمْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ	৭০
৫.	**পঞ্চম আলোচনা :** মুফাসসিরগণ	اَلْبَحْثُ الْخَامِسُ : اَلْمُفَسِّرُوْنَ	৭৭
৬.	**ষষ্ঠ আলোচনা :** ওহীর পদ্ধতি ও প্রকারভেদ	اَلْبَحْثُ السَّادِسُ : اَلْوَحْيُ وَطُرُقُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ وَاَقْسَامُهُ	৮২
৭.	**সপ্তম আলোচনা :** তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও উৎস	اَلْبَحْثُ السَّابِعُ : اَلتَّفْسِيْرُ وَالتَّأْوِيْلُ، أَقْسَامُ التَّفْسِيْرِ وَمَصَادِرُهُ	৮৬
৮.	**অষ্টম আলোচনা :** আল কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত	اَلْبَحْثُ الثَّامِنُ : بَعْضُ الْمَعْلُوْمَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ	৯৮
৯.	**নবম আলোচনা :** কুরআনে কারীমে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের মানচিত্র	اَلْبَحْثُ التَّاسِعُ : اَطْلَسُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْمَذْكُوْرِيْنَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ	১১৫
১০.	**দশম আলোচনা :** ইমাম মহল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর পরিচিতি	اَلْبَحْثُ الْعَاشِرُ : اَلتَّعْرِيْفُ بِالْمُؤَلِّفَيْنِ الْإِمَامِ الْمَحَلِّيِّ وَالسُّيُوْطِيِّ (رحمها الله)	১৪১
১১.	**এগারোতম আলোচনা :** তাফসীরুল জালালাইন পরিচিতি	اَلْبَحْثُ الْحَادِيْ عَشَرَ : اَلتَّعْرِيْفُ بِتَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْنِ	১৪৫
১২.	খুতবা ও গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতি	اَلْخُطْبَةُ وَمَنْهَجُ تَأْلِيْفِ الْكِتَابِ	১৫১
	প্রথম পারা		
	২. সূরাতুল বাকারা		
১৩.	আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে আলোচনা	كَلِمَاتٌ حَوْلَ التَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ	১৬৪
১৪.	**রুকূ'-১ :** মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য এবং কাফেরদের অবস্থা ও তাদের পরিণতির বর্ণনা	ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمُتَّقِيْنَ مَعَ ذِكْرِ أَحْوَالِ الْكَافِرِيْنَ وَعِقَابِهِمْ	১৮১
১৫.	**রুকূ'-২ :** মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, তাদের পরিণতি ও তাদের অবস্থার উপমার বর্ণনা	ذِكْرُ الْمُنَافِقِيْنَ مَعَ أَوْصَافِهِمْ وَعِقَابِهِمْ وَضَرْبِ الْمَثَلَيْنِ لِحَالِهِمْ	২১২
১৬.	**রুকূ'-৩ :** আল্লাহর একত্ববাদের দলিল এবং কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনার চ্যালেঞ্জের বর্ণনা	ذِكْرُ الْأَدِلَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالٰى وَالتَّحَدِّيْ لِلْإِتْيَانِ بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِ الْقُرْاٰنِ	২৩৭
১৭.	**রুকূ'-৪ :** আদম (আ.)কে খলিফা বানানো এবং তাঁর সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সেজদা করানোর বর্ণনা	بَيَانُ جَعْلِ آدَمَ خَلِيْفَةً وَإِسْجَادِ الْمَلَائِكَةِ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ	২৬৮
১৮.	**রুকূ'-৫ :** অবতীর্ণ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বনী ইসরাঈলকে ঈমানের প্রতি আহ্বান	دَعْوَةُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى الْإِيْمَانِ بِالتَّذْكِيْرِ بِالنِّعَمِ عَلَيْهِمْ	২৯১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯.	রুকূ'–৬ : ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদানের বর্ণনা بَيَانُ تَنْجِيَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ فِرْعَوْنَ	৩০৫
২০.	بَيَانُ تَعَدُّدِ النِّعَمِ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكُفْرِهِمْ بِهَا	৩৩০
	রুকূ'–৭ : বনী ইসরাঈলের ওপর বিভিন্ন নিয়ামতসমূহ ও তা অস্বীকারের বর্ণনা	
২১.	جَزَاءُ كُفْرِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقِصَّةُ أَصْحَابِ السَّبْتِ	৩৩৮
	রুকূ'–৮ : বনী ইসরাঈলের কুফরীর শাস্তি এবং আসহাবুস সাবতের ঘটনা	
২২.	ذِكْرُ عِنَادِ الْيَهُوْدِ لِلرُّسُلِ وَ أَمَانِيِّهِمِ الْكَاذِبَةِ	৩৬১
	রুকূ'–৯ : রাসূলদের প্রতি ইহুদিদের হঠকারিতা ও তাদের মিথ্যা আশার বর্ণনা	
২৩.	بَيَانُ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَنَقْضِهِمِ الْمِيْثَاقَ	৩৮৩
	রুকূ'–১০ : বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বর্ণনা	
২৪.	بَيَانُ جَرَائِمِ الْيَهُوْدِ الَّتِي ارْتَكَبُوْهَا وَقَبَائِحِهِمْ	৩৯৩
	রুকূ'–১১ : ইহুদিদের কৃত বিভিন্ন অপরাধ ও মন্দ কাজের বর্ণনা	
২৫.	রুকূ'–১২ : হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা قِصَّةُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ	৪১২
২৬.	بَيَانُ النَّسْخِ وَحَقْدِ الْيَهُوْدِ وَحَسَدِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ	৪৩৭
	রুকূ'–১৩ : নসখ এবং মুমিনদের প্রতি ইহুদিদের হিংসা বিদ্বেষের বর্ণনা	
২৭.	ذِكْرُ افْتِرَاءِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَرَدُّ دَعْوَاهُمُ الْبَاطِلَةِ	৪৫৭
	রুকূ'–১৪ : ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পরস্পর অপবাদ আরোপের বর্ণনা এবং তাদের ভ্রান্ত দাবির খণ্ডন	
২৮.	قِصَّةُ بِنَاءِ إِبْرَاهِيْمَ لِلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ دُعَائُهُ	৪৮২
	রুকূ'–১৫ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাবা নির্মাণের ঘটনা এবং তাঁর দোয়া	
২৯.	وَصِيَّةُ إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَبْنَاءَهُمَا	৫০২
	রুকূ'–১৫ : হযরত ইবরাহিম ও ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক স্বীয় সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রদান	
	দ্বিতীয় পারা	
৩০.	রুকূ'–১৭ : কিবলা পরিবর্তনের পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত حِكْمَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِي تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ	৫২৭
৩১.	أَمْرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ	৫৪৪
	রুকূ'–১৮ : মুসলমানদেরকে কাবা শরীফের অভিমুখী হওয়ার নির্দেশ	
৩২.	دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ أَهَمِّيَّةِ الْحَجِّ	৫৫১
	রুকূ'–১৯ : সবর ও সালাতের প্রতি মুমিনদের আহ্বান এবং হজের গুরুত্বের বর্ণনা	
৩৩.	রুকূ'–১৯ : আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও একত্ববাদের দলিলের বর্ণনা بَيَانُ أَدِلَّةِ الْقُدْرَةِ وَ الْوَحْدَانِيَّةِ	৫৭১
৩৪.	أَمْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاجْتِنَابِهِمْ مَا حَرَّمَهُ اللهُ	৫৮০
	রুকূ'–২১ : মুমিনদেরকে উত্তম হালাল বস্তু থেকে ভক্ষণের এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জনের নির্দেশ	
৩৫.	রুকূ'–২২ : প্রকৃত সৎকর্ম, কেসাস এবং অসিয়তের হুকুমের বর্ণনা بَيَانُ عَمَلِ الْبِرِّ الْحَقِّ وَحُكْمِ الْقِصَاصِ وَالْوَصِيَّةِ	৫৯৩
৩৬.	ذِكْرُ أَحْكَامِ الصَّوْمِ وَالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ	৬১১
	রুকূ'–২৩ : রোজার আহকাম এবং অন্যায়ভাবে সম্পদগ্রাস থেকে বিরত থাকার বর্ণনা	

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭.	اَلْبَحْثُ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَالْجِهَادِ وَأَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ **রুকূ'–২৪ :** নতুন চাঁদ, জিহাদ, হজ এবং ওমরার বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা	৬৩৩
৩৮.	**রুকূ'–২৫ :** স্ববিস্তারে হজের বিধিবিধানের বর্ণনা بَيَانُ أَحْكَامِ الْحَجِّ عَلٰى وَجْهِ التَّفْصِيْلِ	৬৫৬
৩৯.	حُكْمُ نَفَقَةِ الْأَقْرِبَاءِ وَتَشْرِيْعُ فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ **রুকূ'–২৬ :** আত্মীয়দের ভরণপোষণের হুকুম ও জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধান	৬৮০
৪০.	حُكْمُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَحُكْمُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ **রুকূ'–২৭ :** নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান এবং মদ ও জুয়ার হুকুম	৬৯২
৪১.	حَلُّ الْمَشَاكِلِ الْأُسْرِيَّةِ مِنَ الْإِيْلَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ **রুকূ'–২৮ :** খোলা, তালাক, ঈলাজাতীয় পারিবারিক সমস্যার সমাধান	৭০৫
৪২.	أَحْكَامُ الطَّلَاقِ وَتَوْضِيْحُ طَرِيْقَتِهٖ وَشُرُوْطِهٖ وَآدَابِهٖ **রুকূ'–২৯ :** তালাকের হুকুম এবং তার পদ্ধতি, শর্ত ও আদব স্পষ্টকরণ	৭২০
৪৩.	أَحْكَامُ الرَّضَاعَةِ وَعِدَّةِ االْمَرْأَةِ الَّتِيْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا **রুকূ'–৩০ :** স্তন্যদান ও বিধবা স্ত্রীর ইদ্দতের বিধিবিধান	৭২৮
৪৪.	**রুকূ'–৩১ :** মহরের হুকুম ও সকল নামাজে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ حُكْمُ الْمَهْرِ وَأَمْرٌ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ	৭৩৯
৪৫.	**রুকূ'–৩২ :** জিহাদের নির্দেশ এবং সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান اَلْأَمْرُ بِالْجِهَادِ وَالتَّرْغِيْبُ فِي الصَّدَقَةِ	৭৫১
৪৬.	**রুকূ'–৩৩ :** তালূত ও জালূতের মাঝে যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা بَيَانُ قِصَّةِ الْقِتَالِ بَيْنَ طَالُوْتَ وَجَالُوْتَ	৭৬৩

তৃতীয় পারা

৪৭.	دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَبَيَانُ صِفَاتِ اللهِ تَعَالٰى **রুকূ'–৩৪ :** মুমিনদেরকে আল্লাহর রাস্তায় খরচের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা	৭৭৪
৪৮.	إِثْبَاتُ ذَاتِ اللهِ تَعَالٰى وَإِثْبَاتُ الْحَشْرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ **রুকূ'–৩৫ :** আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, হাশর এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সাব্যস্তকরণ	৭৮২
৪৯.	اَلتَّرْغِيْبُ فِي الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ و أَمْرٌ بِالْجِهَادِ لِأَعْدَاءِ اللهِ **রুকূ'–৩৬ :** আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের উৎসাহ প্রদান এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ	৭৯৫
৫০.	**রুকূ'–৩৭ :** সদকা এবং তার আদবসমূহের বিশদ বর্ণনা بَيَانُ الصَّدَقَةِ وآدَابِهَا عَلٰى وَجْهِ التَّفْصِيْلِ	৮০৪
৫১.	**রুকূ'–৩৮ :** সুদকে নিকৃষ্ট, জঘন্য উপার্জন হিসেবে উপস্থাপন عَرْضُ الرِّبَا كَسْبًا خَبِيْثًا شَنِيْعًا	৮১৪
৫২.	ذِكْرُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالدَّيْنِ وَالتِّجَارَةِ وَالرَّهْنِ **রুকূ'–৩৯ :** ঋণ, ব্যবসা ও বন্ধকের বিশেষ আহকামসমূহের বর্ণনা	৮২৩
৫৩.	اَلْبَحْثُ عَنْ جُزْئِيَّاتِ الْإِيْمَانِ وَخَتْمِ السُّوْرَةِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِ **রুকূ'–৪০ :** ঈমানের শাখা-প্রশাখার আলোচনা এবং মুমিনের দোয়ার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি	৮৩১

৩. সূরাতু আলে ইমরান

৫৪.	أَوْصَافُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَأَنْوَاعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ **রুকূ'–১ :** আসমানি কিতাবসমূহের গুণাবলি এবং কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ	৮৪২
৫৫.	ضَرْبُ الْمَثَلِ بِغَزْوَةِ بَدْرٍ وَتَزْيِيْنُ الشَّهَوَاتِ لِلنَّاسِ **রুকূ'–২ :** বদর যুদ্ধ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষের জন্য চিত্তাকর্ষক বস্তু সজ্জিতকরণ	৮৫২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৬.	إِيْرَادُ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْيَهُوْدِ وَضَلَالَتِهِمْ	৮৬৪
	রুকূ'–৩ : ইহুদদিদের অবস্থা এবং তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা	
৫৭.	**রুকূ'–৪ :** মারইয়াম ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা قِصَّةُ وِلَادَةِ مَرْيَمَ وَ وِلَادَةِ يَحْيٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ	৮৭৬
৫৮.	قِصَّةُ وِلَادَةِ الْمَسِيْحِ عِيْسٰى مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَمُعْجِزَاتُهُ	৮৯০
	রুকূ'–৫ : পিতাবিহীন হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর জন্মলাভের ঘটনা এবং তাঁর মু'জিযা	
৫৯.	**রুকূ'–৬ :** হযরত ঈসা (আ.)-এর দোষমুক্তি ও আকাশে উত্তোলন بَرَاءَةُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَفْعُهُ إِلَى السَّمَاءِ	৯০৫
৬০.	دَعْوَةُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى إِلَى التَّوْحِيْدِ وَالاقْتِدَاءِ بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ	৯১৬
	রুকূ'–৭ : ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে তাওহীদ এবং ইবরাহীম (আ.)-কে অনুসরণের প্রতি আহ্বান	
৬১.	**রুকূ'–৮ :** আহলে কিতাবের আমানত রক্ষা ও মিথ্যাচারিতা أَدَاءُ الْأَمَانَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَكَاذِيْبِهِمْ	৯২১
৬২.	**রুকূ'–৯ :** নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বর্ণনা بَيَانُ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ	৯৩১
	চতুর্থ পারা	
৬৩.	نَقْضُ دَعَاوِي الْيَهُوْدِ وَ وَالتَّحْذِيْرُ مِنْ مَكَائِدِهِمْ	৯৪১
	রুকূ'–১০ : ইহুদিদের দাবি খণ্ডন ও তাদের চক্রান্ত থেকে সতর্কীকরণ	
৬৪.	دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ	৯৫৫
	রুকূ'–১১ : মুমিনদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করার প্রতি আহ্বান	
৬৫.	فَضِيْلَةُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ النَّهْيُ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ	৯৬৫
	রুকূ'–১২ : উম্মতে মুহাম্মদির ফযীলত ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ	
৬৬.	ذِكْرُ نُصْرَةِ اللهِ تَعَالٰى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ	৯৭৭
	রুকূ'–১৩ : বদর ও উহুদ যুদ্ধে মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যের বর্ণনা	
৬৭.	اَلنَّهْيُ عَنِ مُعَامَلَةِ الرِّبٰوا وَ أَوْصَافُ الْمُتَّقِيْنَ وَ أَجْرُهُمْ	৯৮৭
	রুকূ'–১৪ : সুদি লেনদেন থেকে নিষেধাজ্ঞা এবং মুত্তাকীদের গুণাবলি ও প্রতিদান	
৬৮.	**রুকূ'–১৫ :** উহুদ যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা ও তার শিক্ষার বর্ণনা بَيَانُ أَحْدَاثِ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْعِبَرِ	৯৯৬
৬৯.	**রুকূ'–১৬ :** উহুদ যুদ্ধে মুমিন ও মুনাফিকদের অবস্থা أَحْوَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ فِيْ غَزْوَةِ أُحُدٍ	১০০১
৭০.	**রুকূ'–১৭ :** উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ أَسْبَابُ الْهَزِيْمَةِ فِيْ غَزْوَةِ أُحُدٍ	১০০৯
৭১.	**রুকূ'–১৮ :** আল্লাহর প্রতি মুমিনদের ভরসা ও তাদের প্রতিদান تَوَكُّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى اللهِ وَأَجْرُهُمْ	১০২০
৭২.	**রুকূ'–১৯ :** ইহুদিদের নানা অপরাধ ও ষড়যন্ত্রের বর্ণনা بَيَانُ جَرَائِمِ الْيَهُوْدِ وَدَسَائِسِهِمْ	১০৩০
৭৩.	بَيَانُ أَوْصَافِ أُوْلِي الْأَلْبَابِ وَتَفَكُّرِهِمْ فِيْ خَلْقِ اللهِ	১০৩৮
	রুকূ'–২০ : জ্ঞানীদের গুণাবলি ও আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের চিন্ত-ভাবনার বর্ণনা	
	৪. সূরাতুন নিসা	
৭৪.	**রুকূ'–১ :** নারী এবং এতিমদের হক সম্পর্কে আলোচনা اَلتَّحَدُّثُ عَنْ حُقُوْقِ النِّسَاءِ وَالْيَتَامٰى	১০৪৯
৭৫.	**রুকূ'–২ :** বিস্তারিতভাবে মীরাসের বিধানসূহের আলোচনা ذِكْرُ أَحْكَامِ الْمِيْرَاثِ عَلٰى وَجْهِ التَّفْصِيْلِ	১০৬৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৬.	রুকূ'–৩ : জেনার হদের বিধান ও জাহেলী প্রথার খণ্ডন أَحْكَامُ حُدُوْدِ الزِّنَا وَنَقْضُ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ	১০৭৩
৭৭.	রুকূ'–৪ : বিবাহ বৈধ নয় এমন নারীদের বর্ণনা ذِكْرُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِيْ لَا يَجُوْزُ نِكَاحُهُنَّ	১০৮৩
	৫. পঞ্চম পারা	
৭৮.	রুকূ'–৫ : অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা اَلنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ	১০৯৬
৭৯.	রুকূ'–৬ : স্বামী-স্ত্রীর সংশোধনের পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা بَيَانُ طُرُقِ إِصْلَاحِ الزَّوْجَيْنِ	১১০৫
৮০.	أَحْكَامُ الْوُضُوْءِ وَالتَّيَمُّمِ وَبَيَانُ ضَلَالَةِ الْيَهُوْدِيِّيْنَ রুকূ'–৭ : ওযূ ও তায়াম্মুমের বিধান এবং ইহুদিদের পথভ্রষ্টতার বর্ণনা	১১১৬
৮১.	لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَبَيَانُ شِدَّةِ عَذَابِهِمْ فِي النَّارِ রুকূ'–৮ : ইহুদিদের ওপর আল্লাহর লা'নত ও জাহান্নামে তাদের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা	১১২৬
৮২.	ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الشَّنِيْعَةِ وَعَاقِبَتِهِمْ রুকূ'–৯ : মুনাফিকদের কিছু জঘন্য স্বভাব ও তাদের পরিণামের বিবরণ	১১৩৬
৮৩.	أَمْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجِهَادِ وَ مَوْقِفُ الْمُنَافِقِيْنَ عَنِ الْجِهَادِ রুকূ'–১০ : মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ এবং জিহাদ সম্পর্কে মুনাফিকদের অবস্থান	১১৪৫
৮৪.	اَلتَّوْبِيْخُ عَلٰى تَرْكِ الْجِهَادِ وَخَوْفِ الْمَوْتِ রুকূ'–১১ : জিহাদ পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে ভয় করার কারণে ভর্ৎসনা	১১৫০
৮৫.	রুকূ'–১২ : মুনাফিকদের অবস্থার আলোচনা اَلْبَحْثُ عَنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِيْنَ	১১৬৩
৮৬.	রুকূ'–১৩ : ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম حُكْمُ الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَالْقَتْلِ الْعَمَدِ	১১৬৮
৮৭.	اَلتَّرْغِيْبُ فِي الْهِجْرَةِ وَالثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا রুকূ'–১৪ : হিজরতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং তার ছওয়াবের বর্ণনা	১১৮২
৮৮.	রুকূ'–১৫ : মুসাফিরের নামাজ এবং সালাতুল খাওফের বর্ণনা ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَصَلَاةِ الْخَوْفِ	১১৮৮
৮৯.	রুকূ'–১৬ : চুরির ঘটনায় নবী ﷺ-কে অবহিত করানো اِطِّلَاعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حَادِثَةِ السَّرِقَةِ	১১৯৬
৯০.	إِثْبَاتُ مُخَالَفَةِ أَمْرِ الرَّسُوْلِ جُرْمًا عَظِيْمًا রুকূ'–১৭ : রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতাকে বিরাট অপরাধ হিসেবে সাব্যস্তকরণ	১২০২
৯১.	اَلتَّحْذِيْرُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَطُرُقُ إِغْوَائِهِ রুকূ'–১৮ : শয়তান থেকে সতর্কীকরণ এবং তার ভ্রষ্টকরণের বিভিন্ন পন্থা	১২০৬
৯২.	حَقُّ النِّسَاءِ فِي الْمِيْرَاثِ وَقُدْرَةُ اللهِ تَعَالٰى فِي الْعَالَمِ রুকূ'–১৯ : মীরাসে নারীদের অধিকার ও বিশ্বজগতে আল্লাহর ক্ষমতা	১২১৩
৯৩.	রুকূ'–২০ : সাক্ষ্য ও ফয়সালা প্রদানে ইনসাফের আদেশ اَلْأَمْرُ بِالْإِقْسَاطِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ	১২২২
৯৪.	রুকূ'–২১ : মুনাফিকদের স্বভাব ও পরিণাম أَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ وَعَاقِبَتُهُمْ	১২২৯

اَلْمَدْخَلُ إِلٰى عِلْمِ التَّفْسِيْرِ

علم التفسير-এর শুরুর কথা

- প্রথম আলোচনা : আল কুরআনুল কারীম
- দ্বিতীয় আলোচনা : উলূমুল কুরআন
- তৃতীয় আলোচনা : ইজাযুল কুরআন
- চতুর্থ আলোচনা : কুরআন সংকলন
- পঞ্চম আলোচনা : মুফাসসিরগণ
- ষষ্ঠ আলোচনা : ওহীর পদ্ধতি ও প্রকারভেদ
- সপ্তম আলোচনা : তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও উৎস
- অষ্টম আলোচনা : আল কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত
- নবম আলোচনা : কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের মানচিত্র
- দশম আলোচনা : ইমাম মহল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর পরিচিতি
- এগারোতম আলোচনা : তাফসীরুল জালালাইন পরিচিতি

اَلْبَحْثُ الْأَوَّلُ : اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْم

প্রথম আলোচনা : আল কুরআনুল কারীম

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- اَلتَّعْرِيْفُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٢- آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي اشْتِقَاقِ لَفْظِ الْقُرْآنِ
٣- اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُشْتَقِّ مِنْهُ لِلْقُرْآنِ
٤- أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ مِصْدَاقِ لَفْظِ الْقُرْآنِ
٥- وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٦- عَدَدُ أَسْمَاءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَصِفَاتِهِ
٧- مَوْضُوْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٨- غَرَضُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٩- ذِكْرُ أَوْصَافِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
١٠- بَيَانُ الْعُلُوْمِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
١١- فَضَائِلُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَأَهَمِّيَّتُهُ
١٢- اَلتَّعْرِيْفُ بِالْآيَةِ
١٣- اَلتَّعْرِيْفُ بِالسُّوْرَةِ
١٤- اَلسُّوَرُ عَدَدُ رُكُوْعِهَا وَآيَاتِهَا وَكَلِمَاتِهَا وَحُرُوْفِهَا مَعَ تَعْيِيْنِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ
١٥- تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيْرُهُ بِاللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْعَالَمِ
١٦- كُتُبُ التَّفَاسِيْرِ الْمُطَوَّلَةِ
١٧- أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ حَوْلَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

❖ اَلتَّعْرِيْفُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ : কুরআন মাজীদের পরিচয়

ক. আভিধানিক অর্থ

১. اَلْقُرْآن শব্দটি قَرْأ মূলধাতু হতে নির্গত। এটা فَعْلَان -এর ওযনে বাবে فَتَحَ-এর মাসদার, যা مَقْرُوْء-এর অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ– অধিক পঠিত। যেহেতু এ গ্রন্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই কুরআনকে قُرْآن বলে নামকরণ করা হয়েছে।

২. قُرْآن শব্দটি قَرْن মূলধাতু হতে নির্গত। বাবে ضَرَبَ থেকে তখন শব্দটি مَقْرُوْن অর্থে ব্যবহার হবে, যার অর্থ– মিলিত বা সংযুক্ত, মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে এবং এক সূরা অন্য সূরার সাথে মিলিত; তাই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. 'আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী (র.) বলেন–

هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ بِوَاسِطَةِ الْأَمِيْنِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ اَلْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَتَمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ.

অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ আল্লাহর অলৌকিক বিস্ময়কর বাণী, যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ। আমাদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত। যার তেলাওয়াত ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত। যা সূরা ফাতেহা দ্বারা আরম্ভ এবং সূরা নাস দ্বারা পরিসমাপ্ত।

২. আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন–

اَلْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ ﷺ اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ، اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِيْهِ.

৩. আল-মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ

৪. আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন–

هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ.

৫. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন– اَلْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لِلْإِعْجَازِ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ

৬. আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন–

اَلْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللهِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ رُوْحُ الْأَمِيْنِ عَلَى قَلْبِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِأَلْفَاظِهِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الْحَقَّةِ، اَلْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُوْمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ.

৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর সেই অতীব সম্মানিত বাণী, যা তাঁর পক্ষ হতে রাসূল (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স.) হতে আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে।

❖ آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِيْ اشْتِقَاقِ لَفْظِ الْقُرْآنِ

قُرْآن শব্দটি মুশতাক হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ : قُرْآن শব্দটি اِسْم مُشْتَق কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের দুই ধরনের বক্তব্য রয়েছে।

এক. قُرْآن -اِسْمُ مُشْتَقٌّ (নির্গত বিশেষ্য) নয়; বরং اِسْمُ جَامِدٍ (মৌলিক নাম) :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– هُوَ اسْمُ عَلَمٍ غَيْرُ مُشْتَقٍّ خَاصٌّ بِكَلَامِ اللهِ غَيْرُ مَهْمُوْزٍ অর্থাৎ, কুরআন আল্লাহর কালামের নির্দিষ্ট নাম। এটি কোনো কিছু থেকে নির্গত হয়নি। সুতরাং এতে কোনো হামযা নেই। আল্লামা ইবনে কাসীর ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এ অভিমত সমর্থন করেন।

২. ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন– اَلْقُرْآنُ اِسْمٌ وَلَيْسَ بِمَهْمُوْزٍ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلٰكِنَّهُ اسْمُ كِتَابِ اللهِ مِثْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ অর্থাৎ, কুরআন এমন একটি বিশেষ্য, যাতে কোনো হামযা নেই এবং قراءة শব্দ থেকেও এটি গৃহীত হয়নি। কিন্তু এটি তাওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় আল্লাহর কিতাব।

দুই. قُرْآن - اِسْمُ جَامِدٍ (মৌলিক নাম) নয়; বরং اِسْمُ مُشْتَقٌّ (নির্গত বিশেষ্য) : কেউ কেউ বলেন, اَلْقُرْآن শব্দটি اِسْمُ مُشْتَقٌّ ;

অগ্রগণ্য অভিমত : দুটি উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ, اَلْقُرْآن শব্দটি اِسْمُ عَلَمٍ غَيْرُ مُشْتَقٍّ ; কেননা, এতে কুরআনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয় না। যেমন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন–

اَلْمُخْتَارُ عِنْدِيْ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح).

❖ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ الْمُشْتَقِّ مِنْه لِلْقُرْآنِ

قُرْآن-এর মুশতাক মিনহু সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : যারা কুরআন শব্দকে اِسْمُ مُشْتَقٌّ বলেন, তাদের মাঝে এর مُشْتَقّ منه সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। একদলের মতে, اَلْقُرْآن-এর হামযা অতিরিক্ত ও নূন আসল এবং অন্যদলের মতে, নূন অতিরিক্ত আর হামযা আসল। যেমন–

১. আশয়ারীদের মতে, কুরআন শব্দটি قَرْنُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ থেকে নির্গত। এর অর্থ– এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলিত করা। আর কুরআনুল কারীমের মধ্যে প্রত্যেকটি সূরা, আয়াত ও অক্ষর পরস্পরের সাথে মিলিত।

২. প্রখ্যাত নাহুবিদ ফাররা বলেন, اَلْقُرْآنُ শব্দটি اَلْقَرَائِنُ থেকে নির্গত, যার অর্থ– اَلتَّصْدِيْقُ وَالتَّشْبِيْهُ তথা সত্যায়ন করা ও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। আর কুরআনের আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহ পরস্পরকে সত্যায়ন করে এবং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. আল্লামা লাহয়ানী (র.) বলেন, رُجْحَان ও غُفْرَان-এর ন্যায় اَلْقُرْآن শব্দটি قَرَأَ يَقْرَأُ-এর মাসদার। তখন এর অর্থ হবে– اَلْمَقْرُوْءُ তথা পঠিত। আর কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

৪. মুহাম্মদ আব্দুল আযীম যারকানী (র.) লাহয়ানীর এ উক্তি সমর্থন করেন।

৫. প্রখ্যাত নাহুবিদ যুজাজ (র.) বলেন, اَلْقُرْآن শব্দটি اَلْقُرْءُ থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো– اَلْجَمْعُ তথা একত্র করা।

৬. আবূ ওবায়দা যুজাজের মতের সমর্থক। তিনি বলেন, সকল সূরাকে এ মহাগ্রন্থে একত্র করা হয়েছে বিধায় এর নাম اَلْقُرْآن।

৭. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন–

لَا يُقَالُ لِكُلِّ جَمْعٍ اَلْقُرْآنُ وَلَا لِجَمْعِ كُلِّ كَلَامٍ اِنَّمَا سُمِّيَ قُرْآنًا لِكَوْنِهِ جَمْعَ ثَمَرَاتِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ الْمُنَزَّلَةِ.

❖ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ مِصْدَاقِ لَفْظِ الْقُرْآنِ

قُرْآن শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কিত মতভেদ : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়, নাকি উভয়ের কোনো একটিকে, এ ব্যাপারে ইমামগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. **ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত :** ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও কোনো কোনো উসূলবিদের অভিমত হলো, শুধু অর্থকেই কুরআন বলা হয়; শব্দকে নয়।

দলিল : ক. মহান আল্লাহর বাণী– ১- اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى.
২- اِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ.

যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ভাষা আরবি ছিল না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন– তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ইবরানি ভাষায়, যাবূর ইউনানি আর ইঞ্জিল সুরিয়ানি ভাষায়। সুতরাং ভাষার রূপান্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

খ. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) আরবিতে কুরআন পাঠ করার ক্ষমতা থাকার পরও ফারসিতে অনুবাদ করে নামাজে কুরআন তেলাওয়াত জায়েজ মনে করতেন এবং নিজেও পাঠ করেছেন। সুতরাং শব্দ নয়; অর্থই কুরআন।

২. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, কুরআন শুধু শব্দের নাম।

দলিল : ক. মহান আল্লাহর বাণী– ১- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
২- وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ.

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আর এর দ্বারা শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব শব্দের সমষ্টিই হলো কুরআন।

খ. আর এ কারণেই আল-মানার প্রণেতা কুরআনের সংজ্ঞায়– اَلْمَكْتُوْبُ - اَلْمُنَزَّلُ ও اَلْمَنْقُوْلُ ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা মূলত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গ. কুরআনে কিছু حروف مقطعات ও آيات متشابهات রয়েছে; যেসবের অর্থ মানুষ জানে না। যদি শুধু শব্দের নাম কুরআন না হয়, তাহলে সেগুলো কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা নাসাফী, নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন ও ড. আব্দুল করীম যায়দানসহ জমহুর আলেমের মতে, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।

দলিল : ক. মহান আল্লাহর বাণী– ১- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
২- يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.

প্রথম আয়াতে কুরআনকে মানবজাতির জন্যে রহমত ও শেফা বলা হয়েছে, যা শব্দ এবং অর্থ উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। আর দ্বিতীয় আয়াতাংশে যে তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে, তাতে অক্ষর প্রয়োজন; অতঃপর কিতাব শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে অর্থের প্রয়োজন।

খ. তারা আরো বলেন, কুরআনের সম্পূর্ণটাই মু'জিযা। আর এ গুণটি শব্দ ও অর্থ উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।

জমহুরের পক্ষ থেকে বিরোধীদের প্রত্যুত্তর : বিরুদ্ধবাদীগণের বক্তব্যের উত্তর নীচে বর্ণিত হলো–

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) পরবর্তীতে قِرَاءَةُ الْفَارِسِيَّة-এর বৈধতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন নূরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার বলেন–

فَاِنَّ الْاِمَامَ الْاَعْظَمَ رَجَعَ اِلٰى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ عَلٰى مَا رَوَاهُ نُوْحُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْهُ (كَذَا فِي التَّلْوِيْح).

২. কতিপয়ের উপস্থাপিত দলিলের আয়াত ও বিশ্লেষণসমূহ যেরূপ শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত করে।

৩. حروف مقطعات ও آيات متشابهات-এর অর্থ মানুষ না জানলেও অনেকে মনে করেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-এর জন্যে বিরাট তাৎপর্যবহ গোপন সংকেত।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই اَلْمَنَار গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا;

❖ وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم

কুরআন নামকরণের তাৎপর্য : এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা নীচে বর্ণিত হলো–

১. মুফতি তাকী ওসমানীর অভিমত : আল্লামা তাকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, কুরআন অবতরণকালে আরবের অবিশ্বাসীরা নানারূপ হট্টগোল করতো, যাতে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌঁছে। তাদের এ আপত্তিকর ব্যবহারের জবাবে قُرْآن (পঠিত) নাম রেখে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেন, কিছুতেই তোমরা তা পারবে না।

২. **আবুল হাসান আশয়ারী (র.)-এর অভিমত :** আবুল হাসান আশয়ারী (র.)-এর মতে, কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও সূরা মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। কেননা, কুরআন শব্দটি قَرْن (মিলিয়ে দেওয়া) মূলধাতু থেকে এসেছে।

৩. **ইমাম ফাররা (র.)-এর অভিমত :** বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ ফাররা (র.)-এর মতে, যেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহ একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণকারী ও পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই একে قُرْآن নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর মতে, কুরআন শব্দটি قَرَائِنُ (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) শব্দ থেকে এসেছে।

৪. **আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত :** আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, 'কুরআন' নামটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর আবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাবের জন্যেই নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট; যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

৫. **ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.)-এর অভিমত :** ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.)-এর মতে–

إِنَّمَا سُمِّيَ قُرْآنًا لِكَوْنِهِ جَمْعَ ثَمَرَاتِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ الْمُنَزَّلَةِ.

অর্থাৎ, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কুরআনকেই قرآن বলা হয়েছে এজন্যে যে, আসলে এ কুরআনেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

❖ عَدَدُ أَسْمَاءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَصِفَاتُهُ

কুরআন কারীমের নাম ও গুণসমূহ : আল কুরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ নাম 'কুরআন'। এর অনেক গুণবাচক নামও রয়েছে। যেমন–

ক. আল্লামা আবুল মা'আলী কুরআনুল কারীমের ৫৫টি নাম বর্ণনা করেছেন।

খ. কেউ কেউ নিরানব্বইটি নামও বর্ণনা করেন।

গ. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে কুরআনের চারটি মৌলিক নাম উল্লেখ করেন। তা হলো আল কুরআন, আল-কিতাব, আল-ফুরকান ও আয-যিকর।

ঘ. ইমাম যারকানী (র.) 'আত-তানযীল' নাম বৃদ্ধি করে পাঁচটি মৌলিক নাম উল্লেখ করেন।

ঙ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর গ্রন্থে আবুল মা'আলী-এর বরাতে কুরআনুল কারীমের ৫৫টি গুণবাচক নাম বর্ণনা করেন। নিম্নে অর্থসহ গুণবাচক সেই নামগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. اَلْكِتَابُ	(লিখিত গ্রন্থ)	২. اَلْمُبِيْنُ	(বর্ণনাকারী)
৩. اَلْقُرْآنُ	(পঠিত)	৪. اَلْكَرِيْمُ	(মহাসম্মানিত)
৫. كَلَامُ اللهِ	(আল্লাহর বাণী)	৬. اَلنُّوْرُ	(আলো)
৭. اَلْهُدٰى	(পথপ্রদর্শক)	৮. اَلرَّحْمَةُ	(দয়া)
৯. اَلْفُرْقَانُ	(পার্থক্যকারী)	১০. اَلشِّفَاءُ	(আরোগ্য)
১১. اَلْمَوْعِظَةُ	(উপদেশ)	১২. اَلذِّكْرُ	(আলোচনা)
১৩. اَلْمُبَارَكُ	(বরকতময়)	১৪. اَلْعُلٰى	(সুউচ্চ)
১৫. اَلْحِكْمَةُ	(প্রজ্ঞা)	১৬. اَلْحَكِيْمُ	(প্রজ্ঞাময়)
১৭. اَلْمُهَيْمِنُ	(সংরক্ষণকারী)	১৮. اَلْحَبْلُ	(রশি বা রজ্জু)
১৯. اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ	(সঠিক পথ)	২০. اَلْقَيِّمُ	(মজবুত)
২১. اَلْقَوْلُ	(বাণী)	২২. اَلْفَصْلُ	(পৃথককারী)
২৩. اَلنَّبَأُ الْعَظِيْمُ	(মহাসংবাদ)	২৪. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ	(উত্তম বাণী)
২৫. اَلْمُتَشَابِهُ	(সাদৃশ্যপূর্ণ)	২৬. اَلْمَثَانِيْ	(বার বার পঠিত)

২৭. اَلتَّنْزِيْلُ	(অবতীর্ণ)	২৮. اَلرُّوْحُ	(আত্মা)
২৯. اَلْوَحْيُ	(প্রত্যাদেশ)	৩০. اَلْعَرَبِيُّ	(আরবি ভাষা)
৩১. اَلْبَصَائِرُ	(দৃষ্টি)	৩২. اَلْبَيَانُ	(বর্ণনা করা)
৩৩. اَلْعِلْمُ	(জ্ঞান)	৩৪. اَلْحَقُّ	(সত্য)
৩৫. اَلْهُدٰي	(পথপ্রদর্শনকারী)	৩৬. اَلْعَجَبُ	(বিস্ময়কর)
৩৭. اَلتَّذْكِرَةُ	(উপদেশ)	৩৮. اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى	(সুদৃঢ় রজ্জু)
৩৯. اَلصِّدْقُ	(সত্য)	৪০. اَلْعَدْلُ	(ন্যায়)
৪১. اَلْبُشْرٰى	(সুসংবাদ)	৪২. اَلْمَجِيْدُ	(মর্যাদাশীল)
৪৫. اَلزَّبُوْرُ	(যাবূর)	৪৬. اَلْبَشِيْرُ	(সুসংবাদদাতা)
৪৭. اَلنَّذِيْرُ	(ভীতিপ্রদর্শনকারী)	৪৮. اَلْعَزِيْزُ	(শক্তিশালী)
৪৯. اَلْبَلَاغُ	(পৌঁছানোর মাধ্যম)	৫০. اَلْقَصَصُ	(ঘটনাবলি)
৫১. اَلصُّحُفُ	(পাণ্ডুলিপি)	৫২. اَلْمُكَرَّمَةُ	(সম্মানিত)
৫৩. اَلْمَرْفُوْعَةُ	(সমুন্নত)	৫৪. اَلْمُطَهَّرَةُ	(পবিত্র)
৫৫. اَلْمُصَدِّقُ	(সত্যায়নকারী)		

আল্লাহ তা'আলা যেমন মহান, চিরন্তন ও সর্বাধিক নামের অধিকারী; ঠিক আল্লাহর বাণী হিসেবে কুরআনও মহান, চিরন্তন ও অধিক নামসমৃদ্ধ। তবে কুরআনের মূল নাম কুরআনই। অন্যগুলো সিফাত বা গুণবাচক নামমাত্র।

❖ مَوْضُوْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন কারীমের আলোচ্য বিষয় : কুরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মতপার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

১. ইমাম গাযালী (র.)-এর অভিমত : ইমাম গাযালী (র.) কুরআনের চারটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন। যথা–

১. عِلْمُ الْأُصُوْلِ তথা মূলনীতির জ্ঞান। এ জ্ঞান আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা– ক. عِلْمُ التَّوْحِيْدِ তথা একত্ববাদের জ্ঞান, খ. عِلْمُ الرِّسَالَةِ তথা রিসালাতের জ্ঞান, গ. عِلْمُ الْآخِرَةِ তথা পরকালের জ্ঞান।
২. عِلْمُ الْأَحْكَامِ তথা বিধিবিধানসংবলিত জ্ঞান।
৩. عِلْمُ السُّلُوْكِ তথা মারেফতের জ্ঞান।
৪. عِلْمُ الْقَصَصِ عَنِ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ তথা পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাসংবলিত জ্ঞান।

২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)-এর অভিমত : তিনি কুরআনের পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. عِلْمُ الْأَحْكَامِ তথা বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।
২. عِلْمُ الْجَدَلِ তথা তর্কশাস্ত্রীয় জ্ঞান।
৩. عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِآلَاءِ اللهِ তথা আল্লাহর নিদর্শনমূলক জ্ঞান।
৪. عِلْمُ التَّعْذِيْبِ مِنَ اللهِ তথা আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কিত জ্ঞান।
৫. عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ তথা মৃত্যু ও পারলৌকিক জ্ঞান।

৩. আল্লামা তাকী ওসমানী (দা.বা.)-এর অভিমত : তিনি কুরআনের বিষয়বস্তুকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. عَقَائِد তথা মৌলিক বিশ্বাস
২. أَحْكَام তথা বিধিবিধান
৩. قَصص তথা ঘটনাবলি
৪. أَمْثَال তথা উপমাসমূহ

৪. আল্লামা ইকবাল (র.)-এর অভিমত : তাঁর মতে, কুরআনের বিষয়বস্তু তিনটি। যথা–

১. বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা ২. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা ৩. বিধিবিধান সংক্রান্ত আলোচনা

৫. আল্লামা শিবলী নোমানী (র.)-এর অভিমত : তিনি বলেন, মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধান।

❖ غَرَضُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন কারীমের উদ্দেশ্য : কুরআনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মতমত রয়েছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. আল্লামা রসুল খান (র.) বলেন, কুরআনের উদ্দেশ্য হলো– الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ তথা, সরল-সঠিক পথ।

২. আল্লামা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী (র.) বলেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হলো কুরআনের উদ্দেশ্য।

৩. আল্লামা আহমদ আলী লাহোরী (র.) বলেন, কুরআনের উদ্দেশ্য হলো–

طَرِيْقَةُ التَّزْكِيَةِ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَطَرِيْقَةُ التَّحْلِيَةِ بِمَا يَرْضٰى بِهِ اللهُ تَعَالٰى.

৪. কারো কারো মতে, কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৫. কেউ কেউ আবার কুরআনের উদ্দেশ্য 'হেদায়েত' বলেও উল্লেখ করেন।

ফরাসী পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলি চমৎকার একটি মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্যে একটি বিজ্ঞানসংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্যে একটি ব্যাকরণগ্রন্থ এবং আইনবিদদের জন্যে একটি আইন বিশ্বকোষ।

❖ ذِكْرُ أَوْصَافِ الْقُرْآنِ

কুরআন কারীমের বৈশিষ্ট্যাবলি : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বমানবের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও অমূল্য অবদান। কুরআন কারীমের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নীচে আলোচনা করা হলো–

১. সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ : আল কুরআন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্যে একমাত্র আদর্শ। এ গ্রন্থের পর আর কোনো আসমানি কিতাব পৃথিবীতে আসবে না। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব আসমানি গ্রন্থের জন্যে সীলমোহরস্বরূপ। এ কিতাব কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনবিধান হিসেবে কার্যকর থাকবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

২. সন্দেহমুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ : বিশ্বের যে কোনো গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই কুরআন নিজেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে– ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

৩. অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ : কুরআন মাজীদ এমন একটি গ্রন্থ, যার সাথে বিশ্বের অন্য যে কোনো গ্রন্থের কোনো প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোপুরিই অসম্ভব। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সুদৃঢ় চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَائَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

উল্লিখিত ঘোষণার চৌদ্দশ' বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে আজও কেউ দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারেনি।

৪. উপদেশসংবলিত জীবন্ত গ্রন্থ : কুরআন সকল নবী-রাসূলের কর্মতৎপরতার জীবন্ত আলেখ্য। এতে সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধাদানকারীদের লোমহর্ষক অত্যাচারের বর্ণনাপূর্বক তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ.

৫. অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান : কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, মহানবী ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। তাইতো আল্লাহ ঘোষণা করেন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ

৬. সর্বজনীন জীবনবিধান : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ গ্রন্থ শুধু ধর্মীয় বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নীতিমালা যথার্থরূপে বিধৃত হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন– وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

৭. **সত্যের ঝাণ্ডাবাহী :** কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য ও অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে সত্য ও আলোর পথে চালিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়্যাতের বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে কুরআন মানুষকে আলোর দিশা দিয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

৮. **শ্রেষ্ঠ আইনগ্রন্থ :** কুরআন মাজীদ মুসলিম আইনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর প্রতিটি বিধিনিষেধ অবশ্য পালনীয়। ড. মরিস বুকাইলি বলেন, "কুরআন আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ।"

৯. **ভাষা ও গুণগত মানে শ্রেষ্ঠত্ব :** কুরআন মাজীদের অত্যুঙ্গ ভাব, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ, সুরমূর্ছনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সবকিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চিরশাশ্বত গুণমানে অধিষ্ঠিত। এদিক থেকে কুরআন মহানবী ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

❖ بَيَانُ الْعُلُوْمِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন কারীম থেকে উদ্ভাবিত জ্ঞানভাণ্ডারের বর্ণনা : কুরআন থেকে নির্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় নীচে বর্ণিত হলো–

১. **একত্ববাদের জ্ঞান :** উসূলশাস্ত্রবিদগণ মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদে প্রাপ্ত মৌলিক প্রমাণাদির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ; এরকম আরো অনেক আয়াত নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেছেন। তাঁরা এ প্রকার ইলমকে عِلْمُ التَّوْحِيْد বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. **ফিকহসংক্রান্ত জ্ঞান :** ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কুরআন মাজীদে বর্ণিত হালাল, হারাম ও অন্যান্য হুকুমসংবলিত আয়াতসমূহে গভীরভাবে গবেষণা করে এ প্রকার ইলমের নাম রাখেন عِلْمُ الْفُرُوْعِ وَالْفِقْهِ

৩. **উসূলে ফিকহশাস্ত্রীয় জ্ঞান :** উসূলে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কুরআনের আয়াতের অর্থকে নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করেন–
عَامّ. خَاصّ. صَرِيْح. كِنَايَة. مُشْتَرِك. مُؤَوَّل. حَقِيْقَة. مَجَاز. ظَاهِر. نَصّ. مُحْكَم. مُفَسَّر.
এসবকে তাঁরা عِلْمُ أُصُوْلِ الْفِقْه তথা 'উসূলে ফিকহশাস্ত্র' বলে নামকরণ করেন।

৪. **পরকাল সম্পর্কীয় জ্ঞান :** কুরআনে সুসংবাদ, ভীতি প্রদর্শন, মৃত্যুর আলোচনা, পুনর্জীবন, হাশরনাশর, হিসাবনিকাশ, বেহেশত ও দোজখের আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়কে আলেমগণ عِلْمُ الْمَعَادِ নাম দিয়েছেন।

৫. **ইতিহাস ও কাহিনী শাস্ত্রীয় জ্ঞান :** ঐতিহাসিক আলেমগণ কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে পূর্ববর্তী নবীদের জীবনচরিত এবং পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী উম্মতের ইতিহাস, মানব সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করেন। এ প্রকার ইলমকে عِلْمُ التَّارِيْخِ وَالْقَصَصِ বলে নামকরণ করা হয়।

৬. **عِلْمُ الْفَرَائِض তথা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান :** কিছুসংখ্যক আলেম ও মনীষী কুরআনে বর্ণিত মীরাস তথা উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত যেমন– يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ থেকে গবেষণা করে عِلْمُ الْفَرَائِضِ উদ্‌ঘাটন করেন।

৭. **বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ সম্পর্কিত জ্ঞান :** আল্লাহ তা'আলা তেলাওয়াত প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا; এ আয়াতে গবেষণা করে তাজভীদ শাস্ত্রবিদগণ কুরআন তেলাওয়াত বা পাঠ করার নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। আর এ প্রকার ইলমকে عِلْمُ التَّجْوِيْدِ বলা হয়।

৮. **হেকমত ও উপমাসূচক জ্ঞান :** মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানসম্মত উপমা ও উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
এসব আয়াতে গবেষণা করে আলেমগণ عِلْمُ الْحُكْمِ وَالْأَمْثَالِ আবিষ্কার করেন।

৯. **অলঙ্কার শাস্ত্রীয় জ্ঞান :** মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের আশ্চর্যপূর্ণ গ্রন্থনা, ভাষাশৈলীর বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, বিভিন্ন পন্থায় উপস্থাপনা, বালাগাত-ফাসাহাতে পরিপূর্ণতা, শাব্দিক সংযোজন, ভাষার অনুপম সৌন্দর্য, সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে আরবি ভাষাবিদগণ عِلْمُ الْمَعَانِيْ وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيْعِ আবিষ্কার করেন।

১০. **নাহু ও সরফশাস্ত্রের জ্ঞান :** মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদে রয়েছে অসংখ্য– مُعْرَب - مَبْنِيّ - مُفْرَد - مُرَكَّب - جُمْلَة - اِسْمٌ - فِعْل - حَرْف ইত্যাদি। নাহুশাস্ত্রবিদগণ এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে عِلْمُ النَّحْوِ وَالصَّرْفِ বা 'নাহু ও সরফশাস্ত্র' আবিষ্কার করেন।

১১. ছন্দবিদ্যা : কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের শেষ বর্ণগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল থাকার কারণে একদল আদীব বা ভাষাপণ্ডিত عِلْمُ الْعَرُوْضِ উদঘাটন করেন।

১২. চিকিৎসাবিদ্যা : কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যা মানুষের রোগ নিরাময় করে। তাই কিছুসংখ্যক মনীষী কুরআন মাজীদ গবেষণা করে عِلْمُ الطِّبِّ বা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রণয়ন করেন।

১৩. নীতিবিদ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ; এ জাতীয় আয়াতসমূহে গবেষণা করে আলেমগণ عِلْمُ الْأَخْلَاقِ বা 'নৈতিক চরিত্র শাস্ত্র' উদঘাটন করেন।

১৪. প্রকৌশল বিদ্যা : আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلِّ ذِيْ ثَلَاثِ شُعَبٍ-এর ন্যায় আয়াতসমূহের মধ্যে গবেষণা করে বিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ عِلْمُ الْهَنْدَسَةِ তথা 'প্রকৌশল বিদ্যা' উদ্ভাবন করেছেন।

১৫. ভূগোলশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান : কুরআন মাজীদের বাণী– قُلْ سِيْرُوْ فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ এবং الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا ইত্যাদি আয়াতসমূহ গবেষণা করে একদল মনীষী عِلْمُ الْجُغْرَافِي বা 'ভূগোলশাস্ত্র' আবিষ্কার করেন।

১৬. দিগদর্শন বিদ্যা : আল্লাহ তা'আলার বাণী–

١- تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا .

٢- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

ইত্যাদি আয়াতসমূহে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক আলেমগণ عِلْمُ الْهَيْئَةِ তথা 'দিগদর্শন' সংক্রান্ত বিদ্যা উদঘাটন করেন।

১৭. তর্কশাস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞান : কুরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা যৌক্তিক তর্ক করার শিক্ষা দেয়। যেমন– وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

অনুরূপ ইবরাহীম (আ.) ও নমরূদ এবং মূসা (আ.) ও ফিরাউনের মধ্যে ঘটিত তর্ক সংবলিত আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে গবেষণা করে আলেমগণ عِلْمُ الْجَدَلِ রচনা করেন।

১৮. জ্যোতির্বিদ্যা : জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বহুসংখ্যক আয়াত পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ; এ আয়াতসমূহ গবেষণা করে عِلْمُ النُّجُوْمِ উদঘাটন করা হয়।

১৯. গণিতশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান : মহান আল্লাহর বাণী– فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ইত্যাদি আয়াতসমূহে গবেষণা করে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ عِلْمُ الْحِسَابِ বা 'অংকশাস্ত্র' (হিসাববিজ্ঞান) উদঘাটন করেন।

❖ فَضَائِلُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَأَهَمِّيَّتُهُ

কুরআন কারীমের ফযিলত ও গুরুত্ব : কুরআন ও তার জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে হাদীসে অনেক ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় কুরআন শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত। কিছু কুরআন পঠন ও তারতীল সংক্রান্ত। কিছু রয়েছে কুরআন সংরক্ষণ ও বার বার অধ্যয়ন সংক্রান্ত। অনুরূপভাবে স্বয়ং কুরআনেও অসংখ্য আয়াতে মুমিনদেরকে কুরআন গবেষণা ও হুকুমসমূহ পালন করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আর তা পাঠের সময় মনোযোগসহ শ্রবণ করা ও চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নীচে কুরআনের ফযিলত ও গুরুত্ব সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হলো–

ক. কুরআনের আয়াত

١- اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ ..... رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.

٢- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

٣- ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ.

٤- إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.

٥- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

٦- لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

٧- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
٨- مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.
٩- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

খ- হাদীসে নববী

١- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. (رواه البخاري)
٢- أَشْرَفُ أُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ (رواه الترمذي)
٣- اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ. (رواه الترمذي)
٤- مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. (متفق عليه)
٥- إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
٦- تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ.
٧- مَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ حَرْفًا فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
٨- أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ.
٩- مَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
١٠- فَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهِ.
١١- اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ.
١٢- اَلَّذِيْ يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ.
١٣- مَنْ قَرَءَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.
١٤- لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِيْ إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِى النَّارِ مَا احْتَرَقَ.
١٥- عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِى الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ.
١٦- اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَصَادِقٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.

❖ اَلتَّعْرِيْفُ بِالْآيَةِ : আয়াতের পরিচয়

ক. আভিধানিক অর্থ : اَلْآيَةُ শব্দটি আভিধানিকভাবে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. اَلْعَلَامَةُ তথা চিহ্ন, নিদর্শন। যেমন আল্লাহর বাণী– فِيْهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
২. اَلنَّصِيْحَةُ তথা উপদেশ। যেমন– لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً
৩. اَلتَّعَجُّبُ তথা বিস্ময়কর। যেমন বলা হয়– هُوَ آيَةٌ فِى الْعِلْمِ وَالْمَالِ
৪. কেউ কেউ বলেন– جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُرُوْفِ وَالْكَلِمَاتِ তথা কতগুলো বর্ণ ও শব্দের সমষ্টি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. ইমাম জাবারী (র.)-এর মতে– اَلْآيَةُ قُرْآنٌ مُرَكَّبٌ مِنْ جُمَلٍ وَلَوْ تَقْدِيْرًا ذُوْ مَبْدَأٍ وَمَقْطَعٍ مُنْدَرِجٌ فِيْ سُوْرَةٍ
অর্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের কতগুলো বাক্যের সমাবেশ; যদিও উহ্যভাবে হোক। যার শুরু এবং শেষ আছে এবং সেগুলো সূরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত।
২. আল বুরহান গ্রন্থপ্রণেতা বলেন– اَلْآيَةُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مُنْقَطِعَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا لَيْسَ بَيْنَهَا شِبْهٌ بِمَا سِوَاهَا
৩. কেউ কেউ বলেন– اَلْآيَةُ طَائِفَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ مُتَمَيِّزَةٌ بِفَصْلٍ
কমপক্ষে একটি শব্দেও একটি আয়াত হয়। যেমন– مُدْهَامَّتَانِ

❖ اَلتَّعْرِيْفُ بِالسُّوْرَةِ : সূরার পরিচয়

ক. আভিধানিক অর্থ

১. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, سُوْرَة শব্দটি سور থেকে নির্গত; যার অর্থ–اَلْإِنَاءِ فِي مَا بَقِيَ مِنَ الشَّرَابِ অর্থাৎ, পাত্রে অবশিষ্ট পানীয়। সুতরাং سُوْرَة-এর অর্থ قِطْعَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ তথা কুরআনের অংশ।

২. কোনো কোনো মুফাসসির এটাকে سُوْرَةُ الْمَدِيْنَةِ তথা 'শহর বেষ্টনী' অর্থ থেকে গৃহীত মনে করেন। যেহেতু কুরআনের প্রত্যেকটি سُوْرَة তার অধীনস্থ আয়াতসমূহকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাই এটাকে سُوْرَة বলা হয়।

৩. اَلْعَلَامَةُ তথা চিহ্ন, নিদর্শন।

৪. اَلْمَنْزِلَةُ الرَّفِيْعَةُ তথা উচ্চস্থান।

৫. اَلشَّرَفُ তথা মর্যাদা। যেমন– لَهُ عَلَيْكَ سُوْرَةٌ

৬. দীর্ঘ ও সুরম্য প্রাসাদ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. ইমাম জাবারী (র.)-এর মতে– اَلسُّوْرَةُ قُرْآنٌ يَشْتَمِلُ عَلٰى أَيِّ ذِيْ فَاتِحَةٍ وَخَاتِمَةٍ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ অর্থাৎ, সূরা হলো যা কুরআনের কতগুলো আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যার শুরু এবং শেষ রয়েছে। তার সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো তিন আয়াত।

২. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন–
اَلسُّوْرَةُ الطَّائِفَةُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُسَمَّاةُ بِاِسْمٍ خَاصٍّ سُمِّيَتْ بِذٰلِكَ لِأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلٰى كَلِمَاتِهَا كَاشْتِمَالِ سُوْرَةِ لِلْبَلَدِ

৩. আল্লামা সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন–
اَلطَّائِفَةُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُسَمَّاةُ بِاِسْمٍ خَاصٍّ تَوْقِيْفًا وَاَقَلُّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ.

❖ اَلسُّوَرُ: عَدَدُ رُكُوْعِهَا وَآيَاتِهَا وَكَلِمَاتِهَا وَحُرُوْفِهَا مَعَ تَعْيِيْنِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ

মাক্কী-মাদানী ও নাসেখ-মানসুখ নির্ধারণসহ সূরার রুকূ', আয়াত, শব্দ ও হরফের সংখ্যা নির্ণয় : নবুয়ত লাভের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে ১২ বছর ৫ মাস ২ দিন ছিলেন। এরপর তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন এবং ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন মদীনায় অতিবাহিত করার পর ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন।

মক্কা শরীফে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলো 'মাক্কী' সূরা বলা হয়। আর যেসব সূরা মদীনা শরীফে অবস্থানকালে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে 'মাদানী' সূরা বলা হয়। আমরা কথাটিকে এভাবেও বলতে পারি যে, হিজরতের পূর্বে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, সে সূরাসমূহকে মাক্কী সূরা বলা হয়। আর হিজরতের পর অবতীর্ণ সূরাসমূহকে মাদানী সূরা বলা হয়। নিম্নে মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো–

ক্রমিক	সূরা	রুকূ'	আয়াত	শব্দ	হরফ	পারা	মাক্কী/মাদানী	নাসেখ/মানসুখ
০১.	ফাতেহা	১	৭	২৫	১২৩	১	মাক্কী	নেই
০২.	বাক্বারা	৪০	২৮৬	৬০২১	২৫০০৩	১-৩	মাদানী	উভয়
০৩.	আলে ইমরান	২০	২০০	৩৫৪২	১৫৩২৬	৩-৪	মাদানী	উভয়
০৪.	নিসা	২৪	১৭৬	২৭২০	১৬৬৬৭	৪-৬	মাদানী	উভয়
০৫.	মায়েদা	১৬	১২০	২৪৪২	১২৪৬৪	৬-৭	মাদানী	উভয়
০৬.	আন'আম	২০	১৬৫	৩১০০	১২৯৩৫	৭	মাক্কী	মানসুখ
০৭.	আ'রাফ	২৪	২০৬	৩৩৮৭	১৪৬৩৫	৮	মাক্কী	মানসুখ
০৮.	আনফাল	২০	৭৫	১২৫৩	৫৫২২	৯	মাদানী	উভয়
০৯.	তওবা	১৬	১২৯	২৫৩৭	১১২৬০	১০	মাদানী	উভয়
১০.	ইউনুস	১১	১০৯	১৮৬১	৭৭৩৩	১১	মাক্কী	মানসুখ
১১.	হূদ	১০	১২২	১৯৩৬	৭১২৪	১১	মাক্কী	মানসুখ
১২.	ইউসুফ	১২	১১১	১৮০৮	৭৪১১	১২	মাক্কী	নেই

ক্রমিক	সূরা	রুকূ'	আয়াত	শব্দ	হরফ	পারা	মাক্কী/মাদানী	নাসেখ/মানসুখ
১৩.	রা'দ	৬	৪৩	৮৬২	৩৬১৪	১৩	মাদানী	মানসুখ
১৪.	ইবরাহীম	৭	৫২	৮৪৫	৩৬০১	১৩	মাক্কী	উভয়
১৫.	হিজর	৬	৯৯	৬৬৩	২৯০৭	১৩	মাক্কী	মানসুখ
১৬.	নাহল	১৬	১২৮	১৮৭১	৭৯৭৪	১৪	মাক্কী	মানসুখ
১৭.	বনী ইসরাঈল	১২	১১১	১৫৮২	৬৭১০	১৫	মাক্কী	মানসুখ
১৮.	কাহফ	১২	১১০	১৬০৮	৬৬২০	১৫	মাক্কী	মানসুখ
১৯.	মারইয়াম	৬	৯৮	৯৬৮	৩৯৮৬	১৬	মাক্কী	উভয়
২০.	ত্বা-হা	৮	১৩৫	১২৫১	৫৪৬৬	১৬	মাক্কী	মানসুখ
২১.	আম্বিয়া	৭	১১২	১১৮৭	৫১৫৪	১৭	মাক্কী	উভয়
২২.	হজ	১০	৭৮	১২৬৩	৫৪৩২	১৭	মাদানী	উভয়
২৩.	মুমিনূন	৬	১১৮	১০৭০	৪৫৩৪	১৮	মাক্কী	মানসুখ
২৪.	নূর	৯	৬৪	১৪২	৬৪১	১৮	মাদানী	উভয়
২৫.	ফোরক্বান	৬	৭৭	৯০৬	৩৯১৯	১৮	মাক্কী	উভয়
২৬.	শু'আরা	১১	২২৭	১২৪৭	৫৬৮৯	১৯	মাক্কী	উভয়
২৭.	নামল	৭	৯৩	১১৬৭	৪৮২৯	১৯	মাক্কী	মানসুখ
২৮.	ক্বাসাস	৯	৮৮	১৪৫৪	৬০১১	২০	মাক্কী	মানসুখ
২৯.	আনকাবূত	৭	৬৯	৯৯০	৪৪১০	২০	মাক্কী	মানসুখ
৩০.	রূম	৬	৬০	৮২৭	৩৫৪৭	২১	মাক্কী	মানসুখ
৩১.	লোক্বমান	৪	৩৪	৫৫৪	২২১৭	২১	মাক্কী	মানসুখ
৩২.	সাজদা	৩	৩০	২৭৪	১৫৭৭	২১	মাক্কী	মানসুখ
৩৩.	আহযাব	৯	৭৩	১২১০	৫৯০৯	২১	মাদানী	উভয়
৩৪.	সাবা	৬	৫৪	৮৯৬	৩৬৩৬	২২	মাক্কী	উভয়
৩৫.	ফা-ত্বির	৫	৪৫	৭৯২	৩২৮৯	২২	মাক্কী	মানসুখ
৩৬.	ইয়াসীন	৫	৮৩	৭২৯	৩০৯০	২২	মাক্কী	নেই
৩৭.	সা-ফ্ফাত	৫	১৮২	৮৭৩	৩৯৫১	২৩	মাক্কী	মানসুখ
৩৮.	সোয়াদ	৫	৮৮	৮৩৮	৩১০৭	২৩	মাক্কী	মানসুখ
৩৯.	যুমার	৮	৭৫	১১৮৪	৪৯৬৫	২৩	মাক্কী	মানসুখ
৪০.	মু'মিন	৯	৮৫	১২৪২	৫২১৩	২৪	মাক্কী	উভয়
৪১	হা-মীম সাজদা	৬	৫৪	৮০৯	৩৪০৬	২৪	মাক্কী	মানসুখ
৪২	শূরা	৫	৫৩	৮৬৯	৩৫৮৫	২৫	মাক্কী	মানসুখ
৪৩.	যুখরুফ	৭	৮৯	৮৪৩	৩৬৫৬	২৫	মাক্কী	মানসুখ
৪৪.	দুখান	৩	৫৯	৩৪৬	১৪৯৫	২৫	মাক্কী	মানসুখ
৪৫.	জাসিয়া	৪	৩৭	৪৯২	২১৩১	২৫	মাক্কী	মানসুখ
৪৬.	আহক্বাফ	৪	৩৫	৭৫০	২৭০৯	২৬	মাক্কী	মানসুখ

ক্রমিক	সূরা	রুকূ'	আয়াত	শব্দ	হরফ	পারা	মাক্কী/মাদানী	নাসেখ/মানসুখ
৪৭.	মুহাম্মদ	৪	৩৮	৫৫৮	২৪৭৫	২৬	মাদানী	মানসুখ
৪৮.	ফাতহ	৪	২৯	৫৭১৮	২৫৫৫	২৬	মাদানী	মানসুখ
৪৯.	হুজুরাত	২	১৮	৩৫০	১৫১২	২৬	মাদানী	নেই
৫০.	ক্বাফ	৩	৪৫	৩৭৬	১৫২৫	২৬	মাক্কী	মানসুখ
৫১.	যা-রিয়াত	৩	৬০	৩৬০	১৫৫৯	২৬	মাক্কী	উভয়
৫২.	ত্বূর	২	৪৯	৩১৯	১৩৩৪	২৭	মাক্কী	উভয়
৫৩.	নাজম	৩	৬২	৫৬৫	১৪৫০	২৭	মাক্কী	মানসুখ
৫৪.	ক্বামার	৩	৫৫	২৪৮	১৪৮২	২৭	মাক্কী	মানসুখ
৫৫.	রাহমান	৩	৭৮	৩৫১	১৬৮৩	২৭	মাদানী	নেই
৫৬.	ওয়াক্বিয়া	৩	৯৬	৩৮৪	১৭৬৮	২৭	মাদানী	উভয়
৫৭.	হাদীদ	৪	২৯	৫৮৬	২৫৯৯	২৭	মাদানী	নেই
৫৮	মুজাদালা	৩	২২	৪৭৯	২১০৩	২৮	মাদানী	উভয়
৫৯.	হাশর	৩	২৪	২৫৫	২০১৬	২৮	মাদানী	নাসেখ
৬০.	মুমতাহিনা	২	১৩	৩৭০	১৫৬৩	২৮	মাক্কী	মানসুখ
৬১.	ছফ	২	১৪	২২৩	৯৯১	২৮	মাদানী	নেই
৬২.	জুমুয়া	২	১১	১৭৬	৭৮৭	২৮	মাদানী	নেই
৬৩.	মুনাফিক্বুন	২	১১	১৮৩	৮২১	২৮	মাদানী	নাসেখ
৬৪.	তাগাবুন	২	১৮	২৪৭	১১২২	২৮	মাদানী	নাসেখ
৬৫.	ত্বালাক্ব	২	১২	২৯৮	১২৩৭	২৮	মাদানী	নাসেখ
৬৬.	তাহরীম	৩	১২	৩৫৩	১১২৪	২৮	মাদানী	নেই
৬৭.	মুলক	২	৩০	৩৩৫	১৩৫৯	২৯	মাক্কী	নেই
৬৮.	ক্বলম	২	৫২	৩০৬	১২৯৫	২৯	মাক্কী	নেই
৬৯.	হা-ক্বক্বা	২	৫২	২৬০	১১৩৪	২৯	মাক্কী	নেই
৭০.	মা'আরিজ	২	৪৪	২২০	৯৭৭	২৯	মাক্কী	মানসুখ
৭১.	নূহ	২	২৮	২৩১	৯৭৪	২৯	মাক্কী	নেই
৭২.	জিন	২	২৮	২৮৭	১১২৬	২৯	মাক্কী	নেই
৭৩.	মুযযাম্মিল	২	২০	২০০	৮৬৪	২৯	মাক্কী	উভয়
৭৪.	মুদদাসসির	২	৫৬	২৫৬	১১৪৫	২৯	মাক্কী	উভয়
৭৫.	ক্বিয়ামা	৪	৪০	১৬৪	২৮২	২৯	মাক্কী	মানসুখ
৭৬.	দাহর	২	৩১	২৪৬	১০৯৯	২৯	মাক্কী	মানসুখ
৭৭.	মুরসালাত	২	৫০	১৮১	৮৪৬	২৯	মাক্কী	নেই
৭৮.	নাবা	২	৪০	১৭৪	৮০১	৩০	মাক্কী	নেই
৭৯.	নাযি'আত	২	৪৬	১৮১	৭৯১	৩০	মাক্কী	নেই
৮০.	'আবাসা	১	৪২	১৩৩	৫৫৩	৩০	মাক্কী	মানসুখ

ক্রমিক	সূরা	রুকূ'	আয়াত	শব্দ	হরফ	পারা	মাক্কী/মাদানী	নাসেখ/মানসুখ
৮১.	তাকভীর	১	২৯	১০৪	৪৩৬	৩০	মাক্কী	উভয়
৮২.	ইনফিত্বার	১	১৯	৮০	৩৩৪	৩০	মাক্কী	নেই
৮৩.	মুত্বাফফিফীন	১	৩৬	১৭২	৭৫৮	৩০	মাক্কী	নেই
৮৪.	ইনশিক্বাক্ব	১	২৫	১০৮	৪৪৮	৩০	মাক্কী	নেই
৮৫.	বুরূজ	১	২২	১০৯	৪৭৫	৩০	মাক্কী	নেই
৮৬.	ত্বারেক্ব	১	১৭	৬১	২৫৪	৩০	মাক্কী	নেই
৮৭.	আ'লা	১	১৯	৭২	২৯৯	৩০	মাক্কী	নাসেখ
৮৮.	গাশিয়া	১	২৬	৯২	৩৮৪	৩০	মাক্কী	মানসুখ
৮৯.	ফাজর	১	৩০	১৩৭	৫৯৭	৩০	মাক্কী	নেই
৯০.	বালাদ	১	২০	৮২	৩৪৭	৩০	মাক্কী	নেই
৯১.	শামস	১	১৫	৫২	২৫৪	৩০	মাক্কী	নেই
৯২.	লাইল	১	২১	৭১	৩১৪	৩০	মাক্কী	নেই
৯৩.	দোহা	১	১১	৪০	১৬৬	৩০	মাক্কী	নেই
৯৪.	আলাম নাশরাহ	১	৮	২৭	১০২	৩০	মাক্কী	নেই
৯৫.	তীন	১	৮	৩৪	১৬৫	৩০	মাক্কী	মানসুখ
৯৬.	আলাক্ব	১	১৯	৭২	২৯০	৩০	মাক্কী	উভয়
৯৭.	ক্বাদর	১	৫	৩০	১১৫	৩০	মাক্কী	নেই
৯৮.	বায়্যিনা	১	৮	৯৫	৪১৩	৩০	মাদানী	নেই
৯৯.	যিলযাল	১	৮	৩৭	১৫৮	৩০	মাদানী	নেই
১০০.	'আদিয়াত	১	১১	৪০	১৭০	৩০	মাক্কী	নেই
১০১.	ক্বা-রিআহ	১	১১	৩৫	১৬০	৩০	মাক্কী	নেই
১০২.	তাকাছুর	১	৮	২৮	১২৩	৩০	মাক্কী	নেই
১০৩.	আছর	১	৩	১৪	৭৪	৩০	মাক্কী	নেই
১০৪.	হুমাযা	১	৯	২৩	১৩৫	৩০	মাক্কী	নেই
১০৫.	ফীল	১	৫	২৩	৯৪	৩০	মাক্কী	নেই
১০৬.	কুরাইশ	১	৪	১৭	৭৯	৩০	মাক্কী	নেই
১০৭.	মা'ঊন	১	৭	২৫	১১৫	৩০	মাক্কী	নেই
১০৮.	কাওসার	১	৩	১০	৩৭	৩০	মাক্কী	নেই
১০৯.	কাফিরূন	১	৬	২৬	৯৯	৩০	মাক্কী	মানসুখ
১১০.	নাছর	১	৩	১৯	৮১	৩০	মাদানী	নেই
১১১.	লাহাব	১	৫	২৪	৮১	৩০	মাক্কী	নেই
১১২.	ইখলাছ	১	৪	১৭	৪৯	৩০	মাক্কী	নেই
১১৩.	ফালাক্ব	১	৫	২৩	৭৩	৩০	মাক্কী	নেই
১১৪.	নাস	১	৬	২০	৮১	৩০	মাক্কী	নেই

❖ تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيْرُهُ بِاللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْعَالَمِ

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীরগ্রন্থসমূহ

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থে রয়েছে সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ, সকল সমস্যার সমাধান। এজন্যে যুগে যুগে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার এ সাধনা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমরা এ পর্যায়ে কয়েকখানি বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ ও কয়েকজন তাফসীরকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করব।

আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

১. **জামিউল বয়ান বা তাফসীরে তাবারী :** এ সুদীর্ঘ তাফসীরখানি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও তথ্যপূর্ণ। এ তাফসীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় সাহাবী ও তাবেয়ীনদের অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরখানিতে আভিধানিক, ব্যাকরণিক ও সাহিত্য সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (মৃত্যু : ৩১০ হিজরি) এ তাফসীর লিখেছেন।

২. **তফসীরে কাশশাফ :** আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী আল্লামা জারুল্লাহ মাহমূদ বিন ওমর যামাখশারীর লিখিত এ তাফসীরখানি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ বলে সকলের নিকট সমাদৃত। লেখক আকিদার দিক থেকে মুতাযিলী ছিলেন। ৮১৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. **মাফাতিহুল গাইব বা তাফসীরে কাবীর :** এ তাফসীরখানি তাফসীরের জগতে সব দিক থেকে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। লেখক হলেন ইমাম ফখরুদ্দীন ওমর রাযী (র.)। ইসলামি দর্শন সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য নজীরবিহীন। মনীষীরা তাঁকে ইসলামি দর্শনের সম্রাট বলে স্মরণ করেন। তাফসীরখানির ভাষা খুবই প্রাঞ্জল। প্রামাণ্য হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি এতে প্রচুর। ফিকহ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নিকনির্দেশনা রয়েছে এতে। তাফসীরখানিতে ইসলামি দর্শন সম্পর্কে যে আলোচনা পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত বিরল। লেখকের সর্বাধিক কৃতিত্ব হলো, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানকে কুরআন পাকের অধীন করে দিয়েছেন। ইমাম রাযী (র.) ৬০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৪. **তাফসীরে কুরতুবী :** তাফসীর জগতে এটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবীর এ মহামূল্যবান তাফসীরখানি পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। মিসরের একটি প্রকাশনা সংস্থা কয়েকটি খণ্ডে গ্রন্থটির অর্ধেক প্রকাশ করেছে। তাও দুষ্প্রাপ্য।

৫. **তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীল :** শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ আলেম হোসাইন বিন মাসঊদ (র.) কর্তৃক প্রণীত। হাদীস শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মিসরে আট খণ্ডে তাফসীরখানি প্রকাশিত হয়।

৬. **তাফসীরে ইবনে কাসীর :** দামেস্কের অধিবাসী হাফেয ইমামুদ্দীন ইসমাঈল বিন কাসীর-এর প্রণীত তাফসীরখানি বর্তমানে চার খণ্ডে প্রকাশিত। তাফসীরখানিতে প্রামাণ্য হাদীসের অংশই বেশি।

৭. **মাদারিকুত তানযীল বা তাফসীরে মাদারিক :** এ তাফসীরখানির প্রণেতা হাফেযুদ্দীন মাহমুদ, ইসলামি আকিদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ইসলামি আকিদা সম্পর্কীয় তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আকায়েদে নাসাফী' মাদরাসাসমূহের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

৮. **আনওয়ারুত তানযীল বা তাফসীরে বায়যাভী :** আব্দুল্লাহ বিন ওমর বায়যাভী (র.) কর্তৃক রচিত তফসীরখানির অংশবিশেষ মাদরাসাগুলোর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৯. **আল-বাহরুল মুহীত :** তাফসীরকারের নাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ। ৬৫৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মুহাদ্দিস ও আরবি সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি খ্যাত ছিলেন।

১০. **তাফসীরে আবিস সাউদ :** আবুস সঊদ ইমাদী কর্তৃক প্রণীত তাফসীরখানি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত সমাদৃত। মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. **তাফসীরে রুহুল মা'আনী :** আবুল ফযল শাহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী (র.) (মৃত্যু: ১২৭০ হিজরি)। এ তাফসীরগ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত হয়েছে।

১২. **তাফসীরে আনওয়ারুল ফজর :** কৃতঃ কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (মৃত্যু:৫৪৩ হিজরি)। তাফসীরগ্রন্থখানি ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত।

উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

উর্দু ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও তরজমা অনেক হয়েছে। আমাদের জানামতে, উর্দু ভাষায় এ পর্যন্ত ৯২টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এবং তাঁর বংশধরদের অবদান অবিস্মরণীয়।

১৩. ১১৫০হিজরিতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) ফারসি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেন।

১৪. তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ রফিউদ্দিন (র.) ১২৪২ হিজরিতে পবিত্র কুরআনের উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন।

১৬. হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (র.) এবং হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) যে অনুবাদ ও টীকা লিপিবদ্ধ করেন, তা সর্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

১৭. **বয়ানুল কুরআন :** হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) প্রণীত এ তাফসীর গ্রন্থখানি উপমহাদেশে সর্বত্র সর্বাধিক সমাদৃত এবং নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত।

১৮. **তাফসীরে মাজেদী :** মাওলানা আব্দুল মাজেদ (র.) কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থে এ যুগের বহু প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। এতে তাওরাত এবং ইঞ্জিলের অনেক উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত, অথচ অতি মূল্যবান এ গ্রন্থখানি করাচি থেকে প্রকাশিত।

১৯. **খোলাসাতুত তাফাসীর :** মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ সাহেব এ তাফসীরখানি লিখেছেন। তাফসীরকার যদিও উপমহাদেশে তত প্রসিদ্ধ নন, তবু বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর তাফসীর গুরুত্বপূর্ণ।

২০. **তাফসীরে মাযহারী :** উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) রচিত এ তাফসীরখানা উর্দুতে অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ আব্দুদ দায়েম আল-জালালী।

২১. **মা'আরিফুল কুরআন :** সাম্প্রতিক সময়ে উর্দু ভাষায় রচিত সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থ। যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (র.) কর্তৃক প্রণীত তাফসীরখানিতে ইসলামি ফিকহ সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২২. **তারজমানুল কুরআন :** মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক প্রণীত। ডা. সাইয়েদ আব্দুল লতীফ হায়দারবাদী এ তাফসীরখানার ইংরেজি অনুবাদ করেন।

২৩. **তাফসীরে কাশফুর রহমান :** আল্লামা আহমদ সাঈদ সাহেবের সুদীর্ঘ বিশ বছরের গভীর সাধনায় এ তাফসীরখানি আত্মপ্রকাশ করে।

২৪. **তাফসীরে হাক্কানী :** উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল হক দেহলবী (র.) কর্তৃক প্রণীত। এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শানে নুযূল।

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

২৫. ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদ হয় ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। অনুবাদটি মূলত ল্যাটিন অনুবাদের তরজমা।

২৬. অতঃপর মিঃ সেল ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অনুবাদ লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে পামার, পিকথিল প্রমুখ অনেকেই ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা প্রকাশ করেন।

২৭. জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী সাহেবও ইংরেজি ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ ভাষা এবং বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের ছাব্বিশখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

২৮. যদিও ফার্সী ভাষায় পবিত্র কুরআনের বহু তাফসীর ও তরজমা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে বিখ্যাত সাধক কবি হযরত শেখ সাদী (র.)-এর (৬৯১ হিজরি) তাফসীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এটিকে ফার্সী ভাষার প্রথম তাফসীরও মনে করা হয়।

২৯. হযরত শাহ আব্দুল আযীয কর্তৃক রচিত তাফসীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। আমাদের জানামতে, এ পর্যন্ত ফারসি ভাষায় পবিত্র কুরআনের ৫২টি তরজমা প্রকাশিত হয়েছে।

জার্মান :

৩০. যদিও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে কয়েকখানি অনুবাদ, তবে জার্মানীর সুবিখ্যাত সংস্কারক, প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথারই জার্মান ভাষায় সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের তরজমা করেন।

ফ্রেঞ্চ :

৩১. ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এম এন্ড্রি ফ্রেঞ্চ ভাষায় পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর আরো অনেক লেখক বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কুরআনের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

ল্যাটিন :

৩২. ১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রখ্যাত ধর্মযাজক পাদ্রী পিটার্স ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন, যা কয়েক শতাব্দী পর ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাজিল এবং সুইজারল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তা ডাচ, জার্মান ভাষায়ও প্রকাশিত হয়।

রুশ :

৩৩. রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকেই ১৩৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রুশ ভাষায় কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত রুশ ভাষায় ৩টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ইটালী :

৩৪. ইটালীয়ান ভাষায়ও কুরআন শরীফের অনুবাদ হয়েছে। সর্বপ্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভেনিস থেকে।

চীনা :

৩৫. ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর আরো অনুবাদ হয়েছে।

হিন্দী :

৩৬. হিন্দী ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের ১৮টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী ভাষায় সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের অনুবাদ হয় ৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রথম তাফসীরগ্রন্থ : পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। মুস্তাদরাক নামক গ্রন্থে এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ছিল।

❖ كُتُبُ التَّفَاسِيْرِ الْمُطَوَّلَةُ

সর্বাধিক বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ : 'আল ইস্তেগনা ফী উলূমিল কুরআন'। রচনা : আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ আলী মক্করী আল হানাফী (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরি)। এ তাফসীর গ্রন্থখানি ১২০ খণ্ডে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ গ্রন্থখানি দেখেছেন। এতদ্ব্যতীত এমনি আরো কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। যথা–

১. কিতাবুত তাহরীর ওয়াত তাযয়ীজ। এ গ্রন্থখানি ৫০ খণ্ডে লিপিবদ্ধ।
২. তাফসীরে ইবনুল যাওজী। ২৭ খণ্ডে সমাপ্ত।
৩. তাফসীরুল আওফাবী। ১২০ খণ্ডে সমাপ্ত। লিখেছেন রুমের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আওফাবী
৪. তাফসীরুল ইসফাহানী। ইমাম রাযী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরের বহু স্থানে এ গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেছেন।
৫. তাফসীর সাবত ইবনুল জওযী। ৩০ খণ্ডে।
৬. কিতাবুল জামে ফিত তাফসীর। ৩০ খণ্ডে।
৭. তাফসীরুল কাযবিনী। ৩০০ খণ্ডে।
৮. তাফসীরে হাদায়েকে যাতে বাহ্যাহ; ৫০০ খণ্ডে।

❖ آرَاءُ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ حَوْلَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অমুসলিম পণ্ডিতদের অভিমত : অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো, বর্তমান অশান্ত বিশ্বের মানুষ গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের পর পবিত্র কুরআনের মহান ও চিরন্তন সত্যের দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই পৃথিবীর বহু দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এ পর্যায়ে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত এখানে পেশ করছি–

১. অধ্যাপক পামার তার বিখ্যাত "Introduction to the Quran" নামক গ্রন্থে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেছেন, "That the best of the Arab writers has never succeeded in producing anything equal in merit to the Quran". অর্থাৎ, "আজ পর্যন্ত আরবের কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিকও কুরআনের সমকক্ষ সৌন্দর্যময় কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সমর্থ হননি"।
২. কার্লাইন পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেছেন, কুরআন শরীফে সাহিত্যের গুণ ছাড়া অন্য ধরনের গুণও আছে। কুরআনের ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গির কাছে সমস্ত শিল্পকলা এবং সাহিত্যের কলাকৌশল নিষ্প্রভ আজ পর্যন্ত দেড় হাজার বছর ধরে কেউ কুরআনের ভাষার মতো আরবি ভাষা ব্যবহার করেছে, তার অন্য কোনো দ্বিতীয় নজির নেই।
৩. প্রখ্যাত খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক গীবন তার "Decline and fall of the Roman Empire" নামক গ্রন্থে বলেন "Quran is a glorious testmoney of the unity of God". অর্থাৎ, "পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার অদ্বিতীয়তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন"।

পবিত্র কুরআন এবং প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এমন বহু অমুসলিম চিন্তাবিদ ও মনীষীদের নাম উল্লেখ করা যায় এবং তাদের উদ্ধৃতিও দেওয়া যায়–

৪. স্যার উইলিয়াম মুইর বলেন, পবিত্র কুরআন স্বভাব, প্রকৃতি ও সৃষ্টিজগতের দ্বারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে প্রমাণ করেছে এবং মানবজাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।
৫. অধ্যাপক এডওয়ার্ড জিব্রউন বলেন, আমি যতই কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করি, এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করি, ততই আমার মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্ধিত হয়।

৬. মি. এমানুয়েল ডি এনশ বলেন, সমগ্র ইউরোপ যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন সেখানে কুরআনের আলোকরশ্মি প্রবেশ করে এবং তা গ্রীসের মৃত জ্ঞান ও বুদ্ধি সত্তাকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে।

৭. ড. জনসন বলেন, কুরআনের বক্তব্য এত সময়োপযোগী ও সহজযোগ্য যে, মানবজাতি তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদেরকে দেখে দেখে সারা দুনিয়া কুরআনকে উপেক্ষা করছে।

৮. অধ্যাপক আর এ নিকলসন বলেন, কুরআনের প্রভাবে আরবি ভাষা সমগ্র মুসলিম জাহানের মহিমান্বিত ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআনই কন্যাসন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার ন্যায় জঘন্য রীতির চির অবসান ঘটিয়েছে।

৯. মি. এইচ. এস. লিভার. বলেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকেই দর্শন ও বিজ্ঞান উৎসারিত হচ্ছে এবং এতে উন্নতির এমন স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে যে, সমসাময়িক ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানকেও ম্লান করে দিয়েছেন।

১০. মি. এ. ডি. মাবিল বলেন, ইসলামের শক্তি কুরআনেই নিহিত। কুরআন হচ্ছে আইনের উৎস এবং মানবাধিকারের শাশ্বত সনদ।

১১. মি. স্টেনলি লেনপুল বলেন, একটি বিশ্বজনীন ধর্মে যেসব উপাদান থাকা প্রয়োজন, তা কুরআনে রয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যক্তিসত্তায় তা সমুজ্জ্বল।

১২. এইচ. জি. ওয়েলস বলেন, কুরআন মুসলমানদের এমন গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে যা বর্ণ, বংশ ও ভাষার সীমারেখা স্বীকার করে না।

১২. পাদ্রি ভলা বসান ডিডি বলেন, কুরআন আনীত ধর্ম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম।

১৩. গড ক্লিহেংস বলেন, কুরআন দরিদ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু এবং ধনীদের অবিচারের কঠোর সমালোচক।

১৪. ডিন স্টোলী বলেন, কুরআনের আইন বাইবেলের আইনের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু যে সত্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, শুধু প্রশংসা কোনো প্রকার উপকারী বা কার্যকরী হয় না যদি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ ও প্রকৃত ঈমান না থাকে।

ইহজীবন ও পরকালীন জিন্দেগীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে ঈমান হলো পূর্বশর্ত। ঈমানই মানুষের রক্ষাকবচ। মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদই হলো ঈমান। এটিই পবিত্র কুরআনের প্রথম আহ্বান এবং কুরআনের আলোকে এটিই মানবতার মূলভিত্তি।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষ মাত্রই পবিত্র কুরআনের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে এবং মানবতার এ ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তথা বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন (আমীন)। কেননা, এই ঈমানের মাধ্যমেই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়। আর এটিই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হলেই জীবনসংগ্রাম সার্থক, সুন্দর ও সফলকাম হয়।

১৫. জর্জ বার্নাড'শ বলেছেন "বিশ্ববাসী, যদি তোমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চাও এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর জীবনব্যবস্থা কামনা কর, তবে সংসারের নিয়ন্ত্রণভার মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে ছেড়ে দাও"।

১৬. সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও কবি 'গ্যাটে' তাঁর 'West oest licher Divan' নামক গ্রন্থে পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে মন্তব্য করত বলেন, "However often we true to it (Quran) at first disgusting us each time afresh, it soon attracts astounds and in the end enforces our rever-ence, its style, in accordance with its contents and aim is stern, grand, terrible-ever and truly sublime. Thus this book will go on exercising through all ages a most potent influence"

"কুরআন প্রথমত আমাদের মনে এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণা সঞ্চার করে। কিন্তু অতঃপর অতি শীঘ্রই আমাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে নেয়। আমাদের হৃদয়মনে আলোক সম্প্রসারণ করতে অবশেষে তাকে সম্মান করতে আমাদেরকে বাধ্য করে"। "মত এবং উদ্দেশ্যানুযায়ী এর রচনাবলি অত্যন্ত জোরালো, উচ্চ এবং প্রভাবশীল। আমরা তা যতই পড়ি তার প্রতি ততই আকৃষ্ট হই এবং আমাদের অন্তরে তার প্রভাব অনুভব করি"।

১৭. বিখ্যাত আরবি ও ইংরেজি অভিধান প্রণেতা ড. স্টঙ্গাছ বলেন, "আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, দুনিয়ার মধ্যে কুরআন শরীফের সমকক্ষ কোনো গ্রন্থই প্রণীত হয়নি"।

১৮. কালাইল বলেন, সর্বোত্তমভাবে কুরআনের নিঃস্বার্থতা আমাকে তার গুণমুগ্ধ করে"।

১৯. পবিত্র কুরআনের শক্তি সম্বন্ধে ইম্যানয়েল ডাস বলেন, একটি পুস্তক যার সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডার অপেক্ষা রোম অপেক্ষা পৃথিবীর বৃহত্তর ভূভাগ জয় করতে সমর্থ হয়েছিল; রোমের যত শতক বছর লেগেছিল তার জয় সম্পূর্ণ করতে, আরবের লেগেছিল তত দশক। এরই সাহায্যে সমস্ত সেমেটিক জাতির মধ্যে কেবল আরবরাই এসেছিল ইউরোপের রাজরূপে, যেখানে ফিনিশিয়রা এসেছিল বণিকরূপে আর ইহুদিরা এসেছিল পলাতক কিংবা বন্দিরূপে।

اَلْبَحْثُ الثَّانِيْ : عُلُوْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم
দ্বিতীয় আলোচনা : উলূমুল কুরআন

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- اَلتَّعْرِيْفُ بِعُلُوْمِ الْقُرْآنِ	١٢- تَعْرِيْفُ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ
٢- نَشْأَةُ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ	١٣- أَهَمِّيَّةُ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَفَوَائِدُ مَعْرِفَتِهَا
٣- تَطَوُّرُ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ	١٤- زَعْمُ الْبَعْضِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ
٤- اَلْمَقْصُوْدُ بِعُلُوْمِ الْقُرْآنِ	١٥- هَلِ الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ أَمْ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ
٥- أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ أَوَّلِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ	١٦- أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ مَعْنٰى إِنْزَالِ الْقُرْآنِ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
٦- أَقْسَامُ الْقُرْآنِ الَّتِيْ تَرْجِعُ إِلٰى نُزُوْلِهِ	١٧- اَلتَّعْرِيْفُ بِالنَّسْخِ
٧- اَلْآيَةُ الْمَكِّيَّةُ وَالْمَدَنِيَّةُ	١٨- أَقْسَامُ النَّسْخِ
٨- خُصُوْصِيَّاتُ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ	١٩- حُكْمُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِغَيْرِهِ مِنَ السُّنَّةِ
٩- خُصُوْصِيَّاتُ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ الْمَدَنِيَّةِ	٢٠- حِكْمَةُ اللهِ فِي النَّسْخِ
١٠- اَلْأَقْوَالُ فِيْ كَيْفِيَّةِ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ	٢١- هَلْ يَقَعُ النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ
١١- اَلْحِكْمَةُ فِيْ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ مُنَجَّمًا	٢٢- أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ تَعْدَادِ الْآيَاتِ الْمَنْسُوْخَةِ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একবারেই নাযিল হয়নি; বরং মহানবী ﷺ-এর নবুয়তি জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে অবতারিত এ কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তি কী ছিল? ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয় উলূমুল কুরআন শাস্ত্রে। নীচে উলূমুল কুরআন সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো–

❖ اَلتَّعْرِيْفُ بِعُلُوْمِ الْقُرْآنِ

উলূমুল কুরআনের পরিচয় : উলূমুল কুরআন কুরআন সংক্রান্ত সুবিশাল জ্ঞানশাস্ত্র। মুসলিম উম্মাহ যেমন ইসলামী শরীয়ার উপর নির্ভরশীল এবং শরীয়া কুরআনের উপর নির্ভরশীল, অনুরূপ কুরআন থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের জন্যে নির্ভরশীল হতে হয় উলূমুল কুরআন শাস্ত্রের উপর। তাই এ শাস্ত্র ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনার দাবি রাখে। عُلُوْمُ الْقُرْآنِ-এর সংজ্ঞা হচ্ছে–

هُو مَبَاحِثُ تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مِنْ نَاحِيَةِ نُزُوْلِهِ وَتَرْتِيْبِهِ وَجَمْعِهِ وَكِتَابَتِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَتَفْسِيْرِهِ وَإِعْجَازِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوْخِهِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ عَنْهُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

অর্থাৎ, এমন কিছু বিষয় যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা, সংকলন, লিখন, পঠন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার মু'জিয হওয়া, নাসিখ ও মানসুখ হওয়া এবং কুরআনের প্রতি আরোপিত সন্দেহ-সংশয়সমূহের নিরসন এবং অনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

❖ نَشْأَةُ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ

উলূমুল কুরআনের উৎপত্তি : হিজরি প্রথম শতকে তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সময়ই عُلُوْمُ الْقُرْآنِ-এর উৎপত্তি হয়। সে সময়ে যেসব বিষয়ের চর্চা হতো সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে– ١- أَسْبَابُ النُّزُوْلِ، ٢- اَلنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ، ٣- غَرِيْبُ الْقُرْآنِ এসব বিষয়ে যদিও তখন পর্যন্ত কোনো গ্রন্থ রচনা হয়নি, তবে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ চলত অবিরত। এ প্রসঙ্গে যেসব সাহাবী ও তাবেয়ীর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন– চার খলিফা, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবূ মূসা আশয়ারী, আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.), মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, কাতাদা, হাসান বসরী, যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) প্রমুখ।

❖ تَطَوُّرُ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ

উলূমুল কুরআনের ক্রমবিকাশ : উলূমুল কুরআনের ক্রমবিকাশকে হিজরি শতকভিত্তিক ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যেমন–

দ্বিতীয় শতাব্দী : এ সময়ে উলূমুল কুরআনের উপর গ্রন্থনার কাজ শুরু হয়। মূলত তখন এ কাজ তাফসীর রচনার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে। এ কাজে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.)।

তৃতীয় শতাব্দী : এ সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ হলো–

১. আলী ইবনে মাদিনী (র.)-এর أَسْبَابُ النُّزُوْل

২. আবূ ওবায়েদ কাসেম (র.)-এর اَلنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخ

চতুর্থ শতাব্দী : এ সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে–

১. আবূ বকর সিজিস্তানী (র.)-এর إِعْجَازُ الْقُرْآن

২. আলী ইবনে ইবরাহীম (র.)-এর اَلْبُرْهَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن

পঞ্চম শতাব্দী : এ সময়ের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।

ষষ্ঠ শতাব্দী : এ সময়ে ইবনুল জাওযী (র.) দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা–

১- فُنُوْنُ الْأَفْنَانِ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ ২- اَلْمُجْتَبٰى فِيْ عُلُوْمٍ تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ

সপ্তম শতাব্দী : এ সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি হচ্ছে–

১. আল্লামা সাখাভী (র.)-এর جَمَالُ الْقُرْآن

২. ইযযুদ্দীন (র.)-এর مَجَازُ الْقُرْآن

৩. আবূ শামাহ (র.)-এর اَلْمُرْشِدُ الْوَجِيْز

অষ্টম শতাব্দী : এ সময়ের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে–

১. ইবনুল কায়্যিম (র.)-এর أَقْسَامُ الْقُرْآن

২. বদরুদ্দীন যারকাশী (র.)-এর اَلْبُرْهَان

নবম শতাব্দী : এটি ছিল উলূমুল কুরআন-এর স্বর্ণযুগ। এ সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি হলো–

১. জালালুদ্দীন আল-বালকীনী (র.)-এর مَوَاقِعُ الْعُلُوْمِ

২. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর গ্রন্থাদি। যথা–

১- اَلتَّحْبِيْرُ فِيْ عُلُوْمِ التَّفْسِيْرِ، ২- اَلْإِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ، ৩- مُعْتَرَكُ الْأَقْرَانِ فِيْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ

পরবর্তী যুগ : পরবর্তী যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো–

১. আল্লামা মুস্তফা সাদিক রাফেয়ী (র.) রচিত– إِعْجَازُ الْقُرْآن

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) রচিত– اَلتَّصْوِيْرُ الْفَنِّيُّ فِي الْقُرْآن

৩. শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা আল-মুরাগী (র.) রচিত– تَرْجَمَةُ الْقُرْآن

৪. শায়খ মুস্তফা সবরী (র.) রচিত– مَسْأَلَةُ تَرْجَمَةِ الْقُرْآن

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দারায (র.) রচিত– اَلنَّبَأُ الْعَظِيْمُ

৬. শায়খ তাহির আল-জাযায়েরী (র.) রচিত– اَلتِّبْيَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ

৭. শায়খ মুহাম্মদ আলী সালাতাহ রচিত– مَنْهَجُ الْفُرْقَانِ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ

৮. আব্দুল আযীম যায়কানী (র.) রচিত– مَنَاهِلُ الْعِرْفَانِ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن

৯. ড. সুবহী সালিহ (র.) রচিত– اَلْمَبَاحِثُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ

১০. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী রচিত– اَلتِّبْيَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن

❖ اَلْمَقْصُوْدُ بِعُلُوْمِ الْقُرْآنِ

উলূমুল কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য–

১. আল্লামা সাবুনী اَلتِّبْيَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ গ্রন্থে উলূমুল কুরআনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

يُقْصَدُ بِعُلُوْمِ الْقُرْآنِ الْأَبْحَاثُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِهٰذَا الْكِتَابِ الْمَجِيْدِ الْخَالِدِ مِنْ حَيْثُ النُّزُوْلِ وَالْجَمْعِ وَالتَّرْتِيْبِ وَالتَّدْوِيْنِ، وَمَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَالْمَكِّيِّ مِنْهُ وَالْمَدَنِيِّ وَمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْحَاثِ الْكَثِيْرَةِ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ, উলূমুল কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কতকগুলো বিষয়, যেগুলো চিরন্তন, শাশ্বত এ কুরআন মাজীদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– কুরআন নাযিলের পদ্ধতি, সংকলন, ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ, সববে নুযূল সম্পর্কে জানা, মাক্কী ও মাদানী সূরা জানা, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে জানা, মুহকাম ও মুতাশাবিহ সম্পর্কে জানা ইত্যাদি। এছাড়াও এমন গবেষণামূলক বিষয় যেগুলো কুরআনে কারীমের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. উলূমুল কুরআনের উদ্দেশ্য এভাবেও বলা যেতে পারে– اَلتَّضَلُّعُ مِنْ يَنَابِيْعِ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى وَإِنَارَةِ الْقَلْبِ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِهٖ অর্থাৎ, মহান আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থের নানামুখী ফল্গুধারা থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়া এবং অন্তরকে কিতাবুল্লাহর জ্ঞানের আলো দ্বারা আলোকিত করা। কেননা, কুরআন হলো সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল উৎস। এমন কোনো বিষয় নেই, যার সমাধান আল কুরআনে নেই। আল কুরআনে যুগজিজ্ঞাসার সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন– وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا

৩. আল্লামা তাকী ওসমানী (দা. বা.)-এর বর্ণনায় সাবুনী এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আল্লামা তাকী ওসমানী বলেন, এ বিদ্যায় عِلْمُ التَّفْسِيْر-এর اُصُوْل ও مَبَادِي তথা মূলনীতি ও উৎসের প্রতি আলোকপাত করা হয়। নবী করীম ﷺ-এর প্রতি কুরআন কীভাবে অবতীর্ণ হলো, ওহীর উদ্দেশ্য কী, কুরআন কোন নিয়মে অবতীর্ণ হয়েছে, কখন সম্পন্ন হলো, মাদানী ও মাক্কী সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য কী, শানে নুযূল কী, তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলের গুরুত্ব কী, কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত রহিত আছে কিনা, বিভিন্ন কেরাতের উদ্দেশ্য কী, কুরআন মাজীদে কী কী বিষয় আছে, আল্লাহ তা'আলা কীভাবে কুরআন হেফাজত করেছেন, কত ধাপে এটি লিখিত ও ছাপানো হয়েছে, তাফসীরের মূলনীতি কী, কুরআন বোঝার সঠিক পদ্ধতি কী, কোন জাতীয় ভুলের ধারণে পথভ্রষ্ট হতে হয়? এ সকল প্রশ্নের জবাব عُلُوْمُ الْقُرْآنِ-এর মাঝে প্রদান করা হয়।

৪. কেউ কেউ বলেন–

فَهْمُ كَلَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى ضَوْءِ مَا جَاءَ عَنِ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنْ تَوْضِيْحٍ وَبَيَانٍ وَمَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ حَوْلَ تَفْسِيْرِهِمْ لِآيَاتِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ طَرِيْقَةِ الْمُفَسِّرِيْنَ وَأَسَالِيْبِهِمْ فِي التَّفْسِيْرِ مَعَ بَيَانِ مَشَاهِيْرِهِمْ وَمَعْرِفَةِ خَصَائِصِ كُلٍّ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ وَشُرُوْطِ التَّفْسِيْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ دَقَائِقِ هٰذَا الْعِلْمِ.

অর্থাৎ, এ পাঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল (স.) সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কুরআনের আয়াতে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, সে আলোকে আল্লাহর কালাম বোঝা, তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি অবগত হওয়া, প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ সম্পর্কে অবগত হওয়া, প্রত্যেক মুফাসসিরের বৈশিষ্ট্যাবলি, তাফসীরের শর্তাবলি এবং এ শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান অর্জন করা।

❖ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ أَوَّلِ وَآخِرِ مَا نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ

কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা : এ ব্যাপারে চারটি উপশিরোনাম রয়েছে। যথা–

এক. সর্বপ্রথম অবতারিত আয়াত : এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে–

প্রথম অভিমত : কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরাতুল আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত।

দলিল :

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হেরাগুহায় হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনবার আলিঙ্গন করার পর বললেন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ .... عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

২. ইমাম হাকেম (র.) মুসতাদরাক এবং ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েল গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

৩. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– إِنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

৪. ইবনে শিহাব যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِحِرَاءٍ اِذْ أَتٰى مَلَكٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيْبَاجٍ فِيْهِ مَكْتُوْبٌ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ إِلٰى "مَا لَمْ يَعْلَمْ"

৫. হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَكَانَ يَقُوْلُ هُوَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ

৬. ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

দ্বিতীয় অভিমত : সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত– بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দলিল

১. হযরত ইকরিমা (র.) বলেন– أَوَّلُ مَا نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

أَوَّلُ مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرَائِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِسْتَعِذْ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩. হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে– أَوَّلُ مَا نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দুই. সর্বপ্রথম অবতারিত সূরা : এ বিষয়েও দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

প্রথম অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ সূরা হলো– سُوْرَةُ الْمُدَّثِّر

দলিল

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবূ সালমা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি জাবের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন– أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

২. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ... فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَدَثَّرُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ

৩. ইবনে হাজারের মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো– سُوْرَةُ الْمُدَّثِّر

দ্বিতীয় অভিমত : অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত হলো, কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে ফাতেহা।

দলিল

১. আল্লামা যামাখশরী বলেন– اِنَّ أَوَّلَ سُوْرَةٍ نُزِّلَتْ هِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَاب

২. আমর ইবনে শুরাহবিল থেকে মায়াসারাহ-এর বর্ণিত হাদীসটিতে বোঝা যায়, সূরা ফাতেহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে।

তিন. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত : কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.

৩. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র.) বলেন– آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ "وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ"

৪. মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন– آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ.

৫. কতিপয় আলেম বলেন, কুরআনের সর্বশেষে যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো– اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ.

৬. ইবনে জারীর আত-তাবারী ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

৭. হযরত মুয়াবিয়া (র.)-সহ অনেকের মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.

৮. ইমামুল হারামাইন (র.)-এর মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে– قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا

৯. হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ

১০. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ

চার. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা : কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরার ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম মুসলিম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ" آخِرُ السُّوْرَةِ نَزَلَتْ

২. ইমাম তিরমিযী ও হাকেম হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَتْ آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوْهُ

৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা বারায়াত।

اَلْقَوْلُ الرَّاجِحُ : অগ্রগণ্য অভিমত

১. সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। কারণ, بِسْمِ الله কোনো স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়; বরং এটি সকল সূরার শুরুতেই আছে।

২. সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো– سُوْرَةُ الْمُدَّثِّر; কারণ, সূরা ফাতেহা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও একটি অভিমত আছে।

৩. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতে– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الخ; এ আয়াত নাযিলের পরে রাসূল ﷺ মাত্র নয় রাত জীবিত ছিলেন।

৪. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা– سُوْرَةُ النَّصْر

❖ أَقْسَامُ الْقُرْآنِ الَّتِيْ تَرْجِعُ إِلٰى نُزُوْلِهٖ

অবতরণের দিক থেকে কুরআনের প্রকার : আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর রচিত اَلْإِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ গ্রন্থে কুরআনের আয়াতসমূহকে অবতরণের প্রেক্ষাপট, স্থান ও কালের বিভিন্নতা হিসেবে ১৫টি ভাগে ভাগ করেছেন। এর বিবরণ নীচে বর্ণিত হলো–

১. اَلْمَكِّيُّ : যে সকল সূরা বা আয়াত হিজরতের পূর্বে মক্কায় অথবা রাসূল ﷺ মদিনায় পৌঁছার পূর্বে পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মাক্কী সূরা বা মাক্কী আয়াত। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি মাক্কী।

২. اَلْمَدَنِيّ : যে সকল সূরা বা আয়াত রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পর নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। কুরআনের ২৮টি সূরা মাদানী।

৩. اَلْحَضَرِيّ : ঐ সকল আয়াত বা সূরা যা রাসূল ﷺ-এর বাসস্থানে অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন মাজীদের অধিকাংশ আয়াত ও সূরাই حَضَرِيّ;

৪. اَلسَّفَرِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূল ﷺ-এর سَفَر বা ভ্রমণ অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে سَفَرِي বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ... وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

৫. اَلنَّهَارِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়, তাকে نَهَارِي বলা হয়। উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদের অধিকাংশ আয়াতই দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৬. اَللَّيْلِيّ : রাত্রিবেলায় যে সকল আয়াত বা সূলা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে اللَّيْلِي বলা হয়। যেমন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا

৭. اَلْفِرَاشِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূল ﷺ-এর শয্যা বা শয়ন অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে فِرَاشِي বলা হয়। যেমন– وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

৮. اَلنَّوْمِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা নিদ্রাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে نَوْمِي বলা হয়। যেমন- সূরা কাওসার।

৯. اَلصَّيْفِيّ : যে সকল সূরা বা আয়াত গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে اَلصَّيْفِي বলে। যেমন– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

১০. اَلشِّتَائِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা শীতকালে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো اَلشِّتَائِيّ বলে। যেমন– إِفْك-এর আয়াতসমূহ অর্থাৎ, إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ .... وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ

১১. اَلْأَرْضِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূল ﷺ-এর পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে أَرْضِي বলা হয়। কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াতই أَرْضِي;

১২. اَلسَّمَائِيّ : যে সকল আয়াত বা সূরা মহানবী ﷺ-এর ঊর্ধ্বলোক বা মিরাজে গমনের সময় আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে اَلسَّمَائِي বলা হয়। যেমন– সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ..... أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ.

১৩. مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ : যেসব আয়াত রাসূল ﷺ-এর মিরাজে গমনকালে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূরা الصَّافَّات-এর একটি আয়াত– وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ;

১৪. أَوَّلُ مَا نَزَلَ : যে আয়াত বা সূরা কুরআনুল কারীমে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে أَوَّلُ مَا نَزَلَ বলা হয়। যেমন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ... مَا لَمْ يَعْلَمْ

১৫. آخِرُ مَا نَزَلَ : যে আয়াত বা সূরা সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে آخِرُ مَا نَزَلَ বলা হয়। যেমন– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিন মতান্তরে নয় দিন জীবিত ছিলেন।

❖ اَلْآيَةُ الْمَكِّيَّةُ وَالْمَدَنِيَّةُ

মাক্কী ও মাদানী আয়াত : আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কুরআনে কারীমের সূরাসমূহের শিরোনামে কোনোটিতে মাক্কী এবং কোনোটিতে মাদানী লেখা রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

অধিকাংশ মুফাসসিরের পরিভাষায় মাক্কী আয়াত বলতে বোঝায় যা রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। কারো কারো মতে, যেগুলো মক্কা নগরীতের নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কী, আর যেগুলো মদীনানগরীতে নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের পরিভাষা অনুযায়ী এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা মক্কা নগরীতে নাযিল হয়নি। কিন্তু হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়ার কারণে এগুলোকে মাক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মীনা, আরাফাত কিংবা মিরাজের সফরে নাযিল হয়েছে, এমন কি হিজরত করার পথে মদীনা নগরীতে পৌঁছার পূর্বে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মাক্কী বলা হয়।

তেমনি এমন অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা নগরীতে নাযিল হয়নি। কিন্তু এগুলোকে মাদানী বলা হয়। হিজরতের পর রাসূল ﷺ অনেকগুলো সফরে এ সমস্ত স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মাদানীই বলা হয়। এমনকি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা নগরীতে কিংবা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী বলা হয়। যেমন– إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا এ আয়াতটি মক্কা নগরীতে নাযিল হয়েছে। কিন্তু হিজরতের পরে নাযিল হওয়ার কারণে এটাকে মাদানী বলা হয়। [আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৮; মানাহিলুল ইরফান : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৮]

সারকথা হলো, মাক্কী ও মাদানী নামে বিভক্তিকরণ যদিও স্থানভিত্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালভেদে এগুলো বিভক্ত করা হয়েছে। হিজরত পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তা মাক্কী, আর যা পরে নাযিল হয়েছে তা মাদানী।

যদিও রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি এমন কোনো রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই, যার মাঝে কোনো সূরা কিংবা আয়াতকে মাক্কী বা মাদানী বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে যেসব সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীনে কেরাম কুরআনে কারীমের শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণে তাদের জীবন ব্যয় করেছেন, তাঁরা এ কথাটি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, কোনটি মাক্কী ও কোনটি মাদানী। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) শপথ করে বলেন : "শপথ! সে সত্তার, যিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ তা'আলার এ কিতাবের প্রত্যেক আয়াতের ব্যাপারে আমার এ জ্ঞান আছে যে, সে আয়াতটি কোন প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে? সেটা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? [আল-ইতকান : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯]

হযরত আলী (রা.) বলেন, "আল্লাহর শপথ! প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে আমার এ জ্ঞান রয়েছে যে, সেটা রাতে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি দিনে? উন্মুক্ত প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি পাহাড়-পর্বতে? [আল-ইতকান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৭]

কুরআনে কারীমের অধিকাংশ সূরা ও আয়াতের ব্যাপারে তো সাহাবায়ে কেরামই বাতলে দিয়েছেন যে, অমুক আয়াত মাক্কী, অমুক আয়াত মাদানী। কোনো কোনো আয়াত কিংবা সূরার ক্ষেত্রে অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারাও মাক্কী বা মাদানী হওয়া জানা যায়। যেমন– যেসব আয়াতে বদরের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তো মাদানীই হবে। যেসব আয়াতে মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই মাক্কী হবে। সুতরাং কেয়াস যেহেতু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, তাই কোনো কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কারো নিকট মাক্কী আবার কারো নিকট মাদানী বলে চিহ্নিত হয়।

কোনো কোনো সূরার সম্পূর্ণটাই মাক্কী কিংবা সম্পূর্ণটাই মাদানী। যেমন– সূরা মুদ্দাসসিরের সম্পূর্ণ অংশ মাক্কী ও সূরা আলে ইমরানের সম্পূর্ণ অংশ মাদানী। আবার কোনো সূরা পুরোটাই মাক্কী; কিন্তু এর মাঝে কয়েকটি মাদানী আয়াত সন্নিবেশিত রয়েছে। যেমন; সূরা আ'রাফ মাক্কী। কিন্তু وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ..... أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াত মাদানী। পক্ষান্তরে কোনো কোনো সূরা পুরাটাই মাদানী। কিন্তু এর মাঝে কয়েকটি মাক্কী আয়াত সন্নিবেশিত রয়েছে। যেমন– সূরা হজ মাদানী। কিন্তু এর চারটি আয়াত অর্থাৎ, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنّٰى থেকে عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ পর্যন্ত মাক্কী।

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, কোনো সূরাকে মাক্কী বা মাদানী গণ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, মাক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে সে সূরাকে মাক্কী ও মাদানী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে সে সূরাকে মাদানী বলে গণ্য করা হয়। আবার এমনও হয়ে থাকে যে, যেসব সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট আয়াত হিজরতের পরে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মাক্কী সূরা বলে অভিহিত করা হয়। [মানাহিলুল ইরফান : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯২]

❖ خُصُوْصِيَّاتُ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ

মাক্কী সূরা ও আয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ : মাক্কী আয়াত চেনার ব্যাপারে আলেমগণ নিম্নবর্ণিত উক্তি করেছেন–

১. যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াতের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে এবং সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ নম্রতা ও কোমল নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলো মাক্কী আয়াত।
২. মাক্কী আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই।
৩. যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত।
৪. যেসব আয়াতে মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত।
৫. যেসব আয়াতে তাওহীদ ও কেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত।
৬. যেসব আয়াতে আদম (আ.) ও ইবলিসের কাহিনী বিবৃত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ মাক্কী আয়াত।
৭. যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশ কম এগুলো মাক্কী আয়াত।
৮. মাক্কী আয়াতসমূহে আকিদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে।
৯. মাক্কী আয়াতসমূহে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই।
১০. মাক্কী আয়াতসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরুপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর।
১১. মাক্কী আয়াতসমূহে শরিয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই।
১২. যেসব আয়াতে حَرْف رَدْع রয়েছে সেগুলো প্রায়ই মাক্কী সূরা।
১৩. মাক্কী আয়াতসমূহ ছোট ছোট।
১৪. মাক্কী আয়াতসমূহে প্রায়ই يَاأَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
১৫. যেসব সূরায় حُرُوْف تَهَجِّي বা حُرُوْف مُقَطَّعَات রয়েছে, সেগুলো মাক্কী আয়াত। কিন্তু সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান এর বিপরীত।
১৬. সেজদার আয়াতসমূহ মাক্কী।

❖ خُصُوْصِيَّاتُ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ الْمَدَنِيَّةِ

মাদানী সূরা ও আয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ : মাদানী আয়াতের পরিচিতির ব্যাপারে আলেমগণের উক্তি নীচে বর্ণিত হলো–

১. যেসব আয়াত চিন্তার গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা বিরাজমান সেগুলো মাদানী আয়াত।
২. যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচারকার্যের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশও রয়েছে, সেগুলো মাদানী আয়াত।
৩. যেসব আয়াত আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত।
৪. যেসব আয়াতে ইবাদত ও হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে সেগুলো প্রায়ই মাদানী আয়াত।
৫. মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ।
৬. যেসব আয়াতের বক্তব্য প্রায়ই আইনানুগ, সেগুলো মাদানী আয়াত।
৭. যেসব আয়াতে আহলে কিতাবের বিতর্কের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত।
৮. মাদানী আয়াতসমূহে প্রায়ই يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
৯. মাদানী আয়াতসমূহে জনতাকে يَاأَيُّهَا النَّاسُ বলে খুব কমই সম্বোধন করা হয়েছে। মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়।
১০. যেসব আয়াতে হদ তথা দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত।
১১. যেসব আয়াত জয়পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো মাদানী আয়াত।

১২. যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে তার অধিকাংশই মাদানী আয়াত ।
১৩. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের বিধান রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত ।
১৪. যেসব আয়াতে বিবাহ, তালাক, জাকাত, হজ, ফারায়েয ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলির বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো মাদানী আয়াত।
১৫. যেসব আয়াতে সন্ধি, যিম্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত।
মাক্কী আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আর মাদানী আয়াতগুলোতে শরয়ী হুকুম-আহকাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান আলোচিত হয়েছে।

❖ اَلْأَقْوَالُ فِي كَيْفِيَّةِ إِنْزَالِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : যুগে যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আসমানি কিতাব সৃষ্টির সূচনা থেকেই لَوْحٍ مَحْفُوْظ বা সংরক্ষিত দপ্তরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে– بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ; অতঃপর সেখান থেকে কালক্রমে নবী-রাসূলদের নিকট ওহী প্রেরণ করে বিধান জারি করা হয়। এতে নিশ্চয় অনেক রহস্য বিদ্যমান। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কুরআন لَوْحٍ مَحْفُوْظ থেকে কীভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমগণ থেকে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

প্রথম অভিমত : জমহুর আলেমের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, কদরের রাতে পূর্ণাঙ্গ কুরআন একত্রে لَوْحٍ مَحْفُوْظ থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেখান থেকে সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী প্রয়োজনমতো রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়। এ মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

দলিল

ক. কুরআনের আয়াত

১- إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (سُوْرَةُ الْقَدْر)
২- إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. (سُوْرَةُ الدُّخَان)
৩- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا. (سورة الإسراء)

খ. হাদীসে নববী–

১- أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَكَانَ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَكَانَ اللهُ يُنْزِلُهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ بَعْضَهُ فِيْ إِثْرِ بَعْضٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ)
২- فُصِّلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ فَوُضِعَ فِيْ بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَجَعَلَ جِبْرَائِيْلُ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
৩- أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُنْزِلَ نُجُوْمًا.

দ্বিতীয় অভিমত : প্রতিবছর যা অবতরণ হতো, তা ঐ বছরের রমজান মাসে কদরের রাতে প্রথম আসমানে নাযিল হতো। অতঃপর সেখান থেকে পূর্ণ বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে রাসূল ﷺ-এর উপর নাযিল করা হতো। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এর প্রবক্তা হলেন মুকাতিল।

দলিল : এ প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন–
يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يُنْزَلُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى إِنْزَالِهِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ اللَّوْحِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

তৃতীয় অভিমত : ইমাম শাবী প্রমুখ আলেমগণের অভিমত হলো, কুরআন অবতরণের সূচনা হয় কদর রজনীতে। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়। এ অভিমত পোষণকারীগণ প্রথম আসমানে কুরআন নাযিল হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

চতুর্থ অভিমত : আল্লামা আল-মাওয়ারদী আরেকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর তা হলো–
إِنَّهُ نُزِّلَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الْحَفَظَةَ نَجَمَتْهُ عَلَى جِبْرَائِيْلَ فِيْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَإِنَّ جِبْرَائِيْلَ نَجَمَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ عِشْرِيْنَ سَنَةً.

দলিল : এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবূ হাতেম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–
نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ إِلَى السَّفَرَةِ الْكَاتِبِيْنَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَنَجَمَتْهُ السَّفَرَةُ عَلَى جِبْرَائِيْلَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَنَجَمَهُ جِبْرَائِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِيْنَ سَنَةً

এ মতটিকে ইমাম সুয়ূতী দুর্বল মত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

❖ اَلْحِكْمَةُ فِيْ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ مُنَجَّمًا

কুরআন বিচ্ছিন্নভাবে নাযিল হওয়ার রহস্য : কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ার হেকমতসমূহ নীচে আলোচনা করা হলো–

১. **রাসূল ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুরুত্ব-মর্যাদা প্রকাশ করা :** একবারে প্রথম আসমানে কুরআন নাযিল করে সমগ্র আসমানবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাযিল করার জন্যে কাছাকাছি করা হয়েছে। যদি এ উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ন্যায় একত্রেই নাযিল হতে পারত; অতএব শেষ নবী ও তাঁর উম্মতকে মর্যাদাদানের জন্যে আল্লাহ তা'আলা অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন।

২. **রাসূলের অন্তঃকরণ মজবুত করার জন্যে :** বার বার ওহী নাযিল হলে রাসূল ﷺ অন্তরে সাহস পাবেন এবং যে কোনো ঘটনার মুকাবিলা করতে দৃঢ় হবেন। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বার বার কুরআন নাযিল করে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ.

৩. **কাফেরদের অভিযোগ খণ্ডন ও জবাব দেওয়ার জন্যে :** কুরআন সময়ের প্রেক্ষাপটে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করার আরেকটি হেকমত হলো, কাফেরদের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করা এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়া; যাতে তারা জব্দ হয়ে যায় এবং তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

৪. **مَنْسُوْخ ও نَاسِخ নিরূপণের জন্যে :** শরিয়তের বিধিবিধানে نَاسِخ ও مَنْسُوْخ অর্থাৎ, পূর্বের বিধান রহিত করে নতুন বিধান প্রবর্তনের জন্যেও বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে প্রয়োজনসাপেক্ষে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।

৫. **প্রতিবার অবতরণই নতুন মু'জিযা, নতুন চ্যালেঞ্জ :** প্রতিবারই কুরআন অবতরণের দ্বারা নতুন নতুন মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে এবং কাফেরদের প্রতি প্রতিবারই নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

৬. **আমলে অভ্যস্ত করানোর জন্যে অবকাশ :** একত্রে সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হলে আমলের অভ্যাসের জন্যে অবকাশ থাকত না। তাই ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল করে আমলের জন্যে অভ্যস্ত করা হয়েছে।

❖ تَعْرِيْفُ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ

আসবাবুন নুযূলের পরিচয় : আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একত্রে নাযিল হয়নি; বরং মহানবী ﷺ-এর নবুয়তের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে। যেসব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কুরআনের আয়াত বা সূরা নাযিল হয়েছে, তা اَسْبَابُ النُّزُوْل নামে খ্যাত।

ক. আভিধানিক অর্থ : أَسْبَاب শব্দটি سَبَب শব্দের বহুবচন। (س.ب.ب) মূলবর্ণ থেকে গঠিত। জিনসে مُضَاعَف ثُلَاثِي; অর্থ– কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। আর اَلنُّزُوْلُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। (ن.ز.ل) মূলবর্ণ থেকে গঠিত। জিনসে صَحِيْح; অর্থ– অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া। আর تَرْكِيْب إِضَافِي অনুযায়ী শব্দদ্বয়ের যুক্ত অর্থ হলো, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা প্রেক্ষাপটসমূহ। একে শানে নুযূলও বলা যায়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, কুরআনের আয়াতসমূহ যে সকল কারণ বা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মহানবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সে সকল কারণ বা প্রেক্ষাপটকে أَسْبَابُ النُّزُوْل বলে। যেমন–

১. আল্লামা আব্দুল আযীম যারকানী (র.) বলেন–

سَبَبُ النُّزُوْلِ هُوَ مَا نَزَلَتِ الْآيَةُ أَوِ الْآيَاتُ مُتَحَدِّثَةً عَنْهُ أَوْ مُبَيِّنَةً لِحُكْمِهٖ أَيَّامَ وُقُوْعِهٖ.

অর্থাৎ, এক বা একাধিক আয়াত যে নতুন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কিংবা অবস্থার আলোকে বিধান জারি করার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তা-ই সববে নুযূল।

২. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী সববে নুযূলকে দু'ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যথা–

ক. কোনো বিশেষ ঘটনা বা নতুন কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি এক বা একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়, তবে উক্ত ঘটনা বা অবস্থাকে সববে নুযূল বলে।

খ. শরিয়তের হুকুম জানার জন্যে বা দীনের বিষয় অনুসন্ধানের জন্যে কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এক বা একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়, তবে তাকে সববে নুযূল বলে।

❖ أَهَمِّيَّةُ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَفَوَائِدُ مَعْرِفَتِهَا

আসবাবুন নুযূলের গুরুত্ব ও তার উপকারিতা : মহাগ্রন্থ কুরআনের أَسْبَابُ النُّزُوْل জানার গুরুত্ব ও উপকারিতা ব্যাপক। যেমন–

১. **আয়াতের উদ্দেশ্য জানার ক্ষেত্রে :** কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতে কারীমা রয়েছে, যার শাব্দিক অর্থের উপর নির্ভর করে ঐ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় না। এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্যে ঐ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা أَسْبَابُ النُّزُوْل জানতে হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ নীচের মন্তব্য করেন–

ক. আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর রচিত اَلْإِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন– اَلْوُقُوْفُ عَلَى الْمَعْنٰى وَإِزَالَةُ الْإِشْكَال অর্থাৎ, سَبَب نُزُوْل জানার মাধ্যমে আয়াতের মর্মার্থ খুব সহজে জানা যায় এবং বাক্যের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সব সমস্যা দূরীভূত হয়।

খ. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন– مَعْرِفَةُ سَبَبِ النُّزُوْلِ يُعِيْنُ عَلٰى فَهْمِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ وَرَّثَ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ

গ. আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন– لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ تَفْسِيْرِ الْآيَةِ دُوْنَ الْوُقُوْفِ عَلٰى قِصَّتِهَا وَبَيَانِ نُزُوْلِهَا

অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতের শানে নুযূল এবং ঘটনা জানা ছাড়া কোনো আয়াতের তাফসীর জানা সম্ভব নয়।

২. **حُكْم-এর ক্ষেত্রে :** কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে أَسْبَابُ النُّزُوْل-এর গুরুত্ব অনেক। কারণ, অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যথাযথ حُكْم তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– مَعْرِفَةُ وَجْهِ الْحِكْمَةِ الْبَاعِثَةِ عَلٰى تَشْرِيْعِ الْحُكْم

৩. **خُصُوْص ও عُمُوْم-এর ক্ষেত্রে :** কোনো কোনো আয়াতের حُكْم-কে সাধারণত خُصُوْص কিংবা عُمُوْم-এর উপর প্রয়োগ করা যায় না। অথচ প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে আয়াতের حُكْم-কে خُصُوْص কিংবা عُمُوْم-এর উপর সহজে প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّفْظَ قَدْ يَكُوْنُ عَامًّا وَيَقُوْمُ الدَّلِيْلُ عَلٰى تَخْصِيْصِهِ فَإِذَا عُرِفَ السَّبَبُ قُصِرَ التَّخْصِيْصُ عَلٰى مَا عَدَا صُوْرَتِهِ

৪. **مَرْفُوْع-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে :** যদি কোনো সূরা বা সূরার অংশের سَبَب نُزُوْل সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণনা করা হয়, তবে তা حَدِيْث مَرْفُوْع-এর পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং مَرْفُوْع-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়া سَبَبُ نُزُوْل বা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল।

৫. **রহস্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে :** অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে আয়াতে কারীমার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সুপ্ত রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে سَبَبِ نُزُوْل তথা প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা অতি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন আল্লামা ইবনে দাকীক বলেন– بَيَانُ سَبَبِ النُّزُوْلِ طَرِيْقٌ قَوِيٌّ فِي الْفَهْمِ

৬. **অস্পষ্টতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে :** এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– مَعْرِفَةُ اسْمِ النَّازِلِ فِيْهِ الْآيَةُ وَتَعْيِيْنُ الْمُبْهَمِ فِيْهَا

অর্থাৎ, সববে নুযূল জানার মাধ্যমে যার প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা যায় এবং আয়াত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়।

৭. **আয়াত সংরক্ষণ, অনুধাবন ও স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে :** যেমন বলা হয়েছে–

تَيْسِيْرُ الْحِفْظِ وَتَسْهِيْلُ الْفَهْمِ وَتَثْبِيْتُ الْوَحْيِ فِيْ ذِهْنِ كُلِّ مَنْ يَسْمَعُ الْآيَةَ إِذَا عَرَفَ سَبَبَهَا.

অর্থাৎ, সববে নুযূল পরিচয় লাভের মাধ্যমে নাযিলকৃত আয়াত সংরক্ষণ, তা অনুধাবন করা সহজ হয় এবং স্মরণে ওহী স্থায়িত্ব লাভ করে।

❖ زَعْمُ الْبَعْضِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ

কতিপয়ের ধারণা ও তার জবাব : কোনো কোনো মুফাসসির মনে করেন, কুরআন হলো সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের সার্বিক সমস্যার একমাত্র সমাধানগ্রন্থ। সুতরাং এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বজনীন। এর অর্থকে سَبَب نُزُوْل-এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে خَاصّ করা ঠিক নয়। সুতরাং سَبَبُ النُّزُوْل জানার প্রয়োজন নেই। উপরিউক্ত ধারণার জবাব দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নিচের মন্তব্য করেন–

১. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– قَدْ أَخْطَؤُا فِيْ ذٰلِكَ بَلْ لَهُ فَوَائِد; অর্থাৎ, যারা মনে করেন কুরআনের শানে নুযূল জানার মধ্যে তেমন কোনো উপকারিতা বা গুরুত্ব নেই, তাঁরা এ ব্যাপারে ভুল করেছেন; বরং سَبَب نُزُوْل জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

২. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন– هٰذَا زَعْمٌ خَاطِئٌ وَقَوْلٌ مَرْدُوْدٌ অর্থাৎ, এ ধারণা ভ্রান্ত এবং এ উক্তিটি প্রত্যাখ্যাত।

৩. কেউ কেউ বলেন, কুরআন যদিও সর্বজনীন ও ব্যাপক বিষয়, তথাপি এর অধিকাংশ আয়াত ও সূরা তৎকালীন মানবসমাজ ও ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। তা না হলে বিনা কারণে ও বিনা প্রেক্ষাপটে কুরআন নাযিল হলে এর গুরুত্ব তেমন অনুধাবন হতো না; বরং তখন কুরআনের প্রতি অপবাদ দেওয়া হতো যে, এটা ঐতিহাসিক কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই বিনা কারণে নাযিল হয়েছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়ে থাকলেও এটি সর্বজনীন ও ব্যাপক। তবে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান থাকলে সহজেই এর অর্থ, অন্তর্নিহিত ভাব এবং সুপ্ত রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব।

আল কুরআনে একই ঘটনা বার বার উল্লেখের কারণ : সাধারাণত এমন প্রশ্ন পাঠকের মনকে অনেক সময় ব্যাকুল করে তোলে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে ৭২ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কেন হয়? যদি এ ঘটনাকে একই স্থানে উল্লেখ করে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা থাকত, হয়তো ভালো হতো।

এ পর্যায়ে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা, একই ঘটনা বার বার উল্লেখ করার মধ্যে বহু হেকমত রয়েছে।

১. পবিত্র কুরআন হঠাৎ করে একই সঙ্গে নাযিল হয়নি; বরং বারে বারে ক্রমশ নাযিল হয়েছে। আর পবিত্র কুরআন এমন এক সংগ্রামী জাতির পথপ্রদর্শনের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে যার প্রাথমিক দিনগুলো ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং অতীব সংকটময়। প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল কঠিন পরীক্ষা। জটিলতটর সমস্যা মোকাবিলায় জাতিকে যদি বারংবার সান্ত্বনা না দেওয়া হতো তবে সত্য-সাধনা তথা দীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হতো।
তাই পবিত্র কুরআন এমন সব অবস্থায় পূর্ববর্তীকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত বার বার পেশ করেছে এবং মুসলমানদেরকে এ সান্ত্বনা দিয়েছে যে, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার এবং ঈমানী জিন্দেগির এ সংগ্রামে তোমরা নতুন নও; বরং ইতঃপূর্বেও আম্বিয়ায়ে কেরাম এমন সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা ও তাদেঁর সাথিগণ এমনি কষ্ট করেছেন যার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। তবে শেষ হাসি তারাই হেসেছেন এবং সাফল্য তাঁদেরই পদচুম্বন করেছে। মূলত এ কারণেই পবিত্র কুরআনে একাধিক নবীর কথাই বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে এবং যখন যার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পবিত্র কুরআন মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন আকীদা ও বিশ্বাসের সংশোধন, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সৎ কাজে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন মাসয়ালার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে না। এজন্যে প্রিয়নবী ﷺ-এর হাদীসসমূহের উপর আমল করার আহ্বান জানায়। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর হাদীসসমূহ ইসলামি শরিয়তের অন্যতম দলিল। কেননা, কুরআনে ঘটনাবলি একাধিকবার উল্লেখ না করে মাসয়ালা-মাসায়েলের বিস্তারিত বিবরণই স্থান পেত, কিন্তু পবিত্র কুরআনে তা করা হয়নি; বরং বার বার বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে অন্তরে বদ্ধমূল করা হয়েছে এবং শরিয়তের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আল্লাহর রাসূলের পরিপূর্ণ অনুকরণের তাগিদ করেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল, সে বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য প্রকাশ করল"।
এমন কি পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য না থাকলে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .
"অতঃপর (হে রাসূল!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা সে পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে সেসব বিষয়ে আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী হিসেবে গ্রহণ না করে। আর আপনার সিদ্ধান্তকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে না পারে এবং আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ না করে"।

৩. পবিত্র কুরআনে ঘটনাবলিকে বার বার উল্লেখ করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, একই কথা বার বার শ্রবণ করলে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু পবিত্র কুরআনে বার বার উল্লিখিত ঘটনায় প্রত্যেকবারই যেন নবতর স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থা মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য করে যে, পবিত্র কুরআন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কালাম। মানুষের কথা এমন হতেই পারে না।

❖ هَلِ الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ أَمْ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

আয়াতের হুকুম শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট কিনা : এখানে প্রশ্ন হলো, কুরআনের আয়াতের হুকুম কি শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে, নাকি শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

এক. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতের হুকুম শব্দের عُمُوْم হিসেবেই ধরা হবে। سَبَب نُزُوْل-এর সাথে خَاصّ থাকবে না। এ সম্পর্কে আল্লামা যামাখশরী বলেন–
سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ السَّبَبُ خَاصًّا وَالْوَعِيْدُ عَامًّا لِيَتَنَاوَلَ كُلَّ مَنْ يَأْتِيْ ذٰلِكَ الْقَبِيْحَ لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ جَارِيًا مَجْرَى التَّعْوِيْضِ-

দলিল : জমহুর আলেম দলিল হিসেবে ইসলামি শরিয়তের কয়েকটি বিধান উল্লেখ করেন, যা বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। পরবর্তীতে তা সাধারণ বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। যেমন–

১. آيَةُ حَدِّ الْقَذْف বা মিথ্যা অপবাদের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত– وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি إِفْك বা মিথ্যারোপকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। পরবর্তী সময়ে তা অন্যের জন্যে বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়।

২. آيَةُ الظِّهَار বা স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার বিধান সংক্রান্ত আয়াত– وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَآءِهِمْ হযরত সালমা বিনতে সখর (রা.)-কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে এটা শরিয়তের বিধান হিসেবে সবার জন্য প্রযোজ্য হয়।

৩. آيَةُ اللِّعَانِ বা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে চারিত্রিক দোষারোপ করার বিধান সংক্রান্ত আয়াত- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُم হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.) এবং তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়। অতঃপর তার হুকুম ব্যাপকভাবে বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়।

৪. এছাড়াও কোনো কোনো আয়াতের শব্দ عَامّ হওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ঘটনায় এর দ্বারা দলিল পেশ করতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আয়াতখানি কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হলেও পরবর্তীতে তা ব্যাপক হয়ে যায়।

দুই. কতিপয়ের অভিমত : কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, যেসব আয়াত কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে সেসব আয়াতের হুকুম উক্ত سَبَبُ النُّزُوْل বা ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট থাকবে। শব্দের ব্যাপকতা বা حُكْم عَامّ হবে না।

দলিল : তাঁদের দলিল নীচে উল্লেখ করা হলো–

হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি এর অর্থ عُمُوْم বা ব্যাপক হিসেবে মুমিন-কাফের সবার জন্যে প্রযোজ্য মনে করলেন এবং বললেন, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধনসম্পদ বা নিয়ামত পেয়ে আনন্দিত হলে শাস্তিযোগ্য হয়, তবে কেউই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, উক্ত আয়াতটি আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এর বিধান তাদের জন্যে নির্ধারিত। এর দ্বারা সাধারণভাবে হুকুম গ্রহণ করা ঠিক নয়। একথার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আয়াতে কারীমায় শব্দের عُمُوْم-এর উল্লেখ থাকলেও বিধানটি سَبَبُ النُّزُوْل-এর সাথে নির্দিষ্ট।

বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের প্রত্যুত্তর : জমহুরের পক্ষ থেকে বিরোধীদের জবাবে বলা হয় যে, শব্দটি عَامّ হলেও হুকুম ব্যাপক হবে। তবে নির্দিষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে عَامّ-কে নিয়েও خَاصّ বা নির্দিষ্ট কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন–

১. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াতে ظُلْم শব্দটি সকল প্রকার অত্যাচার ও পাপাচারকে বুঝায়। কিন্তু এখানে নির্দিষ্টভাবে شِرْك-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাসূল ﷺ এ আয়াতের তাফসীরে ظُلْم-এর ব্যাখ্যা اَلشِّرْك করেছেন।

২. অনুরূপভাবে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْن আয়াতেও শব্দ عَامّ হলেও তা বিশেষ অর্থে خَاصّ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং তাঁদের দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।

জমহুর আলেমের অভিমতই অধিকতর বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। আল্লামা সুয়ূতী (র.) সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- وَالْاَصَحُّ عِنْدَنَا الْاَوَّلُ اَيِ الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظ অর্থাৎ, জমহুর আলেমের অভিমতই অধিকতর বিশুদ্ধ যে, শব্দের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য হবে।

তবে এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, মূলত ফিকহ ও ব্যাখ্যাকারগণের মাঝে উপরিউক্ত মতবিরোধ শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মাত্র; মূলত আমলের ক্ষেত্রে উক্ত বিরোধের কারণে উভয়ের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা দেয় না। ফলে যাঁরা কুরআনের আয়াতসমূহকে আয়াত অবতীর্ণের ঘটনা পর্যন্ত সীমিত রেখেছেন, তাঁরাও আমলের ক্ষেত্রে অপর দলের মতো আয়াতের বিধান বা বিষয়বস্তুকে একই ধরনের সকল ঘটনার জন্যে প্রয়োগ করতে থাকেন। তবুও কিছুটা পার্থক্য এই থাকে যে, অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে উক্ত বিধানের জন্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। অপরদিকে অপর দলের মতানুসারে উক্ত বিধানের উৎস হয় শরিয়তের অন্য কোনো দলিল। যেমন- হাদীস, ইজমা, কেয়াস ইত্যাদি।

❖ اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ مَعْنَى اِنْزَالِ الْقُرْآنِ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

কুরআন সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ সম্পর্কে আলেমগণের বক্তব্য : রাসূল ﷺ বলেছেন- إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ; উল্লিখিত হাদীসের অর্থ প্রসঙ্গে প্রায় চল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলো নিচে বর্ণিত হলো–

১. আবূ ওবায়দা, সালাবা, যুহরী (র.) প্রমুখ মনীষী বলেন– سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা সাতটি আরবি আঞ্চলিক ভাষা উদ্দেশ্য। এ সাতটি ভাষা হলো- سَعْدُ بْنُ بَكْر ও تَمِيْم - ازد - رَبِيْعَة - هَوَازِن - قُرَيْش - هُذَيْل গোত্রের প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ আলেম এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. এর দ্বারা সাত কেরাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, প্রত্যেক শব্দকে এক বা একাধিক পদ্ধতিতে পাঠ করা যায়।

৩. এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদের শব্দকে বহুসংখ্যক পদ্ধতিতে পাঠ করা।

৪. আল্লামা ইবনে কুতায়বা (র.) বলেন- اِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْاَوْجُهُ الَّتِيْ يَقَعُ بِهَا التَّغَايُرُ অর্থাৎ, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা ঐ দিকসমূহ উদ্দেশ্য, যার দ্বারা কুরআন মাজীদের পরিবর্তন সাধন হয়।

৫. আবুল ফযর আর-রবী বলেন, سَبْعَة اَحْرُف সাতটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি থেকে মুক্ত নয়।

৬. কোনো কোনো মনীষী বলেন, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা তেলাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে। যেমন- مَدْ - تَفْخِيْم - اِظْهَار - اِدْغَام -تَلْيِيْن - تَخْفِيْف - تَشْدِيْد - قَصْر - تَحْقِيْق ইত্যাদি।

৭. আল্লামা ইবনুল জাযরী (র.) বলেন, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা مُنْكَرَة - مُتَوَاتِرَة - مَشْهُوْرَة - صَعِيْفَة - قِرَاءَة ইত্যাদি উদ্দেশ্য। অতঃপর তা ভিন্ন ভিন্ন সাতটি পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

৮. সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না, ইবনে জারীর, ইবনে ওহাব (র.) প্রমুখের মতে, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দাবলির মাধ্যমে একই অর্থবোধক সাতটি পদ্ধতি উদ্দেশ্য। যেমন- اَقْبَل - تَعَالَى - هَلُمَّ - عِجْل - اَسْرِعْ ইত্যাদি।

৯. سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা প্রকৃত সাত সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং اَلسَّعَةُ ও اَلتَّسْهِيْلُ، التَّيْسِيْرُ উদ্দেশ্য। আর سَبْعَة শব্দটি একাধিকের উপর প্রয়োগ হয়।

১০. এর দ্বারা সাতটি মূল বিষয় বুঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে– اَمْر نَهْي حَلَال حَرَام مُحْكَم مُتَشَابِه أَمْثَال

১১. আল্লামা হারানী (র.) বলেন, سَبْعَة اَحْرُف-এর অর্থ হচ্ছে– مُتَشَابِه - مُحْكَمْ - حَرَام - حَلَال - اَمْر - زَجْر ও اَمْثَال.

১২. কেউ কেউ বলেন- سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা اِسْتِثْنَاء - مُفَسَّر - مُجْمَل - مَنْسُوْخ - نَاسِخ - مُؤَوَّل - نَص - عَامّ - خَاص - مُقَيَّد - مُطْلَق উদ্দেশ্য।

১৩. কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেন, এর দ্বারা حَذْف - تَقْدِيْم - تَأْخِيْر - اِسْتِعَارَة - تَكْرَار - كِتَابَة - حَقِيْقَة - مَجَاز مُجْمَل - مُفَسَّر - ظَاهِر - غَرِيْب ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

১৪. কোনো কোনো নাহুশাস্ত্রবিদ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– تَأْنِيْث - تَذْكِيْر - شَرْط - جَزَاء - تَعْرِيْف - اِعْرَاب - اَقْسَام - جَوَابُ الْاَقْسَام - اِفْرَاد - تَصْغِيْر - تَعْظِيْم - اَلْاَدَوَات - اِخْتِلَاف.

১৫. কেউ কেউ বলেন, أمثال ও حَلَال - حَرَام - اَمْر - نَهْي - زَجْر - خَبْر ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

১৬. কেউ কেউ বলেন, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা اِحْتِجَاج ও وَعْد - وَعِيْد - حَلَال - حَرَام - مَوَاعِظ - اَمْثَال উদ্দেশ্য।

১৭. কারো কারো মতে, اَمْر ও نَهْي - بَشَارَة - نَذَارَة - اَخْبَار - اَمْثَال ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

১৮. কারো কারো মতে, اَمْر - زَجْر - تَرْغِيْب - تَرْهِيْب - جَدَل - قَصَص - مِثْل উদ্দেশ্য।

১৯. কোনো কোনো আলেম বলেন, এর অর্থ হলো– اَمْر ও نَهْي - جَدَل - عِلْم - سِرّ - ظَهْر - بَطْن

২০. কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো– نَاسِخ - مَنْسُوْخ - وَعْد - وَعِيْد - رَجْم - تَأْدِيْب - اِنْذَار

২১. কোনো কোনো আলেম বলেন, سَبْعَة اَحْرُف হলো– حَلَال - حَرَام - اِفْتِتَاح - اِخْتِتَام - اِخْبَار - فَضَائِل - عُقُوْبَات

২২. কারো কারো মতে, এর দ্বারা اَنْبَاء - اَمْثَال - اَوَامِر - قَصَص - وَعْظ - عِتَاب ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

২৩. কারো কারো মতে, এর দ্বারা اِبَاحَات ও وَعَد - وَعِيْد - مَنْصُوْص - اَمْثَال - حَرَام - حَلَال উদ্দেশ্য।

২৪. কেউ কেউ বলেন, سَبْعَة اَحْرُف হলো- بَطْن - ظَهْر - اَمْثَال - عُمُوْم - خُصُوْص - نُدُب - فَرْض ইত্যাদি।

২৫. কেউ কেউ বলেন, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা اِعْتِبَار ও وَعِيْد - وَعْد - اِرْشَاد - اِبَاحَة - نَهْي - اَمْر উদ্দেশ্য।

২৬. কোনো কোনো আলেম তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাতটি গুণবাচক নাম বুঝিয়েছেন। সেগুলো হলো- اَلْغَفُوْرُ - اَلرَّحِيْمُ - اَلسَّمِيْعُ - اَلْبَصِيْرُ - اَلْعَلِيْمُ - اَلرَّحْمٰنُ - اَلْحَكِيْمُ.

২৭. কেউ কেউ বলেন, سَبْعَة اَحْرُف হচ্ছে- مُؤَخَّر - مُقَدَّم - اَمْثَال - مُتَشَابِه - مَوَاعِظ - حُدُوْد - فَرَائِض ইত্যাদি।

২৮. সাদান নহবী বলেন, এর অর্থ খুবই জটিল। কারণ, হরফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে طَرْف বা كَلِمَة;

উপরিউক্ত বিষয়ে চল্লিশটি আবার কারো মতে, পঁয়ত্রিশটি উক্তি রয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে আল্লামা সুয়ূতী, বদরুদ্দীন আইনী, ইমাম বুখারী, ইবনে হাজার আসকালানী (র.) প্রমুখের মতে, প্রথম উক্তিটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, سَبْعَة اَحْرُف দ্বারা সাতটি লোগাত বা আরবি আঞ্চলিক ভাষা উদ্দেশ্য।

❖ اَلتَّعْرِيْفُ بِالنَّسْخ

নসখের পরিচয় : نَسْخ-এর বিধান উসূলে তাফসীর শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এতদসম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে কুরআনের তাফসীর করা ও শরিয়তের হুকুম-আহকাম অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক মুফাসসিরের জন্যে نَسْخ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখা অপরিহার্য। নীচে نَسْخ-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো–

ক. আভিধানিক অর্থ : اَلنَّسْخ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ن - س - خ); অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. اَلتَّبْدِيْلُ তথা পরিবর্তন করা। যেমন- وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
২. اَلتَّحْوِيْلُ তথা স্থানান্তর করা। যেমন- تَنَاسُخُ الْمَوَارِيْث অর্থাৎ, تَحْوِيْلُ الْمِيْرَاثِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ
৩. اَلْإِزَالَةُ তথা দূরীভূত করা। যেমন- فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَان
৪. اَلْإِبْطَال তথা বাতিল করা। যেমন- نَسَخَ الْحَاكِمُ الْقَانُوْن
৫. اَلنَّقْلُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ অর্থাৎ, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া।
৬. اَلرَّفْع তথা তুলে নেওয়া।
৭. اَلْإِنْسَاء তথা ভুলিয়ে দেওয়া।
৮. بَيَانُ الْمُدَّةِ لِلْحُكْمِ الْمُطْلَق তথা সাধারণ হুকুমের সময়সীমা বর্ণনা করা। আল্লামা সাবুনী, জাওযী ও যারকানী (র.) এসব অর্থ বর্ণনা করেন।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : نَسْخ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ
অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলিল দ্বারা পূর্ববর্তী শরয়ী হুকুমকে রহিত করাকে نسخ বলা হয়।
২. আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থকার আল্লামা সাবুনী বলেন– هُوَ انْتِهَاءُ الْحُكْمِ وَتَبْدِيْلُهُ بِحُكْمٍ آخَرَ
৩. জমহুর মুফাসসিরের মতে- هُوَ تَبْدِيْلُ حُكْمٍ وَآيَةٍ بِآيَةٍ وَحُكْمٍ آخَرَ
৪. ড. মুহাম্মদ ইজায (র.) বলেন, اَلنَّسْخُ هُوَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْه
৫. আল্লামা সাঈদ আহমদ هُوَ بَيَانُ انْتِهَاءِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيْقٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْه গ্রন্থে বলেন- اَلْعَوْنُ الْكَبِيْر
৬. আল্লামা যারকানী (র.) বলেন- هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

❖ أَقْسَامُ النَّسْخ

নসখের প্রকারভেদ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে نَسْخ-এর প্রকারগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

এক. সময় ও কারণ হিসেবে : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর اَلْإِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن গ্রন্থে نَسْخ-এর সময় ও কারণ হিসেবে তিনটি প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. نَسْخُ الْمَأْمُوْرِ بِهِ قَبْلَ امْتِثَالِهِ অর্থাৎ, নির্দেশিত হুকুমটিকে কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই مَنْسُوْخ করে দেওয়া। আর এটাই হলো- اَلنَّسْخُ عَلَى الْحَقِيْقَة
২. আমাদের শরিয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তের বিধানকে রহিত করাও نَسْخ-এর একটি প্রকার। যেমন– نَسْخُ التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِالْكَعْبَة.
৩. এমন হুকুম যা কোনো কারণে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন উক্ত سَبَب তথা কারণ দূরীভূত হয়ে যায়, তখন হুকুমও مَنْسُوْخ তথা রহিত হয়ে যায়।

দুই. তেলাওয়াত ও হুকুম হিসেবে : এ দৃষ্টিকোণ থেকেও نَسْخ তিন প্রকার। যথা-

১. مَا نُسِخَ تِلَاوَتُهُ وَحُكْمُهُ مَعًا অর্থাৎ, যার তেলাওয়াত ও হুকুম একসঙ্গে রহিত হয়েছে।
২. مَانُسِخَ حُكْمُهُ دُوْنَ تِلَاوَتِهِ অর্থাৎ, যার হুকুম রহিত হয়েছে, কিন্তু তেলাওয়াত রহিত হয়নি। যেমন– اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
৩. مَا نُسِخَ تِلَاوَتُهُ دُوْنَ حُكْمِهِ অর্থাৎ, যার তেলাওয়াত রহিত হয়েছে; কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে।

তিন. নাসিখ ও মানসূখ হিসেবে : এ হিসেবে نَسْخ চার প্রকার। যথা–

১. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ তথা কুরআনকে কুরআন দ্বারা রহিত করা।
২. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ তথা কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা।
৩. نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ তথা সুন্নাহকে কুরআন দ্বারা রহিত করা।
৪. نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ তথা সুন্নাহকে সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা।

❖ حُكْمُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِغَيْرِهِ مِنَ السُّنَّة

সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত করার হুকুম : এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েজ নেই : অধিকাংশ আহলে হাদীস, ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ, ইবনে শুরাইহ (র.) প্রমুখ আলেমের মতে, কুরআনকে কুরআন ব্যতীত সুন্নাহ বা অন্যকিছু দ্বারা রহিত করা জায়েজ নেই।

দলিল : তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে নীচের দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন–

ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١- مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا
٢- مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ.
٣- وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ.

খ. মহানবী ﷺ-এর বাণী–

١- إِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّيْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى فَإِنْ وَافَقَ الْكِتَابَ فَاقْبَلُوْهُ وَإِلَّا فَرُدُّوْهُ.
٢- كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ.

২. সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েজ : জমহুর ফকীহ, হানাফী আলেমগণ, ইলমে কালাম বিশেষজ্ঞ আলেমগণ, ইমাম মালেক (র.) প্রমুখের মতে, সুন্নাহ দ্বারা কুরআনকে রহিত করা জায়েজ।

দলিল : তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে দলিল উপস্থাপন করে বলেন, রাসূল ﷺ-এর বাণীও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত বাণী, যাকে وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوّ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى;

৩. সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া শর্তসাপেক্ষ : এ বিষয়ে ইবনে হাবীব নিশাপুরী (র.) বলেন, যদি সুন্নাহ আল্লাহর নির্দেশে হয়, অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে হুকুম এসে থাকে, তবে قرآن-কে রহিত করা জায়েজ; অন্যথা জায়েজ নয়।

বস্তুত نَاسِخ ও مَنْسُوْخ-এর হুকুম প্রবর্তন করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্যে একটি বিশেষ নিয়ামতস্বরূপ। আর রাসূল ﷺ কর্তৃক কোনো হুকুম প্রবর্তন করা অর্থাৎ, সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিতকরণ– এটাও আল্লাহরই বিধান। মূলত বান্দাদের জন্যে শরিয়তের বিধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে نَاسِخ ও مَنْسُوْخ-এর হুকুম প্রবর্তন করা হয়েছে। ❖

❖ حِكْمَةُ اللهِ فِي النَّسْخِ

নসখের মধ্যে আল্লাহর হেকমত : এ হেকমতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করার ক্ষেত্রে : যুগের আবর্তনে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী শরিয়ত রহিত করত নতুন শরিয়ত প্রবর্তন করেন। যেমন- বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের হুকুম نَسْخ করে কা'বা শরীফকে কেবলা ঘোষণা করা।

খ. ইসলামের কিছু বিধান রহিত করার ক্ষেত্রে : ইসলামের মধ্যে এক বিধানকে অন্য বিধানের মাধ্যমে রহিত করার হেকমত পাঁচ ধরনের হতে পারে।

১. সহজীকরণের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বিধান জারি করা : ইসলামের প্রারম্ভে মুসলমানগণ কঠিনতর আমল করতে অভ্যস্ত ছিল না। যেমন- রমজানের রোজা। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন এটিকে আবশ্যকীয় বিধান করায় হয় তখন অনেকের ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হয়। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ করে বিধান প্রবর্তন করেন- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অতঃপর রোজা রাখতে যখন তারা অভ্যস্ত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

২. বিধানকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও উন্নতকরণ : অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কঠিন বিধানকে রহিত করে সহজ ও উন্নত বিধান প্রবর্তন করেন।

৩. বিধান মধ্যপন্থায় প্রবর্তনকরণ : অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে কঠিন ও সহজতর বিধানকে মধ্যপন্থায় প্রবর্তন করেন। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে বিজয়ী করেন এবং মুনাফিককে ধ্বংস করেন।

৪. **তেলাওয়াত বাকি রেখে হুকুম রহিত করার হেকমত :** কুরআন মাজীদের এমন কিছু আয়াত আছে, যার তেলাওয়াত বহাল রেখে আল্লাহ তা'আলা হুকুম রহিত করেছেন। এর হেকমত হচ্ছে, এর মাধ্যমে যেন একজন মুসলিম আল্লাহ, নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন, এটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে পুণ্য লাভ করতে পারেন, এর অলঙ্কারশাস্ত্রের স্বাদ উপভোগ করতে পারেন এবং নবী করীম ﷺ-এর মু'জিযা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

৫. **হুকুম বহাল রেখে তেলাওয়াত রহিত করার হেকমত :** অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের কিছু আয়াতের হুকুম বহাল রেখে তেলাওয়াত রহিত করা হয়েছে। এর হেকমত হচ্ছে, কোনো একটি বিষয়ের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যখন মানব মনে উক্ত খারাপ পরিণতির বিষয়টি গ্রথিত হয়েছে তখন তার হুকুম বাকি রেখে তেলাওয়াত রহিত করা হয়েছে।

❖ هَلْ يَقَعُ النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ

সংবাদ ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে নসখ সংঘটিত হয় কিনা : এ বিষয়ে নীচে উল্লিখিত বক্তব্য পাওয়া যায়–

১. অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, نَسْخ-এর বিধান শুধুমাত্র আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; খবর বা ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, আল্লাহর উপর মিথ্যার ধারণা অসম্ভব।

২. আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নসখের ক্ষেত্রে হালালকে হারাম করেন, হারামকে হালাল করেন, বৈধ জিনিসকে নিষিদ্ধ করেন, আর নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করেন। সুতরাং নসখ কখনো আদেশ-নিষেধ, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ, বৈধ-অবৈধ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সাব্যস্ত হবে না। অতএব ঘটনাবলির ক্ষেত্রে যেমনি নাসিখ পাওয়া যাবে না, তেমনি মানসুখও পাওয়া যাবে না।

৩. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, নসখের বিষয় সবই রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পর শরিয়ত সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর আর কোনো নসখ নেই, এ ব্যাপারে সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেন। এ কারণেই ওহী বন্ধ হওয়ার পর ইজমা কখনো নসখ হয় না এবং এর দ্বারা অন্য কোনো বিধানও নসখ বা রহিত করা যায় না। কেননা, ইজমা সংঘটিত হয়েছে ওহী বন্ধ হওয়ার পর।

৪. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেন–
إِنَّمَا لَا يَكُوْنُ فِي الْأَخْبَارِ وَالْقَصَصِ، إِنَّمَا يَكُوْنُ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِيْ فِيْهَا حَلَالٌ وَحَرَامٌ.
অর্থাৎ, রহিতকরণ বিষয় সংবাদ ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে না; বরং এটি হালাল-হারাম সংবলিত শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হবে।

৫. কেউ কেউ বলেন, খবরটি যদি কোনো শরয়ী হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তা নসখ হওয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا মানসূখ হয়ে نَاسِخ নাযিল হয়েছে।

❖ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ تَعْدَادِ الْآيَاتِ الْمَنْسُوْخَةِ

মানসূখ আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে আলেমগণের মতামত : নসখের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্যের কারণে মানসূখ আয়াতসমূহের ব্যাপারেও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-

১. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর মতে কুরআন মাজীদের মাত্র পাঁচটি আয়াত রহিত হয়েছে। তাঁর এ অভিমতটি একটি বিশেষ কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; নতুবা তাঁর মতে কুরআন মাজীদে মূলত কোনো নসখই সংঘটিত হয়নি। তাঁর এ চিন্তাধারা সম্পর্কে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র.) বলেন, "আমাদের দৃষ্টিতে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)-এর মূল উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন মাজীদে মূলত কোনো আয়াত রহিত হয়নি। কিন্তু তিনি একথাটি কল্যাণের কারণে সুস্পষ্ট করে বলতেন না। কারণ, এভাবে স্পষ্ট করে বললে তার কথাটি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য হতো এবং সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করাই ছেড়ে দিতেন। আর তিনি এক্ষেত্রে যে সংশোধনী আশা করতেন, তা বাস্তবায়ন হতো না। এ লক্ষ্যে তিনি এ দূরদর্শী পন্থা অবলম্বন করেন যে, জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) যে ২০ টি আয়াত রহিত মেনে নিয়েছেন, তন্মধ্যে যেগুলো কঠিন ছিল, তা সমাধান করে তা রহিত নয় বলে প্রমাণ করেছেন। আর একেবারে সহজ আয়াতসমূহে নসখ মেনে নিয়েছেন। ইমাম আবূ মুসলিম ইস্পাহানী, ইমাম রাযী, নবাব সিদ্দীক হাসান খান ও আল্লামা কাশ্মীরী (র.) প্রমুখ ব্যবধান ব্যতীত এ অভিমত পেশ করে থাকেন।"

২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর কিতাবে পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী মানসূখ আয়াতের সংখ্যা উনিশটি উল্লেখ করেন।

৩. শায়খ আবূ বকর আরাবীর মতে, মানসূখ আয়াতের সংখ্যা বিশটি।

৪. আব্দুল আযীম যারকানী (র.) প্রসিদ্ধ মানসূখ আয়াতের সংখ্যা ২২টি উল্লেখ করেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর রচিত اَلْإِتْقَان গ্রন্থে শায়খ আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.)-এর মতানুযায়ী মানসূখ আয়াতের সংখ্যা ২০টির কাছাকাছি বর্ণনা করেছেন। নিম্নে সেগুলোর বিস্তারিত ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হলো–

❖ **অসিয়তের বিধান প্রসঙ্গ :** কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.)-এর বর্ণনা এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর বর্ণনা মতে, সূরা বাকারায় মানসূখ আয়াতের সংখ্যা মোট ৬টি। তন্মধ্যে প্রথম আয়াতটি হলো–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ الخ. (البقرة : ١٨)

ইসলামপূর্ব যুগে লোক দেখানোর লক্ষ্যে দূরবর্তী আত্মীয়দের ব্যাপারে অসিয়ত করা হতো। ফলে নিকটাত্মীয়রা প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতো। তাই উক্ত আয়াতে ওয়ারিশদের যেমন– পিতামাতা, ভাই-বোন প্রমুখের জন্যে অসিয়ত করা মৃত ব্যক্তির উপর আবশ্যক করা হয়েছে। অতঃপর এ অসিয়তের হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু নাসেখের ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে-

১. কোনো কোনো আলেম বলেন, নিম্নের মিরাশ-সংক্রান্ত আয়াতটি হলো নাসেখ।

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ الخ. (النساء : ١١-١٢)

২. কারো কারো মতে, نَاسِخ হলো নিম্নের হাদীসটি–

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الخ (رَوَاهُ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيِّ)

অর্থাৎ, কোনো ওয়ারিশের জন্যে অসিয়ত করা বৈধ নয়।

৩. কারো কারো মতে, ইজমায়ে উম্মত হলো نَاسِخ তথা রহিতকারী।

৪. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর মতে, নাসেখ হলো মিরাশের আয়াত يُوْصِيْكُمُ اللهُ আর হাদীস لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ হলো এ নাসেখকে সুস্পষ্ট সমর্থনকারী।

উল্লেখ্য, ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে আয়াতকে মানসূখ গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ, ইজমা কেয়াসের মতো কোনো শরয়ী হুকুমের জন্যে নাসেখ হতে পারে না। উসূলে ফিকহের বিখ্যাত কিতাব 'হুসামী' এর মধ্যে বলা হয়েছে–

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا وَكَذٰلِكَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ.

অর্থাৎ, কেয়াস নাসেখ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এ ব্যাপারে জমহুর আলেমের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। তদ্রূপ ইজমাও অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে নাসেখ হতে পারে না।

বি. দ্র. আল্লামা সুয়ূতী (র.) ও হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ছাড়াও যাঁদের মতে আয়াতটি মানসূখ, তাঁরা হলেন- ১. আল্লামা নাহ্হাস, ২. আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও ৩. আল্লামা যারকানী (র.)। আর যাঁদের মতে আয়াতটি مَنْسُوْخ তথা রহিত নয় তাঁরা হলেন- ১. আল্লামা ইবনুল জাওযী ও ২. ড. মোস্তফা যায়েদ (র.)।

آيَة وَصِيَّة ও آيَة مِيْرَاث-এর মাঝে সমন্বয়সাধন : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-সহ জমহুর আলেমের মতে, অসিয়তের আয়াত মিরাশের আয়াতের দ্বারা রহিত হয়েছে। কিন্তু হযরত কাতাদা, হযরত তাউস, হযরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখ আয়াতটিকে রহিত না মেনে উভয়ের মধ্যে تَطْبِيْق তথা সমন্বয়সাধন করেন।

ক. ইমাম শা'বী, ইমাম নাখায়ী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, আয়াতে অসিয়তের فَرْضِيَّة রহিত; তবে মুস্তাহাব এখানো বিদ্যমান রয়েছে।

খ. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র.) বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার অনুমান হয় যে, আমার বিধর্মী মা বর্তমানে আমার সঙ্গে থাকেন, আমি অসুস্থ। এমতাবস্থায় আমি মনে করি, যদি আমি ইন্তেকাল করি, তাহলে কেউ আমার মায়ের খোঁজ-খবর নেবে না; বর্তমানে আমার কারণেই তাঁকে সম্মান করা হচ্ছে। আমার ইন্তেকালের পরেই তিনি (সম্পদ থেকে) বঞ্চিত হয়ে যাবেন। তাই আমি উপলব্ধি করলাম যে, পরিস্থিতি যদি এমন দেখা দেয়, তাহলে অসিয়ত করা অতি আবশ্যক। সুতরাং كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ-এর উপর আমল করার একটি পথ বেরিয়ে আসে। এজন্যে এ আয়াতকে রহিত বলার প্রয়োজনই নেই। উল্লেখ্য, আল্লামা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র.) শিখ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

গ. আল্লামা শাওকানী (র.) উভয় আয়াতের মাঝে সমন্বয়সাধন করতে গিয়ে বলেন, আয়াতে অসিয়ত যদিও ব্যাপক; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে নির্দিষ্ট। আর আয়াতে বর্ণিত وَالِدَيْن শব্দ দ্বারা এমন মা-বাবা উদ্দেশ্য, যারা কুফর ও দাসত্বের কারণে মিরাশ থেকে বঞ্চিত। আর اَقْرَبِيْن দ্বারা ওয়ারিশ ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়স্বজন উদ্দেশ্য। সুতরাং অসিয়তের আয়াত এ ধরনের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বেলায় এখনও প্রযোজ্য।

ঘ. আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেন, যখন মৃত্যুমুখী মৃত্যুর পর তার ছেলে-সন্তানরা পরিত্যক্ত সম্পদ শরিয়তের বিধান মতে বণ্টন না করার আশঙ্কাবোধ করবেন, তখন তার উপর জরুরি হলো, সমস্ত ওয়ারিশদের জন্যে শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষীর উপস্থিতি বা স্বাক্ষর নিয়ে অসিয়তনামা লেখা বা অসিয়ত করা। তাহলে ভবিষ্যতে কেউ কারো হক নষ্ট করতে চাইলেও তা পারবে না এবং ঝগড়া-বিবাদের পথও বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

হাদীস দ্বারা কুরআনের নসখ : এখানে প্রশ্ন হতে পারে, لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ হাদীসটি মূলত خَبَر وَاحِد; আর খবরে ওয়াহেদ কিতাবুল্লাহর জন্যে রহিতকারী হতে পারে না। তাহলে কীভাবে আয়াতে অসিয়তের জন্যে হাদীসটিকে রহিতকারী সাব্যস্ত করা হলো? এ প্রশ্নের দুটি উত্তর দেওয়া হয়েছে–

১. সর্বস্তরের উম্মত এ হাদীসটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তা মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌঁছেছে। আর মুতাওয়াতির হাদীস কিতাবুল্লাহর জন্যে রহিতকারী হতে পারে। এ ব্যাপারে কারো মতানৈক্য নেই।

২. হাদীসটি مُتَوَاتِر; আর মুতাওয়াতিরের দুটি স্তর আছে। প্রথমত, ঐ হাদীসকে مُتَوَاتِر বলা হয়, যার রাবীগণ মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। আর দ্বিতীয়ত, ঐ হাদীসকেও مُتَوَاتِر বলা হয়, যার উপর বিনা মতানৈক্যে আমলকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের রাবীর সংখ্যার ন্যায় হয়। لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ হাদীসটি মূলত মুতাওয়াতিরের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (র.) হাদীসটির ছয়জন সাহাবী রাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

وَ لَا يَخْلُوْ إِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهَا عَنْ مَقَالٍ لٰكِنَّ مَجْمُوْعَهَا يَقْتَضِىْ أَنَّ لِلْحَدِيْثِ أَصْلًا بَلْ جَنَحَ الشَّافِعِيُّ فِى الْأُمِّ إِلٰى أَنَّ هٰذَا الْمَتْنَ مُتَوَاتِرٌ.

অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বাণী উল্লেখ করেন– فَكَانَ نَقْلُ كَافَّةٍ عَنْ كَافَّةٍ فَهُوَ أَقْوٰى مِنْ نَقْلِ خَبَرِ وَاحِدٍ; মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) বর্ণনা করেন, আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, যদিও হাদীসটি আমাদের নিকট সূত্রে পৌঁছেছে, কিন্তু বিদায় হজের বিশাল সমাবেশে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তা ঘোষণা করা এবং এর উপর ইজমায়ে সাহাবা ও ইজমায়ে উম্মত এ কথা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, হাদীসটি তাঁদের কাছে অকাট্য সূত্রে প্রমাণিত; নতুবা সন্দেহ থাকা সত্ত্বে হাদীসের কারণে কুরআনের আয়াতের হুকুম ছেড়ে এর উপর ইজমা হতো না।

❖ অক্ষম ব্যক্তির রোজার পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান : সূরা বাকারার রহিত আয়াতসমূহের দ্বিতীয়টি হলো وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতটি। এটি যেহেতু ব্যাপক, তাই এর অর্থ দাঁড়ায় রোগী কিংবা মুসাফির নয় এমন সাধারণ সুস্থ-সবল মানুষ রোজা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও রোজা না রাখতে চাইলে তাদের রোজার পরিবর্তে ফিদইয়া আদায় করতে হবে। জ্ঞাতব্য যে, রোগী ও মুসাফিরের রোজার বিধান–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ আয়াতে পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি রোজার ফিদইয়া হলো আশি তোলা সের হিসেবে এক সের সাড়ে বারো ছটাক, আর কেজির হিসেবে এক কেজি ছয়শ' ছত্রিশ গ্রাম গম বা তার সমতুল্য একজন মিসকিনকে দান করা।

আয়াতটি রহিত নাকি অরহিত এ ব্যাপারে দু'ধরনের অভিমত রয়েছে। জমহুর আলেমের মতে এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। রহিতকারী হলো নিম্নের আয়াত– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الخ (البقرة : ١٨٥)

হযরত শাহ ওয়লীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও দেওবন্দের অনেক আলেম আয়াতটিকে مُحْكَم ও مَعْمُوْل بِهَا তথা আমল করার যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তবে হুকুম নির্ণয় ও নির্ণয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

জমহুর ব্যতীত অন্যান্য আলেম বলেন, এ আয়াতে অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীদের রোজা রাখার পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদানের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরা বলেন, আয়াতে يُطِيْقُوْنَهٗ-এর পূর্বে একটি না অর্থজ্ঞাপক لَا উহ্য আছে। আর يُطِيْقُوْنَهٗ-এর ه যমীরের مَرْجِع হলো صِيَام; এ বিশ্লেষণ মতে আয়াতটি এ রকম হবে– وَعَلَى الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَ الصِّيَامَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

অর্থাৎ, যারা (বার্ধক্যজনিত কারণে) রোজা রাখার সামর্থ্য রাখে না, তারা যেন মিসকিনকে ফিদইয়া হিসেবে খাদ্য প্রদান করে। তাঁরা আয়াতে لَا উহ্য থাকার সমর্থনে সূরা নিসার সর্বশেষ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন। সূরা নিসার আয়াতে যেভাবে لَا উহ্য রয়েছে (সেখানে কারো দ্বিমত নেই), সেভাবে এ আয়াতেও একটি لَا উহ্য রয়েছে। সূরা নিসার আয়াতটি হলো–

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا أَيْ اَنْ لَا تَضِلُّوْا (النساء : ١٧٦)

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, এ আয়াতে صَدَقَةُ الْفِطْر-এর হুকুম বর্ণিত হয়েছে। কারণ, রমজান মাসে মুসলমানগণ ধারাবাহিকভাবে তিনটি আমল করে থাকে। যথা- ১. রোজা রাখা, ২. সদকাতুল ফিতর প্রদান করা, ৩. ঈদের নামাজ আদায় করা। তাই আল্লাহ তা'আলাও প্রথম পর্যায়ে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ-এর মাধ্যমে রোজা রাখার হুকুম, দ্বিতীয় পর্যায়ে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ-এর মাধ্যমে সদকাতুল ফিতরের হুকুম এবং তৃতীয় পর্যায়ে وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ-এর মাধ্যমে ঈদের নামাজের হুকুম বর্ণনা করেন।

তিনি আরো বলেন, يُطِيْقُوْنَهٗ শব্দের ه যমীরের مَرْجِع হলো فِدْيَة আর فِدْيَة শব্দের অর্থ طَعَام; তাই অর্থের দিক থেকে আয়াতটি হবে وَعَلَى الَّذِيْنَ يَطِيْقُوْنَ الطَّعَامَ فِدْيَةٌ هِيَ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অর্থাৎ, যারা খাদ্যদানে সামর্থ্য রাখে, তাদের দায়িত্ব হলো ফিদইয়া দেওয়া। আর তা হলো একজন মিসকিনের খাদ্য।

এখন প্রশ্ন হয় يُطِيْقُوْنَه-এর ه যমীরের مَرجِع যদি فِدْيَة হয়, তাহলে إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْر তথা যমীরের مَرْجِعْ উল্লেখ করার পূর্বে যমীর ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, যা আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের দিক থেকে নাজায়েজ। লেখক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন- إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْر তখন নাজায়েজ, যখন যমীর لَفْظًا ও رُتْبَةً উভয় দিক থেকে مُقَدَّم হয়। কিন্তু যদি لَفْظًا مُقَدَّم হয় এবং رُتْبَة مُؤَخَّر হয়, তাহলে إِضْمَار قَبْلَ الذِّكْر জায়েজ। সুতরাং এখানে مَرجِع (উদ্দেশ্য) لَفْظًا مُؤَخَّر হলেও رَتْبَة مُقَدَّم; অতএব কোনো আপত্তি থাকে না। কারণ, তারকীবে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّر আর فِدْيَةٌ هِيَ طَعَامُ مِسْكِيْن হলো خَبر مُقَدَّم আর তারকীবের দিক দিয়ে আয়াতটি হবে এভাবে- فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আর একথা সর্বজনবিদিত যে, مُبْتَدأ ও خَبْر উভয়ের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে مُبْتَدَأ-এর স্তর প্রথম, আর خَبْر-এর স্তর দ্বিতীয়।

এখন আবার প্রশ্ন হয় يُطِيْقُوْنَه শব্দের ه যমীরের مَرْجِع যখন فِدْيَة হয়, তাহলে ه যমীরের পরিবর্তে ها যমীর আসা আবশ্যক ছিল। কারণ স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে স্ত্রীলিঙ্গ যমীর ব্যবহার হয়। এর উত্তর হলো, যেহেতু এখানে فِدْيَة শব্দের অর্থ طَعَام আর طَعَام হলো مُذَكَّر কাজেই مُذَكَّر-এর জন্যে ضَمِيْر مُذَكَّر এসেছে। সুতরাং কোনো আপত্তি থাকে না। আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দেওবন্দের আলেমগণের বিশ্লেষণ : আকাবিরে দেওবন্দ আয়াতের মর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আরবি ভাষা ও মনোভাব প্রকাশের যে ধরন রয়েছে, তাতে কোনো বস্তুর উপর শক্তি অর্জনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এর প্রথম স্তর হলো اَلْاِسْتِطَاعَة আর সর্বশেষ স্তর হলো اَلْاِطَاقَة; যে কাজ করতে হলে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয় না, তাকে اِسْتِطَاعَة বলা হয়। আর যে কাজ করতে গেলে অধিক পরিমাণে কষ্ট করতে হয়, তাকে اِطَاقَة বলা হয়। এখন যদি কেউ বলে- إِنِّي أُطِيْقُ أَنْ أَرْفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فَمِي অর্থাৎ, আমি অত্যন্ত কষ্ট করে এক লোকমা খানা মুখে দিয়েছি, তাহলে কথাটি আরবি অভিধানশাস্ত্রের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, মুখে খাবার দিতে কিংবা নিতে কোনো কষ্ট হয় না। তবে কেউ যদি বলে- إِنِّيْ أُطِيْقُ أَنْ اَحْمِلَ هٰذَا الْحَجَرَ الثَّقِيْلَ অর্থাৎ, আমি এ ভারি পাথর বহন করতে অত্যন্ত কষ্ট করছি, তাহলে কথাটি শুদ্ধ হবে। কারণ, ভারি পাথর বহন করা কষ্টকর। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে- اَلَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ مَعَ شِدَّةٍ وَ تَعْبٍ وَمَشَقَّةٍ عَظِيْمَةٍ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِيْنٍ অর্থাৎ, যারা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করে রোজা রাখে, তাদের জন্যে ফিদইয়া হলো মিসকিনকে খাদ্য দান করা। আর আয়াতের এ অর্থ প্রযোজ্য হয় اَلْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ ও اَلشَّيْخُ الْكَبِيْرُ-এর উপর। কারণ, তারা প্রাণনাশের সম্ভাবনা-সহকারে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে রোজা রাখে। তারা সুস্থ-সবল মানুষের ন্যায় সাধারণ কষ্ট স্বীকার করে রোজা রাখতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আয়াতের এ মর্মই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন- إِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ الْهَرِمِ وَالْعَجُوْزِ الْهَرِمَةِ الْكَبِيْرَةِ فَهُمَا يُطْعِمَانِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلاَ يَقْضِيَان এ আয়াতটি বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও বয়োবৃদ্ধ নারী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে এবং রোজার কাযা আদায় করবে না।

মোটকথা, আয়াতের এ ব্যাখ্যা করলে আয়াতটিকে রহিত মানতে হয় না এবং মুহকাম মানতে গিয়ে لَائے نَافِيَه উহ্য মানারও প্রয়োজন হয় না, যা আরবি ভাষার দিক দিয়ে আমলের পরিপন্থি। আর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর ন্যায় দূরবর্তী ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন হয় না। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল্লামা সুলায়মান নদভী, আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী, আল্লামা শামসুল হক দয়ানভী ও আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.) প্রমুখ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস ও তাফসীরে মাযহারীর সূত্রে বলেন, যারা বয়োবৃদ্ধির কারণে রোজা রাখতে অক্ষম, কিংবা দীর্ঘকাল রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; কিংবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পুনরায় সুস্থ হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য। এটাই সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত।

বি. দ্র : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ব্যতীত, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবূ তালিব, আল্লামা ইবনুল জাওযী ও আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত। তবে ড. মোস্তফা যায়েদ (রা.)-এর মতে আয়াতটি রহিত নয়।

❖ **রমজানের রাতে স্ত্রীসহবাস প্রসঙ্গ :** বুখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম যখন রমজান মাসের রোজা ফরজ করা হয়, তখন ইফতার করার পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গমের অনুমতি ছিল। তখন একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রমজান মাসে মানুষের অবস্থা ছিল এমন যে, কোনো ব্যক্তি রোজা রেখে ইফতার করে ঘুমিয়ে পড়লে পরের দিন ইফতার করার আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হারাম হয়ে যেত। অতঃপর এ হুকুম বহাল থাকেনি। এবার দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

১. এ হুকুমটি কীভাবে প্রবর্তিত হলো? কুরআনের মাধ্যমে নাকি হাদীসের মাধ্যমে।
২. হুকুমটি কীভাবে রহিত হলো?

প্রথম বিষয় সম্পর্কে কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, হুকুমটি আল্লাহ তা'আলার বাণী- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-এর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের (মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের) উপর রোজা ঐভাবে ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আর উল্লিখিত পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী উম্মতগণ রোজা পালন ও সাধনা করতেন। অর্থাৎ, তারা রাত্রে একবার ঘুমিয়ে পড়ার পর রোজা শুরু হয়ে যেত।

মোদ্দাকথা, আয়াতে كَاف حَرْف تَشْبِيْه-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতদের রোজা ও আদায়ের পদ্ধতির সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় তথা مَنْسُوْخ (রহিত হওয়া) প্রসঙ্গে কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) দুটি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১. কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে হুকুমটি রহিত হয়েছে- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ. (البقرة : ١٨٧)

২. হুকুমটি সুন্নাতে রাসূলের মাধ্যমে রহিত হয়েছে।

সারকথা, তাঁর মতে- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ মানসূখ। এর নাসেখ হলো- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ বা সুন্নাতে রাসূল।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) তাঁর প্রথম মতের সমর্থনে উপমার ব্যাপকতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তা খণ্ডন করে বলেন, كَمَا كُتِبَ এ আয়াতাংশে উপমা শুধু রোজা ফরজ এবং ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে; রোজা পালন ও আদায়-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নয়। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, তাশবীহের জন্যে সামান্যতম সাদৃশ্যই যথেষ্ট। সর্বক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক নয়। সুতরাং كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ আয়াতটি রহিত নয়; বরং مُحْكَم; কাজেই আয়াতটিও নাসেখ নয়। অতএব তাঁর মতে উভয় আয়াত مُحْكَم

আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) বর্ণিত দ্বিতীয় অভিমত তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সিয়াম-পদ্ধতির প্রচলন সুন্নাত দ্বারা প্রবর্তিত- এ কথার খণ্ডনে মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) দুটি উত্তর দেন। ১. অস্বীকারমূলক ২. স্বীকারোক্তিমূলক।

অস্বীকারমূলক উত্তরে তিনি বলেন, হাদীসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, রাসূল ﷺ এমন নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ এ আয়াতকে এর জন্যে নাসেখ মানার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে, উক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইসলামপূর্ব যুগের বা পূর্ববর্তী শরিয়তের রোজা পালন-পদ্ধতিতে সংস্কার সাধিত হয়েছে। আর এ পরিবর্তন ও সংস্কারকে পূর্ববর্তীগণের পরিভাষায় نَسْخ বললেও পরবর্তীদের পরিভাষায় نَسْخ বলা যায় না।

আর যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, রাসূল ﷺ ইসলামপূর্ব যুগের রীতি কিংবা পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে তা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্যে কুরআনের কোনো আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ব্যবহার করা বা দলিল হিসেবে দাঁড় করা এবং দ্বিতীয় আয়াত যেমন أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ-কে نَاسِخ হিসেবে উপস্থাপন করা বিশুদ্ধ নয়। অতএব كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ এ আয়াত রহিত নয়, আর أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَام এ আয়াতও রহিতকারী নয়।

❖ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহের নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে পবিত্র মাসে যুদ্ধবিগ্রহের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর সে পবিত্র মাস হলো চারটি। যথা- ১. রজব, ২, যিলকদ, ৩, যিলহজ ও ৪. মহররম। এ মাসচতুষ্টয়ে যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ الخ. (البقرة : ٢١٧)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র.) جَامِعُ الْبَيَان নামক গ্রন্থে হযরত আতা ইবনে মায়সারা (র.)-এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন, আয়াতটি সূরা তাওবার নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে-

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا الخ (التوبة : ٣٦)

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াত পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম এ কথা প্রমাণ করে না; বরং তার বৈধতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, আয়াতটি تَسْلِيْمُ الْعِلَّة ও اِظْهَارُ الْمَانِع-এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যদিও তাতে হারাম হওয়ার عِلَّة পাওয়া যায়, কিন্তু অসুবিধা থাকার কারণে হুকুম পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধবিগ্রহ হারাম হওয়ার عِلَّة (কারণ) হলো কবীরা গুনাহ, আর مَانِع (অসুবিধা) হলো (কাফেরদের পক্ষ থেকে) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া, মহান আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করা, মসজিদে হারামে হজ আদায় করতে বাধা সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের হিজরত করতে বাধ্য করা। সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহ হারাম হওয়ার عِلَّة থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত مَانِع (অসুবিধা) প্রতীয়মান হওয়ার কারণে হারাম হওয়ার হুকুম বহাল থাকেনি। এ ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতের মর্ম হবে, উক্ত পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহ করা যদিও বড় গুনাহ; কিন্তু ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা তা থেকে আরো বড় গুনাহ। তাই ফেতনা প্রতিরোধকল্পে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা হারাম নয়; বরং বৈধ। লেখকের এ ব্যাখ্যাটি আয়াতের سِيَاق (পরবর্তী অংশ) থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়; سِيَاق হিসেবে আয়াতের অর্থ নিম্নে পেশ করা হলো-

"সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করার ব্যাপারে তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, যদিও এ মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহ করা মারাত্মক গুনাহ; তথাপি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় অপরাধ। অধিকন্তু আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে কলহ-দাঙ্গা সৃষ্টি করা যুদ্ধবিগ্রহের চেয়েও জঘণ্য পাপ। আর এসব বিষয় প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। সুতরাং পবিত্র মাসসমূহে ফেতনা-ফ্যাসাদ দমনকল্পে যুদ্ধ করা বৈধ। অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা অবশ্যই গুনাহ; কিন্তু মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া, নিজেরা ইসলাম গ্রহণ না করা, বায়তুল্লাহর যিয়ারত থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া এবং মক্কাবাসী (সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল ﷺ-কে পবিত্র মক্কা থেকে বের করে দেওয়া পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা থেকেও অধিক গুনাহের কাজ। আর কাফের-মুশরিকরা সর্বদা এহেন অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। সুতরাং এ মাসসমূহেও তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ।

উল্লেখ্য, এ আয়াতটি আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবূ তালিব ও আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.)-এর মতে রহিত তবে মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ছাড়া আল্লামা যারকানী ও মোস্তাফা যায়েদ (র.)-এর মতেও আয়াতটি অরহিত বা রহিত নয়।

❖ **বিধবার জন্যে এক বছরের ভরণপোষণ প্রসঙ্গ :** উপরিউক্ত আয়াতে বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাহেলি যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জন্যে ইদ্দত পালনের বিধান ছিল এক বছর পর্যন্ত। ইসলামের প্রথম যুগেও এ হুকুম বলবৎ ছিল। তবে ইদ্দত পালনের সময় স্ত্রীর জন্যে স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করা এবং স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ভরণপোষণ গ্রহণ করার অসিয়ত করা স্বামীর উপর আবশ্যক ছিল, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (البقرة : ٢٤٠)

আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন–

১. ইদ্দতের মেয়াদ এক বছর।
২. স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এক বছর ভরণপোষণ ভোগ করা।
৩. এক বছর স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করা। তবে পরবর্তীকালে ইদ্দতের মেয়াদ এক বছর রহিত করে চার মাস দশ দিন সাব্যস্ত করা হয়। আর রহিত হওয়ার বিধানটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا الخ (البقرة : ٢٣٤)

উল্লেখ্য যে, বিধবা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত। এতে সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই; যা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়– وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الخ (الطلاق : ٤)

অতঃপর ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর ভরণপোষণের অসিয়ত করার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়। আর রহিত হওয়ার বিধানটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়– يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ الخ (النساء : ١١-١٢)

অর্থাৎ, স্বামীর যদি কোনো সন্তান না থাকে, তা হলে স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে; আর সে সন্তান বর্তমান স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত, তা হলে ঐ স্ত্রী সম্পদের এক-অষ্টমাংশ পাবে।

সুতরাং মৃতের জন্যে এখান থেকে তার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্যে অসিয়ত করা বৈধ নয়।

মৃত স্বামীর বাড়িতে স্ত্রীর থাকার হুকুমটি রহিত কিনা, এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারী উলামায়ে কেরাম বলেন, হুকুমটি রহিত হয়নি; বরং এখনো বহাল রয়েছে। তাঁরা দলিল হিসেবে রাসূল ﷺ-এর এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন–اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهٗ অর্থাৎ, ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার বাসগৃহে অবস্থান কর। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারী উলামায়ে কেরাম বলেন, হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। আহনাফের প্রথম দলিল– قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنٰى لَهَا

অর্থাৎ, হযরত আতা (র.) বলেন, এরপর মিরাশের আয়াত অবতীর্ণ হলে বসবাসের হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা, ইদ্দত পালন করতে পারে। তার জন্যে কোনো নির্ধারিত ঘর নেই।

আহনাফের দ্বিতীয় দলিল হলো, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ থেকে তার মালিকানা ছিন্ন হয়ে ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে আসে। সুতরাং স্বামীর সম্পদ হিসেবে তার গৃহে স্ত্রীর বসবাস করার অধিকার নেই।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, যদিও জমহুর মুফাসসির আয়াতটিকে রহিত বলেছেন, তথাপি একে রহিত না বলে এ ব্যাখ্যা করা যায় যে, এখন থেকে মৃতব্যক্তির জন্যে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বসবাসের জন্যে অসিয়ত করা ওয়াজিব নয়। তবে তা করলে মুস্তাহাব হবে, নাজায়েজ হবে না। অর্থাৎ, অসিয়তের আবশ্যকতা রহিত হয়ে গেছে, তবে বৈধতা বহাল আছে। কিন্তু স্ত্রীর অন্য স্বামীর বাসগৃহে থাকা আবশ্যক নয়। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি রয়েছে–

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (يَعْنِيْ فَاِنْ خَرَجْنَ) عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَإِنْ خَرَجْنَ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। ইদ্দত পালন তার নিজস্ব ব্যাপার; স্বামীর বাড়িতে হোক কিংবা পিতার বাড়িতে। স্ত্রীর বসবাসের অসিয়ত করা যদি স্বামীর জন্যে সম্পূর্ণ অবৈধ হতো, তা হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) حَيْثُ شَاءَتْ বলে ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে বসবাসের স্বাধীনতা দিতেন না। সুতরাং বুঝা গেল, অসিয়ত করার বৈধতা এখনো বহাল আছে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকেও এ ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়। আয়াতে বলা হয়েছে- غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, বিধবা স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের করা যাবে না। তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যায়, তা হলে ওয়ারিশদের কোনো গুনাহ নেই। ..... فَإِنْ خَرَجْنَ আয়াতে স্ত্রীদেরকে স্বামীর ঘরে অবস্থান করা না-করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অবস্থানের অসিয়ত যদি সম্পূর্ণ অবৈধ হতো, তা হলে স্ত্রীদেরকে কেবল অবস্থান না করার হুকুম দেওয়া হতো।

মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরীর অভিমত : তিনি বলেন, এক বছরের ভরণপোষণের অসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতটির উপর আমল করা সম্ভব। কখনো سُنَّةٌ مُوَسِّعَةٌ (ব্যাপক ও সাধারণ সুন্নত) হিসেবে। আবার কখনো ভরণপোষণের অসিয়ত করা ওয়াজিব, যখন বিধবা মহিলাটি একেবারে নিঃস্ব হয়। না আছে তার কোনো বসবাসের ঠিকানা, আর না আছে কোনো নিকটাত্মীয়, আর না মিলছে ভরণপোষণ পরিমাণ উত্তরাধিকারস্বত্ব। কারণ, ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) শেষ হতেই তড়িঘড়ি করে বিবাহ দেওয়া প্রায় সময় সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এমতাবস্থায় শরিয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্যে এক বছরের থাকা-খাওয়ার অসিয়ত করা আবশ্যক করেছে, যাতে বিধবা স্ত্রী ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু বিধবা ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পালনের পর চাইলে সেখানে অবস্থান করতে পারবে, কিংবা অন্যত্র চলে যেতে পারবে। যদি সারা বছর থাকতে চায়, তাহলেও বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাকে বের করে দেওয়া বা চলে যাওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা মৃতব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্যে নাজায়েজ।

উল্লেখ্য, মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ব্যতীত আরো যে সকল আলেমের মতে আয়াতটি রহিত নয়, তাঁরা হলেন- আল্লামা যারকানী ও ড. মোস্তাফা যায়েদ (র.)। আর আল্লামা সুয়ূতী (র.)-সহ আরো যাঁরা আয়াতটি রহিত বলেন, তাঁরা হলেন– আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.)।

❖ **মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আমলের হিসাব-নিকাশ :** মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত বাহ্যিক কাজকর্ম দু'প্রকার। যথা–

১. ইচ্ছাধীন, যা স্বেচ্ছায় করা হয়। যেমন- স্বেচ্ছায় কথা বলা, স্বেচ্ছায় কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি।

২. অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে থাকে। যেমন- এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা, কিংবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে অন্যের কোনো কিছু ক্ষতি হয়ে যাওয়া।

অনুরূপভাবে যে সকল কাজকর্ম মানুষের অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। যথা–

১. ইচ্ছাধীন। যেমন- স্বেচ্ছায় অন্তরে কুফর ও শিরকের আকিদা পোষণ করা, বা জেনেশুনে স্বেচ্ছায় নিজেকে বড় মনে করা। অর্থাৎ, অহংকার করা।

২. অনিচ্ছাধীন। যেমন- অনিচ্ছাকৃত নানা কুমন্ত্রণা আসা-যাওয়া।

মূলত মৃত্যুর পর এ উভয় প্রকারের ইচ্ছাধীন কাজকর্ম ও মনোভাবের হিসাব নেওয়া হবে। অনিচ্ছাকৃত মনোভাব ও কাজকর্মের কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না। তবে নিম্নের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের ইচ্ছাধীন, অনিচ্ছাধীন সকল প্রকার মনোভাব ও কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ الخ (البقرة : ٢٨٤)

উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ, مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ-এর ব্যাপকতার মধ্যে মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ইচ্ছাধীন বিষয় তো মানুষের সাধ্যের মধ্যে। স্বেচ্ছায় করলে প্রতিদান পাবে, না করলে পাবে না। কিন্তু অনিচ্ছাধীন বিষয় তো মানুষের সাধ্যের বাইরে; এর থেকে সংযত থাকাও সম্ভব নয়। তাই শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

এজন্যে আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতদিন পর্যন্ত আমাদেরকে এমন আমলের مُكَلَّف (বাধ্য) বানানো হয়েছিল, যা আমাদের সাধ্যাধীন। কিন্তু আজ আপনার উপর এমন এক আয়াত অবতীর্ণ হলো, যার উপর আমল করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা কি পূর্ববর্তী উম্মত তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মতো سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا তথা আমরা শুনলাম, কিন্তু মানতে পারলাম না বলতে চাও? বরং তোমরা বলো- سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا তথা আমরা শুনলাম এবং মানলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। এ আয়াত অবতীর্ণ করে পূর্বের ঐ আয়াত রহিত করে দেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আয়াত রহিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, মুতায়াখখিরীন উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় এটি রহিত নয়; বরং عَامّ-এর تَخْصِيْص মাত্র। কারণ, পরবর্তী আয়তে -এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইখলাস ও নেফাক। অর্থাৎ, প্রকাশ্যে ইখলাস আর গোপনে নেফাকের জন্যে হিসাব দিতে হবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে যে সকল কুমন্ত্রণা আসে, তা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানুষের সাধ্যাধীন বিষয়ের উপর জবাবদিহিতা আছে; কিন্তু সাধ্যাতীত বিষয়ের ব্যাপারে জবাবদিহিতা নেই। আর মানুষের মনে উদিত কুমন্ত্রণা সাধ্যাধীন নয়। কাজেই এর উপর কোনো প্রকার জবাবদিহিতা নেই। যেমন রাসূল ﷺ বলেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهٖ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (رواه الشيخان عن أبي هريرة ؓ)

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের সেসব বিষয় ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা মনে কুমন্ত্রণা দেয়; যতক্ষণ না তারা সে অনুপাতে কাজ করবে কিংবা কথা বলবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা সুয়ূতী (র.) ব্যতীত আল্লামা যারকানী (র.) আয়াতটিকে রহিত বলেছেন। আর মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-সহ আল্লামা নাহহাস, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত নয়।

❖ পরিপূর্ণ আল্লাহভীতি প্রসঙ্গ : تَقْوٰى অর্থ– বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। সে অনুপাতে اِتَّقُوا اللهَ-এর অর্থ হবে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থেকো, বেঁচে থেকো। আর تَقْوٰى শব্দের অর্থ ভয় করাও আসে। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সর্বাবস্থায় তাঁকে ভয় করার নির্দেশ দিয়ে বলেন– يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. (آل عمران : ١٠٢)

কতিপয় তাফসীরকার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হাসান বসরী, কাতাদা ও রবী (র.)-এর মতের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, পরিপূর্ণ আল্লাহভীতির মর্ম হলো সর্বদা আল্লাহর অনুগত থাকা। কখনো তাঁর অবাধ্য না হওয়া। সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কখনো তাঁর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। কখনো তাঁকে না ভুলা। আর এ ধরনের কাজ মানুষের পক্ষে সর্বদা সম্ভবপর হয় না।

তাই আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। যেহেতু আল্লাহর প্রাপ্য হক অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধ্য কারো নেই, সেহেতু নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াতকে রহিত করা হয়েছে।

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (التغابن :١٦)

কতেক তাফসীরকার বলেন– اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি অরহিত। মহান আল্লাহকে পূর্ণমাত্রায় ভয় করার অর্থ হলো, যেভাবে কুফর, শিরক থেকে বেঁচে আছ, সেভাবে যাবতীয় পাপাচার থেকেও বেঁচে থেকো। তাফসীরকারগণ উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেন, تَقْوٰى-এর কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্নস্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলামানকেই مُتَّقِي তথা আল্লাহভীরু বলা যায়। যদিও সে গুনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বুঝানোর জন্যেও কুরাআনের বহু স্থানে مُتَّقِيْن ও تَقْوٰى শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

تَقْوٰى-এর দ্বিতীয় স্তর হলো, এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অপছন্দনীয়। কুরআন-হাদীসে তাকওয়ার যেসব ফযিলত ও কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে, তা এ স্তরের তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

تَقْوٰى-এর তৃতীয় স্তর হলো সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা দ্বারা সমৃদ্ধ রাখা। اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর মধ্যে তাকওয়ার এ স্তর অর্জন করার কথা বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও তাউস (র.) বলেন, এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য হলো, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে পাপ থেকে বেঁচে থেকো। এতেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধ কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পরিপূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হলে তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থি হবে না।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর নিকটও اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি রহিত নয়; বরং محكم তথা অরহিত। তবে তাঁর মতে উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এক নয়। তিনি বলেন, حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে কুফর, শিরক ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে। কেননা, তা থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা অতীব জরুরি। আর فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমল প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অজু করে নামাজ পড়ার সামর্থ্য রাখে না, সে তায়াম্মুম করবে। আর যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার শক্তি রাখে না, সে বসে নামাজ আদায় করবে।

এ ব্যাখ্যা আয়াতের পরবর্তী অংশ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ দ্বারাও স্পষ্ট। কারণ, উক্ত আয়াতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর অবিচল থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রায় সময় আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু ঈমান যথার্থই থাকে। সুতরাং আয়াতে مُسْلِمُوْنَ-এর 'ইসলাম' দ্বারা اعمال اسلام উদ্দেশ্য নয়; বরং একত্ববাদে বিশ্বাস উদ্দেশ্য।

আল্লামা শায়খ আবুল হাসান শাযালী (র.)-ও এ ব্যাখ্যা অবলম্বন করে বলেন, প্রথম আয়াতে حَقَّ تُقَاتِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য তাওহীদ। আর দ্বিতীয় আয়াতে مَا اسْتَطَعْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য আমল।

সারকথা হলো, কোনো কোনো আলেমের মতে اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি মুহকাম তথা অরহিত। আবার কোনো কোনো আলেমের মতে আয়াতটি মানসূখ তথা রহিত। তবে মুহকামের পক্ষেই অধিংকাংশ আলেমের অভিমত পাওয়া যায়। আর এ অভিমতটিই অগ্রগণ্য।

উল্লেখ্য যে, সূরা আলে ইমরানের একমাত্র এই আয়াতের ব্যাপারে নসখের দাবি করা হয়েছে; অন্য কোনো আয়াতের ব্যাপারে এ দাবি করা হয়নি, আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতেও আয়াতটি রহিত, তবে আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, আল্লামা ইবনুল জাওযী ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত নয়।

❖ **উত্তররাধিকার ও বন্ধুত্বসুলভ চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা :** ইসলামের সূচনালগ্নে মক্কা-মদিনার অধিবাসীরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ক. মুসলমান খ. কাফের। তাদের অবস্থা এ রকম ছিল যে, পিতা মুসলমান হলে ছেলে কাফের কিংবা ছেলে মুসলমান হলে পিতা কাফের। ভাই-ভাতিজা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ ছিল। আর আল্লাহর আইনও মুমিন এবং কাফের উভয় জাতির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. (التغابن : ٢)

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন ও কেউ কাফের। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন। কাজেই উভয় জাতির ধর্মীয় বিধান যেমন ভিন্ন, তেমনিভাবে তাদের মিরাশের বিধানও সম্পূর্ণ ভিন্ন; যদিও তারা পরস্পর নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো কাফের কোনো মুসলমানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। ঠিক তদ্রুপ কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। অর্থাৎ, কাফেরের উত্তরাধিকারী কাফের হবে আর মুসলমানের উত্তরাধিকারী মুসলমান হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الخ (الأنفال : ٧٣)

অর্থাৎ, যারা কাফের, তারা একে অপরের অভিভাবক। আর এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ أَوْ كَمَا قَالَ

অর্থাৎ, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। আর কোনো কাফেরও কোনো মুসলমানের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এ উত্তরাধিকারী না হওয়াকে ইলমুল ফারায়েজের পরিভাষায় اختلاف دينين (দীনের ভিন্নতা) বলা হয়। আর এ হুকুমটি কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অন্যদিকে তৎকালীন মুসলমানগণও দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। ক. মুহাজির, খ. অমুহাজির। আর মুসলমানদের মীরাসের ভিত্তি ছিল হিজরত। অর্থাৎ, মুহাজিরগণ অমুহাজিরদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। আবার অমুহাজিরগণ মুহাজিরদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কারণ, তখন মুসলমান নারী-পুরুষ সবার উপর হিজরত করা ফরজ ছিল। এ আদেশ পালন করতে গিয়ে মাত্র কতিপয় মুসলমান ব্যতীত বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছিলেন। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই মুহাজির ও অমুহাজিরদের মীরাসের স্বত্ব তখন ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তবে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর উত্তরাধিকারী ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করে দেন। যাকে عَهْد مُوَاخَاة (ভ্রাতৃসুলভ চুক্তি) বলা হয়। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁরা একে অন্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا الخ. (الأنفال : ٧٢)

হিজরত ও মৈত্রীচুক্তি-ভিত্তিক উত্তরাধিকারস্বত্ব আদায়ের জন্যে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ الخ (النساء : ٣٣)

এ হিজরত ও বন্ধুত্বচুক্তিভিত্তিক হুকুমটি রহিত নাকি অরহিত, তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর আলেম বলেন, তা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে– وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ. (الأنفال : ٧٥)

রাসূল ﷺ বলেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই।

যখন হিজরত নেই, তখন এ সংক্রান্ত বিধানও নেই। অতএব, হিজরত ও মৈত্রীবন্ধনভিত্তিক উত্তরাধিকারস্বত্ব রহিত হয়ে গেছে। অপরদিকে অনুসন্ধিৎসু উলামায়ে কেরাম বলেন, এ হুকুমটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। কিন্তু এটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত। যদি কোনো সময় কোনো দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা হলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে। অর্থাৎ, মুহাজিরগণ অমুহাজিরদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। এর বিপরীত দিকটিও তা–ই; যাকে ইলমুল ফারায়েজের পরিভাষায় اختلاف دارين (দেশের ভিন্নতা) বলা হয়।

উত্তরাধিকারী স্বত্বের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার এবং ঋণ ও কর আদায় করার চুক্তি করে, তা হলে তাদের উভয়ের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে, তারা একে অন্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

সারকথা, وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ আয়াতটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ আয়াতের মাধ্যমে রহিত হবে। আবার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুমটি বহালও থাকবে।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, আয়াতটি রহিত নয়; বরং অরহিত; আর আয়াতের মর্ম হলো, মিরাশ তো আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য; তবে মিত্রদেরকে সৌজন্যমূলকভাবে কিছু দান করার অনুমতি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, আল্লামা যারকানী ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে আয়াতটি مَنْسُوْخ তথা রহিত নয়; বরং محكم তথা অরহিত।

❖ বণ্টনকালে সন্তুনা-অংশ দানের বিধান : মৃতব্যক্তির বহু আত্মীয় এমন আছেন, যারা রক্তসূত্রে দূরাত্মীয় হওয়ার কারণে শরিয়তের বিধি অনুযায়ী মৃতের সম্পত্তির অধিকারী নয়। কিন্তু তারাও মনে মনে কিছুটা পাওয়ার আশা পোষণ করে থাকে। বিশেষ করে বণ্টনকালে তারা যদি উপস্থিত হয়, আর তাদের মধ্যে যদি এতিম-মিসকিন এবং অভাবগ্রস্ত লোক থাকে। আর যখন অন্যরা শরিয়ত অনুযায়ী স্ব স্ব অংশ নিয়ে যায়, তখন তাদের দুঃখ-বেদনা আরো বৃদ্ধি পায়। তাই অংশীদার কর্তৃক তাদেরকে সৌজন্য ও সান্ত্বনামূলক হিসেবে কিছু অংশ দেওয়ার এবং অপারগতায় নম্র-ভদ্র ও বিনয়ী ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا (النساء : ٨)

কতিপয় তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতটি মীরাস-সংক্রান্ত আয়াত- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ الخ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, রহিত হয়নি; তবে মানুষের আমল এর উপর প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

তবে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর মতানুযায়ী বলেন, আয়াতটি রহিত নয়; বরং অরহিত। তবে হুকুমটি মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

❖ ব্যভিচারী নারীদের গৃহবন্দি করার আদেশ : সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاللّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (النساء : ١٥)

জমহুর তাফসীরকার বলেন, আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (النور : ٢)

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, সূরা নিসার আয়াতটি রহিত নয়; বরং হুকুমটি নির্ধারিত সময়সীমার জন্যে প্রবর্তিত ছিল। অতঃপর সূরা নূরের আয়াত দ্বারা হুকুমটির নির্ধারিত সময় যখন অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন রাসূল বলেন–خُذُوْا عَنِّيْ خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা তাদের (ব্যভিচারিণীদের) জন্যে নতুন পন্থা তৈরি করে দিয়েছেন।

আর সময় পরিবর্তনজনিত কারণে হুকুমের পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরবর্তী উলামায়ে কেরামের পরিভাষা অনুযায়ী রহিত নয়। কারণ, তাঁদের পরিভাষায় حكم مطلق-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করার নাম হলো নসখ; حكم موقت-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করাকে রহিত বলা হয় না। তাই তো উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব نور الانوار-এ বলা হয়েছে–

إِذَا الْتَحَقَ بِهِ التَّوْقِيْتُ لَا يُنْسَخُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ النَّسْخِ ..... اَلْأَوْلٰى فِيْ نَظِيْرِهِ : قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا.

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আয়াতে নিসার নসখ অস্বীকার করলেও এর উপর আমল করা হবে কিনা এবং আমল করা হলে কোন পদ্ধতিতে হবে? তা বর্ণনা করেননি। আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেন,

সূরা নিসার আয়াতের উপর আমল করা তখন ওয়াজিব, যখন মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারানো বা না থাকার কারণে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার সামর্থ্য রাখবে না। কারণ, আয়াতটি মুসলমানগণ এমন অবস্থা থাকাকালেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মুসলমানগণ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সূরা নূর -এর আয়াত অবতীর্ণ হলো।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ব্যতীত আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবূ তালিব, আল্লামা যারকানী ও আল্লামা মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে, আয়াতটি مَنْسُوْخ তথা রহিত।

❖ **সম্মানিত মাসে বৈধ কাজ করার নিষিদ্ধতা :** পবিত্র মাসসমূহ তথা রজব, যিলকদ, যিলহজ ও মহররম এ চার মাসে সর্বপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ الخ (المائدة : ٢)

জমহুর তাফসীরকার হারাম মাসসমূহকে হালাল মনে না করার এ মর্ম বর্ণনা করেন যে, ঐ মাসসমূহে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ না করা। এ ব্যাখ্যার আলোকে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ আয়াতটিকে রহিত মনে করেন। যার রহিতকারী হলো নিম্নের আয়াতসমূহ–

١- فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ الخ. (التوبة : ٥)

٢- وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً الخ (التوبة : ٣٦)

মুহাদ্দিসে দেহলভি (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, আমি কুরআন বা সহীহ হাদীসে এর কোনো রহিতকারী খুঁজে পাইনি। তিনি জমহুর মুফাসসির কর্তৃক বর্ণিত হারাম মাসসমূহকে হালাল মনে না করার তাফসীর খণ্ডন করে বলেন, এর অর্থ এ নয় যে, হারাম মাসসমূহে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হারাম; বরং এর অর্থ হলো, যুদ্ধবিগ্রহ ও খুনাখুনি চিরদিনের জন্যে হারাম; এর নিষিদ্ধতা হারাম মাসসমূহের আল্লাহর দরবারে আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। আয়াতটির মর্ম বুঝাতে গিয়ে তিনি এ হাদীসের উদ্ধৃতি দেন–

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا.

অর্থাৎ, তোমাদের জান-মাল তোমাদের উপর হারাম, যেভাবে তোমাদের এ দিন (আরাফাহ দিবস), তোমাদের এ মাসে (যিলহজ) এবং এ শহরে (মক্কা) হারাম। অর্থাৎ, অন্যায় রক্তপাত ও কারো সম্পদ ভোগ-দখল তো অন্য মাসেও অবৈধ; বিশেষ করে জিলহজ মাসে আরাফাত দিবনে পবিত্র মক্কানগরীতে তা আরো অধিক অবৈধ। ঠিক তদ্রূপ اَلْحَرَامَ وَلَاالشَّهْرَ-এর অর্থও তা-ই। উল্লেখ্য যে, প্রকৃত জিহাদ ব্যতীত যে কোনো ধরনের রক্তপাত হারাম।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা যারকানী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও আল্লামা মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে, আয়াতটি রহিত নয়। তবে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.)-এর মতে রহিত।

❖ **অমুসলিমদের মামলা-মকদ্দমায় মুসলিম বিচারকের রায় প্রসঙ্গ :** যখন রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর ইহুদিরা তা থেকে উপকার লাভ করতে চাইল। তাই যেসব ইহুদি তাওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহ পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মামলায় রাসূল ﷺ-কে বিচারক বানানোর আগ্রহী হলো, যাতে একদিকে ইসলামের নরম ও সহজ বিধান থেকে ফায়দা লাভ করা যায়, অন্যদিকে তাওরাত পরিবর্তন কর অপরাধ থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তবে তারা তাঁকে বিচারক সাব্যস্ত করার পূর্বে একটি অপকৌশলের আশ্রয় নিত। আর তা এই যে, তারা মামলা দায়ের করার পূর্বে কোনো না কোনো উপায় বের করে ফতোয়া আকারে বিচারের রায় জেনে নিত। যদি তা তাদের স্বার্থানুকূলে হতো, তা হলে বিচারক বানাতো; নতুবা কেটে পড়ত। তা বুঝে রাসূল ﷺ যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে ইহুদিদের দায়েরকৃত এ জাতীয় কোনো মামলা-মকদ্দমার পক্ষে-বিপক্ষে রায় দেওয়া না-দেওয়ার স্বাধীনতা দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا الخ (المائدة : ٤٢)

এ আয়াতের সারমর্ম হলো, আপনি যদি মামলা নিষ্পত্তি করেন, তা হলে ন্যায়বিচারের সঙ্গে করুন; নতুবা তা থেকে নির্লিপ্ত থাকুন; তারা তাদের মামলা তাদের ধর্মীয় নেতাদের নিকট উপস্থাপনা করে সমাধান করুক।

অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, রাসূল ﷺ-এর এ অধিকার হিজরতের প্রাথমিক যুগে ছিল, যখন ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তিসামর্থ্য কম ছিল। অতঃপর ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এ এখতিয়ার বাতিল করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ الخ (المائدة : ٤٩)

সারকথা, জমহুর আলেমের ভাষ্য অনুযায়ী সূরা মায়েদার এতদুভয় আয়াতের মধ্যে প্রথমটি রহিত দ্বিতীয়টি রহিতকারী।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন- وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আয়াতটি রহিতকারী নয়; বরং ঐ আয়াতের পরিপূরক। কারণ, এ আয়াতের অর্থ হলো, আপনি যদি মীমাংসা করার ইচ্ছা করেন, তা হলো ইসলামি শরিয়তের আলোকে করুন এবং তাদের মনোভাব ও মতামত এড়িয়ে চলুন। আর যদি না করেন, তা হলে তারা তাদের ধর্মীয় নেতাদের নিকট গিয়ে নিজেদের ব্যাপারে সামাধান করুক।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন, প্রথম আয়াত ঐসব অমুসলিম সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয়; বরং স্বীয় দেশে বসবাস করে আমাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন- বনূ কোরায়যা ও বনু নযীর। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিম সম্পর্কে যারা যিম্মী এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, আল্লামা যারকানী ও আল্লামা মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতেও আয়াতটি রহিত নয়।

আর রাসূল ﷺ-এর আদালতে মামলা দায়েরকারী ইহুদিরা ইসলামে আদৌ বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থও ছিল না। আর ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম যিম্মীদের সার্বিক দায়দায়িত্ব সরকারের। তারা সরকারি আদালতে মামলা দায়ের করলে রায় দেওয়া বিচারকের উপর আবশ্যক।

❖ সফরকালে অমুসলিমকে সাক্ষী বানানো প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে সফরকালে অমুসলিমকে সাক্ষী বানানো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারো মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ বা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার জন্যে দু'জন মুসলামানকে সাক্ষী নিয়োগ করা প্রয়োজন। কোনো সময় কোনো কারণবশত বিশেষ করে ভ্রমণকালে কোনো মুসলিম পাওয়া না গেলে অমুসলিমদেরকে সাক্ষী নিযুক্ত করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا الخ (المائدة : ١٠٦)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, আয়াতের اَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অংশটি উক্ত আয়াত وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব উল্লেখ করে বলেন, আয়াতটি রহিত নয়। কারণ, ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাব হলো সফরকালে মুসলমান সাক্ষী পাওয়া না গেলে কাফেরকে সাক্ষী নিযুক্ত করা জায়েজ আছে।

কিন্তু অন্যান্য ইমামগণের নিকট যদিও মুসলমানের স্বীয় বিষয়ে কোনো কাফেরকে সাক্ষী বানানো বৈধ নয়, তথাপি আয়াতটিকে রহিত বলা ঠিক হবে না। কারণ, আয়াতের এ ব্যাখ্যা হতে পারে যে, غَيْرِكُمْ দ্বারা অমুসলিম উদ্দেশ্য নয়; বরং মুসলমান উদ্দেশ্য। যারা অসিয়তকারী আত্মীয় নয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। আয়াতটিতে মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে সুতরাং মুসলমানদের বিপরীত অমুসলিমই উদ্দেশ্য হবে; মুসলমান উদ্দেশ্য হবে না।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-সহ আল্লামা যারকানী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবূ তালিব, আল্লামা ইবনুল জাওযী ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে এ আয়াতটি রহিত নয়।

❖ অল্প-সংখ্যক ধৈর্যশীল ব্যক্তি বহু-সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ প্রসঙ্গ : ইসলামের সূচনালগ্নে জিহাদ ফরজ হওয়ার সময় কাফেরের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই লঘু ছিল। তাই মুসলমানদের মনোবল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (الانفال : ٦٥)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর মতানুযায়ী পূর্বের আয়াতটি এ আয়াত– اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ ..... مَعَ الصَّابِرِيْنَ. (الانفال : ٦٦) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর অভিমত সমর্থন করে বলেন, আয়াতটি রহিত, এর রহিতকারী হলো পরবর্তী আয়াত বা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, আয়াতটি রহিতকারী (نَاسِخ) সুনির্দিষ্ট নয়। মুসলমানগণ যখন সংখ্যায় লঘু ছিল, তখন একজন মুসলমানকে দশজন কাফেরের মুকাবিলা করার আদেশ দেন। এরপর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন হুকুমটি হালকা করে দেওয়া হয়। আর তাদের দ্বিগুণ কাফেরের মুকাবিলা কারার নির্দেশ দেওয়া হয়। সুতরাং পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে একজন মুসলমানকে দশজন কাফেরের মুকাবিলা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল্লামা যারকানী ও আল্লামা মোস্তফা যায়েদ (র.) আয়াতটিকে রহিত বলেছেন। তবে আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, আয়াতটি রহিত নয়।

❖ **জিহাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া প্রসঙ্গ :** আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সর্বাবস্থায় জিহাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আদেশ দিয়ে বলেন–

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ الخ (التوبة : ٤١)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত ও ওজর-সংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ الخ (التوبة : ١٢٢)

আর ওজর-সংক্রান্ত আয়াত হলো–

١- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ الخ (التوبة : ٩١ - ٩٢)

٢- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ الخ (الفتح : ١٧)

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) خِفَافًا তথা সুস্থ-সবল ও ثِقَالًا তথা অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধের যে অর্থের ভিত্তিতে আয়াতটি রহিত সাব্যস্ত করেছেন, তা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) খণ্ডন করে বলেন, خِفَافًا ও ثِقَالًا-এর মধ্যে মুজাহিদের অবস্থা বর্ণিত হয়নি; বরং সমরাস্ত্রের পর্যাপ্তি ও অপর্যাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, خِفَافًا যুদ্ধসামগ্রী অপর্যাপ্ত হোক আর ثِقَالًا যুদ্ধসামগ্রী পর্যাপ্ত হোক; উভয় অবস্থায়ই যুদ্ধের জন্যে বের হতে হবে। সুতরাং আয়াতটিকে রহিত বলা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এখানে অসুস্থ রোগী ও অক্ষম মুসলমানদেরকে জিহাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং সুস্থ-সবলদেরকে সর্বাবস্থায় বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা আয়াতটির নসখ সুনির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ, আয়াতে সকল মুসলমান, সুস্থ-অসুস্থ, সবল-দুর্বল এবং যুবক-বৃদ্ধকে জিহাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে মেনে নিলেও আয়াতটিকে রহিত বলা ঠিক হবে না। কারণ, যদি শত্রুর আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে আর ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সবার প্রতি বের হওয়ার নির্দেশ আসে, তা হলে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা যারকানী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, আল্লামা ইবনুল জাওযী ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর নিকটও আয়াতটি রহিত নয়।

❖ **সৎলোকের ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ প্রসঙ্গ :** আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন–

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (النور : ٣)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হলো ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীর বিবাহ বৈধ। কিন্তু তাদের সঙ্গে সৎ ও ভদ্র নারী-পুরুষের বিবাহ বৈধ হতে পারে না। তাদের কাছে ذٰلِكَ ইসমে ইশারার مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো- প্রকৃত মুমিন-মুসলমানের উপর ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে বিবাহ করা হারাম। আর মুহাক্কিক আলেমের মতে আয়াতটির মর্ম হলো, ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর সমতুল্য ও সমপর্যায়ের লোক। সতী-সাধ্বী নারীর জন্য সমতুল্য নয়। সুতরাং ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা উত্তম নয়। তাদের দৃষ্টিতে (ذٰلِكَ) ইসমে ইশারার مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো ব্যভিচার ও শিরক। অর্থাৎ, ব্যভিচার হারাম। কিন্তু সৎপুরুষ বা নারীর জন্যে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা হারাম নয়। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থের দিক থেকে আয়াতের মধ্যে কোনো অসুবিধা না হলেও একটি জটিল প্রশ্ন থেকে যায়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-সহ অন্যান্য দার্শনিক যাঁরা حُرِّمَ ذٰلِكَ এ আয়াতাংশের ذٰلِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ শিরক ও ব্যভিচার নির্ধারণ করেছেন; এ হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, মুসলমানের উপর ব্যভিচার হারাম হলেও ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা হারাম নয়, তখন শিরক অংশের অর্থ দাঁড়াবে, মুমিন-মুসলমানের উপর শিরক হারাম হলেও মুশরিকা নারীকে বিবাহ করা হারাম নয়। অথচ তা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস পরিপন্থি, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, একই مُشَارٌ اِلَيْهِ-এর একাংশের ব্যভিচার অর্থ প্রযোজ্য হলেও অন্যাংশের শিরক অংশের অর্থ প্রযোজ্য হয় না। প্রযোজ্য যদি হয়, তা হলে উভয় অংশের হবে, নতুবা কোনো অংশেরই হবে না। এটিই হলো নিয়ম।

উক্ত প্রশ্নের সমাধানে মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন, আয়াতে ذٰلِكَ দ্বারা ব্যাভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীর বিবাহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সঙ্গে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিবাহ নাজায়েজ। এভাবে ব্যভিচারী পুরুষের সঙ্গে সতী নারীর বিবাহ কিংবা ব্যভিচারিণী নারীর সঙ্গে সৎপুরুষের বিবাহও নাজায়েজ। এই নাজায়েজ বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎপুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারের উপর সন্তুষ্ট থাকে। কারণ, এমতাবস্থায় এটি হবে দায়ূসী (নিজ স্ত্রীকে অন্যের সহবাসে দিয়ে উপার্জন করা) যা শরিয়তে অবৈধ। এভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বাতিল হওয়া আবশ্যক নয়।

শরিয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা–

১. কাজটি গুনাহ, আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে, সে আখেরাতে শাস্তিযোগ্য এবং দুনিয়াতে কাজটি বতিল বলে গণ্য হবে। কোনো পার্থিব বিধানও এর উপর প্রযোজ্য নয়। যেমন– কোনো মুশরিকা নারীকে কিংবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গুনাহ। ব্যভিচারী ও তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২. কাজটি হারাম। অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গুনাহ, কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফলাফল প্রকাশ পায় এবং শুদ্ধও হয়। যেমন– কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে কিংবা অপহরণ করে এনে শরিয়ত অনুযায়ী দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি (ধোঁকা ও অপহরণ) অবৈধ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। এভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করে এবং ব্যভিচার থেকে তওবা না করে; তবে তাদের এই বিবাহ হারাম। কিন্তু পার্থিব বিধানে তা বাতিল নয়।

বিবাহের শরিয়ত আরোপিত ফলাফল যেমন– ভরণপোষণ, মহর, উত্তরাধিকারস্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এভাবে আয়াতে حُرِّمَ শব্দটি মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে সঠিক। বর্ণিত অর্থে আয়াতটিকে রহিত বলার প্রয়োজন নেই।

তবে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) প্রথম তাফসীরের আলোকে বলেন, সূরা নূরের এ আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الخ. (النور : ٣٢)

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমত ও ব্যাখ্যা : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর অভিমতটি খণ্ডন করে বলেন, আয়াতটি রহিত নয়। কারণ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সৎপুরুষ ও সৎনারীর সঙ্গে তাদের বিবাহ হারাম। তবে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তওবা ছাড়াই এরূপ বিবাহ বৈধ। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ দেওয়ার ঘটনাবলি প্রমাণিত। তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ ফতোয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু এরপরও আয়াতটিকে রহিত বলা সঠিক নয়। কেননা, উল্লিখিত আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, ব্যভিচারী যেহেতু কবীরা গুনাহে লিপ্ত এবং ফাসেক, তাই সে ব্যাভিচারিণীর كُفُؤ তথা সমতুল্য সঠিক হলেও সতী নারীর كُفُؤ নয়। সুতরাং كُفُؤ তথা সমতার মেলাবন্ধন হিসেবে ব্যভিচারীর ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা উচিত। সতী নারীকে বিবাহ করা উচিত নয়। কিংবা আয়াতের অর্থ হবে যে, সৎপুরুষের জন্যে ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ হলেও উত্তম নয়। তাই উত্তম হলো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করা। আর ذلك ইসমে ইশারার مشار اليه হলো জেনা এবং শিরক; نكاح زوانى নয়। আর এগুলো (জেনা ও শিরক) যে হারাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া আল্লামা সুয়ূতী (র.) যে আয়াতকে نَاسِخ বলেছেন, অর্থাৎ, ... وَاَنْكِحُوا তা হলো عام তথা ব্যাপক অর্থবোধক। আর যে আয়াতকে রহিত বলেছেন অর্থাৎ, ... اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ তা হলো خَاصّ তথা সীমিত অর্থবোধক। আর عام দ্বারা خاص-এর نسخ হয় না। সুতরাং নসখের দাবিও সঠিক নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা যারকানী (র.) প্রমুখের মতে আয়াতটি রহিত। তবে মুহাদ্দিসে দেহলভীসহ আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, মোস্তফা যায়েদ (র.) প্রমুখের মতে আয়াতটি রহিত নয়।

❖ সাক্ষাতের জন্যে অনুমতি চাওয়া প্রসঙ্গ : কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব; চাই তা পুরুষ বা নারীর ঘর হোক, আগন্তুক পরিচিত বা অপরিচিত হোক, নিকটাত্মীয় হোক বা দূরাত্মীয় হোক, নারী বা পুরুষ সবার জন্যে তা ওয়াজিব। তদ্রূপ পরিবারের সব মাহরাম সদস্য, যারা একই বাসা-বাড়িতে বসবাস করে এবং বারংবার ঘরে আসা-যাওয়া করে এবং যাদের সামনে পর্দা করাও আবশ্যক নয়, তাদের জন্যে মুস্তাহাব হলো, ঘরে প্রবেশের পূর্বে যে কোনোভাবে সংবাদ দিয়ে প্রবেশ করা; চাই তা শব্দ করে পদচারণা কিংবা গলা খাঁকারি বা সরাসরি অনুমতি গ্রহণ করার মাধ্যমে হোক। আর এটি ত্যাগ করা মাকরূহে তানযীহি। আর এসব হলো ঘরে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু ঘরে প্রবেশের পর বিশেষ তিনটি সময়ে কারো নির্জন কক্ষে প্রবেশের জন্যে বিশেষভাবে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ الخ. (النور : ٥٨)

আলোচ্য আয়াতে ফজরের পূর্বে, দুপুর বেলা ও এশার পর যে কারো নির্জন কক্ষে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়ার জন্যে দাস-দাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, সে সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলামেলা অবস্থায় থাকতে চায়। এমনকি কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে এবং মাঝে-মধ্যে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হয়ে যায়। এ সময়ে কোনো বুদ্ধিমান বালক কিংবা ঘরের কোনো নারী বা স্বীয় সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক লোকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ, তখন সাবালকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশের প্রশ্নই আসে না। মূলত আয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বলা হলো তোমরা দাস-দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদেরকে বলে দেবে যে, তোমরা অমুক অমুক সময় অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করো না। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে দাসদাসী ও নাবালক-নাবালিকাদের সম্বোধন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গোলাম স্বীয় নারী মনিবের জন্যে মাহরাম কি না, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ফিকহবিদ বলেন, পুরুষ ক্রীতদাস মাহরাম নয়। নারী মনিবের জন্যে তার সামনে পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, পুরুষ ক্রীতদাসের জন্যে তার নারী মনিবের পশম পর্যন্ত দেখা নাজায়েজ।

আয়াতের নসখ নিয়ে মতানৈক্য : উল্লিখিত আয়াতটি রহিত কি না, এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত। কিন্তু তারা রহিতকারী উল্লেখ করেননি। আবার কারো কারো মতে আয়াতটি রহিত নয়; বরং অরহিত। তবে মানুষ এর উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র.) আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তিনটি আয়াতের উপর আমল করা লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো অনুমতি চাওয়া সংক্রান্ত আয়াত– لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ; এতে আত্মীয়স্বজন, অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আয়াতটি সর্ম্পকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আয়াতটি রহিত নয়। অতঃপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, এটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম দিকে মানুষের ঘরের দরজা-জানালার পর্দা ছিল না। আর সন্তানসন্ততি ও সেবক-সেবিকারা সহজেই ঘরে প্রবেশ করতো। যদ্দরুন তারা কোনো সময় মাতাপিতা ও মনিবের বিবস্ত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দেখে ফেলত, এমতাবস্থায় তাদেরকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্পদ দান করেন, এতে তারা পর্দার ব্যবস্থা করে এবং মনে করে যে, এখন আর ঘরে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, আমি আমার মায়ের নিকট যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি নেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনুমতি নেবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে না। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সর্বদা তাঁর নিকটই থাকি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে না। তুমি কী তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, এজন্যেই অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। কারণ, ঘরে কোনো প্রয়োজনে তাঁর অপ্রকাশযোগ্য কোনো অঙ্গ বিবস্ত্র থাকতে পারে।

❖ রাসূল ﷺ-এর জন্যে সহধর্মিনীগণ ব্যতীত অন্য নারী বিবাহ করা প্রসঙ্গ : রাসূল ﷺ-এর জন্যে সহধর্মিণীগণ ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করা হালাল না হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْبًا. (الأحزاب : ٥٢)

উক্ত আয়াতে مِنْ بَعْدُ-এর অর্থ হলো– مِنْ بَعْدِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَهَّرَاتِ অর্থাৎ, আপনার বিবাহবন্ধনে যে পবিত্র সহধর্মিণীগণ রয়েছেন, তাদের ছাড়া অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্যে জায়েজ নয়।

উক্ত তাফসীরের আলোকে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আয়াতটি রহিত। তার রহিতকারী হলো নিম্নোক্ত আয়াত–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللّٰاتِيْ آتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّٰاتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ (الأحزاب : ٥٠)

মোটকথা, উক্ত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সারমর্ম হলো, বর্তমান সহধর্মিণীর তালিকায় নতুন কোনো মহিলাকে যুক্ত করতে এবং একজনকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর অভিমত সমর্থন করে বলেন, নাসেখ-মানসূখের মধ্যে নাসেখ তেলাওয়াতের মধ্যে কোনো সময় আগে হতে পারে। কেননা, নাসেখের জন্যে অবতরণের ক্ষেত্রে পরে হওয়া আর মানসূখের জন্যে পূর্বে হওয়া আবশ্যক। নাসেখের জন্যে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে পরে হওয়া আবশ্যক নয়। আর এটাই আমার মতে অধিক সুস্পষ্ট।

তবে অধিকাংশ মুফাসসির ..... لَا يَحِلُّ لَكَ আয়াতকে রহিত আর ..... اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ আয়াতকে রহিতকারী মনে করেন না; বরং তাঁরা উভয় আয়াতকে অরহিত বলে থাকেন। তাঁরা من بعد-এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে مِنْ بَعْدِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُوْرَةِ; তখন আয়াতের অর্থ হবে, যত মহিলা ..... اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ আয়াতের মাধ্যমে আপনার জন্যে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, তারা ব্যতীত অন্য নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্যে বৈধ নয়। এ তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে مِنْ بَعْد-এর মাধ্যমে কোনো নতুন বিধান প্রবর্তন করা হয়নি; বরং পূর্বোক্ত বিধানেরই ..... اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। তাই এ আয়াতের কারণে নয়জন পবিত্র সহধর্মিণী গ্রহণ করার পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়নি; বরং মুমিন নয় এবং মুমিন হলেও হিজরত করেনি এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তখনকার সময়ে হিজরত করা ফরজ ছিল। আর মুসলমান হওয়া-না হওয়া এবং মুসলমান থাকা-না থাকা ছিল হিজরতের উপর নির্ভরশীল। তাই রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার জন্যে হিজরত ছিল অপরিহার্য শর্ত। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য; অন্যদের বেলায় এরূপ শর্ত ছিল না। আর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ-এর অর্থ হবে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও বৈধ; কিন্তু এটি বৈধ নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তাঁর স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করবেন। তবে পরিবর্তনের নিয়ত ব্যতীত প্রয়োজনবোধে যতটা ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ নয়জন ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতেও আয়াতটি রহিত; তবে আল্লামা ইবনুল জাওযী ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতে রহিত নয়।

❖ **রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎকালে সদকা করা প্রসঙ্গ :** রাসূল ﷺ গণশিক্ষা ও জনসংস্কারমূলক কাজে রাতদিন ব্যস্ত থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহের লোকজন তাঁর মহামূল্যবান বাণী শুনে উপকৃত হতো। এরপরও কোনো লোক একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাইলে; তিনি তাকে পৃথকভাবে সময় দিতেন। এ সুযোগে মুনাফিকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা একনিষ্ঠ মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর নিকট একান্ত গোপনে কথা বলার জন্যে সময় প্রার্থনা করতো এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। এতে প্রকৃত মুসলমানগণ খুবই কষ্ট পেত। অপরদিকে কিছু খাঁটি অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা দীর্ঘ করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করে ফেলতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গোপন কথাবার্তা ও সাক্ষাতের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার জন্যে তাদের আদেশ দিয়ে বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً الخ (المجادلة : ١٢)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আয়াতটি রহিত। যার রহিতকারী হলো পরবর্তী এ আয়াতটি–

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا الخ. (المجادلة : ١٣)

আয়াতটি রহিত হওয়ার ব্যাপারে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অভিমতও তা–ই। তবে মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেন, প্রথমে সদকা করা ওয়াজিব ছিল। অতঃপর সদকা দেওয়া-না দেওয়ার মধ্যে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছে; তাই বিষয়টি এখন মুস্তাহাব। সুতরাং এখানে শুধু وصف তথা ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে; যা মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় রহিত হলেও মুতায়াখখিরীনের পরিভাষায় রহিত নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা সুয়ূতী (র.)-সহ আল্লামা যারকানী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব, আল্লামা ইবনুল জাওযী ও মোস্তফা যায়েদ (র.)-এর মতেও আয়াতটি রহিত।

❖ **মুহাজির স্ত্রীদের-মহর প্রদান :** হোদায়বিয়া সন্ধির প্রাকালে কুফরি বিবাহ ভঙ্গের কোনো শরয়ী কারণ হিসেবে বিবেচিত ছিল না। অর্থাৎ, একজন মুসলমানের স্ত্রী হিসেবে একজন কাফের মহিলা কিংবা একজন মুসলিম নারীর স্বামী হিসেবে একজন কাফের পুরুষের দাম্পত্য জীবযাপনের ক্ষেত্রে শরয়ী কোনো বিধান ছিল না। এরপর হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, যদি কোনো লোক মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসে, তা হলে মুসলমানগণ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। আর মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে আসলে, মক্কার কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। সুতরাং কিছু লোক যখন মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসে, তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে শর্ত অনুযায়ী প্রত্যার্পণ করেন। এরপর কিছু বিবাহিত মুসলিম মহিলাও মদিনায় চলে আসে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফেরত না দেওয়ার নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهَاجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ الخ. (الممتحنة : ١٠)

আয়াতের মর্মার্থ হলো, মক্কা থেকে মদিনায় আগত মুসলিম নারীরা যদি বাহ্যিক ঈমানী পরীক্ষায় মুসলিম প্রমাণিত হয়, তা হলে তোমরা তাঁদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দিও না। কারণ, তাঁরা দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে কাফের স্বামীদের জন্যে এখন থেকে আর বৈধ নয়। তবে তাঁদের স্বামীরা মহর হিসেবে তাঁদের পিছনে যা ব্যয় করেছে; তোমরা তা চাঁদা তুলে কিংবা বায়তুলমাল থেকে তাদের স্বামীদেরকে দিয়ে দাও। এভাবে তোমাদের কাফের স্ত্রীরাও তোমাদের জন্যে এখন থেকে আর বৈধ নয়। সুতরাং তোমরা তাদের পিছনে মহর হিসেবে যে অর্থ ব্যয় করেছ, তা মক্কার কাফেরদের থেকে আদায় করে নাও। যখন এ বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানগণ উভয় আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু মক্কার কাফেররা নিতে প্রস্তুত হলেও আদায় করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন–

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ الخ. (الممتحنة : ١١)

উক্ত আয়াতের মর্ম হলো, যদি কাফেররা তোমাদের স্ত্রীদের মহর না দেয়, তাহলে তোমরাও তাদের স্ত্রীদের মহর দিয়ো না। আর তাদের মহরের অংশ ঐসব মুসলমানদেরকে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রীরা এখনো কাফের রয়েছে। তবে মুসলমানদেরকে কাফেরদের মহরের পূর্ণ অংশ দিয়ো না; শুধু এ পরিমাণ দাও; যে পরিমাণ মুসলমানগণ তাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট অংশ কাফেরদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। অর্থাৎ, এ হুকুমটি কেসাস ও প্রতিশোধমূলক ছিল।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত নয়। তবে আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও আল্লমা ইবনুল জাওযী (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত।

আয়াতটি منسوخ তথা রহিত নাকি محكم তথা অরহিত, এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানসূখ। আবার কেউ কেউ বলেন, মুহকাম, যাঁরা মানসূখ বলে মত পোষণ করেন, তাঁরা নাসেখের ব্যাপারেও দ্বিমত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, নাসেখ হচ্ছে জিহাদের আয়াত– قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً الخ. (التوبة : ٣٦)

অর্থাৎ, এখন কাফেরের মুসলমান স্ত্রী মদিনায় আসার অপেক্ষা করা এবং তাদের মহর আটকে রেখে নিজেদের কাফের স্ত্রীর মহর আদায় করার জন্যে কোনো প্রকার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই; বরং জিহাদের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের হক আদায় করে নাও। আর কেউ কেউ বলেন, নাসেখ হচ্ছে গনিমতের এই আয়াত–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى الخ. (الأنفال : ٤١)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কার স্ত্রী-পরিত্যক্ত মুহাজির স্বামীদেরকে গনিমত থেকে অংশ দেওয়া হতো। এরপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, এতে গনিমত-স্বত্বাধিকারীদের তালিকা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, মোট পঞ্চমাংশের চার অংশ মুজাহিদরা ভোগ করবে, আর পঞ্চমাংশ যারা ভোগ করবে, তাদের মধ্যে কাফের স্ত্রী-পরিত্যক্ত স্বামীদের কথা উল্লেখ নেই। অতএব এখন থেকে তারা আর অংশ পাবে না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, আমার মতে আয়াতটি محكم তথা অরহিত। তবে বর্ণিত হুকুমটি সর্বযুগের জন্যে প্রযোজ্য নয়; বরং কাফেররা যখন শক্তিশালী আর মুসলমানগণ দুর্বল-অসহায় অবস্থায় থাকে অথবা মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে, তখন তা প্রযোজ্য হবে।

তাহাজ্জুদ নামাজের বিধান : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ ও সমস্ত উম্মতের উপর তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। এমনকি রাতের পূর্ণ এক-চতুর্থাংশ সময় নামাজ পড়তেন; যাকে قِيَامُ اللَّيْلِ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا، نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا. (المزمل : ١-٤)

উক্ত নির্দেশ পালনার্থে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাতের বেশির ভাগ সময় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। ফলে তাদের পা দুটি ফুলে যেত। পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এ সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْه অর্থাৎ, কাজেই কুরআনের যে পরিমাণ তোমাদের জন্যে সহজ, সে পরিমাণ তেলাওয়াত করো। এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাজে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে বলা হয়, যতক্ষণ নামাজ পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামাজ পড়াই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। অতঃপর মিরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের নির্দেশও রহিত হয়ে যায়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে উক্ত সূরার শেষাংশ অর্থাৎ, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْه রহিত হওয়ার দাবি প্রমাণহীন। কারণ, তাহাজ্জুদের নামাজ যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে বলবৎ ছিল, সেভাবে তা আজও বলবৎ রয়েছে। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার মাধ্যমে তাহাজ্জুদ নামাজের বৈধতা রহিত হয়নি। আর এ কথাও বলা সঠিক নয় যে, সূরার প্রথমাংশ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا-এর মাধ্যমে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْه-এর মাধ্যমে রহিত হয়েছে। কারণ, সূরার প্রথমে قِيَامُ اللَّيْلِ তথা রাত্রি জাগরণ ফরজ হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রি জাগরণ (قِيَامُ اللَّيْلِ) মুস্তাহাব হুকুমের প্রতি তাকিদ এসেছে। আর সূরার শেষাংশে উক্ত তাকিদ রহিত করে শুধু মুস্তাহাব অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। সুতরাং তা হলো হুকুমটির গুণগত পরিবর্তন। এতে মূল বিধান শেষ হয়ে যায়নি। এটা মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় রহিত হলেও মুতায়াখখিরীনের পরিভাষায় রহিত নয়। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনুল জাউযী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবূ তালিব ও আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতেও আয়াতটি রহিত।

উক্ত আয়াতের মর্ম হলো, যদি কাফেররা তোমাদের স্ত্রীদের মহর না দেয়, তাহলে তোমরাও তাদের স্ত্রীদের মহর দিয়ো না। আর তাদের মহরের অংশ ঐসব মুসলমানদেরকে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রীরা এখনো কাফের রয়েছে। তবে মুসলমানদেরকে কাফেরদের মহরের পূর্ণ অংশ দিয়ো না; শুধু এ পরিমাণ দাও; যে পরিমাণ মুসলমানগণ তাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট অংশ কাফেরদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। অর্থাৎ, এ হুকুমটি কেসাস ও প্রতিশোধমূলক ছিল।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত নয়। তবে আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবী তালিব ও আল্লমা ইবনুল জাওযী (র.)-এর মতে আয়াতটি রহিত।

আয়াতটি منسوخ তথা রহিত নাকি محكم তথা অরহিত, এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানসূখ। আবার কেউ কেউ বলেন, মুহকাম, যাঁরা মানসূখ বলে মত পোষণ করেন, তাঁরা নাসেখের ব্যাপারেও দ্বিমত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, নাসেখ হচ্ছে জিহাদের আয়াত– قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً الخ. (التوبة : ٣٦)

অর্থাৎ, এখন কাফেরের মুসলমান স্ত্রী মদিনায় আসার অপেক্ষা করা এবং তাদের মহর আটকে রেখে নিজেদের কাফের স্ত্রীর মহর আদায় করার জন্যে কোনো প্রকার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই; বরং জিহাদের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের হক আদায় করে নাও। আর কেউ কেউ বলেন, নাসেখ হচ্ছে গনিমতের এই আয়াত–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى الخ. (الأنفال : ٤١)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কার স্ত্রী-পরিত্যক্ত মুহাজির স্বামীদেরকে গনিমত থেকে অংশ দেওয়া হতো। এরপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, এতে গনিমত-স্বত্বাধিকারীদের তালিকা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, মোট পঞ্চমাংশের চার অংশ মুজাহিদরা ভোগ করবে, আর পঞ্চমাংশ যারা ভোগ করবে, তাদের মধ্যে কাফের স্ত্রী-পরিত্যক্ত স্বামীদের কথা উল্লেখ নেই। অতএব এখন থেকে তারা আর অংশ পাবে না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, আমার মতে আয়াতটি محكم তথা অরহিত। তবে বর্ণিত হুকুমটি সর্বযুগের জন্যে প্রযোজ্য নয়; বরং কাফেররা যখন শক্তিশালী আর মুসলমানগণ দুর্বল-অসহায় অবস্থায় থাকে অথবা মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে, তখন তা প্রযোজ্য হবে।

তাহাজ্জুদ নামাজের বিধান : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ ও সমস্ত উম্মতের উপর তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। এমনকি রাতের পূর্ণ এক-চতুর্থাংশ সময় নামাজ পড়তেন; যাকে قِيَامُ اللَّيْلِ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا، نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا. (المزمل : ١-٤)

উক্ত নির্দেশ পালনার্থে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাতের বেশির ভাগ সময় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। ফলে তাদের পা দুটি ফুলে যেত। পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এ সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْه অর্থাৎ, কাজেই কুরআনের যে পরিমাণ তোমাদের জন্যে সহজ, সে পরিমাণ তেলাওয়াত করো। এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাজে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে বলা হয়, যতক্ষণ নামাজ পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামাজ পড়াই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। অতঃপর মিরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের নির্দেশও রহিত হয়ে যায়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে উক্ত সূরার শেষাংশ অর্থাৎ, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْه রহিত হওয়ার দাবি প্রমাণহীন। কারণ, তাহাজ্জুদের নামাজ যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে বলবৎ ছিল, সেভাবে তা আজও বলবৎ রয়েছে। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার মাধ্যমে তাহাজ্জুদ নামাজের বৈধতা রহিত হয়নি। আর এ কথাও বলা সঠিক নয় যে, সূরার প্রথমাংশ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا-এর মাধ্যমে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْه-এর মাধ্যমে রহিত হয়েছে। কারণ, সূরার প্রথমে قِيَامُ اللَّيْلِ তথা রাত্রি জাগরণ ফরজ হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রি জাগরণ (قِيَامُ اللَّيْلِ) মুস্তাহাব হুকুমের প্রতি তাকিদ এসেছে। আর সূরার শেষাংশে উক্ত তাকিদ রহিত করে শুধু মুস্তাহাব অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। সুতরাং তা হলো হুকুমটির গুণগত পরিবর্তন। এতে মূল বিধান শেষ হয়ে যায়নি। এটা মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় রহিত হলেও মুতায়াখখিরীনের পরিভাষায় রহিত নয়। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনুল জাউযী, আল্লামা নাহহাস, আল্লামা মাক্কী ইবনে আবূ তালিব ও আল্লামা যারকানী (র.)-এর মতেও আয়াতটি রহিত।

❖ أَقْسَامُ الْمُعْجِزَةِ

মু'জিযার প্রকারভেদ : মু'জিযা দুই প্রকার। যথা–

এক. مُعْجِزَة حِسِّيَّة তথা ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মু'জিযা : যেসব মু'জিযা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাতি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা অনুভূত হয়, তাকে مُعْجِزَة حِسِّيَّة বলা হয়। যেমন–

ক. মহানবী ﷺ-এর আঙ্গুলের ইশরায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

খ. বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাঁদের পূর্বেকার নবীগণের মু'জিযাসমূহ ছিল حسية তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। যেমন–

১) হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– نَاقَةُ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا

২) হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠ।

৩) হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সকল প্রাণীর ভাষাজ্ঞান জানা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

৪) হযরত ঈসা (আ.)-এর ভূমিষ্ঠের পর কথোপকথন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِيْ الْمَهْدِ وَكَهْلًا

৫) হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى قَالَ هِيَ عَصَايَ

দুই. معجزة عقلية তথা বিবেকপ্রসূত মু'জিযা : معجزة عقلية ঐ মু'জিযাকে বলা হয় যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায় না; বরং বিবেক দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়। যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অধিকাংশ মু'জিযাই ছিল عقلى তথা বিবেক বোধগম্য। যাতে করে জ্ঞানবান লোকেরা উক্ত معجزة-কে প্রত্যেক যুগে দেখতে পায় এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে। মহানবী ﷺ এ সম্পর্কে বলেন–

مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ اِلَّا قَدْ اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ - وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوْتِيْتُهٗ وَحْيًا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيَّ فَارْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

❖ بَيَانُ وُجُوْهِ الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআনে ইজাযের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা : কুরআনের মাঝে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ইজায রয়েছে, সে সম্পর্কে কতিপয় মনীষীর উক্তি বর্ণনা করা হলো–

১. ইজাযুল কুরআন প্রণেতা বলেন– اَلْقُرْآنُ بَدِيْعُ النَّظْمِ وَعَجِيْبُ التَّأْلِيْفِ

২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন– اَلْفَصَاحَةُ وَغَرَابَةُ الْأُسْلُوْبِ وَالسَّلَامَةِ فِيْ جَمِيْعِ الْعُيُوْبِ

৩. কামালুদ্দীন ইবনে যামলাকানী (র.) বলেন–

وَجْهُ الْإِعْجَازِ رَاجِعٌ إِلَى التَّأْلِيْفِ الْخَاصِّ بِهٖ لَا مُطْلَقِ التَّأْلِيْفِ وَهُوَ بِأَنِ اعْتَدَلَتْ مُفْرَدَاتُهٗ تَرْكِيْبًا وَ زِنَةً.

৪. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা (র.) বলেন– بِنَظْمِهٖ وَصِحَّةِ مَعَانِيْهِ وَتَوَالِي فَصَاحَةِ أَلْفَاظِهٖ إِعْجَازُهٗ

৫. কারো কারো মতে, সকল বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং মানুষের শক্তিসামর্থ্যের বাইরে অদৃশ্য বিষয়সমূহ এবং সূক্ষ্ম ভাবসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৬. কেউ কেউ মনে করেন, প্রারম্ভিকা ও সমাপ্তিকার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও উত্তম বিশেষত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা।

তা ছাড়া কুরআনুল কারীমে মোট কত ধরনের ইজায আছে, সে ব্যাপারেও আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে–

১) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ও ইবনুল আরাবী (র.)-এর মতে, কুরআনুল কারীমের ইজাযের পদ্ধতি চারটি।

২) আল্লামা ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ও আল্লামা রুম্মানী (র.)-এর মতে, দুটি।

৩) আল্লামা যারকাশী (র.)-এর মতে, চৌদ্দটি।

৪) শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর মতে, পাঁচটি।

৫) আবূ বকর বাকিল্লানী (র.)-এর মতে, তিনটি।

৬) আল্লামা ইবনে হিশাম (র.)-এর মতে ছয়টি।

৭) ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে, দশটি।

নীচে আল কুরআনুল কারীমের ইজাযের কতিপয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো–

১. **অনন্য বর্ণনাশৈলী :** কুরআনের বিস্ময়কর শব্দাকৃতি, তার দুর্লভ পদ্ধতিসমূহ ও আশ্চর্যজনক ছন্দসমূহ আরবদের বাক্যের নিয়মনীতির পরিপন্থি। এটাও কুরআনের মু'জিযা। এ সম্পর্কে কাজী ইয়ায (র.) বলেন–
صُوْرَةُ نَظْمِهِ الْعَجِيْبِ وَاُسْلُوْبِهِ الْغَرِيْبِ وَالْمُخَالِفُ لِأَسَالِيْبِ كَلَامِ الْعَرَبِ.

২. **ভবিষ্যৎ বিষয়ের আলোচনা :** কুরআনে এমন কিছু অজানা ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ উল্লেখ করা হয়, যা ইতঃপূর্বে কখনো সর্বজনবিদিত ছিল না। কুরআনের এ বর্ণনার পর অনুরূপ ঘটনারই প্রমাণ পাওয়া গেছে।
যেমন ইয়ায (র.)-এর বাণী– اَلْإِخْبَارُ بِالْمُغِيْبَاتِ وَلَمْ تَكُنْ فَوُجِدَتْ كَمَا أُخْبِرَ
যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

৩. **অতীত সম্প্রদায়ের সংবাদ :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মু'জিযাই অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করছে। যেমন কাজী ইয়ায (র.) বলেন–
اَلْأَنْبِيَاءُ بِالْقُرُوْنِ السَّالِفَةِ وَالْأُمَمِ الْبَائِدَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّاثِرَةِ مَعَ كَوْنِ مَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أُمِّيًّا لَا يَقْرَءُ وَلَا يَكْتُبُ وَهِيَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ مِنْهَا الْقِصَّةُ الْوَاحِدَةُ إِلَّا طَفِيْفٌ مِّنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

৪. **সমকালীন আরবজাতিকে অক্ষম করে দেওয়া :** আল কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে তার অনুরূপ সামান্য একটি আয়াত রচনা করতে চরমভাবে অক্ষম করে দিয়েছে। যার প্রমাণ হলো কুরআন মাজীদ অবতরণকালে আরবের শ্রেষ্ঠতম আরবি ভাষাবিদ ও কবিগণ কুরআনের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেনি। এমন কি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম কবি ও ভাষাবিদ লাবীদ কা'বা শরীফের দেয়ালে সূরা 'কাওসার'-এর মতো ছোট একটি সূরা দেখে তার অনুরূপ রচনায় অক্ষম হয়ে বলেছিল– لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ

৫. **চ্যালেঞ্জ ঘোষণা :** আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) কুরআনের মু'জিযার একটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তা হলো, তৎকালীন আরবরা ভাষাশৈলী ও কাব্যপ্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও আল কুরআনকে অস্বীকার করতো। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করার জন্যে চ্যালেঞ্জ করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী– فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ

৬. **সাবলীল বর্ণনায় গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্মার্থ :** কুরআনের ভাষা অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সাবলীল। একজন কচি শিশুও সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে পারে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সাধনা চালিয়েও তার তলদেশে পৌঁছা যায় না।

৭. **অনুপম রূপ :** কুরআন মাজীদের আলৌকিকত্বের একটি রূপ হলো বিস্ময়কর শব্দ, গ্রন্থনারীতি ও অনুপম বাচনভঙ্গি, যা আরবদের কথোপকথনের পদ্ধতিসমূহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এমনকি পৃথিবীর কোনো পণ্ডিতই এরূপ অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী রচনায় সক্ষম হয়নি।

৮. **কাফের-মুশরিকদের আকর্ষণ :** কুরআন মাজীদের শত বিরোধিতা করার পর আবূ জেহেলের মতো শীর্ষস্থানীয় কাফের নেতা পর্যন্ত কাবার দেয়ালে কান লাগিয়ে মর্মস্পর্শী কুরআনের তেলাওয়াত শুনত। এতে প্রমাণ হয়, কুরআনের প্রতি কাফের-মুশরিকদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী–
لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ.

৯. **সকল জ্ঞানের উৎস :** আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ, কুরআনে আমি কোনো কিছুই বাদ দিইনি। ড. মরিস বুকাইলি -এর একটি মন্তব্য যথার্থই মনে হয়– The Quran will be regarded as an academy of science for the scientistic, a lexicon for etymologist, a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and encyclopedia of laws and legislation.

১০. **সন্দেহাতীতভাবে সংরক্ষিত ও সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ :** আল কুরআন সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন– ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ; অনেক ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়েছে; কিন্তু কুরআন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। কোটি কোটি হাফেজ একে মুখস্থ রাখেন। এত বেশি পঠিত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই। এভাবে আল্লাহই এটি সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ

১১. **প্রাচীন জাতির বর্ণনা :** মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি। পৃথিবীর কারো কাছে তিনি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতির করুণ পরিণতির সংবাদ প্রদান করেছেন, যা কুরআনের একটি বিশেষ মু'জিযা।

১২. **বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা ও বিষয়বস্তুর গভীরতা :** কুরআন আকারে বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যে মানবতার যাবতীয় সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। এটা কুরআনের একটি বড় ধরনের অলৌকিকতা।

১৩. **কাফেরদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ :** এ মহাগ্রন্থে আরবের মুনাফিক, কাফের ও মুশরিকদের সকল গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে, যা তার অলৌকিকতার প্রমাণ বহন করে।

১৪. **ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থা প্রকাশ :** আল কুরআন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাস্তবরূপ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, যা তার মু'জিযা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১৫. **বিরক্ত উদ্রেককারী না হওয়া :** আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ যাকে বার বার পাঠ করলেও হৃদয়ের আকর্ষণ কমে না; বরং যত বেশিই পাঠ করা হয় ততই আগ্রহ বাড়তে থাকে। পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থে এরূপ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় না। এটা কুরআনের চিরন্তন একটি মু'জিযা।

১৬. **মানুষের অন্তরের অবস্থার বিবরণ :** আল কুরআনে মানুষের অন্তরের লুক্কায়িত বিষয় সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য ও বাস্তব।

❖ أَقَلُّ مِقْدَارِ الْقُرْآنِ لِثُبُوْتِ الإِعْجَازِ

আলৌকিকতা সাব্যস্তের জন্যে কুরআনের সর্বনিম্ন পরিমাণ : কুরআন মাজীদ মহানবী ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কুরআনের কতটুকু অংশ মুজিযা হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এর পরিসীমা কী? এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

ক. **মু'তাযিলাদের অভিমত :** মু'তাযিলাদের মতে, কুরআনের মু'জিযা হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, একটি পরিপূর্ণ সূরা। আয়াত যত বড়ই হোক, তা মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

দলিল : তাঁদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী– فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ অর্থাৎ, (যদি তোমরা সক্ষম হও) তবে কুরআনের অনুরূপ 'সূরা' নিয়ে এসো এবং তোমাদের সাক্ষীদের আহ্বান করো।

খ. **আবুল হাসান আশা'আরী (র.)-এর অভিমত :** আবুল হাসান আশ'আরী (র.)-এর মতে, মু'জিযা হওয়ার জন্যে কুরআনের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা বা তৎসম পরিমাণ আয়াত। চাই সেটা ছোট-বড় যে পরিমাণেরই হোক না কেন, তা মু'জিযা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

দলিল : আরবের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাষাবিদ লাবীদ কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ সূরা 'কাউসার'-এর মতো ছোট একটি সূরা রচনায় অক্ষম হয়ে বলেছিল– لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটা কোনো মানুষের ভাষা নয়। অতএব প্রমাণ হলো, কুরআনের ছোট একটি অংশও এর মু'জিযা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

বিরোধীদের দলিলের জবাব : মু'তাযিলাদের দলিলের উত্তরে ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী (র.) বলেন, একটি সূরা বা তার কিয়দংশ তৈরিতেই আরবদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে, কুরআনের যে কোনো অংশই সর্ববৃহৎ সূরা আল বাকারার মতো মু'জিযা, যদিও এর মধ্যে কোনো অংশের মু'জিযা স্পষ্ট এবং কোনো অংশের মু'জিযা দুর্বোধ্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

অতএব, কুরআনের কোনো একটি অংশ মু'জিযা হওয়ার দ্বারা কুরআনের প্রত্যেকটি অংশ মু'জিযা হওয়া প্রমাণিত। যেমন আমরা কুরআনের কোনো কোনো আয়াতকে রোগমুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী বললেও مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতাংশের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কুরআনকেই রোগমুক্তির উপায় মনে করি; নচেৎ কুরআনের কতেক মানা আর কতেক না মানার মতো হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ অর্থাৎ, তোমরা কি কুরআনের কিয়দংশ মানবে আর কিয়দংশ অস্বীকার করবে?

অতএব প্রমাণ হলো যে, কুরআনের একটি ছোট সূরা বা তার সমপরিমাণ আয়াতই কুরআনের মু'জিযা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

❖ مَرَاتِبُ تَحَدِّى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণার স্তরসমূহ : আল্লামা সাবুনী তাঁর তিবইয়ান গ্রন্থে কুরআনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণাকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. **اَلتَّحَدِّى الْعَامّ তথা সাধারণ চ্যালেঞ্জ :** প্রথমত আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ কুরআনের অনুরূপ আনয়নের জন্যে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এর দ্বারা তিনি আরব-অনারব, মুমিন-কাফের, মানব ও জিন সকলকেই সম্বোধন করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সকল সৃষ্টজীবকে চ্যালেঞ্জ করার পর কুরআন আনয়নের ব্যাপারে তাদের অক্ষমতারও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২. اَلتَّحَدّى الْخَاصّ তথা বিশেষ চ্যালেঞ্জ : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেন বিশেষ করে কুরাইশ কাফেরদেরকে। কেননা, তারা তৎকালীন সময়ে নেতৃত্বের আসনে এবং সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন। কুরআনে তাদেরকে তিন প্রকারের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যথা–

ক. পূর্ণাঙ্গ চ্যালেঞ্জ : আল্লাহ তা'আলা আরবদের পূর্ণ কুরআনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে বলেন–

١- فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ.

অর্থাৎ, তাহলে যেন তার অনুরূপ বাণী আনয়ন করে, যদি তারা তাদের কথায় সত্যবাদী হয়।

٢- قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ.

খ. দশটি সূরার দ্বারা আংশিক চ্যালেঞ্জ : পূর্ণাঙ্গ কুরআনুল কারীমের চ্যালেঞ্জে বিশ্ববাসী বিশেষ করে আরবদের অপারগতার পর তাদেরকে দশটি সূরা আনয়নের মাধ্যমে আংশিক চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ.

গ. একটি সূরার দ্বারা আংশিক চ্যালেঞ্জ : কুরআনে আরবদের একটি সূরা আনয়নের চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, তারা কি বলে, তিনি এটা রচনা করেছেন? বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ.

এ আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টই বলেছেন, "তারা কখনো পারবে না।"

আল্লামা কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا অর্থাৎ, তারা অতীতে কখনো সক্ষম হয়নি। আর وَلَنْ تَفْعَلُوْا অর্থাৎ, তারা ভবিষ্যতেও কখনো এর মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না।

কুরআনের ইজায সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায়, নবী করীম ﷺ আরবদের সামনে একটি নতুন দীন উপস্থাপন করেন। তাদের প্রতিমাসমূহ ও আকিদা-বিশ্বাসকে অসার প্রমাণ করেন এবং তাদের প্রতিমাগুলোকে মানুষের সামনে হাস্যাস্পদ করে তুলে ধরেন। এরপর তিনি তাদের তাঁর অনুসরণ করতে এবং তাঁকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানান। তিনি তাঁর নবুয়তের পক্ষে দলিল হিসেবে আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন পেশ করেন এবং বলেন, "আমার এ দাবিকে তোমরা স্বীকার না করলে কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করো।" এ চরম প্রয়োজনের মুহূর্তেও তারা তাদের অপারগতা প্রমাণ করে কুরআনের মুকাবিলা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও অক্ষম।

আর এ চ্যালেঞ্জ যুগের পর যুগ আবহমানকাল তথা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং কেউই অনুরূপ কুরআন বা সামান্য কিছু তৈরির চেষ্টা করেও পারবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

❖ مُعْجِزَاتُ الْقُرْآنِ مُسْتَمِرَّةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কুরআনের মু'জিযা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে : এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট দলিল রয়েছে। যেমন- মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম সর্বযুগে সকল জিন ও ইনসানের জন্যে সাধারণ ও ব্যাপক মু'জিযা। এটা কেয়ামত পর্যন্ত মু'জিযা স্বরূপ থাকবে। অর্থাৎ, সকল মাখলুক তার মোকাবিলা করতে অক্ষম হবে। এ সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। নীচে কতিপয় উল্লেখ করা হলো–

১. আল্লাহ তা'আলা যেমনি অবিনশ্বর, তাঁর কালাম কুরআনও তেমনি অবিনশ্বর। সুতরাং কুরআন সর্বযুগের সকল মানবদানব তথা মাখলুকাতের জন্যে ব্যাপক মু'জিযা।

২. আল্লাহ তা'আলা নিজেই উক্ত কুরআনের হেফাজত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ তা'আলা) উক্ত নসিহত (কুরআন) বাণী অবতরণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত কুরআনকে বিকৃত করা এবং এর মোকাবিলা করা থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হেফাজত করবেন। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত তাকে কেউ ধ্বংস কিংবা মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে না।

৩. মহানবী ﷺ যে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ তথা সর্বশেষ নবী এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে না, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ- মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন- اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِى অর্থাৎ, আমি হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে না। অনুরূপভাবে অনেক হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা রাসূল ﷺ শেষ নবী এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুয়ত স্থায়ী থাকবে বলে প্রমাণিত। বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন অদ্যাবধি হুবহু নিখুঁতভাবে বিদ্যমান। এ পর্যন্ত কেউই এ কুরআনের মোকাবিলা করতে পারেনি।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন রাসূল ﷺ-এর উপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল আজও অবিকৃত অবস্থায় ঐরূপই বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি আয়াত, একটি শব্দ কিংবা একটি অক্ষরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি বা কেউ বিকৃত করতে পারেনি। আর কেয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

৪. তিনি যে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রাসূলরূপে প্রেরিত, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ يٰا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

সুতরাং এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, রাসূল ﷺ সমগ্র জাহানের সকলের জন্যে সর্বযুগের রাসূল। আর কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত মু'জিযা।

৫. কুরাআন যে কেয়ামত পর্যন্ত মু'জিযা, এ কুরআনের মোকাবিলা যে কেয়ামত পর্যন্ত কেউ করতে পারবে না, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে মানবজাতি! আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট যা অবতরণ করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, তা আমার বাণী নয়, তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা তোমরা তৈরি করে নিয়ে এসো। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে একত্র করে যৌথভাবে চেষ্টা করো, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল মানব-দানব তথা সমস্ত সৃষ্টজীবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অতঃপর যখন তারা অপারগ হলো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন-

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা এ কুরআনের মোকাবিলা করতে পারবে না এবং তোমরা অপারগ। কেননা, এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং তা মু'জিয বা অকাট্য দলিল। আর আলোচ্য আয়াতে وَلَنْ تَفْعَلُوْا বলে কুরআনকে কেয়ামত পর্যন্ত মু'জিযা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনটি আল্লামা মুস্তফা সাদেক রাফেয়ী (র.) বলেন-

وَهِىَ لَنْ تَفْعَلُوْا كَلِمَةٌ يَسْتَحِيْلُ أَنْ تَكُوْنَ إِلَّا مِنَ اللّٰه وَلَا يَقُوْلُهَا عَرَبِىٌّ فِى الْعَرَب أَبَدًا - وَقَدْ سَمِعُوْهَا وَاسْتَقَرَّتْ فِيْهِمْ وَدَارَتْ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَعَرَفُوْا أَنَّهَا تُنْفِىْ عَنْهُمُ الدَّهْرَ نَفْيًا وَتُعْجِزُهُمْ اٰخِرَ الْأَبَدِ.

৬. ইমাম আবূ বকর আল-বাকিল্লানী (র.) বলেন-

أَمَّا دَلَالَةُ الْقُرْآنِ فَهِىَ مِنْ مُعْجِزَاتٍ عَامَّةٍ عَمَّتِ الثَّقَلَيْنِ وَبَقِيَتْ بَقَاءَ الْعَصْرَيْنِ وَلُزُوْمُ الْحُجَّةِ بِهَا فِىْ أَوَّلِ وَقْتٍ وُرُوْدِهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلٰى حَدٍّ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُعْلَمُ بِعَجْزِ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهٖ وَجْهُ دَلَالَتِهٖ فَيُغْنِىْ ذٰلِكَ عَنْ نَظْرٍ مُجَدَّدٍ فِىْ مُعْجِزِ أَهْلِ هٰذَا الْعَصْرِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهٖ.

৭. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন- مُعْجِزَةُ الْقُرْآنِ مُسْتَمِرَّةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের মু'জিযা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। স্থান বা কালের পরিবর্তনে কুরআনের সামান্যও পরিবর্তন ঘটবে না। কুরআন জিন ও ইনসান তথা সমগ্র জগতের সকল মাখলুকের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন মু'জিযা।

কুরআন হলো মহানবী ﷺ-এর নবুয়তের মু'জিযা বা অকাট্য দলিল এবং তা জিন ও ইনসান উভয় জাতির জন্যে মু'জিযা এবং কেয়ামত পর্যন্ত এটা মু'জিযা হিসেবে বহাল থাকবে। আর মহানবী ﷺ সর্বশেষ নবী এবং তাঁর দীন কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে।

اَلْبَحْثُ الرَّابِعُ : جَمْعُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ

চতুর্থ আলোচনা : কুরআন সংকলন

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- تَارِيْخُ جَمْعِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٢- اَلْمَشَاهِيْرُ مِنْ كُتَّابِ الْوَحْيِ
٣- اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَصْحَفِ الصِّدِّيْقِيْ وَالْمَصْحَفِ الْإِمَامِ
٤- تَرْتِيْبُ السُّوَرِ أَمْرٌ تَوْقِيْفِيٌّ أَمْ اِجْتِهَادِيٌّ؟
٥- تَرْتِيْبُ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٦- اَلْإِقْدَامُ عَلٰى تَسْهِيْلِ التِّلَاوَةِ
٧- طَبَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

বিশ্বমানবের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অমূল্য দান হচ্ছে আল কুরআন। এটি মুসলিম উম্মাহর জীবনপথের নির্দেশিকা। এ কিতাব অন্যান্য আসমানি কিতাবের মতো একই সাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ মহানবী ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবতরণের কারণে এর সংরক্ষণ ও সংকলনের স্বতন্ত্র ইতিহাস তৈরি হয়।

❖ تَارِيْخُ جَمْعِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন সংকলনের ইতিহাস : রাসূল ﷺ-এর যুগ : মহানবী ﷺ-এর যুগে দুটি পদ্ধতিতে কুরআন সংরক্ষণ করা হয়েছে। যথা–

ক. **মুখস্থকরণের মাধ্যমে :** কুরআন নাযিলের সাথে সাথে মহানবী ﷺ তা মুখস্থ করে রাখতেন এবং সাহাবীগণকেও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ পেয়ে সাহাবীগণও কুরআন মুখস্থ করতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী– لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ রাসূল ﷺ কুরআন মুখস্থ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। রাসূল ﷺ প্রতি রমজানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কুরআন শোনাতেন। তা ছাড়া সাহাবীদের মাঝেও কুরআন মুখস্থ করার প্রবল আগ্রহ ছিল।

খ. **লিখে রাখার মাধ্যমে :** মহানবী ﷺ-এর যুগে কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি তা লিপিবদ্ধও করা হতো। রাসূল ﷺ ওহী নাযিল হওয়ার পর লিখে রাখার জন্যে একদল সাহাবী নিযুক্ত করেছিলেন। তারা كَاتِبُ الْوَحْيِ (ওহী লেখক) হিসেবে প্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ-এর যুগে বর্তমান সময়ের মতো মুদ্রণযন্ত্র ছিল না। মানুষ বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখে রাখত। এমনকি খেজুর পাতা, বিভিন্ন কাঠের ফলক, উটের চেপটা হাড়, পাতলা চামড়া বা গাছের বাকলের উপরও লেখা হতো। এছাড়া পাথর বা কাপড়ও লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো। অবশ্য সে যুগে সুবিন্যস্তভাবে গোটা কুরআন একসাথে লিপিবদ্ধ ছিল না। একই স্থানে একই মানের বস্তুতে পুরো কুরআন সংকলিত ছিল না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু যেটুকু সংকলিত হয়েছে তার সমর্থনে ইরশাদ হচ্ছে– رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً - فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
তা ছাড়া বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূল ﷺ-এর সময়ে ওহী লেখকদের মাধ্যমে নাযিলকৃত কুরআনের বাণী লিখে রাখা হতো। যেমন– হযরত আলী (রা.) বলেন– اِنَّ الْقُرْآنَ كَانَ مَجْمُوْعًا مُؤَلَّفًا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ
ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন– مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ
এ সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা হলো–

১. আবূ দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَدْعُوْ بَعْضَ مَنْ يَّكْتُبُ لَهٗ وَيَقُوْلُ لَهٗ ضَعْ هٰذِهِ الْآيَةَ فِيْ السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا اَوْ كَذَا.
অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ-এর উপর যখন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি কোনো ওহী লেখককে ডেকে পাঠাতেন এবং আয়াতটি কোন সূরায় রাখা হবে, তিনি নিজে তা বলে দিতেন।

২. কুরআন সংকলনের কাজে প্রধান দায়িত্বশীল হযরত যায়েদ (রা.) বলেন– كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ

৩. এ বিষয়ে হাদীস শরীফে আরো এসেছে–
وَكَانُوْا يَكْتُبُوْنَ ذٰلِكَ فِى الصُّحُفِ وَالْاَلْوَاحِ وَالْعَسْبِ وَكَانَ لَا يُقْبَلُ مِنْ اَحَدٍ شَيْئًا حَتّٰى يَشْهَدَ شَهِيْدَانِ.

❖ اَلْمَشَاهِيْرُ مِنْ كُتَّابِ الْوَحْيِ

প্রসিদ্ধ ওহী সংকলকগণ : রাসূল ﷺ একদল সুদক্ষ লেখক সাহাবীকে ওহী সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন–

ক. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে কয়েকজন আনসারীর নাম দেখা যায়। তিনি বলেন–
جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ.

খ. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, কাতেবে ওহী ছিলেন ৪০ জন।

গ. 'তাদবীনুল ওহী' গ্রন্থে এরূপ ৪২ জন ওহী সংকলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নীচে প্রসিদ্ধ ওহী সংকলকদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত আবূ বকর (রা.)	২. হযরত ওমর (রা.)
৩. হযরত উসমান (রা.)	৪. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)
৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)	৬. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)
৭. হযরত তালহা (রা.)	৮. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)	১০. হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)
১১. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)	১২. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)
১৩. হযরত খাদীজা (রা.)	১৪. হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)
১৫. হযরত আবান ইবনুল আস (রা.)	১৬. হযরত খালেদ ইবনুল আস (রা.)
১৭. হযরত আমের ইবনে ফোহায়রা (রা.)	১৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.)
১৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ (রা.)	২০. হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.)
২১. হযরত হানযালা ইবনে রবী (রা.)	২২. হযরত শুরাহবিল ইবনে হামান (রা.)
২৩. হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রা.)	২৪. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)
২৫. হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)	২৬. হযরত মুয়াইকিব ইবনে আবী ফাতেমা (রা.)
২৭. হযরত হুয়াইতাব (রা.)	২৮. হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)
২৯. হযরত মু'আবিয়া (রা.)	৩০. হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রা.)
৩১. হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রা.)	৩২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সালামা (রা.)
৩৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী রাযী (রা.) প্রমুখ।	

কুরআন যেমন মহান ও চিরন্তন; যারা এর সংকলনের কাজটি করেছেন, তাঁরাও তদ্রূপ ভিন্নতর মর্যাদার দাবি রাখেন। কেননা, তাঁদের মহান কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘোষণার বাস্তবায়ন করেছেন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় দেখা যায়, তিনি তাঁর ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে কুরআনের লিখিত কপি লুকাতে দেখে বলেন– اَعْطُوْنِى الْكِتَابَ الَّذِىْ عِنْدَكُمْ اَقْرَأُهٗ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে লিখিত যে অংশটুকু আছে, তা আমাকে দাও, আমি তা পাঠ করব। কুরআন সংকলনের কাজে প্রধান দায়িত্বশীল হযরত যায়েদ (রা.) বলেন–
كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ.

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগ : ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে একাদশ হিজরিতে ভণ্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামায় মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজে কুরআন শাহাদাতবরণ করলে হযরত ওমর (রা.)-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ বিচলিত হয়ে পড়েন। হযরত ওমর (রা.) খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে কুরআনের সকল مَصْحَف একত্র করার পরামর্শ দেন, যাতে সমগ্র কুরআন একটি مَصْحَف-এ একত্র করা যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শে হযরত আবূ বকর (রা.) যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করত কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.) যায়েদ (রা.)-কে বলেন– اِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ اِجْمَعْهُ অর্থাৎ, তুমি যুবক ও বুদ্ধিমান, তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আর তুমি মহানবী ﷺ-এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং কুরআন সংকলনের এ দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করা হলো। তুমি অনুসন্ধান করে কুরআন একত্র করো।

হযরত যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ৭৫ জন সাহাবী কাগজ, পাতা, চামড়া এবং হাফেজে কুরআনগণ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে একত্র করে সুবিন্যস্ত আকারে কুরআন সংকলনের পাণ্ডুলিপি করেন। তিনি বলেন–

فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِىْ بِهٖ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ.

হযরত যায়েদ (রা.) কুরআনের এ পাণ্ডুলিপি খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা.)-এর হেফাজতে ছিল। হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুর আগে মহানবী ﷺ-এর পত্নী, স্বীয় কন্যা হাফসার নিকট সে পাণ্ডুলিপি আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে اَلْمَصْحَفُ الصِّدِّيْقِىُّ বলা হয়।

اَلْمَصْحَفُ الصِّدِّيْقِىُّ-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. মহানবী ﷺ-এর নির্দেশিত ও বিন্যাসপদ্ধতি অনুযায়ী কুরআনের আয়াতসমূহ সূরার মাঝে সাজানো হয়েছে। এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়নি; বরং আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল।

২. সূরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে مَصْحَف صِدِّيْقِى কতগুলো সহীফায় বিভক্ত ছিল। এগুলোকে উম্ম বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো।

৩. مَصْحَف صِدِّيْقِى -এর পাণ্ডুলিপিগুলো 'হিরী' পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল।

৪. এতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতি সন্নিবেশিত হয়েছিল।

৫. এটি সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ : হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলমানগণ অসংখ্য রাজ্য দখল করলে বিভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা কুরআনকে বিভিন্নভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে। এতে কুরআনের আয়াত ও অর্থের মধ্যে অনেক তারতম্য সৃষ্টি হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উসমান (রা.) ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি কুরআনের এ সমস্যার সমাধানকল্পে হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছ থেকে اَلْمَصْحَفُ الصِّدِّيْقِىُّ সংগ্রহ করে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-কে প্রধান করে একটি বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডকে তিনি দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন- اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ এ সংকলক বোর্ড রাসূল ﷺ-এর ভাষায় অনেকগুলো কপি তৈরি করে মূল একটি কপি নিজে সংরক্ষণ করত বাকিগুলো বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেন এবং পুরাতন ছিন্নবিচ্ছিন্ন কপিসমূহ পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁর দায়িত্বে যেহেতু বিশুদ্ধভাবে قُرْآن সংকলন হয়েছে, সেহেতু তাঁকে جَامِعُ الْقُرْآنِ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর উসমান (রা.)-এর সংকলিত মাসহাফটি اَلْمَصْحَفُ الْإِمَامُ নামে পরিচিত।

❖ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمَصْحَفِ الصِّدِّيْقِيِّ وَالْمَصْحَفِ الْإِمَامِ

মাসহাফে সিদ্দীকি ও মাসহাফে ইমাম -এর মাঝে পার্থক্য : اَلْمَصْحَفُ الْإِمَامِ ও اَلْمَصْحَفُ الصِّدِّيْقِيُّ-এর মাঝে কিছু পার্থক্য ছিল। নিম্নের তালিকায় তা তুলে ধরা হলো–

ক্রমিক	মাসহাফে সিদ্দীকি	মাসহাফে ইমাম
১.	প্রতিটি সূরা ভিন্ন ভিন্ন কপিতে লেখা হয়েছিল।	প্রতিটি সূরা বিন্যস্ত করে এক কপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
২.	শুধুমাত্র একটি কপি প্রস্তুত করা হয়।	একাধিক কপি প্রস্তুত করা হয়। কারো মতে, পাঁচটি আর কারো মতে, সাতটি কপি প্রস্তুত করে প্রদেশগুলোতে পাঠানো হয়।
৩.	এ নুসখার পাশাপাশি সকলের কাছে থাকা ব্যক্তিগত নুসখা বিদ্যমান ছিল।	এ নুসখা তৈরির পর বিদ্যমান ব্যক্তিগত নুসখাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়।
৪.	এ কপি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল, কুরআনের কোনো অংশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দূর করা।	এ নুসখা তৈরির উদ্দেশ্য ছিল, কেরাত ইত্যাদি সংক্রান্ত মতবিরোধ দূর করে একক নুসখা প্রণয়ন করা।

মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, ইসলামের একমাত্র সংবিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ কুরআন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধভাবে সংকলন করা হয়েছে, যা অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। কেয়ামত পর্যন্ত এটি কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ব্যতীত সংরক্ষিত থাকবে। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজ হাতেই রেখেছেন।

❖ تَرْتِيْبُ السُّوَرِ اَمْرٌ تَوْقِيْفِيٌّ اَمْ اِجْتِهَادِيٌّ

সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস তাওকীফি নাকি গবেষণার ফসল : এ ব্যাপারে আলেমগণ দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন। যথা–

প্রথম দল : অধিকাংশ আলেম যেমন- ইমাম মালেক, কাজী আবূ বকর (এক মতে) ও ইবনে ফারেস (র.) প্রমুখ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারবাহিকতা সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ ও ইজমার ভিত্তিতে হয়েছে।

দলিল : তারা নিজেদের দাবির পক্ষে দলিল উপস্থাপন করে বলেন, প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি ছিল। যেমন–

১. হযরত আলী (রা.)-এর পাণ্ডুলিপি ছিল অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। অর্থাৎ, প্রথমে সূরা ইকরা, তারপর সূরা মুদ্দাসসির, তারপর সূরা কলম, তারপর সূরা মুযযাম্মিল, তারপর সূরা লাহাব, তারপর সূরা তাকভীর এভাবে শেষ পর্যন্ত।

২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পাণ্ডুলিপিতে ছিল প্রথমে সূরা বাকারা, তারপর সূরা নিসা, তারপর সূরা আলে ইমরান, এভাবে শেষ পর্যন্ত।

৩. অনুরূপ ছিল হযরত উবাই ও অন্যদের পাণ্ডুলিপি। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত্যে সূরার এ ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. হযরত উসমান (রা.) বড় সূরাসমূহকে আয়াতের সংখ্যার দিক দিয়ে একই ধরনের করার আদেশ দেন। অতঃপর সূরা আনফাল ও সূরা তাওবাকে যৌথভাবে সাতটি বড় বড় সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দল : কতিপয় আলেম যেমন– ইমাম বায়হাকী, কাজী আবূ বকর (অন্যমতে), কিরমানী, আবূ বকর ইবনে আম্বারী ও আবূ জাফর ইবনে যোবায়ের (র.) প্রমুখ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ-এর নির্দেশেই নির্ধারণ হয়েছে।

দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নীচে বর্ণিত দলিলসমূহ পেশ করেন–

১. হযরত উসমান (রা.) বলেন, কুরআন অবতরণকালে মহানবী ﷺ বলতেন–

ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا.

২. হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) বলেন–

كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا اِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهٖ ثُمَّ صَوَّبَهٗ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَلْزَقَهٗ بِالْأَرْضِ قَالَ : ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهٖ فَقَالَ : اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَامَرَنِىْ اَنْ اَضَعَ هٰذِهِ الْآيَةَ بِهٰذَا الْمَوْضَعِ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ.

৩. হযরত যায়েদ (র.) বলেন- كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ

উক্ত হাদীসে نُؤَلِّف-এর ব্যাখ্যায় ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন–

اَلْمُرَادُ بِهٖ تَأْلِيْفُ مَا نُزِّلَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ سُوَرُهَا وَجَمْعُهَا فِيْهَا بِاِشَارَةِ النَّبِىِّ ﷺ

৪. আল্লামা ইবনে ফারেস (র.) বলেন, কুরআন সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, সূরাসমূহে আয়াতসমূহের সংস্থাপন। তা মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী ﷺ-কে নির্দেশ করেছেন।

৫. আবূ বকর ইবনে আম্বারী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ আয়াত ও সূরার স্থান নির্ধারণ করে দেন। অতঃপর আয়াত ও অক্ষরের ধারাবাহিকতার ন্যায় সূরার ধারাবাহিকতাও মহানবী ﷺ-এর মাধ্যমেই হয়েছে।

৬. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা সেভাবেই হয়েছে, যেভাবে লাওহে মাহফূযে আল্লাহ তা'আলার নিকট ছিল।

৭. আল্লামা তীবি (র.) বলেন, কুরাআন মাজীদ লাওহে মাহফূযের বিন্যাস অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিতে বিন্যস্ত হয়েছে।

৮. ইমাম বায়হাকী (র.) আরো বলেন- اِنَّ جَمِيْعَ السُّوَرِ تَرْتِيْبُهَا تَوْقِيْفِىٌّ اِلَّا بَرَاءَةَ وَالْاَنْفَالَ

উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান : আল্লামা যারকাশী (র.) উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে 'আল বুরহান' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সূরার ধারাবাহিকতা নিয়ে উভয় দলের এ মতভেদ اِخْتِلَافِ لَفْظِى তথা আক্ষরিক মতভেদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কোনো মতভেদ নেই।

❖ تَرْتِيْبُ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন মাজীদের আয়াত ও সূরাসমূহের ক্রম : কুরআন শরীফের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত ও সূরা যে তারতীবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে, মূলত সেটাই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র তারতীব। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অতঃপর হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকেও এই তারতীবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, কুরআনে বর্তমান তারতীব একান্তই ওহীগত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুসলিম উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করে লিখেন–

تَرْتِيْبُ الْآيَاتِ فِى السُّوَرِ بِتَوْقِيْفِيَّةِ النَّبِىِّ ﷺ أَمْرُهُ غَيْرَ خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ, কুরআনের প্রত্যেক সূরার আয়াতসমূহের তারতীব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে অবগত করানোর পর সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২]

সূরা বাকারা হতে তওবা পর্যন্ত কুরআনের প্রথম ৭টি সূরা বড়। পরিভাষায় এগুলোকে سَبْع طِوَال বলা হয়। তারপর কমবেশি একশত আয়াত সংবলিত বৃহৎ সূরাগুলো রয়েছে। পরিভাষায় এগুলোকে مِئِيْن [মিঈন] বলা হয়। এরূপ সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ২৪টি। তারপর রয়েছে শতের কম আয়াত সংবলিত সূরাসমূহ। এসবকে বলা হয় مَثَانِىْ [মাছানী]। এ সূরাগুলোতে ঘটনাবলি ও উপদেশসমূহের পুনরুক্তি রয়েছে। তাই এগুলোকে মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে ছোট সূরাগুলো। এগুলোকে বলা হয় مُفَصَّل (মুফাসসাল)। সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলে।

মুফাসসাল সূরাগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত।

১. طِوَالِ مُفَصَّل : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'তিওয়ালে মুফাসসাল' বলা হয়। এতে মোট ৩০টি সূরা রয়েছে।

২. اَوْسَاط مُفَصَّل : সূরা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ [সূরা লাম ইয়াকুন] পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'আওসাতে মুফাসসাল' বলা হয়। এতে মোট ১৩টি সূরা রয়েছে।

৩. قِصَار مُفَصَّل : সূরা বায়্যিনাহ [লাম ইয়াকুন] থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'কিসারে মুফাসসাল' বলা হয়। এতে মোট ১৭টি সূরা রয়েছে। [তাফসীরশাস্ত্র পরিচিতি : ই.ফা.বা.]

❖ اَلْإِقْدَامُ عَلٰى تَسْهِيْلِ التِّلَاوَة

তেলাওয়াত সহজীকরণ প্রচেষ্টা : হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক মাসহাফ তৈরির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর দুনিয়ার সর্বত্র তার অনুলিপির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যেহেতু মূল উসমানী নুসখায় নুকতা এবং হরকত ছিল না, সেজন্য অনারবদের পক্ষে এ মাসহাফের তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উসমানী অনুলিপিতে নুকতা এবং হরকত সংযোজন করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্যে তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল উসমানী মাসহাফে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন ও সহজীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। সংক্ষেপে সে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ–

ক. **নুকতা :** আরবি ভাষাভাষীদের মাঝে হরফে নুকতা লাগানোর রীতি ছিল না। তাই লেখকগণ নুকতাবিহীন লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং পাঠকগণও এ নিয়মে পড়ায় এতই পারদর্শী ছিল যে, নুকতা ব্যতীত হরফ পড়তে কোনো ধরনের অসুবিধা হতো না।

শব্দের পূর্বাপরের সাহায্যে একই ধরনের বিভিন্ন হরফের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অনায়াসেই করতে পারত। শুধু তা-ই নয়, এ ব্যাপারে তারা এতই অভিজ্ঞ ছিল যে, কখনো কখানো কেউ যদি তার লেখায় নুকতা দিতেন, তাহলে তাকে অনভিজ্ঞ বলে অভিহিত করা হতো।

সুতরাং মাসহাফে উসমানীও নুকতাবিহীন ছিল। তা ছাড়া কুরআনে নুকতা না দেওয়ার আরও একটি কারণ হলো, যেন সকল কেরাতকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরবর্তীতে অনারবি ও আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কে অনবহিতদের সুবিধার্থে কুরআনে নুকতা দেওয়া হয়।

তবে সর্বপ্রথম কে কুরাআনে নুকতা দিয়েছেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক বর্ণনামতে, সর্বপ্রথম এ কাজ আঞ্জাম দেন আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (র.)। কেউ বলেছেন, এ কার্যই আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (র.) হযরত আলী (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেছেন। ঐতিহাসিক আবুল ফরজ বলেন, কুফার গভর্নর তার দ্বারা এ কাজ করিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এ কাজ হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও নাদর ইবনে আসেম (র.)-এর দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ করিয়েছেন।

এক বর্ণনামতে, আরবি রসমুল খত্ব-এর প্রবর্তক হলেন বোলান গোত্রের মুরারা ইবনে মুররাহ, আসলাম ও আমের ইবনে হাররাহ। মুরারাহ হলেন হরফের আকৃতির প্রবর্তক, আসলাম সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্নকরণের নিয়মনীতির প্রবর্তক এবং আমের হলেন নুকতার প্রবর্তক।

অন্য এক বর্ণনামতে, নুকতার সর্বপ্রথম প্রচলন হয় হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব-এর দাদা আবূ সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া থেকে। তিনি শিখেছেন হিরার অধিবাসীদের থেকে।

খ. **হরকত :** নুকতার মতো কুরআনুল কারীমে হরকতের (যবর, যের, পেশ) প্রচলন ও প্রথম জমানায় ছিল না। সর্বপ্রথম কে পবিত্র কুরআনে হরকত লাগিয়েছেন, এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুয়ালী হরকত সংযোজন করেন। কেউ কেউ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও নাসির ইবনে আসেম লাইসী দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এ কাজ করিয়েছেন।

সকল রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথাই বুঝে আসে যে, হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়ালী সর্বপ্রথম হরকত প্রবর্তন করেন। তবে তৎকালের হরকত আর বর্তমান সময়ের হরকতের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তৎকালে যবরের জন্যে হরফের উপর এক নুকতা, যেরের জন্যে হরফের নীচে এক নুকতা এবং পেশের জন্যে তদ্রূপ হরফের সামনে এক নুকতা এবং তানবীনের জন্যে দুই নুকতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীতে খলীল আহমদ (র.) হামজা ও তাশদীদ-এর আলামত প্রবর্তন করেন এবং কিছুদিন পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর, নাসির ইবনে আসেম লাইসী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে একই সময়ে নুকতা এবং হরকত লাগানোর নির্দেশ দেন। তখন হরকত প্রকাশের জন্যে নুকতার পরিবর্তে বর্তমানের যবর, যের ও পেশ নির্ধারণ করা হয়। যাতে হরফের নুকতার সাথে এর সংমিশ্রণ না হয়।

গ. **মনযিল বা হিযব :** সাহাবায়ে কেরাম (র.) এবং তাবেয়ীগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে মনযিল বা হিযব বলা হয়। তাই তাঁরা পাঠের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৭ মনযিলে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম মনযিল : সূরা ফাতেহা হতে সূরা আন নিসা-এর শেষ পর্যন্ত।
দ্বিতীয় মনযিল : সূরা মায়েদা হতে সূরা আত তাওবা-এর শেষ পর্যন্ত।
তৃতীয় মনযিল : সূরা ইউনুস হতে সূরা আন নাহল-এর শেষ পর্যন্ত।
চতুর্থ মনযিল : সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা আল-ফুরকান-এর শেষ পর্যন্ত।
পঞ্চম মনযিল : সুরা আশ-শু'আরা হতে সূরা ইয়াসীন-এর শেষ পর্যন্ত।
ষষ্ঠ মনযিল : সূরা আস-সাফফাত হতে সূরা আল হুজুরাত-এর শেষ পর্যন্ত।
সপ্তম মনযিল : সূরা কাফ হতে শেষ সূরা পর্যন্ত।

ঘ. **পারা :** পবিত্র কুরআন ত্রিশটি অংশে বিভক্ত, যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে করা হয়নি; বরং পড়তে যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমান অংশে কুরআনে করীমকে বিভক্ত করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সর্বপ্রথম কে করেছেন? তবে কারো কারো ধারণা, এটা নবী জামাতা হযরত উসমান (রা.) মাসহাফ অনুকপি করানোর সময় পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারায় [সহীফায়] লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা তাকী ওসমানী [দা. বা.] বলেন, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের কিতাবে আমি এর কোনো দলিল এ পর্যন্ত পাইনি।

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) বলেন, কুরআনের ত্রিশ পারার এ নিয়ম প্রসিদ্ধভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে এবং মাদরাসাসমূহের কুরআনী নুসখায়ও এটা প্রচলিত রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় যেন এ বণ্টনধারা সাহাবা পরবর্তী যুগে শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

ঙ. **খুমুস ও আ'শার :** প্রথম যুগের কুরআনী নুসখায় আরেকটি প্রচলন ছিল। তা হলো, পাঁচ আয়াতের পরে হাশিয়াতে خمس বা خ এবং দশ আয়াত শেষে আশার বা ع লেখা হতো।

প্রথম প্রকারের চিহ্নকে اَخْمَاس এবং দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নকে اعْشَار বলে। [মানাহিলুল ইরফান : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৩]

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এ আলামতগুলো জায়েজ, আবার কেউ বলেন, এগুলো মাকরুহ। [আল-ইতকান : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১-১৭]

কারণ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনামতে, সাহাবা যুগ থেকেই এগুলোর প্রচলন শুরু হয়।

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيْرَ فِى الْمَصْحَفِ.

অর্থাৎ, হযরত মাসরূক (র.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) পাণ্ডুলিপির মাঝে أَعْشَار সংযোজন করাকে অপছন্দ করতেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৯৭]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আ'শার সাহাবা যুগে প্রচলিত ছিল।

চ. **রুকূ' :** আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে রুকূ'। যার প্রবর্তন পরবর্তীকালে করা হয়েছে এবং এ যাবত প্রচলিত হয়েছে। রুকূ' গঠনে সাধারণ আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখানে এক ধরনের আলোচনা শেষ হয়, সেখানেই হাশিয়াতে রুকূ' এর চিহ্ন দেওয়া হয়। আর তার সংকেত হচ্ছে (ع)। উলূমুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, আমি যথেষ্ট খোজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি যে, কে কবে রুকূ'র সূচনা করেন। [তারীখুল কুরআন : পৃষ্ঠা ৮১] কারো কারো ধারণা হচ্ছে, হযরত উসমান (রা.)-এর সময়েই রুকূ' নির্ধারণ করা হয়। আল্লামা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, রেওয়ায়েতে এর কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

অবশ্য একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এ আলামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের এমন একটি পরিমাণ নির্ণয় করা যা নামাজের এক রাকাতে পাঠ করা যায়। এ চিহ্নগুলোকে রুকূ' এজন্যে বলা হয় যে, নামাজে এ স্থানে পৌঁছে রুকূ' করা হয়।

বিরাম চিহ্ন : কুরআন তেলাওয়াত ও তাজভীদের সহজীকরণের নিমিত্তে আরেকটি উপকারী কাজ এটা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাক্যের শেষে এমন কিছু চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ স্থানে ওয়াকফ করাটা কেমন? এ চিহ্নগুলোকে রুমূয ও আওকাফ বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, একজন অনারবি ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, তখন যেন সে যথাস্থানে ওয়াকফ করতে পারে এবং ভুল স্থানে শ্বাস ত্যাগ করার কারণেও যেন অর্থের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। এ ধরনের অধিকাংশ চিহ্নের প্রণেতা হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (র.)।

❖ طَبَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন কারীমের মুদ্রণ : মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআনে কারীম হাতেই লেখা হতো। প্রত্যেক যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল কুরআনে কারীম লিপিবদ্ধ করা। কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। কুরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এর জন্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানির হামবুর্গ শহরে ১১১৩ হিজরিতে কুরআন ছাপানো হয়। কুরআনের সে নুসখাটি এখনো রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কুরাআনে কারীম মুদ্রণ করেন। তবে মুসলিম বিশ্বে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কুরআনে কারীম মুদ্রিত হয়। একই সময়ে কাযান শহরেও একটি কপি মুদ্রিত হয়। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে কুরআনে কারীমের আর একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কুরআনে কারীমের নুসখা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়।

اَلْبَحْثُ الْخَامِسُ : اَلْمُفَسِّرُوْنَ
পঞ্চম আলোচনা : মুফাসসিরগণ

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- طَبَقَاتُ الْمُفَسِّرِيْنَ
٢- شُرُوْطُ الْمُفَسِّرْ
٣- آدَابُ الْمُفَسِّرْ
٤- اَلَّذِيْنَ اشْتَهَرُوْا فِى التَّفْسِيْرِ مِنَ الصَّحَابَةِ
٥- مِنْ مَشَاهِيْرِ الْمُفَسِّرِيْنَ وَتَفَاسِيْرِهِمْ

❖ طَبَقَاتُ الْمُفَسِّرِيْنَ

মুফাসসিরদের স্তরসমূহ : মুফাসসিরগণকে দশটি স্তরে বিন্যাস করা যায়। যথা–

প্রথম স্তর : সাহাবায়ে কেরামের যুগ। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর সংস্পর্শে অবস্থান ও তার সান্নিধ্যের বরকতে কুরআনের তাফসীর করার সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে চার খলিফা, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর : তাবেয়ীদের যুগ। এ স্তরের মুফাসসিরগণ ছিলেন সাহাবীদের শিষ্য। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শিষ্যগণ প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, তাউস ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র.) প্রমুখ তাবেয়ীগণ।

মদিনায়ও অনেক তাবেয়ী মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে হাসান বসরী, কাতাদা, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, আতা ইবনে আবূ সালামা, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহহাক ও আবুল আলিয়া (র.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় স্তর : তাবে তাবেয়ীনের যুগ। এ স্তরে ঐসব মুফাসসির ও মনীষী তাফসীর করতেন, যারা সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণিত ভাষা বর্ণনা করতেন। এ যুগেই তাফসীরগ্রন্থসমূহের সংকলন শুরু হয়। এদের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, সুফিয়ান সাওরী, শোবা, ওয়াকী, আব্দুর রাযযাক (র.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ স্তর : উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের যুগ। যা তাবে তাবেয়ীগণের পরে শুরু হয়। এ স্তরের প্রসিদ্ধ মনীষীগণের মধ্যে আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.) প্রসিদ্ধ। আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর তাফসীরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পঞ্চম স্তর : এ যুগের লোকেরা সনদ বাদ দিয়ে বর্ণনাকে সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রতি সম্বন্ধ করতেন। যেমন– وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَذَا - قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ كَذَا ইত্যাদি। কিন্তু এতে অনেক মিথ্যা ও ভুলভ্রান্তি ছিল। আবূ আব্দুর রহমান নিশাপুরী, আবূ ইসহাক আহমদ সালাবী, আবুল কাসেম আব্দুল করীম এবং আবুল হাসান আহমদ ওয়াহেদী প্রমুখ মুফাসসিরগণ এ স্তরের।

ষষ্ঠ স্তর : উলামায়ে মুতায়াখখেরীনের যুগ। এ যুগে মুফাসসিরগণের অনেকেই নিজ নিজ মেধা ও জ্ঞান অনুযায়ী তাফসীর করা শুরু করে দেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে – আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী, আবুল কাসেম হোসাইন রাগেব আন্দালুসী, আবূ হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী, আবূ হোসাইন ইবনে মাসঊদ বাগভী (র.) ও আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওমর যামাখশরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম স্তর : এ স্তরে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম কুরতুবী ও আল্লামা বায়যাভী (র.) প্রসিদ্ধ। বায়যাভী (র.) تفسير البيضاوى সংকলন করেন এবং তাতে আল্লামা যামাখশরীর মুতাযিলী আকিদা খণ্ডন করেন।

অষ্টম স্তর : এ স্তরের মুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবুল বারাকাত আন-নাসাফী, শরফুদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ ও আল্লামা কুতুবুদ্দীন সিরাজী (র.)।

নবম স্তর : এ স্তরে নবম হিজরি শতাব্দী ও তার পরের যুগের মুফাসসিরগণ ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জালালুদ্দীন মহল্লী (র.); যাঁদের রচিত তাফসীর تفسير الجلالين প্রসিদ্ধ। এছাড়া আল্লামা আলুসী (র.)-ও এ সময়ের সমাদৃত মুফাসসির।

দশম স্তর : এ স্তর শুরু হয় ১২০০ শতাব্দী থেকে। এ স্তরে বহু মুফাসসির প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), আল্লামা শাওকানী (র.), আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), আশরাফ আলী থানভী (র.), শায়খ মাহমুদ হাসান (র.), কাজী সানা উল্লাহ পানিপথী (র.), মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) ও শাব্বির আহমদ ওসমানী (র.)।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান অতি সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। তাই কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন স্তরের মুফাসসির। তবে যে কোনো লোকের পক্ষেই তাফসীর করা সম্ভব নয়; বরং এর জন্যে মুফাসসিরকে কিছু বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। তাকে উপযুক্ত হতে হয় বিশেষ কিছু শর্তের ভিত্তিতে।

❖ اَلشُّرُوْطُ لِلْمُفَسِّرِ

মুফাসসিরের শর্তাবলি : একজন মুফাসসিরের তাফসীর সর্বমহলে সমাদৃত হতে হলে তার মধ্যে দু'প্রকারের শর্ত থাকা আবশ্যক। যথা–

ক. **মুফাসসিরের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি :** উলামায়ে কেরাম মুফাসসিরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন। তা হচ্ছে–

১. اَلْعَقَائِدُ الصَّحِيْحَةُ তথা বিশুদ্ধ আকীদা।
২. اَلْاِجْتِنَابُ عَنِ الْهَوٰى তথা খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা।
৩. أَنْ يَبْدَأَ التَّفْسِيْرَ بِالْقُرْآنِ أَوَّلًا তথা প্রথমে কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা।
৪. أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ তথা হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করা। কারণ তা কুরআনের বিশ্লেষক।
৫. فَإِذَا لَمْ يَجِدِ التَّفْسِيْرَ مِنَ السُّنَّةِ رَجَعَ إِلٰى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ অর্থাৎ, যদি হাদীসে কোনো বিষয়ের তাফসীর না পাওয়া যায়, তাহলে মুফাসসিরকে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
৬. যদি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে কোনো আয়াতের তাফসীর না পাওয়া যায়, তাহলে তাবেয়ীগণের নিকট থেকে তা গ্রহণ করতে হবে।
৭. বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ ও মাযহাব থেকে দূরে থাকা।
৮. দলিল চয়নে বাড়াবাড়ি না করা।
৯. তীক্ষ্ণ ও গভীর বোধশক্তি থাকা।

একজন মুফাসসিরের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.)-এর মতে ১৫টি علم তাফসীর করার যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারিত।

ড. হোসাইন আয-যাহাবী, ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী অনুরূপ ১৫টি মতের সমর্থন করেছেন। নীচে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো–

১. عِلْمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّة (আরবি ভাষায় জ্ঞান) : কুরআনুল কারীম যেহেতু আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু মুফাসসিরের অবশ্যই আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা শাব্দিক ও পরিভাষাগত অর্থ জানা ব্যতীত তাফসীর করা সম্ভব নয়। আলেমগণ এ জ্ঞানকে ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন–

আল্লামা যারকাশী (র.) বলেন, মুফাসসিরের উপর ওয়াজিব হলো, শাব্দিক ভাষাগত জ্ঞান আলোচনার মাধ্যমে তাফসীর শুরু করা। কুরআনুল কারীমের মর্ম বোঝার ইচ্ছা করলে শব্দ-বিশ্লেষণ অবশ্যই জরুরি। কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ তার জন্যে বিরাট খনিসদৃশ। যেমনিভাবে কেউ দালান নির্মাণ করার ইচ্ছে করলে তাকে প্রথমে ইট সংগ্রহ করতে হয়।

বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মুফাসসির মুজাহিদ (র.) বলেন–

لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِلُغَاتِ الْعَرَبِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস আছে এমন ব্যক্তির পক্ষে তাফসীর করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না আরবদের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।

২. علم النحو (বাক্যপ্রকরণ শাস্ত্র) : আরবি ভাষায় জ্ঞানের পাশাপাশি ইলমে নাহুর জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা, ইরাব বা অবস্থার পার্থক্যের কারণে বাক্যের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে।

৩. علم الصرف (শব্দপ্রকরণ শাস্ত্র) : ইলমে শরফের মাধ্যমে শব্দের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এগুলো জানা না থাকলে কুরআনের অর্থ বের করা সম্ভব হবে না।

৪. علم الاشتقاق (শব্দের উৎপত্তিগত জ্ঞান) : শব্দের উৎপত্তিগত পার্থক্যের কারণে অর্থেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই মুফাসসিরের এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত।

৫. علم المعانى (আরবি অলংকার শাস্ত্রের জ্ঞান) : বাক্যবিন্যাসের লুপ্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, সাদৃশ্য, প্রতিপাদন, রূপক, ইশারা ইঙ্গিত তথা ইলমে মায়ানীর দ্বারা অলঙ্কার শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাই এটা মুফাসসিরের জানা কর্তব্য।

৬. علم البيان (বাক্যালংকার শাস্ত্র) : ভাবার্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা সম্পর্ক এ বিদ্যার মাধ্যমে জানা যায়। কেননা এর দ্বারা বিন্যস্ত বাক্যের ভাব ব্যঞ্জনশৈলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা যায়। কারণ কোনটা উপমামূলক, কোনটা মূল অর্থবোধক, কোনটা রূপক, কোনটা ইঙ্গিতমূলক -এসবকিছু জানা দরকার; অন্যথা সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

৭. علم البديع (ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান) : এটা দ্বারা বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় সন্নিহিত বিচিত্র গুণাবলির সন্ধান তথা বাক্যের সৌন্দর্য ও সৌকর্য সম্পর্কে অনুভব করা যায়।

স্মরণীয় যে, علم المعانى ، علم البيان ও علم البديع জ্ঞানের এ তিনটি শাখাকে একত্রে علم البلاغة বা অলংকার শাস্ত্র বলা হয়। একজন সুদক্ষ মুফাসসিরের এ তিনটি বিদ্যায় পূর্ণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। একে তাফসীরের সূক্ষ্ম জ্ঞান বলা হয়। এটা ব্যতীত তাফসীর করা সম্ভব নয়।

৮. علم القراءة (কুরআন পঠনরীতির বিদ্যা) : কুরআনের পাঠ পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে অর্থের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। আবার স্থানবিশেষে মূল অর্থের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে কোনো বিশেষ কেরাত অবলম্বন করতে হয়। এসব বিষয়ের জন্যে علم القراءة -এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৯. علم أصول الدين (দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান) : ইলমে আকাইদ সম্পর্কিত জ্ঞান তাফসীর করার জন্যে অপরিহার্য। কেননা, কোনো কোনো আয়াত বাহ্যিক দিক থেকে আল্লাহর মহত্ত্বের জন্যে ত্রুটিস্বরূপ। তাই অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হবে; অন্যথা বিভ্রান্তির আশঙ্কা থেকে যাবে।

১০. علم اصول الفقه (ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান) : এ জ্ঞান জানা থাকলে কুরআনুল কারীম থেকে দলিল বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। এছাড়াও কুরআন থেকে বিভিন্ন প্রমাণ বের করা সহজ হয়।

১১. علم أسباب النزول والقصص (কুরআন নাজিলের পেক্ষাপট ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান) : কেননা, এর দ্বারা কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট, ঘটনাবলি ও তদনুযায়ী ভাবার্থ জানা যায়।

১২. علم الناسخ والمنسوخ (নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান) : কুরআনুল কারীমের কিছু কিছু আয়াত নাসিখ, কিছু কিছু আয়াত মানসুখ। আবার কোনো কোনো আয়াত মুহকাম, কোনো কোনো আয়াত মুতাশাবিহ। সুতরাং এ জ্ঞান জানা থাকলে কোন বিধানটি বহাল আছে আর কোন আয়াতটি বহাল নেই, তা জানা যায়।

১৩. علم الفقه (আইনশাস্ত্র) : দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় বিষয়ের জন্যে শরিয়তের কী বিধি-বিধান আছে, তার পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শরিয়তের ছোটখাটো বিষয় সম্পর্কেও কুরআনের নির্দেশ আছে; অবশ্য তা সংক্ষিপ্ত আকারে; সুতরাং এ জ্ঞান না থাকলে এসব বিষয় অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

১৪. علم الحديث (রাসূল ﷺ-এর হাদীসের জ্ঞান) : কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রাসূল ﷺ-ই প্রথম করেছেন। সুতরাং এ জ্ঞান না থাকলে কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয়। যদি করে, তাহলে সে তাফসীর ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

১৫. علم الموهبة (আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান) : যারা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ জ্ঞান দান করেন। কুরআনের তাফসীরের জন্যে এ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। হাদীসে এসেছে– مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাকে এমন বিষয়ের ইলম দান করবেন, যা সে জানে না।

একজন মুফাসসিরের জন্যে উল্লিখিত শর্তাবলি ব্যতীত আরো অনেক বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে, যা শায়খ যারকানী, শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ও আল্লামা হোসাইন আয-যাহাবী (র.) বর্ণনা করেছেন। নীচে তা আলোচনা করা হলো–

১৬. সীরাতুন্নবী ﷺ সম্পর্কে জ্ঞান।
১৭. সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান।
১৮. মানবসমাজের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান।
১৯. ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান।
২০. ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞান।
২১. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা; যেমন– পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান।
২২. সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান।
২৩. দাওয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞান।
২৪. কুরআনের তাফসীর করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান।
২৫. কুরআনে বর্ণিত শব্দের ভেদ সম্পর্কিত জ্ঞান।
২৬. মানুষের নানাবিধ অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান।
২৭. কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াতের পথ বাতলানো সম্পর্কিত জ্ঞান।

اَلْآدَابُ اللَّازِمَةُ لِلْمُفَسِّرِيْنَ

মুফাসসিরের জন্য অত্যাবশ্যক আদবসমূহ : তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসিরকে নীচে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হতে হবে–

১. حُسْنُ النِّيَّةِ وَصِحَّةُ الْمَقْصَدِ তথা বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নিয়ত এবং সঠিক উদ্দেশ্য।
২. حُسْنُ الْخُلُقِ তথা উত্তম চরিত্রগুণ।
৩. اَلْاِمْتِثَالُ وَالْعَمَلُ بِالْعِلْمِ তথা, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং ইলম অনুসারে আমল।
৪. تَحَرِّى الصِّدْقِ وَالضَّبْطِ فِى النَّقْلِ তথা কোনো বিষয় উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সততা ও নিশ্চয়তা যাচাই করা।
৫. اَلتَّوَاضُعُ وَالْاِنْكِسَارُ তথা বিনয় ও নম্রতা।
৬. عِزَّةُ النَّفْسِ তথা আত্মমর্যাদাবোধ।
৭. اَلثَّبَاتُ عَلَى الْجَهْرِ بِالْحَقِّ তথা সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা।
৮. حُسْنُ السَّمْتِ তথা উত্তম ভাবাদর্শ।
৯. اَلْاَنَاةُ وَالرُّوْيَةِ তথা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।
১০. تَقْدِيْمُ مَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ তথা তাফসীরকারকদের মধ্যে যে অধিক উপযুক্ত, তাঁকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া।
১১. اَلْاِسْتِعْدَادُ التَّامُّ وَالْاِلْقَاءُ الْبَلِيْغُ : পূর্ণ প্রস্তুতি ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন।

তাফসীরের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে; অন্যথায় প্রবৃত্তির চাহিদা মতো মনগড়া তাফসীর ছড়িয়ে পড়বে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী একমাত্র গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ, সকল বস্তুর আলোচনা এতে বিদ্যমান। সব বিষয়ই এতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত বিধায় রাসূল ﷺ সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। নীচে তাফসীরের শ্রেণিবিভাগ ও তার শর্তাবলি আলোচিত হলো–

তাফসীর করার জন্যে অসামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন। মুজাহিদ (র.) বলেন– لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ ..... اَنْ يَتَكَلَّمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِلُغَاتِ الْعَرَبِ; যুগ যুগ ধরে মহামনীষীগণ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সুবৃহৎ তাফসীরগ্রন্থসমূহ রচনা করে মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের এ অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

❖ اَلْمُفَسِّرُوْنَ اَلْمَشْهُوْرُوْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ

সাহাবীদের মাঝে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ : সাহাবীগণের মধ্যে তাফসীরশাস্ত্রের দশজন সাহাবী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁরা হলেন– ১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), ২. হযরত ওমর (রা.), ৩. হযরত ওসমান (রা.), ৪. হযরত আলী (রা.), ৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), ৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), ৯. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.), ১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)।

❖ مِنْ مَشَاهِيْرِ الْمُفَسِّرِيْنَ وَتَفَاسِيْرُهُمْ

কতিপয় প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও তাঁদের তাফসীরগ্রন্থসমূহ : নীচে তাফসীর গ্রন্থসহ বিখ্যাত কয়েকজন মুফাসসিরের নাম উল্লেখ করা হলো।

তাফসীর বিল-মাসূর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ :

ক্রমিক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
১.	جَامِعُ الْبَيَانِ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ	ইবনে জারীর তাবারী (র.)
২.	بَحْرُ الْعُلُوْم	আবূ লাইছ সমরকন্দী (র.)
৩.	اَلْكَشْفُ وَالْبَيَانُ عَنْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآن	আবূ ইসহাক তাগলাবী (র.)
৪.	مَعَالِمُ التَّنْزِيْل	আবূ ইসহাক হাসান বাগাভী (র.)
৫.	اَلْمُحَرَّرُ الْوَجِيْزُ فِى تَفْسِيْرِ الْكِتَابِ الْعَزِيْز	ইবনে আতা আন্দালুসী (র.)
৬.	تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْم	হাফেজ ইবনে কাসীর (র.)
৭.	اَلْجَوَاهِرُ الْحِسَانُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآن	আব্দুর রহমান সালাবী (র.)
৮.	اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ فِى التَّفْسِيْرِ بِالْمَاثُوْر	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)

তাফসীর বির-রায় সম্পর্কিত কিতাবসমূহ :

ক্রমিক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
১.	مَفَاتِيْحُ الْغَيْب	ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.)
২.	اَنْوَارُ التَّنْزِيْل وَأَسْرَارُ التَّأْوِيْل	বাইযাভী (র.)
৩.	مَدَارِكُ التَّنْزِيْل وَحَقَائِقُ التَّأْوِيْل	ইমাম নাসাফী (র.)
৪.	لُبَابُ التَّأْوِيْل فِى مَعَانِى التَّنْزِيْل	আলী ইবনে মুহাম্মদ খাযেন (র.)
৫.	اَلْبَحْرُ الْمُحِيْط	আবূ হাইয়ান (র.)
৬.	غَرَائِبُ الْقُرْآنِ وَرَغَائِبُ الْفُرْقَان	নিশাপুরী (র.)
৭.	تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْن	জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
৮.	اَلسِّرَاجُ الْمُنِيْر	খতীব শারানী (র.)
৯.	اِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ اِلٰى مَزَايَا الْقُرْآنِ الْكَرِيْم	আবুস সাউদ (র.)
১০.	رُوْحُ الْمَعَانِىْ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْم وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي	শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আলুসী (র.)
১১.	اَلْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآن	মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতুবী (র.)।

اَلْبَحْثُ السَّادِسُ : اَلْوَحْيُ وَطُرُقُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ وَاَقْسَامُهُ

ষষ্ঠ আলোচনা : ওহীর পদ্ধতি ও প্রকারভেদ

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- تَعْرِيْفُ الْوَحْيِ
٢- ضَرُوْرِيَّةُ الْوَحْيِ
٣- غَرْضُ الْوَحْيِ
٤- اَلْاِعْتِقَادُ عَنِ الْوَحْيِ
٥- أَقْسَامُ الْوَحْيِ بِاعْتِبَارِ طُرُقِ النُّزُوْلِ
٦- أَقْسَامُ الْوَحْيِ مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوْعِ
٧- أَقْسَامُ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
٨- كَيْفِيَّاتُ نُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই ওহীর মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। রাসূল ﷺ কুরআন ছাড়াও অনেক বিষয় ওহীর মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কিত মহান আল্লাহর বাণী– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

❖ تَعْرِيْفُ الْوَحْيِ : ওহীর পরিচয়

ক. আভিধানিক অর্থ : وحي শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. اَلْاِخْبَارُ فِي الْخَفَاءِ তথা গোপনে জানিয়ে দেওয়া।
২. اَلْاِلْهَام তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা।
৩. اَلْاِرْسَال তথা প্রেরণ করা
৪. اَلْكِتَابَة তথা লেখা।
৫. اَلرِّسَالَة তথা চিঠি।
৬. اَلْاِشَارَةُ তথা ইঙ্গিত করা।
৭. اَلْاِعْلَام তথা জানানো।
৮. اَلنَّفْثُ فِي الرُّوْع তথা অন্তরে ঢেলে দেওয়া।
৯. اَلْبَعْث তথা পুনরুত্থান।
১০. اَلسُّرْعَة তথা দ্রুত করা।
১১. اَلْاَمْر তথা আদেশ।
১২. اَلْاِسْمَاع তথা শুনিয়ে দেওয়া।
১৩. اَلتَّصْوِيْت তথা আওয়াজ করা।
১৪. اَلْكَلَامُ الْخَفِيُّ তথা গোপন কথা।
১৫. اَلرَّمْيُ তথা নিক্ষেপ করা।
১৬. اَلْاِلْقَاءُ তথা উপস্থাপন করা।
১৭. اَلصَّيْحَةُ তথা চিৎকার করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. শায়খ আব্দুল্লাহ সারকাবী (র.) বলেন–
اَلْوَحْيُ اِعْلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى لِأَنْبِيَائِهِ الشَّيْءَ اِمَّا بِكَلَامٍ اَوْ بِرِسَالَةِ مَلَكٍ اَوْ مَنَامٍ اَوْ اِلْهَامٍ وَقَدْ يَجِيْءُ بِمَعْنَى الْاَمْرِ.
অর্থাৎ, ওহী হলো, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীগণকে ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় জানিয়ে দেওয়া।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اَلْوَحْيُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِالشَّرْعِ অর্থাৎ, ওহী হলো, শরীয়তের জ্ঞান দান করা।

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন– هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهِ অর্থাৎ, নবীগণের উপর আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বাণী।

৪. আল্লামা কাসতাল্লানী (র.) বলেন– هُوَ اِعْلَامُ اللّٰهِ عَلٰى اَنْبِيَائِهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবীগণকে ইলম দান করা।

৫. আল্লামা মাহমূদ হাসান আল মাদানী (র.)-এর ভাষায়– هُوَ اِعْلَامُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لِاَنْبِيَائِهِ مَا يُرِيْدُ اِبْلَاغَهُ عَلٰى وَجْهِ الْخَفَاءِ
অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার নবীগণকে এমন বিষয়াবলির ইলম দান করা, যা নবীগণের নিকট গোপনে পৌঁছানো উদ্দেশ্য।

৬. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন– هُوَ الْاِعْلَامُ الْخَفِي السَّرِيْع অর্থাৎ, গোপন সূত্রে দ্রুত প্রেরিত ইলম।

৭. আল্লামা তাকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, ওহী মানুষের জন্যে জ্ঞান আহরণের সেই সর্বোচ্চ মাধ্যম, যা দ্বারা মানুষ এমন জ্ঞান লাভ করতে পারে, যা তার ইন্দ্রিয় ও বিবেক দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।

৮. ড. ইবরাহীম মাদকুর বলেন– هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اَنْبِيَائِهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নবীগণের নিকট বা প্রত্যাদেশরূপে প্রেরণ করেন।

❖ ضَرُوْرِيَّةُ الْوَحْيِ

ওহীর প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার কোন কোন কাজ পছন্দ করেন, কোনটি পছন্দ করেন না? মানব-জীবন সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্যে এসব প্রশ্নের সদুত্তর জানা এবং সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক। কোনো সন্দেহ নেই, ওহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বুদ্ধির সীমানা থেকে উর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্নাবলির সমাধান দিয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওহীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

❖ غَرَضُ الْوَحْيِ

ওহী প্রেরণের উদ্দেশ্য : ওহী প্রেরণে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে তার রূহ জগতে স্বীকারোক্তির কথা أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাকে ওহীর মাধ্যেমে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে সুসংবাদ ও অবাধ্যতার কারণে সাবধানবাণী শুনিয়ে অজুহাত পেশ করার পথ বন্ধ করে দেওয়া। যেন কেয়ামতের দিন কোনো মানুষ এমন ওজর পেশ করতে না পারে যে, হে আল্লাহ! পৃথিবীতে এ কথাটি কেউ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়নি। পবিত্র কুরআনে নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণের হেকমত বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

অর্থাৎ, আমি সুসংবাদদানকারী ও সাবধানকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যেন রাসূল আসার পর আল্লাহর কাছে মানুষের কোনো অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। [সূরা নিসা : ১৬৫]

এ হেকমতকে সামনে রেখেই সকল যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন। [ঈযাহুল বুখারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮]

❖ اَلْاِعْتِقَادُ عَنِ الْوَحْيِ

ওহী সম্পর্কে বিশ্বাস : শরিয়তের দৃষ্টিতে যে কথাটি ওহী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। ওহীর বাণী অবিশ্বাস করা বা তাতে সন্দেহ পোষণ করা স্পষ্ট কুফরি। এ কারণে পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে– الٓمٓ. ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, আলিফ-লাম-মীম। এটি সেই কিতাব, যেখানে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীগণের জন্যে পথপ্রদর্শক। [সূরা বাকারা : ২-২]

এখানে كِتَاب বলে ওহীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ওহীর সত্যতাকে বিশ্বাস করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ.

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল সত্য তথা ওহী নিয়ে আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো। এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। [সূরা নিসা : ১৭০]

একই আয়াতে ওহীর অস্বীকার যে মূলত কুফরি, সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থাৎ, আর তোমরা ওহীকে অস্বীকারপূর্বক কুফরির পথ অবলম্বন করলে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই; ক্ষতি তোমাদেরই। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, আসমান-জমিনে যা আছে, সব আল্লাহরই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। [সূরা নিসা : ১৭০]

মক্কাবাসীদের কাছে রাসূল ﷺ ওহীর পয়গাম পেশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারাও ওহী অস্বীকার করেছিল। তখন তাদের অস্বীকারের ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ.

অর্থাৎ, হে নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট। [সূরা নিসা : ১৬৩]

মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ আয়াতে রাসূল ﷺ-এর ওহীকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওহীর সাথে তুলনা করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, ওহী অস্বীকার মানবজাতির জন্যে ভীষণ ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। পূর্ববর্তীকালে হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মত তাঁর ওহীকে অস্বীকার করায় তাদের উপর মহাপ্লাবনের আযাব নাযিল হয়েছিল।

সুতরাং বোঝা গেল, নবীকে বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাঁর ওহীকেও বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ কারণে ইসলামি শরিয়ত মতে, কোনো মানুষ মুমিন হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্যে যেমন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত ওহীর প্রতি বিশ্বাস করতে হয়, তেমনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত ওহীকেও সত্যবাণী হিসেবে বিশ্বাস করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর এবং যে কিতাব তিনি ইতঃপূর্বে [অন্যান্য নবীগণের উপর] অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর ঈমান আনো। কেউ যদি আল্লাহকে বা তাঁর ফেরেশতাগণকে বা তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে বা পরকালকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। [সূরা নিসা : ১৩৬]

❖ اَقْسَامُ الْوَحْيِ بِاعْتِبَارِ طُرُقِ النُّزُوْلِ

অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির দিক থেকে ওহীর শ্রেণিবিভাগ : নবীগণের নিকট ওহী নাযিল হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির দিক থেকে চিন্তা করেও ওহীর শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওহী মোট তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. وَحْى قَلْبِى (ওহীয়ে কালবী) : ওহীয়ে কালবী হলো এমন ওহী যা কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরিভাবে নবীর হৃদয়পটে এসে স্থান নেয়। এ পদ্ধতির ওহীর মধ্যে কোনো ফেরেশতা বা নবীর কোনো ইন্দ্রিয়শক্তির মধ্যস্থতা থাকে না। নবীর মনে কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে আগত হয়েছে। এ পদ্ধতির ওহী নবীগণের নিকট জাগ্রত বা নিদ্রিত উভয় অবস্থায় অবতীর্ণ হতো। সে কারণে নবীগণের স্বপ্নও ওহী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

২. وَحْى كَلَامِى (ওহীয়ে কালামী) : ওহীয়ে কালামী হলো এমন ওহী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে সরাসরি প্রদান করা হয়। এখানে ফেরেশতার কোনো মধ্যস্থতা থাকে না। তবে নবী আল্লাহর কুদরতি কালামের ধ্বনি শুনে থাকেন।

৩. وَحْى مَلَكِى (ওহীয়ে মালাকী) : ওহীয়ে মালাকী হলো এমন ওহী যা কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মধ্যে ওহীকে উপরিউক্ত বিবিধ প্রকারে বিভক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاۤءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ.

অর্থাৎ, মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যমে ব্যতিরেকে বা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত বা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাঁরই অনুমতিক্রমে– তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন। [সূরা শূরা : ৫১]

উপরিউক্ত আয়াতে وَحْيًا দ্বারা ওহীয়ে কালবী বোঝানো হয়েছে। তারপর مِنْ وَرَاۤءِ حِجَاب দ্বারা কালামে এলাহীকে এবং يُرْسِلَ رَسُوْلًا দ্বারা ওহীয়ে মালাকী বোঝানো হয়েছে। [উলূমুল কুরআন : মুফতী তাকী ওসমানী : পৃষ্ঠা ৩১-৩২]

❖ اَقْسَامُ الْوَحْيِ مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوْعِ

বিষয়বস্তুর বিচারে ওহীর প্রকারভেদ : বিষয়বস্তুর দিক থেকে ওহী দুই প্রকার। যথা–

এক. اَلْوَحْىُ التَّكْوِيْنِى তথা প্রকৃতি বিষয়ক ওহী : اَلْوَحْىُ التَّكْوِيْنِى বলতে প্রকৃতির সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত ওহী বোঝায়। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি ওহী নাযিল হয়েছিল, তাতে تَكْوِيْنِى বিষয়ের ওহীই ছিল অধিক পরিমাণে।

দুই. اَلْوَحْىُ التَّشْرِيْعِى তথা শরিয়ত সম্পর্কিত ওহী : اَلْوَحْىُ التَّشْرِيْعِى বলতে ধর্মীয়ভাবে মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম বোঝায়। হযরত নূহ (আ.) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত ওহীর ধারা ছিল اَلْوَحْىُ التَّشْرِيْعِى; হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যে ওহী নাযিল হতো, তা প্রধানত تَشْرِيْعِى;

❖ أَقْسَامُ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ ওহীর প্রকারভেদ : রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ ওহী দু'প্রকারে বিভক্ত। যথা–

ক. **وَحْى مُتْلُو তথা পঠিতব্য ওহী :** যে ওহীর ভাব, শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছে ন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থাও করেছেন, এ প্রকারের ওহীকে وَحْى مَتْلُو তথা পঠিতব্য ওহী বা وَحْى جَلِى তথা প্রত্যক্ষ ওহী বলা হয়। আর এটাই হলো কুরআন মাজীদ।

খ. **وَحْى غَيْر مَتْلُو তথা অপঠিতব্য ওহী :** যে ওহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু ভাষা ও শব্দ রাসূল ﷺ-এর, তাকে وَحْى غَيْر مَتْلُو তথা অপঠিতব্য বা وَحْى خَفِى তথা প্রচ্ছন্ন ওহী বলা হয়। এ প্রকারের ওহী হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর হাদীস।

❖ كَيْفِيَّاتُ نُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

নবী করীম ﷺ-এর উপর ওহী নাজিলের পদ্ধতিসমূহ : নবী করীম ﷺ-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ.

এ আয়াতের উপর ভিত্তি করেই আল্লামা সুহাইলী (র.) বলেন, নাযিল হওয়ার দিকটি বিবেচনা করে ওহীর ধরন সাতটি। যথা–

১. **فِى الْمَنَام অর্থাৎ, স্বপ্নযোগে :** এ পদ্ধতিকে اَلرُّؤْيَا الصَّادِقَة বলা হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে–

اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيًا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. (بخارى)

কতিপয় আলেম, سورة الكوثر -কে এ শ্রেণির ওহীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

২. **مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ তথা ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় :** কোনো কোনো সময় ওহী নাযিল হতো ঘণ্টার আওয়াজের ন্যায়। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীস–

١. اَسْمَعُ صَلَاصِلَ ثُمَّ اَسْكُتُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُّوْحٰى اِلَىَّ اِلَّا ظَنَنْتُ اَنَّ نَفْسِىْ تُقْبَضُ.

٢. اَحْيَانًا يَأْتِيْنِىْ مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ.

এটি ছিল রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহী নাজিলের কঠিনতম পদ্ধতি।

৩. **النفث فى الرو তথা অন্তরে ওহী ফুঁকে দেওয়া :** কখনো কখনো জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-এর প্রতি কালাম প্রক্ষেপণ করতেন বা উদ্রেক করে দিতেন। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِى رُوْعِىْ

৪. **قُدُوْمُ الْمَلَكِ فِىْ صُوْرَةِ إِنْسَانٍ অর্থাৎ, মানব আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন :** হযরত জিবরাইল (আ.) কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট মানুষের রূপে আগমন করতেন। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় হযরত দিহইয়াতুল কালবী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করে আসতেন এবং ওহী পাঠ করে শোনাতেন। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

١- وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِى الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِىْ.

٢- اِنَّ اَكْثَرَ مَا يَأْتِيْنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلٰى صُوْرَةِ دِحْيَةِ الْكَلْبِى.

এটাই ছিল ওহী নাজিলের সহজতম পদ্ধতি।

৫. **قُدُوْمُ الْمَلَكِ فِىْ صُوْرَتِهٖ নিজ আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন :** কোনো কোনো সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজস্ব আকৃতিতে ওহী নিয়ে আগমন করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

١- اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى جِبْرَئِيْلَ وَلَهٗ سِتُّ مِأَةِ جَنَاحٍ.

٢- فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ بحراء جَالِس عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

৬. **بِوَسِيْلَةِ إِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর মাধ্যমে :** কোনো কোনো সময় হযরত ইসরাফীল (আ.) রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আগমন করতেন। হযরত শাবী বর্ণিত হাদীসে আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَكَّلَ بِهٖ اِسْرَافِيْلَ فَكَانَ يَتَرَاى لَهٗ ثَلَاث سِنِيْنَ يَأْتِيْهِ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْوَحْيِ وَالشَّىْءِ ثُمَّ وكل بِهٖ جِبْرَائِيْلَ.

৭. **بِالتَّكَلُّمِ مُبَاشَرَةً সরাসরি কথোপকথন :** যেমন মেরাজের রাতের ওহীর কথা মহানবী ﷺ নিজেই বলেন–

لَمَّا اَسْرٰى بِىْ اِلَى السَّمَاءِ قَرَّبَنِىْ رَبِّىْ تَعَالٰى حَتّٰى كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَ يَا حَبِيْبِىْ يَا مُحَمَّدُ ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَبِّ

اَلْبَحْثُ السَّابِعُ : اَلتَّفْسِيْرُ وَالتَّأْوِيْلُ وَاَقْسَامُ التَّفْسِيْرِ وَمَصَادِرُهُ

সপ্তম আলোচনা : তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও উৎস

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- تَعْرِيْفُ التَّفْسِيْرِ
٢- مَوْضُوْعُ التَّفْسِيْرِ
٣- غَرْضُ التَّفْسِيْرِ
٤- فَائِدَةُ التَّفْسِيْرِ
٥- نَشْأَةُ التَّفْسِيْرِ وَتَطَوُّرُهُ
٦- مُمَيِّزَاتُ التَّفْسِيْرِ فِيْ عَهْدِ التَّابِعِيْنَ
٧- بَعْضُ تَفَاسِيْرِ التَّابِعِيْنَ
٨- مَصَادِرُ التَّفْسِيْرِ الْمُعْتَبَرَةُ
٩- مَصَادِرُ التَّفْسِيْرِ الْمَرْجُوْحَةُ
١٠- أَقْسَامُ التَّفْسِيْرِ
١١- تَقْسِيْمٌ آخَرُ لِلتَّفْسِيْرِ
١٢- أَوْجُهُ التَّفْسِيْرِ
١٣- اَلْفَرْقُ بَيْنَ التَّفْسِيْرِ وَالتَّأْوِيْلِ
١٤- بَعْضُ أَسْمَاءِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالتَّأْوِيْلِ
١٥- تَعْرِيْفُ أُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ
١٦- مَوْضُوْعُ أُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ
١٧- غَرْضُ أُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ

আল-কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান; যাতে রয়েছে যাবতীয় সমস্যার সমাধান। কুরআনের সংক্ষিপ্ততার কারণে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি। এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মুসলিম অঙ্গনে تفسير নামে খ্যাত। নীচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

❖ تَعْرِيْفُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীরের পরিচয় : নীচে تفسير -এর পরিচয় তুলে ধরা হলো–

ক. আভিধানিক অর্থ : تفسير শব্দটি (ف.س.ر) মূলবর্ণ হতে নিঃসৃত; যা বাবে تفعيل-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– নীচে বর্ণনা করা হলো–

১. আল-মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– هُوَ الشَّرْحُ وَالْبَيَان তথা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা।
২. ইতকান প্রণেতা আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে, اَلْبَيَانُ وَالْكَشْفُ তথা বর্ণনা ও উন্মোচন করা।
৩. কারো কারো মতে– اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ الْإِيْضَاحُ অর্থাৎ, تَفْسِيْر হলো সুস্পষ্টতা।
৪. কারো কারো মতে, এটি سفر থেকে নির্গত; যার অর্থ আলোকিত করা।
৫. কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে, التفسير শব্দটি تفسرة হতে নিষ্পন্ন; এর অর্থ অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগজীবাণু শনাক্ত করা।
৬. কারো নিকট এর অর্থ হলো– الإظهار তথা প্রকাশ করা।
৭. কেউ বলেন– كشف المغطى তথা আচ্ছাদিতকে খুলে দেওয়া।
৮. আবুল হাইয়ান বলেন, এটি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে খুলে দেওয়া অর্থে ব্যবহার হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : تفسير -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা–

১. মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন–

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ اَحْوَالِ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ مِنْ حَيْثُ نُزُوْلِهٖ وَسَنَدِهٖ وَاَدَبِهٖ وَأَلْفَاظِهٖ وَمَعَانِيْهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنَّظْمِ وَالْاَحْكَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

অর্থাৎ, تفسير এমন শাস্ত্রের নাম, যাতে সম্মানিত কিতাব কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২. আল্লামা জুরজানী (র.) বলেন–

تَوْضِيْحُ مَعْنَى الْآيَةِ وَشَانِهَا وَقِصَّتِهَا وَالسَّبَبِ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهَا بِلَفْظٍ يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاهِرَةً.

অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, এর শানে নুযূল, আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও যে উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা সুস্পষ্ট অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।

৩. ড. হোসাইন আয-যাহাবী বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ اَوْ اَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا
অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বাণী তথা কুরআনুল কারীমের শব্দমালা ও তার মর্মার্থের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৪. আল্লামা তাশকুবরা যাদাহ উল্লেখ করেন– هُوَ عِلْمٌ مِنْ مَعْنَى نَظْمِ الْقُرْآنِ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّة
তাফসীর হলো এমন শাস্ত্র যেখানে সামর্থ মোতাবেক কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়।

৫. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– هُوَ عِلْمُ نُزُوْلِ الْآيَاتِ وَشُئُوْنِهَا وَاَقَاصِيْصِهَا وَالْاَسْبَابِ النَّازِلَةِ فِيْهَا ..... وَعِبَرِهَا وَاَمْثَالِهَا
তাফসীরুল কুরআন এমন শাস্ত্রকে বলা হয়, যেখানে কুরআনের আয়াতের শানে নুযূল, আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি, এর উদ্দেশ্যসমূহ, উপদেশমালা ও দৃষ্টান্তসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

৬. আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন– هُوَ الْعِلْمُ الْبَاحِثُ عَنْ اُصُوْلِ كَلَامِ اللّٰهِ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ
তাফসীর হলো এমন শাস্ত্র, যেখানে আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি উসূলে কালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৭. আল্লামা আবদুল আযীম যারকানীর মতে–
هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اَحْوَالِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهِ عَلَى مُرَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ.
তাফসীরুল কুরআন হলো এমন শাস্ত্র, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়।

৮. আল্লামা আলুসী (র.)-এর মতে–
اِنَّهُ عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِاَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَدْلُوْلَاتِهَا وَاَحْكَامِهَا الْاِفْرَادِيَّة وَالتَّرْكِيْبِيَّة وَمَعَانِيْهَا الَّتِيْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا
তা হলো এমন শাস্ত্র; যেখানে কুরআনের বর্ণনাশৈলী, অর্থ, আয়াতের মাধ্যমে বিবৃত মৌলিক ও গঠনমূলক বিধি-বিধান ও কুরআনের নিগূঢ় মর্মার্থের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হয়।

❖ مَوْضُوْعُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীরের আলোচ্য বিষয় : التفسير -এর আলোচ্য বিষয় নির্ধারণে জমহুর আলেম নীচে বর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন–
اِنَّ مَوْضُوْعَ التَّفْسِيْرِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ خَاصَّةً الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ.
অর্থাৎ, মহাগ্রন্থ কুরআনই التفسير -এর আলোচ্য বিষয়। বিশেষত কুরআনুল কারীমের মুহকাম আয়াতসমূহ।

❖ غَرْضُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীরের উদ্দেশ্য : التفسير -এর একটি উদ্দেশ্য হলো, মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের বিশেষ করে আয়াতে মুহকামাতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করত এর সঠিক নির্দেশনা মোতাবেক কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা।

১. তানবীর প্রণেতা বলেন– وَغَرَضُهُ سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ
২. জমহুরের মতে– اَلتَّمَسُّكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

❖ فَائِدَةُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীরের উপকারিতা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি তথা মানবজাতিকে এমন কালাম দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যা তারা অনুধাবন করতে পারে। এ কারণেই তিনি সকল নবী-রাসূলকে স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং প্রত্যেকের নিকট তাদের জাতীয় ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। তারপরও কয়েকটি কারণে তাফসীরের প্রয়োজন হয়। নীচে তা পেশ করা হলো–

১. **উচ্চতর পাণ্ডিত্য :** বক্তার উচ্চমানের যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। কেননা, তাঁর উচ্চাঙ্গের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের শব্দ ব্যবহার হয় এবং জ্ঞানপূর্ণ বাক্য ও ভাব প্রতিফলিত হয়। কোনো কোনো সময় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না, তাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

২. **কম গুরুত্ব :** কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বের কারণে বক্তব্য সংক্ষেপিত থাকে। ফলে পরবর্তী সময়ে এটাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। অথবা এটা অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় লেখক এর আলোচনা করে না। তখন পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যাকারীর এটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৩. **বহুভাবের সমাহার :** আল কুরআনুল কারীমে এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি একাধিক অর্থের অবকাশ রাখে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য অর্থের প্রাধান্য দেওয়া অত্যাবশ্যক বিধায় তাফসীরের দ্বারস্থ হতে হয়।

৪. **মুসান্নিফের অনুসরণ :** একই শব্দের একাধিক অর্থ হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীকে মুসান্নিফের উদ্দিষ্ট অর্থ প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করতে হয়। যেমন– مجاز, اشتراك এবং دَلَالَةُ الْاِلْتِزَامِ-এরমধ্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। তখন তাফসীর নির্ণয় দ্বারা সঠিক অর্থ করা যায়।

আমরা জানি, আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায় বিশুদ্ধভাষী ও اَفْصَحُ الْعَرَب রাসূল ﷺ-এর যুগে। তখন তারা উক্ত কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ ও হুকুমসমূহ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর সূক্ষ্ম ও অভ্যন্তরীণ অর্থ প্রকাশিত হতো না; যে পর্যন্ত এ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান করা না হতো এবং সাহাবীগণ তা বোঝার জন্যে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন– যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো– وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ তখন সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের উপর জুলুম করেনি? রাসূল ﷺ তখন এর ব্যাখ্যা করলেন যে, এখানে ظُلْم -এর অর্থ শিরক করা। দলিল হিসেবে অন্য আয়াত পেশ করলেন– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ-কে اَلْحِسَابُ الْيَسِيْر সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন– ذٰلِكَ الْعَرْضُ অর্থাৎ হিসাব পেশ করা।

সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, আরববাসী ও সাহাবীগণ কুরআনের ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো শব্দ বা আয়াতের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে। আর আমরা তো অনারবীয় ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং তাঁদের চেয়ে আমরা তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকতর মুখাপেক্ষী।

❖ نَشْأَةُ التَّفْسِيْرِ وَتَطَوُّرُهُ

তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : এ প্রসঙ্গে নীচে বর্ণিত মন্তব্যগুলো হলো–

১. কুরআনের একটি আয়াত ঐ বিষয়ের অপর আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্বরূপ। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের প্রথম মুফাসসির বা ব্যাখ্যাকার। মহান আল্লাহ নিজেই বলেন–

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه .

তারপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের তাফসীরের দায়িত্ব রাসূল ﷺ-কে প্রদান করেছেন। তিনি সাহাবীদের কুরআনের জটিল বিষয়াদি যা তারা বুঝতে পারত না, তা বুঝিয়ে দিতেন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল ﷺ দ্বিতীয় তাফসীরকার। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন– وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

২. কিছুসংখ্যক প্রাচ্যবিদের মতে, তাফসীরের উৎপত্তি হয় হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তাঁদের সেই ধারণা সঠিক ও বাস্তবসম্মত নয়।

৩. ড. সুবহী সালিহ (র.) বলেন– وَلَقَدْ نَشَأَ التَّفْسِيْرُ مُبَكِّرًا فِىْ عَصْرِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ كَانَ اَوَّلَ شَارِحٍ لِكِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তাফসীরের সূচনা ও বিকাশ ঘটে নবী করীম ﷺ-এর সময়ের প্রাথমিক অবস্থায়, যিনি ছিলেন কুরআনুল কারীমের প্রথম মুফাসসির তথা ব্যাখ্যা প্রদানকারী।

৪. ড. আহমদ শারবাসী তাফসীরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন, তাফসীর প্রথমে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরম্ভ হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে। তারপর সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তারপর তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ী, তারপর উলামায়ে সালফ, তারপর উলামায়ে খালফ, তারপর মুতাআখখিরীনের তাফসীর এবং সর্বশেষ সমসাময়িক উলামায়ে কেরামের তাফসীর।

৫. ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী 'তাফসীরুল কুরআন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে তাফসীরের ক্রমবিকাশকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। যথা– ক. মৌখিক বর্ণনার যুগ, খ. সংকলন যুগ, গ. আধুনিক যুগ।

উল্লেখ্য, মৌখিক বর্ণনার যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ১. রাসূল ﷺ-এর স্তর। ২. সাহাবীদের স্তর। ৩. তাবেয়ীদের স্তর।

পরিশেষে বলা যায়, তাফসীরশাস্ত্রের আবির্ভাবের পর বর্ণনার ব্যবহার ও বুদ্ধির ব্যবহার উভয়টিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করে; যা মৌখিক ও লিখিত সংকলনের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

❖ مُمَيِّزَاتُ التَّفْسِيْرِ فِىْ عَهْدِ التَّابِعِيْنَ

তাবেয়ীদের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্যসমূহ : তাফসীরশাস্ত্রের ইতিহাসে তাবেয়ীদের যুগটি দ্বিতীয় স্তরের। সরাসরি মহানবী ﷺ-কে দেখতে না পেলেও মহান সাহাবীদের সাক্ষাৎধন্য হয়ে তাবেয়ীগণও خير القرون তথা কল্যাণ যুগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের তাফসীর সাহাবীদের পরে পৃথিবীর যে কোনো সময়ের তাফসীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নীচে তাবেয়ীদের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করা হলো–

এক. ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্য : তাবেয়ীদের যুগে তাফসীর তাঁদের পরবর্তীদের তাফসীরের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার পিছনে যে বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয়, তা হলো তাঁদের তাফসীরের মূলভিত্তি। যেমন–

১. সর্বপ্রথম তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁরা কুরআনের উপর নির্ভর করতেন।
২. তারপর সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে বর্ণিত নবী করীম ﷺ-এর হাদীসের উপর।
৩. তারপর সাহাবীগণের নিজস্ব মতামতের উপর।
৪. তারপর আহলে কিতাবের বাণী, যা তাঁদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।
৫. তারপর নিজস্ব ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণা।

দুই : মৌলিক বৈশিষ্ট্য : তাবেয়ীদের তাফসীরে মৌলিক চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. তখনো তাফসীর মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতেই চলে আসছিল। তাবেয়ীগণ সাহাবীদের থেকে রেওয়ায়েত করতেন। এমনকি তাবেয়ীগণ একে অন্যের থেকেও তাফসীর রেওয়ায়েত করতেন।
২. এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন মাদরাসার উস্তাদগণের সংশ্লিষ্টতাকেন্দ্রিক বিশেষত্ব ছিল। যেমন– মক্কাবাসীরা হযরত ইবনে আব্বাস, মদিনাবাসীরা হযরত উবাই ও ইরাকী কুফীগণ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন।
৩. তাবেয়ীদের যুগেই ফিকহভিত্তিক মতবৈচিত্রের সূচনা হয়, যা তাফসীরের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্যে এমনভাবে তাফসীর করা শুরু হয়ে যায়, যা অনেকটা ঐ ধরনের মতভেদেরই রূপ দেয়।
৪. তাবেয়ীদের তাফসীরে ইজতেহাদের পাশাপাশি কিছু কিছু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত অনুপ্রবেশ করে।

তিন : মাদরাসাকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য : তাবেয়ীগণের মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন–

১. মক্কার মাদরাসায় শাব্দিক ব্যাখ্যার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়।
২. মক্কা ও ইরাকের মাদরাসায় শিষ্যদের মাঝে তাফসীর করতে গিয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অনুমতি ছিল।
৩. মদিনার মাদরাসায় মুফাসসিরগণ বর্ণনামূলক তাফসীরকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের মাঝে বুদ্ধির ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত।
৪. অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় মদিনার মাদরাসায় মতবৈচিত্রের মাত্রা ছিল কম।
৫. অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় মক্কার মাদরাসায় ঐতিহাসিক আলোচনা ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বেশি গ্রহণ করা হয়। এমনকি মক্কার মাদরাসাকে তাফসীর বিল-মাসূর ও তাফসীর বির রায়ে -এ দুটিকে সম্মিলনের সূচনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

❖ بَعْضُ تَفَاسِيْرِ التَّابِعِيْنَ

তাবেয়ীদের কতিপয় তাফসীর : তাবেয়ীদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিম্নে পেশ করা হলো–

১. **তাফসীরে মুজাহিদ :** এটি বুদ্ধিনির্ভর তাফসীর। এতে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা, আসবাবে নুযূল, নাসেখ-মানসুখ, কেরাত ও ফিকহী মাসআলা রয়েছে এবং আয়াত দ্বারা আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে। এ তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। যথা–
   ক. ইবনে তাইমিয়ার মতে, আবূ নাজিহের সূত্রে মুজাহিদের তাফসীরের মতো সহীহ তাফসীর আর কারো মাধ্যমে হয়নি।
   খ. সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন, তোমার নিকট যখন মুজাহিদের তাফসীর পেশ করা হয়, তখন তোমার জন্যে তা-ই যথেষ্ট।
   গ. মুজাহিদ (র.) নিজেই বলেন–
   عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، أُوْقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا
২. **তাফসীরে হাসান আল-বসরী :** ১১০ হিজরিতে হাসান বসরী (র.) এ তাফসীর রচনা করেন, যা ১৯৯২ সালে ড. আবদুর রহীম -এর সম্পাদনায় মিসরের 'দারুল হাদীস' দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। তবে মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া না যাওয়ায় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে হাসান বসরীর উদ্ধৃতি সংগ্রহপূর্বক এটি সম্পাদনা করা হয়। হাসান বসরী (র.) নিজে সুফী বলে এতে তাসাউফের দিকটি অগ্রাধিকার রয়েছে।
৩. **তাফসীরে সুফিয়ান আস-সাওরী :** হিন্দুস্থানের ইমতিয়ায আলী আরশী -এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সনে বৈরুত থেকে নতুন সংস্করণ বের হয়। এটি তাফসীর বিল-মাসূর এবং আহলে সুন্নাতের আকিদা সম্মলিত একটি তাফসীরগ্রন্থ। এতে শাব্দিক ব্যাখ্যার প্রাধান্য পেয়েছে; তবে ফিকহী আলোচনা নেই বললেই চলে।

অন্যান্যের চেয়ে তাবেয়ীদের যুগে তাফসীরের বিশেষত্ব, পরিধি ও সংখ্যা অনেক বেশি। এক কথায় আমাদের বর্ণনার উর্ধ্বে। তারা জগদ্বাসীকে তাফসীরের যে মহাসম্পদের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন, তার আমানত বহন করতে আমাদের অনেকেই অসমর্থ। তারা যেসব ধারা সৃষ্টি করেছেন, তাতেই তরঙ্গায়িত হয়ে বর্তমানরূপ লাভ করেছে এ মহান শাস্ত্র।

❖ مَصَادِرُ التَّفْسِيْرِ الْمُعْتَبَرَةُ

তাফসীরের নির্ভরযোগ্য উৎস : তাফসীরের উৎস বলতে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানা যায়। তাফসীরের নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ নিম্নরূপ–

১. **আল কুরআনুল কারীম :** তাফসীর শাস্ত্রের উৎস স্বয়ং কুরআনুল কারীম। অর্থাৎ, কুরআনের কোনো কোনো আয়াত কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অপরটির ব্যাখ্যা স্বরূপ। এক স্থানে একটি কথা অস্পষ্টভাবে বলা হলো এবং অন্য স্থানে এ অস্পষ্টতা দূর করে স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। যেমন সূরা ফতেহায় ইরশাদ হয়েছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

উক্ত আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা? এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি; কিন্তু অন্যত্র বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে ইরশাদ হয়েছে– اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ এমনিভাবে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ কিন্তু সে কালেমা বা বাক্যগুলো কী ছিল? একথা বলা হয়নি। অন্যত্র এই কালেমা ও বাক্যগুলো স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

২. **আল হাদীস :** রাসূল ﷺ-এর জীবন কুরআন শরীফের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কোনো আয়াতের মর্ম উদ্ধারে জটিলতা অনুভব করলে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তিনি সকল সমস্যা, সংশয় ও জটিলতার সমাধান করতেন। কারণ, কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রাসূল ﷺ-এর দায়িত্বের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

অতএব, কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা ও আদর্শ হচ্ছে কুরআন তাফসীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৩. **সাহাবায়ে কেরামের উক্তি :** সাহাবায়ে কেরাম হলেন নবী করীম ﷺ-এর নিকট সরাসরি কুরআনের তালিমপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ছিলেন কুরআনের ভাষাভাষী। কুরআন অবতরণ ও সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ অবগত। এজন্যে তাঁদের উক্তি ও অভিমত তাফসীরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। তাই সাহাবীগণ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া গেলে তা মারফু হাদীস সমতুল্য হবে। তাঁদের বর্ণনা ব্যক্তিগত অভিমত বলে পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা, তাঁরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার গোপন রহস্য, বর্ণনাভঙ্গি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা কুরআন নাজিলের প্রকৃত অবস্থা ও পরিস্থিতি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অসাধারণ স্মরণশক্তি ও ধীশক্তি দান করেছিলেন।

৪. **তাবেয়ীগণের বক্তব্য :** যেসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরামের মুখ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই হলেন তাবেয়ী। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, তাবেয়ী কোনো সাহাবী হতে তাফসীর উদ্ধৃত করলে তা সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাবেয়ী তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করলে দেখা হবে, অন্য কোনো তাবেয়ীর অভিমত তাঁর সাংঘর্ষিক কিনা? যদি কোনো অভিমত তাঁর অভিমতের বিরোধী হয়, তবে তাবেয়ীর উক্তি বা অভিমত হুজ্জত হিসেবে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় আয়াতের তাফসীরের জন্যে কুরআনুল কারীম, আরবি অভিধান, হাদীসে নববী, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও অন্যান্য শরয়ী দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে একই-তাফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের মতানৈক্য না হলে নিঃসন্দেহে তাঁর তাফসীর হুজ্জত হবে। এ তাফসীরের অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে।

৫. **আরবি অভিধান :** কুরআনের যে সমস্ত যেসব আয়াতের আলোচ্য বিষয় এতই সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, যার আলোচ্য বিষয়ে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা নেই এবং বোঝার জন্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্রতা জানার প্রয়োজন নেই, সেখানে তাফসীরের জন্যে আরবি অভিধানই একমাত্র উৎস। কিন্তু যেখানে কোনো অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্তা দেখা যায় বা যে আয়াত কোনো সংঘটিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বা এর দ্বারা কোনো ফিকহী বিধান উদ্‌ঘাটন করা হয়, সেখানে কেবল অভিধানের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত উৎসগুলোই মূলভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

৬. **পরিশুদ্ধ বিবেকবুদ্ধি :** দুনিয়ার প্রতিটি কাজকর্মেই শান্ত, পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ বিবেকবুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পূর্বোক্ত উৎসগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে হলেও এ গুণটি ব্যতীত তা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, কুরআন শরীফ একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিপুণ ও বৈচিত্র্যময় তথ্য ও তত্ত্বের অতলান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায়। উল্লিখিত পঞ্চ উৎসের মাধ্যমে প্রয়োজনানুযায়ী এর বিষয়বস্তু জানা যাবে; কিন্তু এর তথ্য ও তত্ত্ব, হেকমত ও দর্শনের বিষয়ে কোনো যুগেই একথা বলা যাবে না যে, এর প্রান্তসীমা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আর অধিক বলা বা আবিষ্কারের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য হলো, কুরআনের তথ্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধান, চিন্তা ও গবেষণার দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে।

মহান আল্লাহ যাকে ইলম, জ্ঞান, বুদ্ধি, খোদাভীতি ও সান্নিধ্যের দৌলতে সৌভাগ্যশীল করবেন, তিনি এ উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করে নব বৈচিত্র্যময় দিগন্ত উন্মোচিত করতে সক্ষম হবেন। এভাবেই তাফসীরকারগণ যুগে যুগে নিজেদের আকণ্ঠ নিমগ্ন সাধনায় মানবজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। এটি এমন এক মহাভাণ্ডার, যার জন্যে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অনুকূলে দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! একে তাফসীরের জ্ঞান ও দীনের প্রজ্ঞা দান করুন।

স্মরণ রাখতে হবে– সমঝ, আকল ও বুদ্ধির উদ্‌ঘাটিত যেসব তথ্য ও তত্ত্ব গ্রহণীয় হবে, সেগুলো যেন শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতি ও উল্লিখিত পঞ্চ উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। শরীয়তে মৌলনীতির উপর আঘাত করে যত তথ্য ও তত্ত্বই বর্ণনা করা হোক, ইসলামে এর কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। [উলূমুল কুরআন : তাকী ওসমানী ৩২৭-৩৪৩]

❖ مَصَادِرُ التَّفْسِيْرِ الْمَرْجُوْحَةُ

তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ

ইসরাঈলী রেওয়ায়েত : যে সমস্ত রেওয়ায়েত ইহুদী বা খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোকে বলা হয় اسرائيليات [ইসরাঈলী বর্ণনা]। এ বর্ণনাগুলোর কিছু সরাসরি বাইবেল বা তালমুদ নামক গ্রন্থ হতে গৃহিত হয়েছে। কিছু অংশ এসেছে মুসনা বা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে। কিছু বর্ণনা রয়েছে মৌখিক। আহলে কিতাবের মাঝে যুগ-যুগ ধরে এগুলো বর্ণিত ও শ্রুত হয়ে আসছে। আরবের ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাঝে এগুলো ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। প্রচলিত তাফসীরগ্রন্থসমূহে বিপুল পরিমাণে এ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত গবেষক ও তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ রেওয়ায়েতগুলোর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, এ ধরনের রেওয়ায়েত তিন প্রকারে বিভক্ত এবং প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। যথা–

১. নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সত্যায়িত হয়েছে। যেমন– ফেরাউনের নীল নদে নিমজ্জিত হওয়া, হযরত মূসা (আ.)-এর তূর পাহাড়ে গমন, জাদুকরদের সাথে তাঁর মুকাবিলা হওয়ার ঘটনা। এ সকল বর্ণনা এজন্যেই গ্রহণযোগ্য হবে যে, কুরআনুল কারীম বা সহীহ হাদীসে এগুলোর পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে।

২. নির্ভরযোগ্য দলিলাদির মাধ্যমে যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন– হযরত সোলায়মান (আ.) জীবনের শেষপ্রান্তে এসে [মাআযাল্লাহ] মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়া। [বাইবেল, কিতাব সালাতীন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১-১৩]
কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এ বর্ণনার প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

৩. নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা যেসব ইসরাঈলী বর্ণনার সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কোনোটাই প্রমাণিত হয় না এবং তা কুরআন, হাদীস বা ইসলামের স্বীকৃত কোনো মূলনীতির বিরোধী নয়; যেমন তাওরাতের বিধানসমূহ– এমন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا تُصَدِّقُوْهَا وَلَا تُكَذِّبُوْهَا (এগুলোকে সত্যও বলো না, মিথ্যাও বলো না।)
এ প্রকারের রেওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়েজ আছে বটে; কিন্তু এগুলোর উপর ভিত্তি করে শরিয়তের কোনো বিষয় সাব্যস্ত করা যাবে না, তেমনি এগুলো বর্ণনা করার দ্বারা বিশেষ কোনো উপকারও নেই।
মৌলিক এ তিনটি প্রকার ছাড়াও ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের আরেকটি প্রকার রয়েছে। সেটি হলো, যে সকল ইসরাঈলী বর্ণনা বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাভাবিক যুক্তির বিরোধী। এ ধরনের আকল ও যুক্তি বিরোধী ইসরাঈলী বর্ণনা সম্পর্কে ইবনে কাসীর (র.) বলেন–
وَإِنَّمَا أَبَاحَ الشَّارِعُ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ فِيْ قَوْلِهِ ﷺ "حَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ" فِيْمَا قَدْ يَجُوْزُهُ الْعَقْلُ فَأَمَّا فِيْمَا تُحِيْلُهُ الْعُقُوْلُ وَيَحْكُمُ فِيْهِ بِالْبُطْلَانِ وَيَغْلِبُ عَلَى الظُّنُوْنِ كِذْبُهُ فَلَيْسَ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ.
অর্থাৎ, রাসূল ﷺ একটি হাদীসে ইহুদীদের কাছ থেকে রিওয়ায়েত করার বৈধতা দান করেছেন "তোমরা বনী ইসরাইলের সূত্রে বর্ণনা করতে পার; এতে কানো সমস্যা নেই।" এ বৈধতার হুকুম শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি ইহুদিদের বর্ণিত বক্তব্যটি কে বাস্তব হিসেবে আখ্যায়িত করবে।
কিন্তু স্বাভাবিক বিবেক ও বিচারবুদ্ধি যদি ইহুদিদের বক্তব্যটিকে অবাস্তব মনে করে এবং তা বাতিল বলে আখ্যায়িত করে কিংবা প্রবল ধারণা হয় যে, ইসরাইলী রেওয়ায়েতটি মিথ্যা, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।

সুফিয়ায়ে কেরামের তাফসীর : কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের অধীনে সুফিয়ায়ে কেরামের কিছু এমন কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো বাহ্যত তাফসীরই মনে হয়; কিন্তু তা আয়াতের বাহ্যিক ও বর্ণিত অর্থের পরিপন্থি হয়ে থাকে। যেমন কুরআনের ইরশাদ হয়েছে– قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ (তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো)। এ আয়াতের অধীনে কোনো কোনো সুফী-সাধক বলেছেন – قَاتِلُوْا النَّفْسَ فَإِنَّهَا تَلِى الْإِنْسَانَ (তোমারা নফসের সাথে যুদ্ধ কারো। কেননা, এটা মানুষের সবচেয়ে নিকটতর)।

❖ اَقْسَامُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীরের প্রকারসমূহ : তাফসীরকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

এক. التفسير بالمأثور তথা ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত তাফসীর :

পরিচয় : নীচে তাফসীর বিল-মাসূর -এর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

ক. আভিধানিক অর্থ : المأثور শব্দের অর্থ– পরম্পরাগত, ধারাবাহিকসূত্রে বর্ণিত ও বর্ণনামূলক। সুতরাং اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْر -এর অর্থ হলো, যে তাফসীর পরম্পরাগত বা ধারাবাহিকসূত্রে বর্ণিত। আল কুরআনুল কারীমের বর্ণনামূলক তাফসীরকে التفسير بالمأثور বলে। এর অপর নাম اَلتَّفْسِيْر بِالرِّوَايَة

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : التفسير بالمأثور -এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যথা–

১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী বলেন, আল্লাহর বাণীসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনায় কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কথামালায় যা এসেছে, তা বর্ণনা করাকে 'আত-তাফসীর বিল-মাসূর' বলে।

২. ড. যফযাফ বলেন, তাফসীর বিল-মাসূর হচ্ছে, যা নবী করীম ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়।

৩. অধ্যাপক আহমদ আমীন বলেন, তাফসীর বিল-মাসূর বলতে আমরা নবী করীম ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের বর্ণনাকেই বুঝি।

اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْر -এর প্রকারভেদ : 'তাফসীর বিল-মাসূর' চার ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা তাফসীর।	١- تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ.
২. রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা তাফসীর।	٢- تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِالْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ.
৩. সাহাবীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর।	٣- تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ.
৪. তাবেয়ীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর।	٤- تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ التَّابِعِيْنِ.

اَلتَّفْسِيْر بِالْمَأْثُوْر -এর উদাহরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِق আয়াতের اَلطَّارِق -এর ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ

একইভাবে কুরআনের আয়াত– غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ -এর মাঝে اَلْمَغْضُوْب ও الضَّالِّيْن -এর ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ বলেন, তারা হলো ইহুদি ও নাসারাগণ।

হুকুম : 'তাফসীর বিল-মাসূর' -এর চার ভাগের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে সেগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো–

১. আল কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা তাফসীর।

২. রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা তাফসীর।

١- تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ.

٢- تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِالْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ.

এ দু'প্রকার তাফসীর গ্রহণের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে এর প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

৩. تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ সাহাবীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর।

সাহাবীগণ (রা.)-এর বর্ণনা যদি মারফু -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যদি তা মাওকুফ হয়, তবুও তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, তবে এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে বৈপরীত্য থাকতে পারবে না। যদি বৈপরীত্য থাকে, তবে তা গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

৪. تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ التَّابِعِيْنِ তাবেয়ীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর।

তাবেয়ীগণের তাফসীরের হুকুমের ব্যাপারে দুটো বক্তব্য রয়েছে। যথা–

ক. একদলের মতে, তাবেয়ীদের তাফসীর গ্রহণ করা যাবে না। আল্লামা ইবনে আকীল এ দলের সমর্থক।

খ. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, তাবেয়ীদের তাফসীর গ্রহণযোগ্য। কেননা, তাঁরা সরাসরি ঐ সাহাবীদের থেকে তাফসীর গ্রহণ করেছেন, যারা সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং তাবেয়ীদের ইজতেহাদ গ্রহণ করা যাবে। তবে যদি তাবেয়ীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা উত্তম। কিন্তু যদি কোনো তাবেয়ী আহলে কিতাব নির্ভর হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর

পরিচয় : নীচে اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ-এর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

ক. আভিধানিক অর্থ : اَلرَّأْيِ (রায়) শব্দের অর্থ– মত, অভিমত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত। اَلرَّأْيِ শব্দটি বিশ্বাস, ইজতেহাদ বা কেয়াসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। সাধারণত রায় বলতে জ্ঞানী ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত গবেষণার নির্যাস বা সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। এ প্রকার তাফসীরকে اَلتَّفْسِيْرُ بِالدِّرَايَةِ তথা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তাফসীর বলে।

খ. পরিভাষিক সংজ্ঞা

১. ড. মুহাম্মদ হোসাইন আয-যাহাবী (র.) এক্ষেত্রে চমৎকার মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন–

عِبَارَةٌ عَنْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ بِالْاِجْتِهَادِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمُفَسِّرِ لِكَلَامِ الْعَرَبِ وَمَنَاحِيْهِمْ فِي الْقَوْلِ مَعْرِفَتِهِ لِلْاَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ وَوُجُوْهِ دَلَالَتِهَا وَاسْتِعَانَتِهِ فِيْ ذٰلِكَ بِالشِّعْرِ الْجَاهِلِيِّ وَوُقُوْفِهِ عَلٰى أَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالنَّسْخِ وَالْمَنْسُوْخِ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاَدَوَاتِ الَّتِيْ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْمُفَسِّرُ.

২. আল্লামা সাবুনী বলেন, রায় বলতে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ও প্রচলিত বিধিবিধানসম্মত পন্থায় ইজতেহাদ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে মুফাসসিরের দায়িত্ব হলো, কুরআনের তাফসীরে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে তার মর্মার্থ প্রকাশ করা। শুধু নিজস্ব মত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা মনে যা আসে বা ইচ্ছে করে, সে অনুসারে কুরআনের তাফসীর করা সমীচীন নয়।

اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ -এর প্রকারভেদ : اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ সাধারণত তিন প্রকার। যথা–

১. **اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ الْمَحْمُوْدُ :** শরিয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, ভ্রষ্টতা ও মূর্খতামুক্ত, আরবি ভাষার নীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ الْمَحْمُوْدُ তথা প্রশংসিত অভিমতসর্বস্ব তাফসীর বলে। যেমন– তাফসীরে বায়যাভী, জালালাইন, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি।

২. **اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ الْمَذْمُوْمُ :** তাফসীরে মাযমুম এমন তাফসীরকে বলা হয়, যা প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই তাফসীর করা অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরিয়ত ও ভাষাগত বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা অথবা যেসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলা যে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে এমনই।

৩. **اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ بَيْنَ الْمَحْمُوْدِ وَ الْمَذْمُوْمِ :** মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বলতে বোঝায়, যা একদিকে নন্দিত আবার অন্যদিকে নিন্দিত। যেমন– ফিকহী মাযহাবকেন্দ্রিক তাফসীরসমূহ। কেননা, কুরআন মাজীদের হুকুম বা শরয়ী আইন বোঝার জন্যে তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু মুফাসসিরগণ নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করার যে চেষ্টা করেছেন তা নিন্দিত।

হুকুম : اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْى জায়েজ কিনা, তাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় উলামায়ে কেরামের মতে, اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْى বৈধ নয়।

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, মুজতাহিদ যদি ভাষায় পণ্ডিত হন, নাহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন, ফিকহশাস্ত্রে পারদর্শী হন এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমার উপর ভিত্তি করে তাফসীর করেন, তাহলে তাঁর তাফসীর বৈধ হবে। অন্যথা সঠিক মতামত দিলেও তা তাঁর জন্য গুনাহের কারণ হবে। কারণ, রাসূল ﷺ বলেন– مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار
তিনি আরো বলেন– مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِه فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ
اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْى দ্বারা যদি প্রথমটি তথা اَلرَّأْىُ الْمَحْمُوْدُ উদ্দেশ্য হয়, তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি মধ্যবর্তী পর্যায়ের হয়, তার হুকুমও মধ্যবর্তী। তবে বির-রায় বলে সাধারণত بِالرَّأْيِ الْمَذْمُوْم তথা প্রবৃত্তি অনুসৃত তাফসীর বোঝায়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের মনগড়া কোনো تَفْسِير তথা ব্যাখ্যা দেওয়া মোটেই জায়েজ নেই; বরং হারাম। এরূপ করা কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কিত দলিল নীচে উপস্থাপন করা হলো–

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন–

١- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ.
٢- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ.
٣- فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.
١- مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّار.
٢- مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.
٣- مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ.

গ. অন্যান্য পার্থক্য : تَفْسِيْر ও تَأْوِيْل -এর মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে আলেমগণের কতিপয় অভিমত উল্লেখ করা হলো। যেমন–

১. আবূ ওবায়েদ (র.) বলেন, تَفْسِيْر ও تَأْوِيْل উভয়টি একই অর্থে ব্যবহার হয়। এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সে হিসেবে এদের সম্পর্ক হয়– نِسْبَةُ التَّسَاوِى

২. আবূ তালেব সালাবী (র.) বলেন, হাকিকী বা মাজাযী অর্থ বর্ণনার নাম তাফসীর। অন্যদিকে লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করার নাম তাবীল। এদিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে نِسْبَةُ التَّبَايُن বিদ্যমান।

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই তাবীল এবং আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবরচিত সবকিছুর ক্ষেত্রে তাফসীর ব্যবহার হয়। তখন এদের সম্পর্ক হয় عَامٌّ خَاصٌّ مُطْلَقٌ;

৪. تَفْسِيْر হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা। আর تَأْوِيْل হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা।

৫. تَفْسِيْر -এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে تَأْوِيْل -এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে না।

৬. رِوَايَة -এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে تَفْسِيْر আর دِرَايَة -এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে تَأْوِيل বলা হয়।

৭. تَفْسِيْر হলো অকাট্য ও গ্রহণীয় ব্যাখ্যা। আর تَأْوِيْل হলো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, যা গ্রহণীয় নয়। এরূপ মত দিয়েছেন আবুল মনসুর আল-মাতুরিদী (র.)।

৮. আল্লামা জুরজানী (র.) একটি উদাহরণ দিয়ে বলে– يَخْرُجُ الْحَىُّ مِنَ الْمَيِّت -এর তাফসীর হলো, ডিম থেকে পাখি বের করা; আর তাবীল হলো কাফের থেকে মুমিন বের করা।

৯. আল্লামা বাগভী (র.)-এর মতে, গবেষণার মাধ্যমে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হলো تَأْوِيْل আর تَفْسِيْر হচ্ছে আয়াতের শানে নুযূল ও ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা।

১০. আল্লামা সাবুনীর মতে, তাফসীর হচ্ছে স্পষ্ট অর্থ; আর তাবীল হচ্ছে নিগূঢ় তত্ত্ব।

কুরআন মাজীদ হতে বিশুদ্ধ পন্থায় শরীয়তের বিধানসমূহ উদ্ভাবনে তাফসীরের গুরুত্ব সর্বাধিক। সুতরাং تَفْسِيْر ও تَأْوِيْل সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

❖ بَعْضُ اَسْمَاءِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالتَّأْوِيْل

তাফসীর ও তাবীল এর কতিপয় কিতাবের নাম : তাফসীর ও তাবীল সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম নীচে উল্লেখ করা হলো–

١- اَلتَّفْسِيْرُ الْكَبِيْرُ لِلْعَلَّامَةِ فَخْرِ الدِّيْنِ الرَّازِي.

٢- اَلْكَشَّافُ عَنْ حَقَائِقِ غَوَامِضِ التَّنْزِيْلِ وَعُيُوْنِ الْاَقَاوِيْلِ فِىْ وُجُوْهِ التَّأْوِيْل (تَفْسِيْر الْكَشَّاف) لِلْعَلَّامَةِ جَارِ اللّٰهِ مَحْمُوْدِ بْنِ عُمَرَ الزَّمَخْشَرِىْ.

٣- اَنْوَارُ التَّنْزِيْلِ وَاَسْرَارُ التَّأْوِيْل (تَفْسِيْرُ الْبَيْضَاوِى) لِلْقَاضِى نَاصِرِ الدِّيْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْبَيْضَاوِىْ.

٤- مَدَارِكُ التَّنْزِيْلِ وَحَقَائِقُ التَّأْوِيْلِ. لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوْدِ النَّسَفِى.

٥- لُبَابُ التَّأْوِيْلِ فِىْ مَعَانِي التَّنْزِيْل. لِعَلِي بْنِ مَحْمَّدِ الْخَازِنْ.

٦- رُوْحُ الْمَعَانِى فِىْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِى. لِاَبِى الثَّنَاءِ شِهَابِ الدِّيْنِ السَّيِّدِ مَحْمُوْدِ آفِنْدِى الْاَلُوْسِى.

٧- تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْر. لِلْحَافِظِ عِمَادِ الدِّيْنِ اَبُوْ الْفِدَاءِ ابْنِ كَثِيْر.

٨- تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْنِ. لِجَلَالِ الدِّيْنِ الْمَحَلِّى الشَّافِعِى وَجَلَالِ الدِّيْنِ السُّيُوْطِى.

٩- غَرَائِبُ الْقُرْآنِ وَرَغَائِبُ الْفُرْقَان. لِنِظَامِ الدِّيْنِ النَّيْسَابُوْرِى.

١٠- تَفْسِيْرُ فَتْحِ الْقَدِيْر. لِاَبِى السَّعُوْد.

١١- تَفْسِيْرُ الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ. لِاِبْنِ حِبَّان.

١٢- تَفْسِيْرُ بَيَانِ الْقُرْآنِ. لِلْعَلَّامَةِ اَشْرَف عَلِى تَهانَوِى

١٣- رَوَائِعُ الْبَيَانِ تَفْسِيْرُ آيَاتِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْقُرْآنِ - لِمُحَمَّد عَلِى الصَّابُوْنِى.

١٤- مَعَارِفُ الْقُرْآن. لِلْمُفْتِي مُحَمَّد شَفِيْع.

١٥- تَفْسِيْرُ تَوْضِيْحِ الْقُرْآنِ لِلْعَلَّامَةِ الْمُفْتِيْ تَقِيْ عُثْمَانِي.

কুরআন মাজীদ হতে বিশুদ্ধ পন্থায় শরিয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনে ইলমে তাফসীরের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে সম্যক অবগতি থাকা অত্যাবশ্যক।

উপমহাদেশে পবিত্র কুরআন : একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে আরবে, সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা হয়েছে মিসরে আর তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে উপমহাদেশে"।

উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তাফসীরের ক্ষেত্রে যে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে কয়েকজন স্বনামধন্য মনীষীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আরও কয়েকজন সাধক ও তাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি, যারা পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব ও তথ্যের অনুসন্ধানে আমরণ সাধনা করেছেন এবং অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষকে পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সাধনা করতে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন।

১. তফসীরে মোহাম্মদী, শেখ হাসান মোহাম্মদ : গুজরাই (মৃত্যু ৯৮২ হিজরি)।
২. সাওয়াতিউল ইলাহাম, ফায়েজী (১০০৪ হিজরি)।
৩. বয়ানুল কুরআন (আরবি : ১০ খণ্ড), কাজী আব্দুশ শহীদ।
৪. তাফসীরে নেজামী, শেখ নিজামউদ্দিন (১০২৪ হিজরি)
৫. তাফসীরে আহমদী, মোল্লা জিউন (র.) (১১৩০ হিজরি)।
৬. তাফসীরে ফাতহুল খাইর, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র) ১১৭৬ হিজরি।
৭. জামেউত তাফসীর, নবাব কুতুব উদ্দীন খান (১২৬৫ হিজরি)।
৮. ফাতহুল বয়ান, নবাব সিদ্দীক হাসান খান (১৩০৭ হিজরি)।
৯. ফাতহুল মান্নান, মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী (১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

বাংলা ভাষায় যারা পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা তরজমা করেছেন তাঁরা হলেন :

১. জনাব গোলাম আকবর আলী খান।
২. জনাব আব্দুল হাকীম ও আলী আহসান।
৩. জনাব আব্দুর রহমান খান।
৪. মাওলানা আকরাম খাঁ।
৫. মাওলানা আবূ তাহের মিসবাহ।
৬. মাওলানা শামসুল হক সাহেব (র.)।
৭. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.)।

উর্দূ ভাষা থেকে যেসব বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো : ১. তাফসীর আশরাফী, ২. মা'আরিফুল কুরআন প্রভৃতি।

❖ تَعْرِيْفُ أُصُوْلِ التَّفْسِيْر

উসূলুত তাফসীরের পরিচয় : নীচে উসূলে তাফসীর -এর পরিচয় তুলে ধরা হলো–

১. ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় أُصُوْلُ التَّفْسِيْر এমন এক শাস্ত্র, যার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা-প্রক্রিয়ার নীতিমালা এবং শর্তাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
২. কারো কারো মতে– أُصُوْلُ التَّفْسِيْرِ : عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْبَحْثِ عَنْ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَحْكَامِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

অর্থাৎ, যে শাস্ত্র কুরআন সম্পর্কে গবেষণার নিয়মকানুন ও তার হুকুম-আহকাম এবং কুরআনের গবেষকদের সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে أُصُوْلُ التَّفْسِيْر বলা হয়।

❖ مَوْضُوْعُ أُصُوْلِ التَّفْسِيْر

উসূলুত তাফসীরের আলোচ্য বিষয় : উসূলে তাফসীরের বিষয়বস্তু হলো কুরআন মাজীদ। কেননা, এতে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়। যদিও আনুষঙ্গিকভাবে তার গবেষকদের নিয়েও আলোচনা করা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীম। তাই তার বিষয়বস্তু কুরআন মাজীদ।

❖ غَرَضُ أُصُوْلِ التَّفْسِيْر

উসূলুত তাফসীরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : উসূলে তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো–

اَلْاِصَابَةُ فِى الْبَحْثِ عَنْ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَفْسِيْرِهٖ وَالْاِبْتِعَادُ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ بِرِعَايَةِ الْأُصُوْلِ وَالْاَحْكَام.

অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের তাফসীর ও গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা ও হুকুম-আহকাম জানার মাধ্যমে তাফসীরের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা।

কুরআন মাজীদের ভাব ও মর্ম উপলব্ধির জন্যে তাফসীরশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, তাফসীরের উপরই শরিয়তের অধিকাংশ বিধিবিধান নির্ভরশীল। আর সঠিক তাফসীর রচনার জন্যে উসূলে তাফসীর অত্যন্ত জরুরি।

التَّدْرِيْبَات: অনুশীলনী

١- ما هى علوم القرآن؟ بين نشأة علوم القرآن وتطورها.
٢- عَرِّفْ علوم القرآن؟ اكتب موضوعها وغرضها.
٣- مَا هو القرآن؟ هل هو اسم علم غير مشتق ام هو مشتق؟ بين الاختلاف فيه مع بيان الراجح عندك.
٤- عرف القرآن - هل القرآن اسم للنظم والمعنى كيهما؟ فصل.
٥- بين موضوعه وغرضه مع ذكر وجه تسمية القرآن بالقرآن.
٦- عرف القرآن الكريم ثم بين فضائل القرآن واهميته بذكر الايات الكريمة والاحاديث الشريفة.
٧- ما معنى القرآن لغة وشرعا؟ وكم اسما للقرآن؟ بين موضحا.
٨- عرف القرآن والسورة والآية بالتفصيل.
٩- عرف السورة. هل ترتيب السور امر توقيفي ام كان باجتهاد من الصحابة؟ بين بالتفصيل.
١٠- ما هى العلوم المستنبطة من القرآن الكريم؟ بين بالاستشهاد.
١١- اذكر اقوال العلماء فى اول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن وما هو الراجح عندك؟
١٢- ما هى الاقسام التى ترجع الى نزول القرآن؟ اذكر اقوال العلماء فى معرفة المكي والمدني مع الاختلاف.
١٣- اذكر الأقوال فى كيفية انزال القرآن الكريم من اللوح المحفوظ؟ ثم بين الحكمة فى نزول القرآن الكريم منجما.
١٤- ما هى اسباب النزول؟ بين اهميتها فى علوم التفسير.
١٥- ما هو اسباب النزول؟ هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص سبب النزول؟ بين اختلاف العلماء فى هذه المسئلة.
١٦- اذكر اقوال العلماء فى معنى الحديث الذى قاله النبى عليه السلام " ان القرآن انزل على سبعة احرف" بالوضاحة.
١٧- ما معنى النسخ وكم قسما له؟ هل يجوز نسخ القرآن بغيره من السنة؟ بين بيانا شافيا.
١٨- ما هى حكمة الله فى النسخ؟ هل يقع النسخ فى الاخبار؟ اذكر اقوال العلماء فى تعداد الآيات المنسوخة.
١٩- ما معنى الوحى لغة وشرعا؟ وكم صورة لنزول الوحى؟ بين.
٢٠- عرف الوحى وكم قسما له؟ اذكر اسماء كَاتِبِيْ الوحي.
٢١- ما هى كيفية تحفيظ القرآن؟
٢٢- عرف التفسير مع بيان موضوعه وغرضه وفائدته ثم بين الفرق بين التفسير والتأويل.
٢٣- ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ وكم قسما للتفسير؟ بين.
٢٤- عرف التفسير والتأويل ثم اكتب بعض اسماء كتب التفسير والتأويل.
٢٥- عرف التفسير واصول التفسير ثم بين موضوعها وغرضهما.
٢٦- بين اقسام التفسير مع حكمها.
٢٧- كم وجها للتفسير؟ بين شروط المفسر وآدابه لتفسير القرآن بالاختصار.
٢٨- ما هي الشروط التى يحتاج اليها المفسر فى تفسير القرآن الكريم؟ ثم بين مصادر التفسير مع بيان حكم التفسير بالرأي
٢٩- عرف التفسير بالرأى وما هو موقف العلماء من التفسير بالرأى؟ بين مفصلا.
٣٠- التفسير بالرأى ما هو؟ بين اقسامه هل يجوز التفسير بالرأى؟ بين موضحا.
٣١- ابحث عن اعجاز القرآن الكريم مفصلا ومدللا.
٣٢- ما هى المعجزة؟ وكم قسما لها؟ بين مراتب تحدى القرآن مفصلا.
٣٣- بين وجوه اعجاز القرآن وكيفيته بالتفصيل.
٣٤- معجزات القرآن مستمرة الى يوم القيامة" ابحث عن هذا القول بالتفصيل.
٣٥- كم دورا لجمع القرآن ولماذا لقب عثمان (رض) لجامع القرآن الكريم؟
٣٦- كم مرة جمع القرآن؟ وما الفرق بين جمع ابى بكر وعثمان (رض) ومن ساد بجمع القرآن؟ اذكر نبذة من حياته.
٣٧- حرر تاريخ جمع القرآن مفصلا ثم اذكر مراد مصحف الامام.
٣٨- التفسير ما هو؟ بين نشأته وتطوره.
٣٩- كم طبقة للمفسرين؟ وما هى شرائط المفسرين؟ بين تفصيلا.
٤٠- كم قسما للتفسير؟ ثم بين العلوم التى يحتاج اليها المفسر بالاختصار.
٤١- كم طبقة للمفسرين؟ اذكر خمسة من مشاهير المفسرين واسماء تفسيرهم.
٤٢- اكتب مميزات التفسير فى عهد التابعين.

اَلْبَحْثُ الثَّامِنُ : بَعْضُ الْمَعْلُوْمَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

অষ্টম আলোচনা : আল কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- اَلْقُرْآنُ مَدَى مُدَّةِ النُّزُوْلِ
٢- عَدَدُ الْحَرَكَاتِ وَالنُّقَاطِ وَالْحُرُوْفِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْآيَاتِ اِجْمَالًا
٣- اَسْمَاءُ السُّوَرِ الْاُخْرٰى
٤- اَلْاَسْمَاءُ الْمَذْكُوْرَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٥- عَدَدُ أَسْئِلَةِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْقُرْآنِ
٦- اَلْقَصَصُ الْمُتَكَرِّرَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ
٧- آيَاتُ الْاَحْكَامِ عَلٰى تَرْتِيْبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ

❖ اَلْقُرْآنُ مَدٰى مُدَّةِ النُّزُوْلِ

কুরআন কারীম অবতীর্ণের ২৩ বছর

সন	সূরাসমূহ
নবুয়তের ১ম বছর	সূরা আলাক, সূরা কলম, সূরা মুযযাম্মিল, সূরা মুদ্দাসসির
নবুয়তের ২য় বছর	সূরা আলা, সূরা তাকভীর, সূরা কিয়ামা, সূরা ইখলাস, সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ, সূরা ফজর, সূরা তীন, সূরা লাহাব, সূরা ফালাক, সূরা নাস
নবুয়তের ৩য় বছর	সূরা শামস, সূরা লাইল, সূরা দোহা, সূরা ইনশিরাহ, সূরা বালাদ, সূরা তারেক, সূরা বুরূজ, সূরা আবাসা, সূরা ফাতিহা, সূরা শু'আরা, সূরা তূর, সূরা যারিয়াত, সূরা ক্বাফ, সূরা গাশিয়া, সূরা আদিয়াত, সূরা তাকাসুর
নবুয়তের ৪র্থ বছর	সূরা ফুরকান, সূরা নামল, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা নাজম, সূরা কামার, সূরা রহমান, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মূলক, সূরা হাক্কা, সূরা মা'আরিজ
নবুয়তের ৫ম বছর	সূরা মুরসালাত, সূরা দাহর, সূরা নূহ, সূরা সোয়াদ, সূরা ত্বহা, সূরা মারইয়াম, সূরা মাউন, সূরা কাউসার
নবুয়তের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছর	সূরা- সাফফাত, সূরা হা-মীম সাজদার একাংশ, সূরা ইয়াসীন
নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর	সূরা নাবা, সূরা আসর, সূরা মুতাফফিফীন, সূরা ইনফি তার, সূরা কাফিরূন
নবুয়তের ৭ম বছর	সূরা নাজি'আত, সূরা ইনশিকাক, সূরা রূম, সূরা কারিয়া, সূরা আম্বিয়া
নবুয়তের ৮ম বছর	সূরা কদর, সূরা বাইয়্যিনাহ, সূরা হুমাযা
নবুয়তের ৯ম বছর	সূরা আনকাবুত, সূরা সাজদা, সূরা লোকমান, সূরা যিলযাল
নবুয়তের ১০ম বছর	সূরা নামল, সূরা মুমিনুন, সূরা শূরা, সূরা যুখরুফ, সূরা দুখান, সূরা জাসিয়া, সূরা জিন
নবুয়তের ১১ তম বছর	সূরা আহকাফ, সূরা মুমিন, সূরা আন'আম, সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'আদ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর
নবুয়তের ১১ ও ১২ তম বছর	সূরা যুমার, সূরা আ'রাফ
নবুয়তের ১২ তম বছর	সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা হা-মীম সেজদার অবশিষ্টাংশ
নবুয়তের ১৩ তম বছর	সূরা হজ, সূরা তাগাবুন
১ম হিজরি	সূরা মুহাম্মদ
১ম ও ২য় হিজরি	সূরা বাকারা
২য় হিজরি	সূরা আনফাল

সন	সূরাসমূহ
২য় ও ৩য় হিজরি	সূরা আলে ইমরান
৩য় হিজরি	সূরা নিসা, সূরা মায়েদা, সূরা সফ
৩য় ও ৪র্থ হিজরি	সূরা জুমআ
৪র্থ হিজরি	সূরা হাশর
৫ম হিজরি	সূরা মুনাফিকুন, সূরা আহযাবের একাংশ, সূরা নূর
৬ষ্ঠ হিজরি	সূরা তালাক, সূরা ফাতহ, সূরা মুজাদালা
৭ম হিজরি	সূরা তাহরীম, সূরা আহযাবের অবশিষ্টাংশ
৮ম হিজরি	সূরা মুমতাহিনা, সূরা হাদীদ
৯ম হিজরি	সূরা তাওবা, সূরা হুজুরাত
১০ম হিজরি	সূরা নাসর এবং اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا এই আয়াতখানা

❖ عَدَدُ الْحَرَكَاتِ وَالنِّقَاطِ وَالْحُرُوْفِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْآيَاتِ اِجْمَالًا

সংক্ষেপে হরকত, নোকতা, অক্ষর, শব্দ ও আয়াতের সংখ্যা :

হরকত ও নোকতা ইত্যাদির সংখ্যা : যবর ৫৩২২৩, যের ৩৯৫৮৩, পেশ ৮৮০৪, মাদ ১৭৭১, তাশদীদ ১২৭৪, নোকতা ১০৫৬৮৪।

কুরআনের অক্ষর সংখ্যা : আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, সোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কুরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর গণনা মতে, কুরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেয়ীদের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কুরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

কুরআনের শব্দ সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের যুগে কুরআনের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবাই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী শব্দের সংখ্যা ৭৬,৪৩০, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহর গণনা অনুযায়ী ৭০৪৩৯, মুজাহিদের গণনা অনুযায়ী ৭৬২৫০। তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা হচ্ছে ৮৬৪৩০।

কুরআনের আয়াত সংখ্যা : হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হযরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হযরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর গণনাই বেশি প্রসিদ্ধ। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের নোসখাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গণনা করলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

কুরআনে হযরত রাসূল ﷺ-এর অঙ্গ মোবারকের উল্লেখ : আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী (র.) লিখেছেন, যে, রাসূল ﷺ-এর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো, কুরআনে পাকে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন– মুখমণ্ডলের উল্লেখ রয়েছে সূরা বাকারার মধ্যভাগেই, ইরশাদ হয়েছে– قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

চক্ষু মোবারক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

জবান মোবারক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

হস্ত মোবারক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ

বক্ষ ও পৃষ্ঠ মোবারক সম্পর্কে সূরা ইনশিরায় ইরশাদ হয়েছে– اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

এবং কলব মোবারক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ

اَسْمَاءُ السُّوَرِ الْاُخْرٰى ❖
বিকল্প নামবিশিষ্ট সূরাসমূহ

পরিচিত নাম	বিকল্প নাম
সূরা ফাতিহা	١- فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، ٢- فَاتِحَةُ الْقُرْآنِ، ٣- سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ، ٤- اَلْحَمْدُ، ٥- اَلشُّكْرُ، ٦- اَلثَّنَاءُ، ٧- تَعْلِيْمُ الْمَسْئَلَةِ، ٨- أُمُّ الْقُرْآنِ، ١٠- أُمُّ الْكِتَابِ، ١١٢- اَلْكَنْزُ، ١٢- اَلنُّوْرُ، ١٣- اَلرُّقْيَةُ، ١٤- اَلشِّفَاءُ، ١٥- اَلشَّافِيَةُ، ١٦- اَلْوَافِيَةُ، ١٧- اَلْكَافِيَةُ، ١٨- اَلدُّعَاءُ، ١٩- اَلسُّؤَالُ، ٢٠- اَلْأَسَاسُ، ٢١- اَلصَّلٰوةُ، ٢٢- اَلتَّفْوِيْضُ، ٢٣- سَبْعُ الْمَثَانِيْ.
সূরা তাওবা	١- اَلْفَاضِحَةُ، ٢- اَلْعَذَابُ، ٣- اَلْبَرَاءَةُ، ٤- اَلْمُقَشْقِشَةُ، ٥- اَلْمُبَعْثِرَةُ، ٦- اَلْبَحُوْثُ، ٧- اَلْمُثِيْرَةُ، ٨- اَلْمُدَمْدِمَةُ، ٩- اَلْحَشْرُ، ١٠- اَلنَّضِيْرُ، ١١- اَلْحَافِرَةُ، ١٢- اَلْمُخْزِيَةُ، ١٣- اَلْمُنَكِّلَةُ، ١٤- اَلْمُشَرِّدَةُ، ١٥- اَلْقَشْقَشَةُ، ١٦- اَلْبَحْثُ، ١٧- اَلْمُنْقِرَةُ.
সূরা নাহল	سُوْرَةُ النِّعَمِ
সূরা বনী ইসরাঈল	١- اَلْإِسْرَاءُ، ٢- سُبْحَان
সূরা কাহাফ	سُوْرَةُ الْكَلِيْمِ
সূরা শুআরা	اَلْجَامِعَةُ
সূরা নামল	سُوْرَةُ سُلَيْمَانَ
সূরা সাজদা	سُوْرَةُ الْمَضَاجِعِ
সূরা ফাতির	اَلْمَلَائِكَةُ
সূরা ইয়াসীন	قَلْبُ الْقُرْآنِ
সূরা যুমার	نمرف
সূরা মুমিন	سُوْرَةُ الْغَافِرِ
সূরা মুজাদালা	سُوْرَةُ الظِّهَارِ
সূরা হাশর	سُوْرَةُ بَنِي النَّضِيْرِ
সূরা বাকারা	١- زَهْرَاءُ، ٢- ذهراين، ٣- طيبة
সূরা নাবা	١- اَلْمُعْصِرَات، ٢- اَلْبَيِّنَة، ٣- اَلْقَيِّمَة
সূরা তালাক	سُوْرَةُ النِّسَاء
সূরা মুলক	مَانِعَة، مُنْجِيَة
সূরা মা'আরিজ	اَلْوَاقِع
সূরা দাহর	اَلْاِنْسَان
সূরা মাউন	سُوْرَةُ الدِّيْن
সূরা নাসর	اَلْوِدَاع
সূরা রহমান	عَرُوْسُ الْقُرْآن
সূরা লাহাব	١- سُوْرَةُ الْمَدِّ، ٢- سُوْرَةُ تَبَّتْ
সূরা হা-মীম সাজদা	١- سُوْرَةُ الْمَصَابِيْحِ، ٢- سُوْرَةُ فُصِّلَت

পরিচিত নাম	বিকল্প নাম
সূরা সফ	سُوْرَةُ الْحَوَارِيِّيْن
সূরা মুমতাহিনা	سُوْرَةُ الْمَوَدَّةِ
সূরা জাসিয়া	١- اَلشَّرِيْف ٢- سُوْرَةُ الدَّهْر ٣- اَلْقِتَال ٤- اَلْبَاسِقَات
সূরা ফালাক ও নাস	١- اَلْأَسَاس، ٢- اَلتَّفْرِيْد، ٣- اَلتَّجْرِيْد، ٤- اَلتَّوْحِيْد، ٥- اَلنَّجَاة، ٦- اَلْمَعْرِفَة، ٧- اَلْمُعَوِّذَة، ٨- سُوْرَةُ الصَّمَد، ٩- اَلْمُنْفَرَة، ١٠- اَلْبَرَائَة، ١١- اَلْمُذَكِّرَة، ١٢- اَلنُّوْر، ١٣- اَلْأَمَان، ١٤- اَلْجَمَال ١٥- الْاِخْلَاص.

❖ اَلْاَسْمَاءُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْم : কুরআনে উল্লিখিত নামসমূহ

ফেরেশতাগণের নাম

ক্রমিক	নাম	পরিচয়
১	হযরত জিবরাইল (আ.)	তিনি নবীদের নিকট ওহী পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। বিভিন্ন সময় কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়কে আযাব প্রদানের জন্যেও প্রেরিত হয়েছেন।
২	হযরত মিকাঈল (আ.)	পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং মাখলুকের রিজিক পৌছে দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা।
৩	মালেক	জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা।
৪	হারুত ও মারুত	মানুষকে জাদুবিদ্যার মাধ্যমে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাবেল নগরীতে অবতীর্ণ ফেরেশতা।
৫	রাদ	মেঘমালার পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতা।
৬	বারক	মেঘমালার বিদ্যুৎ চমকানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা।
৭	সিজিল	আমলনামার রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা।
৮	কাঈদ	মানুষের বদ আমল লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা।
৯	যুলকারনাইন	এক দুর্বল মত অনুযায়ী, তিনি একজন ফেরেশতা।
১০	সাকীনা	এক দুর্বল মত অনুযায়ী, সাকানা একজন ফেরেশতা।

সাহাবীগণের নাম : কুরআনে শুধু একজন সাহাবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি হলেন যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)।

মানুষের উপাধিসমূহ

ক্রমিক	উপাধি	ব্যক্তি
১	ইসরাঈল	হযরত ইয়াকুব (আ.)
২	মাসীহ	হযরত ঈসা (আ.)
৩	ইলয়াস	হযরত ইদ্রিস (আ.)
৪	যুলকিফল	হযরত ইয়াসা, ইউশা অথবা যাকারিয়া (আ.)
৫	নূহ	হযরত আব্দুল গাফফার (আ.)
৬	যুলকারনাইন	বাদশাহ সেকান্দর
৭	ফেরআউন	ওলীদ ইবনে মুসআব
৮	তুব্বা	আসযাদ ইবনে আবূ কুরব

তারকা ও নক্ষত্রের নাম

ক্রমিক	নাম	অর্থ	ক্রমিক	নাম	অর্থ
১	اَلشَّمْس	সূর্য	৩	اَلطَّارِق	শুকতারা
২	اَلْقَمَر	চাঁদ	৪	اَلشِّعْرٰى	লুব্ধক

নবীর নামে সূরার নাম

১. সূরা ইউসুফ, ২. সূরা হুদ, ৩. সূরা ইউনুস, ৪. সূরা ইবরাহীম, ৫. সূরা নূহ, ৬. সূরা মুহাম্মদ

মূর্তির নাম

হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মূর্তি ছিল ৫টি। যথা–

১. উদ (ود), ২. ইয়াগুস (يَغُوْث), ৩. সুয়া (سُوَاع), ৪. ইয়াউক (يَعُوْق), ৫. নসর (نَسْر) ইত্যাদি।

আরব মুশরিকদের মূর্তি ছিল ৭টি। যথা–

১. লাত (لَات), ২. উযযা (عُزّٰى), ৩. মানাত (مَنَات), ৪. রুজয (رُجْز),

৫. জিবত (جِبْت), ৬. তাগুত (طَاغُوْت), ৭. রাশাদ (رَشَاد), ইত্যাদি।

কোনো কোনো মুফাসসিরের নিকট ফেরাউনের মূর্তির নাম, বা'ল (بَعْل), আযার (آزَر) (এক বর্ণনা অনুযায়ী)।

[আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮১]

গোত্র বা জাতির নাম :

১. আদ	৫.বনী ইসরাঈল	৯. কুরাইশ	১৩. আসহাবুর রাস	১৭. আসহাবুল কাহফ
২. সামুদ	৬. তুব্বা	১০. আসহাবে উখদুধ	১৪. আসহাবুস সাবত	১৮. আসহাবুর রাকীম
৩. ইরাম	৭. ইয়াজুজ	১১.আসহাবুল আরাব	১৫. আসহাবুল ফীল	১৯.আসহাবে মাদইয়ান
৪.আলে ফেরাউন	৮. মাজুজ	১২. আসহাবুল আইকা	১৬. আসহাবুল কারইয়াহ	২০. আসহাবু মূসা

কুনিয়াত বা উপনাম

কুরআনে শুধুমাত্র একটি উপনাম উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, আবূ লাহাব। তার নাম হলো আব্দুল ওযযা। যেহেতু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এমন নাম বৈধ নয়, তাই তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

কাফেরদের নাম

ক্রমিক	নাম	পরিচয়
১	কারুন বিন ইয়াসহার	হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই।
২	জালুত	দাউদ (আ.)-এর হাতে নিহত আমালেকা গোত্রের জনৈক জালেম বাদশাহ।
৩	হামান	ফেরাউনের ওযীর।
৪	আযর	ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা। তার নাম হলো তারেখ।
৫	আবূ লাহাব	রাসূল ﷺ-এর চাচা। তার নাম আব্দুল ওযযা।
৬	ইনসী	কারো কারো মতে, সে কেনানা ও আউস গোত্রের সরদার ছিল।
৭	বুশরা	কারো কারো মতে, এটা জনৈক কাফেরের নাম।
৮	শয়তান	তার নাম হলো আযাযীল।

গাছ ও ফলের নাম

ক্রমিক	নাম	অর্থ	ক্রমিক	নাম	অর্থ
১	اَلتِّيْن	আঞ্জীর	৭	زَقُّوْم	কাঁটাদার বৃক্ষ
২	عِنَب	আঙ্গুর	৮	قِثَّاء	শসাজাতীয় সবজি
৩	اَلزَّيْتُوْن	জলপাই	৯	بَصَل	পেঁয়াজ
৪	يَقْطِيْن	কদু বা বেল গাছ	১০	فُوْم	রসুন
৫	عَدَس	মসূর ডাল	১১	نَخْلٌ	খেজুর বৃক্ষ
৬	بَقْل	সবজি			

প্রাণীর নাম

ক্রমিক	নাম	অর্থ	ক্রমিক	নাম	অর্থ
১	اَلْبَقَرَة	গাভী	৬	اَلْخِنْزِيْر	শূকর
২	اَلْفِيْل	হাতি	৭	اَلْحِمَار	গাধা
৩	اَلنَّاقَة	উটনী	৮	اَلْحُوْت	মাছ
৪	اَلْكَلْب	কুকুর	৯	اَلْبَغَل	খচ্চর
৫	اَلنَّعْجَه	ভেড়া	১০	اَلْعِجْل	বাছুর

পাখি ও পতঙ্গের নাম

ক্রমিক	নাম	অর্থ	ক্রমিক	নাম	অর্থ
১	نَمْل	পিঁপড়া	৬	عَنْكَبُوْت	মাকড়সা
২	سَلْوٰى	তিতির পাখি	৭	جَرَاد	ফড়িং
৩	بَعُوْضَة	মশা	৮	غُرَاب	কাক
৪	ذُبَاب	মাছি	৯	هُدْهُد	হুদহুদ, মোহচূড়া
৫	نَحْل	মৌমাছি	১০	اَلْقُمَّل	উকুন

স্থানসমূহের নাম

ক্রমিক	নাম	পরিচয়	ক্রমিক	নাম	পরিচয়
১	بَكَّة	মক্কা মুকাররমা	১৬	عَرِم	একট মরুভূমির নাম
২	يَثْرِب	মদিনা মুনাওয়ারা	১৭	حَرْد	একটি এলাকার নাম
৩	بَدْر	মদিনার নিকটবর্তী একটি এলাকা	১৮	جَرْز	একটি কুয়ার নাম
৪	اُحُد	মদিনার দক্ষিণে অবস্থিত একটি এলাকা	১৯	طَاغِيَة	কারো কারো মতে, এটি সামুদ জাতির আযাবগ্রস্ত হওয়ার জায়গার নাম
৫	حُنَيْن	তায়েফের নিকটবর্তী একটি এলাকা	২০	مِصْر	নীলনদের পাশ্ববর্তী দেশ
৬	جَمْع	মুযদালিফার একটি নাম	২১	نَقْع	আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী জায়গার নাম
৭	اَلْمَشْعَرُ الْحَرَامُ	মুযদালিফায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম	২২	سَبَا	রাণী বিলকিসের এলাকার নাম
৮	اَيْكَة	শোয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বাসস্থান	২৩	صَرِيْم	সাইদ ইবনে জুবায়েরের মতানুযায়ী, এটি ملك عين -এর একটি জায়গার নাম
৯	حِجْر	সামুদ জাতির বাসস্থান	২৪	حِجْر	একটি জায়গার নাম
১০	اَحْقَاف	আম্মান ও হাযারামাউতের মধ্যবর্তী একটি পাহাড়ের নাম	২৫	مَدْيَن	বাগদাদের নিকটবর্তী একটি শহর যাতে কিসরার প্রাসাদ ছিল
১১	طُوْرُ سَيْنَاء	মিসরের একটি পর্বতাঞ্চল	২৬	بَابِل	বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত একটি শহর।
১২	جُوْدِي	নূহ (আ.)-এর জাহাজ যে পাহাড়ে থেমেছিল।	২৭	اَلصَّفَا	মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম
১৩	طُوٰى	ফিলিস্তিনের একটি মরুভূমির নাম	২৮	اَلْمَرْوَة	মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম
১৪	كَهْف	একটি গুহার নাম	২৯	عَرَفَات	মক্কার নিকটবর্তী একটি ময়দানের নাম
১৫	رَقِيْم	আসহাবে কাহাফের এলাকার নাম			

পরকালীন স্থানসমূহ

ক্রমিক	নাম	পরিচয়	ক্রমিক		
১	فِرْدَوْس	জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর	৯	آثَام	জাহান্নামের এক মরুভূমির নাম
২	عِلِّيُّوْن	নেককার আত্মা একত্র হওয়ার স্থান	১০	مَوْبِق	জাহান্নামের একটি মরুভূমির নাম
৩	سِجِّيْن	কাফেরদের আত্মা একত্র হওয়ার স্থান	১১	وَيْل	জাহান্নামের একটি মরুভূমির নাম
৪	كَوْثَر	আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে উপহার হিসেবে প্রদত্ত একটি নহর	১২	سَعِيْر	জাহান্নামের একটি মরুভূমির নাম
৫	سَلْسَبِيْل	জান্নাতের একটি ঝরনার নাম	১৩	سَائِل	জাহান্নামের একটি মরুভূমির নাম
৬	تَسْنِيْم	জান্নাতের একটি ঝরনার নাম	১৪	سَحِيْق	জাহান্নামের একটি মরুভূমির নাম
৭	صَعُوْد	জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম	১৫	فَلَق	জাহান্নামের একটি গর্ত বা কয়েদখানার নাম
৮	غَيّ	জাহান্নামের এক মরুভূমির নাম	১৬	يَحْمُوْم	জাহান্নামের ভেতর ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ একটি গর্তের নাম

মসজিদের নাম : ১. মসজিদুল হারাম ২. মসজিদুল আকসা ৩. মসজিদে কুবা ৪. মসজিদে যিরার (প্রকৃতপক্ষে এটি মসজিদ নয়) ৫. মসজিদে নববী (এক মত অনুযায়ী)।

জান্নাতের নামসমূহ : ১. জান্নাতুল আদন ২. ইল্লিয়্যীন ৩. দারুল কারার ৪. দারুল খুলদ ৫. জান্নাতুল মাওয়া ৬. জান্নাতুন নাঈম ৭. দারুস সালাম ৮. ফিরদাউস

জাহান্নামের নামসমূহ : ১. জাহান্নাম ২. লাযা ৩. হুতামা ৪. সাঈর ৫. সাকার ৬. জাহীম ৭. হাভিয়া

স্থান সম্পর্কিত নামসমূহ

ক্রমিক	নাম	পরিচয়
১	اَلْأُمِّيُّ	এটি উম্মুল কুরা তথা মক্কা উপত্যকার প্রতি নিসবত
২	عَبْقَرِيُّ	এটি عَبْقَر -এর দিকে নিসবত
৩	سَامِرِيُّ	এটি سَامِرَة নাম এলাকার দিকে নিসবত
৪	اَلْعَرَبِيُّ	এটি عَرَب -এ দিকে নিসবত

❖ عَدَدُ اَسْئِلَةِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الْقُرْآنِ

সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নোত্তর কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তার সংখ্যা মাত্র তেরটি। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

١- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ الخ (البقرة ١٨٦)
٢- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ الخ (البقرة ١٨٩)
٣- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ٥ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ الخ (البقرة ٢١٥)
٤- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الخ (البقرة : ٢١٧).
٥- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الخ (البقرة : ٢١٩)
٦- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى الخ (البقرة : ٢٢٠)
٧- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ الخ (البقرة : ٢٢٢)
٨- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ الخ (المائدة : ٤).
٩- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ الخ (الأنفال : ١)

১০- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ (بنى إسرائيل : ٨٥).
১১- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ الخ (الكهف : ٨٣).
১২- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ الخ (طه : ١٠٥).
১৩- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ الخ (النازعات ٤٦).

উল্লেখ্য, রূহ সম্পর্কে এবং যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন না; বরং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারী ছিল মক্কার কাফের-মুশরিক এবং মদিনার ইহুদি জাতি। এ হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের সংখ্যা হলো এগার।

কুরআন মাজীদে আরবদের অজানা কাহিনী বর্ণিত হয়নি : পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবদের কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তাদের সংশোধনের জন্যে পবিত্র কুরআনে এমন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যা তারা সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ব থেকেই অবগত। যেমন– হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি এবং আদ-সামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনাবলি, হযরত ইবরাহীম (আ.), বনী ইসরাঈলের নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতের ঘটনাবলি। কারণ, আরবরা কওমে নূহ (আ.), কওমে আদ-সামূদের ঘটনাবলি তাদের পূর্বপুরুষ থেকে মুখে মুখে শুনে আসছে। আর বনী ইসরাঈলের নবী-রাসূলদের ঘটনাবলি, তাদের প্রতিবেশী ইহুদি জাতির নিকট থেকে অবগত হয়ে আসছে, যারা দীর্ঘদিন থেকে আরব ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে। আর এমন বিরল ও অদ্ভূত ঘটনাবলি পবিত্র কুরআনে আলোচনা হয়নি, যে ব্যাপারে আরবরা একেবারেই অবগত নয়।

কুরআন মাজীদে কোনো বিরল ঘটনা অনুল্লেখের কারণ : কুরআন মাজীদ যেহেতু মানবজাতির পরিশুদ্ধি ও সংশোধনীর জন্যে একটি উপদেশনামা, সেহেতু ইতিহাসগ্রন্থের ন্যায় তাতে প্রতিটি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এজন্যেই তাতে শুধু প্রসিদ্ধ ঘটনাবলিই বর্ণিত হয়েছে। অপ্রসিদ্ধ কোনো ঘটনা তাতে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল ঐ সকল অংশ আলোচনা করেছেন, যা শিক্ষাণীয়। এর কারণ হলো, সাধারণ মানুষ যখন কোনো বিরল ঘটনা শুনে কিংবা কোনো ঘটনা ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ ব্যাখ্যা ও তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ মানুষের নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তারা ঘটনার দিকে মনোযোগী হয়ে যায়। বর্ণনার যে মূল উদ্দেশ্য থাকে; (উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা) তা থেকে বেখবর হয়ে যায়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে কোনো বিরল ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি এবং কোনো ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত বর্ণিত হয়নি।

اَلْقَصَصُ الْمُتَكَرِّرَةُ فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ ❖

কুরআন মাজীদে বার বার বর্ণিত ঘটনাবলি : কুরআন মাজীদে দু'প্রকারের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। যথা– ১. বারংবার বর্ণিত ঘটনাসমূহ ২. দু' একবার বর্ণিত ঘটনাসমূহ। বারংবার বর্ণিত ঘটনাবলির তালিকা নিম্নরূপ–

১. হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ফেরেশতাদের তাঁকে সেজদাকরণ, শয়তানের অহংকারবশত সেজদা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন ও উম্মতে মুহাম্মদীকে পথভ্রষ্ট করা সংক্রান্ত ঘটনাবলি কুরআন মাজীদে বারবার বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ..... اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ الخ (البقرة ٣٠-٣٩)
২- وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ..... قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا الخ (الأعراف : ١١-٢٥)
৩- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ .... اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ الخ (الإسراء : ٢١-٢٥)
৪- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ .... لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ الخ (الحجر : ٢٦-٤٤)
৫- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ..... بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا (الكهف : ٥٠)
৬- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ..... فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى (طه : ١١٦-١٢٣)
৭- اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا .... لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ الخ (ص : ٧١-٨٥)
৮- مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ .... وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ (الأعراف : ١٢-١٨)
৯- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ... لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (الحجر : ٢٤-٣٩)
১০- قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ..... فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوْرًا (بنى اسرائيل : ٦٢-٦٣)

২. কুরআন মাজীদে হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালেহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত ও হযরত শুয়াইব (আ.)-এর স্বজাতির সাথে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ইত্যাদি বিষয় কেন্দ্র করে যে বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনাবলি, ঈমান আনার ব্যাপারে তাদের অহংকার প্রদর্শন, অহেতুক সন্দেহ-সংশয় ও অভিযোগ পেশ করা, নবী-রাসূলদের পক্ষ থেকে এসবের খণ্ডন ও উত্তর প্রদান, উক্ত অবাধ্য জনগোষ্ঠীর আল্লাহর অভিশাপে আক্রান্ত হওয়া এবং নবী-রাসূল ও তাঁদের ঈমানদার উম্মতরা খোদায়ী সাহায্য লাভ-সংবলিত ঘটনাবলি বারংবার বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ ..... فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ (الأعراف : ٥٩.٩٣).
২- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ ..... اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ (هود : ٢٥.٩٥)
৩- وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ ..... فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (الحجر : ٥١.٨٤)
৪- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ ..... وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (الشعراء : ٢٩.١٩١)
৫- هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ..... وَقَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ الخ (الذاريت : ٢٤.٤٦)
৬- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ ..... وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (القمر : ٩.٤٠)

৩. ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং বনী ইসরাঈলের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলি এবং তাঁর সঙ্গে ঐ লোকদের হঠকারী স্বভাবের পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করা, আর হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে সাহায্য করা সংবলিত ঘটনাবলি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

১- وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ .... كَذٰلِكَ يُحْيِى اللّٰهُ الخ (البقرة : ٤٩.٧٣)
২- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ ..... فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الخ (الأعراف : ١٠٣.١٦٦)
৩- وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ..... وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الخ (الشعراء : ١٠.٢٨)
৪- نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .... مِنْهُمْ مَا الخ (القصص : ٣.٦)
৫- وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا .... وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا الخ (الاعراف : ٦٥.٧٢)
৬- وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا ..... وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ (الأعراف : ٧٣.٧٩)
৭- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ..... فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَه اَجْمَعِيْنَ (الشعراء : ١٦١. ٧٨٠)
৮- كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ..... اِنَّهُ الخ (الشعراء : ١٧٦.١٨٩)

৪. হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলি এবং তাদের খেলাফত ও মু'জিযার কথা কুরআন মাজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহে এসেছে–

১- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا .... رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ الخ (النمل : ١٥.٤٤)
২- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا .... اَنْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِىْ الخ (السبا : ١٠.١٤)
৩- وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ..... وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ (ص : ١٧.٤٠)

৫. হযরত আইয়ূব ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাবলি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে–

১- وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .... وَكَذٰلِكَ الخ (الأنبياء : ٨٣.٨٨)
২- وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .... فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ (الصفت : ١٣٩.١٤٨)

৬. হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল ইত্যাদি ঘটনাবলি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে–

১- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ..... وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ (آل عمران : ٣٨.٤١)
২- ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا .... اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (مريم : ٦.١١)
৩- وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ .... وَكَانُوْا لَنَا الخ (الأنبياء : ٨٩.٩٠)

৭. হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও মু'জিযাসংবলিত ঘটনাবলি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

১- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ الخ (آل عمران : ٤٥.٥١)
২- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ..... وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ، هٰذَا صِرَاطٌ الخ (مريم : ١٦.٣٦)
৩- وَالَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (الأنبياء : ٩١)

কুরআন মাজীদে দু'একবার বর্ণিত ঘটনাবলি : নিম্নে কুরআনে দু'একবার বর্ণিত ঘটনাবলির তালিকা তুলে ধরা হলো–

১. হযরত ইদরীস (আ.)-কে উচ্চাসনে উন্নীত করার ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا . (مريم : ٥٦.٥٧)

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে যে, ইদরীস (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর (র.) বলেন– এটা কাবে আহবারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোনোটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কুরআন মাজীদের আলোচ্য বাক্য থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় না যে, এখানে মর্যাদা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না কি জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কুরআনের তাফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। [বয়ানুল কুরআন]

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) ও নমরুদের তর্কবিতর্কের ঘটনা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছে–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ .... وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الخ . (البقرة : ٢٥٨)

৩. পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে পাখি জীবিতকরণের ঘটনাটি বর্ণিত আছে–

اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى .... قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ الخ (البقرة : ٢٦)

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানির ঘটনাটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছে–

قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ..... قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا الخ (الصفت : ١٠٢).

৫. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ الخ (يوسف ٤.١٠١)

৬. হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম ও তাঁকে সাগরে নিক্ষেপ করা সংক্রান্ত ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ الخ (القصص)

৭. কিবতীকে হত্যা করার ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ الخ (أيضا : ١٥)

৮. হযরত মূসা (আ.)-এর মাদইয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রার ঘটনাটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ . (القصص : ٢٢)

৯. হযরত মূসা (আ.)-এর বিবাহের ঘটনাটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمْ الخ (القصص : ٢٣.٢٧).

১০. তুর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর আগুন দর্শনের ঘটনাটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

১- فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ الخ . (القصص : ٢٩)

২- وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ رَاٰى نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا .... (طه : ٩.١٠)

১১. হযরত মূসা (আ.)-এর কালামে বারী শ্রবণের ঘটনাটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

১- فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ الخ (القصص : ٣٠.٣٥)

২- فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الخ (طه : من ١١ إلى الركوعين)

১২. গাভী জবাই করার ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً .... وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ الخ . (البقرة : ٦٧.٧٣)

১৩. হযরত মূসা ও খিযির (আ.)-এর সাক্ষাতের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ .... ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ الخ (الكهف : ٦٠.٨٢)

১৪. তালূত ও জালূতের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ... وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ الخ (البقرة : ٢٤٨.٢٥١)

১৫. রানি বিলকীসের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

اِنِّىْ وَجَدْتُ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ .... وَاَسْلَمْتُ الخ . (النمل : ٢٣.٤٤)

১৬. বাদশাহ যুলকারনাইনের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا .... فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا (الكهف : ٨٣.٩٩).

১৭. আসহাবে কাহাফ ও রকীমের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا .... وَلَا يُشْرِكُ فِيْ الخ (الكهف : ٩-٢٦)

১৮. পরস্পর আলাপ-আলোচনাকারী দুই যুবকের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ ..... هُوَ خَيْرٌ الخ (الكهف : ٣٢-٤٤)

১৯. আসহাবুল জান্নাহ তথা বাগিচাওয়ালাদের ঘটনাটি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ .... لَوْ كَانُوْا الخ (القلم : ١٧-٣٣)

২০. ঐ তিনজন বাণীবাহকের ঘটনা, যাদেরকে দীনের দাওয়াতের জন্যে হযরত ঈসা (আ.) প্রেরণ করেছিলেন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ .... بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ . (يس : ١٣-١٩)

২১. ঐ মুমিনের ঘটনা, যাকে তার স্বগোত্রীয়রা শহীদ করেছিল; কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى ..... فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ (يس : ٢٠-٢٩)

২২. হস্তীবাহিনীর ঘটনাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ বর্ণিত আছে–

وَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ .... فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ (الفيل : ١-٥)

অতীত নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলি : পবিত্র কুরআনে সর্বমোট পঁচিশ জন নবী-রাসূলের ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে তাঁদের নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো– ১. হযরত আদম (আ.), ২. হযরত নূহ (আ.), ৩. হযরত ইদরীস (আ.), ৪. হযরত হূদ (আ.), ৫. হযরত সালেহ (আ.), ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.), ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.), ৮. হযরত ইসহাক (আ.), ৯. হযরত লূত (আ.), ১০. হযরত ইয়াকূব (আ.), ১১. হযরত ইউসুফ (আ.), ১২. হযরত শোয়াইব (আ.), ১৩. হযরত মূসা (আ.), ১৪. হযরত হারুন (আ.), ১৫. হযরত ইউশা (আ.), ১৬. হযরত ইউনুস (আ.), ১৭ হযরত ইলিয়াস (আ.), ১৮. হযরত ইয়াসা' (আ.), ১৯. হযরত উযাইর (আ.), ২০. হযরত দাউদ (আ.), ২১. হযরত সোলায়মান (আ.), ২২. হযরত যুলকিফল (আ.), ২৩. হযরত যাকারিয়া (আ.), ২৪. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ২৫. হযরত ঈসা (আ.)।

❖ آيَاتُ الْأَحْكَامِ عَلٰى تَرْتِيْبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ

ফিকহী অধ্যায় বিন্যাস অনুযায়ী বিধিবিধানের আয়াতসমূহ

পবিত্রতা

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
অযু	৬	মায়েদা	৬	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ..... لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
তাযাম্মুম	৫	নিসা	৪৩	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ ..... بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا
গোসল	৬	মায়েদা	৬	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا ... وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
গোসল	৫	নিসা	৪৩	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ ..... بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا
হায়েয	২	বাকারা	২২২	وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى .... اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নামাজ

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
জামাতে নামাজ	১	বাকারা	৬	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.
মাকামে ইবরাহীমে নামাজ	১	বাকারা	১২৫	وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ... بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.
নামাজের প্রতি যত্নশীল হওয়া	২	বাকারা	২৩৮	حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ
সালাতুল কসর ও সালাতুল খওফ	৫	নিসা	১০১-১০৩	وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ ... فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ	১৫	বনী ইসরাঈল	৭৮-৭৯	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى ... نَافِلَةً لَّكَ ق عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.
জাহরী নামাজের কেরাত	১৫	বনী ইসরাঈল	১১০	قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا.
নামাজের ওয়াক্ত	১৬	ত্বহা ‘১৩০		فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى.
নামাজে একাগ্রতা	১৮	মুমিনুন	২	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ
বেচাকেনা নামাজে বাধা না হওয়া	১৮	নূর	৩৭	رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ.
অন্যায় কাজ থেকে নামাজের বিরত রাখা	২১	আনকাবূত	৪৫	اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.
জুমার আজানের পর যাবতীয় কাজ ত্যাগ করা	২৮	জুমা	৯	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.
রিয়াকারীর শাস্তি	৩০	মাউন	৪-৬	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

জাকাত, সদকা

পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
২	বাকারা	২১৫	يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ق قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ .... وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.
৩	বাকারা	২৬৭	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ .... اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.
৩	বাকারা	২৭১	اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا ... عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.
৩	বাকারা	২৭৩-২৭৪	لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ .... عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.
৮	আনয়াম	১৪১	وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ .... يَوْمَ حَصَادِهٖ ز وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.
১০	তাওবা	৬০	اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ .... اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.
১৮	নূর	৫৬	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.
১৯	ফোরকান	৬৭	وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.
২১	রুম	৩৯	وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا .... مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.
২৯	দাহর	৮৯	وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا .... اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ...

রোজা, ইতেকাফ ও লাইলাতুল কদর

পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
১	বাকারা	২২৫	وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَّاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ ..... بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ .
২	বাকারা	১৮৩-১৮৫	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .
৩	বাকারা	১৮৭	اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ ... كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.
৩	বাকারা	১৮৭	اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ .... كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.
২৫	দুখান	৩-৫	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ. فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ . اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ.
৩০	কদর	১-৫	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ..... بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

হজ

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
কা'বার সম্মান	১	বাকারা	১২৫	وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا .... لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.
	৪	আলে ইমরান	৯৬-৯৭	اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ ... وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.
	১৭	হজ	২৬-২৭	وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ ... وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.
হজের দিনসমূহ	২	বাকারা	১৯৭-১৯৯	اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ ... النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.
তওয়াফে যিয়ারত	১৭	হজ	২৯	ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.
মাকামে ইবরাহীমে	১	বাকারা	১২৫	وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا .... لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.
সায়ী করা	২	বাকারা	১৫৮	اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ .... وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ .
ওমরার বিধান	২	বাকারা	১৯৬	وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ .... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.
ইহরামের অবস্থায় শিকার করা	৬	মায়েদা	১	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ.
	৭	মায়েদা	৯৫	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ... فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
	৭	মায়েদা	৯৬	اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ .... حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.
তামাত্তুর ইহরাম	২	বাকারা	১৯৬	وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ ..... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.
কুরবানির পশু	৭	মায়েদা	৯৭	جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا .... وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.
	১৭	হজ	২৮	لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ .... الْاَنْعَامِ ج فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ.
কুরবানির পশুর দোষ	১৭	হজ	৩০-৩৩	ذٰلِكَ ق وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ ..... اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.
	১৭	হজ	৩৬-৩৭	وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ ... اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.
ইহরাম অবস্থায় শিকার করার শাস্তি	৭	মায়েদা	৯৫	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا . فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ .... وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
ইহসারের হুকুম	২	বাকারা	১৯৬	وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ .... اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

বিবাহ

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
বিবাহের বৈধতা	৪	নিসা	৩	فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ.
যেসব নারীর সাথে বিবাহ অবৈধ	২	বাকারা	২২১	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ .... وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.
	৫	নিসা	২৩-২৪	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ ..... بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.
মহরের বর্ণনা	২	বাকারা	২৩৬-২৩৭	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ .. الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.
	৫	নিসা	২৪	وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ ... مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.
	২০	কাসাস	২৭-২৮	قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ .... فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ.
	২২	আহযাব	৫০	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْ ..... يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.
অভিভাবকের বর্ণনা	৫	নিসা	২৫	وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ ..... وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.
অবিবাহিতদের বিবাহ	১৮	নূর	৩২	وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.
একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা	৫	নিসা	১২৯	وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

স্তন্যদান

পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
২	বাকারা	২৩৩	وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ .... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.
২৬	আহকাফ	১৫	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ ..... وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ج اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

তালাক

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
তালাকের বৈধতা	২	বাকারা	২২৯	اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ق فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ ..... وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.
	২	বাকারা	২৩১	وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ ..... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.
	২	বাকারা	২৩২	وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا ..... اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.
তিন তালাক	২	বাকারা	২৩০	فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ .... ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.
স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়া	২১	আহযাব	২৮-২৯	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ ..... وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.
ইদ্দতের মাঝে ফিরিয়ে নেওয়া	২	বাকারা	২২৮	وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ ..... عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
ঈলার বিধান	২	বাকারা	২২৬-২২৭	لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.
খোলার বিধান	২	বাকারা	২২৯	اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ ... وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.
যেহারের বিধান	২৮	মুজাদালা	২-৪	اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ ..... ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.
লি'আনের বিধান	১৮	নূর	৬	وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ.
ইদ্দতের বিধান	২	বাকারা	২২৮	وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ .. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.
	২	বাকারা	২৩৪	وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ..... اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.
	২	বাকারা	২৪০	وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ ..... فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.
	২২	আহযাব	৪৯	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ .... فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا.
	২৮	তালাক	৪	وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ .... حَمْلَهُنَّ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.
	২৮	তালাক	৬-৭	اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ ... مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

চুরি, ডাকাতি

পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
৬	মায়েদা	৩৮	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
৬	মায়েদা	৩৩	اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ .... لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

দণ্ডবিধি

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
জেনা	৪	নিসা	১৫-১৬	وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا .... وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا
	১৮	নূর	২-৪	اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ .... تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.
পর্দা	১৮	নূর	২৭-৩৭	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ ... يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ.
	১৮	নূর	৫৮-৬০	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ ..... بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.
	২২	আহযাব	৫৩-৫৫	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ .... وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا.
	২২	আহযাব	৫৯	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ .... ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

বেচাকেনা

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
কেনাবেচার বিধান	২	বাকারা	১৯৮	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ.
	৩	বাকারা	২৭৫	اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا .... وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.
	৩	বাকারা	২৮২-২৮৩	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ .... يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.
	৫	নিসা	২৯	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ .... وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.
	১৮	নূর	৩৭	رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ..... الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ.
	২৮	জুমু'আ	১০	فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي .... مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.
	২৯	মুযযাম্মিল	২০	اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ ..... اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.
	৩	বাকারা	২৭৫	اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا .... عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.
	৩	বাকারা	২৭৮-২৮০	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ ..... وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.
	৩	বাকারা	১৬১	وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ .... بِالْبَاطِلِ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

জিহাদ

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
গনিমত, ফাই ও জিজিয়া	৯	আনফাল	১	يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ ..... وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.
	১০	আনফাল	৪১	وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ .... يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.
	১০	তাওবা	২৮-২৯	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ ..... حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.
	২৬	মুহাম্মদ	৪	فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ .... قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ.
	২৮	হাশর	৫-১০	مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً ..... غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.
বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি	১০	আনফাল	৫৬-৫৮	اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ. فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ ..... قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ.
শত্রুদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করা	১০	আনফাল	৬০-৬৩	وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ ..... جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.
	১০	তাওবা	১-৪	بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ ..... عٰهَدْتُّمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.
শত্রুকে নিরাপত্তা দেওয়া	১০	তাওবা	৬	وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ.

বিষয়	পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করা	৩	বাকারা	২৫৬ - ২৫৭	لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ..... مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.
শত্রুর উপর জুলুম না করা	২	বাকারা	১৯০	وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.
	২	বাকারা	১৯১ - ১৯৩	وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ ..... فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.
	২	বাকারা	১৯৪	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ ..... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

অসিয়ত ও মিরাস

পারা	সূরা	আয়াত নং	আয়াত
২	বাকারা	১৮০-১৮২	كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ ..... فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.
২	বাকারা	২৪০	وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً .... فِىْ مَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.
৪	নিসা	৭-৮	لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ .... وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.
৪	নিসা	১১ - ১২	يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ..... غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.
৫	নিসা	৩৩	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ..... فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا.
৭	মায়েদা	১০৬- ১০৮	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ ..... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.
১০	আনফাল	৭৫	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا ..... بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

اَلْبَحْثُ التَّاسِعُ : اَطْلَسُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْمَذْكُوْرِيْنَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

নবম আলোচনা : কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের মানচিত্র

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে প্রথপ্রদর্শনের জন্যে যুগে যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মাঝে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এসব নবী-রাসূলের সংখ্যা সম্পর্কে মুসনাদে আহমদের একটি মারফূ' হাদীসে এক লক্ষ চাব্বিশ হাজার হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীস বিশারদগণের মতে, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ফতুয়ায়ে শামীতেও আল্লামা শামী (র.) নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার হওয়ার বিষয়টিকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সকল নবী-রাসূলের আলোচনা হাদীসে পাওয়া যায় না। এসব নবী-রাসূলগণের বেশিরভাগের আলোচনাই কুরআনে আসেনি। কারণ, কুরআন কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। তবে মুসলমানদেরকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে কতিপয় নবী-রাসূলের ঘটনা আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এরকম নবী-রাসূলের সংখ্যা পঁচিশ। কুরআন শরীফে তাঁদের দাওয়াতের ঘটনা, তাদের কওমের আযাবের ঘটনা বা অন্য কোনো শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেহেতু আমরা কুরআনের তাফসীর পাঠ করতে যাচ্ছি, তাই বিভিন্ন স্থানে নবী-রাসূলের ঘটনাবলি আমাদের সামনে আসবে। সুতরাং পূর্ব থেকেই যদি এ সকল নবী-রাসূলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানা থাকে, তাহলে আয়াত সংশ্লিষ্ট আলোচনা বোঝার জন্যে তা সহায়ক হবে। কারণ, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নবীগণের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ না করে বরং আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটুকু বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই গ্রন্থের একাধিক জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা না করে আমরা সেগুলো একসাথে আলোচনা করা ভালো মনে করেছি। এ কথা চিন্তা করেই আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শুরুতে কুরআনে উল্লিখিত পঁচিশজন নবী-রাসূলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করেছি।

আমরা এ তালিকাটি প্রস্তুত করতে গিয়ে আল্লামা হিফজুর রহমান সিওহারভী (র.) রচিত 'কাসাসুল কুরআন', ড. শাওকী আবূ খলিল সংকলিত 'আতলাসুল কুরআনিল কারীম', আল্লামা ইয়াকুত হামাভী রচিত 'মুজামুল বুলদান'-সহ বিভিন্ন প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সহায়তা নিয়েছি। বিভিন্ন স্থানের নামের বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে এলাকাটি যে নামে প্রসিদ্ধ, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন بيت لحم-এর বাংলা দেওয়া হয়েছে বেথেলহেম। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে আরবি নাম ও বাংলা নামের মাঝে পার্থক্য হয়েছে। কারণ, অনেক আরবি নামই তুর্কি, রাশিয়ান বা ইংরেজি ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এছাড়া নবী-রাসূলগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখ বা অন্যান্য বিষয়ে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সঠিক ও প্রসিদ্ধ মতগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা হয়েছে। তালিকাটি তথ্যবহুল, নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিহীন করতে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। আশা করি, তেমন কিছু চোখে পড়লে পাঠকেরা আমাদেরকে তা জানিয়ে বাধিত করবেন। তালিকাটিতে নবী-রাসূলগণের সময়ক্রমের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে আদম (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে।

১. হযরত আদম (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৫৮৭২-৪৯৪২ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	৯৩০ বছর
অবতরণস্থল	:	অগ্রগণ্য অভিমত হলো, হযরত আদম (আ.)-কে জিবরাঈল (আ.) জাবালে আরাফাতে নামিয়ে দেন। প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের সিলন দ্বীপের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) বাওয নামক পাহাড়ে অবতরণ করেন এবং হাওয়া (আ.)-এর খোঁজে মুযদালিফায় আসেন।
কওমের উপাধি	:	যুররিয়াতু আদম
সন্তানাদি	:	৪০
মৃত্যুস্থান	:	মক্কা/হিন্দ/শাম
রওজা শরীফ	:	অগ্রগণ্য অভিমত হলো, জাবালে আবূ কুবাইস। এছাড়া শাম ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২৫
মোট সূরা সংখ্যা	:	৯
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭ আলে ইমরান : ৩৩, ৫৯ মায়েদা : ২৭ আ'রাফা : ১২১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২ বনী ইসরাঈল : ৬১, ৭০ কাহফ : ৫০ মারইয়াম : ৫৮ ত্বহা : ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২১ ইয়াসীন : ৬০

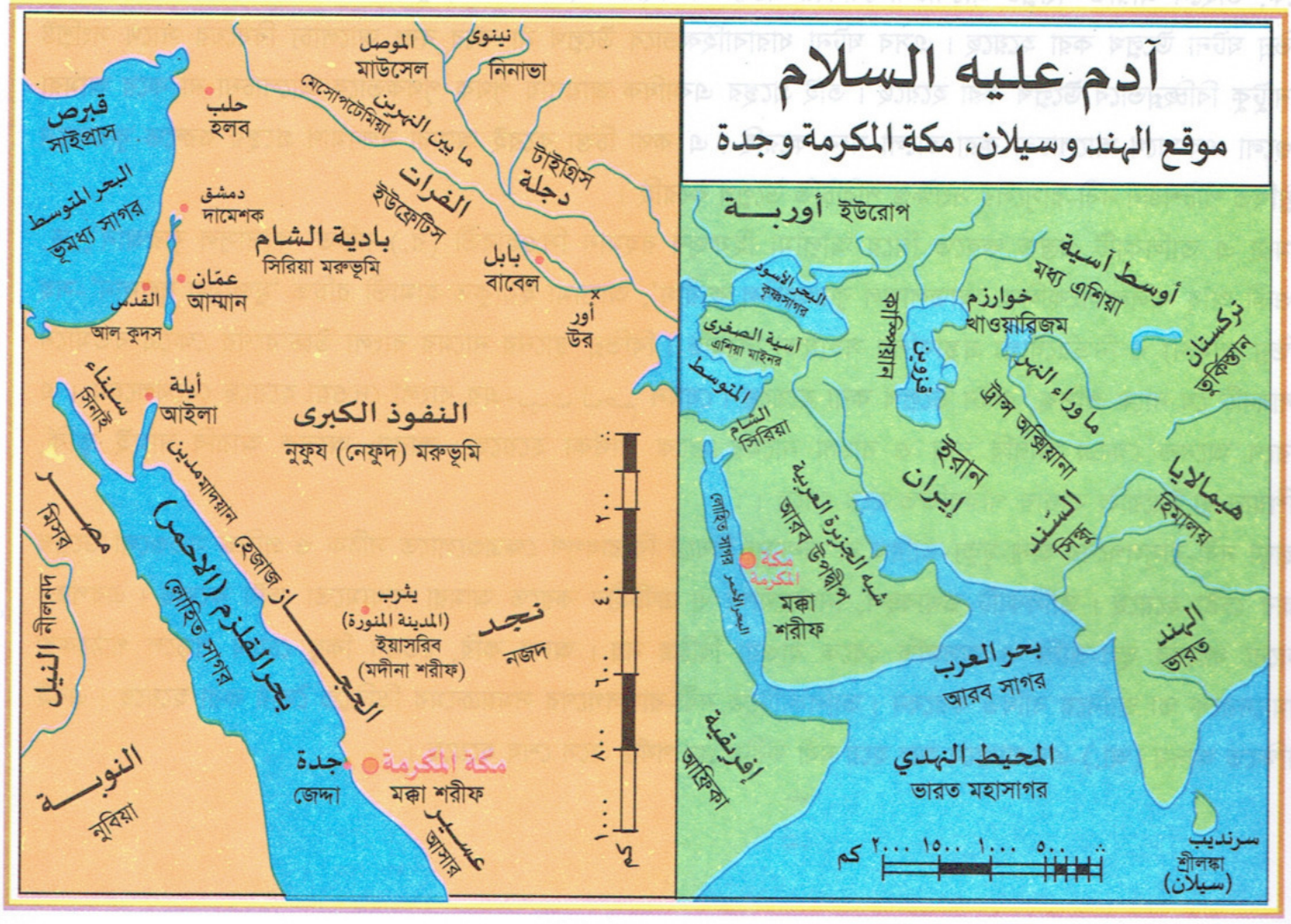

চিত্র : আদম (আ.)-এর অবতরণ স্থল

২. হযরত ইদরীস (আ.)

বংশধারা	:	ইদরীস ইবনে ইয়ারুদ ইবনে মাহলাঈল ইবনে ক্বীনান ইবনে আনুশ ইবনে শীস ইবনে আদম (আ.)।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৪৫৩৩-৪১৮৮ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	৩৪৫ বছর।
জন্মস্থান	:	এক অভিমত অনুযায়ী, হযরত ইদরীস (আ.) মিসরের মেমফিস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য অভিমত অনুসারে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাবেলে। পরবর্তীতে মিসরে হিজরত করেন।
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৪৩৫ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	বাবেল (ইরাক)
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২
মোট সূরা সংখ্যা	:	২
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	মারইয়াম : ৫৬ আম্বিয়া : ৮৫

চিত্র : হযরত ইদরীস (আ.)-এর জন্মস্থান ও হিজরতের পথ

৩. হযরত নূহ (আ.)

বংশধারা	:	নূহ ইবনে মালাক ইবনে মুতাওশালেহ ইবনে আখনুখ ইবনে ইয়ারুদ ইবনে মাইলাঈন ইবনে ক্বীনান ইবনে আনুশ ইবনে শীস (আ.) ইবনে আদম (আ.)।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৩৯৯৩-৩০৪৩ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	৯৫০ বছর
প্রথম রাসূল	:	হযরত আদম (আ.)-এর পর প্রথম নবী যাকে প্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফের শাফায়াত অধ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে একটি দীর্ঘ রেওয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। এতে বর্ণিত আছে– يا نوح انت اول الرسل الى الارض অর্থাৎ হে নূহ, পৃথিবীতে প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম।
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৩৬৫ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি স্থান	:	ইরাক
কওমের উপাধি	:	কওমে নূহ (আ.)
কওমের উপর গজবের স্থান	:	ইরাক
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	হূদ : ৪৪
সন্তানাদি	:	৪
মৃত্যুস্থান	:	মক্কা
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৪৩
মোট সূরা সংখ্যা	:	২৮
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আলে ইমরান ৩৩ নিসা : ১৬৩ আনআম : ৮৪ আরাফ : ৫৯,৬৯ তওবা : ৭০ ইউনুস : ৭১ হূদ : ২৫,৩২,৩৬,৪২,৪৫,৪৬,৪৮,৪৯ ইবরাহীম : ৯ ইসরা : ৩,১৭ মারইয়াম : ৫৮ আম্বিয়া : ৭৬ হজ : ৪২ মুমিনুন : ২৩ ফুরক্বান : ৩৭ শু'আরা : ১০৫,১০৬,১১৬ আনকাবূত : ১৪ আহযাব : ৭ সাফ্ফাত : ৭৫,৭৯ সোয়াদ : ১২ মুমিন : ৫,১৩ শূরা : ১৩ ক্বফ : ১২ যারিয়াত : ৪৬ নজম : ৫২ ক্বমার : ৯ হাদীদ : ২৬ তাহরীম : ১০ নূহ : ১, ২১, ২৬

চিত্র : হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় ও জুদী পর্বতমালার অবস্থান

৪. হযরত হুদ (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	২৪৫০-২৩২০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	২৪০০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	আহক্বাফ
কওমের উপাধি	:	কওমে আদ/ কওমে হুদ/প্রথম আদ
কওমের উপর গযবের স্থান	:	আহক্বাফ
মৃত্যুস্থান	:	হাযরামাউতের পূর্বে তারীমের নিকটে বারাহূত নামক উপত্যকায়। এটা শক্তিশালী অভিমত। কারো কারো মতে, তিনি ফিলিস্তিনে মৃত্যুবরণ করেন। এমনকি ফিলিস্তিনে তাঁর মাজারও রয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক অভিমত নয়।
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	হাক্কাহ : ৬-৭
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৭
মোট সূরা সংখ্যা	:	৩
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আ'রাফ : ৬৫ হূদ : ৫০, ৫৩,৫৮,৬০,৮৯ শু'আরা : ১২৪

চিত্র : হুদ (আ.)-এর কবর এবং প্রথম আদজাতির আবস্থান স্থল

তাফ. জালালাইন (প্রথম খণ্ড) বাংলা-70gsm-৭-খ

৫. হযরত সালেহ (আ.)

বংশধারা	:	সালেহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে আসেক ইবনে মাশেহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে হাদের ইবনে সামূদ ইবনে আদ ইবনে আউস ইবনে এরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	২১৫০-২০৮০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তিসন (আনুমানিক)	:	২১০০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তিরস্থান	:	হিজর (মাদায়েনে সালেহ)
কওমের উপাধি	:	কওমে সামূদ
কওমের উপর গযবের স্থান	:	হিজর/ফাজ্জুন নাকাহ
মৃত্যুস্থান	:	ফিলিস্তিনের রামাল্লা/হাযরামাউত/হিজর/মক্কা।
মু'জেযা	:	উটনী
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	হাক্কা : ৫
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৯
মোট সূরা সংখ্যা	:	৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আ'রাফ : ৭৩,৭৫,৭৭ হূদ : ৬১-৬২,৬৬,৮৯ শু'আরা : ১৪২ নমল : ৪৫

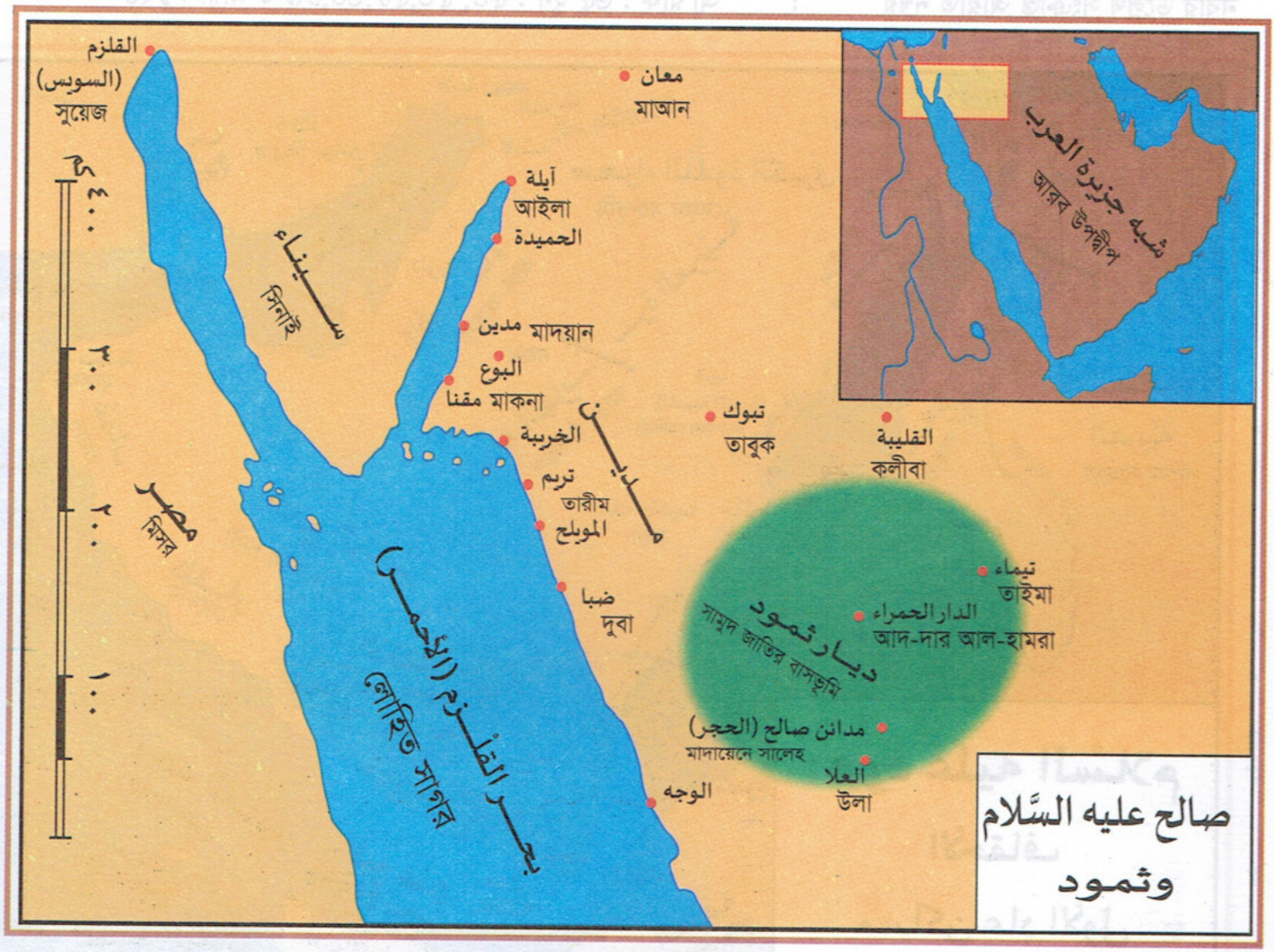

চিত্র : সামূদ জাতির বাসভূমি

৬. হযরত ইবরাহীম (আ.)

বংশধারা	:	ইবরাহীম ইবনে তারেখ (আযর) ইবনে নাহুর ইবনে সারূজ ইবনে রাউ ইবনে ফালেহ ইবনে আবির ইবনে সালেহ ইবনে আরফাকশায ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৯৯৮-১৮২২ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	১৭৬ বছর
জন্মস্থান	:	ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে ফাদদানে আরাম নামক স্থানে।
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৯০০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	উর (ইরাক)
কওমের উপাধি	:	কালদানী
স্ত্রী	:	৩
সন্তানাদি	:	৫
মৃত্যুস্থান	:	ফিলিস্তিনের হেবরোন
মু'জিযা	:	অগ্নি শীতল হওয়া, পাখির পুনর্জীবন, মাকামে ইবরাহীম।
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	আম্বিয়া : ৭০
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৬৯
মোট সূরা সংখ্যা	:	২৫
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ১২৪,১২৫ (একাধিক বার), ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮ (একাধিক বার), ২৬০ আলে ইমরান : ৩৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮৪, ৯৫, ৯৭ নিসা : ৫৪, ১২৫ (একাধিক বার), ১৬৩ আন'আম : ৭৪-৭৫, ৮৩, ১৬১ তাওবা : ৭০, ১৪৪ (একাধিক বার) হূদ : ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬ ইবরাহীম : ৩৫ নাহল : ১২০, ১২৩ আম্বিয়া : ৫১, ৬০, ৬২, ৬৯ শু'আরা : ৬৯ আহযাব : ৭ সোয়াদ : ৪৫ যুখরুফ : ২৬ নাজ্‌ম : ৩৭ মুমতাহিনা : ৪ (একাধিক বার) ইউসুফ : ৬, ৩৮ হিজর : ৫১ মারইয়াম : ৪১, ৪৬, ৫৮ হজ : ২৬, ৪৩, ৭৮ 'আনকাবূত : ১৬, ৩১ সাফ্‌ফাত : ৮৩, ১০৪, ১০৯ শুরা : ১৩ যারিয়াত : ২৪ হাদীদ : ২৬ আ'লা : ১৯

চিত্র : ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থান ও যাত্রাপথসমূহ

তাফ.জালালাইন (প্রথম খণ্ড) বাংলা-70gm-b-ক

৭. হযরত লূত (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৯৫০-১৮৭০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৯০০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	সদূম (শাম)
কওমের উপাধি	:	কওমে লুত
কওমের উপর গযবের স্থান	:	সদূম
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	হূদ : ৮২-৮৩
সন্তানাদি	:	২ মেয়ে
মৃত্যুস্থান	:	কওমে লূতের উপর অবতীর্ণ আযাবে সদূম ও গমোরাহ নগরী দুটি ধ্বংস হয়ে যায়। নিকটবর্তী সুগার নামক এলাকা এ আযাবে আক্রান্ত হয়নি। হযরত লূত (আ.) তাঁর সাথিবৃন্দকে নিয়ে এখানে বসবাস করতে থাকেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২৭
মোট সূরা সংখ্যা :	:	১৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আন'আম : ৮৬ আ'রাফ : ৮০ হুদ : ৭০, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৯ হিজর : ৫৯, ৬১ হজ্জ : ৪৩ শুরা : ১৬০-১৬১, ১৬৭ নামল : ৫৬, ৫৬ আম্বিয়া : ৭১, ৭৪ 'আনকাবুত : ২৬-২৭, ৩২-৩৩ সোয়াদ : ১৩ ক্বফ : ১৩ সাফ্ফাত : ১৩৩ ক্বমার : ৩৩-৩৪ তাহরীম : ১০

চিত্র : লুত (আ.)-এর জাতির আবাসস্থল ও তাঁর মৃত্যুস্থান

৮. হযরত ইসমাঈল (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৯১১-১৭৭৪ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	২৪৭
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৮৫০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	মক্কা
কওমের উপাধি	:	আমালিক/কবাইলে ইয়ামান
সন্তানাদি	:	১২ পুত্র, ১ কন্যা
মৃত্যুস্থান	:	মক্কা
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১২
মোট সূরা সংখ্যা	:	৮
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ১৩৩, ১২৫, ১২৭, ১৩৬, ১৪০ আলে ইমরান : ৮৪ নিসা : ১৬৩ আন'আম : ৮৬ ইবরাহীম : ৩৯ মারইয়াম : ৫৪ আম্বিয়া : ৮৫ সোয়াদ : ৪৮

চিত্র : হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কবর এবং প্রথম আদজাতির অবস্থান স্থল

৯. হযরত ইসহাক (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৮৯৭-১৭১৭ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৮০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	খলিল (ফিলিস্তিন)
কওমের উপাধি	:	কেনানী
স্ত্রী	:	ইসহাক (আ.)-এর স্ত্রী রাফাকাহ ইরাকের ফাদ্দানে আরামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিলিস্তিনে আসেন।
সন্তানাদি	:	২
মৃত্যুস্থান	:	খলিল (হেবরোন)
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১৭
মোট সূরা সংখ্যা	:	১২
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ১৩৩, ১৩৬, ১৪০ আলে ইমরান : ৮৪ নিসা : ১৬৩ আন'আম : ৮৪ হূদ : ৭১ (একাধিক বার) ইউসুফ : ৬, ৩৮ ইবরাহীম : ৩৯ মারইয়াম : ৪৯ আম্বিয়া : ৭২ আনকাবূত : ২৭ সাফ্ফাত : ১১২-১১৩ সোয়াদ : ৪৫

চিত্র : ইসহাক (আ.)-এর জন্মস্থান ও তাঁর স্ত্রীর আগমন পথ

১০. হযরত ইয়াকূব (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৮৩৭-১৬৯০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৭৫০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	কেনান
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল
স্ত্রী	:	৪
সন্তানাদি	:	১২ ছেলে
বিকল্প নাম	:	ইসরাঈল
সফরসমূহ	:	ইয়াকূব (আ.) ফিলিস্তিন থেকে ইরাকের ফাদ্দানে আরাম নামক স্থানে গমন করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ফিলিস্তিনে অবস্থান করেন। এরপর তিনি পরিবারসহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে মিসরে গমন করেন।
মৃত্যুস্থান	:	অগ্রগণ্য অভিমত হলো, তিনি মিসরে ইন্তেকাল করেন। তারপর অসিয়ত মোতাবেক তাঁর মরদেহ ফিলিস্তিনের হেবরোনে এনে দাফন করা হয়।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১৬
মোট সূরা সংখ্যা	:	১০
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ১৩২-১৩৩, ১৩৬, ১৪০ আলে ইমরান : ৮৪ নিসা : ১৬৩ আন'আম ৮৪ হূদ : ৭১ ইউসুফ : ৬, ৩৮, ৬৮ মারইয়াম : ৬, ৪৯ আম্বিয়া : ৭২ 'আনকাবুত : ৭২ সোয়াদ : ৪৫

চিত্র : ইয়াকুব (আ.)-এর জন্মস্থান,মৃত্যুস্থল ও সফরসমূহ

১১. হযরত ইউসুফ (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৭৪৫-১৬৩৫ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	১১০ বছর
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৭১৫ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	মিসর
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল/আল-হিকসুস
সন্তানাদি	:	২ ছেলে, ১ মেয়ে।
সফরসমূহ	:	ইউসুফ (আ.)-কে তার ভাইয়েরা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কোনো এক কূপে ফেলে দিয়েছিল। জনৈক কাফেলা তাঁকে সে কূপ থেকে উদ্ধার করে মিসরের হেকসুসের (বর্তমানে আভারিস) বাজারে এনে বিক্রি করে।
মৃত্যুস্থান	:	ইউসুফ (আ.) মৃত্যুবরণ করেন মিসরে। পরবর্তীতে তাঁর মরদেহ ফিলিস্তিনের হেবরোনে আনা হয়।
মু'জিযা	:	স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান :
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২৭
মোট সূরা সংখ্যা	:	৩
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আন'আম : ৮৪ ইউসুফ : ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ২১, ২৯, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯-৯০ (একাধিক বার), ৯৪, ৯৯ মুমিন : ৩৪

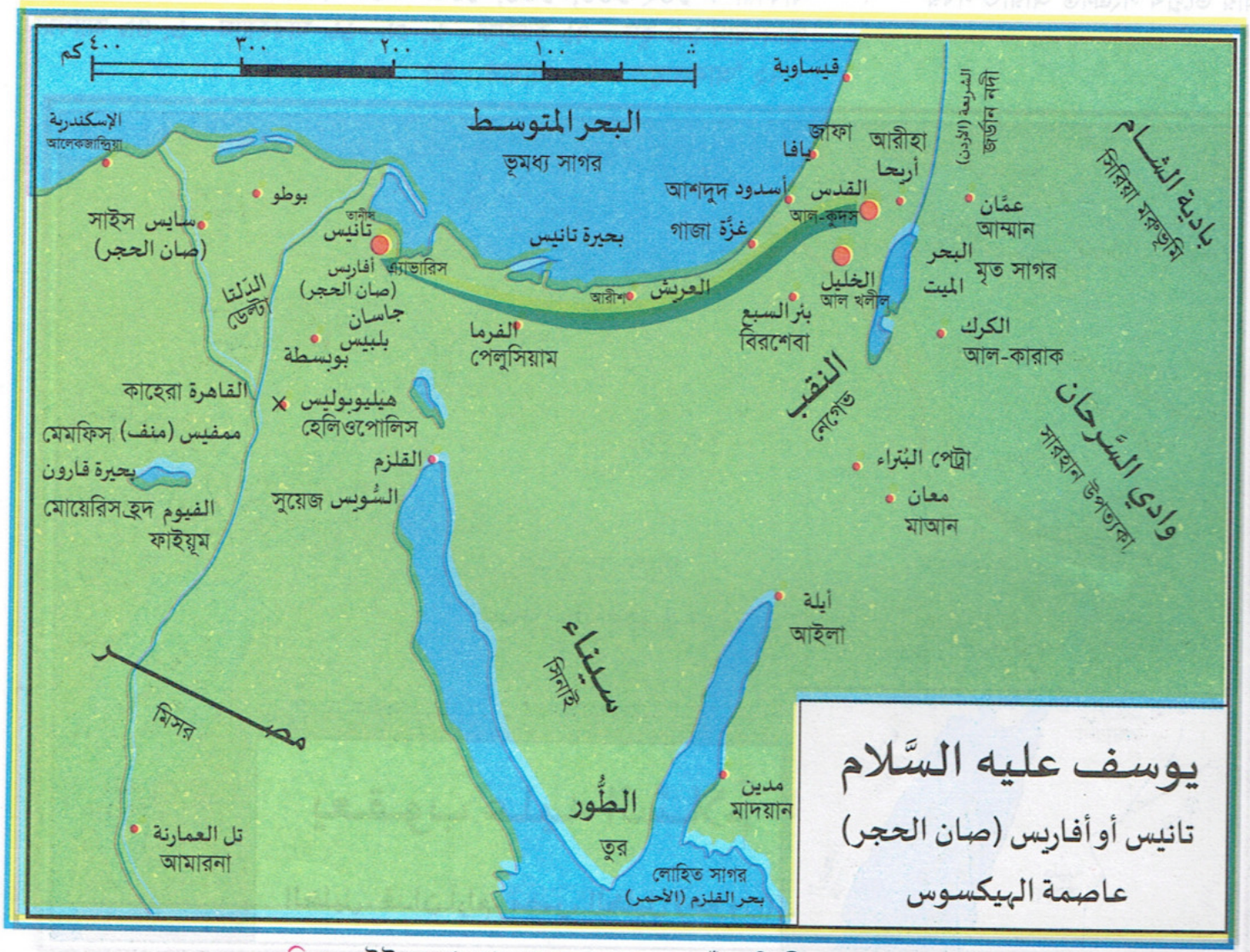

চিত্র : ইউসুফ (আ.)-এর জন্মস্থান এবং তাঁর বিক্রীত হওয়ার স্থান

১২. হযরত শু'আইব (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৬০০-১৪৯০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৫৫০ খ্রি. পূ,
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	মাদইয়ান
কওমের উপাধি	:	মাদয়ান/আসহাবুল আইকা
কওমের উপর গযবের স্থান	:	মাদয়ান
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	শু'আরা : ১৮৯
মৃত্যুস্থান	:	হাযরামাউত
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১১
মোট সূরা সংখ্যা	:	৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আ'রাফ : ৮৫, ৮৮, ৯০, ৯২ (একাধিক বার) হূদ : ৮৪, ৮৭, ৯১, ৯৪ শু'আরা : ১৭৭ আনকাবূত : ৩৬

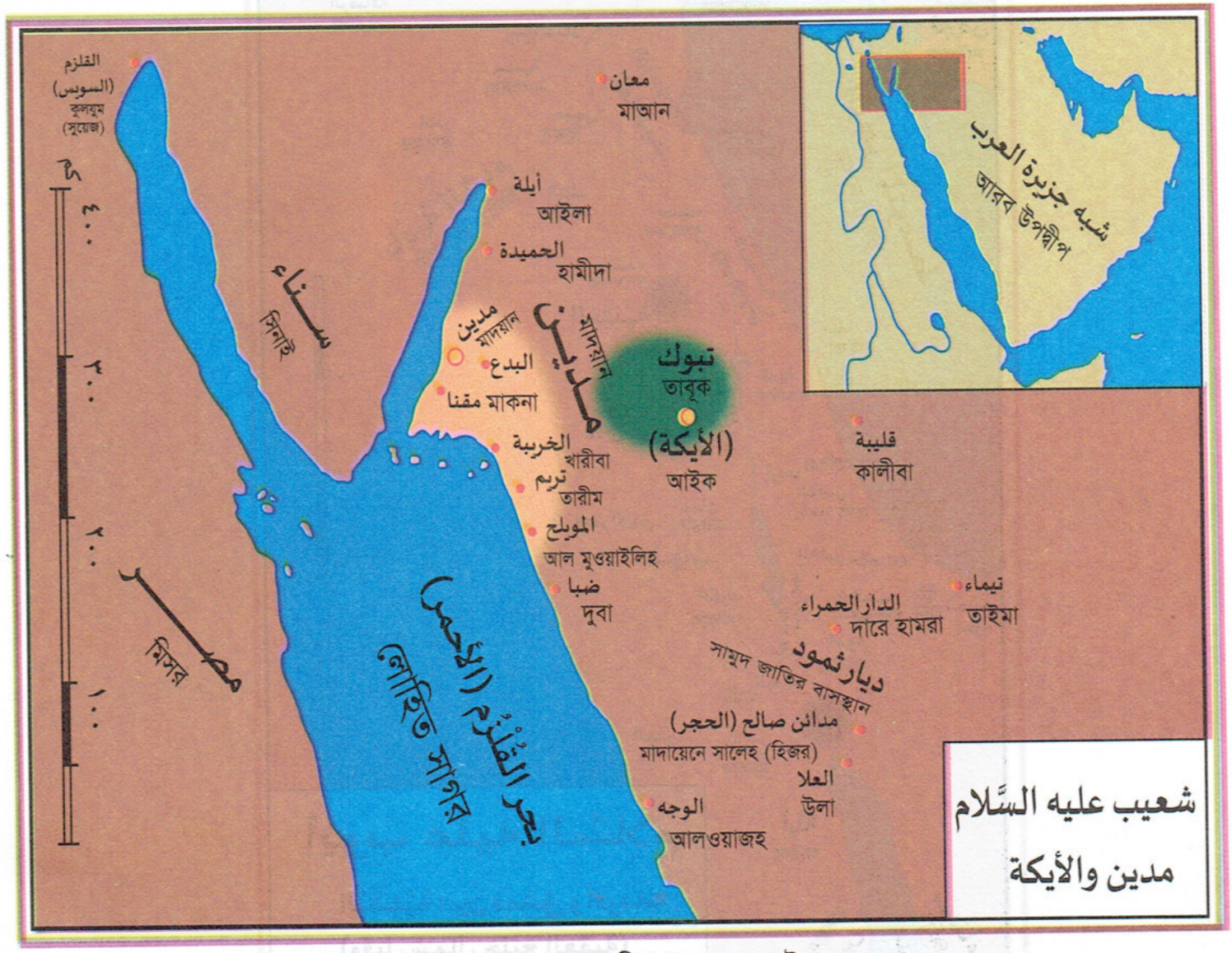

চিত্র : শোয়াইব (আ.)-এর জাতি আসহাবুল আইকার অবস্থান

১৩. হযরত আইয়ূব (আ.)

জন্ম (আনুমানিক)	:	১৫০০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	আওস/ এডোম/বাসানিয়া
কওমের উপাধি	:	উমুরিয়ুন
আবাসস্থল	:	হযরত আইয়ূব (আ.)-এর আবাসস্থল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে, মৃতসাগরের পশ্চিমে এবং আকাবা উপসাগরের উত্তরে অবস্থিত এডোম অঞ্চলে। তবে আল্লামা তাবারী ও ইয়াকূব হামাভী (র.)-এর মতে, তিনি দামেশক ও আযরুয়াতের মধ্যবর্তী বাসানিয়া নগরীর বাসিন্দা।
সন্তানাদি	:	২৬
মৃত্যুস্থান	:	হাওরান
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৪
মোট সূরা সংখ্যা	:	৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	নিসা : ১৬৩ আনআম : ৮৪ আম্বিয়া : ৮৩ সোয়াদ : ৪১

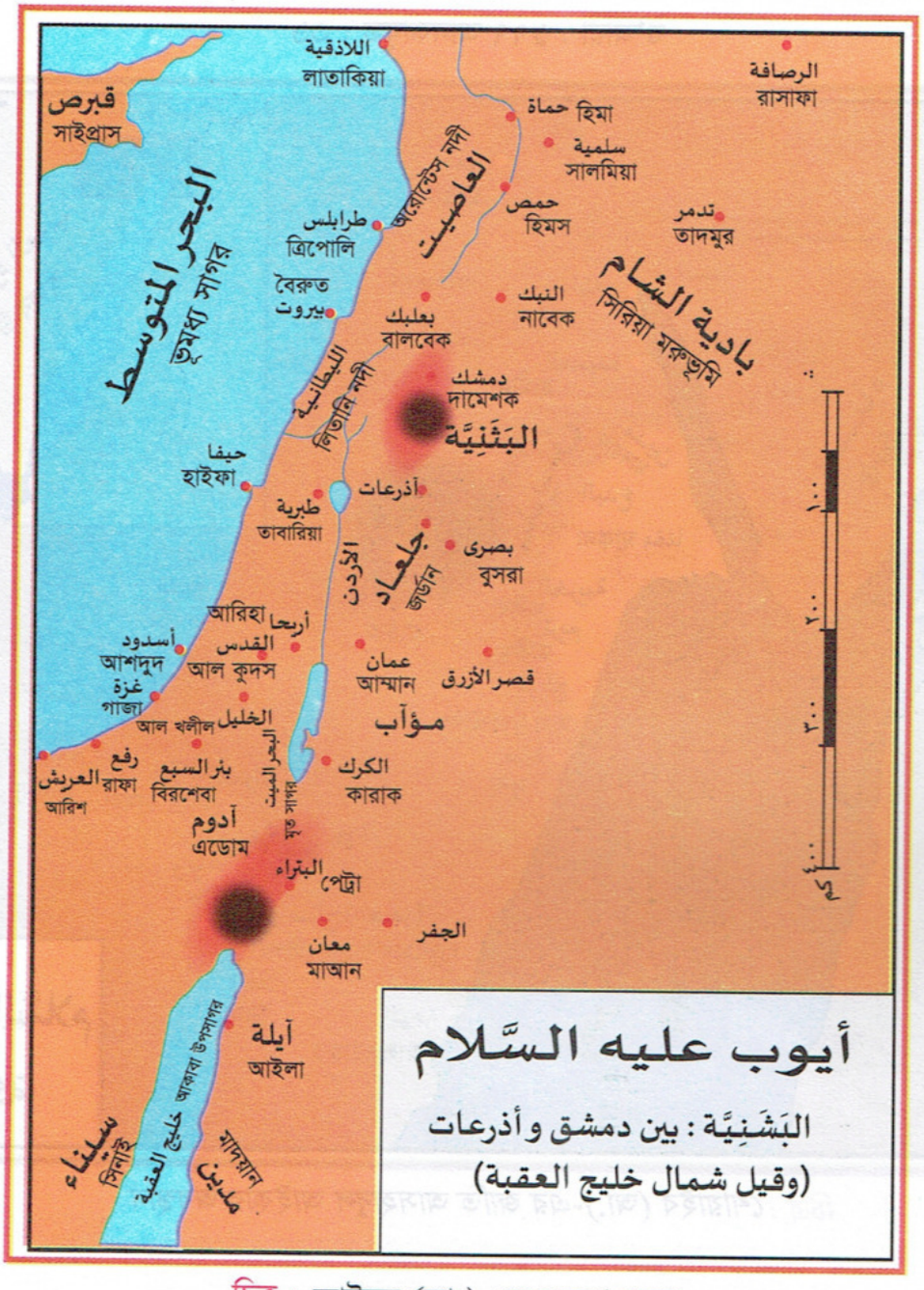

চিত্র : আইয়ুব (আ.)-এর অবস্থান স্থল

১৪. হযরত যুলকিফল (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৫০০-১৪২৫ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৪৬০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	দামেশক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল
কওমের উপাধি	:	উমুরিয়্যূন
মৃত্যুস্থান	:	দামেশক
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২
মোট সূরা সংখ্যা	:	২
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আম্বিয়া : ৮৫ সোয়াদ : ৪৮

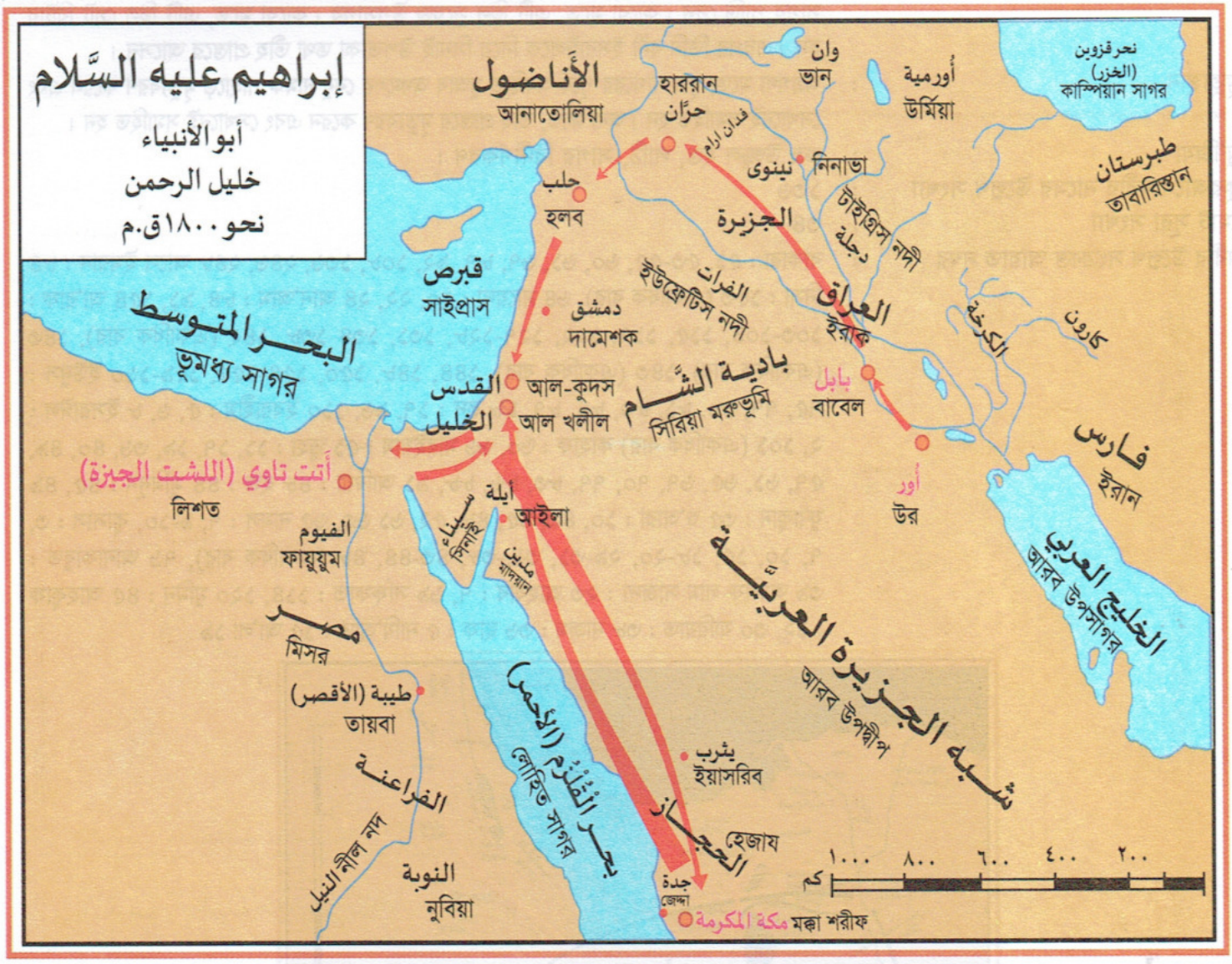

চিত্র : হযরত যুলকিফল (আ.)-এর জন্মস্থান ও যাত্রাপথসমূহ

১৫. হযরত মূসা (আ.)

বংশধারা	:	মূসা (আ.) ইবনে ইমরান কামাত ইবনে লাওয়া ইবনে ইয়াকূব (আ.)।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৫২৭-১৪০৭ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	১২০
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৪৫০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	মিসর
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল/ ফারাআনাহ
কওমের উপর গযবের স্থান	:	সিনা
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	মায়েদা : ২৬
সন্তানাদি	:	২
সফরসমূহ	:	হযরত মূসা (আ.) মিসর থেকে সিনাই হয়ে মাদইয়ান গমন করেন। পরবর্তীতে স্ত্রীকে নিয়ে ফেরার সময় তূর পাহাড়ে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। এরপর মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সাগর পাড়ি দেন। কারো মতে, এটি ছিল সুয়েজ উপসাগর। কারো মতে, এটি ছিল গ্রেট বিটার হ্রদ। এরপর তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সিনাই উপত্যকা তথা তীহ প্রান্তরে আসেন।
মৃত্যুস্থান	:	অগ্রগণ্য মতে, মৃত সাগরের পূর্বে অবস্থিত মুআব অঞ্চলের নেবু নামক পাহাড়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। অন্য মতে, তীহ প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।
মু'জিযা	:	শুভ্র উজ্জ্বল হস্ত, লাঠি, সাগর বিদীর্ণকরণ।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১৩৬
মোট সূরা সংখ্যা	:	৩৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ৫১, ৫৩-৫৫, ৬০, ৬১, ৬৭, ৮৭, ৯২, ১০৮, ১৩৬, ২৪৬, ২৪৮ আলে ইমরান : ৮৪ নিসা : ১৫৩ (একাধিক বার), ৬৪ মায়েদা : ২০, ২২, ২৪ আন'আম : ৮৪, ৯১, ১৫৪ আ'রাফ : ১০৩-১০৪, ১১৫, ১১৭, ১২২, ১২৭-১২৮, ১৩১, ১৩৪ ১৩৮, ১৪২ (একাধিক বার), ১৪৩ (একাধিক বার), ১৪৩ (একাধিক বার), ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪-১৫৫, ১৫৯-১৬০ ইউনুস : ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৮ হুদ : ১৭, ৯৬, ১১০ ইবরাহীম : ৫, ৬, ৮ ইসরাঈল : ২, ১০১ (একাধিক বার) কাহাফ : ৬০, ৬৬ মারইয়াম : ৫১ ত্বহা : ১১, ১৭, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪৯, ৫৭, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭৭, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৯১ আম্বিয়া : ৪৮ হজ : ৪৪ মুমিনূন : ৪৫, ৪৯ ফুরক্বান : ৩৫ শু'আরা : ১০, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫২, ৬১ ৬৩, ৬৫ নামল : ৭, ৯-১০, ক্বাসাস : ৩, ৭, ১০, ১৫, ১৮-২০, ২৯-৩১, ৩৬,-৩৮, ৪৩-৪৪, ৪৮ (একাধিক বার), ৭৬ আনাকাবুত : ৩৯ আলিফ লাম সাজদা : ২৩ আহযাব : ৭, ৬৯ সাফ্ফাত : ১১৪, ১২০ মুমিন : ৪৫ আহক্বাফ : ১২, ৩০ যারিয়াত : ৩৮ নাজ্‌ম : ৩৬ ছাফ : ৫ নাযি'আত : ১৫ আ'লা ১৯

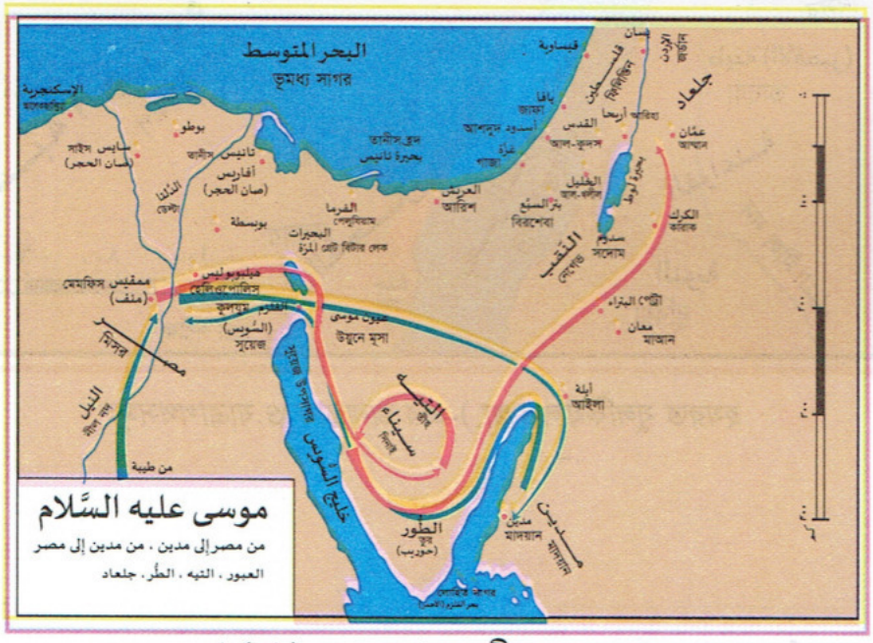

চিত্র : মূসা (আ.)-এর ময়দান ও তীহ প্রান্তরে গমনের পথ

১৬. হযরত হারুন (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১৫৩১-১৪০৮ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১৪৫০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	মিসর
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল/ ফারাআনাহ
মৃত্যুস্থান	:	তীহ প্রান্তরের হূর নামক পর্বত।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২০
মোট সূরা সংখ্যা	:	১৩
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা ২৪৮ নিসা : ১৬৩ আন'আম : ৮৪ আ'রাফ : ১২২, ১৪২ ইউনুস : ৭৫ মারইয়াম : ২৮, ৫৩ ত্বহা : ৩০, ৭০, ৯০, ৯২ আম্বিয়া : ৪৮ মুমিনূন : ৪৫ ফুরক্বান : ৩৫ শু'আরা : ১৩, ৪৮ ক্বাসাস : ৩৪ সাফ্ফাত : ১১৪ ১২০

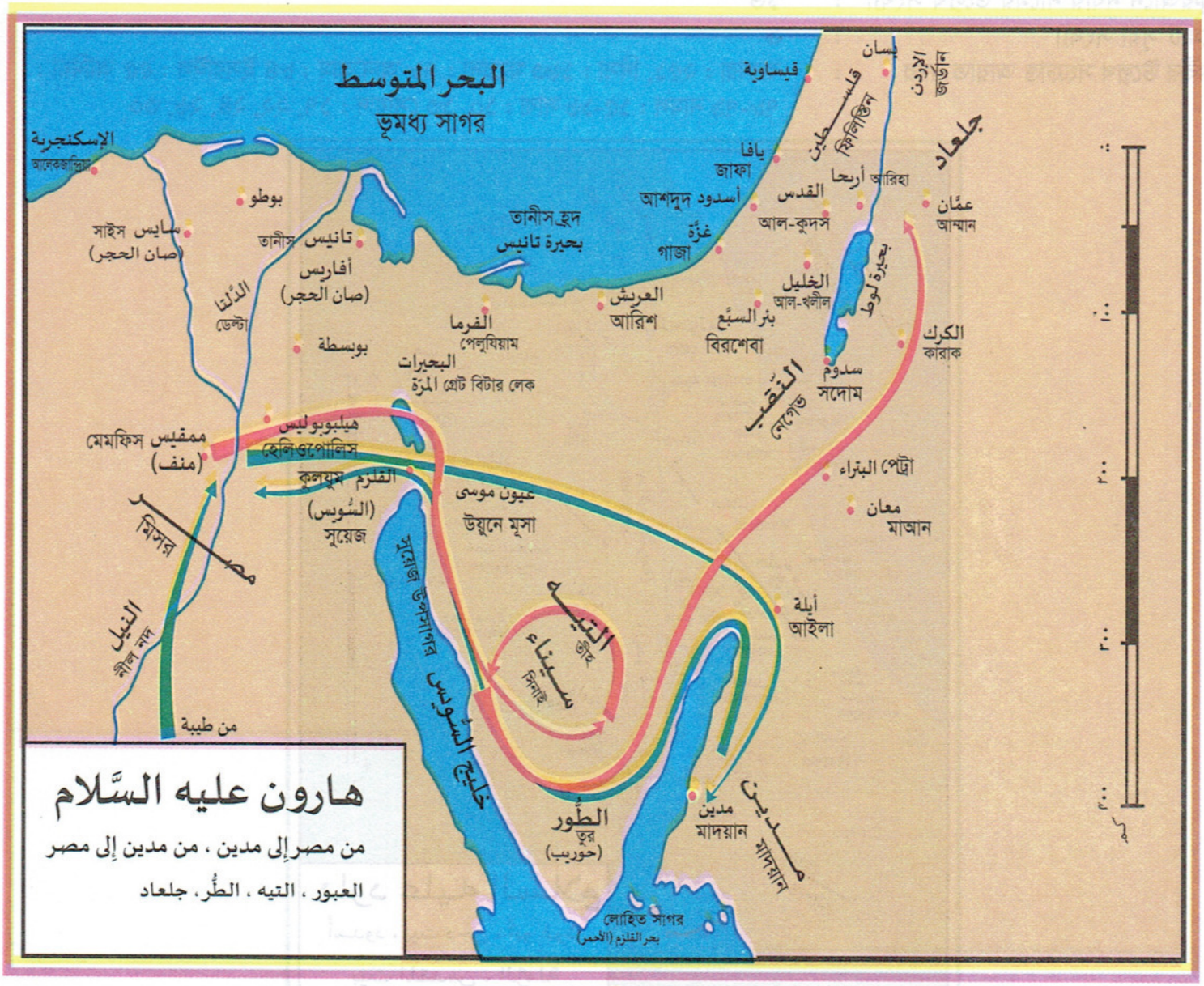

চিত্র : হারুন (আ.)-এর তীহ প্রান্তরে গমনের পথ

১৭ হযরত দাউদ (আ.)

বংশধারা	:	দাউদ ইবনে ঈশা ইবনে আওবাদ ইবনে আবির ইবনে সালমূন ইবনে নাহশূন ইবনে আউনিয়ায ইবনে আরাম ইবনে হাসরুন ইবনে ফারেস ইবনে ইয়াহুযা ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১০৪১-৯৬৩ খ্রি. পূ.
	:	১০৪১-৯৬৩ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	১০০১ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	ফিলিস্তিন
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল
সন্তানাদি	:	১
মৃত্যুস্থান	:	বায়তুল মুকাদ্দাস
মু'জিযা	:	হাতে লোহা গলে যাওয়া, সুমিষ্ট স্বরে যাবূর তেলাওয়াত, স্বল্প সময়ে যাবুর খতম করা, পাখির ভাষা বোঝা।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১৬
মোট সূরা সংখ্যা	:	৯
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ২৫১, নিসা : ১৬৩ মায়েদা : ৭৮ আন'আম : ৮৪ ইসরাঈল : ৫৫ আম্বিয়া : ৭৮-৭৯ নামল : ১৫-১৬ সাবা : ১০, ১৩ সোয়াদ : ১৭, ২২, ২৪, ২৬, ৩০

চিত্র : দাউদ (আ.)-এর রওজা

১৮. হযরত সোলায়মান (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৯৮৯-৯৩১ খ্রি. পূ.
জীবনকাল	:	৫৮ বছর
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৯৭০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	ফিলিস্তিন
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল
মৃত্যুস্থান	:	বায়তুল মুকাদ্দাস
মু'জিযা	:	পাখির ভাষা বোঝা, বায়ু বশীকরণ, জিন ও অন্যান্য প্রাণীসমূহ বশীকরণ, তাম্রের ঝরনা।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	১৭
মোট সূরা সংখ্যা	:	৭
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ১০২ (একাধিক বার) নিসা : ১৬৩ আন'আম : ৮৪ আম্বিয়া : ৭৮-৭৯, ৮১ নামল : ১৫-১৮, ৩০, ৩৬, ৪৪ সাবা : ১২ সোয়াদ : ৩০, ৩৪

চিত্র : সোলায়মান (আ.)-এর অবস্থান স্থল

১৯. হযরত ইলয়াস (আ.)

বংশধারা	:	ইলয়াস ইবনে ইয়াসীন ইবনে ফাতহাস ইবনে ইয়াযার ইবনে হারুন।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৯১০-৮৫০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৮৭০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	বালবেক (লেবানন)
কওমের উপাধি	:	ফিনিশিয়া
মৃত্যুস্থান	:	বালবেক
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৩
মোট সূরা সংখ্যা	:	২
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আন'আম ৮৫ সাফ্ফাত : ১২৩, ১৩০

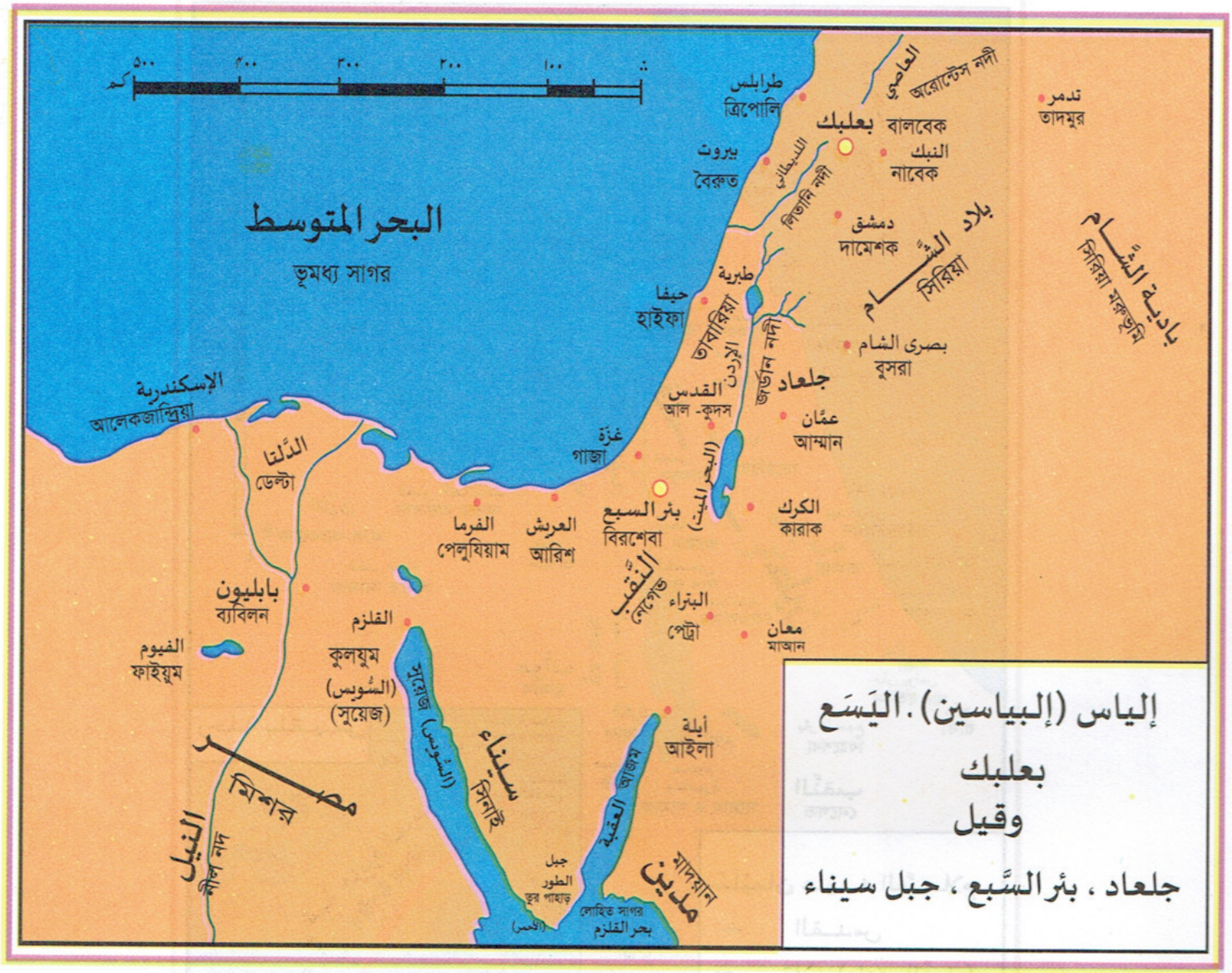

চিত্র : ইলয়াস (আ.)-এর বাসস্থান

২০. হযরত আলইয়াসা (আ.)

বংশধারা	:	আলইয়াসা ইবনে আদী ইবনে শোতাম ইবনে আফরাঈম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৮৮৫-৭৯৫ খ্রি. পূ.
নবুয়ত প্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৮৩০ খ্রি. পূ.
নবুয়ত প্রাপ্তির স্থান	:	বানিয়াস (শাম)
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল/ উমুরিয়ূন
মৃত্যুস্থান	:	ফিলিস্তিন/ বালবেক
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২
মোট সূরা সংখ্যা	:	২
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আন'আম : ৮৬ সোয়াদ : ৪৮

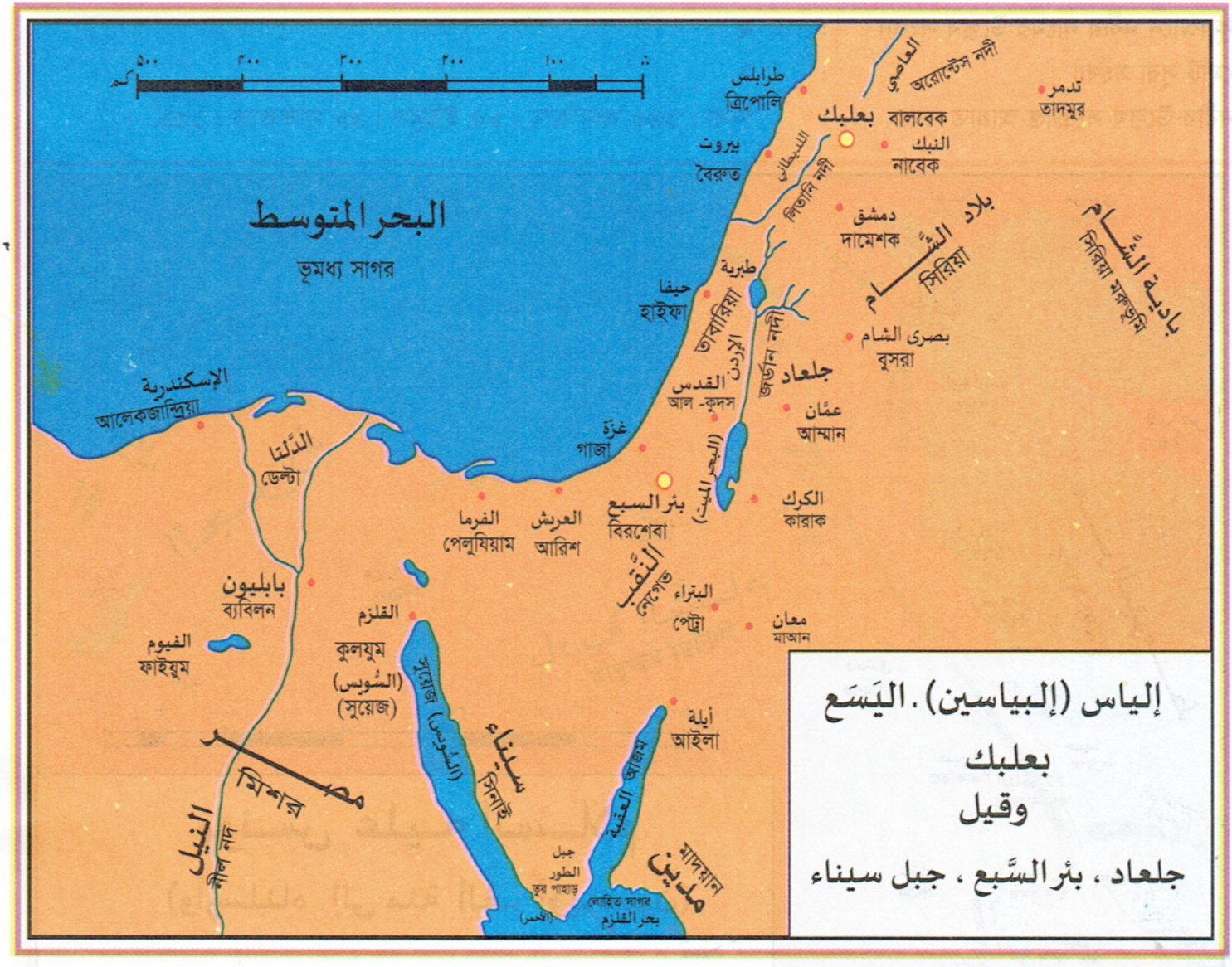

চিত্র : আলইয়াসা (আ.)-এর বাসস্থান

২১. হযরত ইউনুস (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৮২০-৭৫০ খ্রি. পূ.
নবুয়ত প্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৭৮০ খ্রি. পূ.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	নিনাভা (ইরাক)
কওমের উপাধি	:	আসিরিয়ান/কওমে ইউনুস
সফরসমূহ	:	ইউনুস (আ.) জাফা হয়ে তারশীশ (বর্তমানে তিউনিশিয়া) সফর করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়ে নিনাভায় চলে আসেন।
মৃত্যুস্থান	:	অগ্রগণ্য ও সঠিক মত অনুযায়ী, হযরত ইউনুস (আ.) নিনাভাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। দুর্বল একটি মত অনুযায়ী, তিনি ফিলিস্তিনের হেবরোনে সমাহিত হন।
শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত	:	ইউনুস : ৯৮
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২
মোট সূরা সংখ্যা	:	২
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	নিসা : ১৬৩ আন'আম : ৮৫ ইউনুস : ৯৮ সাফ্‌ফাত : ১৩৯

চিত্র : ইউনুস (আ.)-এর নৌকা পারাপার ও নিনাভার গমনপথ

২২. হযরত যাকারিয়া (আ.)

বংশধারা	:	যাকারিয়া ইবনে শাবওয়া ইবনে সাদূক ইবনে জিশান ইবনে দাউদ ইবনে সোলায়মান ইবনে মুসলিম ইবনে সিদ্দীকা ইবনে বারখিয়া ইবনে বালতায়াহ ইবনে নাহর ইবনে শায়ূম ইবনে বাহফাশাত ইবনে ঈনামান ইবনে রাহবায়াম ইবনে সোলায়মান ইবনে দাউদ।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৯১-৩১ খ্রি. পূ.
নবুয়ত প্রাপ্তির স্থান	:	ফিলিস্তিন
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল
সন্তানাদি	:	১
মৃত্যুস্থান	:	ফিলিস্তিন
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৭
মোট সূরা সংখ্যা	:	৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আলে ইমরান : ৩৭ (২ বার), ৩৮ আন'আম : ৮৫ মারইয়াম : ২, ৭ আম্বিয়া : ৮৯

চিত্র : যাকারিয়া (আ.)-এর মৃত্যুর স্থান

২৩. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)

জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১ খ্রি. পূ. - ৩১ খ্রি.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	২৮ খ্রি.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	ফিলিস্তিন
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল
মৃত্যুস্থান	:	অগ্রগণ্য ও সঠিকমত মত অনুযায়ী, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাসে শহীদ হয়েছেন। অন্য একমতে, তিনি দামেশকে শহীদ হয়েছেন।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৫
মোট সূরা সংখ্যা	:	৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আলে ইমরান : ৩৯ আন'আম : ৮৫ মারইয়াম : ৭, ১২ আম্বিয়া : ৯০

চিত্র : ইয়াহইয়া (আ.)-এর শহীদ হওয়ার স্থান

২৪. হযরত ঈসা (আ.)

বংশধারা	:	ঈসা ইবনে মারইয়াম বিনতে ইমরান ইবনে ইয়াশিম ইবনে মীশা ইবনে হাযকিয়া ইবনে ইবরাহীম ইবনে আযরিয়া ইবনে নাবেল ইবনে আজর ইবনে ইয়াহওয়া ইবনে নাযেম ইবনে মোকাসিত ইবনে ঈশা ইবনে আইয়ায ইবনে রাখিয়াম ইবনে সোলায়মান ইবনে দাউদ।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	১ খ্রি. পূ. -৩২ খ্রি.
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	২৯ খ্রি.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	বেথেলহেম, ফিলিস্তিন
কওমের উপাধি	:	বনী ইসরাঈল
সফরসমূহ	:	ঈসা (আ.) বেথেলহেমে জন্ম গ্রহণ করলেও বেড়ে উঠেন নাজেরাথে। বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর মায়ের সাথে একবার মিসরেও গমন করেছেন।
মু'জিযা	:	মৃতকে জীবন দান, মাটি দ্বারা জীবন্ত পাখি তৈরি, কুষ্ঠরোগী ও জন্মান্ধকে আরোগ্য দান, মানুষের ঘরে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা, আসমান থেকে খাদ্যসহ খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়া।
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	২৫
মোট সূরা সংখ্যা	:	১১
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	বাকারা : ৮৭, ১৩৬, ২৫৩ আলে ইমরান ৪৫, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৮৪ নিসা : ১৫৭, ১৬৩, ১৭১ মায়িদা : ৪৬, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬ আন'আম : ৮৫ মারইয়াম : ৩৮ আহযাব : ৭ শূরা : ১৩ যুখরুফ : ৬৩ হাদীদ : ২৭ সাফ : ৬, ১৪

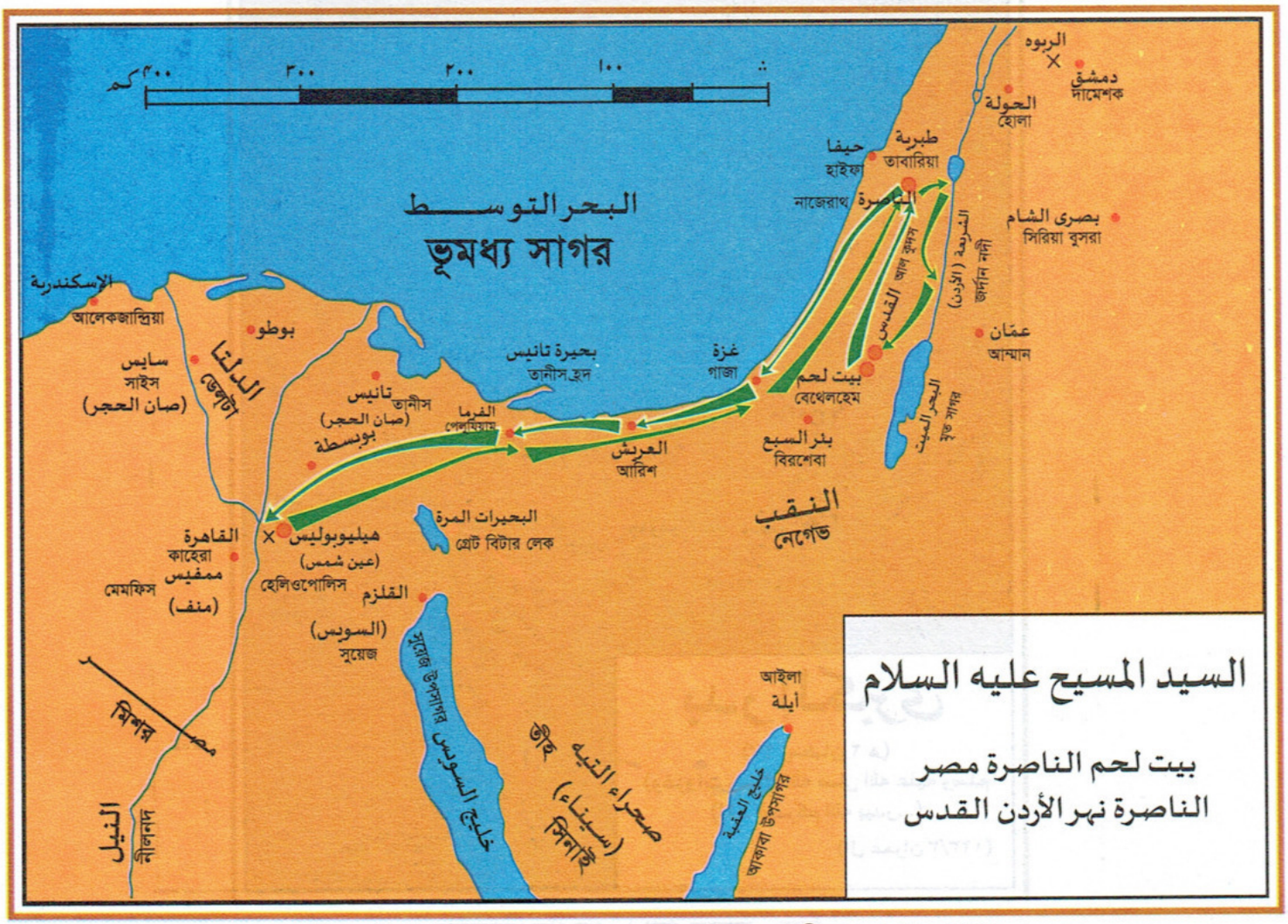

চিত্র : ইসা (আ.)-এর জন্মস্থান, অবস্থানস্থল ও মিসর গমনের পথ

২৫ হযরত মুহাম্মদ ﷺ

বংশধারা	:	মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালেব ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে কেনানা ইবনে খোযায়মা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়াস ইবনে মুযার ইবনে নাযার ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান।
জন্ম-মৃত্যু (আনুমানিক)	:	৫৭১ খ্রি. - ৬৩২ খ্রি.
জীবনকাল	:	৬৩
নবুয়তপ্রাপ্তি সন (আনুমানিক)	:	৬১০ খ্রি.
নবুয়তপ্রাপ্তির স্থান	:	মক্কা
কওমের উপাধি	:	আরব
স্ত্রী	:	১৩
সন্তানাদি	:	৮
মৃত্যুস্থান	:	মদিনা মুনাওয়ারা
কুরআনে নবীর নামের উল্লেখ সংখ্যা	:	৪
মোট সূরা সংখ্যা	:	৪
নবীর উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত নম্বর	:	আলে ইমরান : ১৪৪ আহযাব : ৪০ মুহাম্মদ : ২ ফাতাহ : ২৯

চিত্র : রাসূল (সা.)-এর গযওয়াসমূহ

اَلْبَحْثُ الْعَاشِرُ : التَّعْرِيْفُ بِالْمُؤَلِّفَيْنِ الْإِمَامِ الْمَحَلِّى وَالسُّيُوْطِى (رح)

দশম আলোচনা : ইমাম মহল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর পরিচিতি

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

أ- تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الْمَحَلِّى (رح)		ب- تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ السُّيُوْطِىْ (رح)	
١- اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ	٢- مَوْلِدُهُ	١- اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ	٢- تَحْقِيْقُ لَفْظِ السُّيُوْطِيْ
٣- نَشْأَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ وَمَشَائِخُهُ	٤- حَيَاتُهُ التَّعْلِيْمِيَّةُ وَتَلَامِيْذُهُ	٣- أُسْرَتُهُ	٤- نَشْأَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ وَمَشَائِخُهُ
٥- مُؤَلَّفَاتُهُ	٦- مَنْزِلَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ	٥- أَسْفَارُهُ	٦- حَيَاتُهُ الْعَمَلِيَّةُ
٧- طَبْقَتُهُ مِنْ طَبَقَاتِ الْمُفَسِّرِيْنَ	٨- أَوْصَافُهُ الْعَادِيَةُ وَالْخَلْقِيَّةُ	٧- مُؤَلَّفَاتُهُ	٨- طَبَقَتُهُ مِنْ طَبَقَاتِ الْمُفَسِّرِيْنَ
٩- وَفَاتُهُ		٩- مَذْهَبُهُ	١٠- وَفَاتُهُ

أ. تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الْمَحَلِّى (رح)

ক. ইমাম মহল্লী (র.)-এর জীবনী

নাম ও বংশ : তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ। উপনাম হলো আবূ আব্দুল্লাহ। পিতার নাম হলো শিহাবুদ্দীন আহমদ। তাঁর পূর্ণ বংশতালিকা হলো– আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে হাশেম আল-আব্বাসী জালালুদ্দীন আল-মহল্লী। মহল্লী শব্দটি মিসরের غَرْبِيَّة অঞ্চলের اَلْمَحَلَّةُ الْكُبْرٰى এলাকার দিকে নিসবত। তাঁর বংশীয় পূর্বপুরুষ اَلْمَحَلَّةُ الْكُبْرٰى থেকে আসার কারণে তাঁকে 'মহল্লী' বলা হয়। তাছাড়া কায়রোতে জন্মগ্রহণের কারণে তাঁকে القاهري -ও বলা হয়।

জন্ম : আল্লামা জালাল মহল্লী (র.) ৭৯১ হিজরির ১ শাওয়াল মোতাবেক ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকবৃন্দ : আল্লামা সাখাভী (র.) বলেন, আল্লামা জালাল মহল্লী (র.) কায়রোতে বড় হয়েছেন। সেখানেই তিনি কুরআন, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ফারায়েয, গণিত, যুক্তি-তর্কবিদ্যা ও উলূমুল হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও আরবি ভাষা পড়েন শামসুদ্দীন বারমাওয়ী (র.)-এর কাছে। এছাড়া তিনি জালাল বালকীনী ও ইবরাহীম বাইজুরী (র.) থেকে ফিকহ অর্জন করেন। তিনি ইবনে জামায়া (র.) থেকে উসূলে ফিকহ, শিহাব ওজায়মী ও শামস শাতনূফী থেকে আরবি ব্যাকরণ, নাসিরুদ্দীন ইবনে আনাস হানাফী (র.) থেকে ফারায়েয ও গণিত, বদর আল-আকসারায়ী থেকে মানতিক ও বালাগাত, বিসাতী (র.) থেকে তাফসীর এবং ওয়ালী ইরাকী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র.) থেকে হাদীস শিক্ষা করেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও তিনি আরো অনেকের কাছ থেকেও ইলম অর্জন করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য আরো কিছু শায়খের নাম প্রদান করা হলো–

ক্রমিক	নাম	মৃত্যু সন
১	সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন (র.)	৮০৫ হিজরি
২	সিরাজ আব্দুল লতীফ ইবনে আহমদ আল-ফাভী (র.)	৮০২ হিজরি
৩	বদরুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (র.)	৮০৯ হিজরি
৪	মুহাম্মদ ইবনে মূসা দামীরী (র.)	৮০৮ হিজরি
৫	আহমদ ইবনে ইমাদ আল-আকফাসী (র.)	৮০৮ হিজরি
৬	শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-মুগরাভী (র.)	৮২০ হিজরি
৭	ইবনুদ দীরী মুহাম্মদ ইবনে সাদ (র.)	৮২৭ হিজরি

৮	শামসুদ্দীন ইবনুল জামারী (র.)	৮৩৩ হিজরি
৯	আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ বুখারী (র.)	৮৪১ হিজরি
১০	শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী কায়াতী (র.)	৮৫০ হিজরি

শিক্ষকতা ও ছাত্রবৃন্দ : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) اَلْمَدْرَسَةُ الْبَرْقُوْقِيَّةُ -এ ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল্লামা ইবনে হাজার (র.)-এর মৃত্যুর পর তিনি اَلْمَدْرَسَةُ الْمُؤَيْدِيَّة -তেও শিক্ষকতা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের একটি তালিকা প্রদান করা হলো–

ক্রমিক	নাম	মৃত্যু সন
১	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)	৯১১ হিজরি
২	শামসুদ্দীন সাখাভী (র.)	৮৯২ হিজরি
৩	নূরুদ্দীন সামহূদী (র.)	৯১১ হিজরি
৪	ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ শরীফ মাকদেসী (র.)	৯২৩ হিজরি
৫	মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান বালকীনী (র.)	৮৯০ হিজরি

রচনাবলি : নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির একটি তালিকা প্রদান করা হলো–

ক্রমিক	গ্রন্থের নাম	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১	تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْن	সূরা ফাতেহা এবং সূরা কাহাফ থেকে শেষ পর্যন্ত।
২	اَلْبَدْرُ الطَّالِعُ بِشَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ	আল্লামা সুবকী (র.) রচিত উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ جَمْعُ الْجَوَامِعِ -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৩	شَرْحُ الْوَرَقَاتِ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ	আল্লামা জুওয়ায়নী (র.) রচিত উসূলুল ফিকহ সংক্রান্ত গ্রন্থের শরাহ।
৪	كَنْزُ الرَّاغِبِيْنَ شَرْحُ مِنْهَاجِ الطَّالِبِيْنَ	আল্লামা নবভী (র.) রচিত ফিকহে শাফেয়ীর কিতাব اَلْمِنْهَاج -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৫	اَلْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ	নামাজে বিসমিল্লাহ সশব্দে পাঠ সম্পর্কিত গ্রন্থ
৬	الطِّبُّ النَّبَوِيّ	চিকিৎসা সংক্রান্ত হাদীসের সংকলন
৭	كِتَابٌ فِي الْجِهَادِ	জিহাদের বিধিবিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ
৮	مَنَاسِكُ الْحَجِّ	হজের বিধিবিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ
৯	مُخْتَصَرُ التَّنْبِيْهِ	আবূ ইসহাক সিরাজী (র.) রচিত اَلتَّنْبِيْهُ فِيْ فُرُوْعِ الشَّافِعِيَّة -এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
১০	شَرْحُ تَسْهِيْلِ الْفَوَائِدِ	ইবনে মালেক (র.) রচিত নাহু বিষয়ক গ্রন্থ تَسْهِيْلُ الْفَوَائِدِ -এর শরাহ।

ইলমী অবস্থান : আল্লামা মহল্লী (র.) বিভিন্ন শাস্ত্রে সমকালীন আলেমগণের শিরোমণি ছিলেন। আল্লামা ইবনুল ইমাদ হাম্বলী (র.) তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁকে تَفْتَزَانِيُّ الْعَرَب বলে উল্লেখ করেছেন।

মুফাসসিরগণের মাঝে আল্লামা মহল্লীর অবস্থান : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) মুফাসসিরগণের ১০ তবকার মধ্যে নবম স্তরের মুফাসসির ছিলেন।

চারিত্রিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য : আল্লামা মহল্লী (র.) সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে বিচারক পদে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন– إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لِيْ عَلَى النَّارِ তিনি প্রখর মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মেধা সম্পর্কে জনৈক আলেম মন্তব্য করেন– إِنَّ ذِهْنَهُ يَثْقُبُ الْمَاس তিনি জালেম শাসকদেরকে তাঁর গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নিজস্ব ব্যবসা ছিল তাঁর আয়ের উৎস।

মৃত্যু : ৮৬৩ হিজরির রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি উদরাময়ে আক্রান্ত হন। অবশেষে ৮৬৫ হিজরির পহেলা মহররম তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭১ বছর। বাবুন নাসর ঈদগাহে তাঁর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ب. تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ السُّيُوْطِى (رح)

খ. ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর জীবনী

নাম ও বংশ : তার পরিপূর্ণ নাম হলো, জালালুদ্দীন আবুল ফযল আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাবিকুদ্দীন ইবনে ওসমান ইবনে নাসিরুদ্দীন আল-খুযাইরী আস-সুয়ূতী (র.)। জন্মের পর তাঁর পিতা তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান এবং তাঁর উপাধি রাখেন জালালুদ্দীন। পরবর্তীকালে আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর শায়খ কাজী ইযযুদ্দীন আহমদ আল-কেলানী (র.) তাঁর কুনিয়াত দেন আবুল ফযল। খুযাইরী হলো বাগদাদের খুযাইরিয়্যাহ নামক এলাকার দিকে নিসবত। সুয়ূতী হলো মিসরের একটি অঞ্চলের সুয়ূত -এর দিকে নিসবত।

سُيُوْطِى -এর তাহকীক : سُيُوْطِى শব্দটি سُيُوْطٌ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। سُيُوْط মিসরের একটি এলাকার নাম। সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে শব্দটি সীনে যবরযোগে سَيُوْط হিসেবে প্রচলিত। তবে আল্লামা যুবায়দী বলেন, শব্দটি মোট ছয়ভাবে উচ্চারণ করা বৈধ। যেমন– ১. اَسْيُوْط, ২. اُسْيُوْط, ৩. اِسْيُوْط, ৪. سَيُوْط, ৫. سُيُوْط এবং ৬. سِيُوْط [আল-ফাতহুর রব্বানী : পৃষ্ঠা ২৮৬]

জন্ম : তিনি ৮৪৯ হিজরির ১ রজব মোতাবেক ১৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর, শনিবার মাগরিবের পর মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিবার : আল্লামা সুয়ূতী (র.) حُسْنُ الْمُحَاضِرَة -এর ভূমিকায় নিজের পরিবার সম্পর্কে বলেন যে, তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন সুফী। পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র তাঁর বাবাই আলেম ছিলেন। নাহু-সরফসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বাবার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। সুয়ূতী (র.)-এর মাতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কারণ, আল্লামা সুয়ূতী (র.) নিজের জবানিতে মায়ের কথা উল্লেখ করেননি। তবে আল্লামা সাখাভী (র.) বলেন, তাঁর মাতা তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর জন্মকালে তাঁর বাবার বয়স ছিল ৫০ বছর।

শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকবৃন্দ : আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর বয়স ছয় বছর হওয়ার আগেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি আল্লামা সুয়ূতীর লালনপালনের দায়িত্ব আল্লামা কামাল ইবনুল হুমামকে দিয়ে যান। আল্লামা সুয়ূতী (র.) নয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন শরীফের হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর নাহু ও ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। যেমন– ইমাম নববী রচিত আল-মিনহাজ, উমদাতুল আহকাম, আলফিয়াতু ইবনি মালেক ইত্যাদি। ১৫ বছর বয়সেই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের ইলম হাসিল করেন। তিনি বহু শায়েখ থেকে ফিকহ ও নাহু শিখেন। তাঁদের মাঝে উল্লেযোগ্য হলেন, মুহাম্মদ ইবনে মূসা হানাফী, ইবনুল ফালাতী (র.) প্রমুখ। ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিজের এক কিতাবে বলেন, তাঁর শায়খের সংখ্যা ছয়শত-এরও অধিক। নিম্নে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক	নাম	বিষয়
১.	কামাকল ইবনুল হুমাম (র.)	
২.	ইলমুদ্দীন বালকীনী (র.)	ফিকহ
৩.	শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া আল-মুনাভী (র.)	ফিকহ ও তাফসীর
৪.	তাকী উদ্দীন শুমুনী হানাফী (র.)	হাদীস
৫.	মহিউদ্দীন আল কাফীজী (র.)	নাহু, তাফসীর ইত্যাদি
৬.	সাইফুদ্দীন আল-হানাফী (র.)	হাদীস, ফিকহ ইত্যদি

সফরসমূহ : ইলম অর্জনের জন্যে তিনি মিসরের বাইরে বহু দেশ সফর করেন। মিসরের ভিতরে তিনি দিমইয়াত, আলেকজান্দ্রিয়া, মাহাল্লা ও ফাইয়ুম অঞ্চলে সফর করেন। আর মিসরের বাইরে তিনি শাম, ইয়েমেন, ভারতবর্ষ, মাগরিব সফর করেন।

কর্মজীবন : আল্লামা সুয়ূতী (র.) মাত্র ১৭ বছর বয়সে ৮৬৬ হিজরিতে আরবি ভাষায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এ বয়সেই তিনি بِسْمِ اللّٰه -এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটিই তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ। ৮৭২ হিজরি থেকে তিনি ইবনে তুলুন মসজিদে হাদীসের দরস প্রদান শুরু করেন। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমার পর সেই মসজিদে হাদীসের দরস প্রদান করতেন। ৮৬৭ হিজরিতে তিনি শায়খ বালকীনী থেকে দরস ও ফতোয়া প্রদানের ইজাযত অর্জন করেন। এরপরই তিনি শাইখুনিয়াতে ফিকহের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর।

৮৭৭ হিজরিতে তিনি শাইখুনিয়াতে হাদীসেরও অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি এসবের পাশাপাশি ফারাকা অঞ্চলের একটি খানকাহের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এসব দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি দুনিয়াবিমুখ হয়ে এসব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া শুরু করেন। ৮১১ হিজরিতে তিনি বাইবার্সিয়া খানকাহের দায়িত্ব পান। ৯০০ হিজরির পর তিনি এসব দায়িত্ব একেবারেই ছেড়ে দেন এবং ইবাদত ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি رَوْضَةُ الْمِقْيَاس নামক স্থানে অবস্থান শুরু করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

রচনাবলি : আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, বালাগত ইত্যদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

ক্রমিক	গ্রন্থের নাম	বিষয়
১	تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْن	কুরনআন ও উলুমুল কুরআন
২	لُبَابُ النُّقُوْلِ فِيْ اَسْبَابِ النُّزُوْل	”
৩	الدُّرُّ الْمَنْثُوْر فِى التَّفْسِيْرِ الْمَأْثُوْر	”
৪	الْإِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن	”
৫	النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخ	”
৬	تَرْجُمَانُ الْقُرْآن	”
৭	الْخَصَائِصُ الْكُبْرٰى	উলূমুল হাদীস
৮	اَلْجَامِعُ الصَّغِيْر	”
৯	الدُّرُّ الْمَنْتَثِرَةُ فِى الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَة	”
১০	الْوَسَائِلُ إِلٰى مَعْرِفَةِ الْأَوَائِل	ফিকহ
১১	الرَّدُّ عَلٰى مَنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَجَهِلَ أَنَّ الْاِجْتِهَادَ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ فَرْضٌ	”
১২	عُقُوْدُ الْجُمَانِ فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ وَالْبَيَانِ	
১৩	حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ أَخْبَارُ مِصْر وَالْقَاهِرَة	ইতিহাস
১৪	تَارِيْخُ الْخُلَفَاء	”
১৫	طَبَقَاتُ الْحُفَّاظ	”
১৬	طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّة	”
১৭	اَلْاِقْتِرَاح	নাহু ও ভাষাবিজ্ঞান
১৮	جَمْعُ الْجَوَامِع	”
১৯	كِتَابُ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ النَّحْوِيَّة	”

মুফাসসিরগণের মাঝে আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর অবস্থান : আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুফাসসিরগণের ১০ স্তরের মাঝে নবম স্তরের মুফাসসির ছিলেন।

মাযহাব : ফিকহী ক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি মুজতাহিদে মুনতাসিব ছিলেন। তিনি নিজেই তা বলেছেন। আল্লামা শারানী (র.) তাঁর طَبْقَات গ্রন্থের পরিশিষ্টে আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, আমার সম্পর্কে মানুষ প্রচার করে যে, আমি নাকি চার ইমামের মতো ইজতেহাদে মুতলাকের দাবি করেছি। অথচ এটা আমার সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা। কারণ, আমার উদ্দেশ্য হলো, মুজতাহিদে মুনতাসিব। [আল-ফাতহুল রব্বানী : পৃষ্ঠা ২৮৬]

মৃত্যু : আল্লামা সুয়ূতী (র.) ৯১১ হিজরির ১৯ জমাদিউল আউয়াল মোতাবেক ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর শুক্রবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তাঁকে حوش قوصون নামক স্থানে দাফন করা হয়।

اَلْبَحْثُ الْحَادِيْ عَشَرَ : التَّعْرِيْفُ بِتَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْنِ

এগারোতম আলোচনা : তাফসীরুল জালালাইন পরিচিতি

اَلْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ

١- اِسْمُ الْكِتَاب	٨- ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْكِتَابِ
٢- سَبَبُ التَّأْلِيْف	٩- مَآخِذُ عَلٰى تَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْن
٣- تَحْدِيْدُ تَفَاسِيْرِ الْمَحَلِّي وَالسُّيُوْطِى (رح)	١٠- عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِهٖ
٤- طَرِيْقُ تَعْيِيْنِ الْجُزْئَيْنِ مِنَ التَّفْسِيْر	١١- الْإِسْرَائِيْلِيَّاتُ فِىْ تَفْسِيْرِ الجَلَالَيْن
٦- اَلْمُوَازَنَةُ بَيْنَ مَنْهَجِ الْمَحَلِّي وَالسُّيُوْطِي (رح)	١٢- مُقَدَّمَةُ السُّيُوْطِي (رح)
٧- مِيْزَاتُ تَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْن	١٣- خَاتِمَةُ السُّيُوْطِي (رح)

তাফসীরুল জালালাইন

নাম : আল্লামা মহল্লী এবং আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁদের কেউ তাঁদের তাফসীরকৃত অংশের কোনো নাম রাখেননি। কিন্তু দুই লেখকের 'জালাল' নামের কারণে গ্রন্থটি 'তাফসীরুল জালালাইন' নামেই সর্বমহলে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। অবশ্য তাফসীরে জালালাইনের কিছু কিছু কপিতে নাম লেখা আছে– تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ

রচনার প্রেক্ষাপট ও কারণ : আল্লামা মহল্লী (র.) কুরআনের একটি তাফসীর রচনা শুরু করেন। এই তাফসীর রচনার বিশেষ কোনো কারণ কোথাও উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আল্লামা মহল্লী (র.) তাফসীরের গ্রন্থটি পূর্ণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে আল্লামা সুয়ূতী (র.) বাকি অংশটুকুর তাফসীর পূর্ণ করেন। এ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– هٰذَا مَا اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ فِىْ تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ أَلَّفَهُ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّيْنِ الْمَحَلِّى وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهُ.

আল্লামা মহল্লী ও সুয়ূতী (র.)-এর তাফসীরকৃত অংশ : আল্লামা মহল্লী (র.) কুরআনের তাফসীর শুরু করেন সূরা কাহাফ থেকে। সেখান থেকে সূরা নাস পর্যন্ত তাফসীর করে তিনি সূরা ফাতেহা থেকে তাফসীর শুরু করেন এবং সূরা ফাতেহার তাফসীর সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে আল্লামা সুয়ূতী (র.) সূরা বাকারা থেকে তাফসীর শুরু করে সূরা বনী-ইসরাঈল পর্যন্ত সম্পন্ন করেন।

সাধারণ প্রচলিত মত হলো, আল্লামা মহল্লী (র.) সূরা বাকারার তাফসীর শুরু করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আল্লামা সুয়ূতী (র.) সূরা বাকারা থেকে তাফসীর শুরু করেন। কিন্তু সঠিক অভিমত হলো, আল্লামা মহল্লী (র.) সূরা বাকারার তাফসীর শুরু করেছিলেন। কিছু অংশ তাফসীর করার পর তিনি মৃতুবরণ করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাফসীরের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে আবার সূরা বাকারার শুরু থেকে তাফসীর করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) নিজেই شَذَرَاتُ الذَّهَب গ্রন্থে সূরা বাকারার কিছু অংশ আল্লামা মহল্লী (র.)-এর তাফসীর করার কথা উল্লেখ করেছেন।

দুই অংশের লেখক নির্ণয়ের পদ্ধতি : তাফসীরে জালালাইনের অর্ধেক আল্লামা মহল্লী (র.) লিখেছেন আর বাকি অর্ধেক আল্লামা সূয়ূতী (র.) লিখেছেন। কোন অংশের লেখক কে, তা নির্ণয়ে অনেক সময় ভুল হয়। আলেমগণ তা থেকে বাঁচার চমৎকার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তা হলো, আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে سُيُوْطِى-এর س বর্ণটি مَحَلِّى -এর م বর্ণের আগে আসে। আর তাফসীরে জালালাইনের প্রথম অর্ধেক হলো আল্লামা সুয়ূতী (র.) কৃত আর শেষ অর্ধেক হলো আল্লামা মহল্লী (র.)-কৃত। সুতরাং উভয়ের নিসবতের প্রথম বর্ণটি আরবি বর্ণের ক্রমানুসারে সাজালে উভয়ের তাফসীরকৃত অংশও নির্ণয় করা যাবে।

তাফসীরে জালালাইনের উৎসগ্রন্থসমূহ : আল্লামা মহল্লী (র.) তাফসীরের ক্ষেত্রে আল্লামা মুওয়াফফাকুদ্দীন আহমদ ইবনে ইউসুফ কাওয়াশী (র.) রচিত 'তাফসীরে সগীর' থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তবে আল্লামা সুয়ূতী (র.) বহু তাফসীরগ্রন্থ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর সাথে উল্লেখযোগ্য হলো– আল্লামা মুয়াফফাকুদ্দীন রচিত وَالتَّفْسِيْر الصَّغِيْر তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং আবূ মুহাম্মদ আন্দালুসী (র.) রচিত الْمُحَرَّرُ الْوَجِيْز

আল্লামা মহল্লী ও সুয়ূতী (র.)-এর রচনাশৈলীর তুলনা : আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাফসীরটি পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আল্লামা মহল্লী (র.)-এর রচনাশৈলীর অনুসরণ করেছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে আল্লামা সুয়ূতী (র.) আল্লামা মহল্লী (র.)-এর পদ্ধতির বিপরীত করেছেন। প্রায় দশটি স্থানে তিনি এমনটি করেছেন। যেমন আল্লামা মহল্লী (র.) সূরা সোয়াদে রুহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন– وَالرُّوْحُ جِسْمٌ لَطِيْفٌ يحْيى بِهِ الْإِنْسَان بِنُفُوْذِهٖ فِيْه আল্লামা সুয়ূতী (র.) রূহের সংজ্ঞা উল্লেখ করেননি। কারণ, কুরআনে কারীমে রয়েছে– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ এক্ষেত্রে একমত যে, আল্লামা মহল্লী (র.)-এর পদ্ধতিই উত্তম। কারণ, তিনিই প্রথমে এ পদ্ধতিতে রচনা করেছেন।

তাফসীরে জালালাইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ : আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর ভূমিকায় তাফসীরে জালালাইনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

১. সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করা।
২. যে কোনো বিষয়ে শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য অভিমতটি উল্লেখ করা।
৩. প্রয়োজনীয় তারকীব উল্লেখ করা।
৪. কেরাতের পার্থক্য নির্ণয় করা।
৫. অনির্ভরযোগ্য অভিমত উল্লেখ না করে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রাখা।

তাফসীরে জালালাইনের প্রশংসা : আকারে সংক্ষিপ্ত এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে তাফসীরে জালালাইন আলেমগণের প্রশংসা পেয়েছে। যেমন আল্লামা হাজী খলীফা (র.) কাশফুয যুনূন গ্রন্থে বলেন–

وَهُوَ مَعَ كَوْنِهٖ صَغِيْرَ الْحَجْمِ لٰكِنَّهٗ كَبِيْرُ الْمَعْنٰى لِأَنَّهٗ لُبُّ لُبَابِ التَّفَاسِيْر.

তাফসীরুল জালালাইনের ত্রুটিসমূহ : তাফসীরুল জালালাইন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও আলেমগণ কিছু কিছু বিষয়ে এর সমালোচনা করেছেন। যথা–

১. তাফসীরুল জালালাইনে বহুল পরিমাণে নাহুর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সাধারণ পাঠকের জন্যে বোঝা অনেক কষ্টকর।
২. ইবারতের অতি সংক্ষিপ্ততার কারণে কোনো কোনো স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ হয় না।
৩. কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
৪. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. সংক্ষিপ্ত তাফসীর হওয়া সত্ত্বেও এতে বহু কেরাতের পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করে।
৬. আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের তাবীল পেশ করা হয়েছে। এটি সালাফের তরিকা বিরোধী। তা ছাড়া এ ধরনের আয়াতের তাবীলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাজসীস ও তাশবীহের অভিযোগ রয়েছে।
৭. একাধিক তাফসীরের অভিমতকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গিয়ে কিংবা একাধিক গ্রন্থ থেকে তথ্য নিতে গিয়ে বক্তব্যে সাংঘর্ষিকতা তথা তালফীক সৃষ্টি হয়েছে।
৮. অনেক সময় তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তীতে উল্লিখিত আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থান উল্লেখ করা হয়নি। ফলে কুরআনের হাফেজ ছাড়া অন্যান্য পাঠকদের সে আয়াত খুঁজে পেতে সমস্যা হয়।

তাফসীরুল জালালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ : তাফসীরুল জালালাইনের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা লেখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম নীচে উল্লেখ করা হলো–

ক্রমিক	গ্রন্থের নাম	বিষয়
১	مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَمَطْلَعُ الْبَدْرَيْن	মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ কারখী (র.)
২	اَلْفُتُوْحَاتُ الْإِلٰهِيَّةُ بِتَوْضِيْحِ تَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْن لِلدَّقَائِقِ الْخَفِيَّة	সোলায়মান ইবনে ওমর জামাল (র.)
৩	حَاشِيَةُ الصَّاوِيْ عَلٰى تَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْن	আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাভী (র.)
৪	جَمَالَيْن	মোল্লা আলী কারী (র.)
৫	كَمَالَيْن	শায়খুল ইসলাম ইবনে আব্দুস সামাদ
৬	قَبْسُ النَّيِّرَيْن	শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলকামী (র.)
৭	جَمَالَيْن (اردو)	মাওলানা জামাল বুলন্দশহরী
৮	كَمَالَيْن (اردو)	মাওলানা নাঈম দেওবন্দী
৯	قَمَرَيْن (اردو)	আল্লামা রফিক আহমদ

আমাদের মাঝে প্রচলিত তাফসীরে জালালাইনের টীকা تَعْلِيْقَاتٌ جَدِيْدَةٌ مِنَ التَّفَاسِيْرِ الْمُعْتَبَرَةِ لِحَلِّ جَلَالَيْن কে লিখেছে, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (দা. বা)-এর তাহকীক অনুযায়ী, বর্তমান হাশিয়াসহ জালালাইনটি প্রকাশক নূর মুহাম্মদ কর্তৃক ১৩৬৮ হিজরিতে পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানে টীকাকারের কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তীতে সে নুসখার হাশিয়াটিই ভারত ও বাংলাদেশে ছাপানো হয়েছে।

তাফসীরুর জালালাইনে ইসরাঈলী বর্ণনা : তাফসীরুল জালালাইনে বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু ইসরাঈলী বর্ণনা রয়েছে। আলেমগণ এগুলোকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাফসীরে জালালাইনে উল্লিখিত কিছু অগ্রহণযোগ্য ইসরাঈলী বর্ণনার তালিকা প্রদান করা হলো–

১. ইউসুফ (আ.) ও আযীযের স্ত্রীর ঘটনা।
২. যয়নব বিনতে জাহাশ ও যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর ঘটনা।
৩. রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য .... تِلْكَ الْغَرَانِيْق الْعُلَا সংক্রান্ত বর্ণনা।
৪. হারুত-মারুত ও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা।
৫. বনী ইসরাঈলের গরু জবাই সংশ্লিষ্ট ঘটনা।

আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর ভূমিকা : আল্লামা মহল্লী (র.) তাঁর তাফসীরে কোনো ভূমিকা লিখেননি। তবে আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর অংশের শুরুতে ভূমিকা লিখেছেন। ভূমিকাটি নিম্নরূপ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنَعْمِهٖ ، مُكَافِئًا لِمَزِيْدِهٖ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَجُنُوْدِهٖ. هٰذَا مَا اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ فِيْ تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ أَلَّفَهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ جَلَالُ الدِّيْن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحَلِّي الشَّافِعِيُّ (رح) وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَه، وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ إِلٰى آخِرِ سُوْرَةِ الْإِسْرَاءِ، بِتَتِمَّةٍ عَلٰى نَمْطِهٖ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهٖ كَلَامُ اللّٰهِ، وَالْاِعْتِمَادِ عَلٰى أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ ، وَإِعْرَابِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَتَنْبِيْهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ ، عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ، وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ، وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ بِذِكْرِ أَقْوَالٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ، وَأَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللّٰهَ أَسْأَلُ النَّفْعَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا ، وَأَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبٰى بِمَنِّهٖ وَكَرَمِهٖ.

আল্লামা সূয়ুতী (র.) রচিত পরিশিষ্ট : আল্লামা মহল্লী (র.) তাঁর রচিত অংশের শেষে পরিশিষ্ট সংযুক্ত করেছেন। এতে তিনি রচনার সময়কাল, কারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

هٰذَا آخِرُ مَا كَمُلَتْ بِهٖ تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ جَلَالُ الدِّيْنِ الْمَحَلِّي الشَّافِعِيُّ (رح) وَقَدْ أَفْرَغْتُ فِيْهِ جُهْدِيْ، وَبَذَلْتُ فِيْهِ فِكْرِيْ، فِيْ نَفَائِسَ أَرَاهَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ. تَعَالٰى تُجْدِيْ، وَأَلَّفْتُهُ فِيْ مُدَّةِ قَدْرِ مِيْعَادِ الْكَلِيْمِ، وَجَعَلْتُهُ وَسِيْلَةً لِلْفَوْزِ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُكَمَّلِ، وَعَلَيْهِ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهَةِ الْإِعْتِمَادُ وَالْمُعَوَّلُ. فَرَحِمَ اللّٰهُ إِمْرَأً نَظَرَ بِعَيْنِ الْإِنْصَافِ إِلَيْهِ، وَوَقَفَ فِيْهِ عَلٰى خَطَأٍ فَأَطْلَعَنِيْ عَلَيْهِ، وَقَدْ قُلْتُ :

حَمِدْتُ اللّٰهَ رَبِّيْ إِذْ هَدَانِيْ * لِمَا أَبْدَيْتُ مَعَ عِجْزِيْ وَضُعْفِيْ

فَمَنْ لِيْ بِالْخَطَأِ فَأُرَدَّ عَنْهُ * وَمَنْ لِيْ بِالْقَبُوْلِ وَلَوْ بِحَرْفٍ

هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ فِيْ خَلَدِيْ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِذٰلِكَ، لِعِلْمِيْ بِالْعِجْزِ عَنِ الْخَوْضِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسَالِكِ، وَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّنْفَعَ بِهٖ نَفْعًا جَمًّا، وَيَفْتَحَ بِهٖ قُلُوْبًا غُلْفًا، وَأَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا. وَكَأَنِّيْ بِمَن اِعْتَادَ الْمُطَوَّلَاتِ، وَقَدْ أَضرَبَ عَنْ هٰذِهِ التَّكْمِلَةِ وَأَصْلُهَا حَسْمًا، وَعَدَلَ إِلٰى صَرِيْحِ الْعِنَادِ وَلَمْ يُوْجِّهْ إِلٰى دَقَائِقِهِمَا فَهْمًا، وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰى، رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهٖ هِدَايَةً إِلٰى سَبِيْلِ الْحَقِّ وَتَوْفِيْقًا وَإِطْلَاعًا عَلٰى دَقَائِقِ كَلِمَاتِهٖ وَتَحْقِيْقًا، وَجَعَلْنَا بِهٖ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنُ أُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا.

وَفُرِغَ مِنْ تَأْلِيْفِهٖ يَوْمَ الْأَحَدِ عَاشِرَ شَوَّال ، سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَثَمَانِ مِأَةٍ، وَكَانَ الْإِبْتِدَاءُ فِيْهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مُسْتَهَلَّ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُوْرَةِ. وَفُرِغَ مِنْ تَبْيِيْضِهٖ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ سَادِسَ صَفَر سَنَةَ إِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ وَثَمَانِمِائَة.

اَلْمَدْخَلُ إِلٰى عِلْمِ التَّفْسِيْرِ

علم التفسير-এর শুরুর কথা

- প্রথম আলোচনা : আল কুরআনুল কারীম
- দ্বিতীয় আলোচনা : উলূমুল কুরআন
- তৃতীয় আলোচনা : ইজাযুল কুরআন
- চতুর্থ আলোচনা : কুরআন সংকলন
- পঞ্চম আলোচনা : মুফাসসিরগণ
- ষষ্ঠ আলোচনা : ওহীর পদ্ধতি ও প্রকারভেদ
- সপ্তম আলোচনা : তাফসীর-তাবীল, তাফসীরের প্রকারভেদ ও উৎস
- অষ্টম আলোচনা : আল কুরআনের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত
- নবম আলোচনা : কুরআনে উল্লিখিত নবী ও রাসূলগণের মানচিত্র
- দশম আলোচনা : ইমাম মহল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর পরিচিতি
- এগারোতম আলোচনা : তাফসীরুল জালালাইন পরিচিতি

تفسير الجلالين

তাফসীরে জালালাইন

প্রথম খণ্ড

পারা : ০১ - ০৫

- ✡ সূরাতুল বাকারা
- ✡ সূরাতু আলে ইমরান
- ✡ সূরাতুন নিসা

اَلْخُطْبَةُ وَمَنْهَجُ تَأْلِيْفِ الْكِتَابِ

খুতবা ও গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهٖ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهٖ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَجُنُوْدِهٖ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে। এমন প্রশংসা, যা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজির সমপরিমাণ এবং তাঁর বর্ধিত অনুগ্রহসমূহের সমমানের হয়। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও তাঁর অনুগত অনুসারীদের উপর।

أَمَّا بَعْدُ. فَهٰذَا مَا اشْتَدَّتْ اِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ فِى تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَلَّفَهُ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ جَلَالُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحَلِّىُّ الشَّافِعِىُّ ؒ وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهٗ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ اِلٰى اٰخِرِ سُوْرَةِ الْاِسْرَاءِ بِتَتِمَّةٍ عَلٰى نَمَطِهٖ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهٖ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِعْتِمَادِ عَلٰى اَرْجَحِ الْاَقْوَالِ وَاِعْرَابِ مَا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ وَتَنْبِيْهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ بِذِكْرِ اَقْوَالٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ وَاَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللّٰهَ اَسْأَلُ النَّفْعَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَاَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِى الْعُقْبٰى بِمَنِّهٖ وَكَرَمِهٖ.

হামদ ও সালাতের পর, এটা সেই গ্রন্থ, যার প্রতি আগ্রহীদের প্রয়োজন তীব্রতর হয়েছিল কুরআনে কারীমের অবশিষ্ট তাফসীরের জন্যে, যা রচনা করেছেন সুবিজ্ঞ গবেষক সূক্ষ্মদর্শী ইমাম জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মহল্লী শাফেয়ী (র)। আর এটা সে অংশের পূর্ণতা, যা তিনি অপূর্ণ রেখে গেছেন। অর্থাৎ, সূরা বাকারা হতে সূরা ইসরার শেষ পর্যন্ত। একটি পরিশিষ্টসহ তাঁরই অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে।

সে পদ্ধতি হলো– ১. যতটুকু হলে আল্লাহ তা'আলার কালাম বোঝা সম্ভব, ততটুকু উল্লেখ করা। ২. সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামতের উপর নির্ভর করা। ৩. প্রয়োজন পরিমাণ ইরাব বর্ণনা করা। ৪. বিভিন্ন কেরাত হতে প্রসিদ্ধ কেরাত সম্পর্কে অবহিত করা, সূক্ষ্মভাবে এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অপছন্দনীয় মতামত এবং ব্যাকরণিক বিবরণ দ্বারা আলোচনা দীর্ঘায়িত না করা। কেননা, আরবি গ্রন্থসমূহ হলো তাঁর উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ তা'আলার কাছেই এর মাধ্যমেই তার অনুগ্রহ ও মেহেরবানি দ্বারা জাগতিক জীবনে উপকারিতা এবং পরকালীন জীবনে এর উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করছি।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْخُطْبَة : খুতবার বিশ্লেষণ

سَبَبُ بَدْءِ الْكِتَابِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ

বিসমিল্লাহ ও আল হামদুলিল্লাহ দ্বারা কিতাব শুরু করার কারণ : আল্লামা সুয়ূতী (র.) কুরআনের অনুসারে বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর আমল দ্বারাও এটা প্রমাণিত। রাসূল ﷺ-এর সকল চিঠিপত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ রয়েছে। কোনো কোনো চিঠিতে বিসমিল্লাহর পর হামদও রয়েছে।

أَفْضَلُ اَلْفَاظِ الْحَمْدِ

হামদের সর্বোত্তম শব্দ : মুসান্নিফ (র.) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهٖ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهٖ দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) উক্ত পদ্ধতি ও বাক্যে হামদ প্রকাশ করার কারণ সম্পর্কে আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন–

اِفْتَتَحَ كِتَابَهُ بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْمَحَامِدِ كَمَا صَرَّحُوْا بِهٖ فِيْمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَحْمَدَ اللّٰهَ بِأَفْضَلِ الْمَحَامِدِ أَوْ حَلَفَ لَيَحْمَدَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ أَوْ بِأَجَلِّ التَّحَامِيْدِ فَطَرِيْقُهُ أَنْ يَقُوْلَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا ..... الخ (كَرْخِي) وَهٰذِهِ الصِّيْغَةُ مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْحَدِيْثِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ.

এখানে আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) যে হাদীসটির প্রতি ইশারা করেছেন তা হলো–

قَالَ أَبُوْ نَصْر : قَالَ آدَمُ : يَا رَبِّ! شَغَلْتَنِيْ بِكَسْبِ يَدِيْ فَعَلِّمْنِيْ شَيْئًا مِنْ مَجَامِعِ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ. فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ! إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَهُ. فَذٰلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ.

হাদীসটি ইবনে সালাহ (র.) তাঁর أَمَالِي গ্রন্থে একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সনদ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) التَّلْخِيْصُ الْحَبِيْر গ্রন্থে বলেন– وَهٰذَا مُعْضَلٌ; এছাড়া এ হাদীসটি আবূ আনয়ানার সূত্রে বর্ণিত সনদ সম্পর্কে ইবনুস সালাহ (র.) বলেন– ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ [আত-তালখীসুল হাবীব : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৭]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র.) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন–

هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُعْرَفُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ الْمُعْتَمَدَةِ وَلَا لَهُ إِسْنَادٌ يُعْرَفُ. وَإِنَّمَا يُرْوٰى عَنْ آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ وَلَا يُدْرٰى كَمْ بَيْنَ آدَمَ وأَبِي نَصْرٍ إِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. (هافتيا فِيْ صِيْغَةِ الْحَمْدِ : ص ٤)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) نَتَائِجُ الْأَفْكَار-এ বলেন–

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لٰكِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النَّصْرِ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيْثٍ وَلَمْ يَجِئْ مِنْهُ شَيْءٌ مُسْنَدٌ ..... وَلَعَلَّهُ بَلَغَهُ هٰذَا الْأَثَرُ عَنْ بَعْضِ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. (نَتَائِجُ الْأَفْكَار : ٢٨٩/٣ - ٢٩٠)

মূলত এ ঘটনাটির উপর ভিত্তি করে অনেক শাফেয়ী উলামায়ে কেরাম কসম ও মানত সংক্রান্ত মাসয়ালাটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ ঘটনাটিকে মাস'আলার ভিত্তি বানানো সম্পর্কে আল্লামা নবভী (র.) الرَّوْضَة কিতাবে লিখেন–مَا لِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَلِيْلٌ مُعْتَمَدٌ মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেন, কেউ যদি মানত করে যে, সর্বোত্তম শব্দ দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে তাহলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললে তার মানত রক্ষা হবে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯]

قَوْلُهُ : مُوَافِيًا لِنِعَمِهٖ

অর্জিত নিয়ামতরাজির সমপরিমাণ হামদ : اَىْ مُطَابِقًا لِنِعَمِهٖ وَمُقَابِلًا لَهَا অর্থাৎ, এমন 'হামদ' যা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতও অনুগ্রহসমূহ অনুযায়ী হয়। এভাবে যে, বর্তমান নেয়ামতের মধ্য হতে কোনো নিয়ামত যাতে হামদবিহীন না থাকে। যেন এ হামদটি আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নেয়ামতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهٖ

ভবিষ্যতে প্রাপ্য নিয়ামতরাজি পরিমাণ হামদ : اَىْ مُمَاثِلًا وَمُسَاوِيًا لَهُ অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক যেসব নিয়ামতআল্লাহ তা'আলা মানুষকে বর্ধিতহারে ও অবারিতভাবে প্রদান করেন, সেগুলোর বরাবর ও সমপরিমাণ হয়। বস্তুত এমনটি মোবালাগা স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। অন্যথায় প্রতিটি নেয়ামতের জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন হামদের প্রয়োজন রয়েছে [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬]

سَبَبُ تَرْكِ أَفْضَلِ أَلْفَاظِ الصَّلَاةِ

দরূদের সর্বোত্তম শব্দ ব্যবহার না করার কারণ : দরূদের সর্বোত্তম শব্দ হলো, আদেশবাচক ফে'ল ব্যবহার করে এভাবে বলা- أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ; কারণ, দরূদের এ শব্দটি স্বয়ং রাসূল ﷺ পড়তে আদেশ করেছেন। কিন্তু তারপরও হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদিতে জুমলায়ে খবরিয়ার মাধ্যমে দরূদ পেশ করা হয়। যেমন– صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; এর কারণ হিসেবে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আদেশবাচক শব্দ ব্যবহার করে দরূদ পড়া হলে সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, রাসূল ﷺ-এর উপর আল্লাহর রহমত এ মুহূর্তে নেই। তাই আমরা রহমতের দাবি করছি। এই ভুল ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয়, সে জন্যে আলেমগণ জুমলায়ে খবরিয়া ব্যবহার করেন। তবে আল্লামা আলুসী (র.) রুহুল মা'আনীতে এ অভিমতটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাধারণত জুমলায়ে খবরিয়ার মাঝেই রাসূল ﷺ-এর নাম ও দরূদ বেশি আসে। ফলে যাতে একই কথার মাঝে দু'ধরনের বাক্য (অর্থাৎ, খবরিয়া ও ইনশায়িয়া) ব্যবহার না হয় তাই এভাবে বলা হয়। কারণ, সব বিশুদ্ধ ভাষায় সকল দোয়াবাচক বাক্য جملة خبرية দিয়ে ব্যবহার হয়। [আল-ফাতহুর রব্বানী : পৃষ্ঠা ২৭]

قَوْلُهُ : وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهُ

বক্তব্যের অসতর্কতা : বিজ্ঞ মুফাসসির (র)-এর বক্তব্য وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهُ বাক্যে تَتْمِيْم শব্দ ব্যবহারে অসতর্কতা পরিলক্ষিত হয়। কেননা মহল্লী (র.) যা ছেড়ে দিয়েছেন আল্লামা সুয়ূতী (র.) তার পরিশিষ্ট লিখেননি; বরং مَا اَتٰى بِهِ الْمَحَلِّيُّ অর্থাৎ, মহল্লী (র.) যা রেখে গেছেন, তার পরিশিষ্ট লিখেছেন।

মোটকথা ইমাম মহল্লী (র.) যে রচনা অপূর্ণ রেখেছেন, তা তিনি পরিপূর্ণ করেছেন। কারণ, আল্লামা সুয়ূতীর পরিশিষ্ট مَا فَاتَ الْمَحَلِّيُّ-এর অংশ নয়; বরং مَا اَتٰى بِهِ অর্থাৎ, শেষ অর্ধেকের পরিশিষ্ট। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭]

قَوْلُهُ : مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

আল্লামা সুয়ূতী (র)-এর তাফসীর শুরু : সূরা ফাতিহার তাফসীর আল্লামা মহল্লী (র.) করেছেন। তাই আল্লামা সুয়ূতী (র.) তা শেষাংশের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং তিনি সূরা বাকারা থেকে তাফসীর শুরু করেন। এ ব্যাপারে প্রচলিত অভিমত হলো, জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) সূরা বাকারার কোনো অংশ তাফসীর করেননি। আল্লামা সুয়ূতী (র.) সূরা বাকারা থেকে তাফসীর শুরু করেছেন। কিন্তু ড. ফখরুদ্দীন কাবাওয়াহ বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) সূরা বাকারার ১-২৬ আয়াত পর্যন্ত তাফসীর করার পর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) পরবর্তীতে রচনার ধাঁচ ঠিক রাখার জন্যে সূরা বাকারার শুরু থেকেই তাফসীর করেন। তাছাড়া আল্লামা সুয়ূতী (র.) حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ فِيْ تَارِيْخِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ গ্রন্থে আল্লামা মহল্লী (র)-এর জীবনীতে লিখেন–

وَأَجَلُّ كُتُبِهِ الَّذِي لَمْ تَكْمُلْ "تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ"، كَتَبَ مِنْهُ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ فِيْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ كُرَّاسًا ..... وَهُوَ مَمْزُوْجٌ مُحَرَّرٌ فِيْ غَايَةِ الْحُسْنِ، وَكَتَبَ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَآيَاتٍ يَسِيْرَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَقَدْ أَكْمَلْتُهُ عَلَى نَمَطِهِ مِن أَوَّلِ الْبَقَرَةِ إِلَى أَخِرِ الإِسْرَاءِ.

[মুকাদ্দিমা-তাফসীরুল জালালাইন আল-মুয়াসসার : পৃষ্ঠা ৫]

সূরা ইসরার শেষে সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ অংশের তাফসীর সম্পন্ন করেছেন مِقْدَارُ مِيْعَادِ الْكَلِيْم তথা ৪০ দিনে। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২২ বছর। এটিই তাঁর প্রথম তাফসীর। তিনি ৮৭০ হিজরির রমজানের ১ তারিখ বুধবার এর রচনা শুরু করে ১০ শাওয়াল সমাপ্ত করেন। তিনি ইমাম মহল্লীর ইন্তেকালের ছয় বছর পর এ কিতাব রচনা করেন। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০]

✪ مَنْهَجُ تَأْلِيْفِ تَفْسِيْرِ الْجَلَالَيْن

তাফসীরুল জালালাইনের রচনা-শৈলী : আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাফসীরে জালালাইনের তাকমিলা করতে গিয়ে আল্লামা মহল্লী (র)-এর রচনা শৈলীর অনুসরণ করেছেন। مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ থেকে مِمَّا لَهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ পর্যন্ত অংশটুকুতে সুয়ূতী (র.) মহল্লী (র)-এর রচনাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছেন।

১. قَوْلُهُ : مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى

কুরআনের বক্তব্য বোধগম্য আলোচনা : প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে কুরা'আনের বক্তব্য সহজভাবে বোঝার জন্যে প্রয়োজনীয় শব্দাবলি যুক্ত করা হয়েছে। তাফসীরের এ পদ্ধতিকে বলা হয়– التَّفْسِيْرُ الْمَمْزُوْج (সংযুক্ত তাফসীর)। এ পদ্ধতিতে আয়াতের মাঝেই তা বোঝার জন্যে প্রয়োজনীয় তাফসীর উল্লেখ করা হয়। যেমন তাফসীরে জালালাইনে রয়েছে– (مَا يَفْعَلُ اللّٰه بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ) نِعَمَهُ (وَأَمَنْتُمْ) بِهِ এখানে نِعَمِهِ এবং بِهِ হলো আয়াতের অর্থ বোধগম্য তাফসীর।

এ ধারায় তাফসীর করার কারণে সূরা মুদ্দাসসির পর্যন্ত তাফসীর এবং কুরআনের শব্দ সংখ্যা প্রায় সমান। তবে এরপরে তাফসীরের শব্দসংখ্যা তুলানামূলক বেশি।

২. قَوْلُهُ : اَلْاِعْتِمَادِ عَلٰى أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ

নির্ভরযোগ্য অভিমত বর্ণনা করা : রচনাশৈলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এ তাফসীরগ্রন্থে ব্যাখ্যা, শানে নুযুল, কেরাত ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য অভিমতগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কিছু কিছু তাফসীরের ক্ষেত্রে এ বক্তব্যের বিপরীত দেখা যায়। সেসব জায়গায় আল্লামা সুয়ূতী ও মহল্লী (র.) নির্ভরযোগ্য অভিমতের বিপরীতে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য অভিমত গ্রহণ করেছেন। এমন একটি ক্ষেত্র হচ্ছে সূরা সোয়াদে হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে দুই বিচারপ্রার্থীর ঘটনার তাফসীর। এ ছাড়া আল্লামা মহল্লী ও আল্লামা সুয়ূতী (র.) কেরাত বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণত تَلْخِيْصُ الْحَوَاشِى-এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এসব কেরাতের অধিকাংশই উলামায়ে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রচলিত কেরাত। তবে এর মাঝে কিছু কেরাত এমনও আছে, যা আলেমদের নিকট অপ্রচলিত কেরাত হিসেবে পরিচিত। একইভাবে আল্লামা মহল্লী ও সুয়ূতী (র.) কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য অভিমতের পরিবর্তে ইসরাঈলী বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। দুর্বল ও অপ্রচলিত রেওয়ায়েত গ্রহণ করার কারণ হিসেবে আলেমগণ বলেছেন, তাঁদের যুগে তাঁদের এলাকায় প্রচলিত তাফসীরগ্রন্থ থেকে নকল করার কারণে জমহুরের অভিমতের বিরোধী তাফসীরগুলো চলে এসেছে।

৩. قَوْلُهٗ : إِعْرَابُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ

প্রয়োজনীয় তারকীব উল্লেখ করা : তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আয়াতের তারকীব উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. قَوْلُهٗ : وَتَنْبِيْهٌ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَة

বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কেরাতসমূহ বর্ণনা করা : চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রসিদ্ধ কেরাতসমূহের বর্ণনা দেওয়া। এখানে تنبيه শব্দটির নাকেরা হওয়া স্বল্পতাজ্ঞাপক। কারণ, তাফসীরে জালালাইনে সকল কেরাতের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়নি; বরং প্রসিদ্ধ কিছু কেরাতের পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে مشهور দ্বারা উসূলে হাদীসের পারিভাষিক مشهور উদ্দেশ্য নয়; বরং আভিধানিক অর্থ 'প্রসিদ্ধ' বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, মাসহাফে লিখিত সকল কেরাতই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত।

✪ قَوْلُهٗ : اَلْقِرَاءَاةُ الْمُخْتَلِفَةُ

কেরাতের ভিন্নতার তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন যে নির্দিষ্ট কেরাতের মাধ্যমে নাজিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত ধরনের হতে পারে। অনুমোদিত সেই সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব–

১. বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন, এক কেরাতে وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ-এর কালিমাতু শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেরাতে এই শব্দটি বহুবচন উচ্চারিত হয়ে وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত কেরাতে رَبَّنَا بَاعِدْنَا بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে এবং এ আয়াতই অন্য কেরাতে رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَرِنَا পঠিত হয়েছে। অথবা যেমন– এক কিরাতে পঠিত রয়েছে- وَاتَّخَذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ পক্ষান্তরে অপর কেরাতে وَاتَّخِذُوْا রয়েছে।

৩. রীতি অনুযায়ী হরকত বা যের-যবর, পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতপার্থকের কারণে কেরাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– لَا يُضَرَّ-এর স্থলে কেউ কেউ لَا يُضَارُّ তেলাওয়াত করেছেন। এমনিভাবে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْد-এর স্থলে ذُو الْعَرْسِ الْمَجِيْد তেলাওয়াত করেছেন।

৪. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধিও হয়েছে। যেমন– تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ-এর স্থলে تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ তেলাওয়াত করা হয়েছে।

৫. শব্দের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ এক কেরাতে এক শব্দ এবং অন্য কেরাতে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন– فَتَبَيَّنُوْا-এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং فِىْ طَلْعٍ -এর স্থলে فِىْ طَلْحٍ পঠিত হয়েছে।

৬. **উচ্চারণগত পার্থক্য :** যেমন কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লম্বা খাটো হালকা, শক্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে এতে মূল শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– مُوْسٰى শব্দটি কোনো কোনো উচ্চারণে مُوْسِىْ রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাত কেরাতের মাধ্যমে উচ্চারণের সুবিধার্থে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ–ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত কেরাত পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। [উলূমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী : ১০৬-১০৯]

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

১. قَوْلُهُ : سَيِّدِنَا কোনো কোনো নুসখায় سَيِّدِنَا শব্দটি নেই। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত নুসখায় শব্দটি রয়েছে। যে নুসখাসমূহে سيدنا শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে وَاٰلِهٖ এবং তার পরবর্তী শব্দসমূহের عطف হবে سيدنا-এর উপর; مُحَمَّد-এর উপর নয়। অন্যথায় অন্যান্য معطوف-গুলো سيدنا হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা سيدنا হলো بدل আর محمد হলো مبدل منه; ফলে محمد-এর উপর عطف করলে পরবর্তীগুলোও سيدنا-এর مبدل منه হয়ে سيدنا হবে। অথচ একমাত্র রাসূল ﷺ-ই হলেন سيدنا; অন্যরা নন।

২. قَوْلُهُ : اَمَّا بَعْدُ কোনো কোনো নুসখায় اَمَّا بَعْدُ শব্দটি নেই। সেখানে هٰذَا ইসমে ইশারাটি بَعْد-এর اَمَّا-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যে নুসখায় اَما بعد লেখা আছে, সেখানে اما হবে حرف شرط আর فهذا الخ তার جزاء হবে।

৩. قَوْلُهُ : محالُّهَا হিন্দুস্তানী নুসখাগুলোতে مَحَالُّهَا লিখা রয়েছে। অথচ আরব দেশীয় সকল নুসখাতেই مَحَلُّهَا রয়েছে এবং এটাই সঠিক।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مُوَافِيًا : সীগাহ اسم فاعل বাব مفاعلة বহছ واحد مذكر মাসদার اَلْمُوَافَاةُ মূলবর্ণ و - ف - ي জিনস لفيق مفروق অর্থ- পূর্ণ।

مُكَافِيًا : শব্দটির সঠিক লিখিতরূপ হলো مُكَافِئًا; সীগাহ اسم فاعل বাব مفاعلة বহছ واحد مذكر মাসদার اَلْمُكَافَأَةُ মূলবর্ণ (ك - ف - ء) জিনস مهموز اللام অর্থ- সমান, উপযোগী, যথাযথ।

مَزِيْد : সীগাহ مصدر ميمي বাব ضرب يضرب মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া। শব্দটি لازم ও متعدى উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- زاد الشيء - বস্তুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। زاد غيره - অপর বস্তুকে বৃদ্ধি করেছে। কুরআন শরীফের রয়েছে- هَلْ مِنْ مَزِيْد

جُنُوْد : শব্দটি جُنْدٌ-এর বহুবচন। অর্থ- সৈন্য, সাহায্যকারী ইত্যাদি। جُنْدٌ এমন اسمُ الجِنس যার একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে ياء দ্বারা পার্থক্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং শব্দটি ياء-সহ হলে একবচন এবং ياء ছাড়া হলে বহুবচন হবে। ফলে جُنْدٌ অর্থ- সৈন্য এবং جُنْدِيٌّ অর্থ- একজন সৈনিক। যেমন يَهُوْد অর্থ- ইহুদি সম্প্রদায় আর يَهُوْدِيٌّ অর্থ- একজন ইহুদি।

খুতবাতে جُهُوْدِيٌّ দ্বারা দীনের সাহায্যকারীদের বোঝানো হয়েছে। নবী যুগ থেকে অদ্যাবধি যারা, ইলম, কলম, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ করেছেন, তারা সকলেই এতে শামিল।

رَاغِبِيْنَ : সীগাহ اسم فاعل বাব سمع বহছ جمع مذكر মাসদার اَلرَّغْبَة মূলবর্ণ (ر - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ- আগ্রহী, অনুরাগী। رغبة শব্দটি صلة ছাড়া এবং صلة-সহ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। কোনো বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে صلة হিসেবে فى আসে আর অনাগ্রহ প্রকাশ করতে عن ব্যবহৃত হয়।

تَكْمِلَة : শব্দটি একবচন; বহুবচনে تَكْمِلَاتٌ অর্থ- نِهَايَة তথা শেষ সীমা। বলা হয়- غَدًا نَقْرَأُ تَكْمِلَةَ القِصَّة (আমরা আগামীকাল ঘটনার অবশিষ্ট অংশ পাঠ করব।) [মুজামুল হাই]

اَلتَّكْمِلَةُ مَا يَتِمُّ بِهِ الشَّيْءُ অর্থাৎ, যার দ্বারা কোনো বস্তু পরিপূর্ণ করা হয় তাকে তাকমিলা বলা হয়। [মু'জামুল ওয়াসীত]

اَلْاِمَام : اِمَام শব্দের শাব্দিক অর্থ- اَلْمُقَدَّمُ; নেতা, প্রধান, ইমাম, আগে, পেশকৃত, অগ্রভাগ ইত্যাদি।
পরিভাষায় ইমাম বলা হয়- مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ اَهْلِ الفَضْلِ (যিনি কোনো ব্যাপারে মর্যাদপূর্ণ স্তরে পৌঁছেছেন।)

اَلْعَلَّامَة : আল্লামা সাভী (র.) শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেন-
اَلْعَلَّامَةُ : مُبَالَغَةٌ فِيْ الْعِلْمِ، وَمَعْنَاهُ الجَامِعُ بَيْنَ الْمَعْقُوْلِ وَالْمَنْقُوْلِ بِاَبْلَغِ وَجْهٍ. (حاشية الصاوى جا١ص٧)

اَلْمُحَقِّقُ : সীগাহ اسم فاعل বাব تفعيل বহছ واحد مذكر মাসদার اَلتَّحْقِيْقُ মূলবর্ণ (ح - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- যিনি সঠিক পন্থায় দলিল-প্রমাণ পেশ করেন। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭]

اَلْمُدَقِّقُ : সীগাহ اسم فاعل বাব تفعيل বহছ واحد مذكر মাসদার اَلتَّدْقِيْقُ মূলবর্ণ (د - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণকারী।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : اَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا مَا اشْتَدَّتْ

বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) নিকটবর্তীবাচক هذا ইসমুল ইশারা দ্বারা ঐ কল্পিত ইবারতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা মহল্লীর তাফসীরের পূর্ণতার জন্যে সুয়ূতী (র)-এর কল্পনায় উপস্থিত ছিল। [হাশিয়াতুল জালালাইন পৃষ্ঠা ৪]

অর্থাৎ, هٰذَا-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো اَلْمَعْهُوْدُ فِى الذِّهْنِ যা খুবই নিকটবর্তী। আর তা হলো সূরা বাকারা থেকে সূরা ইসরার শেষ পর্যন্ত। حَرْفُ الشَّرْطِ اَمَّا বাক্যে اَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا হলো جَزَاء; আর هٰذَا হলো

একইভাবে مَا اشْتَدَّتْ-এর مَا দ্বারাও اَلْمَعْهُوْدُ فِى الذِّهْنِ উদ্দেশ্য। আর دعت না বলে اشْتَدَّتْ বলার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তাকমিলার প্রতি তাদের প্রয়োজনটা শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। কেননা, শেষার্ধের বর্ণনাধারা অনুযায়ী বাহুল্যবর্জিত লক্ষ্যভেদি বক্তব্যের মতো করে কেউ লিখতে সক্ষম হচ্ছিল না।

قَوْلُهٗ : وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهٗ ... بِتَتِمَّةٍ عَلٰى نَمَطِهٖ

تَتْمِيْم শব্দে رَفع এবং جَر উভয়টি হতে পারে। رفع অবস্থায় اَلرَّاغِبِيْنَ حَاجَةُ اِلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَا-এর مَا-এর উপর عطف হবে। আর جر অবস্থায় تَكْمِلَة-এর উপর عطف হবে।

وَهُوَ مِنْ اَوَّلِ ..... الخ অংশটির هُوَ যমীর مَا فَاتَهٗ বা تَتْمِيْم-এর দিকে ফিরেছে। উভয় অবস্থায়ই অর্থ একই। তা হলো সুয়ূতীর তাফসীর। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০]

بِتَتِمَّةٍ অংশটি تَتْمِيْم-এর সাথে متعلق আর باء হরফটি مع-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ হলো–

هٰذَا التَّتْمِيْمُ الَّذِى اَتٰى بِهِ السُّيُوْطِى تَفْسِيْرًا لِلنِّصْفِ الْاَوَّلِ مُصَاحِبٌ لِتَتِمَّةٍ.

এখানে تَتِمَّة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরা ইসরার শেষে তিনি هٰذَا اٰخِرُ مَا كَمَّلْتُ بِهٖ تَفْسِيْرَ الْقُرْاٰنِ الخ বলে যে আলোচনা করেছেন, সে অংশটুকু।

আর عَلٰى نَمَطِهٖ অংশটি تَتْمِيْم থেকে حال হয়েছে। অর্থাৎ, তাফসীরগ্রন্থটি পরিপূর্ণ করতে গিয়ে তিনি মহল্লী (র)-এর অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

قَوْلُهٗ : مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ .... مَحَلُّهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ

সম্পূর্ণ অংশটি نَمَطٌ-এর بَيَان হয়েছে। এখান থেকে আল্লামা মহল্লীর তাফসীরের পদ্ধতি ও নীতিমালা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা আল্লামা সুয়ূতী (র.) অনুসরণ করেছেন। الاعتماد অংশটি ذِكْرُ مَا يُفْهَمُ-এর উপর عطف হয়েছে এবং مِنْ-এর পরে হওয়ার কারণে مَجْرور হয়েছে। আর اِعْرَابِ مَا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ এবং تَنْبِيْهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ জুমলা দুটিও عطف হয়েছে ذِكْر-এর উপর।

عطف التفسير وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ অংশটি عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ হয়েছে। وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ অংশটি عطف হয়েছে وَجْهٍ لَطِيْفٍ-এর উপর এবং এটি عطف التفسير হিসেবে ব্যবহৃত। এভাবে যে, عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ-এর মাঝে যে বিষয়টি সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়টি وَتَرْكَ التَّطْوِيْلِ-এর মাঝে বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, কোনো বস্তু সংক্ষিপ্ত হওয়া মানে দীর্ঘ না হওয়া।

بِذِكْرِ اَقْوَالٍ-এর সম্পর্ক হলো تَطْوِيْل-এর সাথে এবং وَاَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا অংশটি اَقْوَال-এর উপর عطف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : واللّٰهَ اَسْأَلُ النَّفْعَ ..... بِمَنِّهٖ وَكَرَمِهٖ

بِهٖ-এর যমীর পূর্বোল্লিখিত تَتْمِيْم-এর দিকে ফিরেছে। بِمَنِّهٖ وَكَرَمِهٖ অংশটি اَسْأَل-এর সাথে মুত'আল্লিক হয়েছে।

الجزء الأول
প্রথম পারা

প্রথম পারা : اَلْجُزْءُ الْأَوَّلُ

الركوع : ٤٠
রুকূ' : ৪০

٢. سورة البقرة (مدنية)
সূরা বাকারা (মাদানী)

الآيات : ٢٨٦, ٢٨٧
আয়াত : ২৮৬, ২৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْاِسْمُ وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ ✪

নাম ও নামকরণের কারণ : মাসহাফে উসমানীর বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের দ্বিতীয় সূরা হলো সূরাতুল বাকারা। অবতীর্ণে ক্রমানুযায়ী সূরাটি ৯১তম। সূরাটির নাম اَلْبَقَرَة রাখার কারণ হলো, সূরা টি এক স্থানে বনী ইসরাইলের بَقَرَة (গাভী)-এর আলোচনা রয়েছে। এটা আরবি কায়েদা تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ الْجُزْءِ (অংশবিশেষের নামে পূর্ণ বস্তুর নামকরণ) হিসেবে হয়েছে। এটা বিষয়ভিত্তিক নাম নয়; বরং প্রতীকী নাম। কুরআনের প্রতিটি সূরায় এ পরিমাণ ব্যাপক ও অধিক বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিকে বিবেচন করে শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এটা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। তাই রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় অধিকাংশ সূরা শিরোনামের বদলে এমন নাম নির্ধারণ করেছেন, যাতে কেবল আলামত ও নিদর্শনের কাজ চলে। এ সূরাকে সূরা বাকারা বলে নামকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখানে গাভীর বিধান, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো এটা এমন সূরা যেখানে গাভী শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮]

مَوْضَعُ النُّزُوْلِ وَخَلْفِيَّتُهُ ✪

অবতীর্ণ-স্থান ও প্রেক্ষাপট : মক্কী জীবনে রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক ছিল দু'ধরনের লোকের সাথে। তারঁ পরিপূর্ণ অনুসারী হিজরত করে যখন তিনি পবিত্র মদিনায় আগমন করলেন, তখন সেখানে ইহুদি-খ্রিষ্টান ছাড়াও নতুন তৃতীয় একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা হলো মুনাফিক সম্প্রদায়; যাদের অধিকাংশ ইহুদি ছিল। আর তাদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। সে পূর্ব থেকেই মদিনায় নিজ ক্ষমতা ও নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখছিল।

কিন্তু রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের কারণে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর আশা গুড়েবালি হলো, তখন সে অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা না পেয়ে আড়ালে বিরোধিতায় মেতে উঠল। মোটকথা, হিজরত করে রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের পর ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকরা ইসলামকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার করতে থাকল। এই তিন শ্রেণির অপপ্রচারের উত্তর ও তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপদেশ সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সূরা বাকারার অধিকাংশ আয়াতই নাযিল হয়েছে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের প্রথম দিকে। হযরত ইকরিমা (র) বলেন- أَوَّلُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ، سُوْرَةُ الْبَقَرَة অবশ্য এর কিছু অংশ হিজরতের অনেক পরে নাযিল হয়েছে। যেমন- সুদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। সে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে রাসূল ﷺ-এর জীবনের একেবারে শেষের দিকে।

মোটকথা, সূরা বাকারা মদিনাতেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা দীর্ঘ সময় ব্যাপী একটু একটু করে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত .... وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ নাযিল হয়েছে বিদায় হজের সময় মিনাতে। কিন্তু হিজরতের পরে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মুফাসসিরগণের পরিভাষা অনুযায়ী এটি মাদানী আয়াত। অনেকের মতে, এটি কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত।

কেউ কেউ বলেছেন, সূরা বাকারার ১০৯ নং আয়াতের কিছু অংশ ... الخ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا এবং ২৭২ নং আয়াত لَيْسَ عليك هُدَاهُمْ .... الخ হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ অভিমতটি সঠিক নয়। বরং উক্ত আয়াতদ্বয়ও মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭; তাফসীরে কুরতুবী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭০]

প্রথম পারা : اَلْجُزْءُ الْأَوَّلُ

الركوع : ٤٠
রুকূ' : ৪০

٢. سورة البقرة (مدنية)
সূরা বাকারা (মাদানী)

الآيات : ٢٨٦, ٢٨٧
আয়াত : ২৮৬, ২৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْاِسْمُ وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ ✪

নাম ও নামকরণের কারণ : মাসহাফে উসমানীর বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের দ্বিতীয় সূরা হলো সূরাতুল বাকারা। অবতীর্ণে ক্রমানুযায়ী সূরাটি ৯১তম। সূরাটির নাম اَلْبَقَرَة রাখার কারণ হলো, সূরা টি এক স্থানে বনী ইসরাইলের بَقَرَة (গাভী)-এর আলোচনা রয়েছে। এটা আরবি কায়েদা تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ الْجُزْءِ (অংশবিশেষের নামে পূর্ণ বস্তুর নামকরণ) হিসেবে হয়েছে। এটা বিষয়ভিত্তিক নাম নয়; বরং প্রতীকী নাম। কুরআনের প্রতিটি সূরায় এ পরিমাণ ব্যাপক ও অধিক বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিকে বিবেচন করে শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এটা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। তাই রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় অধিকাংশ সূরা শিরোনামের বদলে এমন নাম নির্ধারণ করেছেন, যাতে কেবল আলামত ও নিদর্শনের কাজ চলে। এ সূরাকে সূরা বাকারা বলে নামকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখানে গাভীর বিধান, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো এটা এমন সূরা যেখানে গাভী শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮]

مَوْضَعُ النُّزُوْلِ وَخَلْفِيَّتُهُ ✪

অবতীর্ণ-স্থান ও প্রেক্ষাপট : মক্কী জীবনে রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক ছিল দু'ধরনের লোকের সাথে। তারঁ পরিপূর্ণ অনুসারী হিজরত করে যখন তিনি পবিত্র মদিনায় আগমন করলেন, তখন সেখানে ইহুদি-খ্রিষ্টান ছাড়াও নতুন তৃতীয় একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা হলো মুনাফিক সম্প্রদায়; যাদের অধিকাংশ ইহুদি ছিল। আর তাদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। সে পূর্ব থেকেই মদিনায় নিজ ক্ষমতা ও নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখছিল।

কিন্তু রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের কারণে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর আশা গুড়েবালি হলো, তখন সে অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা না পেয়ে আড়ালে বিরোধিতায় মেতে উঠল। মোটকথা, হিজরত করে রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের পর ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকরা ইসলামকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার করতে থাকল। এই তিন শ্রেণির অপপ্রচারের উত্তর ও তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপদেশ সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সূরা বাকারার অধিকাংশ আয়াতই নাযিল হয়েছে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের প্রথম দিকে। হযরত ইকরিমা (র) বলেন- أَوَّلُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ، سُوْرَةُ الْبَقَرَة অবশ্য এর কিছু অংশ হিজরতের অনেক পরে নাযিল হয়েছে। যেমন- সুদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। সে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে রাসূল ﷺ-এর জীবনের একেবারে শেষের দিকে।

মোটকথা, সূরা বাকারা মদিনাতেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা দীর্ঘ সময় ব্যাপী একটু একটু করে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত .... وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ নাযিল হয়েছে বিদায় হজের সময় মিনাতে। কিন্তু হিজরতের পরে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মুফাসসিরগণের পরিভাষা অনুযায়ী এটি মাদানী আয়াত। অনেকের মতে, এটি কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত।

কেউ কেউ বলেছেন, সূরা বাকারার ১০৯ নং আয়াতের কিছু অংশ ... الخ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا এবং ২৭২ নং আয়াত لَيْسَ عليك هُدَاهُمْ .... الخ হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ অভিমতটি সঠিক নয়। বরং উক্ত আয়াতদ্বয়ও মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭; তাফসীরে কুরতুবী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭০]

الرَّابِطَةُ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ ✪

পূর্ববর্তী ও আলোচ্য সূরার যোগসূত্র : সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। তা হলো সূরা ফাতেহাতে যে হেদায়াতের প্রার্থনা জানানো হয়েছিল, সূরা বাকারাতে তা পাওয়ার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনও বলা যায় যে, এ সূরার তৃতীয় রুকু থেকে আল্লাহ তা'আলার জাহেরী ও বাতেনী, সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামতসমূহের যে ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেসব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-এর সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতাসমূহ, শাস্তি ও তওবার বর্ণনা, ইবাদত, বন্দেগি ও শরয়ী বিধনাবলির বর্ণনা হচ্ছে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর ব্যখ্যা। ভালো ও মন্দ লোকদের যে ইতিহাস বা পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো মূলত- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ-এর ব্যাখ্যা।

সূরার নাম ও বিন্যাস : বিশুদ্ধ মতে সূরার নাম ও পারস্পরিক বিন্যাস تَوْقِيْفِى ব্যাপারে। অর্থাৎ স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইঙ্গিতে সাব্যস্ত। যখন কোনো সূরা শেষ হতো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ-কে বলতেন- اِجْعَلْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ عَقِبَ سُوْرَةِ كَذَا وَقَبْلَ سُوْرَةِ كَذَا অর্থাৎ, এ সূরাটি অমুক সূরার পরে কিংবা পূর্বে স্থাপন করুন! এমনিভাবে আয়াতের তারতীব বা ক্রমবিন্যাসও توقيفى হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ-কে বলতেন- اِجْعَلْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَقِبَ اٰيَةِ كَذَا وَقَبْلَ اٰيَةِ كَذَا এ আয়াতটিও অমুক আয়াতের পরে কিংবা পূর্বে স্থাপন করুন। উল্লেখ্য আয়াত এবং সূরার তারতীব তাওকীফী হওয়ার বিষয়টি رَاجِح বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতের ভিত্তিতে, অন্যথায় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেছেন, সূরা ও আয়াতের তারতীব সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদে নির্ণিত হয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কুরআনের নোসখায় সূরার নাম লেখা ছিল না। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ তা লিখেছেন। যেমনিভাবে সে কুরআনকে سُبْع - رُبْع - عُشْر ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছে। [হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২]

উল্লেখ্য, সূরার নামসমূহ تَوْقِيْفِى বলতে প্রসিদ্ধ নামটি। অন্যথায় সাহাবা এবং তাবেঈনের এক জামাত নিজেদের পক্ষ থেকে কতিপয় সূরার নাম দিয়েছেন। যেমন হযরত হুযায়ফা (রা) সূরা তওবার নাম রেখেছেন- اَلْفَاضِحَةُ এবং سُوْرَةُ الْعَذَابِ হযরত খালেদ ইবনে মা'দান সূরা বাকারার নাম فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন।

আবার কিছু সূরার একাধিক নামও রয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহার নামসমূহ নিম্নরূপ- اُمُّ الْقُرْاٰنِ - اُمُّ الْكِتَابِ - سُوْرَةُ الْحَمْدِ - سُوْرَةُ الصَّلَاةِ - اَلشِّفَاءُ - اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ - اَلنُّوْرُ - اَلدُّعَاءُ - اَلْمُنَاجَاةُ - اَلشَّافِيَةُ - اَلْكَافِيَةُ - اَلْكَنْزُ - اَلْاَسَاسُ

সূরা তাওবার নাম اَلْفَاضِحَةُ এবং سُوْرَةُ الْعَذَابِ এবং সূরা ইউনুস -এর নাম اَلسَّابِعَةُ কেননা এটি مُفَصَّل-এর সাতটি সূরার সপ্তম সূরা। সূরা ইসরার নাম بَنِىْ اِسْرَائِيْل। সূরা সাজদার নাম المضاجع সূরা ফাতিরের নাম اَلْمَلَائِكَةُ সূরা মু'মিনের নাম اَلْغَافِرُ সূরা জাছিয়ার নাম اَلشَّرِيْعَةُ ইত্যাদি।

আবার কখনো কয়েকটি সূরার সমন্বিত নামও রয়েছে। যেমন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান -এর নাম الزهراوين এবং সূরা বাকারা থেকে আ'রাফ পর্যন্ত সাতটি সূরার নাম اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ ইত্যাদি। [হাশিয়াতে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৩]

কুরআন শরীফের তরতিব : পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তরতিব দু'প্রকার-

১. সংকলনের, অর্থাৎ সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত যে তরতিব পবিত্র কুরআন বর্তমানে আমাদের সামনে বিদ্যমান আছে। এ তরতিবও সঠিক বর্ণনা মতে হযরত জিবরাঈল (আ) ও নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ অনুসারে চূড়ান্ত হয়েছে।

২. অবতরণের, অর্থাৎ যে তরতিবে বাস্তবে আয়াত ও সূরাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, তা হচ্ছে- সূরা 'আলাক, কলম, মুযযাম্মিল, মুদ্দাছছির, লাহাব, কুওভিরাত, আ'লা, ওয়াল লাইল, ওয়াল ফাজর, ওয়াদ দুহা, আলাম নাশরাহ, ওয়াল 'আছ্‌র, ওয়াল 'আদিয়াত, কাউছার, তাকাছুর, মা'উন, কাফিরূন, ফীল, ইখলাস, নাজম, 'আবাসা, কদর, বুরূজ, তীন, কুরাইশ, কারিয়াহ, মুরসালাত, কাফ, কিয়ামাহ, বালাদ, তারিক, কামার, সোয়াদ, আ'রাফ, জিন, ইয়াসিন, ফুরকান, ফাতির, মারইয়াম, তাহা, ওয়াকিয়াআহ, শু'আরা, নামল, কাসাস, বনী ইসরাঈল, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, হিজর, আন'আম, ওয়াস সাফফাত, লুকমান, সাবা, যুমার, মু'মিন, হামীম সিজদা, হামীম 'আঈন-সীন-কাফ, যুকরুফ, দুখান, জাছিয়া, মু'মিনূন, তানযীল, আসসিজদা, তূর, মুলক, হাক্কাহ, মা'আরিজ, নাবা, নাযি'আত, ইনফিতার, ইনশিকাক, রূম, মুতাফফিফীন ও 'আনকাবূত। উক্ত ৮৩ টি সূরা মক্কী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সর্বশেষ সূরা 'আনকাবূতকে বলেছেন, আর হযরত যাহহাক (র.) ও হযরত 'আতা (র.) সর্বশেষ সূরা মু'মিনূনকে বলেছেন।

মাদানী সূরাগুলো অবতীর্ণের তারতীব হচ্ছে- সূরা বাকারা, আনফাল, আরে ইমরান, আহযাব, মুমতাহিনা, নিসা, যিলযাল, হাদীদ, মুহাম্মদ, রা'দ, রাহমান, দাহর, তালাক, বাইয়্যিনাহ, হাশর, ফালাক, নাস, নসর, নূর, হজ, মুনাফিকূন, মুজাদালাহ, হুজুরাত, তাহরীম, সাফ, জুম'আহ, তাগাবুন, ফাতহ, তওবা, মায়িদা, কেউ কেউ সূরা মায়িদাকে সূরা তাওবার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। সূরা ফাতিহার অবতরণ মক্কা ও মদীনা দু'স্থানে হয়েছে বিধায়- তাকে মক্কীও বলা যায় এবং মাদানীও বলা যায়, আর কিছু সংখ্যক সূরা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। [কামালাইন, খ. ১, পৃ. ১০]

✪ سَبَبُ تَقْدِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারা অগ্রবর্তী করার কারণ : অধিকাংশ গবেষকের মতে, সূরাসমূহের বিন্যাস অহীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। তবে কতিপয়ের মতে, সূরাসমূহের বিন্যাস বুদ্ধি ও গবেষণাপ্রসূত। দ্বিতীয় এই অভিমতটিকে সঠিক ধরে নিলে সূরা বাকারা অন্যান্য সূরাসমূহের পূর্বে স্থান পাওয়ার কারণ কী হতে পারে, তা নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. এটি দীর্ঘতম ও সর্ববৃহৎ সূরা।
২. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, সূরা বাকারায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার সংবাদ, এক হাজার আহকাম ও হিকমত রয়েছে। তাফসীরসহ সম্পূর্ণ সূরা বাকারা অধ্যয়নর করতে হযরত ওমর (রা)-এর ১২ বছর ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর ৮ বছর লেগেছিল। এসব বিষয়বস্তু এবং গুরুত্বপূর্ন বিধান ও হেকমত সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সূরা বাকারাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।
৩. আয়াতুল কুরসীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতপূর্ণ আয়াত এবং আয়াতুল মুদায়ানাতের মতো দীর্ঘতম আয়াত থাকার কারণে সূরা বাকারাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।
৪. কুরআন অবতীর্ণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো একত্ববাদ, নবুয়ত, রিসালাত, পুনর্জীবন ও কেয়ামত ইত্যাদি বিষয় সাব্যস্ত করা। সূরা বাকারাতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
৫. কতিপয় বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিদের মাঝে বাছুর পূজার প্রচলন ছিল, যা সুস্পষ্ট শিরক। কুরআনে কারীমের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শিরকের মূলোৎপাটন করা। আর সূরা বাকারাতে বাছুর পূজা এবং শিরকের বিরুদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

✪ خُلَاصَةُ السُّوْرَةِ

সূরার সারাংশ : সূরা বাকারা শুরু হয়েছে মুমিন, কাফের ও মুনাফিকদের আলোচনা দিয়ে। সেখানে এই তিন প্রকারের বিভিন্ন গুণাবলি, পরিণাম ও তাদের অবস্থার উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ পর্যন্ত ঘটনাবলি।

এরপর আহলে কিতাবদের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এসবের মাঝে রয়েছে- তাদের মন্দ গুণাবলির বর্ণনা, ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা। সূরা বাকারার ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করে ১২৪ নং আয়াত পর্যন্ত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আহলে কিতাবদের আলোচনার পর শরিয়তের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এর মাঝে রয়েছে- রোজা, হজ, ওমরা, জিহাদ, পরিবার, বিবাহ, তালাক, দুগ্ধ পান, ইদ্দতসহ আরো বহু বিষয়। এরপর রিবার মন্দত্ব এবং লেনদেন সংক্রান্ত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে মুমিনদেরকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশনা দিয়ে সূরা সমাপ্ত হয়েছে। [সফওয়াতুত তাফাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪]

✪ فَضِيْلَةُ السُّوْرَةِ

সূরার ফযিলত : কুরআনের প্রতিটি সূরা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ ফযিলতপূর্ণ হলেও সূরা বাকারা হলো শীর্ষ মর্যাদাসম্পন্ন সূরাগুলোর অন্যতম। বিভিন্ন হাদীসে এ সূরার বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهَا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ। অর্থাৎ, যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে। [সহীহ মুসলিম, তিরমিযী]

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا فَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। [মুসলিম]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে আরও বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَاِنَّ سَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْاٰنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া থাকে, কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারা। আর তাতে রয়েছে এমন একটি আয়াত, যা সকল আয়াতের সর্দার। সেটা হলো আয়াতুল কুরসী। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ২৮৭৮]

৪. হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রা) বর্ণনা করেন–

اِقْرَؤُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهُ الْبَطَلَةُ وَهِيَ فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ.

অর্থাৎ, তোমরা সূরা বাকারা তেলাওয়াত করো। কেননা, তা গ্রহণে রয়েছে বরকত, আর বর্জনে রয়েছে অনুতাপ। অকর্মরা এটা বহনে সক্ষম নয়। এটা কুরআনের শামিয়ানা। [দারেমী]

৫. অপর একটি বর্ণনায় আছে– سَيِّدَةُ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ اٰيَةُ الْكُرْسِيّ অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের সরদার হলো আয়াতুল কুরসী। বল্যবাহুল্য, এটি সূরা বাকারারই অন্যতম আয়াত। [তিরমিযী]

৬. বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারা সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। আল্লামা ইবনে আরাবী (র) বলেন–

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اَلْفُ اَمْرٍ وَاَلْفُ نَهْيٍ وَاَلْفُ حِكَمٍ وَاَلْفُ خَبَرٍ أَخْذُهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ لَا تَسْتَطِيْعُ الْبَطَلَةُ وَهُمُ السَّحَرَةُ سُمُّوْا بِذَالِكَ لِمَجِيْئِهِمْ بِالْبَاطِلِ - اِذَا قُرِأَتْ فِيْ بَيْتٍ لَمْ تَدْخُلْهُ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ - (جمل: ص١٣ج١)

অর্থাৎ, এ সূরায় এক হাজার (اَمْر) আদেশ এক হাজার (نَهِى) নিষেধ, এক হাজার হেকমত, এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তা গ্রহণে বরকত এবং বর্জনে অনুতাপ। জাদুকররা তা বহন করতে পারে না। কোনো ঘরে তা পাঠ করা হলে, শয়তান সেখানে তিনদিন পর্যন্ত প্রবেশ করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ সূরার মর্ম আয়ত্ত ও অনুধাবন করতে আট বছর সময় ব্যয় করেছেন। [হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩]

৭. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, হঠাৎ তাঁর কাছে বাঁধা অশ্বটি ভয়ে ছটফট আরম্ভ করল, তখন তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন, অমনি অশ্বটিও শান্ত হয়ে গেল, পরে যখন আবার তিনি তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন, তখন অশ্বও ভয়ে ছটফট আরম্ভ করে দিল। নিকটেই তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া নিদ্রিত ছিল। তিনি চিন্তা করলেন যে, তাঁর ছেলের কোনো অসুবিধা হয় কি না, তাই তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে উপরের দিকে তাকালে একটি উজ্জ্বল ছায়ানীড় দেখতে পেলেন, যার মধ্যে আলো দানকারী চেরাগ ছিল। তিনি এ দৃশ্য দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে এলে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সকালে এ ঘটনা রাসূল ﷺ-এর দরবারে পেশ করলে রাসূল ﷺ বললেন যে, ফেরেশতাগণ তোমার তেলাওয়াত শুনতে এসেছিল, যদি তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে- তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকতেন এবং লোকেরা তাঁদেরকে স্বচক্ষে দেখতে পারতো। সুতরাং, তুমি নিয়মিত সূরা বাকারা পড়তে থাকো।

৮. মুসলিম শরীফ হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারাহ ও আলে- ইমরান নিজ পাঠকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন সায়েবানের কাজে আসবে, সূরা বাকারা পড়তে থাক, এটা পাঠ করার মধ্যে বরকত এবং তেলাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে অফসোস রয়েছে। এ বরকতে প্রতারকের ধোঁকা চলতে পারে না।

مَدَنِيَّةٌ : সূরার বেশির ভাগ বরং প্রায় সবগুলো আয়াতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত পরবর্তী মদনী জীবনে অবতীর্ণ। সুতরাং এক দুটি মক্কী আয়াতের অন্তর্ভুক্তি সূরাটি মাদানী হওয়ার অন্তরায় নয়।

এ নজরে পবিত্র কুরআনের পরিচিতি : পবিত্র কুরআনের সমস্ত সূরাগুলো নাসিখ-মানসূখ অর্থাৎ রহিতকারী ও রহিত হওয়ার দৃষ্টিতে চার প্রকার। যথা–

প্রথম প্রকার : যে সূরাগুলোতে শুধু (نَاسِخٌ) রহিতকারী আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা ৬টি। যথা- সূরা ফাতাহ, হাশর, মুনাফিকূন, তাগাবুন, ত্বালাক ও আ'লা।

দ্বিতীয় প্রকার : যে সূরাগুলোতে নাসিখ মানসূখ উভয় প্রকার আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা- ২৫টি। যথা- সূরা আল বাকারা, আল আল ইমরান, আন নিসা, আল মায়েদা, আর আনফাল, আত তওবা, ইবরাহীম, মারয়াম, আল আম্বিয়া, আল হজ, আন নূর, আল ফোরকান, আশ শু'আরা, আল আহযাব, আস সাবা, আল মু'মিন, আয যারিয়াত, আততূর, আল মুজাদালা, আল ওয়াকি'আহ, আল মুযযাম্মিল, আল মুদ্দাছছির, আত তাকভীর ও আল আছর।

তৃতীয় প্রকার : যে সূরাগুলোতে শুধু মানসূখ আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা ৪০টি। যথা- সূরায়ে আন'আম, আ'রাফ, ইউনুস, হুদ, রা'আদ, হিজর, নহল, ইসরা, কাহফ, তাহা, মু'মিনুন, নামল, কাছাছ, 'আনকাবূত, রোম, লুকমান, আলিফ লাম মীম সাজদা, ফাতির, সাফফাত, সোয়াদ, যুমার, হামীম সিজদা, শুরা, যুখরুফ, দুখান, জাকিয়া, আহকাফ, মুহাম্মদ, ক্বাফ, নাজম, কামার, মুমতাহিনা, মা'আরিজ, কিয়ামাহ, ইনসান, 'আবাসা, তারিক, গাশিয়াহ, তীন, কাফিরূন।

চতুর্থ প্রকার : যে সূরাগুলোতে মানসূখ আয়াতও নেই এবং নাসিখ আয়াতও নেই, এমন সূরার সংখ্যা ৪৩টি। যথা- সূরা ফাতিহা, ইউসুফ, ইয়াসীন, হুজরাত, রাহমান, হাদীদ, সাফ, জুমু'আহ, তাহরীম, মুলক, হাক্কা, নূহ, জিন, মুরসালাত, নাবা, নাযি'আত, ইনফিতার, মুতাফফিফীন, ইনশিকাক, বুরূজ, ফাজর, বালাদ, শামস, লাইল, দুহা, আলাম নাশরাহ, কালাম, ক্বাদর, বাইয়িনাহ, যিলযাল, আদিয়াত, কারিয়াহ, তাকাছুর, হুমাযাহ, ফীল, কুরাইশ, মাঊন, কাউছার, নাসর, লাহাব, ইখলাস, ফালাক নাস। পবিত্র কুরআনে সর্বমোট সূরা ১১৪টি।

সূরাসমূহের বিশ্লেষণ :

প্রথমত সূরা সমূহকে সময় ও স্থান হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- যে সূরা সমূহে মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে- ঐ সূরাগুলো মক্কী, আর যে সূরাসমূহে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে- এ সূরাগুলো মাদানী।

দ্বিতীয়ত যে সূরাগুলো মক্কা ও তার আশেপাশে যেমন- মীনা ইত্যাদি স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে- ঐ সূরাগুলো মক্কী, আর যে সূরাগুলো সূরা মদীনা ও তার আশেপাশে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ সূরাগুলো মদনী।

তৃতীয়ত যা সবচেয়ে অধিক বিশুদ্ধ, তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে যতগুলো সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ সবগুলো মক্কী, আর তার হিজরতের পর যতগুলো সূরা নাজিল হয়েছে- যদিও তা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে, ঐ সবগুলো মাদানী।

জালালাইন-এর সিদ্ধান্ত : জালালাইন-এর বর্ণনা মোতাবেক ২০টি সূরা নিঃসন্দেহে মাদানী, আর ৭৭টি সূরা নিঃসন্দেহে মক্কী এবং ১৭টি সূরা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

সূরাসমূহের নাম : যেমনভাবে বড় আকারের বই ও কিতাবাদিকে সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়। যাতে করে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং পাঠকদের বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে সুবিধা হয়। তদ্রূপ অবস্থাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সূরা আয়াতসমূহের, আর এ সূরাসমূহকে পরস্পর পৃথক করার লক্ষ্যে পৃথক পৃথক নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এ নামকরণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কোথাও প্রথম শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন- সূরা ইয়াসীন, সোয়াদ, নূন, যাকে আরবিতে বলা হয় تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ اَوَّلِ الْجُزْءِ আর কোথাও সূরাতে উল্লিখিত বিশেষ কোনো শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে ঐ শব্দের দ্বারাই সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন- সূরা মুহাম্মদ, সূরা ইবরাহীম ইত্যাদি, যাকে আরবিতে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ اَشْهَرِ الْجُزْءِ -আর কোথাও সূরাতে উল্লিখিত কোনো ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে ঐ সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন- সূরা বাকারা।

قَوْلُهٗ وَسِتٌّ اَوْ سَبْعٌ الخ

এখানে আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মতভেদের উৎস হলো- কোনো কোনো আয়াতের শুরুভাগে মাসহাফে কূফী ও অপরাপর মাসহাফের ভিন্নতা।

اٰيَةٌ : আয়াত অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন। পথিকদের চলার সুবিধার্থে রাস্তার পার্শ্বে যে চিহ্ন স্থাপন করা হয়, তাকে اٰيَةٌ বলা হয়। পরিভাষায় اٰيَة বলা হয়- طَائِفَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْاٰنِ مُتَمَيِّزَةٌ بِفَصْلٍ [কয়েকটি শব্দের সমষ্টিকে আয়াতে কুরআনী বলা হয়।] কখনো একটি কালিমাও আয়াত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যেমন- مُدْهَامَّتَانِ - وَالْفَجْرِ - وَالضُّحٰى - وَالْعَصْرِ - الٓمّٓ - طٰهٰ - يٰسٓ ইত্যাদি। [হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৪]

সূরা বাকরার মর্যাদা ও গুরুত্ব : বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারা সমগ্র কুরাআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র) বলেন-

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اَلْفُ اَمْرٍ وَاَلْفُ نَهْيٍ وَاَلْفُ حِكَمٍ وَاَلْفُ خَبَرٍ أَخْذُهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ لَا تَسْتَطِيْعُ الْبَطَلَةُ وَهُمُ السَّحَرَةُ سُمُّوْا بِذٰلِكَ لِمَجِيْئِهِمْ بِالْبَاطِلِ. اِذَا قُرِأَتْ فِىْ بَيْتٍ لَمْ تَدْخُلْهُ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ.

অর্থাৎ, এ সূরার এক হাজার (اَمْر) আদেশ, এক হাজার (نَهْى) নিষেধ, এক হাজার হেকমত, এক হাজার সংবাদ রয়েছে। তা গ্রহণে বরকত এবং বর্জনে অনুতাপ রয়েছে। ভ্রান্তরা তথা জাদুকররা তা বহন করতে পারে না, বিষয়ে চর্চার কারণে এদেরকে ভ্রান্ত বলা হয়। কোনো ঘরে তা পাঠ করা হলে, শয়তান সেখানে তিনদিন পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩]

সূরা বাকারার পরিসংখ্যান : আয়াত : ২৮৬, মতান্তরে ২৮৭, আয়াত সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্যের কারণ হলো, কোনো কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে মাসহাফে কুফীতে ভিন্নতার কারণে সংখ্যা নির্ধারণ মতানৈক্য। শব্দ : ৬০২১টি, বর্ণ : ২৫৫০টি, রুকু : ৪০টি, সূরাসমূহের অবতীর্ণের ক্রম অনুযায়ী সূরাটি ৯১তম।

كَلِمَاتٌ حَوْلَ التَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ

আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ التَّعَوُّذِ : তা'আউযের বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : আলোচ্য বাক্যে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সূরা নাহলের ৯৮নং আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সময় আশ্রয় প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ, কুরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যা দ্বারা শয়তান পলায়ন করে, (یو بگریزد ازاں قوم کہ قرآن خوانند) "যারা কুরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়।" এছাড়া কোনো কোনো বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানি প্রভাব দূর করার জন্যে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। [তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

এ সত্ত্বেও যখন কুরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরি হয়ে যায়। এছাড়া স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানি কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়েদা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এজন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, মাযহারী]

ইবনে কাসীর (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মানুষের শত্রু দু'রকম।

১. স্বয়ং মানবজাতির মধ্যে থেকে; যেমন সাধারণ কাফের।

২. জিনদের মধ্যে থেকে অবাধ্য শয়তানের দল।

ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং তার আক্রমণও মানুষের উপর সরাসরি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্যে এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান, কারো দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানের প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার যথার্থ কারণ হলো, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কারণ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক। যেহেতু জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে আর পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর নিকট ছওয়াবের অধিকারী হবে।

✪ سَبَبُ تَقْدِيْمِ التَّعَوُّذِ عَلَى التَّسْمِيَةِ

বিসমিল্লাহর পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ পড়ার কারণ : বস্তুত: তা'আওউয হলো শয়তানের ধোঁকার জালে আটকে পড়া থেকে বেঁচে থাকা। আর বিসমিল্লাহ-এর হাকীকত হলো বান্দা আল্লাহ তা'আলার রহমতে দাখিল হয়ে যাওয়া। এ জন্যে তা'আওউয বিসমিল্লাহ-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়। কারণ, دَفْعُ مُضَرَّةٍ مُقَدَّمٌ عَلٰى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ অর্থাৎ, লাভ অর্জনের চেয়ে ক্ষতি রোধ করা অগ্রগণ্য। যেমন– কালেমা তাইয়েবার প্রথমে لَا اِلٰهَ বলে অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে বের করে اِلَّا اللّٰهُ বলে আল্লাহকে স্থান দিতে হবে। সুগন্ধি ব্যবহার করার পূর্বে প্রথমেই শরীর থেকে ময়লা দূর করতে হয়। কাপড় আয়রণ করতে হলে প্রথমত পরিষ্কার করতে হয়। তদ্রূপ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে বের করতে হবে। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা তেলাওয়াতের শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার আদেশ করেছেন যে, শয়তান তোমাদের চিরশত্রু। সুতরাং প্রথমে তাকে অন্তর বের করে তেলাওয়াত শুরু করো।

মোল্লা আলী কারী (র.) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতে বলেন- اَلشَّيْطَانُ كَالْكَلْبِ الْوَاقِفِ عَلَى الْبَابِ অর্থাৎ শয়তানের উপমা হলো দরজায় দাঁড়ানো কুকুরের ন্যায়। যেমন বড় লোকদের গেটের সামনে কুকুর থাকে, ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে, তখন কুকুরের মালিকের আশ্রয় নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। মালিক যখন নির্দিষ্ট বাক্য বলে, তখন কুকুর লেজ নাড়াতে নাড়াতে চলে যায়।

সরাসরি কুকুরের সাথে মুকাবিলা করে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। মালিকের সাহায্য নিতে হয়। তদ্রূপ শয়তান হলো اَكْبَرُ الْكِلَابِ বা সবচেয়ে বড় কুকুর। এ কুকুর থেকে রক্ষা পেয়ে মালিকের সাক্ষাৎ করতে হলে মালিকের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। সরাসরি শয়তানের সাথে মুকাবিলা না করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত কুকুর যেটি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে তার সঙ্গে কথা না বলে; কথা হবে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর। শত্রুর সঙ্গে কীসের কথা! তার দিকে নজর না দিয়ে বন্ধুর দিকে নজর দিতে হবে। তাহলে শত্রু কিছু করতে পারবে না। এ জন্যে কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করতে হয়। এছাড়াও কুরআনে কারীম হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম। তা তেলাওয়াতের পূর্বে জবান ও কলবের পবিত্রতা আবশ্যক। তাই কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে استعاذة-এর হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাতে জবান ও কলব পবিত্র হয়ে যায়।

[মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬]

✪ حِكْمَةُ قِرَاءَةِ التَّعَوُّذِ فِيْ بِدَايَةِ التِّلَاوَةِ

তেলাওয়াতের শুরুতে তাআওউয পাঠের তাৎপর্য :

১. আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন-

وَمِنْ لَطَائِفِ الْاِسْتِعَاذَةِ اَنَّ قَوْلَهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اِقْرَارٌ بِالْعَجْزِ وَالضُّعْفِ وَاعْتِرَافٌ مِنَ الْعَبْدِ بِقُدْرَةِ الْبَارِئِ عَزَّ وَ جَلَّ وَاَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَادِرُ عَلٰى دَفْعِ جَمِيْعِ الْمَضَرَّاتِ وَالْاٰفَاتِ وَاعْتِرَافٌ مِنَ الْعَبْدِ أَيْضًا بِاَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ فَفِى الْاِسْتِعَاذَةِ اللَّجَأُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْقَادِرِ عَلٰى دَفْعِ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ الْفَاجِرِ وَاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى دَفْعِهٖ عَلَى الْعَبْدِ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى. (حَاشِيَةُ الْجُمَل : ١/١٤)

২. আল্লামা শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাভী (র.) বলেন-

فَحِكْمَةُ الْاِسْتِعَاذَةِ تَطْهِيْرُ الْقَلْبِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى، فَاِنَّ فِيْ تَعَوُّذِ الْعَبْدِ بِاللّٰهِ اِقْرَارًا بِالْعَجْزِ وَالضُّعْفِ وَاعْتِرَافًا بِقُدْرَةِ الْبَارِئِ وَاَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَادِرُ عَلٰى دَفْعِ الْمَضَرَّاتِ وَاَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ. (حَاشِيَةُ الصَّاوِيْ : ج١٠ ص١)

অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়ার কারণ হলো, বান্দার অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করা। কেননা, تَعوذ-এর মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ এবং আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার স্বীকারোক্তি রয়েছে। একই সাথে বান্দা এটাও স্বীকার করে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয় শয়তান প্রকাশ্য শত্রু।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ : তা'আওউযের বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোনো মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশত কিংবা কোনো স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা হয়েছে- যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোনো সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুও তা-ই; তাতে শয়তানের দাবির বিপরীতে আল্লাহ উত্তর দিয়েছেন-

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ.

অর্থাৎ, আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোনো জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজেই বিপথগামী হয় এবং তোমার অনুসরণ করতে থাকে।

✪ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ اَلْفَاظِ التَّعَوُّذِ

তা'আওউযের শব্দাবলি নিয়ে মতানৈক্য : তা'আওউযের সর্বোত্তম শব্দাবলির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১. ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, তা'আওউযের শব্দগুলো হচ্ছে-اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলা উত্তম। কেননা, এর দ্বারা تَعَوُّذ-এর নির্দেশনামূলক দুটি আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়। আয়াতদ্বয় হলো-

১- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (النَّحْلُ : ٩٨)

২- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (فُصِّلَتْ :٣٦)

৩. ইমাম আওযায়ী (র.) ও ইমাম সাওরী (র)-এর মতে, উত্তম হচ্ছে এভাবে বলা–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

✪ هَلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ..... الرَّجِيْمِ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَمْ لَا

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الخ কুরআনের অংশ কিনা : জমহুর উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, তাআওউয কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নয়। তাই তা কুরআন শরীফে লেখা হয়নি। কালামুল্লাহ না হওয়ার কারণে এর পূর্ণ বাক্য নির্ধারণে আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে কুরআন পাঠের সময় তা'আওউযের নির্দেশ কুরআনে রয়েছে।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّعَوُّذِ

তাআওউয সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

ক. তেলাওয়াতের পূর্বে পড়ার হুকুম : জমহু উলামায়ে কেরামের মতে, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে তা'আওউয পাঠ করা মুস্তাহাব, চাই কোনো সূরার প্রথম থেকে তেলাওয়াত শুরু হোক কিংবা মধ্যখান থেকে শুরু হোক। কারণ–

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
(অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।) [সূরা নাহল : ৯৮]

২. কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ. (اَلْأَعْرَافُ : ٢٠١ - ٢٠٠)

৩. কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–
اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ، وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ. (المُؤْمِنُوْنَ : ٩٦-٦٨)
এই আয়াত মানব শয়তানের ক্ষেত্রে دَفْعُ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ এবং জিন শয়তানের ক্ষেত্রে اسعاذة অবলম্বনের আদেশ করছে।

৪. ইবনুল মুনযির (র.) বলেন–
جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِيْمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ - أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

খ. নামাজে পড়ার হুকুম : নামাজে তা'আওউয পড়ার হুকুম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে–

১. জমহুরের মতে, নামজে تَعَوُّذْ পড়া সুন্নত। ইচ্ছাকৃত বা ভুলে না পড়ে থাকরে নামাজ নষ্ট হবে না। আর নামাজের বাইরে تَعَوُّذْ পড়া মুস্তাহাব।
عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اِسْتَفْتَحَ ثُمَّ يَقُوْلُ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثَاتِهٖ. (أخرجه أحمد والترمذي)

২. হযরত আতা (র.) বলেন, নামাজের ভেতর এবং বাইরে উভয় জায়গায়ই ওয়াজিব।

৩. হযরত ইবনে সীরিন (র.) বলেন, জীবনে একবার পাঠ করলেও ওয়াজিব আদায় হওয়ার জন্যে যথেষ্ট হবে।
[হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪]

৪. মালেকীগণের অভিমত হলো, তারাবীহ ছাড়া অন্যান্য নামাজে সূরা ফাতেহা বা সূরা মিলানোর পূর্বে তা'আওউয পড়া মাকরূহ। কারণ, আনাস (রা.) বর্ণনা করেন–
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

৫. শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে, প্রত্যেক রাকাতে কেরাতের পূর্বে তা'আওউয পড়া মুস্তাহাব।

৬. হানাফীগণ বলেন, শুধু প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার শুরুতে পাঠ করবে।

গ. পড়ার সময় নিয়ে মতানৈক্য

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, নামাজের ভেতর কিংবা বাইরে সর্বত্র কেরাতের পূর্বে تعوذ পড়বে।

২. ইমাম নাখায়ী ও দাউদ (র.) কেরাতের শেষে تعوذ পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪]

মাসয়ালা

১. কুরআন তেলাওয়াতের সময় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা সূরা নামলের আয়াতের আদেশ পালন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর আমল প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাই অধিক সংখ্যক আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়, সুন্নত বলেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত যত হাদীস রয়েছে, তেলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং কোনো অবস্থায় না পড়ার সব বিবরণ ইবনে কাসীর (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

২. নামাজে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, শুধু প্রথম রাকাতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া মুস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কুরআন তেলাওয়াত নামাজে হোক কিংবা নামাজের বাইরে, উভয় অবস্থাতেই তেলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারাই তেলাওয়াত করবে প্রথম اَعُوْذُ بِاللّٰهِ যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোনো কাজে মশগুল হলে পুনঃ তেলাওয়াতের সময়اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ও بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে নেওয়া উচিত।

৪. কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু بِسْمِ اللّٰهِ পড়া উচিত।

৫. বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ-এর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।

৬. হাদীসে আরো বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ والخُبَائِثِ পাঠ করার মুস্তাহাব। [ফাতওয়ায়ে শামী]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَعُوْذُ : শব্দটি عَاذَ يَعُوْذُ থেকে নির্গত। قَالَ يَقُوْلُ-এর ওযনে। عِيَاذًا وَمَعَاذًا (ن) عَاذَ بِهٖ অর্থ- আশ্রয় গ্রহণ করা, আশ্রয় নেওয়া।

الشَّيْطَان : শব্দটির মূল ধাতু হলো شَطْنٌ; যার অর্থ- দুরাচারী, দুরাত্মা, ইবলিস, বিতাড়িত ইত্যাদি। কেউ বলেন, এর মূলধাতু হলো, شَاطَ يَشِيْطُ -ধ্বংস হওয়া বা ভস্ম হওয়া।

পরিভাষায় শয়তানের সংজ্ঞা হলো- اَلشَّيْطَانُ اِسْمٌ لِكُلِّ عَاتٍ مِنَ الجِنِّ وَالْاِنْسِ অর্থাৎ, মানব ও জিন জাতির মধ্যে প্রত্যেক দাম্ভিক সীমালঙ্ঘনকারীকে শয়তান বলে। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১]

الرَّجِيْم : এটি فَعِيْل-এর ওযনে فاعل-এর অর্থে ব্যবহৃত। يَرْجُمُ بِالوَسْوَسَةِ والشَّرِّ অর্থাৎ, যা মানব মনে ওয়াসওয়াসা ও অনিষ্ট ঢেলে দেয়।

কেউ কেউ বলেন, مفعول-এর অর্থে- مَرْجُوْمٌ بِالشُّهُبِ عِنْدَ اِسْتِرَاقِ السَّمعِ অর্থাৎ, আকাশ থেকে চুরি করে কথা শোনার সময় উল্কা দিয়ে যাকে আঘাত করা হয়।

কেউ বলেন- مَرْجُوْمٌ بِالعَذَابِ (আযাব দ্বারা আক্রান্ত)।

কেউ বলেন- مَرْجُوْمٌ بِمَعْنٰى مَطْرُوْدٍ عَنِ الرَّحْمَةِ وَعَنِ الْخَيْرَاتِ وَعَنْ مَنَازِلِ الْمَلَإِ الْأَعْلٰى অর্থাৎ, রহমত, সমস্ত কল্যাণ এবং ফেরেশতা সমাজ থেকে বিতাড়িত। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০]

✪ تَوْضِيْحُ التَّسْمِيَةِ : বিসমিল্লাহর বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রতিটি বৈধ কাজ শুরু করতে আল্লাহর নাম নেওয়া ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতি অনুসরণ করলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল পাওয়া যায়।

১. অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কারণ, আল্লাহর নাম স্মরণ করার অভ্যাস একথা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কিনা?

২. প্রতিটি বৈধ সঠিক ও সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কারণ, সাধারণত মানুষ অবৈধ ও অসঙ্গত কাজে আল্লাহর প্রতি যথেষ্ট সঙ্কোচবোধ করে। সুতরাং বোঝা গেল আল্লাহর নাম নিতে, নাম মানুষকে বৈধ ও ভালো কাজের প্রতি প্রেরণদায়ক।

৩. এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হলো, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে। কারণ, বান্দা যখন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় তখন আল্লাহও বান্দার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন। এটাই আল্লাহর রীতি।

❖ خَلْفِيَّةُ نُزُوْلِ بِسْمِ اللّٰهِ

বিসমিল্লাহ নাযিল হওয়ার পূর্বকথা : জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকদের মাঝে কোনো কাজ শুরু করার সময় بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى বলার প্রচলন ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথম কুরআন নিয়ে যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথমে বললেন, اِقْرَأْ (পড়ো)। রাসূল ﷺ বললেন– مَا اَنَا بِقَارِئٍ (আমি তো পড়তে সক্ষম নই)। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড়ো তোমার সেই রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।) এরপর থেকে নবী করীম ﷺ যে কোনো চিঠির শুরুতে লিখতেন– بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামে শুরু করছি। পরে এ আয়াতটি নাযিল হয়– بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا (هود : ٤١) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে (নৌকায় আরোহণ করো), যিনি নৌকাকে চালু রাখবেন এবং শক্ত করে উঁচুতে ধারণ করবেন।

এরপর হতে তিনি চিঠির শুরুতে اللّٰه শব্দের পর الرَّحْمٰن-ও লিখতে শুরু করেন। পরে সূরা নামলের আয়াত وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাযিল হলে রাসূল ﷺ পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে শুরু করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে তাঁর ও সুহাইল ইবনে আমর-এর মধ্যকার চুক্তিপত্র রচনার সময় হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-কে বললেন, প্রথম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ। সুহাইল বলল, না, بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তোমার নামে" লিখতে হবে। কেননা, আমরা রাহমানকে চিনি না। নবী করীম ﷺ সুহাইলের কথা মেনে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি পূর্বে কুরআনে নাযিল হয়নি। সূরা নামল নাযিল হওয়ার পরই তা ব্যবহৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য, সূরা নামল মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা সর্বসম্মত। [আহকামুল কুরআন, জাসসাস : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮]

❖ هَلِ اتَّبَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَدْيَانَ الْأُخْرٰى فِي الْبَسْمَلَةِ؟

বিসমিল্লাহর ক্ষেত্রে কি নবী করীম ﷺ অন্যান্য ধর্মের অনুকরণ করেছেন? : জড়বাদী ধর্মাবলম্বী ও অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় গ্রন্থাদিতেও বিসমিল্লাহর অর্থবোধক কিছু বাক্য আছে। যেমন– مهربان داد - بخشا ئشر - بخشائنده - بنام ايزد ইত্যাদি। বর্তমান ইঞ্জিলের কোনো কোনো গ্রন্থের শুরুতেও বিসমিল্লাহ'র ন্যায় শব্দাবলি রয়েছে, যা দ্বারা সন্দেহ হতে পারে যে, রাসূল ﷺ ইঞ্জিল অথবা পারসিকদের কিতাবের অনুকরণ করেছেন কিনা?

সমাধান : প্রথমত মনে রাখতে হবে যে, ইঞ্জিলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ ধরনের কিছু নেই। সুতরাং তাতে উল্টো প্রমাণিত হতে পারে যে, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বর্তমানে তাদের ধর্মগ্রন্থ মুসলমানদের অনুকরণ করেছে। আর পারস্যবাসীদের অনুকরণ সম্পর্কে বক্তব্য হলো, নবী করীম ﷺ কখনো পারস্য যাননি এবং তৎকালে অগ্নিপূজক কোনো আলেম বা পণ্ডিত আরবে ছিল না। অগ্নিপূজকদের কোনো গ্রন্থও আরবে পাওয়া যেত না।

সেকালে অগ্নিপূজকদের কিতাবাদি প্রচারের প্রথা নিজ দেশ ও জাতির মধ্যে ছিল না; বরং বিশেষ বিশেষ লোকেরা অন্য লোকদের দৃষ্টি থেকে নিজ ধর্মীয় কিতাবদি লুকিয়ে রাখত। সুতরাং আরব দেশে সে কিতাব পৌঁছা অসম্ভব ছিল।

এছাড়া স্বয়ং রাসূল ﷺ-ও নিজ ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারতেন না। তারপরও একটি সম্ভাবনা থেকে যায় যে, হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর মাধ্যমে হয়তো রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে জেনেছেন। এ সন্দেহেরও ভিত্তি নেই। কারণ, হযরত সালমান ফারসী (রা.) ক্রীতদাস ছিলেন; ধর্মীয় আলেম ছিলেন না। ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাপারে তাঁর জানার সুযোগ ছিল না।

তাছাড়া রাসূল ﷺ যদি অন্যদের অনুকরণে এমন করেও থাকেন, তবুও এর দ্বারা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়নি। সীরাত ও শামায়েলে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর স্বভাব থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কারো মাঝে ভালো কিছু দেখলে তা নিজে গ্রহণ করতে এবং অন্যকেও তা গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। আর ইসলামও কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন বলে ঘোষণা করেনি; পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী হওয়ার কারণে গৌরব করেছে। ইসলামের সমস্ত বিধানাবলি পুরাতন, যেগুলোর তাবলীগ ও প্রচার সর্বদাই হযরত আম্বিয়া (আ.) করে এসেছেন। কেবল অতীতের ধর্ম ব্যবসায়ীরা যে বিধানগুলোকে গোপন করে রেখেছিল, ইসলাম সেগুলোর প্রকৃত বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

সুতরাং হতে পারে যে, পূর্বের যমানার অতীতের ধর্মগুলোতে শুরু বা আরম্ভ আল্লাহর নামেই হতো, তারপর উক্ত লোকেরা এ বিসমিল্লাহকে পরিবর্তন করেছিল। পরবর্তী সময়ে ইসলাম এসে অতীতের সে আসল বিধান অনুকরণ করেছ। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩-১৪]

✪ فَضَائِلُ الْبَسْمَلَةِ بِضَوْءِ الْاَحَادِيْثِ

হাদীসের আলোকে বিসমিল্লাহর ফযিলত : হাদীসের আলোকে নিম্নে বিসমিল্লাহর ফযিলত বর্ণনা করা হলো–

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هَرَبَ الْغَيْمُ اِلَى الْمَشْرِقِ وَسَكَنَتِ الرِّيَاحُ وَهَاجَ الْبَحْرُ وَاَصْغَتِ الْبَهَائِمُ بِاٰذَانِهَا وَرُجِّمَتِ الشَّيَاطِيْنُ مِنَ السَّمَاءِ وَحَلَفَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ اَنْ لَا يُسَمّٰى اِسْمُهٗ عَلٰى شَيْءٍ اِلَّا بَارَكَ فِيْهِ.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল হল, তখন মেঘমালা পূর্বাকাশে পলায়ন করল, বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হলো, সাগর-মহাসাগর উত্তাল-উদ্বেলিত হলো, চতুষ্পদ প্রাণী কান লাগিয়ে শুনল, শয়তানদের আকাশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং আল্লাহ তা'আলা তার উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসনের শপথ করে বললেন, যে কোনো কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হবে, অবশ্যই আল্লাহ তাতে বরকত দান করবেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : পৃষ্ঠা ২৮]

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর সংকলিত মুসনাদে আহমদ নামক গ্রন্থে একটি রেওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন। হযরত উমাইর (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সাথে একই ঘোড়ার পিঠে (রাসূলের পেছনে) আরোহণ করেছিলাম। হঠাৎ রাসূল ﷺ ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যান। তখন আমি বললাম– تَعَسَ الشَّيْطَانُ (শয়তান ধ্বংস হোক)। তখন রাসূল ﷺ বললেন–

لَا تَقُلْ تَعَسَ الشَّيْطَانُ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ تَعَسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ بِقُوَّتِيْ صَرَعْتُهٗ وَاِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَتَصَيَّرَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

অর্থাৎ, 'শয়তান ধ্বংস হোক' বলো না। কেননা, তুমি যখন تَعَسَ الشَّيْطَانُ বলবে, তখন সে নিজেকে বড় মনে করবে এবং বলবে যে, আমি আমার ক্ষমতাবলে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলেছি। আর যখন তুমি বিসমিল্লাহ বলবে, তখন সে ছোট হয়ে যাবে; এমনকি মাছির মতো ছোট হয়ে যাবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : পৃষ্ঠা ২৮]

এ হাদীসটি ইবনে মারদুইয়াহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে এবং ইমাম নাসায়ী (র.) স্বীয় হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে উভয়ের ইবারতের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। হাদীসটি হলো–

لَاتَقُلْ هٰكَذَا فَاِنَّهٗ يَتَعَاظَمُ حَتّٰى يَكُوْنَ كَالْبَيْتِ وَلٰكِنْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يَصْغُرُ حَتّٰى يَكُوْنَ كَالذُّبَابَةِ.

অর্থাৎ, এরূপ বলো না। কেননা সে তাতে আত্ম-অহমিকায় ফুলে গৃহ সমতুল্য হয়ে যায়। 'বিসমিল্লাহ' বলো। তাতে সে ছোট হয়ে মাছির মতো হয়ে যায়। [ইবনে কাসীর]

৩. অন্য এক হাদীসে আছে– اِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَذُوْبُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ فِيْ النَّارِ অর্থাৎ, বান্দা যখন বিসমিল্লাহ পাঠ করে, তখন শয়তান ঐরূপ বিগলিত হয়, যেরূপ অগ্নিতে সীসা বিগলিত হয়।

৪. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী আল রাযী আল জাসসাস আল হানাফী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ 'আহকামুল কুরআন'-এ একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন-

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ اِذَا سَمّٰى اللّٰهَ الْعَبْدُ عَلٰى طَعَامِهٖ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مَعَهٗ وَاِذَا لَمْ يُسَمِّهٖ نَالَ مِنْهُ مَعَهٗ.

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দা যদি আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করে, তাহলে শয়তান তা থেকে খেতে পারে না। আর যদি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু না করে, তাহলে শয়তান তার সাথে খাবারে শামিল হয়। [আহকামুল কুরআন, জাসসাস : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭]

৫. অযু-ইস্তিঞ্জা, স্ত্রীসহবাসসহ বিভিন্ন আমলের সময় বিসমিল্লাহ বলার কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا اَتَيْتَ أَهْلَكَ فَسَمِّ اللّٰهَ فَاِنَّهُ اِنْ وُجِدَ لَكَ وَلَدٌ كُتِبَ بِعَدَدِ اَنْفَاسِهٖ وَاَنْفَاسِ ذُرِّيَّتِهٖ حَسَنَاتٌ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি যখন স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা করবে, তখন 'বিসমিল্লাহ' বলবে। কেননা যদি সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে তার এবং তার সন্তান-সন্ততির শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ ছওয়াব লেখা হবে। [ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا.

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন বলে- بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا (আল্লাহর নামে শুরু, হে আল্লাহ! আপনি শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের ভাগ্যে যে সন্তান রেখেছেন তাদের থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন)। কেননা, যদি তাদের ভাগ্যে সন্তানের ফয়সালা হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [বুখারি, মুসলিম]

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَبِيْبِهٖ عُمَرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ তাঁর পালক পুত্র আমর ইবনে আবূ সালামাকে বললেন, 'বিসমিল্লাহ' পড় এবং ডান হাত দ্বারা খাও, আর নিজের কাছাকাছি থেকে খাও। [মুসলিম]

৬. হযরত জিবরাঈল (আ) যখন সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন بِسْمِ اللّٰهِ ও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ -এর তালীম দিয়েছিলেন এবং উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَزَلَ بِهٖ جِبْرِيْلُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرحيم قَالَ لَهٗ جِبْرِيْلُ بِسْمِ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ اِقْرَأْ بِذِكْرِ اللّٰهِ رَبِّكَ وَقُمْ وَاقْعُدْ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى. (لَفْظُ ابْنِ جَرِيْر)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যখন হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতরণ করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন- اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ তিনি আবারো বললেন, আপনি বলুন, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ জিবরাঈল (আ) আরো বললেন, হে মুহাম্মদ! পড়া (লেখা), উঠা-বসা (সব কিছু) আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করুন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৯]

৭. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত–

كَلِمَةُ بِسْمِ اللّٰهِ فَاتِحَةٌ لِلْمَوْثُوْقِ وَمُسْهِلَةٌ لِلْوَعُوْدِ وَمَجْنَةٌ لِلشُّرُوْرِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُوْرِ وَاَمَانٌ يَوْمَ النُّشُوْرِ.

অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কালিমাটি শক্ত বাঁধন খুলে দেয়, কঠিনকে সহজ করে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে ঢাল স্বরূপ, অভ্যন্তরীণ ব্যাধির নিয়ামক এবং পুনরুত্থান দিবসের নিরাপত্তা বিধানকারী।

৮. হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত–

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَةٌ لَمْ تُنْزَلْ عَلٰى نَبِىٍّ غَيْرَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ وَغَيْرِىْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থাৎ, হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যা আমার ও সোলায়মান (আ)-এর ব্যতীত অন্য কারো উপর নাযিল হয়নি। তা হলো– بسم الله الرحمن الرحيم

[তাফসীরে ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮]

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنَ الزَّبَانِيَةِ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَلْيَقْرَأْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا جُنَّةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ وَالقُرْطُبِيُّ وَوَجَّهَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ وَنَصَرَهُ بِحَدِيْثٍ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا لِقَوْلِ الرَّجُلِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِنْ اَجْلِ أَنَّهٗ بِضْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ حَرْفًا. (ابْن كَثِيْر: جا، ص ٢٨)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ জাহান্নামের উনিশ জন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা হতে পরিত্রাণ পেতে চায়, তাহলে সে যেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে। তাতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি হরফের বিনিময়ে এক একজন ফেরেশতার শাস্তির বেলায় ঢালস্বরূপ বানিয়ে দেবেন।

(ইবনে আতিয়্যাহ ও কুরতুবী এমনটি উল্লেখ করেছেন, ইবনে আতিয়্যাহ অন্য একটি হাদীস দ্বারা এ বিষয়টিকে সবল করেছেন। হাদীসটি এই : রাসূল ﷺ বলেন, আমি দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ বলার কারণে ত্রিশের অধিক ফেরেশতা দ্রুত ধাবিত হচ্ছেন। কেননা, এতে রয়েছে ত্রিশের অধিক হরফ।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮]

১০. 'বিসমিল্লাহ'র ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) থেকে বর্ণিত-

عَنْ حَضْرَةِ الرِّسَالَةِ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ عَشَرَةَ اٰلَافِ حَسَنَةٍ وَمَحٰى عَنْهُ عَشَرَةَ اٰلَافِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهٗ عَشَرَةَ اٰلَافِ دَرَجَةٍ.

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার নামে দশ হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ হাজার গুণাহ মাফ করে দেন এবং তার মর্যাদা দশ হাজার স্তর উন্নীত করেন। [দাইলামী]

১১. খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন-

طُوْبٰى لِمَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كَيْفَ يَنْغَمِسُ غَدًا فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে, তার জন্যে বড়ই সুসংবাদ। পরকালীন জীবনে সে বেহেশতের অফুরন্ত নিয়ামতরাজীর মধ্যে কতই না আনন্দের সাথে ডুবে থাকবে।

১২. আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন- لَوْلَا التَّسْمِيَةُ لَهَلَكَ الْبَرِيَّةُ অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহ' শরীফ এরূপ ফযিলতময় যে, তা না হলে বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত।

১৩. হযরত উসমান যুন্নুরাইন (রা.) বলেন- مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ عُمْرِهٖ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ مَعَاصِيْهِ ذَرَّةٌ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সারা জীবনে অন্তত একবার 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে, তার সামান্য পাপও অবশিষ্ট থাকে না।

১৪. 'আসরারুল আবরার' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, বেহেশতে 'জাবালে রহমত' নামক একটি পাহাড় আছে। সে পাহাড়ের চূড়ায় একটি বিশাল সুরম্য নগরী রয়েছে, যার নাম 'বাইতুস সালাম'। সে মনোরম নগরীতে রয়েছে একটি চিত্তাকর্ষক বালাখানা, যার নাম 'কসরুস সুরূর' বা প্রমোদ ভবন। সে বালাখানায় চার সহস্র দরজা বিশিষ্ট একটি বিশেষ কক্ষ রয়েছে, যার নাম 'বাইতুল জালাল'। যারা ভক্তিসহকারে নিয়মিতভাবে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে, তাদেরকে সেই বালাখানা দান করা হবে। সেখান থেকে তারা অনায়াসে সরাসরি যখন ইচ্ছা যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আল্লাহ তা'আলার দীদার হাসিল করবে।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْبَسْمَلَةِ

বিসমিল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান : 'বিসমিল্লাহ' পড়া কখনো ফরজ, কখনো সুন্নত বা মুস্তাহাব। আবার কখনো হারাম, কখনো মাকরূহ।

ফরজ : হালাল পশু জবাইকালে, শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপকালে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা ফরজ।

সুন্নত : অজু করার সময়, খানা খাওয়ার সময়, নামাজে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পূর্বে এবং প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা সুন্নত।

মুস্তাহাব : নামাজে সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরা মিলানোর পূর্বে এবং উঠা, বসা, চলা-ফেরার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা মুস্তাহাব। ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ সর্বকাজে বিসমিল্লাহ বলা জরুরি মনে করেন। তবে অধিকাংশ আলেম সর্বকাজে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কাজটি মুস্তাহাব হলেও তার উপকারিতা অপরিসীম। সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো, এর কারণে সব কিছুতে খায়ের-বরকত হয়, শয়তান প্রতিহত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়।

[মাআরিফুল কুরআন: মুফতি মুহাম্মদ শফী র.]

হারাম : হারাম কাজ করার সময়, চুরি ইত্যাদি নাজায়েজ কাজ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া হারাম। অনুরূপ জুনুবী ব্যক্তির (যার উপর গোসল ফরজ) তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা হারাম। একইভাবে হায়েয অবস্থায় ও স্ত্রীসহবাসকালে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা হারাম।

উল্লেখ্য, কুরআন- হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হারাম কাজ, যেমন– শরাব পান করা, যেনা ও চুরি করা ইত্যাদি, করার সময় যিকর ও তেলাওয়াতের নিয়তে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়। আল্লামা শামী (রা.) বাযযাযিয়ার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন- يَكْفُرُ مَنْ يَسْمَلَ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ كُلِّ حَرَامٍ قَطْعِيٍّ الْحَرَامِ الخ

অর্থাৎ, সন্দেহাতীত নিশ্চিত হারাম কাজ করার সময় যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে, সে কাফের হয়ে যায়। [শরহে বাসমালা]

মাকরূহ : সূরা 'বারাআত' তেলাওয়াত করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা মাকরূহ, যদি পূর্বের সূরার সাথে মিলিয়ে তেলাওয়াত করা হয়। আর যদি সূরা 'বারাআত' থেকেই তেলাওয়াত শুরু করা হয়, তখন 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা মাকরূহ নয়। অপবিত্র স্থানে, লজ্জাস্থান অনাবৃত করার সময়, হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট পান করার সময়, রসূন পিঁয়াজ বা অন্য কোনো দুর্গন্ধময় জিনিস খাওয়া বা ব্যবহার করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা মাকরূহ।

আল্লামা শামী (র.) লিখেছেন–

تُكْرَهُ عِنْدَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ اَوْ مَحَلِّ النَّجَاسَاتِ وَفِيْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَرَاءَةِ اِذَا وَصَلَ قِرَاءَتُهَا بِالْاَنْفَالِ الخ.

✪ حُكْمُ الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ

প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠের হুকুম : সূরা ফাতেহার শুরুতে অর্থাৎ, প্রতি রাকাতের শুরুতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এক বর্ণনামতে, বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। আরেক বর্ণনামতে, ওয়াজিব। তবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) আল-বাহরুর রায়েকে বলেছেন, সুন্নত হওয়ার মতটাই ইমাম সাহেব থেকে প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ হানাফী আলেমের মতে; বরং আল্লামা ইউসুফ বানূরী (র)-এর মতে অধিকাংশ হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের মতে, প্রতি রাকাতের শুরুতে সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত; ওয়াজিব নয়।

✪ حُكْمُ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّوْرَةِ

সূরা ফাতেহা ও সূরা মিলানোর মাঝে বিসমিল্লাহ পাঠের হুকুম : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, নামাজে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। আর শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয, তবে সুন্নত নয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতটির সাথে হেদায়া ও আল-বাহরুর রায়েকের গ্রন্থকারদ্বয় আস্তে কেরাতের নামজের শর্ত লাগিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। 'মুস্তাশফা' গ্রন্থে এর উপরই ফতোয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তিকে সহীহ বলা হয়েছে।

আল-বাহরুর রায়েকে বিবৃত হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যটি হলো সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে। তবে পড়ে নিলে সর্বসম্মতভাবে মাকরূহ হবে না। এজন্যেই 'যখীরা' ও 'মুজতাবা' গ্রন্থদ্বয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়ে নিলে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে, তা উত্তম; চাই সূরাটি সশব্দে পাঠ করা হোক অথবা নিঃশব্দে পাঠ করা হোক। আল্লামা ইবনে হুমাম এবং তাঁর শিষ্য হালবী (র.) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [মাআরিফুস সুনান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৭৩]

✪ مَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ فِيْ جُزْئِيَّةِ الْبَسْمَلَةِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ

বিসমিল্লাহ কুরআন বা সূরা ফাতেহা ও অন্যান্য সূরার অংশ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য

ক. ইমাম মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র.) বলেন, সূরাসমূহের শুরুতে উল্লিখিত বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ নয়। নামাজে সূরাসমূহের শুরুতে বিসমিল্লাহ আস্তে বা জোরে পড়া মাকরূহ।

দলিল–

১. ইমাম মালেক (র.) সেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে নবী করীম ﷺ-এর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে নামাজে কেরাত শুরুর কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. তেমনিভাবে বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে না পড়া সংক্রান্ত হাদীস দ্বারাও তিনি দলিল পেশ করেন।

৩. তিনি আরো বলেন, সহীহ হাদীস অনুযায়ী সূরা আলাক শুরু হয়েছে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ থেকে। যদি বিসমিল্লাহ কুরআন বা সূরাসমূহের অংশ হতো, তাহলে সূরা আলাকের শুরুতেও বিসমিল্লাহ উল্লিখিত হতো।

খ. **ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিসমিল্লাহ সূরা বারাআত বা তওবা ব্যতীত প্রতিটি সূরার অংশ। এটাই তাঁর বিশুদ্ধতম মত। তাঁর দ্বিতীয় উক্তিমতে, বিসমিল্লাহ শুধু সূরা ফাতেহার অংশ। তবে এ মতটি তাঁর মাযহাবে অগ্রগণ্য নয়।

দলিল–

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) সেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে নামাজে সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যদি বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ না হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ সশব্দে পড়তেন না।

২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। তাতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ-এর উপর সূরা কাওসার নাযিল হলে তিনি বিসমিল্লাহসহ তা পাঠ করেন। এ হাদীসটি মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

৩. শাফেয়ী মাযহাবের তৃতীয় দলিল হলো, কুরআনের সমস্ত মাসহাফ বা কপিতে সূরা বারাআত ব্যতীত প্রতিটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে।

গ. **ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত :** ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, বিসমিল্লাহ কুরআনের সমষ্টির এক অংশ, যা দুই সূরার মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। তবে তা সূরা ফাতেহা বা অন্য কোনো সূরার অংশ নয়। ইমাম আহমদ (র.) থেকে উপরের তিনটি মাযহাবের ন্যায় তিনটি উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

দলিল–

১. হানাফীগণ প্রথমত সেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে নামাজে বিসমিল্লাহ সশব্দে না পড়ার কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। যদি বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ বা আয়াত হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ অন্যান্য আয়াতের ন্যায় বিসমিল্লাহও সশব্দে পড়তেন।

২. তা ছাড়া বাবের হাদীসেও বিসমিল্লাহ-এর পরিবর্তে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে কেরাত শুরুর কথা বর্ণিত হয়েছে, এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ বা আয়াত নয়; অন্যথায় বিসমিল্লাহ পাঠ করার মধ্য দিয়ে কেরাত শুরু করতেন।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

ইমাম তিরমিযী ফাযায়েলে কুরআনে এই হাদীসটি বর্ণনার পর বলেছেন, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ; আর সূরা মুলকের আয়াত ৩০টি তখনই হবে যদি বিসমিল্লাহকে তার অংশ সাব্যস্ত করা না হয়; নতুবা বিসমিল্লাহকেও তার অংশ সাব্যস্ত করা হলে আয়াত সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১।

৪. হানাফীদের আরেকটি দলিল হলো কুরআনের আয়াত– وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ سَبْعَ الْمَثَانِى-এর ব্যাখ্যা হলো সূরা ফাতেহা, যা সাতটি আয়াত সংবলিত। সুতরাং বিসমিল্লাহকে সূরার অংশ বা আয়াত মেনে নিলে সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা হবে ৮।

৫. মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীসে কুদসী বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হোয়ায়রা (রা.) বলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الخ.

এই দীর্ঘ হাদীসে কুদসীতে সূরা ফাতেহার বিস্তারিত বিবরণ এবং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার কথোপকথন উঠে এসেছে। এই সূরাটির সূচনা হয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ থেকে। এতে বোঝা যাচ্ছে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ বা আয়াত নয়, যেরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলে থাকেন। এই হাদীস হানাফীদের পক্ষে একটি মজবুত প্রমাণ। এই হাদীসে অন্য কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

৬. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (رواه أبو داود في سننه في باب من جهر بها)

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে– لَا يَعْرِفُ اِنْقِضَاءَ السُّوْرَةِ. (رواه أبو داود والحاكم)

আনওয়াহ শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা যেভাবে বিসমিল্লাহ অন্যান্য সূরার অংশ না হওয়া প্রমাণিত হয়, তেমনিভাবে সূরা ফাতেহার অংশ না হওয়াও বোঝা যাচ্ছে। কারণ, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহাসহ অনেক সূরা নাযিল হওয়ার পর বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছে দুই সূরার মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্যে।

এ জাতীয় প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহারও অংশ বা আয়াত নয় এবং অন্য কোনো সূরারও অংশ নয়; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র আয়াত, যা দুই সূরার মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্যে নাযিল করা হয়েছে। যাকে হানাফীগণ جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوْعِ الْقُرْآن বা কুরআনের সমষ্টির এক অংশ বলে থাকেন।

[মাআরিফুস সুনান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৮০: দরসে তিরমিযী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৫-৫০৮]

اَلْجَوَابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ

ইমাম মালেক (র)-এর দলিলের জবাব

১. ইমাম মালেক (র)-এর প্রথম দলিলের জবাব হলো, নবী করীম ﷺ সশব্দে কেরাত পাঠ শুরু করেছেন الحمد لله الخ দ্বারা। আর বিসমিল্লাহ পড়েছেন নিঃশব্দে সানা ও আউযুবিল্লাহ এর সাথে।

২. বিসমিল্লাহ সশব্দে না পড়ার দ্বারা একথা আবশ্যক হয় না যে, তিনি মোটেই বিসমিল্লাহ পড়েননি; বরং সহীহ হাদীসসমূহে একথা প্রমাণিত যে, নবী করীম ﷺ বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়তেন। যেরূপ ইতঃপূর্বে সবিস্তারে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. সূরা আলাকের শুরুতে প্রথমে বিসমিল্লাহ নাযিল করা হয়নি; বরং পরে নাযিল করা হয়েছে। তাই প্রথমে সূরা আলাকের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয়নি। যেরূপ কুরআনের বাকি অংশ পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

[নাসবুর রায়া : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৯]

اَلْجَوَابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাব

১. এসব হাদীস দুর্বল, এমনকি অনেকটা মাওযূ' পর্যন্ত। এগুলোর অনেকটাই শিয়া ও রাফেযীদের গড়া। তাই এসব হাদীস বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দ্বিতীয় দলিলের জবাব হলো, নবী করীম ﷺ সূরার অংশ হওয়ার কারণে সূরা কাওসারের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করেননি; বরং তিনি তেলাওয়াত শুরুর উদ্দেশ্যে বিসমিল্লাহ পাঠ করেছিলেন।

৩. প্রতি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত থাকা দ্বারা সেটি কুরআনের অংশ হওয়া প্রমাণিত হয়; প্রতি সূরার অংশ হওয়া প্রমাণিত হয় না। এর কারণেই বিসমিল্লাহ স্বতন্ত্র লাইনে ভিন্ন খতে লিখিত হয়ে থাকে।

✪ اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ وَعَدَمِهِ فِي الصَّلَاةِ

নামাজে সশব্দে ও নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মতানৈক্য : এই বাবের মূল মাসয়ালা হচ্ছে, সূরা ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া যাবে কি না এবং পড়া হলে সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে পড়া যাবে কিনা, তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ফরজ নামাজে বিসমিল্লাহ পড়া যাবে না। সশব্দেও না এবং নিঃশব্দেও না। তবে নফল ও তারাবীহ নামাজে পড়ার অবকাশ রয়েছে।

দলিল–

১. ইমাম মালেক (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) -এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। সেই হাদীসে তিনি তাঁর ছেলেকে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে তিনি বিদয়াত বলেছেন। তিনি বলেন-

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا، قَالَ تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

২. হযরত আনাস (রা.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانَ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : সূরা ফাতেহা এবং অন্যান্য সূরার শুরুতে জাহরী নামাজে বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়া সুন্নত।

দলিল–

ইমাম শাফেয়ী (র.) বিসমিল্লাহ সশব্দে বলার পক্ষে অনেক হাদীস পেশ করেছেন। তবে সেগুলোর কোনোটিই সহীহ ও সরীহ নয়। হাফেয যাইলায়ী (র.) সবিস্তারে এসব রেওয়ায়াতের খণ্ডন করেছেন। এখানে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দলিল এবং এগুলোর উপর পর্যালোচনা পেশ করা হলো–

১. নুয়াইম আল- মুজাম্মেলের হাদীস। তিনি বলেন-

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتّٰى قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ، قَالَ : آمِيْن، وَفِيْ آخِرِهِ : فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ . (رواه النسائي في سُنَنِه)

২. হাকেম মুস্তাদরাকে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৩) আনাস (রা.) থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

صَلّٰى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِلسُّوْرَةِ الَّتِيْ بَعْدَهَا حَتّٰى قَضٰى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يُكَبِّرْ حِيْنَ يَهْوِيْ حَتّٰى قَضٰى ذٰلِكَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ : يَا مُعَاوِيَةُ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيْتَ؟ أَيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ؟ وَأَيْنَ التَّكْبِيْرُ إِذَا خَفَضْتَ وَرَفَعْتَ؟ فَلَمَّا صَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِلسُّوْرَةِ الَّتِيْ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا.

ইমাম হাকেম এ হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন- صحيح على شرط مسلم; দারাকুতনী এ হাদীসটি বর্ণনার পর বলেছেন- رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ (এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য)। ইমাম শাফেয়ী (র.) সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠের বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যে এ হাদীসটির উপর নির্ভর করেছেন। খতীবে বাগদাদী (র.) বলেন- هُوَ اَجْوَدُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيْ هٰذَا الْبَابِ

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আরেকটি দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.(رواه الحاكم في المستدرك)

গ. **ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (র)-এর অভিমত :** সকল নামাজে সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নত।

দলিল-

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (رواه البخاري)

তবে এই হাদীসে বর্ণিত তাঁদের পিছনে নামাজে বিসমিল্লাহ শুনতে না পাওয়ার মর্ম এটা নয় যে, তারা বিসমিল্লাহ পড়তেন না। যার ফলে তিনি বিসমিল্লাহ শুনতে পেতেন না। কারণ, নাসায়ীর শব্দে এসেছে-

لَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (মাআরিফুস সুনান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২)

এর উদ্দেশ্য হলো, সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি নফী করা। শুধু বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার বিষয়টি নফী করা উদ্দেশ্য নয়।

২. হযরত আনাস (রা.) থেকেই আরো সাতটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন নামাজে সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন না।

١- كَانُوْا لَا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (أَيْ جَهْرًا). (أَحْمَد : ٢٧٨/٣٠)

٢- فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُوْلُ أَوْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (أَحْمَدَ : ٢٧٧/٣)

٣- فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَءُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. طَحَاوِي : (١١٩- بيهقي : ٥٢/٢)

٤- فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. طَحَاوِي : (١١٩، نسائي ١٤٤)

٥- فَكَانُوْا لَا يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ اِلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (أحمد : ١١/٩/٣، دار قطني : ١١٩)

٦- فَكَانُوْا يُسِرُّوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. طحاوي : (١١٩)

٧- فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقُرْآنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. (أحمد : ١٦٧/٣)، وَفِي- الصِّحَاحِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا الْقِرَاءَةُ بَدْلَ الْقُرْآن. (نَصْبُ الرَّايَةِ : ٣٣٠/١ مع حاشيته)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) -এর হাদীসও হানাফীদের একটি দলিল। তবে এই হাদীসের উপর আপত্তি তোলা হয় যে, এতে اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلْ একজন মাজহুল বা অজ্ঞাত রাবী।

এর জবাব হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) -এর ছেলে অজ্ঞাতনামা নন এবং অপরিচিতিও নন। তাঁর নাম হলো ইয়াযিদ। আর তাঁর থেকে তিনজন সেকা রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন, ১. আবূ নুয়ামা। ২. আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা এবং ৩. আবূ সুফিয়ান আস-সাদী। এজন্যেই ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৪. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- اَلْجَهْرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قِرَاءَةُ الْاَعْرَابِ [মাআরিফুস সুনান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৭]

جَوَابُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَدِلَّةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ

ইমাম মালেক (র)-এর দলিল সম্পর্কে হানাফীগণের জবাব : হানাফীদের পক্ষ থেকে ... وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ এবং كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ .... এই দুই হাদীসের জবাব হলো এই যে, এখানে বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়ার নফী হয়েছে। তবে নিঃশব্দে পড়া নফী করা হয়নি। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর ছেলে (ইয়াযিদ) বলেন- سَمِعَنِيْ اَبِيْ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ اَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ- আমার পিতা আমাকে নামাজে বিসমিল্লাহ বলতে শুনেছেন। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তিনি জোরে বিসমিল্লাহ পাঠ করেছিলেন; নতুবা হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) শুনতে পেতেন না। আর এই জোরে পড়ার প্রতিবাদেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) বলেছেন- اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ অর্থ- হে প্রিয় বৎস, বিসমিল্লাহ জোরে পড়াটা বিদ'আত। সুতরাং নিজেকে বিদ'আত থেকে দূরে রাখো। তাই হাদীসে উল্লিখিত فَلَا تَقُلْهَا-এর অর্থ হবে- فَلَا تَجْهَرْ بِهَا; কারণ; এই রেওয়ায়াতেই কোনো কোনো সূত্রে فَلَا تَقُلْهَا-এর পরিবর্তে فَلَا تَجْهَرْ بِهَا বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া مُطْلَق تَسْمِيَة পড়া অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাফেয যাইলায়ী (র.) নাসবুর রায়ার ১ম খণ্ডে ৩২৭ থেকে ৩৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ مُسْتَدِلَّاتِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর পেশকৃত দলিলসমূহের জবাব

১. নুয়াইম আল-মুজাম্মিলের হাদীসের (.... صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ) বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

ক. এই হাদীসটি معلول; কারণ, আবূ হুরায়রা (রা.) -এর সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে ৮০০ ছাত্র রয়েছেন। তবে নুয়াইম আল-মুজাম্মেল ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ছাত্র জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা বর্ণনা করেননি। এজন্যেই ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহদ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা বর্ণনা করেননি।

খ. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নামাজে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন। যার ফলে আস্তে পাঠ করা সত্ত্বেও তিনি শুনতে পেয়েছেন। অতএব, এই হাদীস দ্বারাও শুধু বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। জোরে পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। [নাসবুর রায়া : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৩৭]

২. হাফেয যাইলায়ী (র.) মুসতাদরাকে হাকেমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত (صَلّٰى مُعَاوِيَةُ ...) এই হাদীসটির বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

ক. এই হাদীসটির مَدَار اِنْشَاء হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান ইবনে খাইসাম। তিনি যদিও মুসলিমের একজন রাবী বটে, তবে তিনি বিতর্কিত রাবী। ইবনে মাঈন বলেন- لَيِّنُ الْحَدِيْث, اَحَادِيْثُهُ غَيْرُ قَوِيَّة নাসায়ী বলেছেন- لَيْسَ بِالْقَوِيِّ; দারাকুতনী বলেছেন- ضَعِيْفٌ لَيِّنُوْه; ইবনে মাদীনী বলেছেন- مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ
মোটকথা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান একজন বিতর্কিত রাবী। সুতরাং তিনি একাকী যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য।

খ. এই হাদীসের সনদ ও মতনে ইযতিরাব ও ইখতিলাফ রয়েছে।

গ. এ হদীস মদিনাবাসী নতুন-পুরাতন ওলামায়ে কেরামের মাযহাবের পরিপন্থি। তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রবক্তা নন। [নাসবুর রায়া : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৪]

৩. হাফেয় যাইলায়ী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) -এর (عَنِ ابْنِ عَبَّاس ....) এই হাদীসেরও বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

ক. এই হাদীসের বিশুদ্বতার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। এরূপ সনদে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হতে পারে না। তা ছাড়া এর বিপরীতে অনেক হাদীস রয়েছে।

খ. এই হাদীসের প্রসিদ্ধ মতনে اِسْتِفْتَاح শব্দ রয়েছে; جَهْر নয়। অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ বিসমিল্লাহ দিয়ে নামাজ শুরু করতেন; বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়ার দ্বারা নয়।

গ. তা ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ বিপরীত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন- اَلْجَهْرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قِرَاءَةُ الْاَعْرَابِ (নামাজে সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়া মুর্খ বেদুইনের পাঠ।) [নাসবুর রায়া : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৭]

✪ طَرِيْقُ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ

দু'সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়ার পদ্ধতি : দু'সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়ার চারটি পদ্ধতি হতে পারে-

১. وَصْلِ كُل ২. وَصْلِ كُل ৩. فَصْلِ اَوَّل وَصْلِ ثَانِى ৪. فَصْلِ ثَانِى وَصْلِ اَوَّل;

এ চার প্রকারের প্রথম তিন প্রকার জায়েজ এবং শেষ প্রকারটি নাজায়েজ।

✪ رَسْمُ الْخَطّ

লিখন পদ্ধতি : بِسْمِ اللّٰهِ বাক্যটির শব্দগুলোর লিখন পদ্ধতি একটু ভিন্ন। নিম্নে সেগুলো কারণসহ আলোচনা করা হলো–

১. بِسْم লেখার ক্ষেত্রে اِسْم শব্দটির আলিফ অক্ষরটি লেখা হয় না। ব্যবহারের আধিক্যের কারণে সহজতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আলিফটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফেলে দেওয়া এই আলিফটির দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে بِسْمِ اللّٰهِ-এর ب অক্ষরটির মাথাকে কিছুটা লম্বা করে লেখা হয়।

২. উচ্চারণ হিসেবে اَللّٰهُ শব্দটির স্বাভাবিক বানান الٰلٰه হওয়া উচিত ছিল। اللّٰه শব্দটির এই লিখনপদ্ধতির কারণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আতিয়্যা উন্দুলুসী (র.) বলেন, اَللّٰهُ শব্দটির বানানের সাথে মুশরিকদের দেবতা اَللَّات-এর বানানোর সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই ل ও ه-এর মধ্যবর্তী আলিফটি ফেলে দিয়ে লিখনপদ্ধতিতে পার্থক্য আনা হয়েছে। আর সেই আলিফটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে খাড়া যবর দ্বারা।

৩. الرَّحْمٰنُ শব্দটি উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত ছিল- اَلرَّحْمَانُ ; কিন্তু শব্দটি যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না, তাই اللّٰه শব্দটির অনুকরণে এখানে م ও ن-এর মধ্যবর্তী আলিফকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই উহ্য আলিফের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে م-এর উপর খাড়া যবর যোগ করা হয়েছে। তাছাড়া মিথ্যা নবীর দাবীদার মুসায়লামা কাযযাব নিজেকে رَحْمَانُ الْيَمَامَة দাবি করেছিল। এ পরিবর্তনের দ্বারা তার সেই নাম থেকে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

✡ **اَسْم :** শব্দটির অর্থ হলো– নাম, পরিচয়। শব্দটি মোট পাঁচভাবে উচ্চারণ করা যায়। যথা–

১. اِسْم (আলিফের যের সহকারে)। এটাই প্রচলিত।
২. اُسم (আলিফের পেশসহকারে)।
৩. سِم (সীনে যেরসহকারে ও আলিফবিহীন।)
৪. سُم (সীনে পেশসহকারে ও আলিফবিহীন।)
৫. سَمّى (هَدٰى-এর ওযনে।)

আরবি ভাষায় ১০টি শব্দ রয়েছে, যেগুলোর প্রথম অক্ষর সুকূনবিশিষ্ট। যবর ফলে শব্দগুলো বাক্যের শুরুতে আসলে উচ্চারণের সুবিধার্থে একটি হামযা বৃদ্ধি করা হয়। আর বাক্যের মাঝখানে আসলে হামযার উচ্চারণ ছাড়াই পড়া হয়। اسم শব্দটি সেই দশটি শব্দের একটি।

اِسْم-এর مُشْتَق مِنْه সংক্রান্ত মতবিরোধ : اِسْم শব্দটি مُشْتَق اِسْمٍ; তার উৎস নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ আছে।

ক. কুফীগণের মতে, শব্দটি سِمَةٌ থেকে নির্গত। سِمَةٌ অর্থা হলো– চিহ্ন, নিদর্শন।

খ. বসরীগণের মতে, শব্দটি سِمْوٌ থেকে নির্গত। سِمْوٌ অর্থ– উচ্চতা, মর্যাদা। কারণ, শব্দটির বহুবচন হলো– أَسْمَاءٌ এবং তাসগীর হলো– سُمَيٌّ; যে কোনো শব্দের বহুবচন ও তাসগীরের রূপ দ্বারা শব্দের উৎস বোঝা যায়। শব্দটি سِمَةٌ থেকে নির্গত হলে তার বহুবচন ও তাসগীর হওয়া উচিত ছিল যথাক্রমে- أَوْسَامٌ ও وَسِيْمٌ;

আলেমগণ বিভিন্ন যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উভয় অভিমতের একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন– আল্লামা কুরতুবী বসরীগণের অভিমতকে সঠিকতম বলেছেন। তবে মহীউদ্দীন আদদরবেশ إِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ وَبَيَانُهٗ গ্রন্থে বলেন, অর্থগত দিক বিবেচনায় উভয় মতই সঠিক। [ইরাবুল কুরআন ওয়া বায়ানুহু : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩]

✡ **اللّٰهُ :** শব্দটি জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর তা'আলার নাম।

اللّٰهُ শব্দটির প্রকার সংক্রান্ত মতভেদ : আল্লাহ শব্দটি اِسْم مُشْتَق নাকি اِسْم جَامِد; এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।

ক. ইমাম সীবওয়াইহের অভিম হলো اللّٰه শব্দটি اِسْم مُشْتَق;

খ. অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো اللّٰه শব্দটি اِسْم جَامِد; কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয়। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, নাহুবিদ খলীল (র.) প্রমুখ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম সীবাওয়াইহের একটি অভিমতও এটাই।

اللّٰهُ শব্দটির عَلَمْ কিংবা صِفَة হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা : আল্লাহ শব্দটি কি اِسْمُ الصِّفَة নাকি মহান সত্তার عَلَم এ ব্যাপারেও আলেমগণের সামান্য মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি গুণবাচক। তবে ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী, সীবাওয়াইহ (র)-সহ অধিকাংশ আলেমগণের অভিমত হলো, শব্দটি عَلَم;

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْم-এর ب-টি হরফুল জার। ب-টি এখানে এসেছে اِلْصَاق (সংযুক্তি) অথবা اِسْتِعَانَة (সহায়তা গ্রহণ)-এর অর্থ প্রদানের জন্যে। اِسْم শব্দটি মুযাফ ও اَللّٰه এই মহান শব্দটি মুযাফ ইলাইহি। الرَّحْمٰن ও الرَّحِيْم শব্দ দুটি اللّٰه শব্দটির দুই সিফাত। এই মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হয়েছে উহ্য ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের সাথে।

بِسْمِ اللّٰهِ-এর مُتَعَلِّق সম্পর্কে মতপার্থক্য : بِسْمِ اللّٰهِ-এর পুরো বাক্যটির তারকীব সম্পর্কে তেমন কোনো মতপার্থক্য না থাকলেও بِسْمِ اللّٰه-এর مُتَعَلِّق সম্পর্কে নাহুবিদগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা–

১. ب-এর مُتَعَلّق-টি اِسْم হবে অথবা فِعْل হবে, اِسْم হয়ে اِسْم فَاعِل - اِسْم مَفْعُول প্রভৃতি হতে পারে। فِعْل হয়ে اَمْر حَاضِر - مُضَارِع - مَاضِى হতে পারে।

২. اِسْم বা فِعْل হয়ে উভয়টি عَامْ হবে অথবা خَاص হবে।

৩. اِسْم বা فعل-টি مُقَدّم হবে অথবা مُؤَخَّر হবে।

নিম্নে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো–

১. **مُتَعَلِّق-টি اِسْم বা فِعْل হওয়া প্রসঙ্গে :** ب-এর متعلق-টি اسم হওয়া উত্তম নাকি فعل হওয়া উত্তম এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. ইমাম রাযী (র.) ও বসরী নাহভীদের মতে, اسم হওয়া উত্তম। কেননা اسم সাধারণ دَوَام ও ثُبُوْت-এর অর্থ প্রদান করে।

খ. ইমাম বায়যাভী (র.) ও কূফী নাহভীদের মতে, فعل হওয়া উত্তম। কেননা- ১. ফেয়েলের অর্থে تَجَدُّد-এর অর্থ পাওয়া যায়। ২. اسم উহ্য মানলে উহ্য শব্দও বেশি মানতে হয়।

২. **مُتَعَلّق-এর শব্দটি عَام বা خَاص হওয়ার প্রসঙ্গে :** متعلق-এর শব্দটি عام হবে না خاص, সে সম্পর্কেও নাহুবিদগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. مُتَعَلِّق-এর শব্দ সম্পর্কে একদল নাহুভিদের অভিমত হলো, তা عَلم হওয়া উত্তম। অধিকাংশ আলেমের অভিমত এটিই। তাদের যুক্তি–

১. বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, উহ্য বাক্যটি عام এসেছে। যথা- كُلُّ أَمْرٍ ذِى بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ যা প্রমাণ করে যে, عام হওয়া উত্তম।

২. যেসব ظَرْف বা جَار مَجْرور-এর مُتَعَلّق উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ যদি ظَرْفِ مُسْتَقِر হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো- متعلق-টি عام হওয়া। সে হিসেবে بِسْمِ اللّٰه-এর جَار مَجْرُوْر যেহেতু ظرفِ مُسْتَقِر হয়েছে সেহেতু عام উহ্য মানাই উত্তম।

খ. ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, আল্লামা যামাখশারী ও ইমাম বায়যাভী (র)-সহ একদল আলেমের মতে, متعلق-টি خاص হওয়া উত্তম। তাদের যুক্তি خاص মেনে নেওয়ার পিছনে করিনা বা বাহ্যিক নিদর্শন থাকে। বিসমিল্লাহ বলে যে কাজটি শুরু করা হচ্ছে, সে কাজটি সাক্ষ্য বহন করে পরবর্তী فعل-টি কী হওয়া উচিত। যেমন– কুরাআন তেলাওয়াত উদ্দেশ্য হলে اِقْرَأ হবে। খানা খাওয়ার উদ্দেশ্য হলে- آكُلُ হবে ইত্যাদি, পক্ষান্তরে عام মানার পিছনে কোনো বাহ্যিক কারণ থাকে না। তাই خاص মানা উত্তম।

৩. **متعلق-এর অবস্থান সংক্রান্ত মতবিরোধ :** একইভাবে متعلق-টি بِسمِ اللّٰهِ-এর আগে বসবে নাকি পরে, এ ব্যাপারেও আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. এ ব্যাপারে কূফা ও বসরাবাসী অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, متعلق-টি –চাই তা اسم হোক অথবা ফে'ল– অগ্রবর্তী হওয়া উত্তম। যেমন– اِبْتِدَائِى بِسْمِ اللّٰهِ অথবা اِبْتَدَأْتُ بِسْمِ اللّٰهِ; কারণ عامل-টি معمول-এর উপর مقدم হওয়া বাক্যের স্বাভাবিক গঠন। যেমন– কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে- اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

খ. কাযী বায়যাভী, আল্লামা ইবনে জারীর, আল্লামা ইবনে কাসীর ও আল্লামা যামাখশারী (র)-সহ মুহাক্কিক আলেমগণের মতে, متعلق-টি পশ্চাদবর্তী হওয়াই উত্তম। যেমন- اِبْتِدَائِي بِسْمِ اللّٰهِ ..... অথবা اِبْتَدْأْتُ بِسْمِ اللّٰهِ .....; কারণ-

১. এ অবস্থায় আল্লাহর নামের মাঝে تَخْصِيْص ও حَصْرْ সৃষ্টি হয়। কারণ, বালাগাতের একটি নিয়ম আছে-
اَلتَّقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيْرُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ وَالتَّخْصِيْصَ وَكَذَا التَّاخِيْرُ مَا حَقُّهُ التَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ الحَصْر والتَّخْصِيْص.

২. তাছাড়া কুরআন, হাদীস ও আরবদের ব্যবহারে এর বহু উদাহরণ রয়েছে-

ক. بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

খ. بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا

গ. بِاِسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ

بِسْمِ اللّٰهِ-এর তারকীবগত অবস্থান : بِسْمِ اللّٰهِ-এর তরকীবগত অবস্থান সম্পর্কে বসরী ও কুফী নাহুবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে-

ক. **বসরীগণের অভিমত :** بِسْمِ اللّٰهِ-এর متعلق-টি ইসম হবে। অতএব بِسْمِ اللّٰهِ-টি কোনো উহ্য মাসদারের খবর হিসেবে رَفْع-এর স্থানে রয়েছে। মূলরূপ হবে- اِبْتِدَائِي بِسْمِ اللّٰهِ ..... অথবা اِبْتِدَائِي بِسْمِ اللّٰهِ

খ. **কুফীগণের অভিমত :** بِسْمِ اللّٰهِ-এর متعلق-টি ফে'ল হবে। অতএব, بِسْمِ اللّٰهِ ঐ ফে'লের মুতা'আল্লিক তথা মাফউল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। মূলরূপ হলো- اِبْتَدَأْتُ بِسْمِ اللّٰهِ ..... الخ অথবা اِبْتَدَأْتُ بِسْمِ اللّٰهِ .....

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহ-এর মুতা'আল্লাক : بِسْمِ اللّٰهِ-এর متعلق-টি ফে'ল মুযারে হতে পার। তখন তা اَلتَّجَدُّدُ الِاسْتِمْرَارِيُّ-এর অর্থ প্রদান করবে। আর যদি بِسْمِ اللّٰهِ-এর متعلق ইসম ধরা হয় তাহলে সেটা اَلدَّيْمُوْمَةُ ও اَلثُّبُوتُ-এর অর্থ প্রদান করবে।

إِيْجَازُ الْقَصْرِ : بِسْمِ اللّٰهِ অংশটিতে عام-কে خاص-এর দিকে মুযাফ করার দ্বারা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকে إِيْجَازُ القَصْر বলা হয়।

اَلْاِسْتِعَارَةُ وَالْمَجَازُ : بِسْمِ اللّٰهِ-এর ب-কে যদি اِسْتِعَانَة (সাহায্য প্রার্থনা)-এর অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে বাক্যটিতে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَة تَبْعِيَة হবে। আর যদি ب-টি إِلْصَاق (বিশিষ্টতা)-এর অর্থে ধরা হয় তাহলে বাক্যটিতে مَجَاز রয়েছে। এ مَجَاز-এর ক্ষেত্রে عَلَاقَة (সূত্র) হলো- مَحَلِّيَة;

✪ فَلْسَفَةُ الْبَسْمَلَة

বিসমিল্লাহ-এর দর্শন : সকল সৃষ্টি ও মানুষের তিনটি অবস্থা।

১. সৃষ্টির পূর্বে অস্তিত্বহীনতার অবস্থা।

২. পার্থিব জীবনে থাকার অবস্থা।

৩. পরকালের চিরস্থায়ী অবস্থা।

বিসমিল্লাহ-এর তিনটি শব্দ দ্বারা ঐ তিনটি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। اللّٰه শব্দের মধ্যে প্রথম অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, তিনিই সকল কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

الرَّحْمٰن শব্দটি মুবালাগার সীগাহ। এর মধ্যে الرَّحِيْم-এর তুলনায় অক্ষর ও অর্থ উভয়টিই বেশি; সুতরাং এর ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত হবে দুনিয়ার সকল মুসলমান, কাফের, বাধ্য ও অবাধ্য সবাই। তাই দুনিয়াতে দয়া ও রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি। الرَّحِيْم শব্দটিও মুবালাগার সীগাহ। তবে এর মধ্যে الرَّحْمٰن-এর তুলনায় অক্ষরও কম এবং অর্থও কম। সুতরাং পরকালের রহমত যদিও বেশি ও বড় হবে, কিন্তু দয়া ও রহমত পাওয়ার পাত্র হবে কম। কারণ, শুধু মুমিন ব্যক্তিরাই রহমতপ্রাপ্ত হবেন। মোটকথা, দুনিয়াতে রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি এবং পরকালে রহমত বঞ্চিতদের সংখ্যা বেশি হয়। এ জন্যেই يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ الاٰخِرَةِ বলা হয়। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪]

রুকূ' : ১

ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمُتَّقِيْنَ مَعَ ذِكْرِ أَحْوَالِ الْكَافِرِيْنَ وَعِقَابِهِمْ

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য এবং কাফেরদের অবস্থা ও তাদের পরিণতির বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হওয়ার বর্ণনা
- ❑ মুত্তাকীদের গুণাবলির বর্ণনা
- ❑ মুত্তাকীদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণামের বর্ণনা
- ❑ কোন কোন কাফেরদেরকে সতর্ক করা নিষ্ফল
- ❑ কাফেরদের ঈমান না আনার কারণ
- ❑ কাফেরদের ভবিষ্যৎ পরিণামের বর্ণনা

١. ﴿الٓمٓ﴾ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ.

১. আলিফ লাম মীম এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

❖ مَبْحَثٌ فِي الْحُرُوْفِ الْمُقَطَّعَاتِ

হুরুফে মুকাত্তা'আত সংক্রান্ত আলোচনা :

حُرُوْف مُقَطَّعَات-এর পরিচয় : মহানবী ﷺ-এর শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এর ২৯টি সূরার শুরুতে রয়েছে মু'জিযার বিশেষ চিহ্ন حُرُوْف مُقَطَّعَات; নীচে এর পরিচয় তুলে ধরা হলো–

ক. আভিধানবেত্তাদের দৃষ্টিতে حُرُوْف শব্দটি حَرْف-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ– ১. طَرْفٌ তথা প্রান্ত, ২, অক্ষর; যেমন– ক, খ, গ। আর مُقَطَّعَات শব্দটি مُقَطَّعَةٌ-এর বহুবচন। এটি قَطْعٌ মূলধাতু থেকে গঠিত বাবে تَفْعِيْل-এর اسم مفعول-এর সীগাহ। অর্থ– বিচ্ছিন্ন বা কর্তিত। এখানে حُرُوْف-টি مَوصوف এবং مُقَطَّعَات-টি তার صفة হয়েছে। অতএব, উভয়টির একত্রে অর্থ দাঁড়ায়- বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা, এদেরকে حُرُوْفِ هِجَائِيَّة বলা হয়।

খ. اَهْلُ الِاصْطِلَاحَات তথা পরিভাষাবিদদের দৃষ্টিতে–

اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ حُرُوْفٍ هِجَائِيَّةٍ بُدِءَ بِهَا بَعْضُ سُوْرِ الْقُرْاٰنِ اِعْجَازًا لَهٗ.

অর্থাৎ, حُرُوْفِ مُقَطَّعَات হচ্ছে এমন কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ, যেগুলোর দ্বারা কুরআনের মু'জিযাস্বরূপ কতিপয় সূরা শুরু করা হয়েছে।

গ. তাফসীরবিদদের দৃষ্টিতে–

১. কারো মতে, এগুলো কুরআনের বিশেষ নাম।

২. কারো মতে, এসব হরফ সূরাসমূহের নাম।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, বিশেষজ্ঞরা এর তাৎপর্য জানেন।

৪. অনেকের মতে, এসব মহানবী ﷺ-এর জন্য ব্যবহৃত সংকেত বিশেষ।

৫. জমহুরের মতে, এগুলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এর রহস্য কারো জানা নেই। এমনকি অনুসন্ধানেরও অনুমতি নেই; বরং এতে ঈমান রাখা জরুরি।

কুরআনে কারীমের যে সূরাগুলোর শুরুভাগে বিচ্ছিন্ন হরফ রয়েছে, যথা- المص - حم - ص - الٓمٓ ইত্যাদি, এ হরফগুলোকে একত্রে যুক্ত অবস্থায় লেখা হলেও পৃথক পৃথকভাবে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। যথা- الم-কে পড়তে হবে الف - لام - ميم; حُرُوْف تَهَجِّى-এর মতে পৃথক পৃথকভাবে পড়া হয় বিধায় এগুলোকে مُقَطَّعَات বলা হয়।

[মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯]

حُرُوْف مُقَطَّعَت-এর সংখ্যা ও ধরন : এগুলো মোট ১৪টি হরফ। যার সমষ্টি হলো-نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرٌّ যা আরবি বর্ণমালার অর্ধেক। কতক সূরার শুরুতে একটি হরফ রয়েছে। যেমন- ن - ق; এটিকে اَحَادِى বলা হয়। কতক সূরার শুরুতে দুটি হরফ রয়েছে। যেমন- يس; এটিকে ثُنَائِى বলা হয়। কতক সূরার শুরুতে তিনটি হরফ রয়েছে। যেমন- الٓمّ; এটিকে ثُلَاثِى বলা হয়। এভাবে رُبَاعِى এবং خُمَاسِى পর্যন্ত রয়েছে। এর চেয়ে বেশি নেই। কেননা, আরবি ভাষায় পাঁচ হরফের বেশি কোনো শব্দ নেই। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯]

قَوْلُهُ : اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ

হুরফে মুকাত্তা'আতের তাৎপর্য : এ বাক্যটি দ্বারা মুফাসসির (র) اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো, এ সমস্ত হরফ مُتَشَابِه শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যার মর্ম সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। নিম্নোক্ত উক্তিসমূহে এর সমর্থন পাওয়া যায়-

১- قَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ رضى الله عنه : فِىْ كُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ اللّٰهِ فِى الْقُرْاٰنِ اَوَائِلُ السُّوَرِ.

২- قَالَ عَلِىٌّ رضى الله عنه : اِنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةً وَصَفْوَةُ هٰذَا الْكِتَابِ حُرُوْفُ التَّهَجِّى.

৩- قَالَ الشَّعْبِىُّ وَجَمَاعَةٌ : الٓمّ وَسَائِرُ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ فِىْ اَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِى اسْتَأْثَرَهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهٖ وَهُوَ سِرُّ الْقُرْاٰنِ فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا وَنَتَّكِلُ الْعِلْمَ فِيْهَا اِلَى اللّٰهِ.

৪- قَالَ دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ : كُنْتُ اَسْأَلُ الشَّعْبِىَّ عَنْ فَوَاتِحِ السُّوَرِ فَقَالَ يَا دَاوُدُ لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَ اِنَّ سِرَّ الْقُرْاٰنِ فَوَاتِحُ السُّوَرِ فَدَعْهَا وَسَلْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ. (حَاشِيَة جَلَالَيْن صـ ٤)

মোটকথা, জমহুরের মতো এগুলো প্রথম স্তরের মুতাশাবিহ-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এর প্রকৃত অর্থ উদঘাটন করা বান্দার সাধ্যে বাইরে। কারণ, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এক গোপন রহস্য, যা কোনো বিশেষ কল্যাণ ও পরিকল্পনার কারণে প্রকাশ করা হয়নি। [তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ৩]

আরো কিছু অভিমত :

১. কতিপয় আলেম বলেন, সূরাসমূহের শুরুতে হুরুফে মুকাত্তা'আত এসেছে ঐ সমস্ত সূরার নাম হিসেবে।

২. এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম, বরকতের জন্যে সূরার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি দোয়ার শুরুতে يَا كٓهٰيٰعٓصٓ - يَا حٰمٓ عٓسٓقٓ বলতেন।

৩. কোনো কোনো আলেমের মতে, এগুলো আল্লাহর নামের অংশ। যেমন- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেছেন, الٓر - حٰمٓ - نٓ এগুলোর সমষ্টি হলো الرَّحْمٰن

৪. হযরত মক্কী, সুদ্দী ও কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এসব হলো পবিত্র কুরআনের নাম।

৫. উক্ত পৃথক পৃথক হরফগুলো দ্বারা বাক্যসমূহের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে। যেমন-
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, الٓمٓ-এর الف দ্বারা اَلْاَءُ اللّٰهِ (আল্লাহর নিয়ামতসমূহ) উদ্দেশ্য, আর لام দ্বারা لُطْف (দয়া বা অনুগ্রহ) উদ্দেশ্য এবং ميم দ্বারা مُلْك (রাজত্ব) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহর রাজত্বের সকল নিয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ। তিনি আরো বলেন- الٓمٓ মূলত اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ (আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী)-এর সার-সংক্ষেপ। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭]
অনুরূপভাবে كٓهٰيٰعٓصٓ সম্পর্কে তিনি বলেন- كاف দ্বারা كَافِى এবং هاء দ্বারা هَادِى এবং ياء দ্বারা حَلِيْم এবং عين দ্বারা عَلِيْم এবং صاد দ্বারা صَادِق উদ্দেশ্য।

৬. কুতরুব (র)-এর মত হচ্ছে যে, একটি বিষয়ের আলাপ শেষ করে অন্য বিষয়ে আলাপ আরম্ভকালে শ্রোতাদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আরববাসী উক্ত হরফগুলো ব্যবহার করতেন।

৭. আবুল আলিয়া (র) বলেন, اَبْجَدْ-এর হিসাব মতে, উক্ত হরফগুলোতে জাতি ও ধর্মসমূহের ইতিহাস, তাদের উত্থান ও পতনের কাহিনী লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন- জনৈক ইহুদি যখন রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তিনি তাদের সামনে الٓمٓ পড়লেন। তখন তারা বলতে লাগল যে, যে ধর্মের স্থিতিকাল মাত্র ৭১ বছর সে ধর্ম আমরা কীভাবে গ্রহণ করব? এ কথা শুনে তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তারপর যখন তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করা হলো, তখন তিনি الٓمٓصٓ ও الٓمٓر পড়ে শুনালেন। তখন তারা বলতে লাগল যে, এ হরফগুলোর সংখ্যা ১৬১ ও ২৭২ এবং প্রথমটির চেয়ে বেশি। তাই ব্যাপারটি এখন আমাদের জন্যে জটিল হয়ে গেল। অতএব, এখন আমরা এর কোনো ফয়সালা করতে পারছি না। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬]

৮. কেউ কেউ মনে করেন, যখন কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে, সে যুগের বর্ণনাধারায় এ ধরনের বিচ্ছিন্ন হরফের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বক্তা ও কবিগণ এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। এখনো সংরক্ষিত জাহেলী যুগের কবিতায় তার নমুনা পাওয়া যায়। যেমন জনৈক কবি বলেন– قُلْتُ لَهَا قِفِيْ فَقَالَتْ ق اَىْ وَقَفْتُ হাদীস শরীফে এরূপ ব্যবহার রয়েছে। যেমন– مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ অর্থাৎ কেউ কাউকে হত্যার ব্যাপারে اُقْتُلْ বলার পরিবর্তে اُقْ বলল। এটাও হত্যায় সহযোগিতা বলে ধর্তব্য হবে। এ থেকে জানা গেল যে, اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَة অভূতপূর্ব কোনো বস্তু নয় যে, বক্তা ছাড়া তা কেউ বুঝবে না; বরং শ্রোতারা অনায়াসেই তার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হতেন।

এ কারণেই নবী যুগের কুরআন বিদ্বেষীদের কেউ এমন আপত্তি তোলেনি যে, তোমার কুরআনে এ অর্থহীন শব্দ কেন ব্যবহৃত হয়েছে। একই কারণে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এ মর্মে কোনো বর্ণনা নেই যে, তারা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছেন। রাসূল ﷺ থেকেও এগুলোর কোনো তাফসীর বর্ণিত হয়নি। কালক্রমে আরবি ভাষা থেকে এ পদ্ধতি বাদ পড়তে থাকে, আর তাই মুফাসসিরদের নিকটও সেগুলোর অর্থ নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯]

৯. আল্লামা ইদরিস কান্ধলভী (র) বলেন, আমার ধারণা মতে, এসব মতামত প্রতিটিই সঠিক। আরবি ভাষার দিক দিয়ে এগুলো حُرُوْف تَهَجِّىْ-এর নাম। আর শরিয়তের বাহ্যিক বিধানানুসারে এগুলো مُتَشَابِهَات এবং আল্লাহর গোপন রহস্য, যার সম্পর্কে সাধারণভাবে মানুষকে অবহিত করা হয়নি, হয়তো মানুষের সে যোগ্যতাই নেই। এজন্যে এগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক এবং এর মর্ম অনুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাটি করা নিষেধ। [মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র). : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১]

১০. কেউ কেউ বলেন, এগুলো সংশ্লিষ্ট সূরার বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ।

১১. কেউ কেউ বলেন, এগুলো দ্বারা اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের কতিপয় সূরা বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা শুরু করার মধ্যে কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ রয়েছে যেন কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো– এ হলো কুরআন মাজীদ, যা আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, সেটি এমন কিছু হরফের সমন্বয়ে রচিত, যেসব হরফ দিয়ে তোমরা নিজেদের কথা ও বাক্য গঠন করে থাক। সুতরাং যদি এ কুরআন আল্লাহর কালাম না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ আয়াত বা সূরা রচনা করতে অক্ষম কেন? তা ছাড়া এটাও লক্ষ্য করে দেখ যে, যিনি এ الْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَات সম্বলিত কুরআনের বাহক, তিনি একজন উম্মী মানুষ। তাহলে কী করে কুরআন সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ যৌক্তিক হতে পারে? [মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০]

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র) উক্ত কথাটিই খুব সংক্ষেপে বলেছেন–

وَاِنَّ فَائِدَتَهَا اِعْلَامُهُمْ بِاَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مُنْتَظِمٌ مِنْ جِنْسِ مَا تَنْتَظِمُوْنَ مِنْهُ كَلَامَكُمْ وَلٰكِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ.

এ সকল অভিমতের সারকথা হলো, الحروف المقطعات-এরর অর্থ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম দু'ভাগে বিভক্ত। তবে তাদের এ মতভেদ লফযী; হাকীকী নয়। কারণ, যারা বলেন, এ অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো– এর নিশ্চিত অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। আর যারা বলেন, মানুষ এর অর্থ জানতে পারে, তাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ এসবের সম্ভাব্য অর্থ নির্ণয় করতে পারে। ফলে দুই অভিমতের মাঝে বাহ্যত বিরোধ থাকলেও মৌলিকভাবে কোনো বিরোধ নেই।

إِزَالَةُ الشَّكِّ

একটি সংশয় ও নিরসন : যদি এ সংশয় জাগে যে, اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَة আল্লাহ তা'আলার গোপন রহস্য হলে তো কুরআন مَفْهُوْمُ الْمَعْنٰى থাকল না। কুরআন যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ, সেহেতু এ হরফগুলোও আমাদের বোধগম্য হওয়া অপরিহার্য। এগুলোর অর্থ অজ্ঞাত থাকলে এগুলো নাযিল করার উপকারিতা কী?

এর উত্তর হলো, শুধু অর্থ বোঝাই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনে বহু স্থান এমন আছে, যেগুলোতে শুধু বান্দার ঈমান আনাই উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَات নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো মানুষ এগুলোর উপর ঈমান আনবে এবং এগুলো আল্লাহ তা'আলা পক্ষ হতে হওয়ার কথা বিশ্বাস করবে। যাতে বান্দার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

[মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র.) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১]

কুরআন মাজীদে حُرُوْف مُقَطَّعَة উল্লেখের হেকমত ও উপকারিতা : যাদুল মাসীর ও সাফওয়াতুত তাফাসীরসহ অনেক তাফসীরগ্রন্থের আলোচনার সারকথা হচ্ছে, এগুলো কুরআনের মু'জিযার অংশবিশেষ। নীচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. আল্লাম বায়যাভী (র) বলেন, যারা কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছিল তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে এগুলো শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. তিনি আরো বলেন, এ সকল হরফ দ্বারা সূরা আরম্ভ করার আরেকটি কারণ হলো, যেন প্রথমবারেই তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে যে, এটা রাসূল ﷺ ও কুরআনের একটি স্বতন্ত্র মু'জিযা।

৩. আল্লামা ইবনে জারীর (র) বলেন, এ হরফগুলো দ্বারা সূরার প্রারম্ভ বোঝানোর জন্যে এগুলো শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, এগুলো উল্লেখের দ্বারা এ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ এর ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে, আবার কেউ এটা থেকে মুক্তও থাকতে পারে। তবে বক্র হৃদয়ের অধিকারীরাই এর ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

৫. কারো কারো মতে, যারা কুরআনকে মানবরচিত গ্রন্থ বলে দাবি করে, তাদেরকে অক্ষম সাব্যস্ত করার জন্য সূরার প্রথমে এ ধরনের অক্ষর উল্লেখ করেছেন।

৬. এ হরফগুলোর প্রতি জ্ঞানীবানদের বিশ্বাসের তারতম্য নির্দেশ করার জন্যে সূরার শুরুতে এ বর্ণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. কেউ কেউ বলেন, মুশরিকদেরকে একথা শোনানোর জন্যে যে, এ গ্রন্থের মধ্যে সূক্ষ্মতা রয়েছে।

৮. কেউ কেউ বলেন, সূরার প্রথমে এগুলো উল্লেখের মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনের গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ।

১০. কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এটা দিয়ে সূরা শুরু করার দ্বারা মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : الٓمّٓ

الٓمّٓ-এর তারকীবগত অবস্থান : রফা, নসব ও জর তিনরকমই হতে পারে। নিম্নে প্রতিটি ইরাবের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো–

ক. রফার অবস্থা : الٓمّٓ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক শব্দ ও উহ্য اَللّٰهُ শব্দ তার খবর, অথবা الٓمّٓ শব্দটি مُبْتَدَأ ও পরবর্তী ذٰلِكَ الْكِتَابُ বাক্যটি তার خَبَر।

الٓمّٓ অংশটি খবর হিসেবেও রফার স্থানে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে উহ্য মুবতাদা হবে أَنَا অথবা هٰذَا;

খ. নসবের অবস্থা : الٓمّٓ অংশটি উহ্য فِعْلُ الْقَسَمِ-এর কারণে নসবের স্থানে থাকতে পারে। যেমন–اَلْتَزَمْتُ الٓمّٓ; আবার ফে'লে কসম ছাড়া অন্য উহ্য ফে'ল দ্বারাও مَنْصُوْب হতে পারে। যেমন– اَذْكُرُ الٓمّٓ অথবা اَقْرَأُ الٓمّٓ

গ. জরের অবস্থা : الٓمّٓ অংশটি উহ্য হরফে কসমের কারণে مجرور হতে পারে। যেমন– والٓمّٓ [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৭]

الٓمّٓ-এর সহীহ তারকীব : الٓمّٓ-এর সহীহ তারকীব হলো- এটিকে কোনো তারকীব হয়নি। কারণ, এটি الْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَة -এর অন্তর্ভুক্ত। যার ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো– اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ; আর যে বিষয়ের উদ্দেশ্য জানা যায় না তা حُرُوْف هِجَائِيَّة-এর মতো مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُوْنِ হয়। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫]

حُرُوْف مُقَطَّعَة-এর তারকীব-পদ্ধতি : তাফসীরে বায়যাবীর ব্যাখ্যাকার শায়খ যাদাহ (র) বলেন- حُرُوْفِ مُقَطَّعَة দুই প্রকার। যথা–

১. মুফরাদ, যেমন– ق - ن অথবা মুফরাদের ওযনের শব্দ। যেমন– حم - يس শব্দদ্বয় قَابِيْل - هَابِيْل তথা মুফরাদ শব্দের ওযনে।

২. মুফরাদ কিংবা মুফরাদের ওযনে না হওয়া। যেমন– الٓمّٓ - كٓهٰيٰعٓصٓ; প্রথম প্রকারের ইরাবে হেকায়ীর ভিত্তিতে সাকিন অথবা সম্ভাবনাময় তারকীবের ভিতিতে রফা, নসব ও জর হবে। দ্বিতীয় প্রকারে ইরাবে হেকায়ীর ভিত্তিতে সাকিন হবে।

٢. ﴿ذٰلِكَ﴾ أَيْ هٰذَا ﴿الْكِتٰبُ﴾ الَّذِيْ يَقْرَؤُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لَا رَيْبَ﴾ شَكَّ ﴿فِيهِ﴾ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَجُمْلَةُ النَّفْيِ خَبَرٌ، مُبْتَدَأُهُ «ذٰلِكَ» وَالْإِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيْمِ، ﴿هُدًى﴾ خَبَرٌ ثَانٍ : هَادٍ ﴿لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ اَلصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيْ لِاتِّقَائِهِمْ بِذٰلِكَ النَّارَ.

২. এই ذٰلِكَ শব্দটি এই স্থানে هٰذَا অর্থে ব্যবহৃত। কিতাব যা মুহাম্মদ ﷺ পাঠ করেন কোনো সন্দেহ সংশয় নেই এতে এ ব্যাপারে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এই আয়াতটিতে لَا رَيْبَ নাবাচক বাক্যটি خَبَر; এর مُبْتَدَأ হলো ذٰلِكَ এই ذٰلِكَ শব্দটি আরবি ভাষায় দূরবর্তী ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে আল-কুরআনের সম্মানার্থে এই স্থানে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। পথ নির্দেশক هُدًى শব্দটি উক্ত مُبْتَدَا বা উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় خَبَر এটা مَصْدَر বটে, তবে এই স্থানে اِسْم فَاعِل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য هَادٍ পথ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ পালন করে এবং নিষেধসমূহ হতে বিরত থেকে যারা তাকওয়ার অধিকারী হতে যাচ্ছে তাদের জন্য। কেননা এই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই তারা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : ذٰلِكَ اَىْ هٰذَا الْكِتٰبُ الَّذِىْ يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ

كِتٰبُ ও هٰذَا শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র) ذٰلِكَ-এর তাফসীর করেছেন هٰذَا দ্বারা। এর মাধ্যমে তিনি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ذٰلِكَ শব্দটি هٰذَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে ذلك ব্যবহার করা হয়েছে। ذٰلِكَ মূলত দূরবর্তী ইঙ্গিতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দূরবর্তী হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র স্থান ও কালের পরিমণ্ডলেই অবতীর্ণ হয় না, মর্যাদাগত দূরত্বও এক প্রকার দূরত্ব। এ স্থানেও কুরআনের সম্মানার্থে নিকটবর্তী নির্দেশবাচক ইসমে ইশারা هٰذَا-এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের বাক্যগঠনরীতিতে ذٰلِكَ ও هٰذَا একটির স্থলে অন্যটিকে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই পূর্ববর্তীতে মুফাসসির (র) বলেন- اَلْإِشَارَةُ لِلتَّعْظِيْمِ; সুতরাং এর অনুবাদ হবে- এ পবিত্র ও সম্মানিত কিতাব।

الكِتٰب-এর তাফসীর তিনি اَلَّذِىْ يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ দ্বারা করে এমনটি বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে اَلْكِتٰب দ্বারা শুধুই কুরআন উদ্দেশ্য। অন্যান্য আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ : أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

সন্দেহের ক্ষেত্র নির্ণয় : এ অংশটি দ্বারা মুফাসসির (র) কুরআন শরীফ সম্পর্কিত সন্দেহের ক্ষেত্রটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আয়াতে ব্যাপকভাবে সন্দেহকে নাকচ করা হয়নি; বরং এটা যে আল্লাহ তা'আলার কালাম- এ ব্যাপারে সন্দেহকে নাকচ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ কালাম যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ : هُدًى، خَبَرٌ ثَانٍ هَادٍ

মাসদারটি ইসমে ফায়েলের সমার্থক : هُدًى-এর তাফসীর هَادٍ দ্বারা করে মুফাসসির (র) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, هُدًى মাসদারটি هَادٍ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত। আর هَادٍ-এর স্থলে هُدًى মাসদার ব্যবহার করার কারণ হলো, مُبَالَغَة প্রকাশ করা। যেমন- زَيْدٌ عَادِلٌ-এর স্থলে কখনো زَيْدٌ عَدْلٌ-ও ব্যবহার করা হয়। مُبَالَغَة ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো, এ কিতাবের মাঝে هِدَايَة অর্থাৎ, মানবজাতিকে সঠিক ও সরল পথের দিকে এতো বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, আদ্যপ্রান্ত পুরো কিতাবটিকে هِدَايَة মনে করা অসম্ভব কিছু নয়। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮]

قَوْلُهُ : لِلْمُتَّقِيْنَ - الصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى

مُتَّقِيْن শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত : মুফাসসির (র) لِلْمُتَّقِيْنَ-এর তাফসীর করেছেন- الصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيْ দ্বারা। অর্থাৎ,আদিষ্ট বিষয়াবলি পালন করে ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থেকে যারা তাকওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে, এখনো পূর্ণ মুত্তাকী হয়নি। এ তাফসীর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, হেদায়েতপ্রাপ্তির পর মানুষ মুত্তাকী হয়। হেদায়েতের পূর্বে কেউ পূর্ণরূপে মুত্তাকী গুণে-গুণান্বিত হতে পারে না, অন্যথায় হেদায়াতপ্রাপ্ত বা মুত্তাকীদেরকে হেদায়াত করা জরুরি হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুত্তাকী বলার কারণ হলো– কখনো কখনো পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে নামকরণ করা হয়। যেমন– কেবল হেফজখানায় ভর্তি হওয়া ছাত্রকে হাফেজ বলা হয়। মোটকথা, আয়াতে مُتَّقِيْنَ দ্বারা مُتَّقِى بِالْفِعْلِ (স্ববাস্তব মুত্তাকী) উদ্দেশ্য নয়; বরং مُتَّقِى بِالْقُوَّةِ (মুত্তাকী হওয়ার উপযুক্ত) উদ্দেশ্য। তাদের মাঝে تَقْوٰى-এর যোগ্যতা ও আগ্রহ রয়েছে। আর কুরআন তাদের সে যোগ্যতা ও আগ্রহ কাজে লাগিয়ে তাদেরকে مُتَّقِى بِالْفِعْلِ বানিয়ে দেবে। তাই সেই ভবিষ্যত অবস্থা বিবেচনা করে রূপকার্থে তাদেরকে مُتَّقِى বলা হয়েছে।

• قَوْلُهُ : لِاتِّقَائِهِمْ بِذٰلِكَ النَّارَ

মুত্তাকী নামকরণের কারণ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুত্তাকীকে মুত্তাকী বলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু নেক আমল দ্বারা মুত্তাকী নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখে, এজন্যে মুত্তাকী বলা হয়। এ বাক্য দ্বারা বোঝা যায়, الْمُتَّقِيْنَ-এর مَفْعول به উহ্য রয়েছে। ইবারতের মূলরূপ হবে- هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ النَّارَ অর্থাৎ, এ কিতাব ঐ লোকদের জন্য হেদায়েত, যারা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে। এখানে ذٰلِكَ-এর مُشار اليه হলো- اِمْتِثَالُ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِيْ

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

الكِتَابُ : الكِتَاب শব্দটি মূলত মাসদার। যেমন, কুরআনে রয়েছে- كِتَابُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ; কখনো এর দ্বারা مَكْتُوْبٌ বা লিখিত বস্তু বোঝানো হয়। كتب মাদ্দার প্রকৃত অর্থ– একত্র করা। এ থেকেই كتيبَةُ الجَيْش-এর ব্যবহার। আর পরিভাষায় كِتَابَة অর্থ হলো– ضَمُّ بَعْضِ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ اِلٰى بَعضٍ; [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪]

رَيْبَ : শব্দটি মাসদার। বাব ضرب মূলবর্ণ (ر - ي - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– সন্দেহ করা, اَلشَّكُّ مَعَ التُّهْمَةِ তথা অপবাদসহ সন্দেহ করা, সংশয় করা। পরিভাষায় رَيْب বলা হয়–

هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيْضَيْنِ لَا تَرْجِيْحَ لِاَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخرِ عِنْدَ الشَّاكِ.

অর্থাৎ, তা হলো, দু'টি বিপরীত বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন সংশয় ও দ্বিধা যে, দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট কোনো একটি বিষয়কে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার পথ থাকে না।

আল্লামা যামাখশরী (র.)-এর মতে, ريب হলো- قلق النفس واضطرابها (মনের সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব) এ অর্থেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ

কেউ কেউ বলেন, رَيْب-এর মাঝে তিনটি অর্থ রয়েছে- ১. اَلشَّكّ ২. اَلتُّهْمَة ৩. اَلْقَلَقُ والاِضْطِرَابُ

উল্লেখ্য, رَيْب ও شَكٌّ সমার্থক নয়; বরং رَيْب শব্দটি شَكّ থেকে খাস। উভয়ের মাঝে عموم خصوص مطلق-এর تعلق বিদ্যমান। رَيْبٌ হলো أَخَصُّ مُطْلَق এবং شَكٌّ হলো أَعَمُّ مُطْلَق। কারণ شَكٌّ ব্যাপকভাবে সকল সন্দেহের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়, চাই সাথে تُهْمَة থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য رَيْب শব্দটি রূপকার্থে شَكّ-এর অর্থে ব্যবহার হয়। কারণ, شَكّ হলো طَمَأْنِيْنَة দূর করার এবং قَلَق ও اِضْطِرَاب সৃষ্টির কারণ। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬]

هُدًى : শব্দটি মাসদার। বাব ضرب মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথ প্রদর্শন করা। শব্দটিকে অধিকাংশ নাহুবিদ مذكر সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ শব্দটিকে مؤنث-ও বলেছেন। যেমন– السمين গ্রন্থে বলা হয়েছে- أَنَّهُ يُذَكَّرُ وَهُوَ الكَثِيْرُ وَبَعْضُهُمْ يُؤَنِّثُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ هُدًى মাসদারটি لازم ও متعدي উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। আলোচ্য আয়াতে متعدي অর্থটি উদ্দেশ্য।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহুছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاتقاء মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পরহেজগার, মুত্তাকী ইত্যাদি। যেহেতু মুত্তাকী ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাই তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

مُتَّقِيْنَ শব্দটি মূলত مُتَّقِيِيْنَ ছিল। তাতে দুটি ياء রয়েছে। একটি ياء লাম কালিমা তথা মূল হরফ। আর অপরটি বহুবচনের আলামত। প্রথম ياء-এর মাঝে কাসরা পড়া কঠিন; তাই কাসরাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। অতঃপর দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে একটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

ذٰلِكَ শব্দটি مبتدأ ও الْكِتَابُ হলো খবর। لَا-টি لِلْجِنْسِ; لَا النَّافِيَةُ رَيْب শব্দটি لَا-এর اسم হিসেবে ফাতহার উপর মাবনী অবস্থায় منصوب হয়েছে। فِيْهِ অংশটি لَا-এর উহ্য খবরের সাথে متعلق। এই جملة اسمية-টি ذٰلِكَ-এর خبر ثاني হতে পারে, আবার الكتاب থেকে حال-ও হতে পারে। অথবা ذٰلِكَ الْكِتَابُ অংশটি مبتدأ এবং لَا رَيْبَ فِيْهِ বাক্যটি خبر। উদ্দেশ্য যেহেতু সন্দেহ প্রকাশ অনুচিত হওয়ার বিষয়টি জোরদার করা, তাই বাক্য বিন্যাসে لَا فِيْهِ رَيْبٌ না বলে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা হয়েছে। কেননা, দ্বিতীয় বাক্য বিন্যাসটি نفى করার ক্ষেত্রে অধিকতর দৃঢ়তা জ্ঞাপক, অনেক শক্তিশালী। هُدًى শব্দটি ذٰلِكَ-এর خبر ثالث। لِلْمُتَّقِيْنَ অংশটি جر ও مجرور মিলে هُدًى মাসদরটির সাথে متعلق হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

هدى শব্দের লিখনশৈলী : (আয়াত-২) উল্লিখিত هدى শব্দটি তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থে রসমে উসমানী অনুযায়ী লিপিবদ্ধ হয়নি। নিম্নে তা দেখানো হলো-

ক. তাফসীরে জালালাইনের হিন্দুস্তানী নুসখায় هدى শব্দটির دال বর্ণের পর 'ইয়ায়ে মাজহুল' যোগে هُدِّے রূপে লিখিত হয়েছে।

খ. রসমে উসমানিতে শব্দটির دال বর্ণের পর 'ইয়ায়ে মারূফ' যোগে هدى রূপে লিখিত হয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

❖ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতের ব্যাখ্যা

১. নিকটবর্তী ইসমুল ইশারার স্থলে দূরবর্তী ইসমুল ইশারা ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়। ذٰلِكَ অর্থ- ঐ। এখানে ذٰلِكَ ব্যবহার করার কারণ হলো, এ কিতাব دَقَائِق وَلَطَائِف - اَسْرَار وَغَوَامِض - حَقَائِق وَمَعَارِف সম্বলিত হওয়ার কারণে দৃষ্টি ও চিন্তার সীমানা থেকে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে যদিও কুরআনে কারীম আমাদের দৃষ্টির সামনে ও নিকটে রয়েছে; কিন্তু اَسْرَار وَحَقَائِق-এর দিক থেকে তা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে। এজন্যে هٰذَا-এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহার করা হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২]

২. দূরবর্তী ইশারার শব্দ ذٰلِكَ ব্যবহার করে এ কাথা বুঝানো হয়েছে যে, সূরা ফাতিহাতে যে সীরাতে মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কুরাআন শরীফ সে প্রার্থনারই জবাব এবং এটি সীরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়াতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়াত লাভে ইচ্ছুক, সে যেন এ কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। [মা'আরিফুল কুরআন]

৩. ইমাম ফাররা বলেন-

كَانَ اللّٰهُ قَدْ وَعَدَ نَبِيَّهٗ ﷺ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِ كِتَابًا لَايَمْحُوْهُ الْمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ فَلَمَّا اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ قَالَ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِىْ وَعَدْتُكَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতি তিনি এমন কিতাব নাযিল করবেন, যাকে পানি মুছে ফেলতে সক্ষম হবে না এবং যা অধিক হাত বদল ও ব্যবহারের কারণে পুরাতন হবে না। তাই কুরআন নাযিল পর আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, এটি সে কিতাব, যা নাযিলের প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিয়েছিলাম।

৪. সূরা বাকারা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর মদিনায় অধিকহারে ইহুদিদের বসবাস ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর সে প্রতিশ্রুতির সময় বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই পরবর্তীতে সে প্রতিশ্রুত কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে الاِشَارَةُ لِلبَعِيْد-এর শব্দ ذٰلِكَ ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. ذٰلِكَ-এর مشار اليه হলো সূরা বাকারার পূর্বে নাযিলকৃত সূরাসমূহ। কাফেররা অস্বীকার করেছে বিধায় এখানে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, সেসব সূরা বা আয়াতে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ تَعالٰى : ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ

هٰذَا-এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহারের তাৎপর্য : সাধারণত কোনো দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্যে ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়। এ সর্বনামের বাংলা অর্থ– ঐ। এখানে الكتب দ্বারা কুরআনে কারীমকে বুঝানো হয়েছে। এটি বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থান নয়। কারণ ইশারা কুরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে। যা মানুষের সামনে রয়েছে। তাহলে দূরবর্তী ইশরার শব্দ ব্যবহার করা হলো কেন? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বক্তব্য হলো–

১. ذٰلِكَ মূলত দূরবর্তী ইঙ্গিতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দূরবর্তীতা শুধু স্থান ও কালের পরিমণ্ডলেই আবর্তিত হয় না, মর্যাদাগত দূরত্বও এক প্রকার দূরত্ব। এ স্থানেও কুরআনের সম্মানার্থে নিকটবর্তী নির্দেশবাচক সর্বনাম هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের বাকপ্রণালীতে ذٰلِكَ ও هٰذَا একটির স্থলে অন্যটিকে ব্যবহার করার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) বলেন– وَالْإِشَارَةُ لِلتَّعْظِيْمِ সুতরাং এর অনুবাদ হবে– এই পবিত্র ও সম্মানিত কিতাব। (تَنْزِيْلًا لِبُعْدِ الرُّتْبَةِ مَنْزِلَةَ بُعْدِ الْمَكَانِ وَالْمَعْقُوْلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْسُوْسِ)

২. اِسْم اِشَارَة قَرِيْب-এর স্থলে ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করার কারণ হলো, এ কিতাব স্বীয় অতুলনীয় প্রভাবসহ دَقَائِق وَلَطَائِف ـ اَسْرَار وَ غَوَامِض ـ حَقَائِق وَمَعَارِف সম্বলিত হওয়ার কারণে দৃষ্টি ও চিন্তার সীমানার থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে যদিও কুরআনে কারীম আমাদের দৃষ্টির সামনে ও নিকটে রয়েছে; কিন্তু اَسْرَار وَحَقَائِق-এর দিক থেকে তা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে। এজন্য هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করা হয়েছে।

[মা'আরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩২]

৩. দূরবর্তী ইশারার শব্দ ذٰلِكَ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল ফাতিহাতে যে সীরাতুল মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কুরআন শরীফ সে প্রার্থনারই জবাব এবং এটি সীরাতুল মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। [মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

৪. ইমাম ফাররা (র.) বলেন–

كَانَ اللّٰهُ قَدْ وَعَدَ نَبِيَّهُ ﷺ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِ كِتَابًا لَا يَمْحُوْهُ الْمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ فَلَمَّا اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ قَالَ هٰذَا ذٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِيْ وَعَدْتُكَ ـ (حاشية جَلَالَيْن)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতি তিনি এমন কিতাব নাজিল করবেন, যাকে পানি মুছে ফেলতে সক্ষম হবে না এবং যা অধিক হাত বদল ও ব্যবহারের কারণে পুরাতন হবে না। কুরআন নাজিল হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, এটি সেই কিতাব, যা নাজিলের ওয়াদা আপনাকে করেছিলাম।

৫. সূরা বাকারা মাদানী। এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর মদীনায় অধিকহারে ইহুদিদের সবসাস ছিল। যাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে কুরআন শরীফ নাজিল হওয়ার সংবাদ প্রদত্ত হয়েছিল। যা বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। সেই প্রতিশ্রুত কিতাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় هٰذَا ব্যবহার করা উচিত ছিল। [কামালাইন, খ. ১, পৃ. ১৭]

৬. অথবা এটাও বলা যায় যে, ذٰلِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো সূরা বাকারার পূর্বে নাজিলকৃত সূরাসমূহ যেগুলোকে কাফেররা অস্বীকার করেছে, মিথ্যা বলেছে। এখানে তাদের জন্য বলা হচ্ছে, সে সকল সূরা বা আয়াত সন্দেহাতীত। –[প্রাগুক্ত]

৭. ذٰلِكَ দ্বারা সূরা বাকারার প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে। তখন ইসমে ইশারা মুযাক্কার আনাটা كِتَاب শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে হবে। –[প্রাগুক্ত]

কুরআন সুসংরক্ষিত গ্রন্থ : قَوْلُهُ اَلْكِتَابُ কুরআন মাজীদ নিছক মৌখিক বর্ণনা কিংবা স্মৃতিচারণের সমষ্টি নয়; বরং তা সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত গ্রন্থ, লিখিত আকারেও, মুখস্থ আকারেও। অন্যান্য ধর্মের ইলহামী গ্রন্থের মতো নয় যে, ধর্ম প্রবর্তকের স্মৃতিতে শুধু বিষয় ও ভাব সংরক্ষিত ছিল আর তাদের কাছ থেকে একেক বর্ণনাকারী একেক অংশ একেক রকম বর্ণনা করেছে। এমনকি কয়েক শতাব্দী পরে সংকলন ও গন্থনার পালা শুরু হলে ভাষা ও শব্দগত বিশুদ্ধতা তো দূরের কথা, স্বয়ং ভাব ও বিষয়বস্তুই বিকৃতির শিকার হয় এবং আসমানি কিতাবের নাম ধারণ করলেও তার বিন্যাস ও রচনায় কত শত মানুষের লেখনী ও মস্তিষ্ক কাজ করছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। [তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৮]

একটি সংশয় ও তার নিরসন : আলোচ্য আয়াতে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ আয়াতে কুরআনকে সন্দেহাতীত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রতি যুগেই কিছু কিছু মানুষ এতে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছে। যদি সন্দেহ না থাকত, তাহলে তো সকল মানুষই মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন–

১. ব্যাপকভাবে সকল প্রকার সন্দেহই নাকচ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কুরআনে কারীমের সকল কথাই সত্য, সঠিক ও সন্দেহমুক্ত। দুনিয়ার মানুষ তাতে সন্দেহ করলে সেটা তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হবে। মূলত কুরআন সন্দেহের বস্তু নয়। এজন্যই বলা হয়নি যে, কুরআন সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিধা-সন্দেহ হবে না; বরং বলা হয়েছে যে, এ কিতাব ও তার বিষয়বস্তু সকল সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯; কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮]

২. কোনো কথার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে।
ক. যে কথা বলা হয়েছে, সে কথার মধ্যেই কোনো ভ্রান্তি বা ত্রুটি নিহিত আছে।
খ. শ্রোতার বোধশক্তিতে ত্রুটি আছে। প্রথম অবস্থায় বর্ণনাই সন্দেহের কারণ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রোতার বোধশক্তিই সন্দেহের উৎস। একটি সন্দেহাতীত বর্ণনাকে সে নিজের বুদ্ধির ত্রুটির কারণেই সন্দেহ করছে। উক্ত আয়াতে প্রথম কারণে সৃষ্ট সন্দেহ নিরসনের ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং তার প্রত্যেকটি বর্ণনা যথার্থ, বাস্তব এবং ধ্রুব সত্য, সর্ব প্রকার সন্দেহেরে ঊর্ধ্বে। এতদসত্ত্বেও যদি অস্বীকারকারী তাতে সন্দেহ করে, তবে তাতে কুরআনের উল্লিখিত ঘোষণার কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। কেননা, এই সন্দেহের কারণ পবিত্র কুরআন ও তার বর্ণনা নয়; বরং সন্দেহকারীর বুদ্ধির ভ্রান্তিই এই সন্দেহের উৎস। তাদের এ ভ্রান্তির কারণে উল্লিখিত মহান ঘোষণাকে সন্দেহযুক্ত মনে করা পথভ্রষ্টতার সুস্পষ্ট আলামত। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ৩, টীকা ২]

কুরাআন সুসংরক্ষিত গ্রন্থ : কুরআন মাজীদ নিছক মৌখিক বর্ণনা কিংবা স্মৃতিচারণের সমষ্টি নয়; বরং তার সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত একটি গ্রন্থ। এটি লিখিত কিংবা মুখস্থ– উভয় দিক থেকেই সংরক্ষিত। অন্যান্য ধর্মের ইলহামী গ্রন্থের মতো নয় যে, ধর্ম প্রবর্তকের স্মৃতিতে শুধু বিষয় ও ভাব সংরক্ষিত ছিল আর তাদের কাছ থেকে একেক বর্ণনাকরী একেক অংশ একেক রকম বর্ণনা করেছে। এমনকি কয়েক শতাব্দী পর সেসব গ্রন্থের সংকলন ও গ্রন্থনা শুরু হলে দেখা যায়, ভাষা ও শব্দগত বিশুদ্ধতা তো দূরের কথা, স্বয়ং ভাব ও বিষয়বস্তুই বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং আসমানি কিতাবের নাম ধারণ করলেও তার বিন্যাস ও রচনায় কেবল মানুষের লেখনী ও মস্তিষ্কই কাজ করছে; তাতে আল্লাহর বাণী আছে সামান্যই। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

কুরআনে আত্মপরিচয় : কুরআনের প্রথম আত্মপরিচয় থেকেই কুরআন পাঠকারীকে বুঝে নিতে হবে যে, এটা কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয় যে, তাতে সন-তারিখসহ অতীত ঘটনাবলির সুবিন্যস্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হবে। কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থও নয় যে, তার পাতায় পাতায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান তালাশ করা হবে। এটা কোনো দর্শনগ্রন্থও নয় যে, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন কল্প তত্ত্বের জটিলতায় ঘুরপাক খেতে হবে। তদ্রূপ এতে কোনো গল্প ও প্রবন্ধের রাগ-বিরাগ নেই। বরং কুরআনের মৌলিক পরিচয় হলো, তা আল্লাহভীরুদের জন্যে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা এবং পূর্ণাঙ্গ এক জীবনবিধান। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০]

تَقْوٰى-এর পরিচয় ও স্তরসমূহ : تَقْوٰى-এর আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা। পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়, ঐসব বস্তু থেকে বেঁচে থাক, যা আখেরাতের জন্যে ক্ষতিকর। চাই সেটা আকাইদ ও আখলাক সংক্রান্ত হোক, কিংবা কথা, কাজ ও অবস্থা সংক্রান্ত হোক। আর ক্ষতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সে হিসেবে তাকওয়ারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে–

اَلْمَرْحَلَةُ الْأُوْلٰى : প্রথম স্তর : কুফর থেকে তওবা করে ইসলামে প্রবেশ করা এবং নিজেকে চিরস্থায়ী আযাবের হাত থেকে রক্ষা করা। কুরআনের বাণী– وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى দ্বারা এ স্তরের তাকওয়া উদ্দেশ্য। একে تَقْوَى الْعَوَام বলা হয়।

اَلْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ : দ্বিতীয় স্তর : কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বা সগীরা গুনাহ নিয়মিত করার ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا; শরিয়তের পরিভাষায় مُتَّقِى শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে এটাকেই বোঝানো হয়। একে تَقْوَى الخَاصّ বলা হয়। অর্থাৎ, اِمْتِثَالُ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِى;

اَلْمَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ : তৃতীয় স্তর : অন্তরকে ঐসব বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখা, যা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ; এর মাঝে এ স্তরের তাকওয়ার কথাই বলা হয়েছে। একে تقوى اَخَصُّ الخَوَاصّ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে তিনটি স্তরের তাকওয়াই উদ্দেশ্য হতে পারে।

তাকওয়ার পরিচয় সম্পর্কিত একটি ঘটনা : একবার হযরত ওমর (রা.) সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কাছে তাকওয়ার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি জবাবে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথ দিয়ে হেঁটেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই হেঁটেছি। হযরত উবাই (রা.) বললেন, চলার পথে আপনি কী করেছেন? বললেন, আমি গায়ের কাপড় গুটিয়ে সতর্কভাবে পা ফেলেছি এবং কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি। হযরত উবাই (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এটাই হলো তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থকে বাঁচতে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করার নাম হলো তাকওয়া। অতএব, পার্থিব লাঞ্ছনার ভয়ে আল্লাহর নাফরমানি বর্জন করলে তাকে তাকওয়া বলা হবে না।

فَضِيْلَةُ التَّقْوٰى : তাকওয়ার গুরুত্ব : আল্লাহভীতিই হলো হেদায়াতের পূর্বশর্ত এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎস। হযরত নূহ (আ,) হুদ (আ), সালেহ (আ), লূত (আ) এবং শোয়াইব (আ) প্রমুখ নবীগণ নিজেদের কওমকে সর্বপ্রথম নসিহত করে বলেছেন- اَلَا تَتَّقُوْنَ (তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর না?), فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ (আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো)। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ভয় ছাড়া নসিহত কার্যকরী হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشٰى অর্থাৎ, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে هُدًى لِّلنَّاسِ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে মুত্তাকী নয়, সে প্রকৃত মানুষ নয়। মানবতার দাবিই হলো নিজের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে ভয় করা। আর যে আহকামুল হাকিমীনকে ভয় করে না, সে মানুষ নয়; বরং চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট। এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ [মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৬]

إِزَالَةُ الشَّكِّ : সংশয় নিরসন

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতটি সম্পর্কে এমন প্রশ্ন হতে পারে যে, আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এ কুরআন হলো মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতস্বরূপ। আর বলাবাহুল্য যে, হেদায়াতপ্রাপ্তরাই মুত্তাকী হয়। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের হেদায়েত করা নিরর্থক। এতে تَحْصِيْلُ الحَاصِل সাব্যস্ত হয়। কুরআন একজন পথহারা ব্যক্তির জন্যে হেদায়েতের কারণ হতে পারে। কিন্তু হেদায়েতপ্রাপ্তদের হেদায়েত করার অর্থ কী?

এ সংশয় নিরসনকল্পে মুফাসসিরগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১. হেদায়াত ও তাকওয়া উভয়টিরই বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা- اَدْنٰى - اَوْسَط - اَعْلٰى সুতরাং কুরআনের কারণে মুত্তাকী যখন তাকওয়ার নিম্নস্তর থেকে উঁচু স্তরে উন্নীত হবে, তখন কুরআনকে মুত্তাকীদের জন্যে هدى বলাটা সঠিক হবে। অর্থাৎ, নিম্ন স্তরের হিসেবেই সে মুত্তাকী এবং উঁচু স্তরে পৌঁছলে বলা হবে সে হেদায়াত পেয়েছে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮]

২. এ গ্রন্থ থেকে কেবল তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে, যাদের অন্তরে আল্লাহভীতি রয়েছে। যদিও কুরআন সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ; কিন্তু কার্যত তা থেকে লাভবান কেবল তরাই হবে, যাদের হৃদয়ে আছে সত্যের অনুসন্ধিৎসা। যেমন– সূর্যের আলো যত ঝলমলেই হোক, চোখের আলো যাদের নিভে গেছে, তাদের জন্যে তা অর্থহীন। একইভাবে ভূমি যদি অনুর্বর হয় বৃষ্টিপাত যতো হোক, তাতে সবুজ বাগিচা সৃষ্টি হতে পারে না। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০]

৩. যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, এ কিতাব তাদের জন্যে নূর ও হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হেদায়াতের পথ দৃষ্টিগোচর হবে না। এজন্যে আল্লাহকে ভয়কারীরাই শুধু হেদায়াত পাবে। [মাআরিফুল কুরআন কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ذٰلِكَ الْكِتٰبُ

দূরবর্তীর শব্দ দ্বারা নিকটবর্তীর প্রতি ইশারা : আলোচ্য আয়াতে দূরবর্তী বস্তুর প্রতি ইশারার শব্দ ذٰلِكَ দ্বারা নিকটবর্তীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

মাজাযে আকলী : এখানে কুরআনের দিকে هِدَايَة-এর নিসবত করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত হেদায়াত প্রদানকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা, কুরআন হেদায়াতের মাধ্যম মাত্র। অতএব, এখানে মাজাযে আকলী হয়েছে।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : আল কুরআন কাদের জন্যে হেদায়াত।

ক. মুত্তাকীদের জন্যে	খ. সাধারণ লোকদের জন্যে
الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ.
অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়াতস্বরূপ। (সূরা বাকারা : আয়াত ১-২)	অর্থ : রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের হেদায়াত। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)
এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২টি আয়াত রয়েছে। যথা- সূরা আলে-ইমরান, আয়াত- ১৩৮, সূরা মায়েদা, আয়াত- ৪৬	

تَحْقِيْقُ التَّعَارُضِ : দ্বন্দ্ববিশ্লেষণ : উল্লিখিত ক-অংশ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন শুধু মুত্তাকীদেরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। পক্ষান্তরে খ-অংশ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষের জন্যে আল কুরআন হেদয়াতরূপে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে বাহ্যত অর্থগত দ্বন্দ্ব বিরাজমান।

دَفْعُ التَّعَارُضِ : দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো। যথা-

১. বাস্তবে আল কুরআন হচ্ছে সমস্ত মানবের জন্যে হেদায়েতের চাবিকাঠি ও পথপদর্শনের উজ্জ্বল প্রদীপ। যে কুরআনকে প্রত্যক্ষ করবে, পাঠ করবে এবং তার আলোচ্য বিষয় ও ভাবার্থে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করবে, সে হেদায়াতের পথে পরিচালিত হতে সক্ষম হবে। তবে উপরিউক্ত আয়াতগুলোর ক-অংশে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ, তাকওয়া অর্জনকারীকে আল-কুরআন হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে, তার কারণ হলো, কুরআন পাকের মতো মহামূল্যবান ঝরনাধারা থেকে হেদায়েত গ্রহণ করতে তাঁরা অন্যদের তুলনায় খুব আগ্রগামী ও উৎসাহী হয়ে থাকেন। যদিও মর্তবা বা স্তরের দিক দিয়ে তাদের মাঝে কিছুটা তারতম্য থাকে। তবু তারা ফায়দা অর্জনে পরস্পর অংশীদার হন। আরেকটি কারণ হলো, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্ম সম্পাদনের মতো মহামূল্যবান দৌলত দ্বারা ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী করেছেন। এজন্যে তাদের গুণকীর্তন করণার্থে মহান আল্লাহ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলেছেন। [তাফসীরে আবুস সউদ, তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে খাযেন]

২. হেদায়াত শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে যথা-

ক. اِرَاءَةُ الطَّرِيْق তথা পথ দেখানো।

খ. اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ তথা গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

আল কুরআনের হেদায়াতের ব্যাপারে উভয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। আল কুরআন মুসলিম-অমুসলিম সব মানুষের ক্ষেত্রে পথ দেখাতে সম্পূর্ণ সামর্থ্য রাখে এবং হক-না হক ও সত্য-মিথ্যার সবগুলো পথ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- هُدًى لِّلنَّاس অর্থাৎ, যা দল, মত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে পথ দেখাতে সক্ষম। তবে তাকওয়া অর্জনকারীর ব্যাপারে اِيْصَال اِلَى الْمَطْلُوْبِ-এর অর্থটি সুনির্দিষ্ট। সুতরাং তারা কুরআনের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে আসল গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে। অতএব, ক-অংশের আয়াতের অর্থ তারা اِيْصَال اِلَى الْمَطْلُوْبِ ও খ-অংশের আয়াতের অর্থ اِرَائَةُ الطَّرِيْقِ গ্রহণ করলে আয়াতগুলোর মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। [তাফসীরে কবীর]

৩. যারা বিশ্বাস করে অর্থাৎ, সত্য বলে জানে অদৃশ্য বিষয়ে, যা তাদের থেকে গোপন আছে, যেমন– পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং সালাত কায়েম করে অর্থাৎ, তা আদায় করে যথাযথভাবে। আর আমার দেওয়া রিজিক থেকে যা আমি তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে।

٣. ﴿الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ﴾ يُصَدِّقُوْنَ ﴿بِالْغَيْبِ﴾ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ﴿وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ﴾ أَيْ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ﴾ أَعْطَيْنَاهُمْ ﴿يُنْفِقُوْنَ﴾ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ.

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : يُؤْمِنُوْنَ - يُصَدِّقُوْنَ

يُؤْمِنُوْنَ-এর উদ্দিষ্ট অর্থ : আভিধানিকভাবে اِيْمَان শব্দটি تَصْدِيْق এবং وُثُوْق অর্থে ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র) يُصَدِّقُوْنَ বলে বুঝিয়েছেন যে, আয়াতে تَصْدِيْق অর্থটি প্রযোজ্য। কেননা يُؤْمِنُوْنَ-এর صِلَة হিসেবে باء আসলে সর্বসম্মতিক্রমে শব্দটি تَصْدِيْق-এর অর্থে ব্যবহার হয়।

حَقِيْقَةُ الْإِيْمَانِ : ঈমানের হাকীকত

ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর মুতাকাল্লিমীনের মতে, ঈমান কেবল تَصْدِيْق قَلْبِى-কে বলা হয়। আর জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে, ঈমান হলো তিন জিনিসের সমষ্টির নাম। সেগুলো হলো-اِقْرَار بِاللِّسَان - تَصْدِيْق بِالْقَلْب - عَمَل بِالْاَرْكَان; মুফাসসির (র) يُصَدِّقُوْنَ শব্দ দ্বারা এ দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ঈমান দ্বারা শুধু تَصْدِيْق بِالْقَلْب উদ্দেশ্য; اِقْرَار বা عَمَل নয়।

قَوْلُهُ : وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ أَيْ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا

إِقَامَةُ الصَّلَاة-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র) এ বাক্যটি দ্বারা إِقَامَةُ الصَّلَاة-এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ, শুধু নামাজ আদায়কে إِقَامَةُ الصَّلَاة বলা হয় না; বরং নামাজের দু'ধরনের হক রয়েছে। যথা-

১. জাহেরী বা বাহ্যিক হক। যেমন– নামাজের শর্ত, আদব ও রোকনসমূহ।
২. বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ হক। যেমন– খুশু, খুজূ ও ইখলাস ইত্যাদি।

এ সব ধরনের হক আদায় করে নামাজ পড়াকেই اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ বলা হয়। মুফাসসির (র)-এর এ অংশটুকুর ব্যাখ্যায় আল্লামা সাভী (র) বলেন–

اَىْ بِحُقُوْقِهَا الظَّاهِرَةِ كَالشُّرُوْطِ وَالْآدَابِ وَالْأَرْكَانِ وَالْبَاطِنَةِ كَالْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ وَالْإِخْلَاصِ. (حَاشية الصاوى جـ١ صـ١٢)

قَوْلُهُ : يُنْفِقُوْنَ - فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ

اِنْفَاق-এর কারণ বর্ণনা : মুফাসসির (র)-এর এই বক্তব্য فى হরফটি يُنْفِقُوْنَ-এর تعليل বা কারণ বর্ণনার উদ্দেশ্য ব্যবহার হয়েছে। মূল রূপ হলো– يُنْفِقُوْنَ مِنْ اَجْلِ طَاعَةِ اللّٰهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يُقِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে افعال মাসদার الإِقَمَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা কায়েম করে।

اَلصَّلَاةُ : এটি মাসদার। বাব تفعيل মূলবর্ণ (ص - ل - و) জিনস ناقص واوي অর্থ– নামাজ পড়া, দোয়া করা। এটি হয়ত صَلٰوة (দোয়া) থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা, নামাজ তো দোয়ারই সমষ্টি। অথবা وَصْلَةٌ (মিলন, সম্পর্ক) থেকে নির্গত। قَلْب مَكَانِى হয়ে صَلٰوة হয়েছে। আর নামাজকে صَلٰوة এজন্যে বলা হয় যে, এটি বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সেতুবন্ধন।

رَزَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اِثبَات فِعل مَاضِى مُطْلَق مَعْرُوف মূলবর্ণ ر - ز - ق জিনস صحيح অর্থ- রিজিক দিয়েছি, জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। رزق-এর আভিধানিক অর্থ- অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ, আর এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এ অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছ। [সূরা ওয়াকেয়া : ৮২]

رِزْق একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার দান ও নিয়ামতএর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সম্পদ, স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। এমনকি সে নিয়ামতদুনিয়ারও হতে পারে, আখেরাতেরও হতে পারে। যেমন- ..... وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ আয়াতে رَزَقْنَا দ্বারা দুনিয়ার নিয়ামত উদ্দেশ্য। আর وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ আয়াতে يُرْزَقُوْنَ দ্বারা পরকালের নিয়ামতউদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ..... وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

এ অংশটুকুর ইরাবগত অবস্থান কয়েক রকম হতে পারে। যথা-

১. اَلْمُتَّقِيْنَ-এর صفة হিসেবে جَر-এর স্থানে রয়েছে।

২. উহ্য ফে'ল أَعْنِي-এর মাফউল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

৩. উহ্য মুবতাদা هُمْ-এর খবর হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে। অথবা অংশটুকু মুবতাবা হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى অংশটুকু হবে তার খবর। রফার দুই অবস্থায় এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَة হবে।

مِمَّا হলো مِنْ ও مَا-এর যুক্তরূপ। مِنْ হরফুল জারটি এখানে تَبْعِيْضِيَّة (আংশিকতাজ্ঞাপক)। مَا-টি ইসমে মাওসূল। পুরো অংশটি মুতা'আল্লিক হয়েছে يُنْفِقُوْنَ بَعْضَ مَا رَزَقْنَاهُمْ-এর সাথে। মূলরূপ হলো-

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الايَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ مِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الخ

সূরা ফাতিহায় বান্দার ভাষায় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলে সরল পথ লাভের প্রার্থনা করা হয়েছিল। বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ নাযিল করলেন হেদায়াতগ্রন্থ আল কুরআন। ইরশাদ করেছেন- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ; এরপর কতিপয় গুণাবলি আলোচনা করা হলো। এ সমস্ত গুণ যার মাঝে রয়েছে, সেই মুত্তাকী ও সফলকাম। আর ঐ গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে- ..... اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ থেকে পরবর্তী আয়াত الْمُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ..... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

তাকওয়ার সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি : তাকওয়ার দুটি অংশ। ১. اِمْتِثَالُ الْأَوَامِرِ : ভালো কাজগুলো করা। ২. اِجْتِنَابُ النَّوَاهِيْ : মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা। শরিয়তের কিছু কিছু বিধানের সম্পর্কে আত্মার সাথে এবং কোনো কোনোটির সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে প্রথম প্রকারকে ঈমান বলা হয়। হাদীস শরীফে এ দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে- .... اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَة অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানবলিকে আমল বলে। তা দু'প্রকার। ১. শারীরিক ২. আর্থিক। আয়াতে يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ দ্বারা শারীরিক ইবাদতসমূহ এবং مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ দ্বারা আর্থিক ইবাদতসমূহ উদ্দেশ্য।

'আকিদা বা বিশ্বাসমূহকে সংশোধন করার নাম عِلْمُ الكَلَام (ধর্মতত্ত্ব) এবং আমলসমূহকে সংশোধন করার অধ্যায়কে عِلْمُ الفِقْهِ (ফিকহশাস্ত্র) বলা হয়।

অন্তরকে পবিত্রকরণ ও অভ্যন্তরকে পরিষ্কারকরণ হলো علم الاخلاق; একে تصوف ও اِحْسان বলা হয়। উচ্চস্তরের মুত্তাকীর জন্যে উক্ত তিনটিই আবশ্যক। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯]

اِيْمَان بِالغَيْب-এর ব্যাখ্যা

ঈমানের সংজ্ঞা : اِيْمَان শব্দটি باب الافعال-এর মাসদার। أَمْنٌ মূলবর্ণ থেকে নির্গত। যার অর্থ– নিরাপদ ও আশ্বস্ত হওয়া। যেমন কুরআনে রয়েছে- أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ (তারা কি আল্লাহ তা'আলার কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে?) শরিয়তের পরিভাষায় বিভিন্নরূপে ঈমানের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যদিও সবগুলোর সারকথা প্রায় একই। তা হলো–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ اِعْتِمَادًا عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তা তাঁর প্রতি আস্থা রেখে বিশ্বাস করা। [দরসে মিশকাত : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭]

আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মিল হলো যে, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনল, সে রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা থেকে নিজেকে নিরাপদ করে নিল। এভাবে সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করল। -[প্রাগুক্ত]

অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বাহ্যিক বস্তুতে বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয় : মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আয়াতে বলা হয়েছে- يُؤْمِنُوْنَ بالغيب; এর থেকে বুঝা গেল, অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোনো বস্তু দেখে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে ঈমান বলা হবে না। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা ও এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর অন্য ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। কারণ, এতে বক্তার কোনো প্রভাব বা দখল নেই। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর কোনো সংবাদ কেবলমাত্র রাসূল ﷺ-এর প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নিলেই শরিয়তের পরিভাষায় তাকে ঈমান বলা হবে। [মাআরিফুল কুরআন]

ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য : আভিধানিকভাবে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, আর ইসলামের সম্পর্ক অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। কিন্তু শরিয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়; একটি অপরটির জন্যে আবশ্যক। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল ﷺ-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ না হবে।

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থ বহন করলেও এবং অর্থের পার্থক্যের কারণে কুরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের কথা বলা হলেও ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান শরিয়ত সমর্থন করে না। প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কুরআনের ভাষায় একে বলা হয় নিফাক। নিফাককে কুফরের চেয়েও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করে কুরআনে বলা হয়েছে- اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।

একইভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কুরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়। কুরআনে ইরাশাদ হয়েছে- يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَائَهُمْ অর্থাৎ, আহলে কিতাব কাফেররা রাসূল ﷺ এবং তাঁর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে আপন সন্তানদেরকে।

অন্যত্র ইরাশাদ হয়েছে- وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا অর্থাৎ, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকারবশত।

ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, তবে শুরু ও শেষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ইসলাম প্রকাশ্য আমল থেকে শুরু হয়ে অন্তরে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌঁছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। একইভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য বিশ্বাসের সাথে না হলে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাযালী এবং ইমাম সুবকী (র)-ও এ মত পোষণ করেছেন। [মা'আরিফুল কুরআন]

ঈমানের প্রকারভেদ : ঈমান দু'প্রকার। যথা-

১. اِيْمَان اِجْمَالِى তথা সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করা। যেমন– উপরিউক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেসব বিষয়ের উপর মৌলিকভাবে বিশ্বাস করা।

২. اِيْمَان تَفْصِيْلِى তথা বিশদভাবে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, সকল আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির উপর পৃথক পৃথক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঈমান আনা।

غَيْبٌ-এর পরিচয় : غَيْب শব্দটি বাবে ضرب-এর মাসদার, এর আভিধানিক অর্থ- অজ্ঞাত হওয়া, অদৃশ্য বা পোপন হওয়া, চোখের আড়াল হওয়া, যেমন- اَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِيْنَ; غَيْب-এর এক অর্থ অন্তরও; কেননা, অন্তর তো অদৃশ্য যা কেউ দেখতে পায় না। কুরআনের শব্দটি ৪৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। غَيْب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংবাদ রাসূল ﷺ দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যেমন- কেয়ামতের নিদর্শনাবলি, কবরের শাস্তি, হাশর, পুলসিরাত, মিজান, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি।

নিম্নে উলামায়ে কেরাম হতে বর্ণিত غَيب-এর কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

১. তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে- اَمَّا الْغَيْبُ : فَمَا غِيْبَ عَنِ العِبَادِ مِنْ أَمْرِ الجَنَّةِ وَأَمْرِ وَمَا ذُكِرَ فِى القُرْاٰنِ অর্থাৎ, গায়েব বলা হয় ঐ জিনিসকে, যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে। যেমন- জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থাসমূহ এবং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়াবলি।

২. আল্লামা কাযী বায়যাভী (র) লিখেছেন-

اَلْمُرَادُ بِهٖ (اَيِ الغَيْب) الْخَفِىُّ الَّذِىْ لَا يُدْرِكُهُ الحِسُّ وَلَا يَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ.

অর্থাৎ, গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য এমন গোপন বিষয়, যা মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মেধা দ্বারা জানা সম্ভব নয়। [তাফসীরে বায়যাভী : পৃষ্ঠা ১৮]

৩. شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّة-এর ভাষ্যগ্রন্থ নিবরাসে উল্লেখ রয়েছে-

وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِّ وَالْعِلْمِ الضَّرُوْرِىِّ وَالْعِلْمِ الْاِسْتِدْلَالِىِّ وَاَمَّا مَا عُلِمَ بِحَاسَّةٍ اَوْ ضَرُوْرَةٍ اَوْ دَلِيْلٍ فَلَيْسَ بِغَيْبٍ.

এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য হলো, পাঞ্চেন্দ্রিয়, সুনিশ্চিত জ্ঞান ও প্রামাণিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের বাইরে যে বিষয়াবলি রয়েছে, তাকে গায়েব বলে। পক্ষান্তরে, কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কিংবা ইলমে জরুরি কিংবা অন্য কোনো দলিলের ভিত্তিতে যা জানা যাবে, তা গায়েব নয়। [নিবরাস : পৃষ্ঠা ৫৭৫]

৪. প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে-اَلْغَيْبُ هُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَلَا اِطَّلَعَ مَخْلُوْقٌ অর্থাৎ, ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয়, যার উপর কোনো দলিল বিদ্যমান নেই এবং কোনো মাখলুক সে বিষয়ে অবগত নয়।

গায়েবের প্রকারভেদ : গায়েব প্রথমত দু'প্রকার। ১. غَيْب مُطْلَق, ২. غَيْب اِضَافِى;

غَيْب مُطْلَق যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং বস্তুগত যন্ত্রপাতি বা উপায়-উপকরণ দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন- আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর পবিত্রতা ইত্যাদি।

আর غَيْب إضَافِي বলতে বুঝায়, একটি জিনিস কোনো কোনো সূত্রে ও পরিবেশে গায়েব হলেও অন্য ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তা গায়েব না-ও হতে পারে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির জন্যে যা গায়েব, অন্য ব্যক্তির জন্যে তা গায়েব নাও হতে পারে। যেমন- শুক্রকীট, অতীতে তা গায়েব ছিল, বর্তমানে তা নয়। কেননা, তা যতই সূক্ষ্ম হোক, বর্তমানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির কারণে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে সৌরলোকের নানা স্থানে অবস্থিত অনেক বস্তু এবং পৃথিবীরও অনেক সূক্ষ্ম জিনিস সাধারণ খোলা চোখে গায়েব মনে হলেও প্রযুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট দেখা যায়।

পক্ষান্তরে غيب مطلق-এর অবস্থায় কখনোই কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না। ক্ষেত্র ও অবস্থানে যতই পার্থক্য হোক না কেন। এই পর্যায়ের জিনিসসমূহের প্রতি মানুষকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে; যদি তার অস্তিত্ব ও অবস্থিতি সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। [আল কুরআনে নুবয়ত ও রিসালাত : পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৬]

غَيْب مُطْلَق আবার দু'প্রকারে বিভক্ত। তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়াতে সে প্রকারদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো-

وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِىْ اُرِيْدَ بِقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهٖ وَالنُّبُوَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْاَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَحْوَالِهٖ مِنَ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُرَادُ هٰهُنَا. (رُوْحُ البَيَانِ؛ حَاشِيَةُ جَلَالَيْن ص ٤ ح ٢١)

উল্লেখ্য, কোনো কিছু গায়েব হওয়ার ব্যাপারটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আল্লাহর ক্ষেত্রে গায়েব-অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বলতে কিছু নেই। কেননা, কোনো বস্তুই তাঁর অগোচরে নেই। এ কারণেই কুরআনে বলা হয়েছে- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থাৎ, তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সর্ববিষয়ে অবগত।

আলোচ্য আয়াতে ঈমান বিল গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্য বিশ্বাসের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হেদায়াত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম ঈমান বিল গায়েবের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 'আকিদাতুত-তাহাভী' ও 'আকায়েদে-নাসাফী'-তে এসব বিষয় মেনে নেওয়াকেই ঈমান বিল গায়েব বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ দ্বারা ঈমানের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলি এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোজখের অবস্থা, কেয়ামত ও কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানি কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলের আলোচনা বিস্তারিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সন্দেহ নিরসন : এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত রিপোর্ট ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেকে গায়েব শব্দটি আভিধানিক অর্থে বুঝে নিয়ে যেসব বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে তাকে 'গায়েব' বলে অভিহিত করে থাকে। ফলে নানা প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে। যেমন– রোগীর শরীর দেখা, এক্স-রে বা আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে রোগী সম্পর্কে বিভিন্ন খবর বা আবহাওয়াবিদদের প্রদত্ত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস শুনে অনেকে মনে করে যে, গায়েবের ইলম আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; অথচ এখন তা মানুষও জানে।

এসব প্রশ্নের উত্তর হলো, 'ইলমে গায়েব' বলা হয়, কোনো মাধ্যম বা কোনো নিদর্শন ব্যতীত অদৃশ্যের সংবাদ জানাকে। বৃষ্টির খবর আবহাওয়াবিদরা বায়ুর চাপ ও প্রবাহ, বাতাসের গতি, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করার পর বলে। অর্থাৎ, ঝড়-বৃষ্টির নিদর্শন ও আলামত পাওয়ার পর তারা ঝড়-বৃষ্টির খবর দেয়। তাদের এ খবর আলামতের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। সুতরাং এ ধরনের সংবাদ দেওয়া 'ইলমে গায়েব'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ঝড়-বৃষ্টির নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, কখন এবং কোথায় বৃষ্টি হবে। এটা হলো, 'ইলমে গায়েব'। এ ইলম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নেই।

একইভাবে আল্ট্রাসনোগ্রাফ ইত্যাদির মাধ্যমে গর্ভজাত সন্তানের অবস্থা জানাও ইলমে গায়েব নয়। কারণ, ডাক্তারগণ এ সংবাদ দিতে পারে সন্তানের দেহে রূপ আসার পর। আর আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে অনাদিকাল থেকেই জানেন। কুরআনে বর্ণিত وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ-এর অর্থও তা-ই।

সারকথা হলো, আবহাওয়া বিভাগের খবর, শিরা দেখে বা এক্স-রে করে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া, গর্ভজ সন্তানের অবস্থা জানা ইত্যাদি হলো উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অর্জিত ইলম। এটা ইলমে গায়েব নয়। আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তা ও হাসপাতালের ডাক্তাররা এসব খবর তখনই দিতে পারে যখন এসবের উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে তা প্রকাশ পায় না। শুধু বিশেষজ্ঞরা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জানতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের নিকট এগুলো অজানা থাকে। কিন্তু উপকরণ ও লক্ষণাদি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তার খবর দেওয়া যায় না। সেটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

ঈমান বিল গায়েবের শ্রেষ্ঠত্ব : কোনো কিছুকে দেখার কিংবা বুঝার পর বিশ্বাস করা বা মেনে নেওয়ার চেয়ে শুধু কেউ বলার কারণে মেনে নেওয়া বা বিশ্বাস করা উত্তম। কেননা, প্রথম পদ্ধতিতে নিজের চক্ষু ও বিবেকের উপর ভরসা করা হলো। নবী করীম ﷺ-এর উপর প্রকৃত ঈমান আনার অর্থ এটাই যে, শুধু তিনি বলার কারণে বিশ্বাস করে নেওয়া এবং অন্য কোনো প্রমাণাদির অপেক্ষা না করা।

ঈমান বিল গায়েবের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হলো-

১. রাসূল ﷺ সাহাবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কাদের ঈমান খুবই বিস্ময়কর? তাঁরা বললেন, ফেরেশতাদের। তিনি বললেন, ফেরেশতরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকেন, তাঁর নির্দেশাবলি পালন করেন, তাঁরা ঈমান কেন আনবেন না? সাহাবীগণ (রা) আরজ করলেন, তাহলে আপনার সাহাবীদের ঈমান অধিক বিস্ময়কর। তিনি বললেন, আমার সাহাবীরা শত শত মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলি দেখে, তাদের ঈমান আনার মধ্যে বিস্ময়ের কী আছে? তারপর তিনি নিজেই ইরশাদ করলেন, বিস্ময়কর ঈমান তাদের হবে, যারা আমার পরে আগমন করবে; কিন্তু আমাকে না দেখেই শুধু আমার নাম শুনে সত্য অন্তরে আমার উপর ঈমান আনবে। তারা আমার ভাই এবং তোমার আমার সাথি। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০]

২. হারিস ইবনে কায়স নামক এক তাবেয়ী রাসূল ﷺ-এর একজন সাহাবী (রা)-এর নিকট আরজ করলেন, আফসোস! আমরা রাসূল ﷺ-এর দর্শন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এটা সত্য যে, তোমরা ঐ বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত রয়েছ; কিন্তু তোমরা একটি বড় নিয়ামতপেয়েছ যে, তোমরা রাসূল ﷺ-কে দেখা ব্যতীত তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ। যে তাঁকে দেখেছে তার কাছে হাজার প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর নবুয়ত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তারপরও যদি সে ঈমান না আনে, তবে সে আর কী করবে? ঈমান হচ্ছে তোমাদের। কেননা, তোমরা তাঁকে না দেখে ঈমান এনেছ। -[প্রাগুক্ত]

৩. সুনানে আবূ দাউদ (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি কি রাসূল ﷺ-কে স্বচক্ষে দেখেছেন? স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলেছেন? এবং নিজ হাত দ্বারা তাঁর বরকতময় হাত ধরে বায়'আত হয়েছেন? তিনি সবকটি প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ' বললেন। প্রশ্নকারী এটা শুনে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাচ্ছি, যা রাসূল ﷺ থেকে আমি শুনেছি। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখে ঈমান গ্রহণ করল তার জন্যে সুসংবাদ, আর যে আমাকে না দেখে ঈমান আনল, তার জন্যে অনেক বেশি সুসংবাদ। [প্রাগুক্ত]

اِقَامَةُ الصَّلَاة-এর ব্যাখ্যা : ঈমান বিল গায়েবকে মুত্তাকীদের প্রথম পরিচয়রূপে তুলে ধরার পর দ্বিতীয় পরিচয় হিসেবে বলা হয়েছে যে, বাস্তবজীবনে নামাজ কায়েমকারী। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন জায়গায় اِقَامَة الصَّلٰوة তথা নামাজ কায়েম করার নির্দেশ এসেছে। উলামায়ে কেরাম নামাজ কায়েম করার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন–

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন- اِقَامَة الصَّلٰوة-এর অর্থ হলো জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা।

২. আল্লামা জাওযী (র) বলেন– اِقَامَة الصَّلٰوة বলা হয় নামাজের মাসয়ালা-বিষয়ক জ্ঞান ও তার প্রশিক্ষণ লাভ করে যথারীতি নামাজ আদায় করাকে।

৩. মোল্লা জিউন (র) বলেন- اِقَامَة الصَّلٰوة বলা হয় تَعْدِيْلُ الْاَرْكَان বজায় রেখে নামাজ আদায় করাকে।

৪. কেউ কেউ বলেন, অলসতা ও অবহেলা না করে সময়মতো নামাজ আদায় করাকে اِقَامَةُ الصَّلٰوة বলা হয়।

৫. কারো কারো মতে, অলসতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করে নামাজ আদায় করাকে اِقَامَة الصَّلٰوة বলা হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী–

ক. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ

খ. وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

৬. কেউ কেউ বলেন, বিনয় নম্রতা ও একনিষ্ঠতাসহ নামাজ আদায় করাকে اِقَامَةُ الصَّلٰوة বলা হয়।

৭. অনেকের মতে- اِقَامَةُ الصَّلٰوة দ্বারা নামাজের রোকনগুলোকে যথাযথ ও ধীরস্থিরভাবে আদায় করা অথবা সকল শর্তের সাথে এবং স্থায়ীভাবে নামাজ আদায় করা উদ্দেশ্য।

৮. আল্লামা বায়যাভী (র) اِقَامَةُ الصَّلَاة-এর চারটি অর্থ বর্ণনা করেছেন–

١. تَعْدِيْلُ الْاَرْكَان ٢. الْمُوَاظَبَةُ ٣. التَشَمُّرُ لِاَدَاءِ الصَّلَاةِ ٤. اَدَاءُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا

ক. প্রথম অর্থের ভিত্তিতে يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاة-এর ব্যাখ্যা হলো- يَعَدِّلُوْنَ اَرْكَانَ الصَّلَاةِ; আর تَعْدِيْلُ الاَرْكَان-এর মর্মার্থ হলো, নামাজের রোকনসমূহ এমনভাবে আদায় করা, যাতে তার মাঝে পঠিত তাসবীহ, তাহমীদ কিংবা কুরআনের আয়াতগুলো ধীরস্থিররূপে তাজভীদ অনুযায়ী আদায় করা যায়। اقامة-এর এ অর্থটি اَقَامَ العود بِمَعْنٰى قَوَّمَهُ থেকে নির্গত। اَقَامَ الْعود বলা হয় কাঠকে যখন সমান করা হয় এবং তার বক্রতা দূর করা হয়। مُشْتَق مِنْهُ ও مشتق-এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা হলো- যেভাবে تَقْوِيْم الْعُوْد দ্বারা কাঠ বা খুঁটি সোজা হয়ে যায়। একইভাবে تَعْدِيْلُ الْاَرْكَان-এর কারণে নামাজের রোকনসমূহ সঠিক হয়।

খ. مُوَاظَبَة-এ অর্থটি اَقَمْتُ السُّوْقَ থেকে নির্গত। এ বাক্যটি তখন বলা হয়, যখন কেউ বাজারকে চালু করে। আর বাজার চালু হয় নিয়মিত বেচাকেনা হওয়ার মাধ্যমে। নামাজ নিয়মিত আদায় করার অর্থ হলো, সেটি আগ্রহের বিষয়। যেমনিভাবে চালু বাজার ব্যবসায়ীদের আগ্রহের বিষয়।

গ. اِقَامَة-এর তৃতীয় অর্থ হলো, تَشَمَّرَ لِلْاَدَاءِ তথা কোনো প্রকার অলসতা ও উদাসীনতা ছাড়া নামাজ আদায় করা। এ অর্থটি قَامَ بِالْاَمْرِ وَاَقَامَهُ থেকে নির্গত; যার অর্থ হলো, আগ্রহ-উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সাথে কোনো কাজ করা।

ঘ. اِقَامَة দ্বারা اَدَاءُ الصَّلَاة উদ্দেশ্য হতে পারে এভাবে যে, يُقِيْمُوْنَ-এর همزة-টি تَسْعِيْر-এর জন্যে। يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاة-এর অর্থ হলো নামাজকে قِيَام সম্বলিত করা। আর قِيَام দ্বারা এখানে সবকটি রোকনকে পরিপূর্ণ আদায় করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, جُز বলে كُل বুঝানো হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ-এর মাঝে হয়েছে। আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, এ চারটির মাঝে প্রথম অর্থটিই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, إِقَامَة অর্থ শুধু নামাজ পড়া নয়; বরং যথাযথ হক আদায় করে নামাজের সমস্ত বিধান সম্পন্ন করা। নামাজের সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই إِقَامَةُ الصَّلَاة-এর অন্তর্ভুক্ত। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাজের জন্যে একই শর্ত। এক কথায় নামাজে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই হলো ইকামতে সালাত।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাখ্যা : মুত্তাকীদের আরেকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহর দেওয়া সম্পদ তারা আল্লাহরই দীনের জন্যে, সত্যের পথে ব্যয় করে; আল্লাহর নাফরমানিতে গর্হিত কাজে ব্যয় করে না। আল্লাহর পথে ব্যয় দ্বারা এখানে ফরজ, ওয়াজিব এবং নফল দান-খায়রাত প্রভৃতি সকল প্রকারের ব্যয় উদ্দেশ্য। অবশ্য কুরআনে সাধারণত إِنْفَاق শব্দটি নফল দান-খয়রাতের জন্যেই ব্যবহার হয়েছে। আর ফরজ জাকাতের ক্ষেত্রে সাধারণত زَكٰوة শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, مَا رَزَقْنٰهُمْ-এর ব্যাপকতার মধ্যে ইলমের প্রচার-প্রসারও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, একজন আলেমের দায়িত্ব হলো, নিজের ইলম দ্বারা ছাত্র ও জনসাধারণের উপকার করা।

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ-এ مِنْ যোগ করার কারণ : আয়াতে مِمَّا অংশটুকু দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে না; বরং কিয়দংশ ব্যয় করতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে রিজিককে নিজ সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়েছেন, যত প্রকারের এবং যত পরিমাণের নিয়ামতই মানুষ পেয়ে থাকে, সবই আল্লাহ তা'আলার দান ও করুণার ফল, মানুষের নিজস্ব কিছুই নেই। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩]

আরো চিন্তার বিষয় হলো, এখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিজিক থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, 'রিজিক' হতে পারে শুধুমাত্র মুবাহ বস্তু। নিষিদ্ধ সামগ্রী এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যা চুরি করা হয়েছে এবং অন্যের প্রতি জুলুম করে নেওয়া হয়েছে, তা রিজিক বলে গণ্য হতে পারে না। এসব সামগ্রী আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করে বলা যায় না যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন; বরং আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। রিজিক হলে তা ব্যয় করাও জায়েজ হবে। অন্যকে দান করা বা তা দিয়ে কোনো নেক কাজ করা বৈধ। কিন্তু আলেমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, অন্যায়ভাবে অর্জিত মাল-সম্পদ সদকা করা হারাম। নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ (চুরি করা মালের সদকা কবুল হয় না)। [মাআরিফুল কুরআন]

সদকার নির্দেশের পদ্ধতি : মানুষ স্বভাবগতভাবে কৃপণ হয়, ফলে নিজেদের পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ খরচ করতে পছন্দ করে না। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে আলোচনা করেছেন যাতে বান্দার জন্যে দান-সদকার আদেশকে অযাচিত মনে না হয়। বান্দা তো নিজের শক্তিতে কিছু অর্জন করতে পারে না; বরং বান্দার মালিকানাধীন সকল সম্পদ তো আল্লাহরই দান। সেখান থেকে কিছু অংশ দান করার আদেশ মোটেই অযৌক্তিক নয়। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১]

আয়াতের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম إِيْمَان بِالْغَيْب-এর আলোচনা করেছেন। অতঃপর إِقَامَةُ الصَّلٰوة ও إِنْفَاق فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه-এর আলোচনা করেছেন। কারণ, ঈমান হলো সকল আমলের মূল ভিত্তি। তারপর আমলের আলোচনা এসেছে। কারণ, তাকওয়া এবং পরিপূর্ণ ঈমাণের জন্যে আমলেরও প্রয়োজন রয়েছে।

শুধুমাত্র উল্লিখিত আমলগুলো বর্ণনার কারণ : শরিয়তের ফরজ ও ওয়াজিব আমলের সংখ্যা অনেক। কিন্তু মুত্তাকীদের গুণাবলি হিসেবে শুধুমাত্র নামাজ ও সম্পদ ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, মানুষের জিম্মায় যতগুলো আমল ফরজ বা ওয়াজিব হিসেবে আরোপিত রয়েছে, সেগুলোর সম্পর্ক হয়তো মানুষের সত্তার সাথে অথবা তার সম্পদের সাথে। শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ। আর আর্থিক ইবাদতের সকল শাখা-প্রশাখা انفاق শব্দের মাঝে নিহিত রয়েছে। তাই দুটি আমলের কথা উল্লেখ করা হলেও সমস্ত আমল এ দু'টি প্রকারের মাঝে নিহিত। আর ঈমান-আমলের সমষ্টিই হলো ইসলাম। এর দ্বারা ঈমানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤. ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ﴾ أَيِ الْقُرْآنَ ﴿وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أَيِ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَغَيْرَهُمَا، ﴿وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾ يَعْلَمُوْنَ.

৪. এবং যারা বিশ্বাস করে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে অর্থাৎ, কুরআন এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আর তারা আখেরাতকে নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে নিশ্চিত বলে জানে।

٥. ﴿اُولٰٓئِكَ﴾ اَلْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ ﴿عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ اَلْفَائِزُوْنَ بِالْجَنَّةِ، اَلنَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ.

৫. তারাই অর্থাৎ, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা তাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম অর্থাৎ, জান্নাত অর্জনকারী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভকারী।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : يُوْقِنُوْنَ - يَعْلَمُوْنَ

একীনের স্তর নির্ণয় : يُوْقِنُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির (র) يَعْلَمُوْنَ শব্দটি উল্লেখ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হলো- يَقِيْن তিন প্রকার। ১. عِلْمُ الْيَقِيْن ২. عَيْنُ الْيَقِيْن ৩. حَقُّ الْيَقِيْن; একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটির পরিচয় তুলে ধরা হলো। কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে জানল যে, আগুন বস্তুকে পুড়িয়ে দেয়। এ অবস্থার বিশ্বাসকে عِلْمُ الْيَقِيْن বলে। তারপর বস্তুকে সে আগুনে জ্বলে যেতে দেখল। এ অবস্থায় তার বিশ্বাসকে عَيْنُ الْيَقِيْن বলা হবে। অতঃপর সে নিজেই নিজের আঙ্গুল আগুনে দিয়ে দেখল যে, বাস্তবেই আগুন পুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এ অবস্থায় তার যে বিশ্বাস তৈরি হলো, তাকেই বলা হয় حَقُّ الْيَقِيْن;

এ পর্যায়ের একীন ও বিশ্বাস সকলের দ্বারা সম্ভব হয় না। কেবল নবীগণই এমন একীনের অধিকারী হতে পারেন। মুফাসসির (র) يَعْلَمُوْن শব্দ দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, শরিয়তের উসূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে يَقِيْن-এর তিনটি স্তর থেকে এখানে প্রথম স্তর তথা عِلْمُ الْيَقِيْن-ই উদ্দেশ্য। [শায়খুল হাদীস আল্লামা আলতাফ হুসাইন (র.)-এর মুখ নিঃসৃত]

قَوْلُهٗ : النَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ

নাজাতের ব্যাখ্যা : এখানে নাজাত দ্বারা ابتداء এবং انتهاء উভয় প্রকার নাজাত ও মুক্তি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মুত্তাকীরা শুরু থেকেই অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকবে। পক্ষান্তরে পাপী মুমিনগণ শুরুতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর পবিত্র হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

الْآخِرَة : সীগাহ اسم فاعل বহছ واحد مؤنث মাসদার اَلْأَخِرَةُ মূলবর্ণ (أ - خ - ر) জিনস مهموز فاء অর্থাৎ, বিলম্বিত, পশ্চাদবর্তী, পরকাল। آخِرٌ শব্দটি أَوَّل-এর বিপরীতার্থবোধক। অর্থাৎ, শেষ, সমাপ্তি। কেয়ামত যেহেতু দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার পর হবে তাই তাকে آخِرَة বলা হয়। কাদিয়ানীরা بِالْآخِرَةِ-এর তরজমা করে 'শেষ যুগের ওহী' বলে। এটা আরবি ভাষার সাথে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪]

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْإِيْقَانُ মূলবর্ণ ي - ق - ن জিনস مثال يائي অর্থ- তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে। إِيْقَان বলা হয়-

اِتْقَانُ الْعِلْمِ بِنَفْيِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ عَنْهُ نَظَرًا وَاسْتِدْلَالًا.

অর্থাৎ, সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ইলমকে সুদৃঢ় করা। إِيقَان বা يقين-এর অর্থ কোনো বিষয় নিছক যুক্তিতর্কে মেনে নেওয়ার বশে কিংবা অগভীর ও ভাসা ভাসাভাবে শুধু শব্দসর্বস্ব স্বীকৃতি দেওয়া নয়; বরং একীন হলো, মনে-প্রাণে এমনভাবে বিশ্বাস করা যে, ইচ্ছা, অনুভূতি ও মস্তিষ্ক সবকিছু তাতে সায় দেয়। মোটকথা, সন্দেহাতীত জ্ঞানকে একীন বলা হয়। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪]

اَلْمُفْلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহুছ اسم فاعل বাব افعال মাসদার اَلْإِفْلَاحُ মূলবর্ণ (ف - ل - ح) জিনস صحيح অর্থ– সফল, কৃতকার্য, কামিয়াব।

আরবি অভিধানশাস্ত্রের ইমাম যুবায়দী (র) বলেন–

لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كُلِّهِ أَجْمَعُ مِنْ لَفْظِ الْفَلَاحِ لِخَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থাৎ, আরবি ভাষায় দুনিয়া ও আখেরাতের সমগ্র কল্যাণ বোঝানোর জন্যে فَلَاحٌ-এর চেয়ে উত্তম ও সমৃদ্ধ কোনো শব্দ নেই। আল্লামা থানভী (র) বলেন, اَلْمُفْلِحُوْنَ অর্থ হলো– اَلْكَامِلُوْنَ فِى الْفَلَاحِ فَلْحٌ শব্দের অর্থ– বিদীর্ণ করা, কাটা। এ অর্থ থেকে কৃষককে فَلَّاحٌ বলা হয়। যেহেতু কৃষক মাটি বিদীর্ণ করে জমি চাষ করে থাকে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সফল হতে চায় সে বিভিন্ন বিপদ-আপদ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছায়। ইবনে ইসহাক বলেন-اَلْمُفْلِحُوْنَ : هُمُ الَّذِيْنَ اَدْرَكُوْا مَا طَلَبُوْا وَنَجَوْا مِنْ شَرِّ مَا هَرَبُوْا অর্থাৎ, সফল ব্যক্তি হলো, যারা নিজেদের চাওয়া-পাওয়া পেয়ে গেছে এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে মুক্তি পেয়েছে। কেউ কেউ সফলতার সংজ্ঞা দিয়েছেন- اَلظَّفَرُ بِالْمَطْلُوْبِ وَالنَّجَاةُ مِنَ الْمَرْهُوْبِ অর্থাৎ, উদ্দেশ্যে সফল ও ভয়ানক বিপদ থেকে মুক্তি। সফলতা দুই প্রকার– ১. ইহকালীন সফলতা : এমন স্বচ্ছলতা, যা দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে পারা যায়। ২, পরকালীন সফলতা : এটি বারোটি জিনিসের সমষ্টি। ক. অস্তিত্ব খ. সচ্ছলতা, গ. সম্মান, ঘ. জ্ঞান যাতে করে অনস্তিত্ব, অসচ্ছলতা, লাঞ্ছনা ও মুর্খতার লেশমাত্র থাকবে না। [তাফসীর মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ ..... هُمْ يُوْقِنُوْنَ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ الخ মাওসূল-সেলা আতফ হয়েছে পূর্ববর্তী ইসমে মাউসূলের উপর। واو-টি عاطفة, بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ অংশটুকু يؤمنون-এর মুতা'আল্লিক। وَمَا أُنْزِلَ ..... الخ অংশটি পূর্ববর্তী مَا أُنْزِلَ-এর উপর আতফ হয়েছে। وَبِالْآخِرَةِ هُمْ-এর واو-টি عاطفة; بِالْآخِرَةِ অংশটি يوقنون-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। জুমলায়ে ইসমিয়াটি مِمَّا ..... رَزَقْنَاهُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে।

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অংশটিতে جار ও مجرور-এর আগে আনা হয়েছে حَصْرْ-এর জন্যে। সে সাথে هُمْ -এর সংযোজন তার দৃঢ়তা আরো বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায়, মুত্তাকী মুমিনদের কাছে আখিরাত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐ একটি বিষয়েই যেন তারা ঈমান পোষণ করে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

اولئك হলো মুবতাদা। عَلٰى هُدًى অংশটুকু উহ্য খবরের সাথে متعلق। مِنْ رَّبِّهِمْ অংশটুকু هدى-এর উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক। এই জুমলায়ে ইসমিয়াটি اِسْتِئْنَافِيَة; এখানে هُدًى শব্দটিকে نكرة ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো হেদায়াতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো।

وَأُولٰئِكَ-এর واو-টি عاطفة; পরবর্তী জুমলায়ে ইসমিয়াটি পূর্ববর্তী ..... أُولٰئِكَ عَلٰى-এর উপর আতফ হয়েছে। أُولٰئِكَ মুবতাদা, هُمْ-টি ضَمِيْر الفَصْل হতে পারে। সেক্ষেত্রে এর তরকীবগত কোনো অবস্থান থাকবে না এবং পরবর্তী الْمُفْلِحُوْنَ খবর হবে। আর هُمْ মুবতাদাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে الْمُفْلِحُوْنَ তার খবর হবে। এই জুমলায়ে ইসমিয়াটি أُولٰئِكَ-এর খবর হবে।

هُمْ শব্দটি এখানে পার্থক্যকারীর ভূমিকা পালন করেছে যাতে اَلْمُفْلِحُوْن খবরটিকে صفة বলে ভ্রম না হয়। তা ছাড়া শব্দটি নিসবত বা বাক্যসংযোগকে জোরদার করেছে এবং الْمُفْلِحُوْن মুসনাদটি أُولٰئِكَ মুসনাদ ইলাইহির সাথে সম্পৃক্ত, এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى

هدى শব্দের নুসখা : ২নং আয়াতে উল্লিখিত هُدًى শব্দটির দু'ধরনের লিখনশৈলী পাওয়া যায়। যথা–

ক. রসমে উসমানীতে শব্দটি লিখিত হয়েছে هُدًى রূপে।

খ. প্রচলিত হিন্দুস্তানি জালালাইনের নুসখায় শব্দটি هُدٰے রূপে লিখিত হয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ الخ

আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াত থেকে দু'প্রকারের মুত্তাকীর আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে প্রথম প্রকারের মুত্তাকীর আলোচনা ছিল। আর প্রথম প্রকার হলো, আরবের মুসলমানগণ, যাদের কাছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত কোনো নবী আগমন করেনি। وَالَّذِيْنَ ..... يُؤْمِنُوْنَ এ আয়াতে থেকে দ্বিতীয় প্রকারের মুত্তাকীর আলোচনা শুরু হচ্ছে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো তাঁরা, যারা হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল এবং আখেরী নবী ﷺ-কে পেয়ে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আম্মার ইবনে ইয়াসার, সালমান ফারসী ও নাজ্জাশী প্রমুখ। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ ..... وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

অতীতকালবাচক শব্দ ব্যবহারের কারণ : এখানে أُنْزِلَ (নাযিল করা হয়েছে) মাযির সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তখনও পূর্ণ কুরআনি নাযিল হয়নি। এর সমাধানে আল্লামা সাভী (র) বলেন–

نُزِّلَ الْمُسْتَقْبَلُ مَنْزِلَةَ الْمَاضِى لِتَحَقُّقِ الْوُقُوْعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَمَّ نُزُوْلُهُ. (حَاشِيَةُ الصَّاوِى)

অর্থাৎ, যেগুলো এখনো অবতীর্ণ হয়নি, সেগুলোর অবতরণ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে مُسْتَقْبِل-কে মাযির স্থলে রাখা হয়েছে। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩]

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন– وَالتَّعْبِيْرُ عَنْ اِنْزَالِهِ بِالْمَاضِى مَعَ كَوْنِ بَعْضِهِ مُتَرَقَّبًا حِيْنَئِذٍ لِتَغْلِيْبِ الْمُحَقَّقِ عَلَى الْمُقَدَّرِ অর্থাৎ, আরবি নিয়ম تَغْلِيْب হিসেবে এমনটি করা হয়েছে। অর্থাৎ, নাযিলকৃত আয়াতসমূহকে নাযিল করা হয়নি এমন আয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, কুরআনের অন্য আয়াতে জিনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে- اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى. (الاَحْقَاف : ٣٠); অথচ জিনেরা তখনও পূর্ণ কুরআন শ্রবণ করেনি। এমনকি তখন পূর্ণ কুরআন নাযিলও হয়নি। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯]

রাসূল ﷺ শেষ নবী হওয়ার ইঙ্গিত : এ আয়াতের বর্ণনারীতি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ-ই শেষ নবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কুরআনের পরে যদি কোনো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে তাওরাত ও ইঞ্জিলসহ বিভিন্ন আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান আনার কথাও বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশি। কারণ, তাওরাত ও ইঞ্জিলসহ বিভিন্ন আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই সবার ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে সবাই কমবেশি অবগতও ছিল। তাই রাসূল ﷺ-এর পরেও যদি ওহী ও নবুয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং পূর্ববতী নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার মতো পরবর্তী কিতাব ও পরবর্তী নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু কুরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের আলোচনা রয়েছে, সব জায়গায় পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কোথাও পরবর্তী কোনো কিতাবের উল্লেখ নেই।

সকল নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক : পূর্ববর্তী নবী দ্বারা রাসূল ﷺ-এর পূর্বে প্রেরিত জানা-অজানা সকল নবী উদ্দেশ্য। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, ওহীর আগমন নতুন কিছু নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এ রীতি চলে আসছে। সুতরাং শুধু আখেরী নবীর প্রতি ঈমানই মুমিনের জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং সকল নবী-রাসূল ও তাদের কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩]

নবী করীম ﷺ-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, চাই সেটা وَحِي مَتْلُو তথা কুরআন হোক কিংবা وَحِي غَيْرِ مَتْلُو তথা হাদীস হোক অথবা তা কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবনকৃত ফিকহী ও শরয়ী বিধানাবলি হোক, একজন মুসলমানের জন্যে সবগুলো মানা অত্যাবশ্যক। এ বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী যে সকল পয়গাম্বর (আ.)-এর সময়ে লোকেরা যা কিছু এর সঙ্গে সংযোজন-বিয়োজন করেছে, সেগুলো নিঃসন্দেহে ভুল।

মোটকথা, ইসলামে প্রবেশ করার জন্যে যেমনিভাবে নবী করীম ﷺ-কে সত্যায়ন করা অত্যাবশক, তেমনিভাবে অতীতের সকল নবী-রাসূল ও তাদের কিতাবসমূহকেও সত্যায়ন করা অপরিহার্য। কেননা, সকল পয়গাম্বর (আ.)-এর নবুয়ত মূলত একই উৎস থেকে উৎসারিত। তাই এক নবীকে মিথ্যাবাদী বলা প্রকারান্তরে সকল নবীকেই মিথ্যাবাদী বলার সমতুল্য। তবে বিশ্বাস করার অর্থ এটি নয় যে, বর্তমানেও সেগুলোর অনুসরণ করতে হবে। কারণ, আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর সেগুলোর বিধান রহিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া বর্তমানে সে কিতাবগুলো পরিবর্তন ও বিকৃত হওয়ায় তা কালামে এলাহী বলে গণ্য নয়। অতএব, বর্তমানে কুরআনের বিধান তথা রাসূল ﷺ-এর আদর্শই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

তাফ.জালালাইন (অষ্টম খণ্ড) বাংলা-১৩ ক

মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য : মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়ন করা, কাউকে মিথ্যা ও প্রত্যাখান করা নয়। কুরআনের ইরশাদ- لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ; এ আয়াত ইহুদি-নাসারাদের বিপরীত এজন্যে যে, ওরা পরস্পর একে অপরকে শুধু মিথ্যাবাদী বলে ও প্রত্যাখ্যান করে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ
অর্থ– ইহুদিরা বলে, খ্রিষ্টানরা কোনো ভিত্তির উপরেই নেই এবং খ্রিষ্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো ভিত্তির উপরেই নেই। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى ..... هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

ফায়েদা : أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَّبِّهِمْ -এর মাঝে ঈমান ও তাকওয়ার পার্থিব ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। আর اولئك هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-এর মাঝে তার পরকালীন ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : প্রশ্ন হতে পারে مِنْ رَّبِّهِمْ থেকে বোঝা যায় যে, হেদায়াত দ্বারা আল্লাহর হেদায়াত উদ্দেশ্য এবং হেদায়াতদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। অথচ একথাটি مِنْ رَّبِّهِمْ উল্লেখ না করলেও বুঝে আসে। কেননা, কুরআনের আয়াত اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ-এর মাঝে অন্যের থেকে হেদায়াতকে নাকচ করা হয়েছে। আর وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ-এর মাঝে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা দ্বারা বোঝা যায়, হেদায়াত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু এখানে هُدًى-কে نكرة ব্যবহার করে বড় ধরনের হেদায়াতকে বোঝানো হয়েছে, যা অন্য কারো কাছ থেকে প্রাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। তাহলে এখানে مِنْ رَّبِّهِمْ বলার হেকমত কী?
এর উত্তর হলো, এখানে مِنْ رَّبِّهِمْ শব্দটি হেদায়াতকারী নির্ণয় করার জন্যে ব্যবহৃত হয়নি; বরং هُدًى-এর মাঝে نكرة হিসেবে যে تَعْظِيْم বা মর্যাদার অর্থ রয়েছে, তাকে আরো জোরদার করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, এ হেদায়াতের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে এবং তিনিই তা প্রদানকারী। আর যে জিনিস আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, তা খুবই মর্যাদাপূর্ণ।

মুত্তাকীদের পরিচয় বর্ণনার পদ্ধতি : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কোনো সংজ্ঞা উল্লেখ না করে শুধু গুণাবলি উল্লেখ করে দিয়েছেন। যার মাঝে এমন গুণাবলি পাওয়া যাবে, সে-ই মুত্তাকী। অতঃপর عَلٰى শব্দ দ্বারা তাঁদের হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি এভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যেমনিভাবে আরোহী সাওয়ারির উপর ক্ষমতাশীল হয়, তদ্রূপ মুত্তাকীগণ হেদায়াতকে সওয়ারির ন্যায় করে নিয়েছেন। এ উপমার মধ্যে তাঁদের স্বনির্ভরতা, সঠিক হওয়া ও দৃঢ় হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়াতের পথে অবিচল থাকার ফলে তাঁরা এখন সত্যের নিক্তি ও হেদায়াতের মাপকাঠি হয়ে গেছেন। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২]

মু'তাযিলাদের দাবি খণ্ডন : هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-এর মধ্যে هم যমীর দ্বারা পরিপূর্ণ হেদায়াত ও وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ এবং পরিপূর্ণ কল্যাণের সীমাকে বুঝানো হয়েছে; সাধারণ হেদায়াত ও কল্যাণকে নয়। অর্থাৎ, এ হচ্ছে বিশ্বাস ও কল্যাণের পরিপূর্ণতা। তাই এ শব্দগুলো দ্বারা মু'তাযিলারা নিজেদের দাবির পক্ষে দলিল পেশ করে থাকে। এভাবে যে, কল্যাণ ও হেদায়াত শুধু ঐ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যেই খাস, যারা পরিপূর্ণভাবে কল্যাণ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। পাপী মুমিন অথবা গুনাহগাররা এর থেকে বহিষ্কৃত এবং দোজখের উপযুক্ত।
এর উত্তর হলো, এখানে সাধারণ কল্যাণের সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে দুটি তালিকা হবে, একটি কামেল ঈমানদার অপরটি হলো নাকেস তথা মুমিন পাপীদের। এখানে কল্যাণের পরিপূর্ণতার সীমা বর্ণনা করার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পাপী মুমিন কল্যাণের পরিপূর্ণতা থেকে অবশ্যই বঞ্চিত থাকবে। যদিও সাধারণ কল্যাণের নগণ্য একজন হিসেবে থেকে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। এ মতই হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

ইস্তেয়ারা তাবইয়্যাহ : عَلٰى হরফে জার; اِسْتِعْلَاء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ (যায়েদ ছাদের উপর)। কিন্তু এখানে عَلٰى তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, هُدًى বা هِدَايَة একটি مَعْنَوِى বস্তু। এটি অনুভব বা স্পর্শ করার মতো বস্তু নয়। অথচ اِسْتِعْلَاء حَقِيْقِى-এর জন্যে مُسْتَعْلٰى عَلَيْهِ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বোঝা গেল এখানে عَلٰى-এর ব্যবহার حقيقى অর্থে হয়নি; বরং استعارة تبعية হিসেবে হয়েছে। এখানে হেদায়াতের উপর মুত্তাকীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি এ ব্যক্তির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো সওয়ারির উপর রয়েছে। এভাবে তাশবীহ দিয়ে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার অন্তরে বিষয়টি প্রোথিত করা। কারণ, কোনো مَعْقُوْلِى বস্তুকে مَحْسُوْسِى বস্তুর আকারে উপস্থাপন করা হলে হৃদয়পটে অধিক পরিমাণে রেখাপাত করে। সুতরাং এখানে عَلٰى ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ সকল লোক হেদায়াতকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং হেদায়াতের উপর মজবুতভাবে স্থির আছে। [মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র.) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى ..... وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

পুনরুল্লেখ করা : আয়াতটিতে দু'বার أُولٰئِكَ শব্দটি উল্লেখ করে মুত্তাকীদের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে ইশারা করা হয়েছে। তা ছাড়া هُمْ যমীরটি উল্লেখের মাধ্যমে বক্তব্যে حصر সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারীগণই শুধুমাত্র সফলকাম, অন্যরা নয়।

٦. ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ كَأَبِيْ جَهْل وَأَبِيْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِه ﴿أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾ لِعِلْمِ اللهِ مِنْهُمْ ذٰلِك فَلَا تَطْمَعْ فِيْ إِيْمَانِهِمْ. وَالْإِنْذَارُ إِعْلَامٌ مَعَ تَخْوِيْفٍ.

৬. নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে যেমন আবূ জাহেল, আবূ লাহাব এবং তাদের মতো অন্যান্যরা তাদের জন্যে উভয়ই সমান; আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন ءَأَنْذَرْتَهُمْ-এ ব্যবহৃত হামযাদ্বয়কে আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে আলিফে রূপান্তরিত করে বা তাকে তাসহীলসহ বা তাসহীলকৃত ও তার পূর্ববর্তী হরফটির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে বা তাসহীল পরিত্যাগ করে পাঠ করা যায়। বা সতর্ক না করুন, তারা ঈমান আনবে না। যেহেতু তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। অতএব, আপনি তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে আশা করবেন না। الإنذار অর্থ হলো, ভয় প্রদর্শনসহ কাউকে কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَأَبِيْ جَهْلٍ وَأَبِيْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা সকল কাফের উদ্দেশ্য নয় : মুফাসসির (র.) كَأَبِيْ جَهْلٍ الخ অংশটি দ্বারা একটি সন্দেহ নিরসন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বলেছেন, কাফেররা ঈমান আনবে না। অথচ পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এবং মক্কা বিজয়ের পরে বহু কাফের ঈমান এনেছে।

মুফাসসির (র.) বলেছেন, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল কাফের উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধু সেসব কাফের উদ্দেশ্য, যাদের ঈমান না আনা আল্লাহর ইলমে রয়েছে। যেমন- আবূ জাহেল, আবূ লাহাব প্রমুখ। পরবর্তীতে لِعِلْمِ اللّٰهِ مِنْهُمْ ذٰلِك দ্বারা মুফাসসির (র.) এ উদ্দেশ্যটুকু স্পষ্ট করেছেন যে, আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের মতো ঐসব লোকও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত যাদের ঈমান না আনার বিষয়টি আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত রয়েছে।

قَوْلُهُ : بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ الخ

ءَأَنْذَرْتَهُمْ-এর কেরাতের বর্ণনা : এখানে ءَأَنْذَرْتَهُمْ-এর কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে মোট পাঁচটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১, ২. উভয় হামযা স্পষ্ট করে পড়বে। এ সুরতে দুটি কেরাত হবে। এক. দু'হামযার মাঝে আলিফ প্রবেশ করিয়ে পড়বে। যেমন- ءَأَأَنْذَرْتَهُمْ দুই. দু'হামযার মাঝে আলিফ প্রবেশ না করিয়ে পড়বে। যেমন- ءَأَنْذَرْتَهُمْ

৩, ৪. দ্বিতীয় হামযা তাসহীল করে পড়বে। এ সুরতেও দুটি কেরাত। এক. আলিফ প্রবেশ করিয়ে । যেমন- اانذرتهم দুই. আলিফ প্রবেশ না করে। যেমন- أَأَنْذَرْتَهُمْ

৫. তাসহীল না করে দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে। যেমন- اَنْذَرْتَهُمْ

تَسْهِيْل-এর ব্যাখ্যা : তাসহীলের পরিচয় হলো- جَعْلُ الْهَمْزَةِ بَيْنَه وَبَيْنَ الْحَرْفِ الَّذِيْ مِنْ جِنْسِ لَفْظِ اِعْرَابِ الْهَمْزَةِ যেমন- أأ-কে ا পড়া হবে إأ-কে ي পড়া হবে أي ও أأ-কে و পড়া হবে أو; অবশ্য কারো কারো অভিমত হলো, হামযার উচ্চারণ হামযা ও ০-এর মাঝামাঝি করাকে تَسْهِيْل বলা হয়। তবে অধিকাংশের মতে, তাসহীলের এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُه : فَلَا تَطْمَعْ فِيْ اِيْمَانِهِمْ

ঈমানের আশা না থাকলেও তাবলীগ করতে হবে : মুফাসসির (র.) فَلَا تَطْمَعْ فِيْ اِيْمَانِهِمْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ আয়াত দ্বারা তাবলীগ ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে বিশ্বাস ও আশা না রাখার কথা বলা হচ্ছে। কেননা আশা ভঙ্গ হলে দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হতে হয়।

আর ঈমানের প্রত্যাশা নিয়েই আম্বিয়া (আ.) দাওয়াত দেন। সুতরাং প্রত্যাশার বিপরীত আচরণ পেলে অসহনীয় দুঃখ তাঁদের মনে আসতে পারে। তাই এ স্থানে ঈমান গ্রহণের আশার ব্যাপারে সংযমী হওয়ার তালিম দেওয়া হয়েছে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব نصر মাসদার الكُفْرُ ـ الكُفْرَانُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা অস্বীকার করেছে, অবিশ্বাস করেছে। كُفْرٌ কাফ বর্ণে যবরযোগে বাব ضرب থেকে অর্থ- ঢেকে রাখা, আচ্ছাদিত করা। التَّكْفِيْر বাব تفعيل থেকে অর্থ- কাফের বলা, কাফফারা দেওয়া। কারণ, কুফরির কারণে ঈমান প্রকাশ পায় না, আর কাফফারা গুনাহকে গোপন করে রাখে। অনুরূপভাবে التَّكْفِيْر-এর একটি অর্থ- গুনাহকে এমনভাবে গোপন করা যেন সে গুনাহ করেইনি। যেমন, কুরআনে রয়েছে- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ; আরবি ভাষায় রাতকে كَافِرٌ বলা হয়। কারণ, রাতের আগমনের কারণে দিন অন্ধকার হয়ে যায়। অনুরূপ কৃষককেও كَافِرٌ বলা হয়। কারণ, কৃষক বীজকে মাটির নীচে গোপন করে থাকে। যেমন- কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُه اَىْ الزُّرَّاعَ; কুরআন মাজীদে كفر শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

১. কৃতজ্ঞতা আদায় না করে নিয়ামত গোপন করা। যেমন- وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْد;

২. দীন অস্বীকার করা, যেমন- تَدْعُوْنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللهِ;

৩. শরিয়ত পালনের অলসতা করা, যেমন- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُه;

৪. কুফরে বিশ্বাসী না হয়ে কুফর প্রকাশ করা, যেমন-

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ بَعْدَ اِيْمَانِه اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ.

৫. কুফর থেকে সম্পর্ক মুক্ত করা। যেমন- ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ; كُفْر-এর শাব্দিক অর্থ- سِتْرُ الشَّيْءِ গোপন করা। অকৃতজ্ঞতাকেও كُفْر বলা হয়। কেননা, এতে ইহসানকারীর ইহসান গোপন করা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় كُفْرٌ-এর সংজ্ঞা হলো اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهِ (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-এর নিশ্চিতরূপে আনীত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করা)। كَفَرَةٌ ও كُفَّار শব্দ দুটি যদিও كَافِر-এর বহুবচন, কিন্তু কুরআনে كُفَّار শব্দের ব্যবহার হয়েছে ধর্ম অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে। যেমন- أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ; আর كَفَرَة শব্দের ব্যবহার নিয়ামত অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে। যেমন- أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَة;

أَنْذَرْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِنْذَار মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- আপনি সতর্ক করেছেন। اِنْذَار শব্দের অর্থ হচ্ছে হুমকি বা ভয় প্রদর্শনসহ কাউকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানানো। শুধু ভয় প্রদর্শনকে اِنْذَار বলা হয় না; বরং দয়ার ভিত্তিতে ভয় প্রদর্শনকে বলা হয়। এজন্যেই নবী-রাসূলগণকে বিশেষভাবে نَذِيْر বলা হয়। কেননা, তাঁরা আগত অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের ক্ষেত্রে نَذِيْر শব্দ ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাবলীগের পদ্ধতি হলো, সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ, মমতা ও সমবেদনা সহকারে উপদেশ দেওয়া এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় হতে দূরে সরিয়ে রাখা।

اِنْذَار ঐ ভীতি প্রদর্শনকে বলা হয়, যে বিপদ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। অন্যথায় তাকে اِخْبَار بِالْعَذَاب বলা হবে। [হাশিয়াতুস সাভী]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... لَا يُؤْمِنُوْنَ

اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا অংশটি মাওসূল-সেলা মিলে اِنَّ-এর ইসম হয়েছে। سَوَاءٌ মূলত اِسْتَوَاء-এর সমার্থক মাসদার। মাসদারটি এখানে اسم الفاعل অর্থে এসেছে। অর্থাৎ سَوَاءٌ ; مُسْتَوٍ عَلَيْهِمْ -এর তারকীবগত অবস্থান তিন রকম হতে পারে-

১. سَوَاءٌ খবরে মুকাদ্দাম এবং ءَأَنْذَرْتَهُمْ الخ হলো মুবতাদা।

২. سَوَاءٌ হলো শিবাহ ফে'ল এবং ءَأَنْذَرْتَهُمْ তার ফায়েল।

৩. سَوَاءٌ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ, اِسْتِفْهَام تَسْوِيَة -এর জন্যে এসেছে। سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ এবং ءَأَنْذَرْتَهُمْ মিলে জুমলা হয়ে اِنَّ-এর খবর হয়েছে।

অধিকাংশ মুফাসসির لَا يُؤْمِنُوْنَ বাক্যকে পূর্ববর্তী বাক্যের تفسير বা تأكيد হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য কারো কারো মতে, لَا يُؤْمِنُوْنَ অংশটি اِنَّ-এর খবর। আর উভয় বাক্যাংশের মাঝে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ অংশটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة;

[তাফসীরে বায়যাভী : পৃষ্ঠা ২৩]

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

ءَاَنْذَرْتَهُمْ শব্দের কেরাত : (আয়াত-৬) উল্লিখিত ءَاَنْذَرْتَهُمْ শব্দটির কয়েকটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.)-এর কেরাত অনুযায়ি শব্দটি ءَاَنْذَرْتَهُمْ পড়া হয়।

খ. আবূ আমর, ইবনে কাসির, নাফে ও কিসায়ী (র.) শব্দটিকে آنْذَرْتَهُمْ পড়েছেন।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে আবূ ইসহাক শব্দটি أَأَنْذَرْتَهُمْ পড়েছেন।

ঘ. আমাশ (র.) শব্দটি أَاَنْذَرْتَهُمْ হিসেবে পড়েছেন।

ঙ. আবূ হাতেম (র.) শব্দটি أَنَذَرْتَهُمْ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ الخ

সূরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হেদায়াতকারী গ্রন্থরূপে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়াত দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছে। তাদেরকে মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করে তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ আয়াত থেকে পরবর্তী দুটি আয়াত মুত্তাকীদের বিপরীত অবস্থার লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা হেদায়াতকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচারণ করেছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতটির ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... لَا يُؤْمِنُوْنَ

কুফরের পরিচয় ও প্রকারভেদ : রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং সত্য বলে জানার নাম ঈমান। আর এ শিক্ষামালার কোনো একটিকে সত্য বলে বিশ্বাস না করাকে কুফরি বলা হয়। [মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯]

কুফরের প্রকারভেদ : ওয়ামায়ে কেরাম কুফরেরর পাঁচটি প্রকার বর্ণনা করেছেন-

১. كُفْرِ تَكْذِيْب অর্থাৎ, নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

২. كُفْرِ اِسْتِكْبَار অর্থাৎ, অহংকারবশত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করা এবং দীন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো। যেমন, ইরশাদ হয়েছে- اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

৩. كُفْرِ اِعْرَاض অর্থাৎ, পয়গাম্বরদেরকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটাই না বলা; বরং উপেক্ষ করা এবং ভ্রুক্ষেপ না করা। ইরশাদ হয়েছে-

১- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ. (احقاف.٣)

২- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ. (ال عمران.٣٢)

৪. كُفْرِ اِرْتِيَاب অর্থাৎ পয়গাম্বরদের সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী কোনো ক্ষেত্রেই বিশ্বাস না করা; বরং সন্দেহ ও সংশয় করা। এটাও কুফর। যেমন- কুরআন كفر-এর কারণ বর্ণনা করেছে এভাবে- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

[মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৯-৫০]

তাবলীগের প্রতিদান : আলোচ্য আয়াতে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে; سَوَاءٌ عَلَيْكَ বলা হয়নি। কারণ, রাসূল ﷺ-এর তাবলীগের দ্বারা বিশেষ কিছু কাফের ঈমান আনবে না। ফলে রাসূল ﷺ-এর তাবলীগ করা না করা তাদের জন্যে সমান। কিন্তু এ কাফেররা ঈমান আনুক বা না আনুক, রাসূল ﷺ এ তাবলীগের ছওয়াব অবশ্যই পাবেন। তাই তাবলীগ রাসূলের জন্যে অযথা নয়।

اِنْذَار-এর ফলাফল : প্রশ্ন হতে পারে, কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা বা না করায় যেহেতু কোনো তারতম্য নেই তাহলে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে লাভ কী? এ উত্তরে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. ভীতি প্রদর্শনের লাভ হলো– কাফেররা যেন কেয়ামতের দিন কোনো অজুহাত পেশ করতে না পারে।

২. ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা কাফেরদের উপকার না হলেও ভীতির প্রতিদান তথা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিদান রাসূল ﷺ অবশ্যই পাবেন। আর এজন্যে আল্লাহ তা'আলা আয়াতে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বলেছেন; سَوَاءٌ عَلَيْكَ বলেননি।

قَوْلُه كَاَبِىْ جَهْلٍ وَاَبِىْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরের ব্যাখ্যা : মুফাসসির জালাল (র.) كَاَبِىْ جَهْلٍ الخ বলে একটি সন্দেহের উত্তর দিতে চাচ্ছেন। সন্দেহটি হচ্ছে এই যে, আমরা দেখছি যে, দীনের তাবলীগের পর অনেক কাফের ঈমান গ্রহণ করেছে; বরং সকল সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর তাবলীগের পরই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারপর আল্লাহ পাকের এ কথা বলা "আপনি সতর্ক করুন কিংবা না করুন এরা ঈমান আনবে না" কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, এর দ্বারা 'সাধারণ কাফের' উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ প্রতিশ্রুত ঐ সকল কাফের উদ্দেশ্য, যাদের জন্য আল্লাহর ইলমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করবে না; বরং কুফরের উপরই অটল থাকবে। যেমন– আবূ জাহেল ও আবূ লাহাব প্রমুখ। তাছাড়া سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, এখন আর তাদেরকে দীনের বিধানাবলি শুনানোর এবং তাদের কাছে তাবলীগের প্রয়োজন নেই। কেননা এ তাবলীগ তো রাসূল ﷺ -এর উপর মর্যাদাশীল ফরজ। সুতরাং তারপরও তিনি তাবলীগ বন্ধ করেননি। মুফাসসির (র.) উক্ত সন্দেহকেই দূর করার দিকে فَلَا تَطْمَعْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। কেননা আশার বিপরীত ফল দ্বারা দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হতে হয়।

আম্বিয়া (আ.)-এর অন্তর যেহেতু স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ থাকে, তাঁরা যদি অধিক মহব্বত ও স্নেহ করে থাকেন, ঈমানের আশা পোষণ করেন, তারপর এর বিপরীত হলে কত বড় ও অসহনীয় দুঃখ তাঁদের মনে আসতে পারে! তাই এ স্থানে তাবলীগের ব্যাপারে সংযমী হওয়ার তা'লীম দেওয়া হয়েছে। [কামালইন খ. ১, পৃ. ২৩]

قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا : অর্থাৎ আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের মতো ঐসব লোকও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ঈমান না আনার বিষয়টি আল্লাহর ইলমে রয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির মধ্য থেকে শুধু اِنْذَار-এর দিকটি উল্লেখ করার কারণ : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, রাসূল ﷺ-এর গুনণাবলির মধ্যে بَشِيْر ও نَذِيْر উভয়টি রয়েছে। এখানে اِنْذَار-এর সাথে تَبْشِيْر-ও উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে কেবল একটি গুণ উল্লেখ করা হলো কেন?

এর জবাবে আলেমগণ বলেন, اِنْذَار এবং تَبْشِيْر-এর মধ্যে اِنْذَار-টি হৃদয়ের মধ্যে অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করে। কেননা, اِنْذَارْ দ্বারা دَفْعُ الْمَضَرَّة উদ্দেশ্য। আর এটি جَلْبُ الْمَنْفَعَة-এর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অধিক গুরুত্বপূর্ণটি যখন কাজে আসবে না, তখন تَبْشِيْر -ও কাজে আসবে না, তাই শুধু اِنْذَارْ-এর কথা বলা হয়েছে।

নিজেদের অপকর্মই ঈমান না আনার কারণ : আয়াতে لَا يُؤْمِنُوْنَ বলার কারণে এমন বলা যাবে না যে, আল্লাহ স্বয়ং কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কথা বলেছেন। তাঁর সংবাদের বিপরীত হওয়া যেহেতু অসম্ভব, তাই ঈমান গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে এখন তাদেরকে অপারগ মনে করতে হবে এবং তাদের উপর কোনো ধরনের অভিযোগ নেই।

কারণ, কোনো ডাক্তার মুমূর্ষু রোগীকে দেখে তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয় এবং সে রোগী ডাক্তারের কথা অনুযায়ী ঐ সময় সত্যিই মরে যায়, তখন এ কথা বলা হয় না যে, ডাক্তারের বলার কারণে রোগী মরে গেছে; বরং বলা হয় যে, ডাক্তারের বক্তব্যটি রোগীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, যা সঠিক হয়েছে। এমনিভাবে এ স্থানে আল্লাহর ইলমে জানা ও সংবাদকে তাদের অধার্মিকতা ও দুরবস্থার কারণ বলা যাবে না; বরং স্বয়ং তাদের অন্যায় আচরণ ও অপকর্মকে আল্লাহর সংবাদের কারণ সাব্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ তাদের অন্যায়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন, যা সঠিক হয়েছে। [কামালাইন : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ২৬]

٧ ﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ﴾ طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْثَقَ فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ ﴿وَعَلٰى سَمْعِهِمْ﴾ أَيْ مَوَاضِعِهِ فَلَا يَنْتَفِعُوْنَ بِمَا يَسْمَعُوْنَهُ مِنَ الْحَقِّ ﴿وَعَلٰٓى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ غِطَاءٌ فَلَا يُبْصِرُوْنَ الْحَقَّ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ قَوِيٌّ دَائِمٌ.

৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন তাঁদের অন্তরে ছাপ মেরে দিয়েছেন, শক্তভাবে আটকে দিয়েছেন, তাই তাতে কোনো কল্যাণ প্রবেশ করছে না। ও তাদের শ্রবণে অর্থাৎ, শ্রবণেন্দ্রিয়-এর উপর। ফলে যে সত্য তারা শোনে তাতে কোনো উপকার লাভ করতে পারছে না। এবং তাদের চক্ষুর উপর রয়েছে আবরণ আচ্ছাদন তাই তারা সত্য অবলোকন করতে পারে না। আর তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি যা কঠোর ও চিরস্থায়ী।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُه : طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْثَقَ فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ

خَتَمَ-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) خَتَم-এর আসল অর্থ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, কোনো বস্তুতে মোহর এঁটে সেটি সুদৃঢ় করা। কিন্তু আয়াতে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং اِسْتِعَارَة হিসেবে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, গোমরাহির কারণে তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তাদেরকে কুফর ও নাফরমানির প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছে এবং ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি বিদ্বেষী করে রেখেছে। এখন সে অবস্থাটিকে ضَرْبُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ-এর সাথে উপমা দিয়ে اِسْتِعَارَة تَبْعِيَّة হিসেবে خَتَم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর وَجْهُ الشَّبْهِ হলো عَدَمُ دُخُوْلِ الْخَيْرِ বা কল্যাণকর কিছু প্রবেশ না করা। যা মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ দ্বারা বোঝায় যায়। আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন–

هٰذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى الْخَتْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ وَضْعُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ وَطَبْعُهُ فِيْهِ صِيَانَةً لِمَا فِيْهِ. وَلَيْسَ هٰذَا الْمَعْنٰى مُرَادًا هُنَا بَلِ الْمُرَادُ بِالْخَتْمِ عَدَمُ وُصُوْلِ الْحَقِّ اِلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَدَمُ نُفُوْذِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ فِيْهَا. فَشُبِّهَ هٰذَا الْمَعْنٰى بِضَرْبِ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ تَشْبِيْهَ مَعْقُوْلٍ بِمَحْسُوْسٍ وَالْجَامِعُ اِنْتِفَاءُ الْقَبُوْلِ لِمَانِعٍ مِنْهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْخَتْمِ عَلَى الْاَسْمَاعِ وَجَعْلِ الْغِشَاوَةِ عَلَى الْاَبْصَارِ. (حاشية الجمل : جا صـ٢٢)

قَوْلُه : سَمْعِهِم أَيْ مَوَاضِعِه

উহ্য মুযাফের বর্ণনা : মুফাসসির (র.) مَوَاضِعِه اَيْ অংশটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَتَم-এর সম্পর্ক سَمْع-এর দিকে উহ্য মুযাফের মাধ্যমে হয়েছে। মূল অর্থ হলো– خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى مَوْضِعِ سَمْعِهِمْ

قَوْلُهٗ : عَظِيْمٌ. قَوِيٌّ دَائِمٌ

عَظِيْمٌ শব্দের ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) عَظِيْمٌ শব্দের ব্যাখ্যা قَوِيٌّ دَائِمٌ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, কাফেরদের আযাব খুবই ভয়ানক যা চিরস্থায়ী হবে। পক্ষান্তরে মুমিন যদি আযাবের সম্মুখীন হন, তাহলে তাদের আযাব হবে সামান্য কয়েক দিনের জন্যে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

خَتَم : সীগাহ واحد مذكر غائب বাব ضرب মাসদার الخِتَام. الخَتْم মূলবর্ণ (خ. ت. م) জিনসে صحيح অর্থ– তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন। خَتَم-এর মূল অর্থ– ١. اَلتَّغْطِيَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَالْاِسْتِيْثَاقُ مِنْهُ حَتّٰى لَا يَدْخُلَهُ شَيْءٌ; আয়াতে এ অর্থটি উদ্দেশ্য, মানুষ যখন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও হারামে পরিপূর্ণ লিপ্ত হয়ে পরে, কোনোভাবেই সত্যের দিকে ফিরে তাকাতে পারে না, গুনাহকে গুনাহ মনে করার মতো মানসিকতা থাকে না, অন্তর কঠিন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মহর মেরে দেন, ২. প্রান্তে পৌঁছা, যেমন– خَتَمْتُ الْقُرْاٰن;

قُلُوْبٌ : শব্দটি قَلْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ- অন্তর, হৃদয়। قَلْب শব্দটির মূল অর্থ হলো পরিবর্তন হওয়া, ওলটপালট হওয়া। মানুষের অন্তরও যেহেতু পরিবর্তন হয় এবং গতিসম্পন্ন থাকে, তাই অন্তরকে কলব বলা হয়। কিন্তু قَلْب দ্বারা এ স্থানে হৃৎপিণ্ড উদ্দেশ্য নয়; বরং বোধশক্তি ও বিবেক উদ্দেশ্য।

عَذَابٌ : عَذَابٌ বলা হয়- اِيْصَالُ الْأَلَمِ اِلٰى حَيٍّ هَوَانًا وَذُلًّا অর্থাৎ, কোনো প্রাণীকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার জন্যে কষ্ট দেওয়া। তাই অবুঝ শিশু ও পশু কষ্টে পড়লে তাকে আযাব বলা হয় না। কেননা, তাতে হেয় করা বা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য থাকে না। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ২২]

শব্দটির শাব্দিক অর্থ- কঠিন শাস্তি, বেদনাদায়ক মার। এর বহুবচন হলো- اَعْذِبَةٌ; রূপক অর্থে কঠিন কাজকেও عَذَابٌ বলা হয়। যেমন বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ..... ; অর্থাৎ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, সফর হচ্ছে কষ্টকর একটি কাজ। প্রকাশ থাকে যে, عَذَابٌ শব্দটি عَذْبٌ থেকে নির্গত। عَذْبٌ অর্থ- বিরত রাখা, বারণ করা। কারণ, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার ঐ অপরাধ থেকে বিরত রাখে।

عَظِيْمٌ : শব্দটি মুবালাগা প্রকাশক, اسم فاعل-এর সীগাহ। এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো- حَقِيْرٌ (তুচ্ছ, হীন, নগণ্য)। পরিমাণের কমবেশি বোঝানোর জন্যে صَغِيْرٌ ও كَبِيْرٌ আসে। কিন্তু عَظِيْمٌ-এর মধ্যে كَبِيْر থেকে অধিক মুবালাগা রয়েছে। যেমন- صَغِيْر-এর তুলনায় حَقِيْر-এর মধ্যে অধিক مُبَالَغَة হয়েছে। عَظِيْم শব্দটি যদিও اِجْرَام-এর সিফাত কিন্তু অনেক সময় مَعَانِى-এর জন্যেও ব্যবহার হয়ে থাকে এবং এখানে সে হিসেবেই হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

خَتَمَ اللّٰهُ ..... عَذَابٌ عَظِيْمٌ

خَتَمَ ফে'ল, اَللّٰهُ ফায়েল, عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অংশটি خَتَمَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, وَعَلٰى سَمْعِهِمْ অংশটি عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-এর উপর আতফ। وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ-এর واو-টি عَاطِفَة, عَلٰى أَبْصَارِهِمْ উহ্য শিবাহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে অগ্রবর্তী খবর। আর غِشَاوَةٌ হলো পশ্চাদবর্তী মুবতাদা। وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ বাক্যটি পূর্ববর্তী জুমলায়ে ইসমিয়ার উপর আতফ হয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতটির ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ .....وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কুফর ও নাফরমানিতে সদাসর্বদা লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরসমূহ সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের কানসমূহ সত্য কথা শ্রবণের উপযুক্ত ছিল না এবং তাদের দৃষ্টিসমূহ পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখতে অক্ষম, তাই তারা কীভাবে ঈমান আনতে পারে?

আয়াতে قُلُوْب দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে কলব দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে হৃদপিণ্ড বলা হয়, তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে কলব অর্থ বোধবুদ্ধি ও বিবেক। আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন-

فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْجِسْمُ الصَّنَوْبَرِيُّ الشَّكْلِ بَلِ الْمُرَادُ بِالْقُلُوْبِ الْعُقُوْلُ وَهِيَ اللَّطِيْفَةُ الرَّبَّانِيَّةُ الْقَائِمَةُ بِالشَّكْلِ الصَّنَوْبَرِيِّ قِيَامَ الْعَرَضِ بِالْجَوْهَرِ أَوْ قِيَامَ حَرَارَةِ النَّارِ بِالْفَحْمِ. (حَاشِيَة الجَمَل : ج١ ص٢٢)

মোহরাঙ্কন ও পর্দাবৃতকরণের তাৎপর্য : জমহুর আলেম মুফাসসিরীন ও মুতাকাল্লিমীন (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত ختم এবং غِشاوة-এর মর্মার্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা বাস্তবেই তাদের অন্তর ও কানে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর কোনো পর্দা ফেলে দিয়েছেন; বরং এর মর্মার্থ হলো, কাফেররা নিজেদের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত বক্রতার কারণে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মন্দ স্বভাবসমূহ তাদের অন্তরে মজবুত ও স্থির হয়ে গেছে। তাই যখন অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যকলাপ তাদের কাছে ভালো ও সুন্দর মনে হয় এবং খোদার অবাধ্যতা সুখকর মনে হয়। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এ অবস্থাটি اِسْتِعَارَة হিসেবে خَتَم এবং غِشَاوَة দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্মার্থ হলো, মোহর এবং পর্দা যেভাবে বাইরের বস্তুকে ভিতরে প্রবেশে বাধা হয়ে থাকে, তেমনি তাদের এ অবস্থাও অন্তরে ঈমান ও হেদায়াত প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এমনিভাবে তাদের কান সত্য কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। চোখ কোনো সত্য দেখতে আগ্রহী হয় না। সুতরাং এমন লোকদের ভীতি প্রদর্শন করা না করা সমান।

তবে ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত خَتَم ও غِشَاوَة বাস্তবের উপর নির্ভর করেই বলা হয়েছে। কাফেরদের অন্তর ও কানে বাস্তবেই একটি মোহর রয়েছে এবং চোখে বাস্তবেই পর্দা দেওয়া হয়েছে; যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। আল্লাহর ফেরেশতারা সে মোহর ও পর্দা দেখতে পান এবং তাতেই তারা বুঝে ফেলেন যে, এ কাফের কখনো ঈমান আনবে না। তাই তারা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। একইভাবে তারা মুমিনের অন্তরে ঈমানের চিত্র অঙ্কিত দেখে তার জন্যে দোয়া ও ইস্তিগফার করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَان; সুতরাং চোখে পর্দার বিষয়টিও বাস্তব। كِتَابَةُ الْكُفْرِ وَالْخَتْم-এর মতো كِتَابَةُ الْاِيْمَانِ-এর ধরনও অজ্ঞাত।

ইমাম বায়হাকী (র.) শোআবুল ঈমানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মোহর অঙ্কনকারী ফেরেশতা আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। যখন কেউ আল্লাহর হুকুমের অমর্যাদা করে, প্রকাশ্যে তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হয় এবং তাঁর সাথে বেয়াদবি ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই কাফেরের অন্তরে মোহর অঙ্কন করে দেওয়ার নির্দেশ করেন। যার ফলে সে আর কোনো সত্য গ্রহণ করতে পারে না। তবে ইমাম বায়হাকী (র.) এ হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সহীহ হাদীসসমূহেও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মুমিন যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। পরবর্তীতে সে তাওবা করলে এবং গুনাহ থেকে ফিরে এলে তা মুছে যায়। কিন্তু তওবা না করে গুনাহ করতে থাকলে সে দাগ বাড়তে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তার অন্তর দাগে ভরে যায়। আর এটি হলো সেই মরিচা, যার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ [সুনানে তিরমিযী]

আমরা যেভাবে বাহ্যিক কালিমা ও মরিচা চোখে দেখতে পাই, তেমনিভাবে ফেরেশতারাও আমাদের চেয়ে আরো পরিষ্কাররূপে বনী আদমের অন্তরের দাগ ও মরিচা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন, رَيْن তথা মরিচার স্তর خَتَم এবং طَبَعْ-এর নিম্নে। خَتمٌ ও طَبعٌ-এর স্তর اَقْفَال-এর নীচে আর اقفال হলো অধিকতর কাঠোর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا; [মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২]

কাফেরদের অন্তরে মোহর মারার কারণ : এখানে কেউ এমন সন্দেহ করতে পারে যে, কাফেরদের অন্তর কি প্রথম থেকেই মোহরাঙ্কিত ছিল? এর জবাবে আলেমগণ বলেন, প্রথম থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদের অন্তর মোহরাঙ্কিত এবং চোখ পর্দাবৃত ছিল না; বরং এটি তাদের অহংকার ও অস্বীকৃতির শাস্তিস্বরূপ। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে–

১- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا.

২- فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

৩- وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

বর্ণিত আয়াতসমূহে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তরের মোহর, কর্ণ এবং চোখের পর্দা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, নবী হত্যা এবং অন্তরের বক্রতার শাস্তিস্বরূপ ছিল। তাদের প্রকাশ্য নাফরমানি ও দুঃসাহসিকতার ফলে তাদেরকে চিরদিনের জন্যে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে এবং অন্তরে মোহর লাগিয়ে হেদায়াত গ্রহণের যোগ্যতাই বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে। মারেফত প্রাপ্তির সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সত্য শুনতেও পায় না, অনুভবও করতে পারে না এবং দেখতেও পারে না। এজন্যে এখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা না করা উভয়টাই সমান। প্রশ্ন হয়, এটা কি জুলুম হবে? যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুরু থেকে কারো অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং স্বীয় তাওফীক এবং হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করেছেন, তবুও তা বিন্দু পরিমাণ জুলুম হবে না। এ সম্পর্কে হযরত আতা ইবনে রাবাহ (র.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার জন্যে হেদায়াত বন্ধ করে দেয় এবং আমার ভাগ্যে গোমরাহি লিপিবদ্ধ করে দেন, তবে কি এটা জুলুম হবে না?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার অধিকারভুক্ত কোনো বস্তু নিয়ে নেন, তাহলে এটা জুলুম হবে। আর যদি তিনি নিজের অধিকারভুক্ত বস্তুকে নিয়ে নেন, তাতে কোনো জুলুম হবে না। কারণ, সেটা তার অধিকারভুক্ত। যাকে ইচ্ছা দেবেন, যাকে ইচ্ছা দেবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ এবং قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ; অনুরূপ হেদায়াত ও আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বস্তু। তিনি তা অনুগতদের প্রদান করেন এবং অহংকারী ও নাফরমানদের বঞ্চিত করেন।

[মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী র. : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩]

শুধু তিনটি অঙ্গ উল্লেখের কারণ : প্রশ্ন হতে পারে আয়াতে তিনটি অঙ্গে উল্লেখ করা হলো কেন, এ সম্পর্কে আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন–

وَاِنَّمَا خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْأَعْضَاء بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا طُرُقُ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ فَالْقَلْبُ مَحَلٌّ لِلْعَقْلِ وَطَرِيْقُه' اِمَّا السَّمَاعُ وَاِمَّا الرُّؤْيَةُ. (حَاشِيَة الجَمَل : ج١ ص٢٣)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি অঙ্গকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, মানব শরীরের এ তিনটি অঙ্গ হলো জ্ঞান লাভের মাধ্যম ও উপায়। অন্তর হলো ইলমের 'মহল' বা স্থান। আর এ ইলম অর্জিত হয় দুভাবে– ১. কানে শুনে, ২. চোখে দেখে।

[হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২]

অন্তর ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দেওয়া কারণ : এ সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে, অন্তর এবং কানে মোহর আর চোখে পর্দা দেওয়া হলো কেন?

জালালাইন শরীফের হাশিয়ায় এর জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে–

وَلَمَّا اشْتَرَكَ السَّمْعُ وَالْقَلْبُ فِى الْاِدْرَاكِ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ جَعَلَ مَا يَمْنَعُهَا مِنْ خَاصٍّ فِعْلِهِمَا الْخَتْمَ الَّذِىْ يَمْنَعُ مِنْ جَمِيْعِ الْجِهَاتِ وَاِدْرَاكِ الْاَبْصَارِ لَمَّا اخْتُصَّ بِجِهَةِ الْمُقَابَلَةِ جَعَلَ الْمَانِعَ لَهَا عَنْ فِعْلِهَا الْغِشَاوَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِتِلْكَ الْجِهَةِ. (حاشية الجلالين ص٥ ح٣)

অর্থাৎ, অন্তর এবং শ্রবণেন্দ্রিয় সব দিক থেকে জ্ঞান লাভ করে থাকে। তাই তা বন্ধ করার জন্যে এমন প্রতিবন্ধক বস্তু আনা হয়েছে, যা চতুর্দিক থেকেই বারণকারী হয়। আর তা হলো মোহর। কোনো বস্তুতে মোহর লাগানো হলে তাতে কোনো দিক থেকে আর কিছু প্রবেশ করতে পারে না। আর চোখ কেবল এক দিকে থেকে তথা সম্মুখ দিক থেকে জ্ঞান লাভ করে থাকে বিধায় তার জন্যে غِشَاوَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এক দিক বন্ধ করার জন্যে পর্দাই যথেষ্ট।

অকল্যাণও আল্লাহর সৃষ্টি : ঔষধের মতো নেকী ও বদিও প্রতিক্রিয়াশীল হয়, যা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজন দেখেন ও অনুভব করেন। যেহেতু সব জিনিসের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা, তাই خَتَم-এর সম্পর্ক নিজের দিকে করেছেন; কিন্তু এ কারণে বান্দা কোনোভাবেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ হেদায়াত, পথভ্রষ্টতা এবং এর উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং বান্দাকে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দা নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছায় যে পথকে অবলম্বন করবে, সে তারই জিম্মাদার হবে।

পশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোট শিশু ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যেহেতু ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার এ ক্ষমতা থাকে না, তাই এরা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে, কোনো মন্দকাজ করা যেমন মন্দ ও অন্যায় তেমনি মন্দকে সৃষ্টি করাও মন্দ ও অন্যায় হওয়া উচিত। এর জবাবে আলেমগণ বলে থাকেন যে, মন্দকাজ করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বা বাস্তব কোনো মঙ্গল নেই। পক্ষান্তরে অনিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অজস্র কল্যাণ রয়েছে; যদিও তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেহেতু অনিষ্টের স্রষ্টাকে আমরা সাধারণত প্রজ্ঞাবান হিসেবে বিশ্বাস করি আর মূলনীতি হলো– فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ (প্রজ্ঞাবানের কোনো কর্ম বিচক্ষণতা থেকে মুক্ত নয়), তাই বলা হয়, একই বস্তুর সৃষ্টি ভালো কাজ। কিন্তু সেটা কর্মে পরিণত করা মন্দ কাজ হতে পারে।

[কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫]

التَّدْرِيْبَات: অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. الٓمّٓ "اللّٰه اعلم بمراده بذلك.

أ. بين اختلاف الأئمة الكرام فى كون البسملة جزء الفاتحة وغيرها.

ب. ماذا يقال ل "الم" واشباهها فى بداية السورة، وما اراد بها العلماء المحققون؟ أَوْضح البحث عنها.

ج. ما معنى قوله "اللّٰه اعلم بمراده بذلك".

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ذلك اى هذا الكتاب الذى يقرؤه محمد ﷺ لا ريب فيه.

أ. مالمراد بالكتاب وهل هو قريب منك او لا؟ فان كان الاول فلم اشار إليه بذلك وهو للبعد، فان كان الثانى فلم فسر المصنف ذلك بهذا أجب متفكرا.

ب. ما معنى الريب، ومن اى جهة نفى الريب؟ بين متيقظا.

ج. أعرب العبارة موضحا.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

أ. ما معنى الهداية وكم قسما لها، اكتب ثم بين ان هدى فى اى محل من الاعراب وقوف.

ب. ما معنى هدى للمتقين، اكتب ثم اجب عما يرد على ظاهر معنى هدى للمتقين.

ج. ما معنى التقوى لغة وصطلاحا وكم قسما له اكتب موضحا.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. لم فسر المصنف قوله "يؤمنون" بيصدقون دون يقرون، اكتب ثم بين معنى الغيب واقسامه.

ج. ما المراد باقامة الصلاة؟ وما يطلق عليه الرزق؟ وما استفدت من "من التبعيضية" فى "ومما رزقناهم ينفقون"، اوضح.

د. بين فضيلة من يؤمن بما انزل على نبيه وما انزل على غيره ثم بين فوائد الايمان بهما حيث ينكشف الغبار عن وجه المراد.

ه. انواع المؤمن به كثيرة فلم آثر اللّٰه اليها تخصيص الايمان بالآخرة فى هذا المقام؟ بين متفكرا.

و. قوله "واولئك هم المفلحون" ما معنى الافلاح لغة وشرعا؟ اكتب متيقظا.

ذ. خلاصة الاسلام كم هى، هل الايات المشتملة على أوصاف المتقين تدل عليها؟ فان كان الجواب بنعم فكيف؟ اوضح ايضاحا تاما.

ح. بين الترتيب بين آيات الركوعين الاولين من سورة البقرة موضحا.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

أ. فيمن نزلت الآية الاولى، اكتب ثم ترجمها.

ب. اى مسئلة يستخرج من الآية بناء على تصريح عدم ايمانهم بالجزم.

ج. فان قيل ان الكافرين كيف يؤمنون وقد ختم اللّٰه على اسباب ايمانهم وآلاتهم؟ اجب بالتيقظ التام.

রুকূ' : ২ ذِكْرُ الْمُنَافِقِيْنَ مَعَ أَوْصَافِهِمْ وَعِقَابِهِمْ وَضَرْبِ الْمَثَلَيْنِ لِحَالِهِمْ

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, তাদের পরিণতি ও তাদের অবস্থার উপমার বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ মুনাফিকদের মুখের কথা ও অন্তরের অবস্থার বর্ণনা
- ❑ রাসূল ﷺ ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের ধোঁকা ও এর শাস্তি
- ❑ ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হলে মুনাফিকদের উত্তর
- ❑ ঈমানের দিকে আহ্বান করা হলে মুনাফিকদের উত্তর
- ❑ মুসলমানদের সামনে এবং নিজেদের নেতাদের সামনে মুনাফিকদের বাক্যালাপ
- ❑ মুনাফিকদেরকে আল্লাহর শাস্তিদানের পদ্ধতি
- ❑ ক্ষতিগ্রস্ত লেনদেনকারী ব্যক্তির সাথে মুনাফিকদের উপমা
- ❑ অন্ধকারে অগ্নি প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির সাথে মুনাফিকদের উপমা
- ❑ প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মুনাফিকদের উপমা
- ❑ আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান আর মুনাফিকরা তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়

٨. وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِيْنَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ أَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾ رُوْعِيَ فِيْهِ مَعْنَى مَنْ وَفِيْ ضَمِيْرِ يَقُوْلُ لَفْظُهَا

৮. আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি, অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসের প্রতি। কেননা, এটাই সর্বশেষ দিন অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। এখানে مَنْ-এর অর্থ বিবেচনা করা হয়েছে এবং يَقُوْلُ-এর যমীরের ক্ষেত্রে مَنْ -এর শব্দটিকে বিবেচনা করা হয়েছে।

٩. ﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُوْهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ ﴿وَمَا يُخٰدِعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ﴾ لِأَنَّ وَبَالَ خِدَاعِهِمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ فِي الدُّنْيَا بِإِطْلَاعِ اللّٰهِ نَبِيَّهُ عَلٰى مَا أَبْطَنُوْهُ وَيُعَاقَبُوْنَ فِي الْآخِرَةِ ﴿وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾ يَعْلَمُوْنَ أَنَّ خِدَاعَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ وَذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ وَمَا يَخْدَعُوْنَ.

৯. তারা প্রতারণা করে আল্লাহ ও ঈমানদারদের সাথে, যে কুফুরি তারা গোপন করেছে, তার বিপরীত বিষয় প্রকাশ করার মাধ্যমে যাতে ইসলামের জাগতিক বিধান নিজেদের হতে প্রতিহত করতে পারে। তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে ছাড়া কাউকেই ধোঁকা দিচ্ছে না। কেননা, এ ধোঁকার অশুভ পরিণাম তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। অনন্তর তারা এ পৃথিবীতেই অপমানিত হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করার কারণে। আর পরকালে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অথচ তারা তা বুঝতে পারছে না। অর্থাৎ, নিজেদের সাথেই যে মূলত এ প্রতারণা করছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না।
الْمُخَادَعَةُ এ স্থানে এক পক্ষ হতে প্রবঞ্চনা করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন বলা হয়- عَاقَبْتُ اللِّصَّ (আমি চোরকে শাস্তি প্রদান করেছি।) আর আয়াতে الله শব্দটির উল্লেখ আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে। অপর এক কেরাতে وَمَا يَخْدَعُوْنَ রয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الخ

الْيَوْمِ الْآخِرِ-এর ব্যাখ্যা ও তার কারণ : এখানে يَوْمِ الْقِيَامَةِ অংশটি الْيَوْمِ الْآخِرِ-এর তাফসীর। অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত الْيَوْمُ الْآخِرِ (শেষ দিবস) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেয়ামত দিবস।

এরপর মুফাসসির (র.) لِأَنَّه آخِرُ الأَيَّامِ অংশটি দ্বারা কেয়ামত দিবসকে আয়াতে اَلْيَوْمِ الآخِرِ বলার কারণ বর্ণনা করেছেন এবং এর দ্বারা একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে। প্রশ্নটি হলো, اَلْيَوْمُ لِآخِرِ তথা দুনিয়ার সর্বশেষ দিনের প্রতি ঈমান আনা তো ফরজ নয়, তাহলে اَلْيَوْمِ الآخِرِ অস্বীকারকারীকে ঈমানহীন বলা হলো কেন? মুফাসসির (র.) يَوْمِ القِيَامَةِ দ্বারা তাফসীর করে এর উত্তর প্রদান করেছেন যে, يَوْمُ القِيَامَةِ দ্বারা اليَوْمُ الآخِرِ উদ্দেশ্য। কারণ, কেয়ামত দিবসই হলো দুনিয়ার সর্বশেষ দিবস।

قَوْلُهٗ : رُوْعِيَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ وفِيْ ضَمِيْرِ يقُوْلُ لَفْظُهَا

مَنْ-এর শব্দ ও অর্থগত দিক বিবেচনা : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا আয়াতটিতে يَقُوْلُ-এর মাঝে বিদ্যমান যমীর ও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-এর هُمْ যমীরটি مَنْ-এর দিকে ফিরেছে, কিন্তু প্রথমটি একবচনের যমীর আর দ্বিতীয়টি বহুবচনের যমীর। এক্ষেত্রে সুয়ূতী (র.)-এর বক্তব্য হলো, مَنْ শব্দটি لَفْظًا মুফরাদ। কিন্তু مَعْنًى তা একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের অর্থ ধারণ করে। যেমন বলা হয়- مَنْ هُمْ؟ (তারা কে?)। আলোচ্য আয়াতে يَقُوْلُ-এর মাঝে যমীরটি مَنْ-এর শব্দগত দিক বিবেচনায় একবচন হয়েছে। আর পরবর্তীতে اٰمَنَّا ـ مُؤْمِنِيْنَ ও هُم শব্দগুলো বহুবচন আনা হয়েছে তার অর্থগত দিক বিবেচনা করে। একই বাক্যে مَنْ-এর অর্থগত ও শব্দগত দিক বিবেচিত হওয়ার বহু উদাহরণ কুরআন শরীফে রয়েছে।

قَوْلُهٗ : يُخٰدِعُوْنَ اللّٰه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ بِاِظْهَارِ خِلَافِ الخ

মুনাফিকদের ধোঁকার পদ্ধতি : بِاِظْهَارِ خِلَافِ الخ এ অংশটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মুনাফিকদের ধোঁকার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকরা মুসলমানদের সামনে ঈমানদার হওয়ার দাবি করতো। কিন্তু অন্তরে তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। এভাবে তারা রাসূল ﷺ ও মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে চাইত।

قَوْلُهٗ : لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّة

নিফাকের কারণ : এ অংশটি দ্বারা মুফাসসির (র.) মুনাফিকদের নিফাকের কারণ বর্ণনা করেছেন। কাফেরদের জাগতিক বিধান তথা হত্যা , বন্দিত্ব, জিযিয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিজেদের থেকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা মুসলমানের সাথে সখ্যতা দেখাত। অতএব, তারা বাহ্যত মুমিন সাজলেও বস্তুত তারা কাফের ছিল।

قَوْلُهٗ : اَلْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ

يُخَادِعُوْنَ ফে'লটি مُشَارَكَة-এর অর্থবাচক নয় : يُخَادِعُوْنَ শব্দটি بَابُ الْمُفَاعَلَة-এর মাসদার থেকে গঠিত ক্রিয়া। بَابُ الْمُفَاعَلَة-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো مُشَارَكَة বা দু'পক্ষ থেকে ক্রিয়া বিনিময়ের অর্থ প্রদান করা। তাহলে এ আয়াতে ধোঁকা দেওয়ার কাজটি মুনাফিক ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। অথচ আল্লাহ সব ধরনের নিকৃষ্ট গুণ থেকে মুক্ত। আর ধোঁকা দেওয়া একটি মন্দ বৈশিষ্ট্য। মুফাসসির (র.) .. اَلْمُخَادَعَة বলে এর সমাধান দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষ থেকে কোনো কাজে অংশগ্রহণের অর্থ প্রদান করা بَابُ الْمُفَاعَلَة-এর একটি বৈশিষ্ট্য; কিন্তু এটা قَاعِدَةٌ كُلِّيَة নয়। অনেক সময় بَابُ الْمُفَاعَلَة থেকে নির্গত ক্রিয়া ثُلَاثِي مُجَرَّد-এর অর্থও প্রদান করে। যেমন عَاقَبْتُ اللِّصَّ; আলোচ্য আয়াতে يُخَادِعُوْنَ ক্রিয়াটিও يَخْدَعُوْنَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর بَابُ الْمُفَاعَلَة-এর ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে নিছক তাকীদের উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهٗ : وَ ذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ

আল্লাহকে মুনাফিকদের ধোঁকা দেওয়ার ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় কীভাবে? মুফাসসির (র.) বলেছেন, يُخَادِعُوْنَ-এর মধ্যে اللّٰه শব্দটির উল্লেখ تَحْسِيْن অর্থাৎ আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে হয়েছে। যেমন- কুরআনে কারীমে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَه ..... الخ

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلنَّاس : اَلنَّاسُ হলো اِسْم الجَمْع; এর একবচন হলো اِنْسَانٌ বা اِنْسِيٌّ;

১. ইমাম সিবাওয়াইহ ও ফাররা (র.)-এর মতে, النَّاسُ শব্দটি মূলত أناس ছিল। تخفيف করণার্থে همزة-কে হযফ করা হয়েছে। অতঃপর أُنَاسٌ শব্দটির হামযার পরিবর্তে ال যোগ করায় শব্দটি النَّاسُ হয়েছে। সূরা ইসরাতে এই মূল ব্যবহারটি লক্ষণীয়- يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم; أُنَاسٌ-এর মূলধাতু হলো- همزة . نون . سين সেক্ষেত্রে শব্দটি أُنْسٌ থেকে নির্গত হবে। মানুষ যেহেতু একে অপর থেকে পরিচিত হয় তাই তাকে أُنَاسٌ বলা হয়েছে। অথবা শব্দটি الإِيْنَاسُ (দৃশ্যমান হওয়া) থেকেও নির্গত হতে পারে। মানুষ দৃশ্যমান হওয়ায় তাকে أناس বলা হয় যেমনিভাবে জিন অদৃশ্য থাকার কারণে তাকে জিন বলা হয়।

২. ইমাম কাসায়ী (র.)-এর মতে, النَّاسُ শব্দটি النَّوَسُ (ن ও و বর্ণে যবরযোগে) থেকে নির্গত। যার অর্থ- নড়াচড়া করা। واو মুতাহাররিক তার পূর্বে ফাতহা হওয়ায় واو-কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। [লুগাতুর কুরআন]

উৎসগত এই মতপার্থক্যের কারণে কিছু কিছু আধুনিক আরবি অভিধানে শব্দটি أ . ن . س-এর অধীনে এসেছে। আর কিছু অভিধানে শব্দটি ن . و . س-এর অধীনে রয়েছে।

يُخَادِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مفاعلة মাসদার الخِدَاعُ - المُخَادَعَةُ اثبات فعل مضارع معروف বাব মূলবর্ণ (خ . د . ع) জিনস صحيح অর্থ- তারা ধোঁকা দেয়, প্রতারিত করে। خِدَاع-এর মূল অর্থ- গোপন করা। গর্দানের বিশেষ গোপন শিরাগুলোকে مُخْدَعَان বলে। مُخْدَعُ البَيْتِ অর্থ- ঘরের ভিতরের অংশ। পরবর্তীতে অন্তরের বিপরীত অবস্থা প্রকাশের অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। يُخَادِعُوْنَ শব্দটি خِدَاع থেকে উৎসারিত, خِدَاع শব্দের এক অর্থ- ধোঁকা দেওয়া, কারো কাছে অন্তরের বিপরীত প্রকাশ করা। আল্লাহর বাণী- إِنَّ اللّٰهَ يُظْهِرُ لَهُمُ الإِحْسَانَ وَيَسْتُرُ عَنْهُم عَذَابَ الآخِرَةِ অর্থাৎ, মুনাফিকদের জন্যে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ইসলমের বিধিবিধান প্রয়োগ করে বাহ্যিক সম্মান করেছেন; কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। ইবনুল আরাবি থেকে সালাব বর্ণনা করেন خِدَاع-এর অর্থ- ফাসাদ, يُخَادِعُوْنَ اللّٰه-এর অর্থ হবে মুনাফিকরা নেফাকের মাধ্যমে নিজেদের ঈমান-আমল নষ্ট করেছে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... অর্থাৎ মুমিনদেরকে ধোঁকা দেওয়া অর্থ হবে।

مَا اَظْهَرُوْهُ مِنَ الْاِيْمَانِ خِلَافَ مَا اَبْطَنُوْهُ مِنَ الكُفْرِ لِيَحْقِنُوْا دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَيَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ قَد نَجَوْا وَخَدَعُوْا (القرطبى)

لَا يَشْعُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার الشُّعُوْرُ মূলবর্ণ (ش . ع . ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুভব করে না, উপলব্ধি করে না, বুঝতে পারে না। আর একই বাব থেকে ش বর্ণে যেরবিশিষ্ট মাসদার হলে অর্থ হবে- কবিতা রচনা করা, কবিতায় রূপান্তরিত করা। الشَّعْرُ বাব سمع অর্থ- লম্বা চুলবিশিষ্ট হওয়া, التَّشْعِيْر বাব تفعيل অর্থ চুল লাগানো, চুল গজানো। الشُّعُوْرُ শব্দটি সূক্ষ্মভাবে কোনো কিছু অনুভব করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ..... وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

حَرْفُ الْاِسْتِئْنَاف; اِسْتِئْنَافِية টি-واو আসে নতুন প্রসঙ্গ শুরু করার ক্ষেত্রে। এখানে থেকে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ শুরু হচ্ছে। مِنَ النَّاسِ অংশটি উহ্য شِبْهُ الفِعْل-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে অগ্রবর্তী খবর। مَنْ يَقُوْلُ থেকে بِمُؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত পুরো অংশটি তার পশ্চাদবর্তী মুবতাদা।

مَنْ ইসমে মাওসূল, পরবর্তী পুরো অংশটুকু তার صِلَة; অথবা مَنْ-টি নাকেরা মাওসূফ হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী অংশটুকু তার সিফাত হবে। اٰمَنَّا بِاللّٰهِ বাক্যাটি يقول-এর মাফউলে বিহী। আর وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْن পুরো অংশটি يَقُوْل-এর হাল হয়েছে। مَا-টি لَيْسَ-এর সমার্থক, هُمْ যমীরটি مَا-এর ইসম হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ ..... وَمَا يَشْعُرُوْنَ

জুমলায়ে ফে'লিয়াটি اِسْتِئْنَافِيَّة; اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا অংশটুকু মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে يُخَادِعُوْنَ-এর মাফউল। وَمَا يَخْدَعُوْنَ-এর واو-টি حالية; বাক্যটি হাল হিসেবে নসবের স্থানে আছে। إلا হলো الحَصْر আর مَا أَنْفُسَهُمْ হলো يَخْدَعُوْنَ-এর মাফউল। وَمَا يَشْعُرُوْنَ-এর واو-টি عاطفة অথবা اِسْتِئْنَافِيَّة; ফলে পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী وَمَا يَخْدَعُوْنَ-এর উপর আতফ হতে পারে, আবার اِسْتِئْنَافِيَة-ও হতে পারে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَخْدَعُوْنَ শব্দের কেরাত : ৯নং আয়াতে উল্লিখিত وَمَا يَخْدَعُوْنَ শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) কেরাত অনুযায়ী শব্দটি مُجَرَّدْ ثُلَاثِي থেকে مَا يَخْدَعُوْنَ পড়া হয়।

খ. ইমাম আবূ আমের (র.) শব্দটিকে مزيد فيه ثلاثي অর্থাৎ, বাব مفاعلة থেকে ى বর্ণে পেশ এবং خ বর্ণে খাড়া যবরযোগে مَا يُخٰدِعُوْنَ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকুর যোগসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا

পূর্ববর্তী রুকুতে দু'ধরনের মানুষের আলোচনা করা হয়েছে– ১. আল্লাহর বিধানের অনুগত মুমিন।

২. আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহকারী কাফের।

এখান থেকে তৃতীয় প্রকার লোকদের বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা প্রকাশ্যে ছিল মুমিন এবং ভেতরে ছিল কাফের। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও মাতাব ইবনে কোশাইর প্রমুখ। শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। এখান থেকে পরবর্তী ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের অবস্থার উপমা বর্ণিত হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ ..... وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

নেফাকের সূচনা : নেফাক তথা ইসলামের মিথ্যা দাবি মক্কায় ছিল না। নেফাকের সূচনা হয় মদিনায় বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও মর্যাদা দেখে কিছু ধূর্ত কাফের ছলনাবশত নিজেদেরকে মুমিন ও মুসলিম বলে পরিচয় দিত। এ দলটির প্রধান ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। সে ছিল সমসাময়িক আরবদের প্রসিদ্ধ নেতা। মদিনায় গোটা জনপদ তার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত ছিল। এমনকি তাকে বাদশাহ ঘোষণা করার আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় রাসূল ﷺ মদিনায় আগমন করেন। ফলে এই আয়োজন ভেস্তে যায়। তখন সে নিজেদের কুফরীর কথা প্রকাশ না করে প্রকাশ্যে ইসলামের কালেমা বলে বেড়ায়। আওস-খাযরাজের বাইরে একদল ইহুদিও এ দলে যোগ দেয়।

নেফাকের প্রকারভেদ : নেফাক দু'প্রকার। যথা–

১. نِفَاقٌ فِي الْعَمَل (কার্যক্ষেত্রে নেফাক) ২. نِفَاقٌ فِي الْاِعْتِقَاد (বিশ্বাস পোষণে নেফাক)।

১. نِفَاقٌ فِي الْعَمَل হলো, অন্তরে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও আমলে তা প্রকাশ না পাওয়া। যেমন নামাজের জামাতে শরিক না হওয়া ইত্যাদি। নিফাকের এ প্রকারটি বর্তমানে পাওয়া যায়। এ প্রকারের মুনাফিক কাফের নয়।

২. نِفَاقٌ فِى الْاِعْتِقَادِ-এর তিনটি অবস্থান হতে পারে–

ক. অন্তরে কুফরি থাকলেও কোনো দুনিয়াবি স্বার্থে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করা।

খ. ঈমান ও কুফরির মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা। মুসলমানদের কোনো উন্নতি দেখলে মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার মুসলমানদের ক্ষতি দেখলে কুফরির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

গ. রাসূল ﷺ সত্য নবী, এটা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও দুনিয়াবি স্বার্থে ইসলামের বিরোধিতা করা।

বিশ্বাসগত নিফাকের এই তিনিট প্রকারই কুফরি। نِفَاق فِى الِاعْتِقَاد-এর প্রকারগুলো শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআন মুনাফিক দ্বারা এই প্রকারটিই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ ..... وَمَا يَشْعُرُوْنَ

মুনাফিকদের জড়বুদ্ধিতা : মুনাফিকরা মুনাফেকি করার মাধ্যমে অন্য কারো ক্ষতি করে না; বরং নিজেদেরই ক্ষতি করে। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাদের পরিচয় রাসূল ﷺ-কে জানিয়ে দিয়ে পার্থিব জীবনে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং পরকালে তারা আযাবের শিকার হবে।

আয়াতে لَا يَشْعُرُوْنَ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির কারণে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও এই নির্বোধরা গাফলতির আতিশয্যে এটাও অনুভাব করে না।

আল্লামা সাভী (র.) বলেন–

عُبِّرَ بِالشُّعُوْرِ دُوْنَ العِلْمِ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوْا اِلٰى رُتْبَةِ البَهَائِمِ فَاِنَّ الْبَهَائِمَ يَمْتَنِعُ عَنِ المَضَارِّ فَلَا تَقْرَبُهَا لِشُعُوْرِهَا بِخِلَافِ هٰؤُلَاءِ (حاشية الصاوى)

আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। ধোঁকা তাকে দেওয়া যায়, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে অনবগত থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। এর সমাধানের লক্ষ্যে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. সত্যের অব্যাহত বিরুদ্ধাচরণ এবং সত্যকে অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য তাদের এতটাই বেড়ে গিয়েছেল যে, তারা নিজেরা ধারণা করতো যে, এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে তারা ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এখানে তাদের সে মনের ধারণার বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন। যদিও কেউ আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اِخْتَرَعُوْا عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى ظَنُّوْا أَنَّهُمْ يَخْدَعُوْنَ اللّٰهَ

২. রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতারণার অপচেষ্টাকে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সাথে প্রতারণা বলে উল্লেখ করেছেন। এর আরো দৃষ্টান্ত কুরআনে আছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যে, কর্মটি অত্যন্ত জঘন্য তা প্রকাশ করা।

৩. এখানে বালাগাতের নিয়মে اِسْتِعَارَة تَمْثِيْلِيَّة হয়েছে। مشبه به-কে مشبه-এর জন্যে مُسْتَعَار নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সাথে মুনাফিকদের আচরণটি ঐ ব্যক্তির অবস্থার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যে স্বীয় সঙ্গীকে ধোঁকা দেয় এবং তার সাথে প্রতারণামূলক আচরণ করে।

৪. خِدَاع-এর নিসবত আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا; এখানে একই ব্যাপার ঘটেছে।

৫. এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। মূলত ইবারতটি হবে يُخَادِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ;

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : আলোচ্য আয়াতে ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

মুবালাগা : আয়াতের স্বাভাবিক বর্ণনাপদ্ধতি হিসেবে وَمَا اٰمَنُوْا বলা উচিত ছিল কারণ, পূর্বে বলা হয়েছে– يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ; কিন্তু এখানে جملة فعلية-এর পরিবর্তে جملة اسمية ব্যবহার করা হয়েছে। মুনাফিকদেরকে মুমিনদের দল বহির্ভূত বোঝানোর জন্যে। আর খবরের শুরুতে باء যোগ করা হয়েছে ঈমানের নফীর ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রকাশের জন্যে। ফলে মুনাফিকদেরকে মুবালাগা সহকারে ঈমানহীন বলা হয়েছে।

اِسْتِعَارَةٌ تَمْثِيْلِيَّة : এখানে মুনাফিকদের অবস্থাকে ধোঁকা প্রদানকারী প্রজার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর اِسْتِعَارَة-এর ভিত্তিতে মুশাব্বাহের জন্যে মুশাব্বাহ বিহীর ইসম ব্যবহার হয়েছে।

١٠. ﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ شَكٌّ وَنِفَاقٌ فَهُوَ يُمْرِضُ قُلُوْبَهُمْ أَيْ يُضْعِفُهَا ﴿فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا﴾ بِمَا أَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِكُفْرِهِمْ بِهِ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ مُؤْلِمٌ ﴿بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾ بِالتَّشْدِيْدِ أَيْ نَبِيَّ اللّٰهِ وَبِالتَّخْفِيْفِ أَيْ فِيْ قَوْلِهِمْ آمَنَّا

১০. তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি সন্দেহ ও কপটতা, ফলে এ ব্যাধি তাদের অন্তরকে রোগাক্রান্ত অর্থাৎ, দুর্বল করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কুরআনের যে অংশ নাজিল করে চলেছেন। সেটাকেই তাদের অস্বীকার করার দ্বারা এবং তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক বেদনাদায়ক শাস্তি, কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। يكذبون তাশদীদসহ পঠিত হলে এর মর্ম হবে, আল্লাহর নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দরুন। আর তাখফীফসহ পঠিত হলে এর মর্ম হবে, 'ঈমান এনেছি, বলে তাদের ছলনাময় বক্তব্যের দরুন।

١١. ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ﴾ أَيْ لِهٰؤُلَاءِ ﴿لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ﴾ بِالْكُفْرِ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْإِيْمَانِ ﴿قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيْهِ بِفَسَادٍ

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় অর্থাৎ, ঐ সকল লোককে তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, সত্য প্রত্যাখ্যান এবং ঈমান হতে লোকজনকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে তখন তারা বলে, আমরা তো সংশোধনবাদী মাত্র। আমরা যে কাজ করছি, সেটা বিশৃঙ্খলা নয়।

١٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ ﴿اَلَآ﴾ لِلتَّنْبِيْهِ ﴿اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ﴾ بِذٰلِكَ.

১২. আল্লাহ তা'আলা তাদের যুক্তি খণ্ডন করে ইরশাদ করেন শোন! ﴿اَلَآ﴾ শব্দটি সতর্কীবাচক অব্যয়। নিশ্চয়ই তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

١٣. ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ﴾ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ ﴿قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ﴾ الْجُهَّالُ أَيْ لَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ قَالَ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ ﴿اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ﴾ ذٰلِكَ

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরাও ঈমান আনো যেভাবে অপরাপর লোকজন অর্থাৎ, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ ঈমান এনেছে, তারা বলে নির্বোধগণ মূর্খগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? অর্থাৎ, আমরা তাদের ন্যায় কাজ করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন, জেনে রাখ! নিঃসন্দেহে তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ شَكٌّ وَنِفَاقٌ ....

مَرَض-এর উদ্দেশ্য আত্মিক ব্যাধি : আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) مَرَض-এর ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত দুটি শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَرَض দ্বারা আত্মিক ব্যাধি উদ্দেশ্য। যেমন – কুফরি, নিফাক, কৃপণতা, মূর্খতা ইত্যাদি। কারণ কুফর, নিফাক, শিরক ইত্যাদির সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। এ কারণে মুফাসসির (র.) يُمْرِضُ قُلُوْبَهُمْ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ : فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا بِمَا اَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ

রোগ বৃদ্ধি দ্বারা কুফর বৃদ্ধি উদ্দেশ্য : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) زِيَادَةُ الْمَرَضِ বা রোগ বৃদ্ধির মাধ্যম ও কারণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে একের পর এক বিধান অবতীর্ণ করছেন। মুনাফিকরা এসব বিধানের মুকাল্লাফ। কিন্তু তারা সেসব বিধান অস্বীকার করে যাচ্ছে। এভাবে তাদের কুফুরি বৃদ্ধির কারণে তাদের আত্মিক রোগে বৃদ্ধি ঘটেছে।

قَوْلُهُ : وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ

اَلِيْمٌ শব্দটি اَلَمٌ থেকে নির্গত : اَلِيْمٌ শব্দটি فعيل-এর ওযনে। শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর মাসদার اَلْاَلَمُ থেকে নির্গত হতে পারে আবার বাবে إفعال-এর মাসদার الإِيْلَامُ থেকেও নির্গত হতে পারে। মুফাসসির (র.) اَلِيْمٌ-এর পরে مُؤْلِمٌ শব্দটি এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটাকে বাবে إفعال থেকে ইসমে ফায়েলের অর্থেও নেওয়া যায়। অর্থাৎ, عَذَابٌ কষ্টদায়ক হবে। একইভাবে ইসমে মাফউলের অর্থেও নেওয়া যায়। তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে مبالغة; অর্থাৎ শাস্তি এত ভয়াবহ হবে যে, স্বয়ং عذاب-ও ব্যথিত হবে।

قَوْلُهُ : بِمَا كَانُوْا يُكَذِّبُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ أَيْ نَبِيَّ اللهِ .....

يُكَذِّبُوْنَ শব্দটি লাযিম নাকি মুতা'আদ্দি : يُكَذِّبُوْنَ-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। একটি হলো তাশদীদসহ অপরটি তাশদীদ ছাড়া। তাশদীদসহ পড়া হলে শব্দটি باب تفعيل-এর মাসদার التَّكْذِيْب (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) থেকে উৎপন্ন হওয়া ফে'লটি مُتَعَدِّىْ হবে। তাই মুফাসসির (র.) اَىْ نَبِيَّ اللهِ বাক্যটি উল্লেখ করে তা মাফউলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর শব্দটি لازم হলে অর্থ হবে– 'আমরা ঈমান এনেছি' তাদের এ ধরনের মিথ্যা বক্তব্যের দরুন .....।

قَوْلُهُ : وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَيْ لِهٰؤُلَاءِ

উল্লিখিত মুনাফিকরা হলো لَهُمْ-এর مرجع : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র সেসব মুনাফিক, যারা পূর্বের আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র। আর قِيْلَ لَهُمْ-এর যমীরে মুত্তাসিলটি তাদের দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ : اٰمَنَ النَّاسُ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ

اَلنَّاسُ-এর জন্যে العَهْدُ الذِّهْنِي টি-ال-এর জন্যে : মুফাসসির (র.) النَّاسْ-এর ব্যাখ্যায় اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, النَّاسْ-এর মাঝে ال-টি العَهْدُ الذِّهْنِي-এর অর্থ প্রকাশক। এটা দ্বারা সকল মানুষ উদ্দেশ্য নয়; শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : اَنُؤْمِنُ لَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ

أَنُؤْمِنُ-এর হামযার অর্থ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أَنُؤْمِنُ-এর হামযাটি اَلْاِسْتِفْهَامُ الْاِنْكَارِىْ-এর অর্থে এসেছে। পাশাপাশি এতে উপহাস ও কটাক্ষেরও অর্থ রয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مَرَضٌ : এটা বাবে سمع-এর মাসদার। এর অর্থ হলো– রোগ, ব্যাধি, দুর্বলতা। مَرَضٌ শব্দটি অন্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে উদ্দেশ্য হয় সত্যবিমুখতা, দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে উদ্দেশ্য হয় শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা আর চোখের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে উদ্দেশ্য হয় দৃষ্টি স্বল্পতা।

التَّعْوِيْق : শব্দটি باب تفعيل-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ع . و . ق) অর্থ– বাধা দেওয়া, বিরত রাখা, কোনো কাজে প্রতিবন্ধক হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হলো– অন্যকে ঈমান গ্রহণে বাধা দেওয়া।

المُفْسِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اِسْم فاعل বাব افعال মাসদার اَلْاِفْسَادُ মূলবর্ণ (ف . س . د) জিনস صحيح অর্থ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা, গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা। فَسَاد অর্থ হলো اَلْعُدُوْلُ عَنِ الْاِسْتِقَامَةِ اِلٰى ضِدِّهَا অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বের হয়ে যাওয়া। এর বিপরীত অর্থ বোধক শব্দ হচ্ছে صَلَاح; হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান এবং কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, এখানে فَسَاد দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহ ও অঅবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ, যেগুলোর কারণে জাহেরী ও বাতেনী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– ظَهَرَ الفَسَادُ فِى البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

السُّفَهَاءُ : শব্দটি سَفِيْهٌ-এর বহুবচন। سَفِيْهٌ অর্থ– নির্বোধ, বোকা। এটি বাবে سَمِعَ ও كَرُمَ-এর মাসদার السَّفَهُ থেকে নির্গত الصفة المشبهة-এর শব্দ। السَّفَه-এর বিপরীতার্থবোধক শব্দ হলো– الحِلْمُ; السَّفَهُ-এর মৌলিক অর্থ– خِفَّةٌ فِى البَدَنِ-শরীর হাল্কা হওয়া। এর থেকে খারাপ করে কাপড় তৈরি করা হলে বলা হয় ثَوبٌ سَفِيْهٌ; পরবর্তীতে শব্দটি কম আকল সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে থাকে, চাই পার্থিব বিবেচনায় হোক। যেমন– سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ অথবা পরকাল বিবেচনায় হোক, যেমন– وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ;

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

فِيْ قُلُوْبِهِمْ ..... كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

فِيْ قُلُوْبِهِمْ খবরে মুকাদ্দাম, مَرَضٌ মুবতাদায়ে মুয়াখখার; زَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا জুমলায়ে ফে'লিয়া; لَهُمْ অংশটি অগ্রবর্তী খবর, عَذَابٌ মাওসূফ, اَلِيْم প্রথম সিফাত, بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ب হরফুল যায়, ما হসমুল মাসদার كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ মাসদার اسم মাসদার ও المصرا মিলে ب হরফুল যারের মাজরূর حرف الجر ও مجرور মলি أَلِيْمٌ শিবহুল ফে'লের সাথে متعلق ।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ ..... وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ

واو-টি استئنافية-হতে পারে; আবার عاطفة-ও হতে পারে اِذَا-হলো حَرْفُ الشَّرْطِ, قِيْلَ-এর নায়েবে ফায়েল হলো لَا তُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ; لَهُمْ মুতা'আল্লিক اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ অংশটি জুমলা হয়ে قَالُوْا-এর মাফউল । শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া । اَلَا হরফে তাম্বীহ বাক্যের প্রথমে আনা হয় । اِنَّ-এর اسم হলো هُمْ যমীরটি, هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ জুমলাটি اِنَّ-এর খবর । لٰكِنْ-টি ইস্তিদরাকিয়াহ ।

✪ اِخْتِلَافُ الْاملاء : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ : عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ

مُؤْلِمٌ শব্দের লিখনশৈলী : ১০নং আয়াত উল্লিখিত اَلِيْمٌ শব্দের তাফসীরে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি مُوْلِمٌ অর্থাৎ واو বর্ণে হামযাবিহীন রূপে লিখিত হয়েছে ।

খ. তবে সহীহ লিখনশৈলী হবে واو বর্ণে হামযার উল্লেখসহ । কারণ, وَلَمٌ মূলবর্ণ থেকে باب الاِفعَال-এর মাসদার হলো الْإِيْلَامْ; এর অর্থ হলো ভোজের আয়োজন করা । হাদীসে রয়েছে– أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ; পক্ষান্তরে لم মূলবর্ণ থেকে বাবে بَابُ الْإِفْعَالِ হতে ব্যবহার হলে অর্থ হয় কষ্ট দেওয়া ।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

يَكْذِبُوْنَ শব্দের কেরাত : ১০নং আয়াতে উল্লিখিত يَكْذِبُوْنَ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে । যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.)-এর কেরাত অনুযায়ী শব্দটির ذال বর্ণে তাশদীদবিহীন পাড়া হয় ।

খ. ইমাম নাফে ও আবূ আমর (র.) শব্দটির ذال বর্ণে তাশদীদসহ পড়েছেন ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ ..... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

কাফের ও মুনাফিকদের আযাবের ধরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ : ৭নং আয়াতে কাফেরদের ব্যাপারে যে আযাবের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার ধরন হিসেব عَظِيم ব্যবহার করা হয়েছে । আর এখানে মুনাফিকদের যে আযাবের আলোচনা হচ্ছে, তার ধরন اَلِيْمٌ ব্যবহার করা হয়েছে । اَلِيْمٌ অর্থ– বেদনাদায়ক শাস্তি এবং এর মধ্যে শাস্তির দিকটা অধিক । কারণ, যারা মুনাফিক, তারা কাফেরও । কিন্তু তাদের অপরাধ সাধারণ কাফেরদের চেয়েও জঘন্য । কেননা, তারা কুফরির পাশাপাশি ধোঁকা, প্রতারণা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে । এজন্যে তাদের শাস্তি বেশি কঠিন হবে । আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন– اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকেব । [সূরা নিসা : ১৪৫]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ : আয়াতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অংশটি চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মুনাফিকরা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রোজ কেয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেত। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ যা কোনো আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না– সে কাফের-ফাসিকই হোক না কেন।

মিথ্যা বলার পাপ : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কাঠোর শাস্তির কারণ– بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যেই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই কুরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে ইরশাদ করেছেন– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ অর্থাৎ, মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا ..... إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

মুনাফিকদের ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা : পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের ধোঁকার কথা বলা হয়েছে। এখানে তাদের আরেকটা স্বভাবের কথা বলা হচ্ছে যে, তারা নিজেরা সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। কিন্তু অন্যকে ফ্যাসাদকারী আখ্যা দেয়। আয়াতে মুনাফিকদেরকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা থেকে বারণ করা হয়েছে। মুনাফিকরা বিভিন্নভাবে ফ্যাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো। তারা কাফের ছিল। আর কুফরি দ্বারা যমীনে ফ্যাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কারণ, কুফরি স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত। এছাড়া তারা ঈমান গ্রহণে অন্যদেরকে বাধা দিত মুসলমানদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে পাচার করতো এবং কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করতো। আলোচ্য আয়াতে ফ্যাসাদ দ্বারা মুনাফিকদের এসব কাজ উদ্দেশ্য।

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন–

وَالْمُرَادُ بِمَا نُهُوْا عَنْهُ مَا يُؤَدِّىْ اِلٰى ذٰلِكَ مِنْ اِفْشَاءِ اَسْرَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى الْكُفَّارِ وَاِغْرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِن فُنُوْنِ الشُّرُوْرِ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ : لَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ بِيَدِكَ وَلَا تَلْقِ نَفْسَكَ فِى النَّارِ. (حاشية الجمل : ج ١ ص ٢٤)

অর্থাৎ, যে কাজ থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন বিষয়, যা তাদেরকে কাফেরদের নিকট মুমিনদের গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়া, কাফেরেদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা এবং অন্যান্য অমঙ্গলজনক কাজের প্রতি তাদের কে ধাবিত করবে।

যেমন– কোনো ব্যক্তিকে বলা হলো তুমি আত্মহত্যা করো না, এবং নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করো না।

মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা : প্রত্যেক যুগের ধর্মবিদ্বেষী ও মুনাফিকদের চরিত্রই হলো ফ্যাসাদ ও অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড করেও নিজেদেরকে শান্তি ও উন্নতির ধ্বজাধারী বলে সর্বত্র বলে বেড়ানো। মাদিনায় মুনাফিকদের অবস্থাও তা-ই ছিল। যখন তাদেরকে কেউ বলত, নেফাকী করে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা অকুণ্ঠচিত্তে জবাব দিত– اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ অর্থাৎ, আমরাই তো একমাত্র শান্তির ধারক-বাহক। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় তাদের জবাব দিয়ে বলেন– اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ (শুনে রাখ! ওরাই একমাত্র বিশৃঙ্খলাকারী; কিন্তু তারা তা বোঝেও না)। অর্থাৎ তাদের বিবেক বুদ্ধি এতটাই লোপ পেয়েছে যে, তারা বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা এবং অশান্তিকে শান্তি মনে করছে। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে– اَفَمَنْ زُيِّنَ لَه سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا (فاطر : ٨)

কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা দেখে প্রত্যেক মানুষ-ই বুঝেতে পারে যে, এগুলো ফেতনা ও ফ্যাসাদ। যেমন– হত্যা, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, জুলুম ইত্যাদি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই এগুলোকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ মনে করবে। তাই প্রত্যেক ভদ্র মানুষ এসব থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেতনা ফাসাদ নয়; কিন্তু সেসবের কারণে সব রকমের ফেতনা ফ্যাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মুনাফিকদের অবস্থা ছিল অনুরূপ। তারা চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অবিচার করাত না। কারণ, তারা এসবকে দূষণীয় মনে করতো। কিন্তু সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬]

١٤.﴿وَاِذَا لَقُوْا﴾ أَصْلُهُ لَقِيُوْا حُذِفَتْ الضَّمَّةُ لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا﴾ مِنْهُمْ وَرَجَعُوْا ﴿اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ﴾ رُؤَسَائِهِمْ ﴿قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ﴾ فِي الدِّيْنِ ﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ.

১৪. যখন তারা সাক্ষাৎ করে لَقُوْا ক্রিয়াটি মূলত لَقِيُوْا ছিল। (ى-এর মাঝে) পেশ উচ্চারণে কঠিন বিধায় তাকে বিদূরিত করে দেওয়া হয়, অতঃপর واو সাকিনের সাথে ইয়া সকিন একত্র হওয়ায় তাকেও বিলুপ্ত করা হয়েছে। ঈমানদারদের সাথে, তখন তারা বলে "আমরা ঈমান এনেছি" আর যখন তারা পৃথক হয়, সাহাবীগণ হতে এবং ফিরে যায় তাদের শয়তানদের নিকট অর্থাৎ, তাদের দলপতিদের নিকট তখন তারা বলে, "আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি" ধর্ম বিশ্বাসে। তাদের সাথে নিশ্চয় আমরা শুধু ঠাট্টা-তামাশা করছি বাহ্যত ঈমানের কথা প্রকাশ করে।

١٥.﴿اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ يُجَازِيْهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ ﴿وَيَمُدُّهُمْ﴾ يُمْهِلُهُمْ ﴿فِيْ طُغْيَانِهِمْ﴾ بِتَجَاوُزِهِمْ الْحَدَّ فِي الْكُفْرِ ﴿يَعْمَهُوْنَ﴾ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا حَالٌ.

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন অর্থাৎ তিনি তাদের এই তামাশার শাস্তি দান করবেন এবং তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, ছাড় দেন তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় কুফরি করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করার মাধ্যমে আর তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। অর্থাৎ, হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে يَعْمَهُوْنَ সীগাহটি حَالٌ (অবস্থাবাচক পদ) হয়েছে।

١٦.﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى﴾ أَيْ اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهِ ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ﴾ أَيْ مَا رَبِحُوا فِيْهَا بَلْ خَسِرُوْا لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾ فِيْمَا فَعَلُوْا.

১৬. তারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি ক্রয় করেছে। অর্থাৎ, পরিবর্তিত রূপে করে নিয়েছে আর তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি অর্থাৎ এতে তারা লাভবান হয়নি; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ, কেননা তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন হলো, তাদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে অবধারিত জাহান্নামের দিকে। এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত নয় তাদের এই কর্মকাণ্ডে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُه : وَاِذَا خَلَوا ـ مِنْهُمْ وَرَجَعُوْا

خَلَوْا-এর صِلَة-এর বিবরণ : خَلَوْا إِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ বাক্যাটির তারকীবে মতভেদ আছে। কারো কারো অভিমত হলো, خَلَوْا শব্দটির صِلَة হিসেবে إِلٰى শব্দ ব্যবহার হতে পারে না। অতএব, এখানে خَلَوْا-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি صِلَة এবং إِلٰى-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ফে'ল উহ্য ধরে নিতে হবে। তাহলে মূলরূপ হবে- خَلَوْا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَجَعُوْا إِلٰى رُؤَسَائِهِمْ; মুফাসসির (র.) এ অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করে এভাবে তাফসীর করেছেন।

قَوْلُه : شَيَاطِيْنِهِمْ ـ رُؤَسَائِهِمْ

شَيَاطِيْنِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতে শয়তান বলে ইহুদি-মুশরিক ও মুনাফিক নেতৃবৃন্দকে বোঝানো হয়েছে, যাদের প্ররোচনায় সাধারণ বিধর্মীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

قَوْلُه : يَعْمَهُوْنَ ـ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا

يَعْمَهُوْنَ-এর তারকীবগত অবস্থান : يَعْمَهُوْنَ জুমলাটি يَمُدُّهُمْ-এর মানসূব যমীর هُمْ কিংবা طُغْيَانِهِمْ-এর মাজরূর যমীর هُمْ থেকে حَال হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এ তারকীব করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَعْمَهُوْنَ বাক্যটি يَمُدُّهُمْ বা طُغْيَانِهِمْ-এর যমীরের সিফাত নয়। কারণ, যমীর কখনো مَوْصُوْف হতে পারে না। مَوْصُوْف হওয়ার যোগ্যতা রাখে সত্তাগত বস্তু, তাই মুফাসসির (র.) এ তারকীব করেছেন।

١٤.﴿وَاِذَا لَقُوْا﴾ أَصْلُهُ لَقِيُوْا حُذِفَتْ الضَّمَّةُ لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا﴾ مِنْهُمْ وَرَجَعُوْا ﴿اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ﴾ رُؤَسَائِهِمْ ﴿قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ﴾ فِي الدِّيْنِ ﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ.

১৪. যখন তারা সাক্ষাৎ করে لَقُوْا ক্রিয়াটি মূলত لَقِيُوْا ছিল। (ى-এর মাঝে) পেশ উচ্চারণে কঠিন বিধায় তাকে বিদূরিত করে দেওয়া হয়, অতঃপর واو সাকিনের সাথে ইয়া সকিন একত্র হওয়ায় তাকেও বিলুপ্ত করা হয়েছে। ঈমানদারদের সাথে, তখন তারা বলে "আমরা ঈমান এনেছি" আর যখন তারা পৃথক হয়, সাহাবীগণ হতে এবং ফিরে যায় তাদের শয়তানদের নিকট অর্থাৎ, তাদের দলপতিদের নিকট তখন তারা বলে, "আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি" ধর্ম বিশ্বাসে। তাদের সাথে নিশ্চয় আমরা শুধু ঠাট্টা-তামাশা করছি বাহ্যত ঈমানের কথা প্রকাশ করে।

١٥.﴿اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ يُجَازِيْهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ ﴿وَيَمُدُّهُمْ﴾ يُمْهِلُهُمْ ﴿فِيْ طُغْيَانِهِمْ﴾ بِتَجَاوُزِهِمْ الْحَدَّ فِي الْكُفْرِ ﴿يَعْمَهُوْنَ﴾ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا حَالٌ.

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন অর্থাৎ তিনি তাদের এই তামাশার শাস্তি দান করবেন এবং তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, ছাড় দেন তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় কুফরি করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করার মাধ্যমে আর তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। অর্থাৎ, হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে يَعْمَهُوْنَ সীগাহটি حَالٌ (অবস্থাবাচক পদ) হয়েছে।

١٦.﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى﴾ أَيْ اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهِ ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ﴾ أَيْ مَا رَبِحُوا فِيْهَا بَلْ خَسِرُوْا لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾ فِيْمَا فَعَلُوْا.

১৬. তারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি ক্রয় করেছে। অর্থাৎ, পরিবর্তিত রূপে করে নিয়েছে আর তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি অর্থাৎ এতে তারা লাভবান হয়নি; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ, কেননা তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন হলো, তাদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে অবধারিত জাহান্নামের দিকে। এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত নয় তাদের এই কর্মকাণ্ডে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُه : وَاِذَا خَلَوا ـ مِنْهُمْ وَرَجَعُوْا

خَلَوْا-এর صِلَة-এর বিবরণ : خَلَوْا إِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ বাক্যাটির তারকীবে মতভেদ আছে। কারো কারো অভিমত হলো, خَلَوْا শব্দটির صِلَة হিসেবে إِلٰى শব্দ ব্যবহার হতে পারে না। অতএব, এখানে خَلَوْا-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি صِلَة এবং إِلٰى-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ফে'ল উহ্য ধরে নিতে হবে। তাহলে মূলরূপ হবে- خَلَوْا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَجَعُوْا إِلٰى رُؤَسَائِهِمْ; মুফাসসির (র.) এ অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করে এভাবে তাফসীর করেছেন।

قَوْلُه : شَيَاطِيْنِهِمْ ـ رُؤَسَائِهِمْ

شَيَاطِيْنِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতে শয়তান বলে ইহুদি-মুশরিক ও মুনাফিক নেতৃবৃন্দকে বোঝানো হয়েছে, যাদের প্ররোচনায় সাধারণ বিধর্মীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

قَوْلُه : يَعْمَهُوْنَ ـ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا

يَعْمَهُوْنَ-এর তারকীবগত অবস্থান : يَعْمَهُوْنَ জুমলাটি يَمُدُّهُمْ-এর মানসূব যমীর هُمْ কিংবা طُغْيَانِهِمْ-এর মাজরূর যমীর هُمْ থেকে حَال হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এ তারকীব করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَعْمَهُوْنَ বাক্যটি يَمُدُّهُمْ বা طُغْيَانِهِمْ-এর যমীরের সিফাত নয়। কারণ, যমীর কখনো مَوْصُوْف হতে পারে না। مَوْصُوْف হওয়ার যোগ্যতা রাখে সত্তাগত বস্তু, তাই মুফাসসির (র.) এ তারকীব করেছেন।

قَوْلُهٗ : اِشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى . اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهٖ

আয়াতে اِشْتَرَوُا-এর যে অর্থ উদ্দেশ্য : মুসান্নিফ (র.) اِسْتَبْدَلُوْهَا এ অংশটি বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِشْتِرَاءٌ-এর মাজাযী বা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে اِشْتِرَاء দ্বারা উদ্দেশ্য اِسْتِبْدَال; যা اِشْتِرَاء-এর জন্যে আবশ্যিক বিষয়। অর্থাৎ, এখানে مَلْزُوْم বলে لَازِمْ-কে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُه : فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اَىْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا الخ

رَبِحَ ও تِجَارَةٌ-এর মাঝে ইসনাদটি মাজাযী : مَا رَبِحُوْا বলে মুফাসসির (র.) একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে مَجَاز عَقْلِى হিসেবে ব্যবসার প্রতি লাভের নিসবত করা হয়েছে। কারণ, رَبِحَ-এর নিসবত تِجَارَة-এর দিকে হয় না; تَاجِرُ-এর দিকে হয়। যেমনটি اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর মাঝে হয়েছে। আরবদের মাঝে এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে। এখানে سَبَب বলে مُسَبَّب উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা, ব্যবসা হলো লাভ-ক্ষতির কারণ। আর لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِم অংশটি দ্বারা মুনাফিকদের ঈমানের বিনিময়ে কুফরি গ্রহণকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যা দেওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُه : وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ . فِيْمَا فَعَلُوْا

দ্বিরুক্তির অভিযোগ নিরসন : প্রশ্ন হতে পারে, আয়াতে কেন একই বিষয় বিনা কারণে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, اِشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ দ্বারাও হেদায়াত না থাকা বোঝা যায় এবং وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ দ্বারাও তা-ই বোঝা যায়। কুরআনে কারীমে এমন তাকরার দূষণীয়।

এ কারণে মুসান্নিফ (র.) فِيْمَا فَعَلُوْا বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ দ্বারা ব্যবসা পদ্ধতি সংক্রান্ত হেদায়াত উদ্দেশ্য আর اِشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى দ্বারা দীনি হেদায়াত উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনো তাকরার হয়নি।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَقُوْا : সীগাহ غائب جمع مذكر বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব سمع মাসদার اَللِّقَاءُ মূলবর্ণ (ل.ق.ى) জিনস ناقص يائى অর্থ তারা সাক্ষাৎ করেছে। তবে শব্দটির শুরুতে اِذَا হরফে শর্ত আসায় তা مضارع-এর অর্থে- (তারা সাক্ষাৎ করে) হবে। لَقُوْا শব্দটি মূলত لَقِيُوْا ছিল। ضمة যুক্ত ياء-এর পূর্বে কাসরা উচ্চারণে কঠিন হওয়ায় ضمة হযফ করা হয়েছে। এখন সাকিনযুক্ত ياء এবং واو হয়েছে তাই ياء-কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে لَقُوْا হয়েছে। واو-এর পূর্বে কাসরা কঠিন হওয়ায় তা যম্মা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

خَلَوْا : সীগাহ غائب جمع مذكر বাহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব نصر ينصر মাসদার اَلْخُلُوُّ মূলবর্ণ (خ.ل.و) জিনস ناقص وروي অর্থ : তারা একান্তে মিলিত হয়েছে শব্দটি মূলত خَلَوُوْا ছিল। প্রথম واو-টি লাম কালেমা (মূলবর্ণ) আর দ্বিতীয় واو-টি বহুবচনের আলামত। واو মুতাহাররিকের পূর্বে مفتوح বিধায় প্রথম واو-টিকে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন الف এবং দ্বিতীয় واو-এর মাঝে দুই সাকিন একত্র হওয়ায় الف বিলুপ্ত হয়ে خَلَوْا হয়েছে।

شَيَاطِيْن : শব্দটি বহুবচন, একবচনে شَيْطَان; এর مشتق منه-এর ব্যাপারে ভাষাবিদগণের দুটি অভিমত রয়েছে।

ক. শব্দটি فَيْعَالٌ ওযনে شطن মূলবর্ণ থেকে নির্গত। شَطْن অর্থ হলো দূরবর্তী হলো। শয়তান সঠিক পথ থেকে দূরে থাকে বলে তাকে شَيْطَانْ বলা হয়।

খ. শব্দটি شَاطٌ থেকে নির্গত। شَاطٌ অর্থ হলো বাতিল হলো।

আরবি ভাষায় شَيْطَان শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। كُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالدَّوَابِّ فَهُوَ شَيْطَانٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক অবাধ্য উদ্ধত আচরণকারীকে شَيْطَان বলা হয়। জিন-ইনসান এমনকি জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার হয়েছে। হাদীস শরীফে একাকী সফরকারীকেও শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

يَمُدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার المد মূলবর্ণ (م.د.د) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ তিনি ছাড় দেন, অবকাশ। مَدّ-এর ব্যবহার অকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন সূরা মারইয়ামে রয়েছে– وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (مريم : ٧٩); আর কল্যাণের ক্ষেত্রে সাধরণত باب افعال থেকে امداد-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

١- وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ. (الاسراء : ٦)
٢- وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ. (الطور : ٢١)
٣- اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ. (ال عمران : ١٢٣)

طُغْيَانٌ : এটি طَغٰى يَطْغٰى-এর মাসদার। শব্দটির ط বর্ণে কাসরা ও যম্মা উভয়টি হতে পারে। এর অর্থ হলো– সীমালঙ্ঘন করা। শব্দটির মূলবর্ণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বেলন– طَغٰى-এর কালেমা হলো ياء; আবার কেউ বলেন– واو; যেমন বলা হয়– طَغَوْتُ. طَغَيْتُ;

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سمع কিংবা فتح মাসদার اَلْعَمَه মূলবর্ণ (ع.م.ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা দিশেহারা হয়। عَمَهَ فِى الْاَمْرِ অর্থ– কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগা। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারা। কোনো কোনো মুফাসসির উক্ত আয়াতে এ অর্থটি গ্রহণ করেছেন। কারণ, মুনাফিকরা কুফরের ব্যাপারেও সিদ্ধান্তহীন ছিল। আর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, عَمَه-এর অর্থ হেদায়াতপ্রাপ্ত না হওয়া, ইবনে কুতাইবা (র.) বলেন, عَمَه-এর অর্থ আগতবস্তু না দেখার উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করে রাখা।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, عَمَه এবং عَمًى শব্দটি দুটি সমার্থক। তবে ব্যবহারের দিক থেকে عَمًى শব্দটি বাহ্যিক দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে عَمَه শব্দটি শুধু অন্তর্দৃষ্টি বা চিন্তাগত বিমূঢ়তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, উভয়য়ের মাঝে عَام خاص مطلق-এর সম্পর্ক, عَمَه শব্দটি অন্তর্দৃষ্টি অর্থে خاص আর عَمًى শব্দটি বাহ্যিক ও অন্তর্দৃষ্টি উভয় অর্থে عَام, যেমন– وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى; প্রথমটি দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টি উদ্দেশ্য। [রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, মুফরাদাত]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا لَقُوْا ..... قَالُوْا آمَنَّا

لَقُوا الَّذِيْنَ বাক্যটি শর্ত অর্থাৎ, واو হলো حرف عطف; اِذَا ইসমে যরফ, শর্তের অর্থবাহক, অগ্রবর্তী فيه مفعول আর لَقُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল, اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ হলো মাফউল, সব মিলে শর্ত এবং قَالُوْا آمَنَّا হলো জাযা। অর্থাৎ, قَالُوْا হলো قَوْل আর آمَنَّا হলো مَقُوْل উভয় মিলে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে পূর্ববর্তী وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُه تَعَالٰى : وَإِذَا خَلَوْا ..... نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

পুরো বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছ। إِنَّا مَعَكُمْ জুমলায়ে ইসমিয়াটি قَالُوْا-এর মাফ'উল-হিসেবে নসবের স্থানে আছে। إِنَّمَا-এর মাঝে إِنَّ-এর আমল রহিত। কারণ, তার পরে مَا الْكَافَّة (আমল রহিতকারী ما) এসেছে। অতএব, نَحْنُ মুবতাদা ও مُسْتَهْزِءُوْن খবর হবে। আবার স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে রফার স্থানেও হতে পারে।

قَوْلُه تَعَالٰى : اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ ..... كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, পরবর্তী সম্পূর্ণ অংশ তার খবর। وَيَمُدُّهُمْ বাকাটি يَسْتَهْزِئُ-এর উপর আতফ হয়েছে। فِي طُغْيَانِهِمْ অংশটি يَمُدُّ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ। আর يَعْمَهُوْنَ জুমলায়ে ফেয়েলিয়াটি يَمُدُّهُمْ-এর هُمْ থেকে অথবা طُغْيَانِهِمْ-এর هُمْ থেকে হাল হসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

قَوْلُه تَعَالٰى : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ ..... كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

أُولٰئِكَ শব্দটি মুবতাদা ও بِالْهُدٰى ..... الَّذِيْنَ পুরো অংশ সেলা-মাওসূল ও متعلق নিয়ে তার খবর। فما رَبِحَتْ-এর ف-টি عاطفة; পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটির উপর আতফ হয়েছে। ..... وَمَا كَانُوْا বাক্যটি مَا رَبِحَتْ-এর উপর আতফ হয়েছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُه تَعَالٰى : وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ ..... إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.) একবার মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার সহচরদেরকে নসিহত করার জন্যে গেলেন। তারা বললেন, হে ইবাই! তুমি এবং তোমার সাথিরা আমাদের সাথে একনিষ্ঠভাবে ঈমান নিয়ে বসবাস করো। তখন ইবনে সালূল হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল- مَرْحَبًا بِالشَّيْخِ وَالصِّدِّيْقِ হযরত ওমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল- مَرْحَبًا بِالْفَارُوْقِ القَوِى فِىْ دِيْنِهِ এবং হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল ﷺ مَرْحَبًا بِابْنِ عَمِّ النَّبِى; তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন- اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُنَافِقْ (আল্লাহকে ভয় করো মোনাফেকি করো না।) জবাবে ইবনে সালূল বলল, আমাদের ঈমান তোমাদের ঈমানের মতোই এবং আমি যা বলেছি, অন্তর থেকেই বলেছি। কিন্তু পরক্ষণেই সে তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, যখন তোমরা মুললমানদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমার মতো বাক্যালাপ করবে। তখন তারা বলল, তুমি যতদিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে, ততদিন আমরা কল্যাণের মাঝে থাকব। তখন তাদের এ আচরণ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

[হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭; হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُه تَعَالٰى : وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ ..... نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

পুনরুক্তির সন্দেহ নিরসন : প্রশ্ন হতে পারে, ৮নং আয়াতে মুমিনদের সাথে মুনাফিকদের মিথ্যা বলার আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতার আলোচনা হয়েছে। এই পুনরুক্তির কারণ কী? এর উত্তর হলো, মুনাফিকরা মুমিন এবং কাফেরদের সাথে কেমন আচরণ করতো, এখানে তার বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য। আর ৮নং আয়াতে তথা وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا الخ-এর মাঝে তাদের নেফাকির স্বরূপ তুলে ধরা উদ্দেশ্য। সুতরাং উভয় আলোচনায় কোনো ধরনের তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

মুনাফিক নেতাদেরকে শয়তান বলার কারণ : আয়াতে মুনাফিক নেতাদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো-

১. তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে শয়তান রয়েছে, যে তাদেরকে প্ররোচিত করে এবং ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা শিক্ষা দেয়।

২. কেউ কেউ বলে, তাদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো তারা মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তানের মতো। আর সে যুগে এ জাতীয় শয়তানদের শীর্ষ নেতা ছিল পাঁচজন। মদিনায় কা'ব ইবনে আশরাফ, জুহাইনা গোত্রে আব্দুদ দার, বনী আসলামে আবূ বুরদান, বনী আসাদে আউফ ইবনে আমের আর শামে আব্দুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ।

قَوْلُه تَعَالٰى : اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ..... فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

আল্লাহর উপহাস করার কথা আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ কাফেরদের প্রতি উপহাস করেন। অথচ এ কাজ আল্লাহর শানের বিরোধী। তাই মুফাসসিরগণ এ অংশটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন-

১. এখানে مُشَاكَلَةٌ فِى اللَّفْظِ তথা কথার জবাব অনুরূপ কথা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِهْزَاء-এর আসল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল অর্থ হবে- يُجَازِيْهِمْ (তিনি তাদেরকে উপহাসের শাস্তি দেবেন)।

المُشَاكَلَةُ فى اللَّفْظِ কুরআনে একাধিক জায়গায় এসেছে। যেমন- فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ (যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘন করো, যেমন সীমালঙ্ঘন সে তোমাদের উপর করেছে) [বাকারা- ১৯৩] সীমালঙ্ঘনের এ দ্বিতীয় কথাটি মূলত সীমালঙ্ঘন নয়, অনুরূপ কথা বলে তাকে সমুচিত জবাব দেওয়া।

আরো ইরশাদ হয়েছে- فَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ (তোমরা যদি প্রতিশোধ নাও, তাহলে প্রতিশোধ নেবে ততটুকু, যতটুকু তোমাদেরকে নিপীড়ন করেছিল)।

এখানে প্রথম প্রতিশোধ কথাটি কিন্তু মূলত নিপীড়নের প্রতিশোধ, আসলে প্রতিশোধ নয়। এটা কেবল প্রতিশোধ শব্দের মোকবিলায় বলা হয়েছে।

২. কারো কারো মতে, এ ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণাম মুনাফিকদেরই ভোগ করতে হবে। এজন্যে বলা হয়েছে, তাদের সাথে আল্লাহ ঠাট্টা-বিদ্রূপই করবেন।

৩. কারো মতে, মুনাফিকরা দুনিয়ায় আযাবে পতিত হয়নি, অন্যান্য মুশরিকের ন্যায় হত্যার সম্মুখীন হয়নি, কিংবা যিম্মীদের ন্যায় জিজিয়া-কর দিয়ে মদিনায় থাকতে হয়নি। তাই তারা ধোঁকায় পড়ে গেছে। ফলে তাদের সাথেও যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে।

قَوْلُه تَعَالٰى : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا ..... وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি গ্রহণের ব্যাখ্যা : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ ..... الخ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়া মুনাফিকদের কাছে আগে থেকেই হেদায়াত ছিল। পরে তারা হেদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে। অথচ অনেক মুনাফিক আগে কাফের ছিল। এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর মুফাসসিরগণ প্রদান করেছেন–

১. এর একটি উত্তর হলো, হেদায়াত এবং গোমরাহী উভয়টির পথ তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মর্জি মোতাবেক গোমরাহিকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

২. রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهَوِّدَانِهِ الخ; অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু ফিতরাতের (ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষমতার) উপর জন্ম লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন বাতিল ধর্মে দীক্ষিত করে।

৩. রুহের জগতে আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছিলেন– اَلَسْتُ بِرَبِّكُم (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) তখন সকলেই সমস্বরে সাড়া দিয়ে বলেছিল– بَلٰى (হ্যাঁ, অবশ্যই আপনিই আমাদের প্রভু)। এখানে হেদায়াত দ্বারা সেই স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য।

মুনাফিকদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাখ্যা : প্রতিটি মানুষ ফিতরত তথা মুমিন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব, মুনাফিকদের কাছে হেদায়াত ছিল। কিন্তু তারা সেটার পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করেছে। আয়াতে মুনাফিকদের কুফরী প্রাধান্য দেওয়াকে রূপকার্থে ঈমানের বিনিময়ে কুফরির ক্রয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বেচাকেনায় তারা লাভবান হয়নি। কারণ, তারা উত্তমের বিনিময়ে অধম গ্রহণ করেছে। আর এর পরিণামে রয়েছে আখেরাতের শাস্তি।

কাজী বায়যাভী (র.) বলেন–

فَإِنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا أَيْ مِنَ التِّجَارَةِ سَلَامَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ، وَهٰؤُلَاءِ قَدْ أَضَاعُوْا الطَّلَبَتَيْنِ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِهِمِ الفِطْرَةُ السَّلِيْمَةُ وَالْعَقْلُ الصَّرْفُ، فَمَا اعْتَقَدُوْا هٰذِهِ الضَّلَالَاتِ فَبَطَلَ اِسْتِعْدَادُهُمْ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَصَّلُوْنَ بِهِ اِلٰى اِدْرَاكِ الْحَقِّ وَنَيْلِ الْكَمَالِ، فَبَقَوْا خَاسِرِيْنَ آئِسِيْنَ مِنَ الرِّبْحِ فَاقِدِيْنَ الأَصْلَ. (تفسير بيضاوى، حاشية الجمل : ج ١، ص٣)

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের আয়াতে ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذَا لَقُوا .....اِنَّا مَعَكُمْ

اِنَّا مَعَكُمْ ও اٰمَنَّا বাক্যদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য : মুনাফিকরা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন اٰمَنَّا বলে যা جملة فعلية; আর فعلية جملة সীমিত সময়ের জন্যে ঈমান আনা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে যখন তাদের দলনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তখন اِنَّا مَعَكُمْ বলে যা اسمية جملة; আর اسمية جملة সর্বদার অর্থ প্রদান করে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুনাফিকরা যেহেতু অন্তর থেকে ঈমান গ্রহণ করেনি তাই মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাতে কোনো ধরনের তাকীদ ছাড়াই اٰمَنَّا বলত। পক্ষান্তরে নেতাদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের সময় মুসলমানদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশার বিষয়কে তিনটি তাকীদ দ্বারা বর্ণনা করতো। اَنْ, اِنَّمَا, فِيْ জুমলায়ে ইসমিয়া।

قَوْلُه تعَالٰى : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا التَّضْلَلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ

اَلْاِسْتِعَارَةُ التَّرْشِيْحِيَّةُ : بَيْع ও اِشْتِرَاء শব্দদুটি ক্রয় ও বিক্রয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে রূপকার্থে সাধারণ পরিবর্তন করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এ স্থানে هداية দ্বারা উদ্দেশ্য স্বভাবগত হেদায়াত যাকে كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ এবং فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-এর হিসেবে ধরা হয়।

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ-এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة হয়েছে, তাই تِّجَارَة মুশাব্বাহ বিহীর সম্পৃক্ততার কারণে اِسْتِبْدَال মুশাব্বাহ-এর জন্যে প্রমাণ করা হয়েছে।

١٧.﴿مَثَلُهُمْ﴾ صِفَتُهُمْ فِيْ نِفَاقِهِمْ ﴿كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ﴾ أَوْقَدَ ﴿نَارًا﴾ فِيْ ظُلْمَةٍ ﴿فَلَمَّآ اَضَآءَتْ﴾ أَنَارَتْ ﴿مَا حَوْلَهٗ﴾ فَأَبْصَرَ وَاسْتَدْفَأَ وَأَمِنَ مِمَّنْ يَخَافُهُ ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ﴾ أَطْفَأَهُ وَجُمِعَ الضَّمِيْرُ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى الَّذِيْ ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ﴾ مَا حَوْلَهُمْ مُتَحَيِّرِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ خَائِفِيْنَ فَكَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ اٰمَنُوْا بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيْمَانِ فَإِذَا مَاتُوْا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ.

১৭."তাদের উপমা মুনাফিকীর ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা হলো যেমন- এক ব্যক্তি অন্ধকারে অগ্নি প্রজ্বলিত করল, এখানে استوقد সীগাহটি اوقد অর্থে ব্যবহৃত। অতঃপর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল ফলে সে চতুর্দিক দেখতে পেল, তা হতে উষ্ণতা লাভ করল এবং সে ভীতি হতে নিরাপদ হলো, আল্লাহ তখন তাদের আলো নিয়ে নিলেন অর্থাৎ, নির্বাপিত করে দিলেন। الذى-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে بنورهم-এর هم যমীরটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না, তাদের চতুষ্পার্শ্বের পথ সম্পর্কে তারা বিভ্রান্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। তেমনিভাবে তারাও (মুনাফিকগণ) বাহ্যত কালেমা উচ্চারণ করে ঈমান এনেছে বলে প্রকাশ করছে; কিন্তু যখন তারা মারা যাবে ভীতি ও শাস্তি তাদের উপর এসে আপতিত হবে।

١٨.هُمْ ﴿صُمٌّ﴾ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ سِمَاعَ قَبُوْلٍ ﴿بُكْمٌ﴾ خُرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَقُوْلُوْنَهُ ﴿عُمْىٌ﴾ عَنْ طَرِيْقِ الْهُدٰى فَلَا يَرَوْنَهُ ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ﴾ عَنِ الضَّلَالَةِ.

১৮.তারা বধির সত্য সম্পর্কে; সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তা শ্রবণ করে না মূক কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে। অতএব, তারা তা উচ্চারণ করে না, অন্ধ হেদায়েতের পথ সম্পর্কে, ফলে তারা তা দেখে না সুতরাং তারা ফিরে আসবে না পথভ্রষ্টতা থেকে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : مَثَلُهُمْ . صِفَتُهُمْ فِىْ نِفَاقِهِمْ

مَثَلُ শব্দটির অর্থ নির্ণয় : مَثَلُ শব্দটির অর্থ উপমা হতে পারে আবার অবস্থাও হতে পারে। এখানে مَثَلُهُمْ-এর ব্যাখ্যায় صِفَتُهُمْ শব্দ উল্লেখ করে মুসান্নিফ (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَثَلُ দ্বারা উপমা উদ্দেশ্য নয়; বরং অবস্থা উদ্দেশ্য। مثل শব্দটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ও কর্মকাণ্ড অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى ,وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى এবং وَالْمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ; শব্দটি কখনো মর্যদাপূর্ণ না হলেও ব্যবহার হয়। যেমন- كَمَثَلِ الْحِمَارِ. كَمَثَلِ الْكَلْبِ ইত্যাদি। [রুহুলমা'আনী, লুগাতুল কুরআন : মুফরাদাত]

قَوْلُهٗ : اِسْتَوْقَدَ . اَوْقَدَ

এখানে استفعال অর্থে নয় : اِسْتَوْقَدَ-এর ব্যাখ্যায় اَوْقَدَ উল্লেখ করে মুফাসসির (র.) বোঝালেন যে, اِسْتَوْقَدَ-এর মাঝে س এবং ت হরফ দুটি طَلَبَ-এর অর্থ প্রকাশের জন্যে নয়; বরং এগুলো زَائِدَة বা অতিরিক্ত। আরবিতে এর বহু প্রচলন আছে।

قَوْلُهٗ : أَضَاءَتْ . اَنَارَتْ

اَضَاءَتْ-এর অর্থ নির্ণয় : اَلْإِضَاءَةُ মাসদারটি لازم ও متعدى উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। اَضَاءَتْ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির (র.) اَنَارَتْ উল্লেখ করে فعل-টি مُتَعَدِّى হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেক্ষেত্রে أَضَاءَتْ-এর ফায়েল হবে তার মাঝে বিদ্যমান যমীরটির যা النَّار-এর দিকে ফিরেছে। আর مَا حَوْلَه হবে মাফউলে বিহী। অতএব, মূলরূপ হবে- فَلَمَّا أَضَاءَتِ النَّارُ الْمَكَانَ الَّذِىْ حَوْلَهٗ;

قَوْلُهٗ : وَ جَمْعُ الضَّمِيْرِ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى الَّذِىْ

اَلَّذِىْ-এর অর্থ ও শব্দগত দিকের কারণে পরিবর্তন : আয়াতের শুরুতে اِسْتَوْقَدَ শব্দ একবচন ব্যবহার হয়েছে الَّذِىْ-এর শব্দগত দিক বিবেচনা করে। আর بِنُوْرِهِمْ, تَرَكَهُمْ ও لَايُبْصِرُوْنَ-এর মাঝে هُمْ সর্বনামটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে الَّذِى-এর অর্থগত দিক বিবেচনা করে।

قَوْلُهٗ : فَكَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ ..... الخ

উদাহরণের বিবরণ : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত تَمْثِيْل-টিকে মুফাসসির (র.) تَشْبِيْهُ الْمُفْرَدِ بِالْمُفْرَدِ হিসেবে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে مُمَثَّلْ হলো চারটি। যথা– ১. আগুন, ২. আগুন জ্বালানো, ৩. আগুন নিভে যাওয়া, ৪. আগুন নিভে যাওয়ার কারণে আগুন থেকে কোনো ফায়েদা না পাওয়া। এ চারটি مُمَثَّل-এর مُمَثَّل لَه হলো নিম্নেরূপ– ১. আগুনের مُمَثَّل لَه হলো কালিমায়ে শাহাদাত। ২. আগুন জ্বালানোর ممثل له হলো, মৌখিকভাবে মুনাফিকদের কালিমায়ে শাহাদাত বলা। ৩. আগুন নিভে যাওয়ার ممثل له হলো, কুফর-শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণে মুনাফিকদের অন্তর মরে যাওয়া। ৪. আগুন থেকে উপকার লাভ করতে না পারার ممثل له হলো মৃত্যুর পর মৌখিকভাবে বলা কামিলায়ে শাহাদাত মুনাফিকদের কোনো কাজে না আসা।

فَكَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ ..... الخ বলার দ্বারা মুফাসসির (র.) এসব مُمَثَّل لَه ও مُمَثَّل-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উল্লেখ্য, মুফাসসির (র.) আলোচ্য উদাহরণটি تَشْبِيْهُ الْمُفْرَدِ بِالْمُفْرَدِ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে কাজী বায়যাভী (র.)-সহ অনেক মুফাসসির এটিকে تَشْبِيْهُ الْمُرَكَّبِ بِالْمُرَكَّبِ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

قَوْلُهٗ : هُمْ صُمٌّ عَنِ الْحَقِّ .....

صُمٌّ الخ বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় : صُمٌّ হলো উহ্য মুবতাদার প্রথম খবর, بُكْمٌ হলো দ্বিতীয় খবর এবং عُمْيٌ হলো তৃতীয় খবর। মুফাসসির (র.) صُمٌّ-এর পূর্বে هم বলে তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উপরিউক্ত তিনটি খবর যদিও শব্দের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অর্থ ও মর্মার্থের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও সত্য গ্রহণ না করা। সুতরাং এর দ্বারা এটা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের বাহ্যিক অনুভূতিই নেই। لَا يَرْجِعُوْنَ-এর পরে মুফাসসির (র.) عَنِ الضَّلَالَة উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مَثَلُ : مَثَلُ শব্দটি ইসমে মুফরাদ, বহুবচন اَمْثَالٌ; مثل শব্দটি বাবে نصر-এর মাসদার مَثُوْلًا থেকে নির্গত। مَثُوْلًا শব্দের অর্থ اَلْاِنْتِصَابُ বা কারো সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। শব্দটি হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। চাই সেটি উপমা হোক, রূপক উপমা হোক। হৃদয়গ্রাহী উপদেশ বা ইঙ্গিতপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় হোক।

مِثْلُ ও مَثَلُ শব্দের পার্থক্য : আল্লামা কুরতুবী (র.)-এর নিকট উভয়টি সমার্থক। কোনো কোনো মুহাক্কিকের নিকট পার্থক্য রয়েছে। যেমন– اَلْمِثْلُ (মীমে যের) অর্থ اَلْمُتَّحِدُ فِى الْحَقِيْقَةِ যেমন বলা হয়, هٰذَا مِثْلُه কুরআনে রয়েছে– اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ; আর اَلْمَثَلُ (মীমে যবর) ব্যবহার হয়, যদি দুটি বস্তু গুণে এক হয় এবং একটিকে অপরটির সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। যেমন– مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِىْ..... আয়াতে হয়েছে।

مَثَلْ. مِثْلُ. مَثِيْل-এ শব্দগুলো تشبيه-এর অর্থে شبه. شبه. شبيه-এর ন্যায় তিন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। উপমা এবং কোনো আশ্চর্যময় ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলির সাথে তুলনা দেওয়ার জন্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। ইলমে বালাগাতের পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে مثل শুধু كلام مركب-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আর تشبيه মুফরাদ ও মুরাক্কাব উভয়টির জন্যে ব্যবহার হয়। উপমার দ্বারা একটি কাল্পনিক ও অনুভবযোগ্য নয়, এমন বস্তুও অনুভবযোগ্য বস্তুর ন্যায় উপস্থাপনা করা যায়। তাই অলঙ্করশাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন উক্তিতে এবং বিগত ঐশী গ্রন্থাবলিতেও পবিত্র কুরআনের ন্যায় অনেক উপমা পাওয়া যায়।

صُمٌّ : এটি اَصَمُّ-এর বহুচন। অর্থ– বধির। স্ত্রীলিঙ্গ– صَمَّاء; صَمَّتِ الْاُذُنُ (س) শ্রবণশক্তি নষ্ট হলো।

بُكْمٌ : এটি اَبْكَمُ-এর বহুবচন। অর্থ– মূক, বোবা। يَبْكَمُ (س) بَكِمَ-বোবা হলো। আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন– اَلْاَبْكَمُ الَّذِىْ لَا يَنْطِقُ وَلَا يَفْهَمُ فَإِذَا فَهِمَ فَهُوَ الْاَخْرَسُ. وَقِيْل : اَلْاَبْكَمُ وَالْاَخْرَسُ وَاحِدٌ.

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন, জন্মগত বোবাকে اَبْكَم বলা হয়। اَخْرَس ব্যাপকভাবে যে কোনো বোবাকেই বলা হয়।

عُمْيٌ : এটি اَعْمٰى-এর বহুবচন। অর্থ- অন্ধ। স্ত্রীলিঙ্গ- عَمْيَاء; বহুবচন- عَمْيَانُ-ও আসে। عَمِىَ (س) يَعْمٰى অন্ধ হলো। عميا

أَضَاءَتْ : সীগাহ وَاحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব افعال মাসদার اَلْإِضَاءَةُ মূলবর্ণ (ض . و . ء) জিনস مركب (لام مهموز . واوى اجوف) অর্থ- তা আলোকিত করল। তাফসীরে আবুস সাউদ-এ উল্লেখ আছে- اَلْإِضَاءَةُ فَرْطُ الْاِنَارَةِ অর্থাৎ اَلْإِضَاءَةُ অর্থ- অধিক আলোকিত করা। কুরআনে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا [সূরা ইউনুস : ৫] আর اَضَاءَتْ শব্দটিকে مؤنث ব্যবহার করা হয়েছে نَار-কে ফায়েল সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ, اَضَاءَتِ النَّارُ অথবা اَمَاكِن وَاَشْيَا-কে ফায়েল সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ, اَضَاءَتِ الْاَشْيَاءُ وَالْاَمَاكن;

اِسْتَدْفَأَ : সীগাহ وَاحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব استفعال মাসদার اَلْاِسْتِدْفَاءُ মূলবর্ণ (د . ف . ء) জিনস مهموز لام অর্থ- সে তাপ গ্রহণ করল। অভিধানে دُفْءٌ বলা হয় উটের শাবক, দুধ ও তা থেকে আরো যা যা উপকার লাভ করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ [সূরা নাহল : ৫]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ..... ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُوْنَ

مَثَلُهُمْ হলো মুবতাদা, كَمَثَلِ অংশটুকু জার-মাজরূর মিলে উহ্য خبر-এর সাথে متعلق। فَلَمَّا-এর ف-টি عاطفة; لما শর্তের অর্থ ধারণকারী اسم ظرف। مَا حَوْلَهٗ হলো اَضَاءَتْ-এর মাফউল। جملة-টি শর্ত। ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ বাক্যটি جزاء হিসেবে রফার স্থানে আছে। وَتَرَكَهُمْ ..... لَا يُبْصِرُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী ذَهَبَ اللّٰهُ .... الخ বাক্যের উপর আতফ। فِيْ ظُلُمَاتٍ অংশটি تَرْك-এর দ্বিতীয় মাফউল। لَا يُبْصِرُوْنَ বাক্যটি تَرَكَهُمْ-এর هُمْ যমীরটি থেকে حال হিসেবে نصب-এর স্থানে আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِيْ

এখান থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। পূর্বের আয়াতে আলোচনা হয়েছে মুনাফিকদের পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে। যা দ্বারা عَقْلِى-ভাবে মুনাফিকদের সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জিত হয়েছে বটে। কিন্তু عَقْل-এর তুলনায় যেহেতু اِحْسَاس-এর সাথে মানুষের সম্পর্ক বেশি, তাই উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে পুনরায় তাদের কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। দু'শ্রেণির মুনাফিক সম্পর্কে এখানে পৃথক দুটি উপমা পেশ করা হয়েছে।

প্রথম উদাহরণটি ঐ শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে যারা কুফরিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের পক্ষ হতে আর্থিক সুবিধা লাভের জন্যে শুধু মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। আর দ্বিতীয় উদাহরণটি ঐ শ্রেণির মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো কখনো প্রকৃত মুমিন হওয়ার ইচ্ছা করতো; আবার কখনো দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ব্যাপারে দ্বিধায় ফেলে দিত।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي ..... فِيْ ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُوْنَ

আঁধারে আগুন প্রজ্বলনকারীর সাথে মুনাফিকদের উপমা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার আলোকে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত উদাহরণের মর্মার্থ হলো, রাসূল ﷺ হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর সত্য-মিথ্যা এবং হেদায়েত-গোমরাহির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। চক্ষুষ্মানের সামনে সকল বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন কিছু লোক মুসলমান হয়ে আবার দ্রুত মুরতাদ ও মুনাফিক হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে নিপতিত ছিল। সে অগ্নি প্রজ্বলিত করল, ফলে আশপাশ আলোকিত হলো। উপকারী ও ক্ষতিকর জিনিসসমূহ তার সামনে উদ্ভাসিত হলো।

অতঃপর হঠাৎ করে সে আলোকরশ্মি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যখন মুসলমান হয়, তখন যেন আলোতে প্রবেশ করল। সে আলোতে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ চিনতে পারল। অতঃপর পুনরায় কুফর ও নেফাকের অন্ধকারের দিকে ফিরে গেল।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫]

আল্লামা সাভী (র.) বলেন–

فَقَدْ أَمِنُوْا مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَانْتَفَعُوْا بِأَخْذِ الْغَنَائِمِ والزَّكَاةِ فَإِذَا مَاتُوْا فَقَدْ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ فَلَمْ يَأْمَنُوْا مِنَ النَّارِ وَلَمْ يَنْتَفِعُوْا بِالْجَنَّةِ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ : ظُلْمَةُ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْقَبْرِ . (حَاشِيَةُ الصَّاوِى : جـ١، صـ١٩)

ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করার কারণ : ظُلُمَات শব্দটি বহুবচন ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায় সেখানে অনেকগুলো অন্ধকারে ছিল। বহু অন্ধকারের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা–

١- بِاعْتِبَارِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ تَرَاكُمِ الْغَمَامِ وَظُلْمَةِ اِنْطِفَاءِ النَّارِ.

٢- وَفِى الْبَيْضَاوِى : وَظُلُمَاتُهُمْ ظُلْمَةُ الْكُفْرِ وَظُلْمَةُ النِّفَاقِ وَظُلْمَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ نُوْرٌ . قَالَ تَعَالٰى : يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم.

٣- ظُلْمَةُ الضَّلَالِ وَظُلْمَةُ سَخْطِ اللّٰهِ وَظُلْمَةُ الْعِقَابِ السَّرْمَدِى.

٤- ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ كَأَنَّهَا ظُلُمَاتٌ مُتَرَاكِمَةٌ . (حَاشِيَةُ الْجَمَل : جـ١، صـ ٣٢)

আয়াতে بِنُوْرِهِمْ বলার কারণ : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ বলেছেন। অথচ আয়াতের স্বাভাবিক বর্ণনা পদ্ধতিতে ذَهَبَ اللّٰهُ بِنَارِهِمْ বলা উচিত ছিল। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে– اِسْتَوْقَدَ نَارًا; এই পার্থক্যের হেকমত হলো, আল্লাহ তা'আলা আগুনের শুধু আলো ও উপকারটুকু হরণ করেছেন, দাহ্যশক্তি বা ক্ষতিটুকু নয়। একইভাবে এখানে ضوء না বলে نور শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ضَوْء অর্থ– উজ্জ্বল আলো। ফলে ضَوْء ব্যবহারে করলে এ ধারণা হতে পারত যে, আলোর উজ্জ্বলতা হরণ করা হলেও সামান্য আলো হয়তো রয়ে গেছে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনে ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

اَلتَّشْبِيْهُ التَّمْثِيْلِيُّ : মুফাসসির (র.) আলোচ্য উদারণটিকে تَشْبِيْه الْمُفْرَد হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে আলোচ্য উদাহরণটি تَشْبِيْه الْمُرَكَّب-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থাকে সে আগুন প্রজ্বলনকারীর অবস্থার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। যে আগুন প্রজ্বলনকারী আগুন জালানোর পর চতুর্দিক আলোকিত হলে পার্থিব কিছু উপকার গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর হঠাৎ করে সে আলোকরশ্মি নিভে গেলে সে প্রচণ্ড অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। প্রথমে তারা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যখন মুসলমান হয়, তখন যেন আলোতে প্রবেশ করে। সে আলোতে গনিমত ও যাকাত ইত্যাদি উপকার গ্রহণ করে নিল। অতঃপর যখন মারা গেল, তখন জাহান্নাম থেকে নিজেকে আর মুক্ত করতে পারল না। সুতরাং বোঝা গেল যে, এখানে ঈমান প্রকাশকে আলোকিত হওয়ার সাথে এবং ঈমান কোনো কাজে না আসাকে আগুন নিভে যাওয়ার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ

তাশবীহে বালীগ : আয়াতটিতে মুনাফিকদেরকে মূলত অন্ধ-বধির ইত্যাদির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অতএব, আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো– هُمْ كَالصُّمِّ الْبُكْمِ الْعُمْيِ فِيْ عَدَمِ الْاِسْتِفَادَةِ مِنْ هٰذِهِ الْحَوَاسِّ

এরপর أَدَاةُ التَّشْبِيْه তথা ك ও وَجْه الشَّبَه তথা فِى عَدَمِ الْاِسْتِفَادَةِ ..... الخ অংশটুকু উহ্য রাখার কারণে তাশবীহে বালীগ হয়েছে।

١٩. ﴿اَوْ﴾ مَثَلُهُمْ ﴿كَصَيِّبٍ﴾ أَيْ كَأَصْحَابِ مَطَرٍ وَأَصْلُهُ صَيْوِبٌ مِنْ صَابَ يَصُوْبُ أَيْ يَنْزِلُ ﴿مِّنَ السَّمَآءِ﴾ السَّحَابِ ﴿فِيْهِ﴾ أَيْ السَّحَابِ ﴿ظُلُمٰتٌ﴾ مُتَكَاثِفَةٌ ﴿وَّرَعْدٌ﴾ هُوَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ وَقِيْلَ صَوْتُهُ ﴿وَّبَرْقٌ﴾ لَمَعَانُ صَوْتِهِ الَّذِيْ يَزْجُرُهُ بِهِ ﴿يَّجْعَلُوْنَ﴾ أَيْ أَصْحَابُ الصَّيِّبِ ﴿اَصَابِعَهُمْ﴾ أَيْ أَنَامِلَهُم ﴿فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ﴾ أَجْلِ ﴿الصَّوَاعِقِ﴾ شِدَّةِ صَوْتِ الرَّعْدِ لِئَلَّا يَسْمَعُوْهَا ﴿حَذَرَ﴾ خَوْفَ ﴿الْمَوْتِ﴾ مِنْ سِمَاعِهَا كَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ إِذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَفِيْهِ ذِكْرُ الْكُفْرِ الْمُشَبَّهِ بِالظُّلُمَاتِ وَالْوَعِيْدِ عَلَيْهِ الْمُشَبَّهِ بِالرَّعْدِ وَالْحُجَجِ الْبَيِّنَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْبَرْقِ يَسُدُّوْنَ آذَانَهُمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوْهُ فَيَمِيْلُوْا إِلَى الْإِيْمَانِ وَتَرْكِ دِيْنِهِمْ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مَوْتٌ ﴿وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ﴾ عِلْمًا وَقُدْرَةً فَلَا يَفُوْتُوْنَهُ.

১৯. কিংবা তাদের উপমা যেমন- মুষলধারে বৃষ্টি অর্থাৎ বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায়। صيب শব্দটি মূলত صيوب ছিল। এটি صاب يصوب (অবতরণ করা) ক্রিয়পদ থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ, যা বর্ষিত হচ্ছে আসমান অর্থাৎ মেঘমালা থেকে; তাতে অর্থাৎ, ঐ মেঘে রয়েছে নিবিড় অন্ধকার এবং রা'দ, আর রা'দ হলো মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। কেউ কেউ বলেন, তার ধ্বনি ও বিদ্যুৎ অর্থাৎ, যে বেত্রদণ্ড দ্বারা ঐ ফেরেশতা মেঘ হাঁকিয়ে নিয়ে যান তার ছটা। তারা অর্থাৎ, বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তি তাদের আঙ্গুলি প্রবেশ করায় অর্থাৎ, আঙ্গুলে অগ্রভাগ তাদের কর্ণে বজ্রধ্বনিতে রা'দের প্রচণ্ড নিনাদের কারণে, যেন তা আর তাদেরকে শুনতে না হয়, মৃত্যুভয়ে তা শুনে মৃত্যুর আশঙ্কায়। তদ্রূপ মুনাফিকরাও যখন কুরআন নাজিল হয়, আর এতে রয়েছে কুফরের আলোচনা, যার উপমা হলো ঘোর অন্ধকার, এতদসম্পর্কে ধমকি, যার উপমা হলো রা'দ (বজ্রধ্বনি) আরো রয়েছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির বর্ণনা, যেগুলোর উপমা হলো برق (বিদ্যুৎ প্রভা) তখন তারা নিজেদের কান বন্ধ করে ফেলে, যেন তা শুনতে না পায় এবং ঈমান আনয়নের প্রতি কোনোরূপ অনুরাগের সৃষ্টি হবে। আর স্বধর্ম ত্যাগ করা তো তাদের নিকট মৃত্যুর শামিল। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন জ্ঞান ও ক্ষমতা উভয়ভাবে। সুতরাং তারা তাঁকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।

٢٠. ﴿يَكَادُ﴾ يَقْرُبُ ﴿الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ﴾ يَأْخُذُهَا بِسُرْعَةٍ ﴿كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ﴾ أَيْ فِيْ ضَوْئِهِ ﴿وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا﴾ وَقَفُوْا تَمْثِيْلٌ لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ قُلُوْبَهُمْ وَتَصْدِيْقِهِمْ لِمَا سَمِعُوا فِيْهِ مِمَّا يُحِبُّوْنَ وَوُقُوْفِهِمْ عَمَّا يَكْرَهُوْنَ ﴿وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ بِمَعْنَى أَسْمَاعِهِمْ ﴿وَاَبْصَارِهِمْ﴾ الظَّاهِرَةِ كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ﴾ شَاءَهُ ﴿قَدِيْرٌ﴾. وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ.

২০. বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় অর্থাৎ দ্রুত যেন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখ উদ্ভাসিত করে তারা পথ চলে অর্থাৎ, এর আলোকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায় থেমে যায়। কুরআনে বর্ণিত প্রমাণসমূহ তাদের হৃদয় আন্দোলিত করে তোলে এতে নিজেদের পছন্দনীয় বিষয়াবলির বর্ণনা শুনে তৎপ্রতি তাদের যে বিশ্বাস এবং তাদের নিকট অনভিপ্রেত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের যে বিরতি এ স্থানে তাদের ঐ অবস্থারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের বাহ্যিক শ্রবণ শক্তি অর্থাৎ, শ্রবণেন্দ্রিয়সমূহ ও বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারেন। যেমন, তিনি তাদের অন্তর্চক্ষু হরণ করে নিয়েছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে যাতে তিনি চান সর্বশক্তিমান তন্মধ্য হতে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশও অন্যতম।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : كَصَيِّبٍ. أَيْ كَأَصْحَابِ مَطَرٍ

صَيِّب শব্দটির অর্থ ও তালীল : صيب শব্দটি اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّه-এর সীগাহ, শব্দটি বৃষ্টি ও মেঘ উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। এর বহুবচন صَيَايِب আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) كَاَصْحَابِ مَطَر অংশ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শব্দটির পূর্বে একটি মুযাফ উহ্য রয়েছে এবং صَيِّب অর্থ– মেঘ নয়; বরং বৃষ্টি। صَابَ يَصُوْبُ صَوْبًا وَصَيْبُوْبَةً (ن) اَلْمَطَر অর্থ– বৃষ্টি হওয়া, صَوْب-এর উপর থেকে অবতরণ করা, বর্ষণ হওয়া। صيب শব্দটি মূলত صيوب ছিল। مَرْمِيٌّ-এর কায়েদা অনুযায়ী واو ও ياء এক শব্দে একত্র হওয়ার কারণে واو মাকসূরকে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে اِدْغَام করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فِيْهِ أَيِ السَّحَاب

فِيه-এর مرجع নির্ণয় : فِيه যমীরের مَرْجِع মুফাসসির (র.) ظَاهِر-এর বিপরীত سحاب-এর দিকে করেছেন; কিন্তু অন্যান্য মুফাসসিরগণ صيب-এর দিকে করেছেন।

قَوْلُهٗ : وَرَعْدٌ. وَهُوَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ

رَعْد ও بَرْق-এর ব্যাখ্যা : رعد-এর তাফসীরে মুফাসসির (র.) اَلْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ উল্লেখ করেছেন, যেমন– ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে مَرْفُوْعًا একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এমনিভাবে মুসান্নিফ (র.) برق-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– اَلْبَرْقُ سَوْطٌ مِنْ نُوْرٍ يَزْجُرُ بِهِ الْمَلَكُ السَّحَابَ

قَوْلُهٗ : أَصَابِعَهُمْ أَيْ أَنَامِلَهَا

اَصَابِع শব্দটি মাজায : اصابِعَهُمْ -এর ব্যাখ্যা اَنَامِلَ-এর দ্বারা করা হয়েছে। এখানে مَجَاز عَقْلِى হিসেবে مُبَالَغَة-এর জন্যে كل দ্বারা جزء উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : كَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ ..... عِنْدَهُمْ مَوْتٌ

তাশবীহের অবস্থা বর্ণনা : আলোচ্য অংশটুকুতে মুফাসসির (র.) আয়াতে উল্লিখিত মুশাব্বাহসমূহে মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ করেছেন। মুফাসসির (র.)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী আয়াতে বর্ণিত ممثل-সমূহ নিম্নরূপ–

১. বৃষ্টিতে আক্রান্ত মানুষ, ২. বৃষ্টি, ৩. বহু স্তরবিশিষ্ট অন্ধকার,
৪. মেঘের বা বজ্রের শব্দ, ৫. বিদ্যুতের চমক, ৬. মৃত্যু।

এসবের مُمَثَل لَه নিম্নরূপ–

১. বৃষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের مُمَثَّل لَهٗ হলো মুনাফিকরা।
২. বৃষ্টি مُمَثَل له হলো কুরআন।
৩. বহু স্তরবিশিষ্ট আঁধারের مُمَثَّل لَهٗ কুফরি, নিফাক।
৪. বজ্র অথবা মেঘের গর্জনের مُمَثَّل لَه হলো কুরআনে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত কঠোর বাণীসমূহ।
৫. বিদ্যুৎ চমকের مُمَثَّل لَهٗ হলো কুরআনে বর্ণিত সত্য দলিলসমূহ।
৬. মৃত্যুর مُمَثَّل لَهٗ হলো মুনাফিকদের খাঁটিভাবে ঈমান আনয়ন।

মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, আয়াতে তাশবীহে মুফরাদ রয়েছে। অর্থাৎ, আয়াতে প্রতিটি বস্তুর আলাদা উপমা পেশ করা হয়েছে। তবে অধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, আয়াতে তাশবীহে মুরাক্কাব রয়েছে। অর্থাৎ, মুনাফিকদের সার্বিক অবস্থাকে বৃষ্টিতে নিপতিত ব্যক্তির সার্বিক অবস্থার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَلَا يَفُوْتُوْنَه

اِسْتِعَارَة-এর প্রকার উল্লেখ : لَا يَفُوْتُوْنَه দ্বারা এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, এ আয়াতে اِسْتِعَارَة تَمْثِيْلِيَّة হচ্ছে। অর্থাৎ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ বলে আল্লাহর আযাব থেকে কাফেরদের নিস্তার না পাওয়ার অবস্থাকে বেষ্টনকারী ও পরিবেষ্টিত বস্তুর অবস্থার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ : بِسَمْعِهِمْ. بِمَعْنٰى اسْمَاعِهِمْ

মুফরাদটি জমার অর্থে : মুফসসির (র.) এ অংশটি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, سمع শব্দটি বাহ্যত একবচন হলেও অর্থগতভাবে বহুবচন। سمع শব্দটি বহুবচনের অর্থে হওয়ার করীনা হলো পরবর্তী أَبْصَارَهُمْ অংশটি।

قَوْلُهٗ : عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ. شَاءَه

شيء দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্দেশ্য নয় : شيء-এর পরে شَاءَه উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, شيء শব্দটি ইসমে মাফউলের অর্থে। এর দ্বারা সমস্ত شيء এমনভাবে উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে সত্তাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তু شيء দ্বারা উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ নিজ সত্তা ব্যতীত সকল বস্তুসমূহের উপর ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির মধ্যে পরিবর্তন যেহেতু অপূর্ণতা সাব্যস্ত করে, তাই সেটা ক্ষমতার বাইরে থাকবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

أَوْ : সংযোগসূচক অব্যয়সমূহের মধ্য থেকে একটি। এর ব্যবহারে স্থান নিম্নরূপ-

১. সংশয় প্রকাশের জন্যে। যেমন- لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ আমরা পূর্ণ একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।

২. অস্পষ্টতা প্রকাশে। যেমন- نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ আমরা অথবা তোমরা সত্যের উপর আছি।

৩. বৈধতা প্রকাশে। যেমন- جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيْرِيْنَ হাসান (বসরী) কিংবা ইবনে সিরীনের সাথে উঠাবসা কর।

৪. এখতিয়ার বা স্বাধীনতা প্রদান অর্থে। যেমন- سِرْ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا বাহনে আরোহণ করে চল কিংবা পায়ে হেঁটে চল।

৫. প্রকারভেদ বুঝানোর জন্য। যেমন- اَلْكَلِمَةُ اِسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ কলিমা হলো ইসম, অথবা ফে'ল অথবা হরফ।

৬. কখনো إِلٰى-এর অর্থে আসে। যেমন- لَأُلْزِمَنَّكَ أَوْ تُوَفِّيَنِيْ حَقِّيْ আমি তোমার পিছু ছাড়ব না যতক্ষণ না আমার প্রাপ্য পূরণ কর।

৭. কখনো إِلَّا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- لَأَقْتُلَنَّ الْعَدُوَّ أَوْ يَخْضَعَ আমি অবশ্যই শত্রুকে হত্যা করব, তবে যদি সে অনুগত হয়।

اَلسَّمَاءُ : এর কয়েকটি অর্থ- ১. أُفق তথা দিগন্ত সুদূর প্রান্ত, ২. মেঘ, ৩. প্রত্যেক এমন বস্তু যা উপরে থাকে। এ স্থানে উক্ত তিনটি অর্থই যথার্থ। اَلسَّمَاء শব্দটি কখনো مذكر হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন- اَلسَّمَاء منفطر به এবং مؤنث-ও ব্যবহার করা হয়। যেমন- اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ;

اَلصَّوَاعِقُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে صَاعِقة; বজ্র, বজ্রধ্বনি, বজ্রপাত। صَعِقَ الرَّجُلُ صَعقًا কারো উপর বজ্র পড়া ও বেহুঁশ হওয়া। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেন- صاعقة-এর তিনটি অর্থ রয়েছে।

১. মৃত্যু, যেমন- فَصَعِقَ مَنْ فِيْ السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

২. শাস্তি, যেমন- اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْد

৩. আগুন, যেমন- ..... وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيَصِيْبُ بِهَا; কিন্তু উল্লিখিত তিনটি অর্থই- صَاعِقَة-এর মৌলিক অর্থের পরিণতি। কারণ, صاعقة-এর মূল অর্থ হলো- আকাশের শূন্য স্থানের বিকট ধ্বনি। এর ফলে আগুন, শাস্তি বা মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে।

مُحِيْطٌ : সীগাহ وَاحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব افعال মাসদার الْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح.و.ط) জিনস اجوف واوي অর্থ- পরিবেষ্টনকারী। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে محوط ছিল। واو-এর কাসরা পরিবর্তন করে حاء-কে দেওয়া হয়েছে এবং واو-কে ياء দ্বরা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে محيط হয়ে গেছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ..... مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ

كَصَيِّبٍ অংশটি উহ্য মুবতাদা مَثَلُهُمْ-এর খবর। বাক্যটির প্রকৃত রূপ হবে– مِن السَّمَاءِ ;أَوْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اَصْحَابِ صَيِّب অংশটি উহ্য كَائن-এর সাথে متعلق হয়ে صيب-এর সিফাত। ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ মুবতাদা মুয়াখখার, আর فِيْهِ খবরে মুকাদ্দাম। জুমলাটি যরফ হয়েছে। مِنَ الصَّوَاعِقِ অংশটি يَجْعَلُوْن -এর সাথে متعلق এবং حذر الْمَوْت তার مَفْعُوْلٌ لَهٗ। এটা জুমলায়ে مُسْتَأْنِفَة হতে পারে আবার فِيْهِ-এর যমীর থেকে حال-ও হতে পারে। وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ জুমলায়ে مُعْتَرِضَة তারকীবে এর কোনো স্থান নেই। بِالْكَافِرِيْنَ অংশটি مُحِيْط শিবহুল ফে'লের সাথে مُتَعَلِّق

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ..... عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

يَكَادُ হলো اِسْتِئْنَافِية ;اَلْبَرْق তার ইসম এবং يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ বাক্যটি তার খবর। এই জুমলাটি فِعْلُ الْمُقَارَبَة হলো ইসমে যরফ। كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ বাক্যটি كُلَّمَا-এর مَا দ্বারা মাসদার হয়ে كُل-এর مُضَاف اِلَيْه হিসেবে জরের স্থানে রয়েছে। অথবা كُلَّمَا-এর مَا-টি নাকেরা মাওসূফ হতে পারে। সেক্ষেত্রে يَخْطَفُ বাক্যটি মাওসূফের সিফাত হিসেবে জরের স্থানে থাকবে। كُلَّمَا ও তার পরবর্তী বাক্যটি মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি হয়ে مَشَوْا-এর যরফ হয়েছে। وَإِذَا أَظْلَمَ ..... قَامُوْا বাক্যটি كُلَّمَا أَضَاءَ বাক্যটি উপর আতফ। أَضَاء ও أَظْلَمَ-এর মাঝে বিদ্যমান যমীর ফিরেছে اَلْبَرْق-এর দিকে। وَلَوْ-এর واو-টি اِسْتِئْنَافِية ;لَوْ হলো حَرْف الشَّرْط ;شَاءَ اللّٰهُ বাক্যটি শর্ত এবং ..... لَذَهَبَ عَلٰى كُلِّ (কারণবাচক) تَعْلِيْلِيَّة إِنْ ..... شَيْءٍ قَدِيْرٍ। جَوَابُ الشَّرْط বাক্যটি وَأَبْصَارَهُمْ জুমলায়ে ইসমিয়াটি شَيْءٍ অংশটি قَدِير শিবহুল ফে'লের সাথে مُتَعَلِّق

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ..... عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তিদের সাথে মুনাফিকদের উপমা : এ উপমা সেই শ্রেণির মুনাফিকদের, যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করলেও অন্তরে অন্তরে সন্দিহান ছিল। যখনই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো সৌন্দর্য ও বিজয় দেখত, তখন তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ধাবিত হতো। পরে যখন স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটত, ইসলাম-মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় দেখা দিত কিংবা কষ্ট ও বিপদসমূহের সম্মুখীন হতো, তখন ইসলামের প্রতি তারা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলত। সুতরাং যেমনিভাবে কেউ তুফান ও ঝড়ের অন্ধকারে পড়লে বিদ্যুতের আলোতে পথ হাতড়ে চলে; কিন্তু পরক্ষণে অন্ধকারের তীব্রতায় ভীতু হয়ে থমকে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনিই অবস্থা মুনাফিকদের। কেননা, এরা যখনই ইসলামের আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে পায়, তখন সত্যের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু হীনস্বার্থ ও মনের চাহিদার অন্ধকারে পড়ে পুনরায় সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পূর্ববর্তী ও আলোচ্য উদাহরণের ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্য : আঁধারে আগুন প্রজ্বালনকারীর সাথে যে ধরনের মুনাফিকদের উপমা দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছ থেকে ঈমানের আর কোনো আশা নেই। কারণ, সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্ধ ও বধির বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের আলো নিভিয়ে পরিপূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছেন। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বৃষ্টি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে উপমা দেওয়া মুনাফিকদের ঈমান গ্রহণের আশা রয়েছে। কারণ, তারা পূর্ববর্তীদের মতো অন্ধ-বধির নয়।

আল্লাহর সত্তা তাঁর কুদরত বহির্ভূত : شَيْء ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় যাত ও সিফাতসহ বিদ্যমান আছেন। অতএব, প্রশ্ন উঠে আল্লাহ তা'আলা اَشْيَاء-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? যদি না হন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা لَا شَيْء হওয়া অবশ্যক হয়। যা স্পষ্টতই বাতিল। কারণ, তিনি তো বিদ্যমান আছেন। আর তিনি شيء-এর মাঝে দাখিল হলেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা كُلَّ شَيْءٍ هَالِك মূলনীতির আলোকে আল্লাহ তা'আলাও هَالِكٌ বা ধ্বংসশীল হওয়া আবশ্যক হয়।

এর সমাধান হলো, شَيْء দ্বারা ঐ شَيْء-কে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার مَشِيَّة বা ইচ্ছার অধীন। আর আল্লাহ তা'আলার সত্তা তাঁর مَشِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, যে বস্তু مَشِيَّة বা ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত, সেটা حَادِث (নশ্বর) হবে আর আল্লাহ তা'আলা হলেন কাদীম ও অবিনশ্বর।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ

اَلتَّشْبِيْهُ التَّمْثِيْلِيُّ : মুফাসসির (র.) আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন تَشْبِيْهُ الْمُفْرَد-এর ভিত্তিতে। তবে আয়াতটি تَشْبِيْهُ الْمُرَكَّب-এর শ্রেণিভুক্তও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত বৃষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক অবস্থার مُمَثَّل لَهُ হলো, মুনাফিকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বসহ বিভিন্ন অবস্থা।

✪ اَلْعِلْمُ فِي الْقُرْآنِ : আল কুরআনে বিজ্ঞান

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ

বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা হলো বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বাষ্পের পুঞ্জ। এ ধরনের মেঘমালা থেকেই বিদ্যুৎ চমক, বজ্রপাত ও গর্জন সৃষ্টি হয়। বিশালাকৃতির এসব মেঘপুঞ্জের বিস্তৃতি ১০ থেকে ১০০ বর্গমাইল এবং গভীরতা ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৬,৫০০ ফুট উপর থেকে এ মেঘমালার স্তর শুরু হয়। এই মেঘমালার গভীরতা ও বিশালত্বের কারণে সূর্যের আলো তা ভেদ করে আসতে পারে না। এজন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে বর্ষণের মেঘকে কালো দেখায়। এই মেঘপুঞ্জের উপরে সূর্য থাকার কারণে সেখানের অন্ধকার হালকা হয়। কিন্তু মেঘের গভীরতা যতো বড়তে থাকে, অন্ধকারের ঘনত্বও বেড়ে যায় এবং মেঘের নিম্নতম স্তরে গাঢ় অন্ধকার হয়ে যায়।

এ মেঘপুঞ্জের মাঝে বিদ্যুতও থাকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গবেষকগণ এ বিদ্যুতের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। কারো কারো মতে, বিদ্যুতায়িত কণা ও বৃষ্টিকণা বাতাসের প্রবল বেগে উঠানামা করার ফলে মেঘপুঞ্জের হিমায়িত এলাকায় পৌঁছে গেলে পানির কণাগুলো বরফকণায় পরিণত হয়। এই বরফে পরিণত হওয়ার সময় কণাগুলো ফেটে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণা ছিটকে পড়ে। বরফের এই ক্ষুদ্র কণাগুলো ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি বহন করে নিয়ে যায় এবং সেখানে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ এলাকা পৃথক হয়ে যায়।। যখন এই বিপরীত বিদ্যুৎশক্তি এতোটা বৃদ্ধি পায় যে, মধ্যবর্তী বাতাস এই দুই শক্তিকে পৃথক করে রাখতে পারে না, তখন এক বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই দুই এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়। এই বিদ্যুতের শক্তি প্রায় ১০০ কোটি ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। এই বিদ্যুৎ মেঘপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা এক মেঘমালা থেকে অন্য মেঘমালায় প্রবাহিত হয়। তখন বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় কোনো বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থের আকর্ষণে এ বিদ্যুৎ মেঘ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। এটাকেই আমরা বজ্রপাত বলি। মেঘমালার এই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের কারণে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়, যার তাপমাত্রা প্রায় ১০০০ সেন্টিগ্রেড। এ প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে প্রবলভাবে সম্প্রসারিত হয়। যার কারণে বিকট শব্দ হয়। একে আমরা বজ্রনাদ বলি।

মোটকথা বৃষ্টিভরা মেঘপুঞ্জে রয়েছে- ক. বিভিন্ন স্তরের অন্ধকার, এবং খ. বিদ্যুৎশক্তির সঞ্চয় যা বিদ্যুৎ-চমক এবং বজ্রধ্বনি সৃষ্টি করে। উপরে বর্ণিত মেঘমালা সৃষ্টির পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মেঘের অন্ধকার, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ ভালোভাবে বোধগম্য হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

মানুষের দৃষ্টিশক্তি আলোক সংবেদনশীল। মানুষের অক্ষি-গোলকের কোষের রড ও কোন নামক দু'ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। এর উপর আলো পতিত হলে তা মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়, তখন আমরা কোনো বস্তু দেখতে পাই।

অত্যন্ত তীব্র আলোয় রড ও কোনসমূহ সংবেদনহীন হয়ে পড়ে। ফলে সাময়িকভাবে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। বিদ্যুতের চমক অকস্মাৎ তীব্র আলো সৃষ্টি করে। যার ফলে রড ও কোনসমূহ কাজ না করায় মানব দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে ঝাপসা হয়ে যায়। আয়াতে সে বিষয়টিকেই "বিদ্যুৎ চমকের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

أ. ترجم الأيتين الكريمتين فصيحة.

ب. من المراد بقوله "الناسُ" وإلى من اشار اليه بمِنِ التبعيضية؟ عين، ثم اكتب نبذا من شناعاته الموبقة.

ج. فسر الآية الثانية على نهج المصنف (رض) بحيث تتضح الايرادات على قوله "يخادعون الله" ثم أجب عنها.

د. كيف يخدع الرجل نفسه؟ بين ثم اوضح حكمة اتيان لفظ "وما يشعرون" دون يعلمون.

ه. اوضح اوصاف المنافقين وشناعاتهم حسب مادلت عليها آيات القرآن الكريم.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

أ. ترجم الآيتين الكريمتين ترجمة بليغة.

ب. انك تعلم ان الاستهزاء صفة الخلق وهنا كيف ثبت للخالق مع انه لا يليق به؟ اجب بذكر القاعدة البليغة فى مثل هذا.

ج. قوله : "يمدهم فى طغيانهم" عين مرجع الضمير "هم" ثم بين حكمة إمهالهم فى الطغيان مع بيان محل اعراب "يعمهون".

د. قوله "اشتروا الضلالة بالهدى" يرد على ظاهر معناه فما هى الايرادات؟ اجب عنها بتفسير لائق بالمقام حيث يتضح المرام.

ه. اوضح البلاغة المودعة فى الآية.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۔ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

أ. ترجم الآيتين الكريمتين موضحة.

ب. فسر لفظ "صم، بكم، عمى" مع بيان المراد "بالظلمات" ولا يبصرون وحكمة تخصيص الاوصاف الثلاثة بالذكر.

ج. اوضح المناسبة بين المثال والممثل له فى الآيتين الكريمتين.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَّجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ

أ. فسر الكلمات الآتية صيب، وسماء، ورعد، وبرق، الصواعق ثم ترجم الآية الكريمة.

ب. أوضح التشبيهات ووجه الشبه والبلاغة المودعة فى الآية حيث يندفع الانغلاق.

ج. بين محل اعراب "حذر الموت" مع الإجابة عما يرد على قوله "واللّٰهُ محيط بالكافرين "فان لفظ "محيط" يدل على محدود ذاته تعالى.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. حَلِّ لُغَاتِ الْأَلفاظِ الآتية يكاد، يخطف، ابصار، ذهب، الله، شئ، مع بيان مراد قوله "بسمعهم وابصارهم"والاجابة عما يرد على قوله "ان الله على كل شئ قدير" حيث يتضح المرام.

ج. أوضح التمثيل المودع فى الآية ايضاحا تاما.

রুকূ' : ৩

ذِكْرُ الْأَدِلَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالٰى وَالتَّحَدِّيْ لِلْإِتْيَانِ بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِ الْقُرْاٰنِ

আল্লাহর একত্ববাদের দলিল এবং কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনার চ্যালেঞ্জের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ মক্কাবাসী তথা মানজাতিকে সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে আপন রবের ইবাদতের নির্দেশ
- ❑ মানুষের উপর আল্লাহর নিয়ামতরাজির বর্ণনা
- ❑ অনুরূপ কুরআনের একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ
- ❑ কাফেরদের জন্যে দুঃসংবাদ ও মুমিনদের জন্যে সুসংবাদ
- ❑ জান্নাতে মুমিনগণের অবস্থান
- ❑ আল্লাহ তা'আলার উদাহরণ বর্ণনাপদ্ধতি
- ❑ কাফের ও মুসলমানদের মাঝে আল্লাহর উদাহরণসমূহের প্রতিক্রিয়া
- ❑ কুরআন দ্বারা আল্লাহ কাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন
- ❑ নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে কাফেরদের প্রতি আল্লাহর জিজ্ঞাসা

٢١. ﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ﴾ أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ ﴿اُعْبُدُوْا﴾ وَحِّدُوْا ﴿رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ﴾ أَنْشَأَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوْا شَيْئًا ﴿وَ﴾ خَلَقَ ﴿الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ بِعِبَادَتِهِ عِقَابَهُ وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّيْ وَفِيْ كَلَامِهِ تَعَالٰى لِلتَّحْقِيْقِ.

২১. হে মানুষ অর্থাৎ, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা ইবাদত করো একত্ববাদের কথা স্বীকার করো তোমাদের সেই প্রতিপালকের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই ছিলে না এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে যাতে তোমরা তার ইবাদাত করার মাধ্যমে তার শাস্তিকে ভয় কর। لعل মূলত ترجى (আশাব্যঞ্জক) অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে আল্লাহ তা'আলার কালামে তা নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

٢٢. ﴿الَّذِيْ جَعَلَ﴾ خَلَقَ ﴿لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ حَالٌ بِسَاطًا يُفْتَرَشُ لَا غَايَةَ لَهَا فِي الصَّلَابَةِ أَوِ اللُّيُوْنَةِ فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا ﴿وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً﴾ سَقْفًا ﴿وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ﴾ أَنْوَاعِ ﴿الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ تَأْكُلُوْنَهُ وَتَعْلُفُوْنَهُ بِهِ دَوَابَّكُمْ ﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴾ شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ ﴿وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُ الْخَالِقُ وَلَا تَخْلُقُوْنَ وَلَا يَكُوْنُ إِلٰهًا إِلَّا مَنْ يَخْلُقُ.

২২. যিনি বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানাস্বরূপ فراشا শব্দটি حال (অবস্থাবাচক)। অর্থাৎ, এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, যা অতি কঠিন নয়। কোমলও নয় যাতে অবস্থান করা অসম্ভব এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ এ স্থানে بناء শব্দের অর্থ ছাদ এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অনন্তর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকা হিসেবে। বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করেন তোমরা যা নিজেরাও তা আহার কর এবং তোমাদের পশুদেরও তৃণরূপে আহার দান কর। সুতরাং কাউকেও তার সমকক্ষ স্থির করো না, উপাসনায় শরিকরূপে, অথচ তোমরা জান যে তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর এরা (দেব-দেবী) কিছুই সৃষ্টি করে না। আর একমাত্র তিনিই উপাস্য হতে পারেন, যিনি সৃষ্টি করেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اُعْبُدُوْا - وَحِّدُوْا

তাওহীদই ইবাদতের মূল উৎস : মুফাসসির (র.) اُعْبُدُوْا-এর ব্যাখ্যা وَحِّدُوْا-এর দ্বারা এ জন্যে করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেন- كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْاٰنِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهُ التَّوْحِيْدُ অর্থাৎ, কুরআনে যে কোনোস্থানে عِبَادة শব্দটি এসেছে, এ দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হবে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। কেননা, কোনো ইবাদত তাওহীদ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়। তাওহীদই ইবাদতের মূল চাবিকাঠি। তাই তাওহীদকে عِبَادة শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা মাজায হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَلَعَلَّ فِى الْاَصْلِ لِلتَّرَجِّىْ وَفِىْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى لِلتَّحْقِيْقِ

আল্লাহর বাণীতে لَعَلَّ-এর অর্থ : لعل শব্দটির মূল অর্থ সন্দেহ ও আকাঙ্ক্ষার জন্যে ব্যবহার হিসেবে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর ইবাদত করলে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতেও পারে আবার না পাওয়াও যেতে পারে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। মুফাসসির (র.) وَفِىْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى لِلتَّحْقِيْقِ বলে সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর বাণীর ক্ষেত্রে لَعَلَّ শব্দটি নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে ব্যবহার হয়।

قَوْلُهٗ : اَلَّذِىْ جَعَلَ ـ خَلَقَ ـ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا ـ حَالٌ

جَعَلَ ফে'লটি এক মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী : মুফাসসির (র.) حَال দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এখানে جَعَل শব্দের অর্থ হলো خَلَقَ যা একটি মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দী হয়েছে। আর جَعَلَ بِمَعْنٰى صَيَّرَ হলে দু' مفعول-এর দিকে مُتَعَدِّى হবে। এ সুরতে الارْضَ হবে প্রথম مفعول আর فِرَاشًا হবে দ্বিতীয় مفعول; [হাশিয়াতুল জামাল]

قَوْلُهٗ : وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ـ سَقْفًا ـ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

سَمَاءً ও بِنَاءً শব্দের অর্থ : এখানে بِنَاءً শব্দটির অর্থ سَقْفًا তথা ছাদ; কারণ, কুরআনের অন্যত্র سَقْفًا শব্দে এসেছে। যেমন– وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ আয়াতে سَمَاء শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, فوق বা উর্ধ্বলোক। যেমন বলা হয়– كُلُّ مَا عَلَاكَ وَاَظَلَّكَ فَهُوَ سَمَاءٌ; আর سحاب তথা মেঘমালাও যেহেতু উপরেই অবস্থিত, তাই سماء দ্বারা এখানে سحاب বা মেঘমালা উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আপত্তি দূরে হয়ে গেল যে, বৃষ্টি তো মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, আসমান থেকে নয়।

قَوْلُهٗ : فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنْ ـ اَنْوَاعِ ـ الثَّمَرَاتِ

مِنْ-টি ব্যাখ্যাবাচক : مِنْ اَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ দ্বারা মুফাসসির (র.) مِنْ বয়ানিয়া হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্যাপক বস্তুসমূহ উদ্দেশ্য। চাই মানুষের খোরাকের হোক কিংবা পশুর আহার হোক। আর কারো কারো দৃষ্টিতে مِنْ তাবয়ীযিয়া। অর্থাৎ, কোনো কোনো ফল।

قَوْلُهٗ : اَلثَّمَرٰتِ ..... تَعْلِفُوْنَ بِهٖ دَوَابَّكُمْ

الثمرات শব্দটি ব্যাপক : এ বাক্যটুকু উল্লেখ্য করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلثَّمَرَاتِ দ্বারা ব্যাপকভাবে জমিনের সব ধরনের উদ্ভিদ ও উৎপন্ন শস্য বা ফসল বোঝানো হয়েছে। চাই তা মানুষের খাদ্য হোক বা গবাদিপশুর খাদ্য হোক।

قَوْلُهٗ : وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ اَنَّهُ الْخَالِقُ .....

تَعْلَمُوْنَ-এর مفعول নির্ণয় : মুফসসির (র.) ..... اَنَّهُ الْخَالِقُ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বোঝাতে চেয়েছেন। যে, تَعْلَمُوْنَ ফে'লটি متعدى; আর ফে'লে মুতা'আদ্দীর জন্যে মাফউলের প্রয়োজন রয়েছে, তাই মুফাসসির (র.) ..... أنه الْخَالِقُ দ্বারা সে মাফউলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ বাক্যটি تَجْعَلُوْا-এর যমীর থেকে হাল হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَاَيُّهَا : ياء হলো حَرْف نِدَاء; কুরআনে কারীমে نِدَاء-এর জন্যে একমাত্র يَاء হরফটিই ব্যবহৃত হয়েছে। اَىْ মুনাদাটি শব্দগত দিক দিয়ে ضمة-এর উপর মাবনী। আর ইরাবের ক্ষেত্রে نَصَب-এর স্থলে। আর هاء হরফটি تَنْبِيْه বা সতর্কতা স্বরূপ আর النَاس হলো اى-এর صِفَة বা بَدَل;

نِدَاء-এর প্রকারভেদ : نِدَاء-এর সাতটি প্রকার রয়েছে। নিম্নে উদাহরণসহ সেগুলো বর্ণিত হলো–

১. يَاايُّهَا النَّبِيُّ অথবা يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ যেমন– نِدَاء مَدْح
২. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যেমন– نِدَاء ذَمّ
৩. يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ যেমন– نِدَاء تَنْبِيْه
৪. يَا عِبَادِيْ যেমন– نِدَاء إضَافَة
৫. يَا بَنِيْ إسْرَائِيْلَ ـ يَا بَنِيْ آدَمَ যেমন– نِدَاء إضَافَة
৬. يَا إبْرَهِيْمُ ـ يَا دَاوُدُ যেমন– نِدَاء تَسْمِيَة
৭. يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ যেমন– نِدَاء تَعْنِيْف

النَّاسُ : শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো اِنْسَان، اِنْس বা اِنْس; অর্থ- মানুষ, লোক, বাবে ضرب-এর মাসদার اِنْسَان ঘনিষ্ট হওয়ার থেকে নির্গত। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষকে জন্মগতভাবে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ট অন্তরঙ্গ হওয়ার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই মানুষকে مَدَنِي الطَّبْع বলা হয়। النَّاس শব্দটি বহুবচন নির্ণয়ে দুটি মত রয়েছে।

১. جمع বা বহুবচন, اِسْم جَمْع নয়। কারণ, النَّاس-এর মূল হলো اناس; খেলাফে কেয়াস হামযাকে বিলুপ্ত করার পর শুরুতে الف لام যোগ করা হয়েছে, এজন্যেই হামযাসহ الف الام যোগে اَلْاِنَاس বলা যায় না ।[তাফসীরে বায়যাবী]

২. اِسْم جَمْع; কারণ এর দ্বারা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন- خَيْل ـ قَوْم ও رَهْط ইত্যাদি। তাফসীরে রুহুল মা'আনী ও একদল আলেম اِسْم جَمْع হওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, এজন্যেই এ মাদ্দার থেকে এ শব্দের মুফরাদ নেই।

أَهْل : اَهْل শব্দে رفع ও نَصَب উভয় ইরাব হতে পারে। نصب এ হিসেবে যে, এটি بِاعْتِبَار مَحَل বা স্থান বিচারে النَّاس-এর ব্যাখ্যা। আর الناس শব্দটি স্থান বিচারে ای-এর সিফাত হিসেবে নসবের স্থলে রয়েছে। তাই তার ব্যাখ্যা তথা أهل-ও মানসূব হবে। আর رفع এ হিসেবে হবে যে, এটি শব্দগত দিক দিয়ে النَّاس-এর তাফসীর। আর النَّاس শব্দগত দিক দিয়ে مرفوع তাই اهل-ও مرفوع হবে। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১. পৃষ্ঠা ৭]

أَنْدَاد : শব্দটি ند-এর বহুবচন, অর্থ- সদৃশ, সমান শরিক, অনুরূপ, সমকক্ষ। সমকক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ند বলা হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

يَاء হরফে নেদা, اَيُّهَا النَّاسُ মুনাদা اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ জুমলা মাওসূফ, اَلَّذِيْ মাওসূল, خَلَقَكُمْ সেলা, জুমলায়ে فِعْلِيَّة হয়ে মা'তূফ আলাইহি। وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এ জুমলাটি মা'তূফ, উভয় জুমলা رَبَّكُمْ-এর সিফাত হয়েছে। لَعَلَّ টি حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل, كُمْ ইসম تَتَّقُوْنَ খবর। اَلَّذِيْ থেকে শেষ পর্যন্ত মাওসূল, মাওসূল ও সেলা মিলে رَبَّكُمْ-এর দ্বিতীয় সিফাত হয়েছে। সব মিলে اُعْبُدُوْا ফে'লের মাফ'উল।

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا বাক্যের সম্পর্ক পূর্বে উল্লিখিত اُعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ-এর সাথে। এখানে جعل ফেয়েলটি صير-এর অর্থে। আবুল বাকা (র.) سَمَّى অর্থেরও অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। لَا تَجْعَلُوْا দুটি মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হবে। প্রথমটি হলো اَنْدَاد আর দ্বিতীয়টি তার পূর্বের جَار ও مَجْرور; এখানে দ্বিতীয় মাফ'উলটি প্রথমটির পূর্বে হওয়া ওয়াজিব। وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অংশটি فَلَا تَجْعَلُوْا-এর যমীর থেকে حَال হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : اَنْشَأَكُمْ

اَنْشَأَكُمْ শব্দের লিখনশৈলী : ২১নং আয়াতে তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَنْشَاكُمْ শব্দটির দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির আলিফ বর্ণের উপর হামযাবিহীন اَنْشَا লিখিত আছে।

খ. সহীহ ইমলা বা লিখনশৈলী হবে- শব্দটির আলিফ বর্ণের উপর হামযাযোগে اَنْشَأَ;

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

الثمرات শব্দের লিখনশৈলী : ২২নং আয়াতে উল্লিখিত اَلثَّمَرَات শব্দটির দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ء বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে اَلثَّمَرَات লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ء বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَلثَّمَرٰت লিখা হয়।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : تَأْكُلُوْنَهٗ وَتَعْلِفُوْنَهٗ بِهٖ دَوَابَّكُمْ

تَعْلِفُوْنَهٗ শব্দের ভিন্নতা : ২২নং আয়াতের اَلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ-এর তাফসীর করেছেন تَعْلِفُوْنَهٗ بِهٖ দ্বারা। এ শব্দটিতে দুই ধরনের নুসখা পাওয়া যায়। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইন تَعْلِفُوْنَهٗ بِهٖ রয়েছে।

খ. মুহাক্কাক নুসখাতে শব্দটি تَعْلِفُوْنَ بِهٖ রয়েছে। দ্বিতীয়টি সঠিক।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْن

পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকুর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী রুকুতে মুনাফিকদের তিনটি দলের অবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করার পর এখানে থেকে মুনাফিক, মুশরিক কিংবা ইহুদি, আরবীয় অনারবী, পৃথক, সমষ্টিগত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সম্মিলিতভাবে ইসলামের দুটি মৌলিক ভিত্তি তথা একত্ববাদ ও রিসালাতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَات : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ : يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ

মাদানী সূরায় يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ বলার ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনে يٰاَيُّهَا النَّاسُ বলে মক্কাবাসীকে এবং يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে মদিনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়। সূরা বাকারা হলো মাদানী সূরা। যাতে মদিনাবাসীকে সম্বোধন করে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। অথচ يٰاَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এর উত্তর হলো, উক্ত কায়েদাটি অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। كُلِّيْ বা সামগ্রিক দৃষ্টিতে নয়। النَّاسُ-এর ব্যাখ্যা মক্কাবাসী দ্বারা করা সূরা বাকারার বিপরীত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর যে রেয়ায়েত হাকেম (র.) পেশ করেছেন যে, النَّاسُ দ্বারা সম্বোধন মক্কাবাসীকে এবং الذين امنوا দ্বারা সম্বোধন মদিনাবাসীকে করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই দুয়েকটি স্থানে ব্যতিক্রম হওয়া উক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত নয়। মক্কাবাসী ও মাদীনাবাসীদের ক্ষেত্রে সম্বোধনের ভিন্নতার কারণ হলো, মক্কাবাসীদের অধিকাংশ কাফের হওয়ায় يَا اَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা মক্কা নগরীর অধিকাংশ কাফের ও স্বল্পসংখ্যক মুমিন সবাইকে সম্বোধন করা উদ্দেশ্য। আর মদিনায় যেহেতু অধিকাংশ মানুষ ঈমানদার, তাই মদিনাবাসীকে يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

উপাসনার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা : মহৎ লোক স্বভাবত অনুগ্রহকারীর দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর পার্থিব জগতে জীবনযাপনের জন্যে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। চাই ঐ নিয়ামতগুলো প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক, শারীরিক হোক বা আর্থিক হোক। সুতরাং যখন একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, স্রষ্টা শুধুমাত্র এক আল্লাহ। তখন উপাসনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহই হবেন। কারণ, উপাস্য হওয়া শুধু স্রষ্টার জন্যে বিশিষ্ট।

সূরা বাকারার প্রথম আদেশ ও প্রথম নিষেধ : সূরা বাকারাতে অনেক আদেশ ও নিষেধ রয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম আদেশটি হলো اعْبُدُوْا তোমরা ইবাদত করো, আর প্রথম নিষেধটি হলো لَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا (তোমরা কাউকে আল্লাহ সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।) লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আমরের বিষয়টিকে নিষেধসূচক বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াবি শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন : ইসলামে মৌলিক ভিত্তি তাওহীদের উপর বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদমাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, তাওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র এক সত্তার ইচ্ছা-শক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ।

কুরআনে لَعَلَّ সম্শ্লিষ্ট আপত্তি নিরসন : لَعَلَّ যেহেতু সন্দেহ ও সংশয়ের জন্যে রচিত, তাই কালামে এলাহীর মধ্যে এর ব্যবহারটি আপত্তির কারণ। এর সমাধান বিভিন্ন মুফাসসির বিভিন্নভাবে করেছেন। যথা–

১. لَعَلَّ কুরআনে কারীমে كَيْ তালীলিয়ার অর্থে। তখন ইবারতটি হবে اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ لِكَيْ تَتَّقُوْا
২. কেউ কেউ لَعَلَّ-কে তারাজ্জী ও আশার অর্থেই মেনে নিয়েছেন। সম্বোধিত ব্যক্তিদের আস্থা ও বিবেচনা হিসেবে। অর্থাৎ, কালামে এলাহী যেহেতু মানুষের স্বভাব ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত, আর . حَالِ مَاضِيْ . اِنْشَاء مُسْتَقْبِل ইত্যাদি হুকুমাবলি মানুষের কালামের পদ্ধতি। তাই لَعَلَّ. كَادَ ইত্যাদি শব্দগুলো একই কারণে আল্লাহর কালামে পাওয়া যাচ্ছে।
৩. কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, لَعَلَّ শব্দটি تَعَرُّض شَيْء তথা কোনো কিছুকে ফিরানোর জন্যে। ইবারত এরূপ ছিল– اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ مُعْتَرِضِيْنَ لِاَنْ تَتَّقُوْا;

৪. সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, এটাকে রাজকীয় পরিভাষা হিসেবে নেওয়া। যেমন– বলা হয় যে, আমরা ভাগ্যের উপর ভরসা করে এ আশা রাখি যে, তোমরা আমাদের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে। বড়দের সামান্য সামান্য আশার ঝলকও অন্যান্যদের হাজার নিশ্চয়তা থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। যেমন বলা হয়– كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ অর্থাৎ, বাদশাগণের কথা হলো কথার বাদশা।

৫. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) তাঁর রচিত মুফরাদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কতিপয় মুফাসসিরের মত হলো لَعَلَّ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে তা وجوب-এর অর্থ প্রদান করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা দেওয়া যে, আসমান, জমিন প্রাণী- সবই এক আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। এ সকলের সৃষ্টিতে না কোনো দেব-দেবীর দখল আছে, আর না কোনো পীর বা পয়গম্বরের। যখন এ বিষয়টি প্রমাণিত ও স্বীকৃত, যা তোমরা নিজেরাও স্বীকার কর, তাহলে তোমাদের ইবাদত-বান্দেগি একমাত্র তাঁর জন্যেই হওয়া উচিত। অন্য কেউ এর দাবিদার হতে পারে না। তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক বা তাঁর সমকক্ষ স্থির করবে না। তাহলে তোমরা তাঁর নিকট মর্যদার অধিকারী হবে। কিন্তু মানুষ যখন তার নিজ স্থান ও মর্যাদা বিচ্যুত হয়ে অধঃপতনের শিকার হয়েছে, তখন সে লাঞ্ছনার ও অবনতির সমস্ত স্তর পার হয়ে গিয়েছে। ফলে সে তার সেজদার বস্তু বানিয়েছে কখনো চন্দ্র-সূর্যকে, কখনো নদ-নদীকে, কখনো আকাশ ও মাটিকে, কখনো বৃক্ষরাজিকে, কখনো পশু ও নির্জীব বস্তুকে, কখনো সাপ ও আগুনকে।

قَوْلُهُ : اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ ..... وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

আসমান ও জমিন দ্বারা উপকৃত হওয়া : اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا এ আয়াতাংশের মূলপ্রাণ হচ্ছে جَعَلَ لَكُمْ; আকাশ বা পৃথিবী একমাত্র মানুষের উপকারের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে; অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করা হয়নি। কোনো কিছু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সেই সর্বময় ক্ষমতাবানের অধীনে। সুতরাং যে আসমান-জমিন ও তদীয় বস্তুসমূহ আল্লাহর নির্দেশে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত, সেই সেবকের সামনেই মাথানত করা এবং তাকে ইলাহর মর্যাদা দেওয়া উচিত। [তাফসীরে মাজেদী]

জমিন মানুষের জন্যে বিছনাস্বরূপ : ভূমি হলো আমাদের বিছানা বা এমন সমতল স্থান, যাতে আমরা পা রাখতে পারি, চলাফেরা করতে পারি। এমন অসমতল বা খাড়াভাবে তা সৃষ্টি করা হয়নি, যেখানে পা রাখা বা চলাফেরা করা আমাদের জন্যে সম্ভব নয়। পৃথিবী গোলাকার বা ডিম্বাকার যাই হোক, মানুষ ও মানবতার আবাসভূমি হিসেবে তার চেয়ে সুন্দর কোনো ঠিকানা হতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী মানুষের জন্যে একটি আরামাদায়ক বিছানা। তাই বলে এমন প্রশ্ন করা সঙ্গত হবে না যে, চাদর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বোঝা যায়, জমিন গোলাকার নয়। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের এ বিশাল আয়তন গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিস্তৃত মনে হয়। আর কুরআনের বর্ণনাধারার আকর্ষণীয় পদ্ধতি হলো, কুরআন প্রত্যেক বস্তুর ঐ অবস্থাটি বর্ণনা করে থাকে, যা আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সকল মানুষই অনুভব করতে সক্ষম হয়।

জমিনের আয়াতন বড় হওয়ায় গেলাকার হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃত ও ছাড়ানোই মনে হয়। এ হিসেবে জমিনকে গোলাকার এবং বিস্তৃতও বলা হয়। পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুমান নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা করা যেতে পারে। পূর্বে পশ্চিমে এর ব্যাস হলো ১২,৭৫২ কি.মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২,৭০৯ কি.মি.। এর আয়তন প্রায় ১৯কোটি ২০ লক্ষ বর্গমাইল বা ৪৯,৭২,৬০,৮০০ বর্গ কি.মি.। এর পরিধি হলো ২৫,০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস এত বিশাল হওয়ায় দর্শকের দৃষ্টিতে তা সমতল অনুভব হয়। এ কারণেই পৃথিবীকে গোল এবং সমতল উভয়টিই বলা যেতে পারে।

আসমান ছাদস্বরূপ : আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে আসমানকে ছাদরূপে বানিয়েছেন। আসমান উপর থেকে আমাদের ঢেকে রেখেছে এবং মানুষের সেবায় আল্লাহই তাকে নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন, উভয়টিকে মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে জমিনের আলোচনা আয়াতে আগে আনা হয়েছে। কারণ, মানুষ জমিনে বসবাস করে, ইবাদত করে। পক্ষান্তরে আসমানের সঙ্গে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক বস্তুর আসল হচ্ছে হালাল হওয়া : جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا-এর মধ্যে আলেমগণ দুটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, লামে نَفْع দ্বারা ইঙ্গিত এ দিকে করেছেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে হালাল ও বৈধ হওয়া। হারাম হওয়ার কারণ ও দলিলের মুখাপেক্ষী।

আল্লামা যামাখশারী ও মাদারিক গ্রন্থকার (র.) এটাকে আবূ বকর রাযী (র.) এবং মু'তাযিলাদের দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) বলেছেন যে, হালাল ও হারামের বিষয়টি যখন পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়, তখন হারামকে রহিতকারী মনে করে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং 'হালাল' মূল হওয়ার কারণে অগ্রবর্তী ও রহিত হবে। নতুবা 'হারাম' কে মূল ধরলে দু'বার রহিত করতে হবে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

মুকাবালা : আলোচ্য আয়াতে السَّمَاء ও الْأَرْض এবং فِرَاش ও بِنَاءً শব্দগুলোকে একটি আরেকটির বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি পরিভাষায় مُقَابَلَة নামে পরিচিত। এটি اَلْمُحَسَّنَاتُ الْبَدِيْعِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : বৃষ্টি আকাশ থেকে না মেঘমালা থেকে।

ক. আকাশ থেকে

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

অর্থ : যে সত্তা তোমাদের জন্যে ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। [সূরা বাকারা : আয়াত ২২]

এ আয়াতের সমর্থনের আরো ২০টি আয়াত রয়েছে। যথা–

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
বাকারা	১৬৪	ত্বাহা	৫৩	লোকমান	১০
আন'আম	৯৯	কাহাফ	৪৫	নামল	৬০
রাদ	১৭	মুমিনূন	১৮	ফাতির	২৭
ইউনুস	২৪	ফুরকান	৪৮	যুমার	২১
ইবরাহীম	৩২	হজ্জ	৬৩	যুখরুফ	১১
হিজর	২২	আনকাবূত	৬৩	কাফ	৯
নাহল	৬৫	রূম	২৪		

খ. মেঘমালা থেকে

حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ.

অর্থ : এমনকি যখন বায়ুরাশি পরিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরেরর দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। [সূরা আ'রাফ : আয়াত ৫৭]

এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৪টি আয়াত রয়েছে। যথা–

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
নূর	৪৩	রূম	৪৮
ওয়াকি'আ	৬৯	নাবা	১৪

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতসমূহ দ্বারা বোঝা যায় যে, বৃষ্টি আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। অতএব, আয়াতগুলোতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো। যথা–

১. ক-অংশের আয়াতে سَمَاء (আকাশ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَحَاب তথা মেঘমালা। আর মেঘমালাকে سَمَاء শব্দ দ্বারা এজন্যে প্রকাশ করা হয়েছে যে, মহাশূন্যে বা আকাশ সীমাতে যত বস্তু থাকে, সব বস্তুকে سَمَاء শব্দের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এজন্যেই বলা হয় كُلُّ مَا عَلَاكَ فَهُوَ سَمَاءٌ (তোমার উপরে যত বস্তু রয়েছে, সবগুলো سَمَاء) সুতরাং মেঘমালাও যেহেতু প্রত্যেকর উপরে থাকে, এজেন্য তাকে سَمَاء বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এ বিশ্লেষণ মোতাবেক আয়াতগুলোতে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না।

২. বৃষ্টি বর্ষণ হয় মেঘমালা থেকে। আর মেঘমালা সৃষ্টি হয় আকাশমণ্ডলীর বিভিন্ন প্রভাব বা ক্রিয়ার দরুন। যেমন সূর্য আকাশের মধ্যে বিদ্যমান থেকে স্বীয় আলোকরশ্মি সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করে, যার উষ্ণতার ফলে পানি বাষ্প হয়ে মহাকাশে গমন করতে সক্ষম হয়। অতঃপর সে বাষ্প বাতাসের তৃতীয় স্তরে পৌঁছে জমাট হয়ে যায়। আর যখন অধিক ভারি হয়ে যায়, তখন ফোঁটা করে নীচের দিকে বর্ষণ হতে থাকে। এভাবে জলীয় বাষ্পগুলো মহাকাশে জমাট হয়ে ভারি ও গাঢ় হয়ে যাওয়াকে মেঘমালা নামে নামকরণ করা হয়। আর যখন জমিনের দিকে ফোঁটা ফোঁটা করে বর্ষণ হয়, তখন তার নাম হয়ে যায় বৃষ্টি। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আর মেঘমালা সৃষ্টি হয় আকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মাধ্যমে। এজন্যে রূপকার্থে বলা হয় যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে। এতএব এবার বোধগম্য হলো যে, ক-অংশের আয়াত রূপকার্থে ব্যবহৃত। আর খ-অংশের আয়াত প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এখন আর কোনো প্রতিদ্বন্দিতাই বাকি নেই। [রূহুল মা'আনী]

٢٣. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ﴾ شَكٍّ ﴿مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا﴾ مُحَمَّدٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ﴾ أَيِ الْمُنَزَّلِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ. وَالسُّوْرَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخِرٌ أَقَلُّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ. ﴿وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ﴾ آلِهَتَكُمُ الَّتِي تَعْبُدُوْنَهَا ﴿مِّنْ دُوْنِ اللهِ﴾ أَيْ مِنْ غَيْرِهِ لِتُعِيْنَكُمْ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ فِيْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّوْنَ فُصَحَاءُ مِثْلُهُ.

২৩. যদি তোমারা সন্দেহে সংশয়ে থাকো, আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে। এ মর্মে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাহলে, তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো অর্থাৎ অবতীর্ণ কুরআনের মতো। مِن শব্দটি بَيَانِيَّة বা বিবরণমূলক। অর্থাৎ সেই সূরা ভাষালংকার, বাক্যের চমৎকার বিন্যাস এবং গায়েব সম্পর্কে সত্য সংবাদ দানে কুরআনের অনুরূপ হতে হবে। سُوْرَة আল কুরআনের একটি অংশের নাম; যার সুনির্দিষ্ট শুরু ও শেষ রয়েছে। তা ন্যূনতম তিন আয়াতবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তোমরা ডাকো তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে অর্থাৎ তোমাদের উপাস্যদেরকে যাদের তোমরা উপাসনা করে থাক, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে, তোমাদের সাহায্য করার জন্যে; তোমরা যদি সত্যবাদী হও এই কথায় যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে (কুরআনের এসব) কথা বলেছেন। তাহলে তোমরাও তা করে দেখাও। কারণ, তোমরা অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর মতো আরবি ভাষা-ভাষী।

٢٤. وَلَمَّا عَجَزُوْا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا﴾ مَا ذُكِرَ يَعْجِزُكُمْ ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوْا﴾ ذٰلِكَ أَبَدًا لِظُهُوْرِ إِعْجَازِهِ اعْتِرَاضٌ ﴿فَاتَّقُوْا﴾ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ ﴿النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ﴾ الْكُفَّارُ ﴿وَالْحِجَارَةُ﴾ كَأَصْنَامِهِمْ مِنْهَا يَعْنِي أَنَّهَا مُفْرِطَةُ الْحَرَارَةِ تُتَّقَدُ بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تُتَّقَدُ بِالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ ﴿أُعِدَّتْ﴾ هُيِّئَتْ ﴿لِلْكَافِرِيْنَ﴾ يُعَذَّبُوْنَ بِهَا جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ أَوْ حَالٌ لَازِمَةٌ.

২৪. যখন তারা এমন করতে অপারগ হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তোমরা তা না করতে পার উল্লিখিত অপারগতার দরুন আর কখনই তোমরা করতে পারবে না তা কোনো কালেও সম্ভব নয় কুরআনের ইজায প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায়। এখানে وَلَنْ تَفْعَلُوْا হলো جُمْلَة مُعْتَرِضَة তবে তোমরা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো, আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এবং কুরআন যে মানব রচিত নয় এই কথার উপর ঈমান এনে সেই আগুন হতে যার ইন্ধন মানুষ অর্থাৎ কাফেররা ও পাথর যেমন- পাথর নির্মিত তাদের প্রতিমাসমূহ অর্থাৎ, এই আগুনের উত্তাপ হবে প্রচণ্ড। তা দুনিয়ার আগুনের মতো কাঠ ইত্যাদি দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে না; বরং উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রজ্বলিত হবে। কাফেরদের জন্যে তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। أُعِدَّتْ অর্থ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এই বাক্যটি جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة বা حَالٌ لَازِمَةٌ;

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا . مُحَمَّدٍ .....

عَبْد ও مِن শব্দের ব্যাখ্য : مِمَّا نَزَّلْنَا-এর مِنْ-টি سَبَبِيَّة বা اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এটাকে تَبْعِيْضِيَّة ধরা যাবে না। মুফাসসির (র.) عَبْدِنَا এরপর مُحَمَّد উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করে দিলেন যে, এখানে عَبْد দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ

مِثْلِهٖ-এর যমীরের মারযা : مِنْ مِثْلِهٖ-এর যমীর যদি مَا نَزَّلْنَا-এর দিকে ফেরে যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন, তবে من-এর তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম আখফাশের রায় অনুযায়ী, بَيَانِيَّة কিংবা تَبْعِيْضِيَّة অথবা زَائِدَة।

আর যদি যমীর عَبْد-এর দিকে ফেলে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করীম ﷺ-এর সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এমতাবস্থায় من হবে اِبْتِدَائِيَّة অথবা فَأْتُوْا-এর صِلَة হবে যেহেতু শুরুতে শর্তের إن আছে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু غَيْر أُمِّىْ থেকে কুরআনের প্রকাশনার সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই প্রথম পদ্ধতিটি উত্তম। আর এদিকে ইঙ্গিত করেছেন মুফাসসরি (র.) مِنْ مِثْلِهِ-এরূপ اَلْمُنَزَّلُ শব্দ দ্বারা এবং তিনি مِنْ-কে بَيَانِيَّة অর্থ নিয়েছেন।

قَوْلُهُ : وَادْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ . اٰلِهَتَكُمُ الَّتِيْ تَعْبُدُوْنَ . مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

شهداء দ্বারা ভ্রান্ত প্রভুরা উদ্দেশ্য : কাফেররা যাদের উপাসনা করে, তাদের প্রভুদেরকে شُهَدَاء বলা হয়েছে। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের প্রভুরা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে। مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা اُدْعُوْا কিংবা شُهَدَاء-এর সাথে সংযুক্ত। এ আদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য অক্ষম করা। اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ হলো শর্ত। তার জবাব মাহযূফ আছে। তা হলো– فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ; মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : فَاتَّقُوْا . بِالْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ

তাকওয়ার ব্যাখ্যা : فاتقوا-এর পরে আল্লামা সুয়ূতী (র.) যে ইবারত এনেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়ার মাধ্যম যে ঈমানকে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ঈমান বা বিশ্বাস কীসের প্রতি স্থাপন করা হবে, সেটা ব্যাখ্যা করা। আর তা হলো দুটি বিষয়, একটি হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে– কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া এবং মানুষের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর কালাম না হওয়া।

قَوْلُهُ : النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ . اَلْكُفَّارُ وَالْحِجَارَةُ . كَاَصْنَامِهِمْ الخ

النَّار শব্দটি মারেফা ও الحجارة দ্বারা উদ্দেশ্য : النَّار সূরাতুল বাকারা যেহেতু মাদানী। তাই এ স্থানে مَعْرِفَة আনাটা বিশুদ্ধ। আর সূরা তাহরীম মক্কী। সেখানে প্রথমবার نَار উল্লেখ করা হয়েছে, তাই نَكِرَة-এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। حِجَارَة পাথর। এটি حُجْرَة-এর বহুবচন। আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে, পাথর দ্বারা ঐ সব মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে, কাফেররা যেগুলোকে পূজা করতো। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে–

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ জাহান্নামের আসল খোরাক তো হবে খোদ কাফের-মুশরিকরাই। তবে তাদের শাস্তি বৃদ্ধির এটাও একটি উপায় যে, তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, নাও! দুনিয়াতে যাদের পূজা করেছ, তাদের বলো, এখান থেকে উদ্ধার করতে। [তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ : اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ..... حَالٌ لَازِمَةٌ

বাক্যের তারকীব : এ এবারতের সারাংশ হলো, وَقُوْدُهَا-এর যমীর থেকে এটাকে حَال বানানো যাবে না। কেননা, যমীর মুযাফ ইলাইহি এবং মুযাফ ইসমে جَامِد হওয়ার কারণে عَامِل হতে পারে না। দ্বিতীয় আরেকটি তারকীব হলো جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة যা তিনি নিজেও করেছেন। মুফাসসির (র.) এখানে لَازِمَة শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি সন্দেহ দূর করেছেন। সন্দেহটি হলো– اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ দ্বারা বোঝা যায় যে, জাহান্নামের আগুন কাফেরদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের কোনো দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, চাই সে ফাসেক হোক বা অপরাধী কারণ, সেখানে কোনো মুমিনের যেতে হবে না।

حَالٌ لَازِمَةٌ মূলত ذُوالْحَال -এর জন্যে সিফাতের পর্যায়ে হয়ে থাকে এবং ذُو الْحَال থেকে পৃথক হয় না। যেমন– اَبُوْكَ عطوفا-এর মাঝে পিতার স্নেহ ছেলের জন্যে আবশ্যক। কিন্তু নির্দিষ্ট নয়। ছেলে ছাড়া অন্য কারো প্রতি পিতার স্নেহ-মমতা থাকতে পারে। অনুরূপভাবে জাহান্নামের আগুন কাফেরদের জন্যে আবশ্যক; কিন্তু নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তো اَصَالَةً ও دَوَامًا কাফেরদের জন্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। তথাপিও সাময়িকভাবে পরিশুদ্ধ করার জন্যে ফাসেক-ফাজের মুমিনদেরকেও তাতে প্রবেশ করানোটা তার প্রতিবন্ধক নয়।

যেমন রূহুল মা'আনীতেও উল্লেখ আছে– وَكُوْنُ الْاِعْدَادِ لِلْكَافِرِيْنَ لَا يُنَافِيْ دُخُوْلَ غَيْرِهِمْ فِيْهِ عَلٰى جِهَةِ التَّطَفُّلِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ-এর মাঝে কাফের দ্বারা সাধারণ কাফের তথা আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয়টি ধরা হলে কোনো আপত্তিই থাকে না। পারিভাষিক কাফেরের প্রবেশটা স্থায়ী হবে আর আভিধানিক কাফের তথা অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানের প্রবেশটা হবে সাময়িকভাবে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করণার্থে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

شُهَدَاءُ : শব্দটি বহুবচন, শাব্দিক অর্থ সাহায্যকারী, সাক্ষ্যদাতা। এর একবচন হলো شَهِيْد বা شَاهِدٌ যেমন كَرِيْم-এর বহুবচন كُرَمَاء এবং شَاعِر-এর বহুবচন شُعَرَاء; তবে شُهَدَاء শব্দটি شَهِيْد-এর বহুবচন হওয়া অধিক সঠিক। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী فَعِيْلٌ-এর বহুবচন فُعَلَاءُ হয়। شَهِدَ الْمَجَلِس বাবে سَمِعَ থেকে, অর্থ হয় মজলিসে আসা شَهِدَ الشَّيْء অর্থ- পাওয়া। যার অর্থ اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ কখনো শুধু উপস্থিত হওয়া অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ কখানো স্বীকার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ; আলোচ্য আয়াতে شُهَدَاء দ্বারা ভ্রান্ত মাবুদদের বোঝানো হয়েছে। উপাস্যদেরকে شُهَدَاءُ বলা হয়েছে। কারণ কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণামতে, এরা আল্লাহ তা'আলার সামনে তাদের ইবাদত বিশুদ্ধতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

وَفِى الْبَيْضَاوِىِّ : اَلشُّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيْدٍ بِمَعْنٰى اَلْحَاضِرِ أو الْقَائِمِ بِالشَّهَادَةِ أوِ النَّاصِرِ أوِ الْاِمَامِ وَكَأنَّه سُمِّى بِهِ لِأَنَّهُ يَحْضَرُ الْمَجَالِسَ وَتُبْرَمُ بِمَحْضَرَةِ الأمُوْرِ.

وَقُوْدُهَا : واو হরফে ফাতহাযুক্ত অবস্থায় অর্থ হবে مَا تُوْقَدُ بِهٖ অর্থাৎ ইন্ধন। আর واو-এ যম্মাযুক্ত অবস্থায় এটি মাসদার। এ ওযনে আসা সকল সীগাই এ রকম দু'সুরত হয়ে থাকে। যেমন- طُهُوْر. سَحُوْر. وَضُوْء ইত্যাদি। আর কায়েদা হলো فعول-এর ওযনে আসা প্রত্যেক শব্দ ফাতহাযুক্ত হলে آلَةٌ-এর অর্থ হবে। আর যম্মাযুক্ত হলে মাসদার হবে। কেউ কেউ বলেন, একটি অপরটির স্থানেও ব্যবহৃত হয়।

وَقُوْد জমহুরের দৃষ্টিতে واو-এ ফাতহা দিয়ে পড়তে হবে, অর্থাৎ ইন্ধন জ্বালানি। আর واو এ ضَمَّة হলে অর্থ হবে, আগুন জ্বালানো।

اِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم فعل مستقبل معروف বাব فتح মাসদার الفعل মূলবর্ণ (ف.ع.ل) জিনস صحيح অর্থ- যদি তোমরা না পার। تفعلوا ফে'লে দুটি عَامِل রয়েছে, ان ও لم এবং উভয়টির আমল জযম দেওয়া আর এখানে نون اعرابى বিলুপ্তির মাধ্যমে জযম হয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো উভয়টি কি আমেল? এর সমাধান নাহুবিদ দিয়েছেন এভাবে যে, একই আমলকারী দুটি আমেল যখন একত্র হয়ে যায়, তখন একে নির্ধারণ করে অপরটিকে আমলহীন করা হবে। এক্ষেত্রে কাজী বায়যাভী (র.)-এর অভিমত হলো لم আমল করবে চারটি কারণে- ১. لم সর্বদা আমেল হয়ে ব্যবহার হয়। ২. لم শুধু مضارع-এর উপর প্রবেশ করার করণে مضارع-এর সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ৩. لم তার معمول-এর সঙ্গে মিলিত রয়েছে। ৪. لم-এর কারণে مضارع যেহেতু مَاضِيْ-এর অর্থ প্রদান করে, সেহেতু لم ফে'লের অংশে পরিণত হয়ে গেছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ ..... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

عَلٰى عَبْدِنَا ..... إِنْ كُنْتُمْ শর্ত فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ জাযা, مِمَّا نَزَّلْنَا যমীরকে হযফ করার সাথে جر-এর স্থানে رَيْب-এর সিফাত, مَا মওসূলা, مِنْ مِثْلِهِ সিফাত, اَىْ بِسُوْرَةٍ كَائِنَةٍ مِثْله وَادعُوْا شُهَدَاءَكُمْ জুমলায়ে اِنْشَائِيَّة হয়ে মাতূফ হয়েছে فَأْتُوْا-এর উপর। مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা شُهَدَاء থেকে حال-এর স্থানে اِنْ كُنْتُمْ اَىْ شُهَدَاءَكُمْ مُتَفَرِّدِيْنَ عَنِ اللّٰهِ শর্তের জওয়াব উহ্য।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا ..... أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا শর্ত আর فَاتَّقُوا الخ জাযা لَنْ تَفْعَلُوْا জুমলায়ে معترضة আর اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ. النَّارَ থেকে حَالٌ-এর স্থানে এবং এর আমেল হলো فَاتَّقُوْا; وَلَنْ تفعلوا জুমলাটি شَرْط এবং جَزَاء-এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة রূপে এসেছে। এর واو-টি عَطْف-এর জন্যে নয়, বরং اِسْتِئْنَاف-এর জন্যে। অনুরূপভাবে এটি واو حَالِيَة-ও নয়। কেননা واو الْحَال জুমলায়ে মুসতানিফার শুরুতে আসতে পারে না। আর جُمْلَة مُعْتَرِضَة সাধারণত তাকীদ-এর জন্যে আসে এবং ক্ষেত্রেবিশেষ অন্য কারণেও আসে। أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ বাক্যটি جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة আর প্রত্যেক جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة সর্বদা কোনো سُؤَال مُقَدَّر-এর জবাবে হয়ে থাকে।

প্রশ্নটা হলো- لِمَنْ أُعِدَّتْ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ; তার জাবাবে বলা হয়েছে- أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ প্রকাশ থাকে যে, أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ বাক্যটি النَّار শব্দ থেকে حَال হয়েছে। وَقُوْدُهَا-এর যমীর থেকে حَال হওয়া সহীহ নয়। কেননা هَا হলো مُضَاف اليه আর مُضَاف اِلَيْه কোনো مَقْصُوْد বা উদ্দিষ্ট হয় না। আর مُضَاف তথা وَقُوْدُهَا بِمَعْنٰى حَطَب হলো عَيْن যা جَامِد আমেল হতে পারে না। [সামীন সূত্রে হাশিয়াতুল জামাল : ৪৩]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

১. পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ ছিল। আর এখান থেকে পরবর্তী দু'আয়াতে রাসূল ﷺ-এর রিসালাতের প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। কারণ, কুরআন যা হেদায়াতের আলোকরশ্মি তার দুটি মূলভিত্তি রয়েছে। ১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ ২. রিসালাত। আলোচ্য আয়াতে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে অত্যন্ত জোরালো এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চ্যালেঞ্জ দেওয়া হলো।

২. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরআনে সন্দেহের কারণ হয়তো এটা হতে পারত যে, খোদ এ বাণীর মাঝেই কোনো সংশয়পূর্ণ কথা থেকে থাকবে, যা দূরীভূত করার জন্যে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা হয়েছে। অথবা তার কারণ এটা হতে পারত যে, কারো অন্তরে স্বীয় উপলব্ধির ত্রুটির কারণে অথবা তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ আয়াতে শেষোক্ত কারণটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই তা দূর করার একটি সহজ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের ধারণায় এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী না হলে অবশ্যই তা মানব রচিত হবে। আর একজন মানুষের পক্ষে যখন এমন রচনা সম্ভব, তখন অন্যদের পক্ষেও তা নিঃসন্দেহে সম্ভব হবে। আর সেখানে জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ মানব দলের সমাবেশ হলে তো কথাই নেই। সুতরাং তোমরাও এরূপ বিশুদ্ধ ও সাহিত্যালঙ্কারপূর্ণ অন্তত তিন আয়াত সংবলিত একটি সূরা রচনা কর তো দেখি! কিন্তু কাফেররা যখন এমন সূরা বানাতে অপারগ হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা ভাষা ও সাহিত্যালংকারে বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যখন একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছ, তখন হৃদয়ঙ্গম কর যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কোনো মানুষের রচনা নয়। [তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে মাজেদী]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ ..... اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

رَيْب শব্দের অর্থ- সন্দেহ, সংশয়। ইমাম রাগেব ইসফাহানী (র.)-এর মতে رَيْب এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সমান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্যে কুরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও رَيْب-এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের رَيْب শব্দের তানভীনটি হলো تَحْقِيْر-এর অর্থে। অর্থাৎ, তাদের সন্দেহ শক্তিশালী নয়, বরং সাধারণ ও দুর্বল সন্দেহ। যা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হয়েছে।

প্রথম রুকুতে আল্লাহর তা'আলা কুরআনের বর্ণনা দেওয়ার পর এখানে আগের কাফেরদেরকে اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেছেন। কুরআনের ব্যাপারে কাফেরদের অন্তরে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে এজন্যে اِنْ বর্ণ ব্যবহার করেছেন, اِذَا ব্যবহার করেননি, যদিও পূর্বের বর্ণনার পর আর সন্দেহ থাকার কথা ছিল না। اِنْ ব্যবহারের কারণে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, كُنْتُمْ মাযির শুরুতে হরফে শর্ত আসার কারণে ভবিষ্যতে সন্দেহ হতে পারে। কেননা আলোচ্য আয়াতে كَانَ ফে'লটি সর্বদার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা জবাব হলো, ইমাম মুবাররাদ (র.)-সহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, كَان মাযিরূপে শর্ত হলে মাযির অর্থ বাকি থাকে।

تَنْزِيْل ও اِنْزَال-এর পার্থক্য : اِنْزَال বলা হয়- সম্মিলিতভাবে একবারে অবতীর্ণ করাকে। অন্যদিকে تَنْزِيْل বলা হয় প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করাকে। পবিত্র কুরআনের উক্ত দুটি গুণই রয়েছে। এর অবতরণ প্রথম লওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আকাশে পরিপূর্ণভাবে একবারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কোনো স্থানে তাকে اِنْزَال শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর নবুয়তের প্রয়োজন অনুসারে পূর্ণ সময়ে অর্থাৎ ২৩ বছর অল্প অল্প করে অবতরণ হয়েছে। তাই তাকে تَنْزِيْل দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

কাফেররা ভেবেছে যে, যেমনিভাবে কবিগণ তাদের কাব্যগ্রন্থ, গজল, দীর্ঘ কবিতাসমূহকে অল্প অল্প করে পূর্ণ করে, রাসূল ﷺ-ও যেহেতু তেমন করেই প্রকাশ করছেন, তাই এটা মুহাম্মদ ﷺ-এর কালামই হবে। কালামে ইলাহী যদি হতো, তবে এটাকে একত্রেই অবতীর্ণ করা হতো। যদিও পূর্ণাঙ্গভাবে একত্রে অবতীর্ণ করার উপর ক্ষমতাও আছে এবং তাঁর অভ্যাসও এটাই। যেমন- তাওরাত একবারে লিখে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা বলতো- لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً অর্থাৎ, কেন নবী করীম ﷺ-এর উপর কুরআন একবারে অবতীর্ণ করা হয়নি।

চ্যালেঞ্জের মধ্যে এ সন্দেহটাকেই দূর করা উদ্দেশ্য, তাই اَنْزَلْنَا-এর স্থানে نَزَّلْنَا বলা হয়েছে। عَبْدِنَا-এর মধ্যে রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্বকে عَبْد দ্বারা ব্যক্ত করে এবং এটাকে যমীর مُتَكَلِّم-এর দিকে مُضَاف করে রাসূল ﷺ-এর সম্মান এবং তাকে সম্মান প্রদর্শনের ভারসাম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ মাবূদিয়াতের স্থানে নন; বরং আব্দিয়াতের স্থানে আছেন। যা মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চতর স্থান এবং আমার বিশেষ বান্দা বা গোলাম। আল্লাহ যাকে আপন আখ্যায়িত করেন, তার সম্মানের ব্যাপারে আর কী প্রশ্ন করার থাকে?

কোন দিক দিয়ে কুরআনের সামঞ্জস্য হওয়া জরুরি : কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, কোরআনের সূরার মতো একটি সূরা রচনা করতে। প্রশ্ন হলো কোন দিক থেকে তা কুরআনের মতো হতে হবে? এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মতামত হলো অলঙ্কার ও সুবিন্যাসের দিক থেকে, কিন্তু আসলে কুরআনের ভাব ও মর্মের দিকটাও চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত; বরং এটিই মুখ্য। কেননা, কুরআন শুরুতেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ; এ এক হেদায়াতগ্রন্থ। তাই এখানেও সে ভাষায়ই ঘোষণা করছে। আমার এক একটি সূরায় সত্যের যে আলোক বিচ্ছুরণ আছে, তোমরা তার সমতুল্য কিছু পেশ কর দেখি। কুরআনের আরেকটি আয়াত থেকেও সমতার ভিত্তি সম্পর্কে জানা যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. (قَصَص : ٤٩) (তাফসীরে মাজেদী)

قَوْلُهٗ : فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ ..... اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ : এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন স্থানে বার বার করা হয়েছে। অবতীর্ণ করার ধারাবাহিকতা এরূপ যে, প্রথম আয়াত قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا দ্বারা পূর্ণ কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন রচনা করার সরাসরি চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোনো জবাব দেয়নি। তখন সহজ করে বলা হয়েছে-

فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

এবারও যখন কেউ পারল না। তখন এ আয়াত فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ বলে ঘোষণা দেওয়া হলো; কিন্তু তারপরও কোনো উত্তর বের হলো না। তখন فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ বলে আল্লাহ তা'আলা আহ্বান শেষ করেছেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত বিশিষ্ট সূরা কাউসার লিপিবদ্ধ করিয়ে আরবের প্রথানুযায়ী পবিত্র কাবার দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন। অনেকদিন সেখানে সেভাবেই ছিল। কিন্তু কারো থেকে কোনো উত্তর এলো না। অবশেষে কোনো এক বাগ্মী কবি একটি বাক্য لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ طَاقَةِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এ কিতাব মানবীয় সামর্থ্যানুযায়ী রচিত কথামালা নয় লিখে দিয়ে নিজ অক্ষমতা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছে।

وَلَنْ تَفْعَلُوْا-এর মধ্যে অদৃশ্যের সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। অর্থাৎ, এখানে পৃথক পরাজয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। পরে বারংবার তাদেরকে ডাকা হয়েছে। তাদের থেকে কোনো ধরনের উত্তর দেওয়া হয়নি।

নবীদের মু'জিযা ছিল যুগোপযোগী : প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরগণ (আ.) ঐসব বিষয় দ্বারাই তাদের নবুয়াতের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছেন, যে বিষয়ে উম্মত পরিপূর্ণ পারদর্শী ছিল। হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে লোহার কারুকার্য সফলতার চূড়ান্ত সীমায় ছিল। তাই وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ দ্বারা এ ব্যাপারে তার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ যুগের গোটা পৃথিবী তাঁর লোহার কারুকার্যের সামনে হার মেনেছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে যাদু ও যাদুকরদের খুব প্রভাব ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর يد بيضاء ও عصا-এর সামনে وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ-এর বিস্ময় জগদ্বাসী দেখেছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ ডাক্তারি, চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকের যুগ ছিল। কিন্তু যে রোগীদের কোনো নিরাময় ছিল না, হযরত ঈসা (আ.) কোনো ঔষধ ও পথ্য ব্যতীত ঐ রোগীদেরকে শুধু সুস্থই করেননি; বরং মৃতদেরকে পর্যন্ত জীবিত করে সমস্ত বাহ্যিক চিকিৎসাকে পরাজিত করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা : রাসূল ﷺ-এর সাহিত্যময় যুগে, তিনি যে দেশে ও যে গোত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন তাদের বাক-শক্তি ও জ্বালাময়ী ভাষণের এ অবস্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মোকাবিলায় সমস্ত জগদ্বাসীকে বোবা ও নির্বাক মনে করতো। তাদের নারীরাও অগ্নিবর্ষি বক্তা ও কবি ছিল।

কিন্তু রাসূল ﷺ তো শিক্ষা-দীক্ষা দূরের কথা এর প্রকাশ্য উপকরণ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। মাতা, পতি, বোন, ভাই তো তার ছিল না, অন্যান্য স্বজনেরাও তার বিরোধী ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সাহিত্যের ও দর্শনের নজিরবিহীন মু'জিযা পেশ করেছেন। যা নিঃসন্দেহে তার নবুয়তের অকাট্য দলিল।

ইয়ামামার এক ব্যক্তি, মুসাইলামা কাযযাব কুরআনের ধারায় কিছু আয়াত পেশ করার অশুভ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যেমন–

১- وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوْجِ.

২- اَلْفِيْلُ مَالْفِيْلُ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْفِيْلُ ذَنَبُهُ قَلِيْلٌ وَخُرْطُوْمُهُ طَوِيْلٌ وَاِنَّهُ مِنْ خِلْقَةِ رَبِّكَ لَقَلِيْلٌ.

তখন তার স্বগোত্রীয়রাই তাকে ঠাট্টা করেছে। কারণ, আরবদের কাছে এগুলো কোনো মূল্যমানই রাখে না।

এমনিভাবে শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো আলেম সূরা ফাতেহা ও সূরা হাসানাইন তৈরি করে পবিত্র কুরআনের সংযোজন করার অশুভ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা পৃথিবীর কোথাও কোনো সমাদর পায়নি।

কুর'আনী চ্যালেঞ্জ কি নবী যুগের জন্যে নির্দিষ্ট? : পবিত্র কুরআনের এ মু'জিযা একটি ব্যাপক ও চিরস্থায়ী মু'জিযা। অন্যান্য সকল নবী ও রাসূলগণের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কুরআনের মু'জিযা রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতোই মু'জিযাসুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোনো জ্ঞানী গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কুরআনের সমতুল্য কোনো আয়াত ইতঃপূর্বেও কেউ তৈরি করতে পারেনি, এখনো কেউ পারবে না, আর যদি সাহস থাকে, তাহলে তৈরি করে দেখাও। সুতরাং কুরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনোকালেই কোনো জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি চলমান দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। রাসূল ﷺ-এর যুগে যেমন এর নজির পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

জান্নাত ও জাহান্নাম প্রস্তুত কিনা? : أُعِدَّتْ-এর মাঝে أُعِدَّتْ মাযীর সীগা, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বেহেশত ও দোজখ-উভয়টিই সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, পুরস্কার ও শাস্তির সময়ের পূর্বে এগুলোকে সৃষ্টি করা অযথা ও নিষ্প্রয়োজন। আর নিষ্প্রয়োজন কাজ করা থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত।

দলিল : আল্লাহ তা'আলার বাণী تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ আয়াতে نَجْعَلُهَا শব্দটি প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতে সৃষ্টি করা হবে।

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মত : জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান।

দলিল :

ক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

খ. অন্য স্থানে রয়েছে– أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

গ. কুরআনের রয়েছে– اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

ঘ. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে– وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

ঙ. হাদীস শরীফে রয়েছে–

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلَا اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرٌ كُلُّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ اَلَا اِنَّ الشَّرَّ شَرٌّ كُلُّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِى النَّارِ.

মু'তাযিলাদের দলিলের জবাব

১. আয়াতে نَجْعَلُهَا শব্দটির ক্রিয়াপদের মূলধাতু হলো جَعَلَ; جَعْل-এর দুটি অর্থ আছে– خَلْق ও تَمْلِيْك; এখানে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য।

২. আয়াতে نَجْعَلُهَا শব্দটি রূপকার্থে চিরন্তনতা ও চলমানতা বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব থেকে সৃষ্টি করে রাখা অযথা নয়। এটা কি কম উপকার যে, মানুষকে উৎসাহিত করার ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের কাজ নেওয়া হচ্ছে। পার্থিব জীবনেও দেখা যায়, বাদশাহ নিজ রাষ্ট্র শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই জেলখানা তৈরি করান। এটা দেখে এমন আপত্তি করা অবান্তর যে, যখন কেউ চুরি করবে, তখন জেলখানা তৈরি করা হবে, যখন কেউ বিদ্রোহ করবে, তখন ফাঁসির কাষ্ঠ বুলানো হবে।

সত্য প্রত্যাখ্যানের শাস্তি জাহান্নাম : فَاتَّقُوا النَّارَ আয়াতাংশে اِتِّقَاءُ النَّارِ দ্বারা اِحْتِرَازٌ مِنَ الْفَسَادِ উদ্দেশ্য। কেননা, ফেতনা-ফ্যাসাদ ইত্যাদি জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। ف হরফটি পরিণতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ কুরআনের দাবি ও প্রমাণ খণ্ডন করতে এবং নিজেদের দাবির পক্ষে প্রমাণ তুলে ধরতে যেহেতু ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু এখনো সত্যকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকো। আর যদি বিরত না থাক, তাহলে এ বিদ্বেষপ্রসূত সত্য প্রত্যাখ্যানের অনিবার্য শাস্তি জাহান্নাম ব্যতীত আর কী হতে পারে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا

ইখতেসার : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বললেন যে, فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ; আর তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করার সময় বললেন– فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا; এক্ষেত্রে اَلْاِتْيَانُ মাসদারের ফে'লে না আনার কারণ হলো বাক্যটি সংক্ষিপ্ত করা। কেননা, এক্ষেত্রে যদি الاتيان মাসদারের ফে'ল আনা হতো, তাহলে بِالْقُرْاٰنِ ও بِهٖ শব্দদ্বয় অতিরিক্ত আনতে হতো, যার মধ্যে তেমন কোনো ফায়েদা নেই। তখন ইবারতটি এরূপ হতো– فَاِنْ لَّمْ تَاتُوْا بِالْقُرْاٰنِ وَلَنْ تَاتُوْا بِهٖ;

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاتَّقُوا النَّارَ

ইজায : আলোচ্য আয়াতাংশের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মূলরূপ ছিল– فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَخَافُوْا نَارَ جَهَنَّمَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا এটাকে পরিভাষায় اِيْجَاز بِتَصْدِيْقِكُمْ بِالْقُرْآنِ বলা হয়। ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন– হলো শর্ত। আর فَآمِنُوْا بِالْقُرْاٰنِ হলো জাযা, এখানে এ জাযাকে হযফ করে লাযেম তথা اِتِّقَاءُ النَّارِ বলে মালযূম তথা اِيْمَانٌ بِالْقُرْاٰنِ উদ্দেশ্য, যার দ্বারা বাক্যটি আরো ইজায হয়েছে।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কুরআন শরীফের কয়টি সূরা রচনায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

ক. একটি সূরা	খ. দশটি সূরা	গ. সম্পূর্ণ কুরআন
وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ۔ অর্থ : এতদ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। (সূরা বাকারা : ১৩) এ আয়াতের সমর্থনের আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা– সূরা– ইউনুস : ৩৮	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ۔ অর্থ : তারা কি বলে? কুরআন তৈরি করেছে? তুমি বলো, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। (সূরা হূদ : ১৩)	قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ۔ অর্থ : যদি মানব ও জিন জাতি এ উদ্দেশে একত্র হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করবে, তাহলেও তারা কুরআনের অনুরূপ কিতাব রচনা করতে পারবে না। (সূরা বনী ইসলঈল : আয়াত ৮৮) এ আয়াতের সমর্থনের আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা– সূরা– তূর : ৩৪

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআন অবতরণের সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক সকল মানুষকে একত্রে সম্বোধন করে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন যে, যদি তোমরা পবিত্রতম মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ কর, এবং এ ধারণা কর যে, উক্ত গ্রন্থ নবীজি ﷺ নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরা কুরআনের মতো সাহিত্য ও ভাষা-অলংকারপূর্ণ মহামূল্যবান কালাম রচনা করে নিয়ে এসো এবং তোমাদের সাথে তোমদের বন্ধুবান্ধব ও সাহায্যকারীও রাখ। তবে স্মরণ রাখবে যে, সকল মানুষ এক সঙ্গে মিলেও উক্ত মহাগ্রন্থের মতো কোনো কালাম রচনা করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ উক্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করতে গিয়ে ক-অংশের আয়াতে বলেছেন, তোমরা কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা রচনা করো। খ-অংশের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং গ-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ণ কুরআনে পাকের মতো একটি মহাগ্রন্থ রচনা করো। সুতরাং আয়াতগুলোতে কুরআনের অনুরূপ কালম রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদানের পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে পূর্ণ কুরআন শরীফের সমতুল্য মহাগ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। যখন মক্কার কাফেররা তথা সারা দুনিয়ার কুরআনবিরোধী চক্র চ্যালেঞ্জ কবুল করার সামর্থ্য রাখল না , তখন আল্লাহ তা'আলা দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। এতেও তারা সমর্থ হলো না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয়বারের মতো আবার কুরআনে পাকের একটি মাত্র সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন এবং বললেন– فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ অর্থাৎ, আল কুরআনে মতো যে কোনো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো– বড় কিংবা ছোট। এখানে আল্লাহ তা'আলা سورة শব্দটিকে نَكِرَة (অনির্দিষ্ট) অবস্থায় উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা আল কুরআনের ছোট বা বড় যে কোনো সূরা বোঝা যায়। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণেও তারা সক্ষম হলো না। এজন্যে চতুর্থ বারের মতো আবার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হলো– فَلْيَاتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهٖ

অর্থাৎ, হে কুরআন বিরোধী চক্র! যদি তোমরা কুরআনের ছোট একটি সূরা রচনা করতেও সক্ষম না হও, তাহলে কুরআনের একটি আয়াত বা একটি বাক্য হলেও রচনা করে নিয়ে এসো। এ চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হলো না এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী।

অবশ্য উপরে চ্যালেঞ্জ প্রদানের যে ক্রমধারা বর্ণনা করা হয়েছে, তা কুরআন নাজিল হওয়ার ক্রমধারার উপর ভিত্তিশীল। যদিও সূরাসমূহের বিন্যাস এর বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন– চ্যালেঞ্জবিশিষ্ট সূরাগুলোর মধ্যে প্রথমে সূরা ইসরা নাজিল হয়েছে এবং তাতে بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ তথা পূর্ণ কুরআনের সমকক্ষ গ্রন্থ রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সূরা হূদ অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাতে فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ অর্থাৎ, দশটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ অর্থাৎ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর বাণী রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদানের পরিমাণের ক্ষেত্রে যে তারতম্য দৃশ্যমান হচ্ছে, তা اِخْتِلَافُ الزَّمَانِ তথা সময়ের তারতম্য ও ব্যবধানের উপর ভিত্তিশীল। আর যখন একাধিক বিপরীতমুখী বস্তু একাধিক সময়ে সংঘটিত হয়, তখন উক্ত বস্তুসমূহের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় না। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে চ্যালেঞ্জ প্রদানের পরিমাণের ক্ষেত্রে এখন আর কোনো বিরোধই বাকি নেই। [তাফসীরে রুহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর ও হাশিয়ায়ে সাবী]

✪ اَلْعِلْمُ فِى الْقُرْاٰنِ : আল কুরআনে বিজ্ঞান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

তাপশক্তি উৎপাদনের জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। দাহনের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিমুক্ত করা কিংবা পরমাণু বিভাজন অথবা একীভবনের দ্বারা আণবিক শক্তি মুক্ত করার মাধ্যমে তাপশক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে পাথরকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় জ্বালানো হলে তার মৌলিক উপাদান ও গুণাবলিতে পরিবর্তন হয়। উদাহরণত, চুনাপাথরকে ৫৫০ সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করা হলে তা ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন-ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে ২৫৭০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলে তা গলে যায় এবং এর চেয়েও বেশি উত্তপ্ত করার মাধ্যমে এর মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও ক্যালসিয়ামকে আলাদা করা যায়, যা দহন ক্ষমতাসম্পন্ন। এর দ্বারা বোঝা গেল, আলোচ্য আয়াতে পাথরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের কথা বলা দ্বারা জাহান্নামের অগ্নির তীব্র উত্তাপের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٢٥. ﴿وَبَشِّرْ﴾ أَخْبِرْ ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ صَدَّقُوْا بِاللّٰهِ ﴿وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ مِنَ الْفُرُوْضِ وَالنَّوَافِلِ ﴿أَنَّ﴾ أَيْ بِأَنَّ ﴿لَهُمْ جَنّٰتٍ﴾ حَدَائِقَ ذَاتِ أَشْجَارٍ وَمَسَاكِنَ ﴿تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا﴾ أَيْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا وَقُصُوْرِهَا ﴿الْأَنْهَارُ﴾ أَيْ الْمِيَاهُ فِيْهَا وَالنَّهْرُ الْمَوْضِعُ الَّذِيْ يَجْرِيْ فِيْهِ الْمَاءُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْهَرُهُ أَيْ يَحْفِرُهُ وَإِسْنَادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مَجَازٌ ﴿كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا﴾ أُطْعِمُوْا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ﴾ أَيْ مِثْلُ مَا ﴿رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أَيْ قَبْلِهِ فِي الْجَنَّةِ لِتَشَابُهِ ثِمَارِهَا بِقَرِيْنَةِ ﴿وَاُتُوْا بِهٖ﴾ أَيْ جِيْئُوْا بِالرِّزْقِ ﴿مُتَشَابِهًا﴾ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا ﴿وَّلَهُمْ فِيْهَآ أَزْوَاجٌ﴾ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا ﴿مُّطَهَّرَةٌ﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذَرٍ ﴿وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ مَاكِثُوْنَ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُوْنَ.

২৫. আর সুসংবাদ দাও খবর দাও তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে যেমন- ফরজ, নফল সব ধরনের সৎকর্ম أَنَّ এ শব্দটি এস্থানে মূলত بِأَنَّ অর্থে ব্যবহৃত যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত বৃক্ষরাজি সুশোভিত উদ্যানসমূহ ও প্রাসাদসমূহ যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ, তারা প্রাসাদসমূহ ও বৃক্ষরাজির তলদেশে নদী অর্থাৎ, তার বারিরাশি। যে স্থান দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় সেই স্থানটিকে 'নহর' বলে। কারণ, পানি এই স্থানটিকে 'নহর' করে অর্থাৎ, খুঁড়ে ফেলে। এখানে প্রবাহিত হওয়া ক্রিয়ার সম্বন্ধ নহরের দিকে রূপকার্থে করা হয়েছে। (কেননা মূলত প্রবাহিত হয় পানি, নহর নয়।)
যখনই তাদেরকে জীবকা দেওয়া হবে তা হতে অর্থাৎ, সেই উদ্যানরাজি থেকে আহার করতে দেওয়া হবে, খাবার হিসেবে ফলমূল, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে ইতঃপূর্বে জান্নাতে জীবিকারূপে যা দেওয়া হয়েছে তা তো এটাই অর্থাৎ, এরই অনুরূপ। কেননা, বেহেশত-উদ্যানের ফলসমূহ দেখতে একটি আরেকটির ন্যায় হবে। বস্তুত তাদের দেওয়া হবে অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকারূপে প্রদান করা হবে একই ধরনের ফল এগুলোর রঙ হবে একটি আরেকটির মতো, তবে স্বাদ হবে ভিন্ন এবং সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্রা সঙ্গিনী যারা ঋতুস্রাব এবং সকল প্রকার আবিলতা থেকে মুক্ত হুর প্রভৃতি; তারা সেখানে স্থায়ী হবে সর্বদা তারা সেখানে অবস্থান করবে। তাদের বিনাশ হবে না এবং কখনো বের হতেও হবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَبَشِّرْ. أَخْبِرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

بشر-এর অর্থ : মুফাসসির (র.) أَخْبِر শব্দ দ্বারা بَشِّرْ-এর তাফসীর করে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে শব্দটি সাধারণ সংবাদ প্রদানের অর্থে এসেছে।

قَوْلُهٗ : أَنْ. اَيْ بِأَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ

بشر-এর সেলা উহ্য রয়েছে : أن-এর ব্যাখ্যায় بِاَن বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَشِّر-এর ফে'লের পর যে বস্তুর সংবাদ দেওয়া হয়, তা উহ্য হরফে জারের সাথে হয়। ب-কে হজফ করা জায়েজ আছে, যেহেতু ب হরফ হজফ হয়ে গেছে, তাই فِعْل-এর আমল সরাসরি হয়ে গেছে। সুতরাং اَنْ তার পরবর্তী বাক্য بَشِّر-এর মাফ'উল হওয়ায় মানসূবের স্থানে রয়েছে।

قَوْلُهٗ : تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَيْ تَحْتِ اَشْجَارِهَا وَقُصُوْرِهَا

এখানে تَحْتِهَا-এর পরে اَشْجَارُهَا وَقُصُوْرُهَا লিখে গ্রন্থকার জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) একটি সন্দেহ নিরসন করতে চাচ্ছেন যে, ইবারতটিতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, জান্নাতে বৃক্ষরাজিও বালাখানাসমূহের পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হওয়া উদ্দেশ্য। কারণ, বাগানের নীচ দিকে পানি প্রবাহিত হওয়া এতো সুন্দর নয়, যতটুকু বাগানের পাশ দিয়ে, গাছগাছলির মাঝে দিয়ে প্রবাহিত হলে সুন্দর দেখা যায়।

قَوْلُهٗ : اَلْاَنْهَارُ أي الْمِيَاهُ فِيْهَا

تَجْرِيْ-এর ইসনাদটি মাজাযী : اَلْاَنْهَار-এর পরে اَلْمِيَاه ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, اَلْأَنْهَارُ ও تَجْرِيْ শব্দদ্বয়ের মাঝে ইসনাদটি মাজাযে আকলীর ভিত্তিতে হয়েছে। কারণ, নদী প্রবাহিত হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পানি প্রবাতি হয়, নদী দিয়ে পানি চলে যায়। নদী স্ব-স্থানে বয়ে যায়। অথবা বলা যায় যে, এখানে مَجَاز فِى الظَّرْفِ হয়েছে, অর্থাৎ مَحَلٌّ বলে حَالٌّ উদ্দেশ্য। অথবা বলা যায় যে, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। তখন ইবারটি হবে ماء النَّهَار ..... تَجْرِيْ নদীকে نَهْر নামকরণের কারণ হিসেবে বলেছেন যে, মূলত نَهْر অর্থ- খনন করা। যেহেতু পানি অনবরত প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা কাঁচা মাটির মধ্যে গর্ত হতেই থাকে, তাই নদীকে نَهْر বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا . اُطْعِمُوْا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) مِنْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ বলেছেন, যাতে مِنْهَا-এর মধ্যে مِنْ ইবতেদাইয়্যা হওয়া বোঝা যায়। مِنْهَا ও مِنْ ثَمَرَةٍ উভয় হরফে জার رُزِقُوْا-এর সঙ্গে متعلق; তবে প্রথমটি مُطْلَق আর দ্বিতীয়টি مُقَيَّد হওয়াতে একই ফে'লের সঙ্গে একই অর্থে اِتِّحَاد تَعَلق হওয়ার কথা বলা যাবে না।

قَوْلُهٗ : هٰذَا الَّذِيْ أيْ مِثْلُ مَا

ইসমে ইশারা প্রয়োগের উদ্দেশ্য : هٰذَا الَّذِيْ-এর পরে اَىْ مِثْلُ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, هٰذَا শব্দ দ্বারা উভয় খাবার হুবহু এক হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। মুফাসসির (র.) مثل উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য হলো সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া।

قَوْلُهٗ : رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَهٗ

আয়াতাংশের قَبْل দ্বারা উদ্দেশ্য : জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) اَىْ قَبْلَهٗ فِى الْجَنَّةِ দ্বারা এটা বলতে চান যে, قَبْلِيَّة দ্বারা উদ্দেশ্য قَبْلِيَّة فى الْجَنَّةِ দুনিয়াবি কাবলিয়্যাত উদ্দেশ্য নয়। তবে অন্যান্য মুফাসসিরগণের রায় مطلق রাখার পক্ষে। চাই বেহেশতের পূর্বে দুনিয়াতে হওয়া উদ্দেশ্য হোক কিংবা স্বয়ং বেহেশতে হোক। মুফাসসির (র.) নিজ দলিলে যে নিদর্শন وَأُتُوْا بِهٖ শব্দ দ্বারা পেশ করেছেন। এটাই 'সাধারণ কিংবা ব্যাপক' দাবিকারীগণের দলিল হতে পারে।

قَوْلُهٗ : وَأُتُوْا بِهٖ ..... يُشْبِهُ بَعْضُهٗ بَعْضًا

জান্নাতি খাবারের বৈশিষ্ট্য : মুফাসসির (র.) وَأُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর তাফসীর يُشْبِهُ بَعْضُهٗ بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا (রঙের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও স্বাদের দিক থেকে ভিন্ন হবে) দ্বারা একথা বুঝিয়েছেন যে, জান্নাতের কোনো কোনো ফলের রং একই রকম মনে হলেও স্বাদ হবে ভিন্ন ভিন্ন। আর জান্নাতের খাবারেরও বৈশিষ্ট্য এমনটাই।

قَوْلُهٗ : وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا

ازواج দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) ازواج শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا দ্বারা, যার দ্বারা বোঝা যায়, যে, তিনি اَلْحُوْرُ وَغَيْرُهَا বলে জান্নাতের হুর ও দুনিয়ার স্ত্রী উভয়কে উদ্দেশ্য করেছেন। হাসান বসরী (র.) বলেন, اَزْوَاج দ্বারা দুনিয়ার স্ত্রী উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ . مَاكِثُوْنَ اَبَدًا

জান্নাতে সর্বদা অবস্থান করবে : মুফাসসির (র.) خَالِدُوْنَ-এর তাফসির করেছেন- مَاكِثُوْنَ اَبَدًا; কারণ, এখানে خُلُوْد দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বদা, সব সময়। সাময়িক বা দীর্ঘ সময় উদ্দেশ্য নয়। خُلُوْد শব্দের অর্থ- দীর্ঘ সময় অবস্থান করা স্থায়ী হোক বা না হোক। এজন্যে কখনো কখনো خَالِدُوْن-এরপর اَبَدًا ব্যবহার করা হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

بَشِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر معروف বহছ أمر حاضر বাব تفعيل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ সুসংবাদ প্রদান করুন। এর মূল শব্দ হলো اَلْبِشَارَةُ; بِشَارَة হলো এমন বিশেষ সংবাদ যা শ্রোতাকে আনন্দ ও সুখ দেয়। আনন্দদায়ক সংবাদকে بَشَارَة বলার কারণ হলো, সে সুসংবাদের প্রভাবটি بَشَرَة তথা চেহারায় প্রকাশ পায়। সুসংবাদের ফলশ্রুতিতে শ্রোতার মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ই'রাবুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- اَلْبِشَارَةُ : اَلْخَبَرُ الْاَوَّلُ السَّار الَّذِيْ يَظْهَرُ بِهٖ اَثَرُ السُّرُوْرِ فِى الْبَشَرَةِ; تبشير-এর বিপরীত শব্দ হলো انذار; কখনো দুঃসংবাদের ক্ষেত্রেও تَبْشِيْر শব্দ ব্যবহৃত হয়।

جَنّٰتٍ : শব্দটি বহুবচন। এর মূলবর্ণ (ج . ن . ن) যেখানেই হবে তার মধ্যে গোপনের অর্থ অবশ্যই থাকবে। জিনকে মানুষ চোখে দেখতে পায় না। তাই তাকে جِنّ বলা হয়। جُنَّة হলো ঢাল যা শত্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে যোদ্ধাকে গোপন করে। جَنَان কলব, অন্তর। পাগলকে مَجْنُوْن বলা হয়, যেহেতু তার জ্ঞান গোপন থাকে। বাচ্চা পেটের মধ্যে লুকানো থাকে বিধায় মায়ের পেটের বাচ্চাকে جَنِيْن বলা হয়। বেহেশতের নিয়ামত দুনিয়াতে লুকানো বিধায় جَنَّة বলা হয়। যেমন, ইরশাদ হয়েছে فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

بَشِّرْ ফে'ল বা-ফায়েল اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জুমলা হয়ে মাফ'উল, جَنّٰت মাওসূফ, تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ জুমলা হয়ে সিফাতে اول মিলে اَنْ-এর ইসম এবং لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম, জুমলা بِاَنْ মুকাদ্দাম ফে'ল بَشِّرِ-এর সঙ্গে متعلق হয়েছে। كُلَّمَا رُزِقُوْا الخ জুমলায়ে শর্তিয়া দ্বিতীয় সিফাত কিংবা মুবতাদায়ে মাহযূফের খবর অথবা জুমলায়ে মুস্তানিফা وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا জুমলায়ে مُعْتَرِضَة, اَزْوَاج মাওসূফ। مُطَهَّرَة সিফাত মিলে মুবতাদা, لَهُمْ খবরে مُقَدم জুমলায়ে مستأنفة হয়েছে। هُمْ মুবতাদা خَالِدُوْنَ খবর, فِيْهَا মুতা'আল্লিক হয়েছে خَالِدُوْنَ-এর সাথে, সব মিলে জুমলায়ে مستأنفة কিংবা لَهُمْ থেকে حال;

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا

يُشْبِهُ শব্দের ভিন্নতা : এ শব্দটিতে প্রচলিত নুসখা ও মুহাক্কাক নুসখাতে ভিন্নতা রয়েছে। যথা–

ক. প্রচলিত নুসখাতে শব্দটি يُشْبَهُ রয়েছে।

খ. মুহাক্কাক নুসখাতে يُشْبِهُ রয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

পূর্বের আয়াতে অস্বীকারকারীদের জন্যে দোযখের ভীতিপ্রদর্শনের বর্ণনা ছিল। উক্ত আয়াতে স্বীকারকারীদের জন্যে বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যাতে بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ-এর রীতি দ্বারা কথায় উভয়দিক পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের সাধারণ রীতি এই যে, কুরআনে তারগীব ও তারহীব উভয়টিকে সমপর্যায়ে রাখা হয়। যাতে আল্লাহর জালালী ও জামালী উভয় শান প্রকাশ হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ : এ জগতে যে পরিমাণ ভালো ও মন্দ অথবা নিয়ামত ও মসিবত রয়েছে– সবই একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত। একটি জিনিস এক হিসেবে ভালো, অন্য হিসেবে সেটাই মন্দ হয়। অথবা যে বস্তুটি এক হিসেবে মন্দ ও বিপদের কারণ, সে বস্তুটিই অন্য হিসেবে নিয়ামত স্বরূপ ও ভালো মনে হয়। কোনো বস্তু নিজ সত্তার দিক দিয়ে একেবারে শুধু ভালোও না এবং একেবারে শুধু মন্দও না।

তাই অতীব জরুরি যে, এগুলোর জন্যে এমন কিছু উৎস থাকা সেখানে ভালোই থাকবে। ওখানে মন্দের নাম-নিশানাও যেন না থাকে। এমনইভাবে যেখানে মন্দ-থাকবে, সেখানে ভালো যেন কখনো না থাকে। এই দুটি স্থানকে শরিয়তের পরিভাষায় জান্নাত ও জাহান্নাম বলা হয়। জান্নাতের সকল সুস্বাদু, শান্তি নিয়ামতের সমাপ্তি হবে।

হাদীসে وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ এবং আয়াতে কারীমা مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ জীবনযাত্রার যাবতীয় সামগ্রীর সংবাদ দিচ্ছে। এ আয়াতে পানাহারের স্বাদ, বাগান, আনন্দ এবং সুন্দরী, রমণী-স্ত্রীগণের মহাসমাগমের সুসংবাদ শোনোনো হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের ফল-ফলাদি থাকবে, যেগুলোর রং একই হবে, দেখে সন্দেহ হবে যে, ইতঃপূর্বে এখানে কিংবা দুনিয়াতে আমরা এসব খেয়েছি। কিন্তু ইহজগতে খাওয়ার পর যখন নতুন জগত সামনে আসবে, তখন স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর জাহান্নামে সকল কঠোরতা ও বিপদের সমাপ্তি ঘটবে। এ জগতের মূল ও আকৃতির স্থায়িত্ব নেই এবং এগুলো ঘটমান ও নতুন হওয়ার কারণে পরিবর্তন ও ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু ঐ চিরস্থায়ী জগতের প্রতিটি বস্তু স্থায়ী। সে জগতকে এ জগতের উপর অনুমান করাটা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ হবে।

জান্নাতে পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছান্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয়, যাতে যে কোনো মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে; বরং জান্নাতবাসিগণ অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এ অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করতঃ বিমল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্যে ঈমানের সাথে সাথে কাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না; যদিও কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোজখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মুমিন যত পাপীই হোক না কেন, কোনো না কোনো কালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহিত লাভের অধিকারী হতে পারবে না। [রূহুল বয়ান]

مُتَشَابِهًا-এর একটি পদ্ধতি তো এটা যে, স্বাদ ও আকৃতি একই হবে। এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যের হলো রং একই রকম এবং স্বাদ বিপরীতমুখী হওয়া। مُطَهَّرَة-কে ব্যাপক রাখা উত্তম, অর্থাৎ, সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও নাপাকী থেকে, চাই প্রকাশ্য পবিত্রতা হোক কিংবা অসৎ চরিত্রসমূহ থেকে পবিত্র হওয়া হোক। কেননা উভয়টিই দোষের মধ্যে গণ্য।

٢٦. وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُوْدِ لَمَّا ضَرَبَ اللّٰهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِيْ قَوْلِه ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا﴾ وَالْعَنْكَبُوتِ فِيْ قَوْلِهٖ ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ﴾ مَا أَرَادَ اللّٰهُ بِذِكْرِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَسِيْسَةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَضْرِبَ﴾ يَجْعَلَ ﴿مَثَلًا﴾ مَفْعُوْلٌ أَوَّلٌ ﴿مَا﴾ نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ بِمَا بَعْدَهَا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ أَيْ أَيَّ مَثَلٍ كَانَ أَوْ زَائِدَةٌ لِتَأْكِيْدِ الْخِسَّةِ فَمَا بَعْدَهَا الْمَفْعُوْلُ الثَّانِيْ ﴿بَعُوضَةً﴾ مُفْرَدُ الْبَعُوْضِ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ أَيْ أَكْبَرَ مِنْهَا أَيْ لَا يَتْرُكُ بَيَانَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْحِكَمِ ﴿فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ﴾ أَيِ الْمَثَلُ ﴿الْحَقُّ﴾ الثَّابِتُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ ﴿مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا﴾ أَيْ بِهٰذَا الْمَثَلِ وَمَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ مُبْتَدَأٌ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِيْ بِصِلَتِهٖ خَبَرُهُ أَيْ أَيَّ فَائِدَةٍ فِيْهِ قَالَ تَعَالٰى فِيْ جَوَابِهِمْ ﴿يُضِلُّ بِهٖ﴾ أَيْ بِهٰذَا الْمَثَلِ ﴿كَثِيْرًا﴾ عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمْ بِهٖ ﴿وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِتَصْدِيْقِهِمْ بِهٖ ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾ الْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهٖ.

২৬. যখন আল্লাহ তা'আলা وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا (তাদের প্রতিমাদের নিকট হতে মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায়) আয়াতে মাছি দ্বারা এবং মাকড়সার সাথে كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ বলে মাকড়সা দ্বারা উপমা দিয়েছেন তখন ইহুদিরা বলত, এ ধরনের হীন বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কী বুঝাতে চাচ্ছেন? তাদের প্রতি উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না مَثَلًا শব্দটি يَضْرِب-এর প্রথম মাফউল। مَا শব্দটি نَكِرَة (অনির্দিষ্টবাচক)। তা তৎপরবর্তী (بَعُوْضَةً فَمَافَوْقَهَا)-এর সাথে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় মাফ'উল হয়েছে। অথবা مَا শব্দটি زَائِدَة (অতিরিক্ত)। বস্তুটির তুচ্ছতার تَاكِيْد বুঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী অংশটুকু দ্বিতীয় মাফ'উল হবে মশা بَعُوْضَة শব্দটি بَعُوْض-এর একবচন; ছোট কীট। অথবা তার চেয়ে বড় কিছু দ্বারা। অর্থাৎ তার চেয়ে বড়। তিনি তা বর্ণনা করা বর্জন করতেন না হেকমতের কারণে। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, এটা অর্থাৎ এ উপমা সত্য, অর্থাৎ সঠিক ও যথার্থ স্থানে ব্যবহৃত তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। কিন্তু যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা বলে যে, এ উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন? تَمْيِيْز শব্দটি مَثَلًا; অর্থাৎ, بِهٰذَا الْمَثَلُ مَاذَا-এর مَا শব্দটি اِسْتِفْهَام انْكَار (প্রত্যাখ্যানসূচক প্রশ্নবোধক)। এটা মুবতাদা হয়েছে। আর ذا শব্দটি الذى সমার্থক। এটা তার صلة-এর সাথে যুক্ত হয়ে খবর হবে। অর্থাৎ এতে কী উপকারিতা রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেন, এটা এ উপমা দ্বারা এতদ্বিষয় অস্বীকার করার কারণে অনেককেই তিনি পথভ্রষ্ট করেন সত্য থেকে আবার বহু লোককে অর্থাৎ মুমিনদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে। বস্তুত তিনি পাপাচারীগণ ব্যতীত আর কাউকেও পথচ্যুত করেন না। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে।

٢٧. ﴿الَّذِيْنَ﴾ نَعْتٌ ﴿يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ﴾ مَا عَهِدَهُ إِلَيْهِمْ فِي الْكُتُبِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ﴿مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ﴾ تَوْكِيْدِهٖ عَلَيْهِمْ ﴿وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ﴾

২৭. যারা الَّذِيْنَ শব্দটি (পূর্বের الْفَاسِقِيْنَ-এর) সিফাত; ভঙ্গ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার। মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনার বিষয়ে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরও জোরদার করার পরও এবং ছিন্ন করে যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন,

مِنَ الْإِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ وَالرَّحِمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَأَنْ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِ بِهٖ ﴿وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ بِالْمَعَاصِيْ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْإِيمَانِ ﴿أُولٰئِكَ﴾ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ ﴿هُمُ الْخَاسِرُوْنَ﴾ لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি। এস্থানে أَنْ يُوْصِلَ শব্দটি পূর্ববর্তী بِهٖ-এর যমীর থেকে بَدَلْ হয়েছে। এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় পাপকর্ম করে ও ঈমান হতে বাধা প্রদানের মাধ্যমে তারাই উল্লিখিত বিশেষণে অভিযুক্তরাই ক্ষতিগ্রস্ত চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনের দিকে প্রত্যার্পিত হওয়ায়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّضْرِبَ. يَجْعَلَ ..... فَمَا فَوقَهَا

'লজ্জা'-এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করার ব্যাখ্যা : حَيَاء-এর পরিচয় তাফসীরে খাযেনের এভাবে রয়েছে-

اَلْحَيَاءُ تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِى الْاِنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُهٗ وَيُذَمُّ عَلَيْهِ.

কেউ কেউ বলেন লজ্জা হলো- اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبَائِحِ

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে حَيَاء শব্দটি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই মুফাসসির (র.) لَا يَسْتَحْيِي-এর তাফসীর করেছেন لَا يَتْرُكُ بَيَانَه দ্বারা। অর্থাৎ, আয়াতে مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কারণ, লজ্জার ফলাফল হলো, কাজটি বর্জন করা। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠ ৩]

মুফাসসির (র.) اَنْ يَّضْرِبَ-এর তাফসীর করেছেন يَجْعَل দ্বারা, এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, يَضْرِب ফে'লটি দুই মাফউলের দিকে مُتَعَدِّى হয়েছে। ১. مَثَلًا ২. مَا بَعُوْضَةً; দ্বিতীয় মাফ'উলটির ক্ষেত্রে مَا শব্দটিতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. نَكِرة مَوْصُوْفَة; তখন উহ্য ইবারত হবে- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّجْعَلَ مَثَلًا شَيْئًا مَوْصُوْفًا لِكَوْنِهٖ بَعُوْضَةً; ২. ما-টি অতিরিক্ত, তখন উহ্য ইবারত হবে- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّجْعَلَ مَثَلًا بَعُوْضَةً; কিন্তু এখানে مَا-টি অতিরিক্ত হলেও তাকীদের জন্যে ব্যবহার হয়েছে। কারণ কুরআনের কোনো কিছু ফায়েদা বিহীন নয়। মুফাসসির (র.) তাই বলেছেন।

قَوْلُهٗ: فَمَا فَوْقَهَا. أَيْ أَكْبَرَ مِنْهَا

মুফাসরি (র.) أَكْبَرُ مِنْهَا বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে দৈহিক ক্ষেত্রে বড় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, فَمَا فَوْقَهَا فِيْ الْجُثَّةِ لَا فِى الصِّغَرِ وَالْحَقَارَةِ; অবশ্য لَا দ্বারা ক্ষুদ্রতা ও লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে আধিক্যও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, فَمَا فَوْقَهَا فِيْ الْجُثَّةِ لَا فِى الصِّغَرِ وَالْحَقَارَةِ; কেউ কেউ বলেন, এই দ্বিতীয় তাফসীরটিই মুহাক্কিক আলেমগণ গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া মুফাসসির (র.)-এর তাফসীরটিকে এই দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। [হাশিয়ায়ে জলালাইন : হাশিয়া ১০, পৃষ্ঠা ৭]

قَوْلُهٗ: مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا. تَمْيِيْزٌ اَيْ بِهٰذَا الْمَثَلِ .....

مَثَلًا শব্দের তারকীবী অবস্থা নির্ণয় : মুফাসসির (র.) بِهٰذَا مَثَلًا-এরপর تَمْيِيْز শব্দ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَثَلًا শব্দটি তারকীবে تَمْيِيْز হয়েছে, حَال নয়। যেমন- কনো কোনো মুফাসসির مثلا-কে حَال বলেছেন। অথচ حَال হিসেবে তারকীব করা দুর্বল, কারণ, اِسْم جَامد-এর হাল হওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। পক্ষান্তরে اِسْم جَامد তমীয হওয়াতে কোনো মতানৈক্য নেই। হ্যাঁ, একটি প্রশ্ন হতে পারে আর তা হলো যে, তমীয হতে হয় নিসবত থেকে। অথচ بِهٰذَا مَثَلًا-এ মধ্যে কোনো ধরনের নিসবত নেই। মুফাসসির (র.) এর উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, اَىْ بِهٰذَا الْمَثَل; এতে নিসবত বিদ্যমান রয়েছে।

مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ-এর مَا প্রসঙ্গে মুফাসসির (র.) বলেছেন- اِسْتِفْهَام اِنْكَار অর্থাৎ, ما-টি এখানে اِسْتِفْهَام اِنْكَارى-এর জন্যে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, মৌলিকভাবে উপমা দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা করা নিন্দনীয় নয়। অথচ এখানে উপমার নিন্দা করা হয়েছে। এর উত্তরে মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে প্রশ্নটা এজন্যে নয় যে, উপমার হেকমত জানতে চাওয়া উদ্দেশ্য; বরং উপমাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য ছিল।

قَوْلُهٗ : وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ . اَلْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهٖ

পরিপূর্ণ ফাসেক উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) اَلْفَاسِقِيْنَ-এর তাফসীর করেছেন اَلْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهٖ দ্বারা। এর উদ্দেশ্য হলো, এখানে ফাসেক দ্বারা ফাসেকে কামেল তথা মুশরিক-কাফের উদ্দেশ্য তা বোঝানো, মুমিন-ফাসেক উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ শব্দটি এখানে তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে, পারিভাষিক বা শরয়ী-অর্থে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ আয়াতে মুনাফেককে ফাসেক বলেছেন অথচ মুনাফেক সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে খারেজ।

قَوْلُهٗ : مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ اَىْ تَوْكِيْدِهٖ عَلَيْهِمْ

আয়াতে 'অঙ্গীকার' বোধক দুটি ভিন্ন শব্দ নেওয়ার কারণ : تَوْكِيْدِهٖ عَلَيْهِمْ এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হলো, يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ এ আয়াতে عَهْد এবং مِيْثَاق শব্দ দুটির অর্থ একই। তাতে অর্থ দাঁড়ায়, তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকারের পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। বলাবহুল্য, এ কথার কোনো মর্ম হয় না। প্রশ্নটি হলো, এখানে সমার্থবোধক দুটি শব্দ একত্রে নেওয়ার কারণ কী?

এর উত্তরে মুফাসসির (র.) تَوْكِيْدِهٖ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে مِيْثَاق অর্থ তাকিদ এবং দৃঢ়তা। অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকারকে দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে দেয়। এ অর্থটিই সঠিক ও যথার্থ। এ প্রসঙ্গে হাশিয়াতুল জামালে উল্লেখ রয়েছে–

وَالْمِيْثَاقُ اِسْمٌ لِمَا تَقَعُ بِهِ الْوَثَاقَةُ وَهِىَ الْاَحْكَامُ وَالْمُرَادُ بِهٖ مَا وَثَّقَ اللّٰهُ بِهٖ أَىْ قَوِىَ بِهٖ عَهْدُهٗ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْكُتُبِ وْ مَا وَثَّقُوْهُ بِهٖ مِنَ الْاِلْتِزَامِ وَالْقَبُوْلِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُوْنَ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ . (حاشية الجمل)

قَوْلُهٗ : مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ مِنَ الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ

مَا-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা : এ অংশটুকু بَيَان (বিবরণ)। অর্থাৎ, তারা ঐ বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে, যেটা জুড়ে দেওয়ার হুকুম করা হয়েছিল। আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা।

قَوْلُه : وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ . بِالْمَعَاصِىْ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْاِيْمَانِ

প্রকাশ্য ও গোপনীয় ফ্যাসাদ উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) ..... وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ আয়াতের তাফসীর করেছেন بِالْمَعَاصِىْ وَالتَّعْوِيْقِ দ্বারা, এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, بِالْمَعَاصِى দ্বারা প্রকাশ্য ফ্যাসাদ অর্থাৎ, কারো উপর জুলুম করা, হক নষ্ট করা, অরাজকতা সৃষ্টি করা, আর اَلتَّعْوِيْقِ দ্বারা গোপনে ফ্যাসাদ অর্থাৎ, ঈমান না এনে সর্বদা রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা।

قَوْلُهٗ : اُولٰئِكَ . اَلْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ . هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .....

أُولٰئِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) أُولٰئِكَ-এর পর اَلْمَوْصُوْفُوْنَ উল্লেখ করে اِسْم اِشَارَه-এর مُشَار اِلَيْه নির্দিষ্ট করেছেন, الْخٰسِرُوْنَ -এর তাফসীর ..... لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ করে ক্ষতির কারণ বর্ণনা করেছেন। [হাশিয়াতুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

- **يَضْرِبُ** : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার اَلضَّرْبُ মূলবর্ণ (ض . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি উদাহরণ পেশ করেন।
  ضَرْبُ الْخَاتِمِ . ضَرْبُ اللَّبِنِ . ضَرْبُ الْمَثَلِ আরবিতে এ প্রবাদ বাক্যগুলো সচরাচর বলা হয়ে থাকে। এর মূল হচ্ছে একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর উপর সংঘটিত করা।
- **بَعُوْضَةً** : بَعُوْضَة নির্গত হয়েছে بعض থেকে, যার অর্থ হচ্ছে قطع; এটা মূলত فعول-এর ওজনে قطوع সিফাতের অর্থে ছিল। পরবর্তীতে এর মধ্যে اسمية গালেব হয়ে যায় এতে تاء ওয়াহদাতের অর্থের জন্যে রয়েছে।
- **فَاسِقِيْنَ** : শব্দটি বহুবচন, মূলবর্ণ (ف . س . ق) জিনস صحيح; فِسْق মূলত অর্থ– বের হওয়া। বলা হয়– فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قِشْرِهَا অর্থ– খেজুর নিজ খোসা থেকে বের হয়েছে। যেহেতু পাপীষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় তাই তাকে فَاسِق বলা হয়।
- **عَهِدَ** : সারক্ষণযোগ্য ও হেফাজতযোগ্য বস্তু। তাই আরববাসী تَارِيْخ . وَصِيَّة . قَسَم . مَكَان অর্থসমূহে عَهِدَ শব্দ ব্যবহার করে।
- **اَلْخَاسِرُوْنَ** : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سمع يسمع মাসদার اَلْخُسْرَانُ . اَلْخَسَارَةُ মূলবর্ণ (خ . س . ر) জিনস صحيح অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত। خَاسِرٌ বলা হয় সম্পদ, শরীর ও আকল এ তিনটির যে কোনো একটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে। এরা আকলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। خُسْر অর্থ– ত্রুটি, অপূর্ণতা। [হাশিয়াতুল জামাল]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً

اَنْ يَّضْرِبَ অংশটি مِنْ হরফুল যরের مَجْرُوْرٌ খলীল ও সীবওয়াই (র.)-এর দৃষ্টিতে مَا মানসূব এবহামিয়্যাহ অথবা অতিরিক্ত। بَعُوْض শব্দটি مَثَلًا-এর আতফের বয়ান।

مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ-এর মধ্যে مَا এস্তিফ্হামিয়া মুবতাদা এবং الَّذِىْ-এর সমার্থক ذَا সেলার সাথে মিলে খবর, مَثَلًا মানসূব হয়েছে তামযীয হিসেবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا

به-এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য مَثَلًا শব্দটি। অর্থাৎ এর দ্বারা এবং এ ধরনের অন্যান্য কুরআনি উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে গোমরাহ করেন এবং অনেককে হেদায়েতদান করেন। به-এর ب হরফটি سَبَبِيَّة বা 'কারণ' প্রকাশক। এখন কথা হলো এ জুমলাদ্বয়ের محل اعراب কী? কেউ বলেন, কোনো محل اعراب নেই। কেননা, উভয়টি পূর্বের أما দ্বারা শুরুকৃত বাক্যের বয়ান হয়েছে। কেউ বলেন, জুমলাদ্বয়ের محل اعراب হলো নসব। কেননা, তা مَثَلًا-এর সিফাত হয়েছে। اَىْ مَثَلًا يَفْتَرِقُ النَّاسِ بِهٖ إِلٰى ضَالِّيْنَ وَمُهْتَدِيْنَ; আল্লামা আবুল বাকা (র.) বলেন, اللّٰه শব্দ থেকে حال হওয়ারও অবকাশ আছে اَىْ مُضِلًا بِهٖ كَثِيْرًا وَهَادِيًا بِهٖ

اَلْفَاسِقِيْنَ শব্দটি ليضل-এর মাফ'উল এবং এটি مفرغ استثناء হয়েছে। ইমাম ফাররার মতে এটি استثناء হিসেবে মানসূব হতে পারে। তখন مستثنى منه উহ্য থাকবে। তাকদীরী ইবারত হবে- وَمَا يُضِلُّ بِهٖ أَحَدًا اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

[হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ

اَلَّذِيْنَ হলো اَلْفَاسِقِيْنَ-এর সিফাত বা বিশেষণ। এ হিসেবে এটি নসবের স্থলে হবে। কেননা الْفَاسِقِيْنَ শব্দটি يُضِلُّ-এর মাফ'উল হিসেবে নসবযুক্ত।

مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ اَنْ يُوْصَلَ বাক্যটি به-এর যমীর থেকে بدل হওয়ার কারণে مجرور হয়েছে। مَا থেকে بَدْل হয়ে مَنصوب হয়নি। يَنْقُضُوْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। ميْثَاقه-এর যমীর عَهْد-এর দিকেও ফিরতে পারে এবং اللّٰه শব্দের দিকেও ফিরতে পারে। প্রথম সুরতে এটি মাসদার হবে এবং মাফউলের দিকে اضافة হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে فاعل-এর দিকে اضافة হবে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَات : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً

পূর্বের আয়াতে পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কুরআনের সূরার অনুরূপ সূরা উপস্থাপন করার জন্যে। কাফেররা যখন তা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলো, তখন কুরআনের উপর বিভিন্ন অভিযোগ আনতে শুরু করল। তাই আল্লাহ তা'আলা এখান থেকে তাদের অভিযোগ খণ্ডন করছেন।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ ..... أُوْلٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

সূরা হজ ও সূরা আনকাবুতে মাছি ও মাকড়সার অবস্থা দ্বারা উদাহরণ পেশ করার কারণে ইহুদীরা বলেছিল, এটা আল্লাহর কালাম হতে পারে না। এসব তুচ্ছ প্রাণী দ্বারা উদাহরণ পেশ করার তাঁর কী প্রয়োজন হতে পারে। তখন এ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে সূরা বাকারার ২৬ ও ২৭ নং আয়াতদ্বয় নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ : اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً ..... وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

উপমার প্রকৃত অবস্থা : উপমার মধ্যে ঐ বস্তুর সাথে সম্পর্ক তালাশ করতে হবে, যে বস্তুর জন্যে এ উপমা। উপমা পেশকারীর সাথে উপমার সম্পর্ক থাকা জরুরি নয়। সুতরাং পবিত্র কুরআনে মূর্তিগুলোর অসহায় হওয়া এবং মূর্তিপূজা অথর্ব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্যে মাকড়সা ও তার বিস্তৃত করা জালের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সকল নবী (আ.) এবং সকল বিজ্ঞ ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদের কথাবার্তায় এ ধরনের উপমাসমূহে ভরপুর রয়েছে এবং اَنَّهُ الْحَقُّ-এর অর্থ এটাই, যার দিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। যেমনিভাবে اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর পরে فَيَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-এর পরে فَلَا يَعْلَمُوْنَ বলা উচিত ছিল। যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুদ্ধ হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা فَيَقُوْلُوْنَ বলেছেন, যাতে এর দ্বারা ওদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা প্রকাশ হয়ে যায়।

গোমরাহি নিজেদের কৃতকর্মের ফল : আয়াত নিজেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে, গোমরাহী শুধু তাদেরই ললাটের লিখন, যারা নিজেরাই গোমরাহ থাকতে চায়। নিজের থেকে আল্লাহ তা'আলা কারো উপর গোমরাহী চাপিয়ে দেন না। অব্যাহতভাবে স্বেচ্ছাকৃত অব্যাধ্যতার পরিণতিতে অন্তরের আলো নিভে যায় এবং স্বভাব থেকে সত্যের অনুসন্ধিৎসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি বিপথগামী হয়ে তাতে মিথ্যা ও অসত্য জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং কুফরির পর্যায়ে গিয়ে তার পরিণতি ঘটে। [তাফসীরে মাজেদী]

فَاسِق শব্দের বিশ্লেষণ ও তার স্তরসমূহ : فَاسِق তাকে বলা হয়, আনুগত্যের সীমা থেকে যে বের হয়ে যায়। আয়াতে মুনাফিক ও কাফেরকে ফাসেক বলার কারণ হলো, এরা আল্লাহর অনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে। [ইবনে জারীর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী] উল্লেখ্য, ফাসেকের তিনটি স্তর রয়েছে–

১. কখনো কখনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় তবে তা খারাপ ও গুনাহ মনে করেই। এ শ্রেণিকে تَغَابِى বলা হয়।
২. বেপরোয়াভাবে তাতে মগ্ন হয়। এ শ্রেণিকে اِنْهِمَاك বলা হয়।
৩. হঠকারিতার সাথে কাজটি সঠিক মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। এ শ্রেণিকে جحود বলা হয়। এদেরকে কাফেরও বলা হয়। এ স্তরের ফাসেক হলো কাফের।

আয়াতে এ তৃতীয় স্তরের শাসকদের কথাই বলা হচ্ছে। যেমন জালালাইনে উল্লেখ আছে– এখানে فَاسِق দ্বারা فَاسِق كَامِل উদ্দেশ্য। আর فَاسِق كَامِل হলো, কাফের মুশরিকরা। গুনাহগার মুমিন ফাসেকে কামেল নয়। অর্থাৎ এখানে فسق-এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য; পরিভাষিক অর্থ নয়। যেমন কুরআনের অপর আয়াত اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এর মাঝে মুনাফিককে ফাসেক বলা হয়েছে। কেননা, মুনাফিকরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ

আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি : প্রতিশ্রুতি দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক নেওয়া যায়। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ-এর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাও এসে যাবে এবং অতীতের পয়গাম্বরগণ (আ.) থেকে যে অঙ্গীকার রাসূল ﷺ-কে সমর্থন ও সাহায্যের ব্যাপারে নেওয়া হয়েছিল তাও অন্তর্ভুক্ত। অথবা পরস্পর বান্দাদের মধ্যে চাই শরীয়া হোক, যেমন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি, কিংবা ব্যক্তিগত হোক, যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, ঋণ ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাঝে যে চুক্তি হয়।

সম্বোধিত ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের অনুসন্ধানী হয়, তবে উত্তর জ্ঞানীসুলভ হলে উপকারী হয়। কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি যদি গোঁয়াড়-হিংসুটে ও দুষ্ট হয়, তবে তার জন্যে জ্ঞানীসুলভ উত্তর উপকারী হয় না। এ স্থানেও সম্বোধন এ ধরনের লোকদের প্রতিই হয়েছে। উত্তরে তিক্ততা বোঝানোর জন্যে ক্ষতির দিকটিকে উপকারের দিকের পূর্বে আনা হয়েছে। যাতে স্থানটির অপছন্দনীয়তা প্রকাশ হয়ে যায়।

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহের ব্যাখ্যা : মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতে বর্ণিত عهد-এর বিভিন্ন মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

১. عَهْد মানে ঐ সমস্ত অসিয়ত যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার জন্যে নবীগণের মাধ্যমে মাখলুকের সাথে করেছেন।
২. ঐ অঙ্গীকার যা তাওরাত কিতাবে আহলে কিতাবীদের থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, আখেরী জমানার নবীর আগমনের পর তাঁকে সত্য বলে মানা ও তাঁর নবুয়তে বিশ্বাসী হওয়া তোমাদের উপর আবশ্যক হবে।
৩. অঙ্গীকার বলতে اَلَسْتُ-এর অঙ্গীকার বা রুহ জগতের ঐ অঙ্গীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের হওয়ার পর সকল আদম সন্তান থেকে নেওয়া হয়েছে। যার আলোচনা নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে– وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ الخ। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বলতে অঙ্গীকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।
৪. বাদশাহ তাঁর অধীন এবং প্রজাদের প্রতি যে হুকুম জারি করেন, আরবি ভাষায় তাকে عَهْد শব্দে ব্যক্ত করা হয়। এখানে عَهْد এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার বলতে তার ঐ সমস্ত ফরমানকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর আলোকে তাবৎ মানবজাতি কেবল তাঁরই বন্দেগি করার প্রতি আদিষ্ট।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا يَسْتَحْيِىْ

মাজায : আলোচ্য শব্দটিতে মাজায হয়েছে। কারণ, এখানে مَلْزُوم দ্বারা لَازِم উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কেন لَازِم তথা لَا يَتْرُكُ না বলে ملزوم তথা لَا يَسْتَحْيِىْ বললেন? এর উত্তর হলো, সম্ভবত প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে حياء শব্দ ব্যবহার করেছিল, ফলে তার উত্তরও প্রশ্নের শব্দের সঙ্গে মিল রেখে দেওয়া হয়েছে। [তাফসীরে কাশশাফ]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ

ইস্তিয়ারায়ে মাকনিয়্যাহ : আলোচ্য অংশে عَهْد-কে حَبْل-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অতপর مشبه به-কে উহ্য রেখে তার لَازِم তথা نَقْض উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ইস্তিয়ারায়ে মাকনিয়্যাহ হয়েছে।

٢٨. ﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ﴾ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ﴿بِاللّٰهِ وَ﴾ وَقَدْ ﴿كُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ نُطَفًا فِي الْأَصْلَابِ ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ فِي الْأَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ. وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ أَوْ لِلتَّوْبِيْخِ ﴿ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ﴾ عِنْدَ انْتِهَاءِ آجَالِكُمْ ﴿ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ تُرَدُّوْنَ بَعْدَ الْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ.

২৮. হে মক্কাবাসীগণ, তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন। অর্থাৎ, পিতার পৃষ্ঠদেশে শুক্রাকারে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। মাতার গর্ভাশয়ে এবং তোমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন এই পৃথিবীতে। এ স্থানে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও তাদের কুফরির উপর বিস্ময় ও ভর্ৎসনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন নির্দিষ্ট বয়সসীমা শেষ হওয়ার পর। অতঃপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন, পুনরুত্থানের মাধ্যমে অতঃপর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে পুনরুত্থানের পর প্রত্যার্পিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন।

٢٩. وَقَالَ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلَى الْبَعْثِ لِمَا أَنْكَرُوْهُ ﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ أَيْ الْأَرْضِ وَمَا فِيْهَا ﴿جَمِيْعًا﴾ لِتَنْتَفِعُوْا بِهِ وَتَعْتَبِرُوْا ﴿ثُمَّ اسْتَوٰى﴾ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ أَيْ قَصَدَ ﴿إِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ﴾ الضَّمِيْرُ يَرْجِعُ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْآيِلَةِ إِلَيْهِ أَيْ صَيَّرَهَا كَمَا فِي آيَةٍ أُخْرٰى ﴿فَقَضَاهُنَّ﴾ ﴿سَبْعَ سَمٰوٰتٍ﴾، ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا أَفَلَا تَعْتَبِرُوْنَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى خَلْقِ ذٰلِكَ ابْتِدَاءً وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلٰى إِعَادَتِكُمْ.

২৯. এবং আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের প্রমাণস্বরূপ ইরশাদ করেন, যখন তারা তা অস্বীকার করেছে, তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু বিদ্যমান যাবতীয় সবকিছু। যেন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হতে পার এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তারপর পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দেন এবং তাকে বিন্যস্ত করলেন, هُنَّ সর্বনামটি এ স্থানে السَّمَاء দিকে ফিরবে। কারণ السَّمَاء শব্দটি ما يؤل হিসেবে বহুবচনের অর্থের মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, গঠন করলেন। যেমন- অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে فَقَضٰهُنَّ (অনন্তর তিনি তৈরি করলেন) সাত আসমানে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল বিষয়ে। এই বিষয়টি কি তোমরা লক্ষ্য কর না যে, তোমাদের অপেক্ষা বৃহৎ এই সকল কিছু যিনি শুরুতে সৃষ্টি করতে সক্ষম ও ক্ষমতাশীল, তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম?

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ بِاللّٰهِ وَ- قَدْ- كُنْتُمْ اَمْوَاتًا

আয়াতাংশে قد বৃদ্ধির কারণ : وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا-এর শুরুতে গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) قَدْ শব্দ প্রবিষ্ট করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فعل ماضى যখন حال হয়, তখন قد শব্দ আনা অত্যাবশ্যক। প্রকাশ্যভাবে হোক কিংবা গোপনভাবে হোক। এখানে শুরুর واو-টি حالية; আর كُنْتُمْ اَمْوَاتًا হলো تَكْفُرُوْنَ-এর যমীর থেকে حَال; এ কারণেই তাফসীরকার এই স্থানে قَدْ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। আরেকটি জবাব এটাও হতে পারে যে, قَدْ উহ্য থাকা ব্যতিরেকেও حال হওয়া সঠিক। কারণ এখানে শুধু كُنْتُمْ اَمْوَاتًا বাক্যটিই হাল নয়; বরং তার পরবর্তী বাক্য تُرْجَعُوْنَ পর্যন্ত জুমলা হয়ে حال হয়েছে। যেন বলা হয়েছে- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَقِصَّتُكُمْ هٰذِهٖ [জামালাইন]

মুফাসসির (র.) تَكْفُرُوْنَ দ্বারা মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। এজন্যে তিনি يَا اَهْلَ مَكَّةَ দ্বারা তাফসীর করেছেন, কিন্তু অন্যান্য মুফাসসির রূপক অর্থে মুমিন ও কাফের উভয় শ্রেণি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

মুফসসির (র.) اَمْوَاتًا-এর তাফসীর نُطَفًا فِى الْأَصْلَابِ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো যে, মৃত্যুর জন্যে প্রথমে জীবিত থাকতে হয়। আর প্রথম মৃত্যুর জন্যে কোনো জীবন নেই। এর উত্তর দিয়েছেন তিনি এভাবে যে, এখানে اَمْوَاتًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো نُطَفًا فِى الْاَصْلَابِ অর্থাৎ বীর্য, মৃত সদৃশ। নিম্নে হাশিয়াতুল জামালের ইবারত নকল করা হলো–

اَمْوَاتًا : لَا بُدَّ مِنَ التَّأْوِيْلِ عَلٰى مَا فَسَّرَهُ أَىْ وَكَانَتْ مَوَادُّ أَبْدَانِكُمْ أَوْ أَجْزَائِهَا أَمْوَاتًا وَالظَّاهِرُ الْحَمْلُ عَلَى التَّشْبِيْهِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى كُنْتُمْ كَالْاَمْوَاتِ. فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ كَيْفَ قِيْلَ اَمْوَاتًا فِى حَالِ كَوْنِهِمْ جَمَادًا اِنَّمَا يُقَالُ مَيِّتٌ فِيْمَا تَصِحُّ فِيْهِ الْحَيَاةُ. (حاشيةُ الْجَمَلْ : ٥١)

অর্থ اَمْوَاتًا -এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اَمْوَاتًا অংশের যে তাফসীর করেছেন, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, অর্থাৎ, তোমাদের দেহের উপাদান ও অংশগুলো ছিলো প্রাণহীন, স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ব্যাখ্যায় تشبيه তথা সাদৃশ্য প্রদানের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে; সুতরাং মূল অর্থ দাঁড়াবে, তোমরা ছিলে মৃতের ন্যায়, তখন আর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, "তারা জড়পদার্থ থাকা অবস্থায় কীভাবে তাদের মৃত বলা হলো? 'মৃত' তো শুধু সে-ক্ষেত্রেই বলা যায়, যেখানে মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বিদ্যমান বিদ্যমান ছিল।

[হাশিয়াতুল জামাল; পৃ: ৫১]

قَوْلُه : فَاَحْيَاكُمْ. فِى الْاَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ

মাতৃগর্ভ ও দুনিয়ার জীবনের ভিন্নতা : بِنَفْخِ الرُّوْحِ-এর تَعَلُّقْ শুধু اَلْاَرْحَامِ-এর সাথে; وَالدُّنْيَا بِنَفْخِ الرُّوْحِ-এর সাথে নয়। بِنَفْخِ الرُّوْحِ-এর بـ-টি مسببية-এর অর্থে। অর্থাৎ, মার্তৃগভে রুহ দেওয়া দ্বারা জীবন দেওয়া হয়। মুফাসসির (র.) মাতৃগর্ভ ও দুনিয়ার জীবনের মাঝে ধরনগত ভিন্নতার কারণে اَلدُّنْيَا শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَالتَّوْبِيْخِ

প্রশ্নের কারণ বর্ণনা : ..... كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ আয়াতে প্রশ্নটি বিস্ময় প্রকাশের জন্যে হতে পারে। আলোচ্য ইবারতের ক্ষেত্রে জালালাইনের নুসখাসমূহে পার্থক্য রয়েছে। কোনো নুসখায় রয়েছে– اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ উপমহাদেশে প্রচলিত হিন্দুস্তানী নুসখাতে প্রথমটি রয়েছে। সেক্ষেত্রে মুফাসসির (র.)-এর এই ইবারতের ব্যাখ্যা হবে, প্রত্যেক জ্ঞানীই এ অবস্থাদৃষ্টে আশ্চর্যবোধ করবে অথবা تَعَجُّب দ্বারা اِسْتِعْظَام তথা অবস্থার গুরুত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, বিস্ময় তো ঐসব স্থানে প্রকাশ করা হয় যেখানে اَسْبَاب বা কারণসমূহ লুক্কায়িত থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তো কোনো বস্তুর কারণ গোপন নেই। আর কোনো কোনো নুসখায় রয়েছে– اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجِيْبِ সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো, এ প্রশ্ন করা হয়েছে শ্রোতার অন্তরে বিস্ময়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্যে।

মুফাসসির (র.) أَوْ لِلتَّوْبِيْخِ বলে বুঝিয়েছেন যে, প্রশ্নটি ভর্ৎসনার জন্যেও হতে পারে। مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, এটির হলো مَنْشَأُ التَّعَجُّبِ তথা বিস্ময়ের মূল কারণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার একত্বের দলিল-প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও কুফর বা তার সাথে শরিক করা বিস্ময়ের ব্যাপার। আর بُرْهَان দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর বাণী– كُنْتُمْ اَمْوَاتًا الخ অর্থাৎ, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেছেন, একমাত্র তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউ বা কোনো মূর্তি উপাস্য হতে পারে না।

[হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১]

قَوْلُهٗ : وَقَالَ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلَى الْبَعْثِ

আয়াতের কারণ বর্ণনা : পূর্বের দলিল যেহেতু ভূমিকাস্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত ছিল, তাই সেটা কাফেরদের পছন্দ হয়নি বিধায় এখানে সে বিষয়টি বিশদভাবে দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। আর دَلِيْلًا শব্দটি مفعول به হিসেবে منصوب হয়েছে।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ اسْتَوٰى ـ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ اَىْ قَصَدَ

জমিনের মধ্যস্থিত বস্তুর সৃষ্টি কখন হয় : পূর্বের আয়াতের মতো وَمَا فِيْهَا না বলে এখানে শুধু بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ বলা হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে যে, জমিনের মধ্যস্থিত বস্তুগুলো আসমান সৃষ্টি পূর্বে সৃষ্টি হয়নি; বরং তার পরে হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলা দু'দিনে জমিনের অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর দু'দিনে আসমন সৃষ্টির করেছেন। তারপর দু'দিনে জমিনের মধ্যস্থিত সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। যেমনটা সূরা আম্বিয়ার আয়াত থেকে বোঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ـ (الأنبياء : ٣٠)

قَوْلُهٗ : فَسَوّٰهُنَّ ..... لِاَنَّهَا فِىْ مَعْنَى الْجَمْعِ

هن যমীরটি বহুবচন নেওয়ার হেতু : لِاَنَّهَا فِىْ مَعْنَى الْجَمْعِ এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ-এর هن যমীরটি السَّمَاء-এর দিকে ফিরেছে السَّمَاء শব্দটি একবচন। কিন্তু যমীর ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের। সুতরাং ضمير এবং مرجع-এর মাঝে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যাচ্ছে না।

মুফাসসির (র.) ..... الضَّمِيْرُ يَرْجِعُ বলে বুঝিয়েছেন যে, السَّمَاء শব্দটি مَا يَؤُوْل হিসেবে বহুবচন। কেননা اسْتَوٰى-এর পর সাত আসমান অস্তিত্ব লাভ করে। অন্যত্র বলা হয়েছে– فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ

মুফাসসির (র.) প্রদত্ত জবাব ছাড়াও এ প্রশ্নের আরেকটি জবাব এ-ও হতে পারে যে, السَّمَاء-এর لام الف-টি الف لام جِنْسِى তাই বহুবচনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত আছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

كَيْفَ : كَيْفَ প্রশ্নবোধক অব্যয়। অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে ব্যবহার হয়। কিন্তু কুরআনে অস্বীকার করা ও দুঃসাহসিকতার উপর বিস্ময় প্রকাশের জন্যে হরফটি অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে كَيْفَ হামযায়ে اِسْتِفْهَام-এর অর্থে, অর্থাৎ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ اىْ اَتَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَمَعَكُمْ مَا يَصْرِفُ عَنِ الْكُفْرِ এটা এমনই, যেমন– كَيْفَ تَطَيَّرَ بِغَيْرِ جَنَاحٍ اَىْ اَ تَطَيَّرَ بِغَيْرِ جَنَاحٍ

فَاَحْيَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ : إثبات فعل ماضى مطلق معروف মূলবর্ণ (ح ـ ي ـ ي) মাসদার الإِحْيَاءُ জিনস لفيف مقرون অর্থ জীবন দান করা। فَاَحْيَاكُمْ শুধু এক স্থানে فَاء আর অন্য তিন স্থানে ثُمَّ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, প্রথম وُجُوْد ও عَدَم-এর মাঝে সম্পর্ক রয়েছে এবং অন্যান্য অবস্থাগুলোর মধ্যে কিছুটা দূরত্ব হবে। فَاَحْيَاكُمْ-এর মূল ইবারত এরূপ– وَكُنْتُمْ عَلَقَةً فَمُضْغَةً فَاَحْيَاكُمْ; এভাবে তাকদীরী ইবারত উল্লেখ করার প্রয়োজন ও কারণ হলো, বীর্য তৎক্ষণাৎ জীবন প্রাপ্ত হয় না; বরং মাতৃগর্ভে ১২০ দিন সময়ে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর জীবন লাভ করে থাকে।

نُطَفًا : এটি বহুবচন, একবচনে نُطْفَة; অর্থ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি। এমন বস্তু যা টপকে পড়ে। এখানে نُطْفَة দ্বারা বীর্যকে বুঝানো হয়েছে। نُطْفَة-এর সাথে عَلَق এবং مُضْغَة-ও শামিল আছে।

اِسْتَوٰى : সীগাহ : واحد مذكر غائب বহছ إثبات فعل ماضى مطلق معروف মূলবর্ণ (س ـ و ـ ي) মাসদার اَلِاسْتِوَاءُ: বাব اَلِافْتِعال জিনস لفيف مقرون; اِسْتَوٰى-এর আভিধানিক অর্থ- اسْتَقَامَ وَاعْتَدَلَ (সমান হলো, ভারসাম্যপূর্ণ হলো)। যেমন বলা হয়– اِسْتَوَى الْعُوْدُ (কাঠ সমান হলো)। কেউ বলেন, عَلَا وَارْتَفَعَ (উঁচু হলো)। যেমন কুরআনের বাণী–

١- فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ ـ (مؤمنون : ٢٨)

٢- لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ. (الخرف : ١٣)

আলোচ্য আয়াতাংশে اِسْتَوٰى-এর অর্থ হবে– عَمَدَ وَقَصَدَ (ইচ্ছা করলেন)। তার ফায়েল হলো যমীর, যা আল্লাহর দিকে ফিরেছে। আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ইচ্ছার অর্থ– اَلتَّنْجِيْزُ اِلَى الْحَادِثِ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

كَيْفَ প্রথম হাল মুকাদ্দাম, تَكْفُرُوْنَ ফে'ল, যমীর الْحَال ذُو, আর بِاللّٰهِ মুতা'আল্লিক واو হালিয়্যাহ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا মা'তূফ আলাইহি, فَاَحْيَاكُمْ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে প্রথম মা'তূফ, ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ দ্বিতীয় মা'তূফ, ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ তৃতীয় মা'তূফ, ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ চতুর্থ মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহি তার চার মা'তূফ মিলে দ্বিতীয় হাল تَكْفُرُوْنَ-এর যমীরের ذو الحال তার উভয় হাল মিলে ফায়েল, ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية مسأنفة হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

لَكُمْ এটি خَلَق-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর لام-টি تعليل-এর অর্থে। কেউ বলেন, এটি تَمْلِيْكَ وَالْاِبَاحَة-এর জন্যে। অবশ্য تَمْلِيْك-টি শুধু উপকার লাভযোগ্য বস্তুর সাথেই খাস। আর কেউ বলেন, اِخْتِصَاص-এর অর্থে। ما-টি موصولة এবং তার صلة হলো فِى الْأَرْضِ; আর পুরো অংশটি خلق-এর مفعول به;
جَمِيْعًا শব্দটি مفعول به তথা مَا فِى الْاَرْضِ থেকে حال হয়েছে এবং এটি كُلٌّ-এর সমার্থক। কেউ বলেন, এটি حال مؤكدة হয়েছে। কেননা, مَا فِى الْأَرْضِ বাক্যটি ব্যাপক। سَبْعَ سَمَاوَاتٍ অংশটি فَسَوّٰهُنَّ-এর هُنَّ যমীরটি থেকে বদল হিসেবে মানসূব।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَالتَّوْبِيْخِ

وَالتَّوْبِيْخِ শব্দের সংশোধনী : ২৮নং আয়াতের তাফসীরে تَوْبِيْخ শব্দে দু'ধরনের নুসখা পাওয়া যায়। যেমন–
ক. আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত নুসখায় রয়েছে– اَلْبُرْهَانُ وَالتَّوْبِيْخُ
খ. সহীহ হলো– اَلْبُرْهَانُ اَوْ لِلتَّوْبِيْخِ

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তাওহীদ এবং রিসালাতের সুস্পষ্ট দলিলসমূহ এবং অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার খণ্ডন সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এ দুটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইহসান এবং অনুগ্রহের আলোচনা করে এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এতসব অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েও এরা কীরূপে কুফর এবং অস্বীকারেরর দুঃসাহস করে? সেই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি দলিল-প্রমাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না হয়, তাহলে কমপক্ষে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করা, তার সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ করাও তো সুস্থ মস্তিষ্কের দাবি। বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীরাও তার অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করে থাকে। অতএব মানুষ আকল ও বুদ্ধির দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তার অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ কীভাবে অস্বীকার করে?

فَكَاَنَّهٗ قَالَ : لَا يَنْبَغِىْ اَنْ تُوْجَدَ فِيْكُمُ الصِّفَاتُ الَّتِىْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ فَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّصْدُرَ مِنْكُمُ الْكُفْرَ.

অর্থাৎ, সুতরাং তিনি যেন বলেছেন, তোমাদের মাঝে এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা উচিত নয়, যে কারণে কুফরি দেখা দেয়, তাই তোমাদের থেকে কুফরি প্রকাশ পাওয়াও সমীচীন নয়। [হাশিয়াতুল জামাল : পৃষ্ঠা ৫০]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا

আয়াতের মর্মার্থ : اموات শব্দটি ميت-এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে ميت বলা হয়। আয়াতের মর্মার্থ হলো, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা এ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে যা আংশিকভাবে জড় বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা সেসব বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন।

অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। তারপর তিনি নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে আবার মানুষের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন নিষ্প্রাণ দেহকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথম মৃত্যু হলো সৃষ্টিধারার সূচনাপর্বের জড় অবস্থা আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মানুষের আয়ু শেষ হয়ে গেলে যে মৃত্যু হয়। তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কেয়ামতের দিন। কমপক্ষে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করা, তার সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ করাও তো সুস্থ মস্তিষ্কের দাবি। বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীরাও তার অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করে থাকে। অতএব, মানুষ আকল ও বুদ্ধির দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ কীভাবে অস্বীকার করে? এটা চরম বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। [মাআরিফুল কুরআন]

আয়াতের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কেয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু কবরের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে, আলোচ্য আয়াতে কবরের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির উল্লেখ নেই কেন?

কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আয়াতের শব্দের মাঝেই এ প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে। আয়াতে فَاَحْيَاكُمْ-এর পর বলা হয়েছে- ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ; আর ثُمَّ এর কথা বোঝায় যে, রূহ প্রদান ও মৃত্যু প্রদানের মাঝে একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। আর তা হলো দুনিয়ার জীবন। এমনিভাবে ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ-এর ثُمَّ থেকেও এ কথা বোঝা যায় যে, মৃত্যু ও পুনরায় জীবন লাভের মাঝখানেও একটি সময় ছিল। তা হলো কবরের জীবন। অনুরূপভাবে ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-এর মাঝেও আরেকটি সময়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো হাশর-নাশর ও হিসাবকিতাব।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ الخ

মাটি একটি নিয়ামত : আলোচ্য আয়াতে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহ লাভ করেছে বা করতে পারে, তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

দুনিয়ার কোনো বস্তুই অনর্থক নয় : জগতে বিদ্যমান সকল বস্তু কোনো না কোনো উপকারের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি কোনো বস্তুর উপকারিতা জানা নাও যায় তবুও এর দ্বারা ঐ বস্তুটি উপকারী না হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে না। সব বস্তুর উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন। خَلَقَ لَكُمْ-এর 'লাম' উপকারের জন্যে। এর উপর আলেমগণ দীর্ঘ গবেষণা করে বুঝেছেন যে, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে (اِبَاحَة) বৈধতা হচ্ছে আসল। আর নিষিদ্ধতা হলো مُلْحَق بِهٖ; পরবর্তীতে শরিয়তে যে বস্তু ক্ষতিকারক প্রমাণিত হয়েছে, সেটাকে নিষেধ করে দিয়েছে।

একটি সন্দেহ এবং তার সমাধান : কেউ এমন সন্দেহ করতে পারে যে, যখন সকল বস্তুই উপকারী, তাহলে সবই তো হালাল হওয়া উচিত। এর জবাবে আলেমগণ বলেন, কোনো বস্তু উপকারী হলেই তা ব্যবহারযোগ্য হওয়া জরুরি নয়। বিষ ইত্যাদির মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতা অবশ্যই আছে; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এর অপকারিতা অধিক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে এর ব্যবহার থেকে বাধা দেওয়া হয়। একইভাবে শরয়ী দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতা রয়েছে বটে। কিন্তু ক্ষতি অধিক হওয়ায় ওগুলোকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হযরত আদম (আ.) ও পৃথিবীর সৃষ্টির পর্যালোচনা : আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ধারাবাহিকতার বর্ণনা পবিত্র কুরআনের তিনটি স্থানে এসেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এ আয়াতে। দ্বিতীয়টি سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَة-তে এবং তৃতীয়টি سُوْرَة وَالنّٰزِعَات-তে। অধিকাংশ আয়াত দ্বারা আসমান ও জমিন এবং জগতের সৃষ্টি ছয় দিনে হয়েছে বোঝা যায়। অন্যদিকে মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সপ্তম দিন শুক্রবার আছর ও মাগরিব এর মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা দ্বারা জগতের সৃষ্টি সাত দিনে পরিপূর্ণ হওয়া বোঝা যায়।

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ জটিলতার সামাধান দিয়ে বলেন, যে শুক্রবার হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, জরুরি নয় যে, ঐ ছয় দিনের সাথে সে শুক্রবার সংযুক্ত হবে; বরং হতে পারে যে, দীর্ঘদিন পর কোনো এক শুক্রবার হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং জগতের সৃষ্টি ছয় দিনেই সীমিত থাকবে। এ বিশ্লেষণ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে এবং জমিন ও আসমানের সৃষ্টি পরে জিন জাতির দীর্ঘকাল পর্যন্ত জমিনে বসবাস করার বিষয়ে যে একটি সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেছে। এ দলিলের ভিত্তিতে বোঝা যায়, জমিন ও আসমানের সৃষ্টির পর জিন জাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা হাজার হাজার বছর ছিল। তখন কোনো এক শুক্রবারে হয়রত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ثُمَّ-এর অর্থ সংক্রান্ত সন্দেহ নিরসন : ثُمَّ-এর মূল অর্থ تَرَاخِى زَمَان দাবি করে। অথচ তখন কোনো জমানা বা কাল ছিল না। ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন–

১- قِيْلَ : هِىَ اِشَارَةٌ اِلَى التَّرَاخِىْ بَيْنَ رُتْبَتَىْ خَلْقِ الْاَرْضِ واالسَّمَاءِ.

২- وَقِيْلَ : لَمَّا كَانَ بَيْنَ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَعْمَالٌ أُخْرى مِنْ جَعْلِ الْجَبَلِ رَوَاسِىَ وَتَقْدِيْرِ الأَقْوَاتِ. كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى. عُطِفَ بِثُمَّ، اِذْ بَيْنَ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالْاِسْتِوَاءِ اِلَى السَّمَاءِ تَرَاخٍ.

৩- قَالَ الْقُرْطُبِىُّ : ثُمَّ اسْتَوٰى لِلتَّرْتِيْبِ الْإِخْبَارِىِّ لَا الزَّمَانِى، وَذٰلِكَ لِأَنَّ خَلْقَ مَا فِى الْأَرْضِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ. (حَاشِيَةُ الْجَمَل).

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ

ইলতিফাত : পূর্ববর্তী আয়াতে গায়েবের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ইলতিফাতের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু হয়েছে حاضر-এর সীগাহ দ্বারা। এই ইলতিফাতের উদ্দেশ্য হলো ভর্ৎসনা করা ও আলোচ্য বিষয়কে গুরুগম্ভীরভাবে উপস্থাপন করা।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : আকাশের সৃষ্টি আগে, নাকি জমিনের সৃষ্টি।

ক. আকাশের সৃষ্টি	খ. জমিনের সৃষ্টি
هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ. অর্থ : তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে যা কিছু জমিনে রয়েছে সেসব। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। [সূরা বাকারা : আয়াত ২৯] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা– [সূরা– হামীম সাজদা : ৯-১১]	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا الى قوله وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا. অর্থ : তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। এরপর এ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। [সূরা নাযি'আত : আয়াত ২৭-৩০]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভূমণ্ডল আগে সৃষ্টি হয়নি; বরং নভোমণ্ডল আগে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর ভূমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোকে পরস্পর বিরোধ হয়ে গেল। কেননা, খ-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে– وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا অর্থাৎ, ভূমণ্ডলকে নভোমণ্ডল সৃষ্টি পর বিস্তৃত করা হয়েছে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা–

১. প্রথমে ভূমণ্ডল সৃষ্টি বিষয়ক আয়াতগুলোকে আসল ও মূল সাব্যস্ত করে নভোমণ্ডল সৃষ্টি বিষয়ক আয়াতগুলোতে তাবীল করা যাবে।

২. নভোমণ্ডল সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এ বিষয়ক আয়াতগুলোতে আসল সাব্যস্ত করে ভূমণ্ডল সৃষ্টি বিষয়ক আয়াতগুলোকে তাবীল করা যাবে।

৩. এমন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বেছে নিতে হবে, যার দরুন উভয় প্রকার আয়াতের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে যায়।

এই দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে নিম্নে চারটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. ভূমণ্ডল সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এ বিষয়ক আয়াতসমূহ আসল বা মূল। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূমণ্ডল ও তার পৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তুসমূহ (পর্বতমালা, গাছপালা ও নদনদী ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যা উপরিউক্ত প্রথম দুটি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় এবং এর পক্ষে একটি বিশুদ্ধ হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَمَا فِيْهِنَّ مِنَ الْمَنَافِعِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ الشَّجَرَ وَالْمَاءَ وَالْمَدَائِنَ وَالْعُمْرَانَ وَالْخَرَابَ فَهٰذِهٖ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ تَعَالٰى أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ وَخَلَقَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ السَّمَاءَ وَخَلَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ النُّجُوْمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمَلَائِكَةَ. (اَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَغَيْرُهٗ، وَصَحَّحُوْهُ، رُوْحُ الْمَعَانِيْ ٢٤/١٠٥)

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদি হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আকাশ-পাতালের সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা রবি ও সোমবারে জমিন সৃষ্টি করেছেন। পর্বতমালা ও তাতে অবস্থিত উপকারী জিনিসসমূহ মঙ্গলবারে সৃষ্টি করেছেন এবং গাছপলা, পানি, নগরী, আবাদী ও অনাবাদী স্থানসমূহ বুধবারে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এখন পূর্ণ চার দিন হয়ে গেল। এ বর্ণনাকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে পেশ করেছেন যে, তোমরা কি এমন সত্তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, যিনি ভূমণ্ডলকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি তার সাথে অংশীদার স্থাপন করছ? অথচ তিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা এবং তিনি ভূমণ্ডলে পর্বতমালা সৃষ্টি করে তাতে বরকত অবতরণ করেছেন। আর তাতে আহার্য সৃষ্টি করেছেন চার দিনে। এটাই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের পূর্ণ জবাব। এভাবে আল্লাহ তা'আলা বৃহস্পতিবারে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন অনুরূপভাবে আরো একটি রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। [রূহুল মা'আনী : খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ১০৫]

সুতরাং এ রেওয়ায়েত দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডলকে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে।

اَنَّه خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمِ الْاَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْاَكَامَ فِيْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَالْاَشْجَارَ فِي الْاَرْبِعَاءِ وَخَلَقَ السَّمَاءَ فِي الْخَمِيْسِ وَالْجُمْعَةِ. (رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوْعًا حَاشِيَة جَلَالَيْنِ ص ٣٨٩ ج ٢٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা রবি ও সোমবারে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। মঙ্গলবারে পাহাড় ও পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। বুধবার বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন এবং বৃহস্পতি ও জুমাবারে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। [হাশিয়ায়ে জালালাইন : পৃষ্ঠা : ৪৮৯]

অনুরূপভাবে যুক্তির নিরিখেও একথা প্রমাণিত হয় যে, ভূমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টি পূর্বেই হবে। কেননা, ভূমণ্ডল হলো ভিত্তি বা ফাউন্ডেশনের পর্যায়ে। আর নভোমণ্ডল হলো ছাদ পর্যায়ে। এজন্যেই তো আল্লাহ তা'আলা- وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا বলেছেন। সুতরাং ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন যেহেতু পূর্বেই হওয়া সকলের কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, সেহেতু ভূমণ্ডল সৃষ্টি আগেই হবে এবং নভোমণ্ডল সৃষ্টি পরে হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এটাকেই পছন্দ করেছেন। তবে উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি ভূমণ্ডল সৃষ্টিকে অগ্রগামী বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا-এর মধ্যে তাবীল করতে হবে। আর তা হলো এই যে, الاَرْض শব্দের শুরুতে تدبر، تذكر বা اُذْكُر ক্রিয়াপদ উহ্য মনতে হবে। এবং بَعْدَ ذٰلِكَ শব্দকে উহ্য ক্রিয়াপদের ظرف হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে, অতঃপর دحها শব্দটি جُمْلَة مُسْتَانِفَة হবে। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ভূমণ্ডল সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পরে হয়েছে; বরং উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের বর্ণনা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া। অতএব যখন নবীজি ﷺ-কে নভোমণ্ডল বিষয়ক নিয়ামতসমূহের জ্ঞান দান করা হয়, তখন তিনি ভূমণ্ডল বিষয়ক নিয়ামতসমূহকেও স্মরণ করবেন এবং সেগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকবেন এজন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করে নদী-সাগর প্রবাহিত করেছিলেন এবং তার থেকে জলাধার ও প্রস্রবণ বের করে দিলেন। অতঃপর এ ভূমণ্ডলের পৃষ্ঠের উপর অসংখ্য-অগণিত বৃক্ষরাজি ও উদ্ভিদ জগৎ সৃষ্টি করলেন। এভাবে পর্বতমালা ও পাহাড়সমূহ জমিয়ে দিলেন। অথবা উল্লিখিত আয়াতে بَعد শব্দের অর্থ হবে مَع যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। আর بَعْد অর্থ مَع যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে সূরা নাযি'আতের আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের কোনো দ্বন্দ্বই সৃষ্টি হয় না।

২. প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হয়েছে- এ বিষয়ক আয়াতগুলো আসল বা মূল প্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যা- وَالاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইমাম ওয়াহেদী 'আল বাসীত' নামক কিতাবে হযরত মুকাতিল (র.) থেকে এটাই বর্ণনা করেন এবং বহু মুহাক্কিক আলেমও এটা পছন্দ করেছেন। এর কারণ হলো, যেসব আয়াতে আকাশ ও জমিনের কথা আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের মধ্যে سَمٰوَات-কে ارْض-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ. اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ.

সুতরাং অধিকাংশ আয়াতে যেহেতু سموات-কে ارض-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু বোঝা গেল যে, আকাশ সৃষ্টি জমিন সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে। তা ছাড়া যুক্তির নিরিখেও এটা বোঝা যায় যে, আকাশ হচ্ছে উত্তম বস্তু। আর জমিন হচ্ছে অনুত্তম বস্তু। যেমন– আকাশ সত্তাগত, গুণগত ও আয়তনের দিক দিয়ে জমিন থেকে উত্তম পন্থায় অগ্রগামী হয় এবং স্থানের দিক দিয়ে উঁচু ও বুলন্দ হয়। এজন্যে তার সৃষ্টি অনুত্তম বস্তু তথা জমিন সৃষ্টির পূর্বেই হওয়া যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হবে বলে দাবি করা যায়। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আকাশ সৃষ্টি জমিন সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে; পরে নয়।

অবশ্য এখানে জমিন সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে– এ বিষয়ক আয়াতগুলোর মাঝে তাবীল করতে হবে। সুতরাং সে আয়াতগুলোতে ثُمَّ اسْتَوٰى শব্দের মধ্যে ثم অব্যয়টি واو অব্যয়ের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যা দুটি বস্তুকে কোনো হুকুমের মধ্যে একত্রে বর্ণনা করার জন্যে ব্যবহার হয়। সুতরাং আয়াতগুলোতে আকাশ-পাতালের সৃষ্টি একত্রে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে; ধারাবাহিকতা নয়। ফলে সে আয়াতগুলোতে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر-এর ক্রমধারা বর্ণনা করা মোটেই উদ্দেশ্য নেওয়া উচিত হবে না।

অথবা এ তাবীল করা যাবে যে, আয়াতগুলোতে خَلْق শব্দের প্রারম্ভে اَرَاد ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ–

هُوَ الَّذِىْ اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا. قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ اَرَادَ خَلْقَ الْاَرْضِ فِىْ يَوْمَيْنِ.

যেমন– اِذَا اَرَدْتَ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآن এবং اِذَا اَرَدْتُم الْقِيَام-এর মধ্যে اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا-এর মধ্যে الْقِرَاءَةَ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং এ তাবীল অনুসারে আয়াতগুলোর সারমর্ম হবে, আল্লাহ তা'আলা আকাশের পূর্বে জমিন সৃষ্টি করেননি; বরং সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, অচিরেই আল্লাহ জমিন ও তাতে অবস্থিত বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করবেন। অতএব প্রথমে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ভূমণ্ডল সৃষ্টির ইচ্ছার পূর্ণতা প্রকাশ করলেন, যা খ-অংশের আয়াত وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখন দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে গেল।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিতে উপযুক্ত তিনটি আয়াতে মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হলে প্রত্যেকটি আয়াতকে আসল ও মূল প্রকৃতির উপর রেখে এমন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হবে, যার দরুন আয়াতগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে যায়। উক্ত বাখ্যা হলো, প্রত্যেকটি বস্তুর দুটি দিক হয়ে থাকে। একটি ধাতুগত আর অপরটি আকৃতিগত। ধাতুগত দিক দিয়ে জমিন সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এবং আকৃতিগত দিক দিয়ে আকাশ সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে। ধাতুগত দিক দিয়ে জমিন সৃষ্টি প্রথমে হওয়ার কথা ক-অংশের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আকৃতিগত দিক দিয়ে আকাশ সৃষ্টি পূর্ববর্তী হওয়ার কথা খ-অংশের আয়াত তথা وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তাফসীর রুহুল মা'আনীতে উল্লেখ হয়েছে–

خَلَقَ اَوَّلًا مَادَّةَ الْاَرْضِ ثُمَّ جَعَلَ مَادَّةَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنَ الرَّوَاسِىْ وَالْاَشْجَارِ وَالْاَنْهَارِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ خَلَقَ مَادَّةَ السَّمَاءِ الَّتِىْ هِىَ دُخَانٌ ثُمَّ خَلَقَ صُوَرَ السَّمٰوٰتِ فَبَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَبَعْدَ ذٰلِكَ دَحَى الْاَرْضَ وَبَسَطَهَا وَمَدَّهَا وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ وَالْاَنْهَارَ وَالْاَشْجَارَ وَغَيْرَهَا.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূমণ্ডলের মৌলিক উপদান সৃষ্টি করেছেন; এরপর ভূমণ্ডলে অবস্থিত পর্বতমালা, গাছপালা ও নদনদী সৃষ্টির পদার্থ সৃষ্টি করলেন। এরপর আকাশ সৃষ্টির পদার্থ ধুম্র সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আকাশের দেহ সৃষ্টি করে তাকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে সুউচ্চে স্থির করে দিলেন। অতঃপর জমিনের দেহ সৃষ্টি করে তাকে বিস্তৃত অবস্থায় বিছিয়ে দিলেন এবং তার পৃষ্ঠে পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও নদী-সাগর সৃষ্টি করলেন।

অতএব এ ব্যাখ্যানুসারে উপরিউক্ত আয়াতসমূহে কোনো প্রকারের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় না। পরস্পর সামঞ্জস্য কায়েম হয়ে যায়। [রূহুল মা'আনী]

৪. কোনো কোনো মুহাক্কিক তাফসীরবিদ এ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন যে, ধাতুগত দিক দিয়ে আকাশ সৃষ্টি পূর্বে হয়েছে আর দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে জমিন সৃষ্টি পূর্বে হয়েছে। [রূহুল মা'আনী]

التَّدْرِيْبَات: অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۔ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

أ. فسر الآيتين الكريمتين على نهج المصنف العلام (رح)

ب. ما معنى العبادة لغة واصطلاحا؟ وما الفرق بينها وبين العمل الصالح المذكور فى كثير من مواضع القرآن اوضح ثم اذكر وجه تفسير قوله "اعبدوا" بوحدوا۔

ج. انك تعلم ان العقلاء وحكماء في زماننا يخترعون كثيرا من الأشياء العجيبة والغريبة من آلات الاتصال والاخبار العالمية والمراكب السفرية مما تدهش العقول وتحيرها يذكرهم للناس بعجائب كلماتهم مرة وطورا لا يجدون الفاظا يمدحوهم بها فكان القلس أن يعبدهم أيضا ولكن العقل السليم لايبيح ذلك، فبأي مزية تعالى ذاته عليهم ويتمحض فى الاستحقاق بالعبادة ؟ بين بالتفكر فى الآيات القرانية حيث يتضح المرام۔

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

أ. ترجم الآية الكريمة بعد بيان سبب نزولها موضحا۔

ب. فسر الجمل الاتية على نهج المصنف (رح) "فأتوا بسورة من مثله" و "مما نزلنا على عبدنا" و "ان كنتم صادقين" ثم بين ما المراد بشهدائكم ولم سميت بها؟

ج. عرف الملحد والكافر والمنافق والملم تم بين أحكامهم موضحا۔

د. كم تحديا وقع بين الرسول ﷺ وكفار عرب فى الإتيان بمثل القران؟ بين مع ذكر المؤتى بها مفصلا وموضحا۔

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة۔

ب. أوضح تفسير المصنف (رح) حيث يعلو شانه تعالى وتقفل على افواه الملحدين لبيانهم الفاسد فى الجنة وشعار الاسلام۔

ج. انك ترى ان الآية تدل على ان النعم الثلاثة للذين امنوا وعملوا الصلحات وهى تحصل فى الآخرة، وهل ليس لهم نعمة وجزاء فى الدنيا؟ فان كانت فاثبتها بالآيات القرانية۔

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ.

أ. اكتب سبب نزول الآية الكريمة ثم ترجمها فصيحة۔

ب. فسر الآية كما فسر المصنف العلام جلال الدين السيوطى

ج. ما معنى الحياء وكيف نسب ذلك الى الله؟ فإنه صفة الخلق، هات جوابا شافيا۔

ذ. حقق لفظ "الفاسقين" جامعا ومانعا مع بيان اعرابه ووجهه ثم اذكر عشرة اعمال تفضى صاحبها الى الفسق المنفر عنه۔

রুকূ' : ৪ بَيَانُ جَعْلِ آدَمَ خَلِيْفَةً وَإِسْجَادِ الْمَلَائِكَةِ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ

আদম (আ.)কে খলিফা বানানো, তাঁর সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সেজদা করানোর বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ফেরেশতা ও আল্লাহর কথোপকথন
- আল্লাহ আদমকে যা শিক্ষা দিয়েছেন
- হযরত আদম (আ.) ও ফেরেশেতাগণের পরীক্ষার ঘটনা
- ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদম (আ.)-কে সেজদা করা এবং ইবলিসের অবাধ্যতা
- হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতে বসবাস ও নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ
- হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাত হতে নির্গমন
- হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল হওয়া
- হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহর সতর্কবাণী

٣٠. ﴿وَ﴾ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً﴾ يَخْلُفُنِيْ فِيْ تَنْفِيْذِ أَحْكَامِيْ فِيْهَا وَهُوَ آدَمُ ﴿قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا﴾ بِالْمَعَاصِيْ ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ يُرِيْقُهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ وَكَانُوْا فِيْهَا فَلَمَّا أَفْسَدُوْا أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَطَرَدُوْهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ﴾ مُتَلَبِّسِيْنَ ﴿بِحَمْدِكَ﴾ أَيْ نَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَيْ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالِاسْتِخْلَافِ ﴿قَالَ﴾ تَعَالَى ﴿إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي اسْتِخْلَافِ آدَمَ وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيْهِمُ الْمُطِيْعُ وَالْعَاصِيْ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوْا لَنْ يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ لِسَبْقِنَا لَهُ وَرُؤْيَتِنَا مَا لَمْ يَرَهُ فَخَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ مِنْ أَدِيْمِ الْأَرْضِ أَيْ وَجْهِهَا بِأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ جَمِيْعِ أَلْوَانِهَا وَعُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ فَصَارَ حَيَوَانًا حَسَّاسًا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا.

৩০. আর স্মরণ করুন হে মুহাম্মদ, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি আমার বিধি-বিধানসমূহ কার্যকর করার বিষয়ে সে সেখানে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। তিনি হলেন হযরত আদম (আ.)। তারা বলল, আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে অবাধ্যচার করে এবং রক্তপাত ঘটাবে হত্যা করে রক্ত প্রবাহিত করবে? ইতঃপূর্বে যেমন জিন জাতিরা করেছিল। পূর্বে জিনেরা সেখানে (পৃথিবীতে) বাস করতো। এরপর তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে দ্বীপপুঞ্জ ও পাহাড় পর্বতের দিকে বিতাড়িত করেন। আমরাই তো আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি অর্থাৎ, আমরা "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" বলি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। যা আপনার উপর আরোপ করা ঠিক নয়, সেই সমস্ত জিনিস হতে আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। وَنُقَدِّسُ لَكَ-এর ل বর্ণটি অতিরিক্ত। وَنَحْنُ বাক্যটি حَال; অর্থাৎ, আমরাই আপনার প্রতিনিধিত্বের অধিক যোগ্য। তিনি আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না; অর্থাৎ, আদমকে প্রতিনিধি করার পিছনে কী কল্যাণ বিদ্যমান (তা তোমরা জান না)। আর (তা হলো) আদম-সন্তানের মধ্যে বাধ্য-অবাধ্য উভয় ধরনের ব্যক্তি থাকবে। সুতরাং তাদের মাঝেই ন্যায়ের প্রকাশ ঘটবে। যা হোক, ফেরেশতাগণ বলাবলি করল, আমাদের রব কখনো আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী কোনো মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। কারণ, আমাদেরকে পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এমন সব জিনিস আমরা অবলোকন করেছি, যা অন্য কেউ করেনি। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর উপরিভাগের মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করলেন। সকল প্রকার মাটি হতে এক মুঠ মাটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পানির সাহায্যে খামীরা তৈরি করা হলো। তাঁকে সুগঠিত করে তাতে তিনি প্রাণ ফুৎকার করলেন। ফলে তা নিষ্প্রাণ অবস্থা থেকে অনুভূতিশীল এক প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ . اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ..... وَهُوَ آدَمُ

اذ-এর অবস্থান : মুফাসসির (র. اذ-এর পূর্বে اُذْكُرْ ফে'ল উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি اِذْ হরফটি নসবের স্থানে হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আবুল বাকা (র.) বলেন- اِذْ قَالَ বাক্যটি مفعول به হয়েছে اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের। কেউ কেউ বলেন- اِذْ হলো উহ্য মুবতাদার খবর, মূলত বাক্যটি হলো- اِبْتِدَاء خَلْقِيْ اِذْ قَالَ الخ; আবূ ওবায়দা মামার বলেন- اِذْ-টি অতিরিক্ত। আবূ হাইয়ান বলেন- اذ হলো মানসুব قَالُوْ اَتَجْعَلُ-এর কারণে মুফাসসির (র.) خَلِيْفَة-এর তাফসীর করেছেন وَهُوَ آدَمُ দ্বারা; অধিকাংশ আলেমদের অভিমত এটি। عَالَمُ الْاَجْسَادِ হিসেবে তিনি প্রথম খলিফা, আর عَالَمُ الْاَرْوَاحِ হিসেবে রাসূল ﷺ প্রথম খলিফা।

قَوْلُهُ : كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ الخ

বনী আদম সম্পর্কে ফেরেশতাগণের মন্তব্যের উৎস : হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির কথা জানার পর ফেরেশতাগণ বলেছিল, মানবজাতি পৃথিবীতে রক্তপাত করবে। ফেরেশতাগণ গায়েবের ভিত্তিতে এ কথা বলেননি। মানবজাতির পূর্বে পৃথিবীতে জিনদের বসবাস ছিল। তারা পৃথিবতে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-অবিচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। জিনদের কর্মকাণ্ড থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করেই তারা এ মন্তব্য করেছিল। আল্লমা সুয়ূতী (র.) كَمَا فَعَلَ بَنُوا الْجَانِّ الخ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীলে এসেছে- كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ فَقَاسُوا الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ; আর ইবনে কাসীরে এসেছে- وَاِنَّهُمْ قَاسُوْهُمْ عَلَى مَنْ سَبَقَ;

قَوْلُهُ : وَنَحْنُ نُسَبِّحُ . مُتَلَبِّسِيْنَ . بِحَمْدِكَ

بِحَمْدِكَ-এর তারকীবগত অবস্থা : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, بِحَمْدِكَ বাক্যটি نُسَبِّحُ ফে'লের যমীর থেকে حَالَ مُتَدَاخِلَة হয়েছে। কেননা এটি حال-এর মধ্যে আরেকটি حال হয়েছে। আর باء হরফটি مُلَابِسَة বা সহ অর্থ বুঝানো জন্যে এসেছে।

قَوْلُهُ : وَنُقَدِّسُ لَكَ ..... فَاللَّامُ زَائِدَةٌ .....

ফে'লদ্বয়ের পার্থক্য ও نُقَدِّسُ ফে'লটি মাধ্যম ছাড়া মুতা'আদ্দী : মুফাসসির (র.) نُقَدِّسُ ফে'লটি কোনো ধরনের মাধ্যম ব্যতীত মুতা'আদ্দী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কুরআন মজীদে যেহেতু কোনো হরফ অনর্থক নেই। তাই তিনি এখানে لَكَ-এর لام তাকীদের অর্থের জন্যে নিয়েছেন। মুফাসসির (র.) نُقَدِّسُ-এর তাফসীর نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ দ্বারা করে نُقَدِّسُ ও نُسَبِّحُ শব্দদ্বয়ের সমার্থক না হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। কারণ, تَسْبِيْح অর্থ- মৌখিক পবিত্রতা বর্ণনা করা, تَقْدِيْس অর্থ- অন্তরে পবিত্রতার বিশ্বাস রাখা।

قَوْلُهُ : وَالْجُمْلَةُ حَالٌ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ বাক্যের শুদ্ধ তারকীব : মুফাসসির (র.) وَالْجُمْلَةُ حَالٌ বাক্য দ্বারা তারকীবগত একটি সন্দেহ নিরসন করেছেন। وَنَحْنُ نُسَبِّحُ বাক্যটি اَتَجْعَلُ فِيْهَا-এর যমীর থেকে حَال হয়েছে, نُقَدِّسُ আতফ হয়েছে نُسَبِّحُ-এর উপর। উভয় মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে نَحْنُ মুবতাদার খবর। কিন্তু وَنَحْنُ نُسَبِّحُ-এর واو যদি আতফের জন্যে হয়, তাহলে اَتَجْعَلُ বাক্যটির (جُمْلَة اِنْشَائِيَّة-এর) উপর وَنَحْنُ نُسَبِّحُ বাক্যটিতে (جُمْلَة خَبَرِية-এর) আতফ করতে হয় যা বৈধ নয়। আর যদি واو-কে حَالِية হিসেবে তারকীব করা হয় তাহলে প্রশ্ন হয় না। মুফাসসির (র.) তাই বলেছেন وَالْجُمْلَةُ حَالٌ;

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْمَلَائِكَةُ : কেউ বলেন, শব্দটি ملأك-এর বহুবচন। যেমন- شمأل-এর বহুবচন شمائل; تأء تانيث আসার পর বহুবচনের অর্থ দৃঢ় হয়েছে। কেউ বলেন, শব্দটি ملك-এর বহুবচন। আর ملك শব্দটি মূলত مفعل-এর ওযনে مالك ছিল। সহজকরণার্থে همزة-কে হযফ করে ملك করা হয়েছে। এ শব্দটি الوكة থেকে নির্গত। الوكة অর্থ- গয়গাম্বর, রিসালাত, বাহক। مَلَائِكَة-এর আভিধানিক অর্থ- বার্তাবাহক। ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত এবং সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে, এই হিসেবে তাদেরকে مَلَائِكَة বলা হয়।

نُسَبِّحُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س . ب . ح) জিনস صحيح অর্থ– আমরা তাসবীহ পাঠ করি।

نُقَدِّسُ : সীগাহ جمع متلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّقْدِيْسُ মূলবর্ণ (ق . د . س) জিনস صحيح অর্থ আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ ..... اِنِّى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

اِسْتِيْنَافِيَّة আর اذ হলো اُذْكُر উহ্য ফে'লের مفعول به; কুরআনে কারীমে বর্ণিত ঘটনাসমূহের শুরুতে এই তারকীবই অধিক প্রযোজ্য। আর কেউ কেউ এটাকে উহ্য মুবতাদার খবর বলেছেন। অর্থাৎ, اِبْتِدَاء خَلْقِى اِذْ قَالَ الخ; আবার কারো দৃষ্টিতে اذ অতিরিক্ত, قَالَ ফেয়েল رَبُّكَ ফায়েল; اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَة জুমলা মাকূলাহ হয়ে মাফ'উল। جَاعِلٌ-এর অর্থ خَالِق হলে এক مفعول দিয়ে جملة পূর্ণ হবে, তা হচ্ছে خليفة; আর অর্থ مصير-ও হতে পারে, তখন فِى الْاَرْضِ দ্বিতীয় مفعول হবে। قَالُوْا-এর মাকূলাহ الخ اَتَجْعَلُ فِيْهَا; ونحن نسبح বাক্যটি اَتَجْعَلُ-এর যমীর থেকে حال হয়েছে। আর نُقَدِّسُ-এর عطف হয়েছে نُسَبِّحُ-এর উপর। معطوف ও معطوف عليه মিলে جملة فعلية হয়ে نحن মুবতাদার খবর হয়েছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ

اليهم শব্দের সংশোধনী : ৩০নং আয়াতে তাফসীরাংশে اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ বাক্যে দুধরনের নুসখা পাওয়া যায়। যথা–
ক. আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত নুসখায় রয়েছে– اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ খ. সহীহ হলো– اَرْسَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

قَوْلُهٗ : وَنُقَدِّسُ لَكَ . نُنَزِّهُكَ

نُنَزِّهُكَ শব্দের সংশোধনী : ৩০নং আয়াতের তাফসীরাংশে نُنَزِّهُكَ বাক্যে আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত নুসখায় نزهك রয়েছে। কিন্তু সহীহ হলো– نُنَزِّهُكَ;

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকুর যোগসূত্র

পূর্বের রুকুতে মানুষের প্রতি আল্লাহর সাধারণ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা ছিল। এখান থেকে মৌলিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যা বিশেষভাবে শুধু মানবজাতিকে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ইলম ও বুযুর্গী দান করেছেন, তাকে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সেজাদার সম্মান দান করেছেন এবং তোমদেরকে তার সন্তান হওয়ার গৌরব দান করেছেন।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ ..... مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

হযরত আদম (আ.-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ বলে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে তাঁর আলোচনার ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ তা'আলার এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কী এবং এতে কী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো?

একথা সুস্পষ্ট যে, কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সব দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে; নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমাধিকার সমপন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জানার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দুটির কোনোটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য-সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

نُقَدِّسُ ও نُسَبِّحُ একসাথে বলার কারণ : আলোচ্য আয়াতে ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ; এতে تَسْبِيْح ও تَقْدِيْس সমার্থক। দুটি শব্দের অর্থই পবিত্রতা বর্ণনা করা।

تَقْدِيْس ও تَسْبِيْح-এর মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য হলো, تَسْبِيْح আনুগত্য ও আমলের ক্ষেত্রে হয় এবং تَقْدِيْس ইতেকাদের ক্ষেত্রে। উভয়টি একসাথে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মুখ, অন্তর ও অঙ্গসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা। আল্লামা সোলায়মান (র.) এ কারণটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন–

وَفَائِدَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُرَادِفُ فَهُمَا أَنَّ التَّسْبِيْحَ بِالطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَالتَّقْدِيْسَ بِالْمَعَارِفِ فِي ذَاتِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَي التَّفَكُّرِ فِي ذٰلِكَ.

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে কেননা, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তার আয়ত্তাধীন। তাঁর কোনো কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْئَلُوْنَ আল্লাহ তা'আলার কাজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

সারকথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরমর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোনো আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেওয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের, যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন– কুরআন পাকে রাসূল ﷺ-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়ছে।

ফেরেশতাদের প্রশ্নের কারণ : আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি কথা বলার পর ফেরেশতাগণ أَتَجْعَلُ مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا বলে প্রশ্ন করেন। কিন্তু ফেরেশতাদের এ উক্তিটি আপত্তিমূলক ছিল না। ইবনে কাসীর (র.) বলেন–

لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاِعْتِرَاضِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلٰى وَجْهِ الْحَسَدِ لِبَنِيْ اٰدَمَ كَمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ. (تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ)

তাহলে ফেরেশতাদের এ উক্তির মর্ম কী হতে পারে- এ প্রসেঙ্গে অধিকতর সুন্দর জবাব দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশারফ আলী থানবী (র.)। তিনি লিখেছেন, ফেরেশতাদের বক্তব্য হলো– খেলাফতের দায়িত্ব আমাদেকে দেওয়া হলে আমরা সর্বাত্মকভাবে তা আঞ্জাম দেব। আর মানবজাতির সকলে তা আঞ্জাম দেবে না; বরং যারা আপনার অনুগত হবে, তারাই কেবল মনে প্রাণে দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও জালেম হবে, তাদের থেকে সে দায়িত্ব পালনের আশা করা যায় না। সারকথা, যখন দায়িত্ব পালন করা মতো একটি দল বিদ্যমান রয়েছে, তখন একটি নতুন মাখলুক– যাদের কেউ দায়িত্ব পলন করবে কেউ করবে না, তাদের সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন রয়েছে? এটি আপত্তি স্বরূপ বা নিজেদের অগ্রাধিকার দাবি স্বরূপ ছিল না; বরং বিষয়টি এমন, যেমন কোনো শাসক নতুন একটি প্রকল্প শুরু করে তার জন্যে স্বতন্ত্র আমলা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পুরাতন আমলাদের সামনে ব্যক্ত করলেন, তখন তারা স্বীয় আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নিবেদন করল, জাহাপনা! এ কাজের জন্যে যাদেরকে নিযুক্ত করছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যে, তাদের কিছু লোক ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করবে আর কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এতে আপনার মনে অপ্রসন্ন হবে। এসবের কী দরকার? আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণগান এবং পবিত্রতা বর্ণনা করি। আর যে কোনো কাজই হোক না কেন, তা পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বসমূহ পালনসহ নতুন যে কোনো কাজ আমরা সানন্দে পালন করবো। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭০]

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) বলেন, ফেরেশতাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, এসব মানুষ قُوَّت شَهْوَتِيَّة-এর চাহিদায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং قُوَّت غَضَبِيَّة-এর চাহিদানুযায়ী খুনাখুনি করবে। কারণ, প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনটি শক্তি রয়েছে عَقْلِيَّة ـ غَضَبِيَّة ـ شَهْوَتِيَّة প্রথম দুটির মাধ্যমে মানুষ نَقْص বা অপরাধমূলক কাজ করে আর শেষোক্তটি দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ কাজ করে। ফেরেশতারা শেষেরটিকে রেখে শুধু প্রথম দুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে উপর্যুক্ত দাবি করেছিল। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫]

ফেরেশতার পরিচয় : শরিয়তের পরিভাষায় ফেরেশতা বলা হয়–

هُوَ جِسْمٌ نُوْرَانِيٌّ مُتَشَكِّلٌ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ, নূরের তৈরি এমন সৃষ্টজীব, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করেন না; বরং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে রত থাকেন। [কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃষ্ঠা : ৫০৪]

বস্তুত ফেরেশতা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্ট। তারা সাধারণত অদৃশ্য, তাঁদের কোনো আকার নেই। তবে তাঁরা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁরা আমাদের মতো রক্ত-মাংসের সৃষ্টি নন। তাঁদের কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা-তন্দ্রা কিছুই নেই। তাঁরা সবসময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লাহ তা'আলা যখন যা হুকুম করেন, তাঁরা তাই পালন করেন। এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত অথবা শাস্তি যা কিছু নাজিল হয়, তা এই ফেরেশতাগণের মাধ্যমে নাজিল করা হয়। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের প্রতি যেসব কিতাব নাজিল করেছেন, তা তাঁদের ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষ্য দেবেন।

জিনজাতি ও ফেরেশতাদের মাঝে পার্থক্য : ফেরেশতা, জিন ও শয়তানরা সূক্ষ্মদেহী হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক দিক থেকে পরস্পর স্বাতন্ত্র ও ভিন্নতা রাখে। যেমন– ফেরেশতার সৃষ্টি কল্যাণ ও অনুগত্যের উপর। মন্দ কাজ ও পাপের যোগ্যতা তাদের মধ্যে একদম নেই। জিনের মধ্যে মঙ্গল-অমঙ্গল, দুটোরই যোগ্যতা আছে। তবে মন্দ ও অমঙ্গলের যোগ্যতা প্রবল। আর শয়তান বলে প্রত্যেক খবীস ও অবাধ্য জিনকে। জিনদের মধ্যে নারী-পুরুষও আছে। তাদের সন্তানাদি ও বংশ বিস্তার হয়। আদম সন্তান তথা মানবজাতির মতো তারাও প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীর মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের মধ্যে এসব কিছুই নেই। আর সৃষ্টিগত পার্থক্য হলো, ফেরেশতারা নূরের তৈরি, জিন আগুনের তৈরি। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

ফেরেশতাদের সংখ্যা, নাম ও কর্ম : ফেরেশতাগণের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। ইরশাদ হয়েছে– وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ, আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। [সূরা মুদ্দাসসির : ৩১]

চারজন বড় বড় ফেরেশতাসহ কতিপয় ফেরেশতার নাম আমরা জানি। যথা–

১. হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁকে রুহ বা রুহুল আমীনও বলা হয়।

২. হযরত মীকাঈল (আ.)। তিনি সকল জীবের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৩. হযরত আজরাঈল (আ.)। তিনি সকল জীবের জীবন বা রূহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৪. হযরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এরপর কেয়ামত কায়েম হবে।

মুনকার ও নাকীর। তাঁরা মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করেন। জাহান্নামের রক্ষক ফেরেশতার নাম মালিক এবং জান্নাতের জিম্মাদার ফেরেশতার নাম রিজওয়ান। এমনিভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা অগণিত ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন।

খলিফার পরিচয় : খলিফার সংজ্ঞা হলো– وَالْخَلِيْفَةُ مَنْ يَخْلُفُ غَيْرَهُ وَيَنُوْبُ مَنَابَهُ অর্থাৎ, যে কারো স্থলাভিষিক্ত হয়, তাকে খলিফা বলা হয়।

এ স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণ হয়ে থাকে– ১. অনুপস্থিতি ২. মারা যাওয়া ৩. অক্ষম হওয়া এবং ৪. مُسْتَخْلِفُ-এর সম্মান প্রকাশ করা। ইমাম রাগিব (র.)-এর ভাষায়–

اَلْخِلَافَةُ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ اِمَّا لِغَيْبَةِ الْمَنُوْبِ عَنْهُ وَاِمَّا لِمَوْتِهٖ وَاِمَّا لِعَجْزِهٖ وَاِمَّا لِتَشْرِيْفِ الْمُسْتَخْلِفِ.

এখানে শেষোক্তটি উদ্দেশ্য। সসীম বান্দা আল্লাহ তা'আলার অসীম সত্তার কাছ থেকে উলূম ও আহকাম সরাসরি লাভ করতে সক্ষম নয়, তাই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছেন। রুটি যেমন সরাসরি আগুনে দিলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে এবং সঠিক উপায়ে রুটি ভাজার জন্যে কড়াইয়ের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়; অনুরূপ বান্দাও সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নূর তথা উলূম-আহকাম লাভে অক্ষম বিধায় নবী-রাসূলদেরকে মধ্যস্থতা করা হয়েছে।

৩১.এবং তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন যাবতীয় বিষয়ের নাম এমনকি বড় পাত্র, ছোট পেয়ালা, বাতকর্মের শব্দ ও বড় চামচ সম্পর্কে পর্যন্ত তিনি শিক্ষা দিলেন। তাঁর হৃদয়ে এগুলোর জ্ঞান সঞ্চারের মাধ্যমে। এরপর পেশ করলেন সেগুলো অর্থাৎ, বস্তুসামগ্রী। এ স্থানে هُمَ সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে- تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاء (বোধসম্পন্ন প্রাণীসমূহের প্রাধান্য দান)-এর ভিত্তিতে। ফেরেশতাদের সম্মুখে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাকে বলে দাও আমাকে অবহিত করো এ সমুদয় বিষয়সমূহের নাম যদি তোমরা সত্যবাদী হওয়া। এ ব্যাপারে যে, তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো সৃষ্টজীব আমি বানাব না বা তোমরাই প্রতিনিধিত্ব করার অধিক যোগ্যতা রাখ। اِنْ كُنْتُمْ-এর জবাবের উপর পূর্ববর্তী বাক্য اَنْبِئُوْنِىْ ইঙ্গিতবহ।

٣١.﴿وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ﴾ أَيْ أَسَمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ ﴿كُلَّهَا﴾ حَتَّى الْقَصْعَةَ وَالْقَصِيْعَةَ وَالْفَسْوَةَ وَالْفُسْيَةَ وَالْمِغْرَفَةَ بِأَنْ أَلْقَى فِيْ قَلْبِهِ عِلْمَهَا ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ أَيْ الْمُسَمَّيَاتِ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ ﴿عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ﴾ لَهُمْ تَبْكِيْتًا ﴿اَنْۢبِئُوْنِىْ﴾ أَخْبِرُوْنِيْ ﴿بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ﴾ الْمُسَمَّيَاتِ ﴿اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ فِيْ أَنِّيْ لَا أَخْلُقُ أَعْلَمَ مِنْكُمْ أَوْ أَنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ.

৩২.তারা বলল, আপনি মহান আপনার কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে আপনি পবিত্র! আমাদেরকে যা যে বিষয়ে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনিই اَنْتَ শব্দটি اَنَّكَ-এর كَ-এর تَاكِيد বুঝাতে এসেছে। জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। কোনো বিষয়ই যার জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার বাইরে নয়।

٣٢.﴿قَالُوْا سُبْحٰنَكَ﴾ تَنْزِيهًا لَكَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْكَ ﴿لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ؕ﴾ إِيَّاهُ ﴿اِنَّكَ اَنْتَ﴾ تَأْكِيْدٌ لِلْكَافِ ﴿الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾ الَّذِيْ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ.

৩৩.আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম, তাঁদেরকে অর্থাৎ, ফেরেশতাদেরকে এগুলোর এ বিষয়সমূহের নাম বলে দিন। অনন্তর তিনি প্রতিটি জিনিসের নাম এবং তা সৃষ্টির তাৎপর্য বর্ণনা করে দিলেন। যখন তিনি ফেরেশতাদেরকে সমস্ত বস্তুর নাম জানিয়ে দিলেন, তিনি আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু অর্থাৎ, এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু অগোচরে আছে সেই সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর নিজেদের বক্তব্য যা اَتَجْعَلُ فِيْهَا الخ দ্বারা তোমরা প্রকাশ করেছিলে তা এবং যা তোমরা গোপন কর লুকিয়ে রাখ, যেমন- তোমাদের এ কথা যে আমাদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও জ্ঞানী কোনো কিছু আমাদের প্রভু সৃষ্টি করবেন না। তা-ও আমি জানি।

٣٣.﴿قَالَ﴾ تَعَالَى ﴿يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ﴾ أَيْ الْمَلَائِكَةَ ﴿بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ﴾ الْمُسَمَّيَاتِ فَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ بِاسْمِهِ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِيْ خُلِقَ لَهَا ﴿فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ﴾ تَعَالَى لَهُمْ مُوَبِّخًا؟ ﴿اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ مَا غَابَ فِيْهِمَا ﴿وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ﴾ مَا تُظْهِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ أَتَجْعَلُ فِيْهَا إِلَخْ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ تُسِرُّونَ مِنْ قَوْلِكُمْ لَنْ يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ.

৩৪.আর স্মরণ করুন যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা করো মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মানসূচক সেজদা। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করল; সে জিনদের আদি পিতা। ফেরেশতাদের মধ্যে থাকত। সে অমান্য করল সেজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করল এবং বলল, আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٣٤.﴿وَ﴾ اُذْكُرْ ﴿اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ﴾ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالِانْحِنَاءِ ﴿فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ﴾ هُوَ أَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ﴿اَبٰى﴾ امْتَنَعَ مِنَ السُّجُوْدِ ﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾ تَكَبَّرَ عَنْهُ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ فِيْ عِلْمِ اللهِ.

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ أَيْ اَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ كُلَّهَا . حَتَّى الْقَصْعَةَ

الف لام-এর الْاَسْمَاء-টি মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে : اَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ দ্বারা الْاَسْمَاء-এর الف لام-টি مضاف إليه-এর পরিবর্তে এসেছে-এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর উহ্য مضاف-টি হলো اَلْمُسَمَّيَات

الأسماء-এর মাঝে ছোট-বড় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত : كُلَّهَا এটি اَسْمَاء-এর তাকীদ। সমস্ত বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত না করার সন্দেহকে দূর করার জন্যে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, কারো সংশয় হতে পারতো যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা শুধু সম্মানিত ও বড় বড় বস্তুর নাম হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন, তুচ্ছ ও ছোট ছোট বস্তুর জ্ঞান তাকে শিক্ষ দেননি। এ সংশয় নিরসনের জন্যেই কুরআনে كُلَّهَا বলা হয়েছে। মুফাসসির (র.)-ও এর ব্যাখ্যায় حَتَّى الْقَصْعَةَ الخ বলে সেটিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ عَرَضَهُمْ . وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ

ذَوِى الْعُقُوْلِ-এর যমীর ব্যবহারের কারণ : وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ বলে মুফাসসির (র.) এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তা হলো, আল্লাহ তা'আলা عَرَضَهُمْ বললেন কেন? এতে তো মনে হয় নামের জিনিসগুলো ذَوِى الْعُقُوْلِ বা বোধসম্পন্ন। কেননা, هُمْ শব্দটি বোধসম্পন্নের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, বোধহীন জিনিস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না।

মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো, মূলত বোধসম্পন্ন ও বোধহীন সব জিনিসকেই তাতে শামিল করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার সময় বোধহীন বস্তুগুলোর চেয়ে বোধসম্পন্ন সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আরবি নিয়মে একে তাগলীব তথা একটির উপর অপরটির প্রাধান্য দান বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ . (اَلنُّوْرُ : ٤٥)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জীব-জন্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, আবার কেউ চলে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে। আয়াতে বোধ-শক্তিসম্পন্ন ও বোধহীন উভয় শ্রেণি সৃষ্টির শামিল রয়েছে; কিন্তু সকলকেই বোধসম্পন্ন পর্যায়ের ধরা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَقَالَ لَهُمْ تَبْكِيْتًا . اَنْبِئُوْنِىْ . اَخْبِرُوْنِىْ

اَنْبِئُوْا আমরের প্রয়োগ : মুফাসসির (র.) أَنْبِئُوْنِىْ-এর তাফসীর করেছেন, تَبْكِيْتًا দ্বারা, এর মাধ্যমে তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, প্রশ্ন হলো ফেরেশতারা বস্তুসমূহের বাস্তবতা, গুণাগুণ ও নাম বলতে না পারার বিষয় আল্লাহ তা'আলা জানতেন। তারপরও তিনি তাদেরকে কেন أَنْبِئُوْنِىْ দ্বারা আদেশ করলেন? এর উত্তরে মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে أَنْبِئُوْنِىْ আমরের সীগাটি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং তাদেরকে চুপ করানো উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهٗ

جَوَابُ الشَّرْطِ নির্ণয় : اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-এর جَوَابُ الشَّرْطِ উহ্য রয়েছে। আর পূর্বের أَنْبِئُوْنِىْ ফে'লটি সেই উহ্য جَوَابُ الشَّرْطِ-এর قَرِيْنَة। মূল ইবারতটি এভাবে হবে فَاَنْبِئُوْنِىْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ; মুফাসসির (র.) وَجَوَابُ الشَّرْطِ ..... الخ বলে এ তারকীবটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম সিবাওয়াইহ-এর মতে, এ ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে شَرْطِ-কে مُقَدم করা জায়েজ, তাই جَوَابُ الشَّرْطِ-কে উহ্য ধরার প্রয়োজন নেই; বরং পূর্বে বর্ণিত أَنْبِئُوْنِى-ই তার جَوَابُ الشَّرْطِ হবে। মুসান্নিফ (র.) وَجَوَابُ الشَّرْطِ বলার দ্বারা ইমাম সিবাওয়াইহ (র.)-এর মতও খণ্ডন করেছেন।

قَوْلُهٗ : اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ . سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ

সেজদা করার পদ্ধতি : আলোচ্য আয়াতে সেজদা দ্বারা سَجْدَة-এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, নত হওয়া। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা এটাই বুঝিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : اِلَّا اِبْلِيْسَ هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ

اِسْتِثْنَاء-এর ব্যাখ্যা : আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে, ইবলিস জিন ছিল; সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত নয়। অতএব, আয়াতে اِلَّا اِبْلِيْسَ অংশটি হলো اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع তথা لٰكِن-এর অর্থে। অর্থাৎ, ইবলিস ফেরেশতাগণের জিনস বা গোত্রভুক্ত ছিল না; বরং সে কেবল ফেরেশতাদের মধ্যে বসবাস করতো। تَغْلِيْبًا তাকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ বলে মুফাসসির (র.) এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তবে অধিকাংশ মুফাসসির, যেমন- বাগাভী, ওয়াহেদী ও কাজি বায়যাভী (র.) প্রমুখ বলেন, استثناء متصل-টি اِسْتِثْنَاء হবে। অর্থাৎ, ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যথায় ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশিত সেজদার বিধান তাকে শামিল করতো না এবং তাদের থেকে তাকে ইসতিসনা করাও সহীহ হতো না। সূরা কাহাফে যে كَانَ مِنَ الْجِنِّ বলা হয়েছে তার জবাবে তারা বলেন, এর দ্বারা এ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে যে, ইবলিস কর্মের দিক দিয়ে জিনদের জাতভুক্ত ছিল আর نَوْع বা ধরনের দিক দিয়ে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এর আরেকটি জবাব প্রদান করেন যে, আভিধানিক অর্থে ফেরেশতাদেরকেও জিন বলা হয়। কেননা, তারাও মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গোপন থাকেন। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০]

قَوْلُهٗ : وَاسْتَكْبَرَ. تَكَبَّرَ عَنْهُ

এখানে استفعال-টি طلب-এর জন্যে নয় : মুফাসসির (র.) اِسْتَكْبَرَ-এর ব্যাখ্যায় تَكَبَّرَ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে باب استفعال-এর طلب-এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অর্থ হবে না; বরং استفعال-এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে مبالغة স্বরূপ। [হাশিয়াতুর জামাল]

قَوْلُهٗ : وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

ইবলিসকে কাফের বলার রহস্য : প্রশ্ন হতে পারে ইবলিস বড় আবেদ ছিল। অথচ আয়াতে বলা হচ্ছে, সে কাফের ছিল, সে যদি কাফের হয়, তাহলে জান্নাতে ছিল কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) فِيْ عِلْمِ اللّٰه অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে সে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল, যদিও অন্যদের কাছে তা প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তীতে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদার নির্দেশের সময়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন- كان শব্দটি صار-এর সমার্থক। অর্থাৎ সে প্রথম থেকেই কাফের ছিল না। আল্লাহ তা'আলার আদেশের অস্বীকৃতিই তাকে এখন কাফেরদের দলভুক্ত করেছে।

[তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ৮, পার্শ্ব টীকা. ৬; তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

قَصْعَةٌ : অর্থ- বড় পাত্র, আর قُصَيْعَةٌ অর্থ- ছোট পাত্র।

اَلْفَسْوَةُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فُسْوَات; অর্থ- নিঃশব্দে বায়ু নির্গমন করা।

وَفِى الْمِصْبَاحِ : اَلْفَسْوَةُ : فَسَا يَفْسُوْ مِنْ بَابِ عَدَا يَعْدُوْ. وَاِسْمُ الْفَسَاءِ وَهُوَ رِيْحٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ (حَاشِيَةُ الْجُمَل : ج ١ ص ٥٧)

اَلْمِغْرَفَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহুছ اسم آلة বাব ضرب মাসদার اَلْغرفة মূলবর্ন (غ.ر.ف) জিনস صحيح অর্থ- চামচ।

اِبْلِيْس : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَبَالِسَة; অর্থ- শয়তান। এ শব্দটি مشتق এবং غير مشتق হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হলো, এটি অনারবি শব্দ। عَلَم ও عُجْمَة হওয়ার কারণে غير منصرف; আর যদি اِبْلَاس (নৈরাশ্য ও হতাশা) থেকে নির্গত হয়ে থাকে, তাহলে منصرف হবে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ..... اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

واو-টি عاطفة, آدم শব্দটি علم-এর প্রথম মাফ'উল ও الاسماء শব্দটি তার দ্বিতীয় মাফ'উল, كُلَّهَا অংশটি الاسْمَاء-এর তাকীদ হয়েছে। ثُمَّ দ্বারা عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ বাক্যটি ..... عَلَم-এর উপর আতফ হয়েছে। ..... قَالَ اَنْبِؤُوْنِيْ বাক্যটি فاء অব্যয়যোগে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। اَنْبِؤُوْا ফে'ল, نى হলো তার মাফ'উল, بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ অংশটি তার মুতা'আল্লিক, এই পুরো জুমলায়ে ফে'লিয়াটি قَالَ-এর মাফ'উল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى قَالُوْا سُبْحَانَكَ ..... أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

سُبْحَانَكَ অংশটুকু মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نُسَبِّحُ উহ্য ফে'লের مفعول مطلق হয়েছে।

لَنَا-এর মাঝে لَا-টি اَلنَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ এবং عِلْم হলো তার ইসম হিসেবে নসবের উপর মাবনী হয়েছে। لَا عِلْمَ অংশটুকু لا-এর উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। اِلَّا হলো أَدَاةُ الْحَصْر; পরবর্তী مَا عَلَّمْتَنَا অংশটি عِلْم থেকে বদল হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالُوْا سُبْحَانَكَ

سُبْحَانَكَ শব্দের লিখনশৈলী : ৩২নং আয়াতে سُبْحَانَكَ শব্দের দু'ধরনের নোসখা পাওয়া যায়। যেমন–

ক. আমাদের উপমহাদেশের প্রচলিত নোসখায় রয়েছে– سُبْحَانَكَ অর্থাৎ ح-এর পর الف বৃদ্ধি করে।

খ. উসমানী লিখনশৈলীতে سُبْحٰنَكَ অর্থাৎ, ح-এর উপর খাড়া যবর যোগে পাওয়া যায়।

✪ اِخْتِلَافُ الْإِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ مُوَبِّخًا

مُؤَبِّخًا শব্দের সংশোধনী : ৩৩ নং আয়াতের তাফসীরাংশে দু'ধরনের নোসখা পাওয়া যায়। যথা–

ক. আমাদের উপমহাদেশের প্রচলিত নোসখায় শব্দটি রয়েছে مُؤْبِخًا অর্থাৎ, واو বর্ণের উপর হামযা যোগে।

খ. কিন্তু শুদ্ধ লিখনশৈলী হবে مُوْبِخًا অর্থাৎ, واو বর্ণে হামযাবিহীন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারসম্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا ..... وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

পূর্বের আয়াতে ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর হযরত আদম (আ.)-এর ইলমি বা জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমলী দিক দিয়েও হযরত আদম (আ.)-এর ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে ফেরেশতা ও জিনদের মাধ্যমে তাকে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করেছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.) উভয়দিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَات : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ..... إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহর জ্ঞানদান ও এর পদ্ধতি : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করেছিলেন। এ জ্ঞানদানটা ছিল কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ইলহামের মাধ্যমে।

আয়াতে শুধু الْأَسْمَاء (নামসমূহ) শব্দ রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কেবল বস্তুর নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং ব্যক্তি বা বস্তুর নাম, গুণাগুণ উপকারিতা ইত্যাদিও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হযরত আদম (আ.)-কে নামের সঙ্গে সঙ্গে গুণাগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কেননা নাম তো শুধু একটি ধ্বনিমাত্র। এ ধ্বনি শ্রবণে মনের মধ্যে কোনো আকৃতি উদয় হয় না। এ সম্পর্কে আল্লামা রাগেব (র.) বলেন– إِنَّ مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْمُسَمّٰى وَحُصُوْلِ صُوْرَتِهٖ فِى الضَّمِيْرِ আর নামের সঙ্গে বস্তুর আকৃতি ও আলামত শেখানোর ফলেই হযরত আদম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করামাত্রই সবকিছুর নাম বলতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লামা সোলায়মান (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সমস্ত ভাষাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সন্তানরা তাতে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। কেউ আরবি ভাষাকে গ্রহণ করেছে এবং বাকিগুলো ভুলে গেছে। কেউ তুর্কী ভাষা গ্রহণ করেছে এবং বাকিগুলো বর্জন করেছে।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ عَرَضَهُمْ وفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা عَرَضَهُمْ বললেন কেন? এতে তো মনে হয় নামের জিনিসগুলো ذوى الْعُقُوْل বা বিবেকবান জাতীয়। কেননা هُمْ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যারা বিবেকবান ও আকলমন্দ বিবেক-বুদ্ধিহীন জিনিস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না।

উত্তর : মূলত বিবেকবান ও বিবেক-বুদ্ধিহীন সব জিনিসকেই তাতে শামিল করা হয়েছে। আরবি নিয়মে একে তাগলবি তথা একটির উপর অপরটির প্রাধান্য দান বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ - (اَلنُّوْرُ: ٤٥)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জীব-জন্তুকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর করে হামগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, আবার কেউ চলে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে।

এতে বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয় শ্রেণির সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; কিন্তু সকলকে বিবেকবান পর্যায়ে ধরা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ عَرَضَهُمْ

বস্তুসমূহ কীভাবে পেশ করা হয়েছিল? : হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বস্তুগুলোকে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্রাকারে পেশ করেছিলেন। ذات বা বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে তো পদ্ধতিটা সুস্পষ্ট। কিন্তু যেগুলো مَعَانِى-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- আনন্দ, জ্ঞান, অজ্ঞতা, শক্তি ইচ্ছা- সেগুলো পেশ করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর মনে সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি প্রক্ষেপণ করেছিলেন। ফলে তিনি তা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ..... اَلْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

ফেরেশতাগণের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার স্বীকারোক্তি : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়ে এবং তার মুখে সেগুলোর নাম উচ্চারণ করিয়ে ফেরেশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। অপরদিকে পৃথিবী পরিচালনার জন্যে ইলমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। যখন ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির রহস্য ও ইলমের গুরুত্ব উদ্ভাসিত হলো, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান ও অনুভবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিল।

সেজদার পদ্ধতির বর্ণনা ও মতভেদ : হযরত আদম (আ.)-কে ফেরেশতাগণ যে সেজদা করেছিলেন, তা নামাজের মতো মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে হয়নি; বরং তারা মাথা নুইয়ে হযরত আদম (আ.)-কে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই ও পরিবারবর্গ হযরত ইউসুফ (র.)-এর প্রতি যে সেজদা করেছিল, তাও এ উদ্দেশ্যেই ছিল। কেননা, ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে হতে পারে না। সম্মান ও মর্যাদা সবার প্রতি প্রদর্শন করাই জায়েজ। তবে নত হয়ে সম্মান করা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। উম্মতে মুহাম্মদিয়াতে তা জয়েজ নেই; হাদীস দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে। এ উম্মতের সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদনের রীতি হলো সালাম ও মোসাফাহ করা। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا. (قَالَ شُعَيْبُ الأرنؤوط وأصحابه : صَحِيْح لِغَيْرِه)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির জন্যে উচিত নয় অপর ব্যক্তিকে সেজদা করা। কাউকে সেজদা করা যদি ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক অধিকার রয়েছে।

[মুনসাদে আহমদ : হাদীস নং ১২৬১৪, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৬৪]

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এখানে সেজদা দ্বারা শরয়ী অর্থ তথা وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে لآدم-এর মাঝে لَام-টি اِلٰى-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ সেজদা তো আল্লাহ তা'আলার জন্যেই করা হয়েছিল, হযরত আদম (আ.) ছিলেন তাদের জন্যে কিবলা স্বরূপ। যেমন- বায়তুল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করা হয়ে থাকে।

কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এতে হযরত আদম (আ.)-কে মর্যাদা দানের ব্যাপারটি প্রামাণিত হয় না। যেহেতু এখানে আদম (আ.)-এর সম্মান জানানোই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই ইবলিস বলেছিল-

أَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا. قَالَ اَرَئَيْتَكَ هٰذا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ. (اَلْاِسْرَاءِ : ٦١ - ٦٢)

অর্থাৎ, আমি কি সেজদা করব তাকে, যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? আপনি কি লক্ষ্য করেননি, এতে করে আপনি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবেন।

এতে বোঝা যায় ইবলিস সেজদা করা থেকে বিরত থাকার কারণ হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার দ্বারা তাকে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে। আর وَضْعُ الْجَبْهَةِ অর্থের ক্ষেত্রে সেজদার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ। তাই তাতে বিশেষভাবে আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি পাওয়া যায় না।

সেজদাকারীদের ধারাবাহিকতা : বলা হয় সর্বপ্রথম আদমকে (আ.) সেজদা করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) তারপর হযরত মিকাঈল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ. ও হযরত আজরাঈল (আ.)। তারপর নিকটতম ফেরেশতা ও অন্যান্যরা। সে দিন ছিল শুক্রবার। এ সেজদা চলেছে দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ ..... وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

ফেরেশতাদের মাঝে ইবলিসের বসবাস ও তার ঔদ্ধত্যের কারণ : ইবলিসের এ ঔদ্ধত্যের কারণ হলো, পৃথিবীতে জিন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসমানেও তাদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে তারা ক্রমে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদের কতককে নিপাত করেন এবং কতককে মরুভূমি, পাহাড় ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দেন। জিনদের মধ্যে ইবলিস ছিল শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ইবাদতগোজার। সে নিজে জিনদের অন্যায়-অনাচারে জড়িত ছিল না বলে প্রকাশ করে এবং ফেরেশতারাও তার জন্যে সুপারিশ করে। তাই সে নিষ্কৃতি পায়।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ عَرَضَهُمْ

বস্তুসমূহ কীভাবে পেশ করা হয়েছিল? : হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বস্তুগুলোকে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্রাকারে পেশ করেছিলেন। ذات বা বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে তো পদ্ধতিটা সুস্পষ্ট। কিন্তু যেগুলো مَعَانِى-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- আনন্দ, জ্ঞান, অজ্ঞতা, শক্তি ইচ্ছা- সেগুলো পেশ করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর মনে সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি প্রক্ষেপণ করেছিলেন। ফলে তিনি তা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ..... الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

ফেরেশতাগণের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার স্বীকারোক্তি : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়ে এবং তার মুখে সেগুলোর নাম উচ্চারণ করিয়ে ফেরেশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। অপরদিকে পৃথিবী পরিচালনার জন্যে ইলমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। যখন ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির রহস্য ও ইলমের গুরুত্ব উদ্ভাসিত হলো, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান ও অনুভবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিল।

সেজদার পদ্ধতির বর্ণনা ও মতভেদ : হযরত আদম (আ.)-কে ফেরেশতাগণ যে সেজদা করেছিলেন, তা নামাজের মতো মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে হয়নি; বরং তারা মাথা নুইয়ে হযরত আদম (আ.)-কে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই ও পরিবারবর্গ হযরত ইউসুফ (র.)-এর প্রতি যে সেজদা করেছিল, তাও এ উদ্দেশ্যেই ছিল। কেননা, ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে হতে পারে না। সম্মান ও মর্যাদা সবার প্রতি প্রদর্শন করাই জায়েজ। তবে নত হয়ে সম্মান করা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। উম্মতে মুহাম্মদিয়াতে তা জয়েজ নেই; হাদীস দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে। এ উম্মতের সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদনের রীতি হলো সালাম ও মোসাফাহ করা। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا. (قَالَ شُعَيْبُ الأرنؤوط وأصحابه : صَحِيْح لِغَيْرِه)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির জন্যে উচিত নয় অপর ব্যক্তিকে সেজদা করা। কাউকে সেজদা করা যদি ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক অধিকার রয়েছে।

[মুনসাদে আহমদ : হাদীস নং ১২৬১৪, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৬৪]

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এখানে সেজদা দ্বারা শরয়ী অর্থ তথা وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে لِآدم-এর মাঝে لَام-টি اِلٰى-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ সেজদা তো আল্লাহ তা'আলার জন্যেই করা হয়েছিল, হযরত আদম (আ.) ছিলেন তাদের জন্যে কিবলা স্বরূপ। যেমন- বায়তুল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করা হয়ে থাকে।

কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এতে হযরত আদম (আ.)-কে মর্যাদা দানের ব্যাপারটি প্রামাণিত হয় না। যেহেতু এখানে আদম (আ.)-এর সম্মান জানানোই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই ইবলিস বলেছিল-

أَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا. قَالَ اَرَئَيْتَكَ هٰذا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ. (اَلْاِسْرَاءِ : ٦١ - ٦٢)

অর্থাৎ, আমি কি সেজদা করব তাকে, যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? আপনি কি লক্ষ্য করেননি, এতে করে আপনি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবেন।

এতে বোঝা যায় ইবলিস সেজদা করা থেকে বিরত থাকার কারণ হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার দ্বারা তাকে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে। আর وَضْعُ الْجَبْهَةِ অর্থের ক্ষেত্রে সেজদার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ। তাই তাতে বিশেষভাবে আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি পাওয়া যায় না।

সেজদাকারীদের ধারাবাহিকতা : বলা হয় সর্বপ্রথম আদমকে (আ.) সেজদা করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) তারপর হযরত মিকাঈল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ. ও হযরত আজরাঈল (আ.)। তারপর নিকটতম ফেরেশতা ও অন্যান্যরা। সে দিন ছিল শুক্রবার। এ সেজদা চলেছে দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ ..... وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

ফেরেশতাদের মাঝে ইবলিসের বসবাস ও তার ঔদ্ধত্যের কারণ : ইবলিসের এ ঔদ্ধত্যের কারণ হলো, পৃথিবীতে জিন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসমানেও তাদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে তারা ক্রমে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদের কতককে নিপাত করেন এবং কতককে মরুভূমি, পাহাড় ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দেন। জিনদের মধ্যে ইবলিস ছিল শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ইবাদতগোজার। সে নিজে জিনদের অন্যায়-অনাচারে জড়িত ছিল না বলে প্রকাশ করে এবং ফেরেশতারাও তার জন্যে সুপারিশ করে। তাই সে নিষ্কৃতি পায়।

সাধারণ জিনদের আলোচনা পবিত্র কুরআনে সম্ভবত এজন্য করা হয়নি যে, জ্ঞানীরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, ফেরেশতাদের উত্তম জামাতকে এ নির্দেশ [সিজদা করার হুকুম] দেওয়া হয়েছে। তবে জিন জাতি যারা ফেরেশতাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়, তারা তো পরিপূর্ণরূপে এ নির্দেশের মধ্যে গণ্য হবে। পরিষ্কার ব্যাখার প্রয়োজন নেই। শয়তান হুকুম অমান্য করেছে। এ জন্য বিশেষভাবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে; বরং এটা হচ্ছে জিন জাতি এ নির্দেশে গণ্য থাকার নিদর্শন। এমতাবস্থায় اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلْ হবে। শয়তান যেহেতু আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলা অহংকার দ্বারা করেছে, তাই সে চির বিতাড়িত হয়েছে। এর দ্বারা অহংকারের বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি হওয়া বরং সমস্ত গুনাহের মূল হওয়া বোঝা গেল। এখানো যদি কেউ শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতা ও অস্বীকার করে, তাকেও কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। [কামালাইন খণ্ড. ১, পৃষ্ঠ : ৫৩]

আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত সকল যুক্তি অকার্যকর : হযরত আদম (আ.)-কে সেজদার আদেশ অমান্য করার পেছনে ইবলিসের যুক্তি হলো–

১. তাকে আগুন দ্বারা এবং হযরত আদম (আ.)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করো হয়েছে।
২. আগুন মাটি থেকে উত্তম।
৩. উৎকৃষ্টের শাখা উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের শাখা নিকৃষ্ট হয়।
৪. উৎকৃষ্ট দ্বারা নিকৃষ্টের সম্মান করানো জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিপন্থি।

ফলাফল হলো, আমাকে হযরত আদম (আ.)-এর সামনে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া বিচক্ষণতার খেলাফ। বিচক্ষণতার দাবি হলো, হুকুম এর বিপরীত হওয়া, অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে আমার সম্মান করার জন্যে হুকুম দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীত যুক্তি উপস্থাপন করাই অযৌক্তিক এবং যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই সৃষ্টির যুক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। [প্রাগুক্ত : ৫৫]

শব্দ বিন্যাস সংক্রান্ত সন্দেহ নিরসন : اَبٰى-এর পরে وَاسْتَكْبَرَ শব্দটি স্পষ্ট করে দিল যে, আদেশ অমান্য করার ভিত্তি কোনো ভুল ধারণা কিংবা দ্বিধা-সংশয় নয়; বরং অহংকারই ছিলো এর মূল কারণ। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, নিয়ম অনুযায়ী عِلَّة-টি مَعْلُوْل-এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। এখানে اِبَاء-কে আগে এবং اِسْتِكْبَار-কে পরে এনে তারতীলের খেলাফ করা হয়েছে। কেননা অহংকার আগে করা হয় তারপর অস্বীকার করা হয়। এমনটি কেন?

এর উত্তর হলো, এখানে مَعْلُوْل তথা অস্বীকৃতি হলো প্রকাশ্য এবং অনুভূত বিষয় আর عِلَّة তথা تَكَبُّر হলো مَعْنَوِىْ ও غَيْر مَحْسُوْس বিষয়। এজন্যে مَحْسُوْس-কে غَيْر مَحْسُوْس-এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। [হাশিয়াতুল জামাল]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ ..... وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ ..... الخ

ইতনাব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ বলেন। এর ব্যাপকতায় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপর তিনি আবার বলেন– وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ; অথচ পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাপকতার মাঝে বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। তারপরও আলাদা করে বিস্তারিতভাবে উল্লেখের কারণ হলো, সবকিছুই যে আল্লাহর ইলমের অন্তর্ভুক্ত, তা গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা। পরিভাষায় একে إِطْنَاب বলা হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

তিবাক : আলোচ্য অংশে تَكْتُمُوْنَ ও تُبْدُوْنَ ফেয়েল দুটির মাঝে اَلطِّبَاق হয়েছে। এটা عِلْمُ الْبَدِيْع -এর অন্তর্গত একটি পরিভাষা। এর অর্থ হলো,একটি বক্তব্যে বিপরীতার্থ বোধক দুটি শব্দ উল্লেখ করা। আলোচ্য আয়াতে تَكْتُمُوْنَ ও تُبْدُوْنَ বিপরীতার্থবোধক শব্দ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

ইলতিফাত : আলোচ্য আয়াতে অংশটুকু পূর্ববর্তী وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ-এর উপর আতফ হয়েছে। ফলে আয়াাতে غائب থেকে مُتَكَلِّم-এর দিকে اِلْتِفَات করা হয়েছে। এই ইলতিফাতের উদ্দেশ্য হলো, বড়ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করা।

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত আদম (আ.)-এর পরিচয় : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর খামীর এমন মাটি দ্বারা তৈরি করেছেন, যা নিত্যনতুন পরিবর্তনশীল ছিল। সে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর দেহাবয়ব তৈরি করে দীর্ঘ দিন রেখে দেওয়ার কারণে, তা শুকিয়ে মাটির পাকা পাত্রের ন্যায় হয়ে গেল। তাতে আঘাত করলে খনখন শব্দ হতো। তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই মাটির নির্মিত দেহ অবয়বের মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তা মাংস, চর্ম হাড়, রগ, শিরা, উপশিরা ইত্যাদি বিশিষ্ট জীবন্ত মানুষ হয়ে গেল। আর তার মধ্যে ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞানবুদ্ধি, শিক্ষা লাভের প্রেরণা এবং ভাবের অবস্থার অধিকারীরূপে দৃষ্ট হতে লাগল। আর এ আদম (আ.)-ই হলেন পৃথিবীর প্রথম মানব। এজন্যে তাঁকে বলা হয় আবুল বাশার তথা মানব জাতির আদি পিতা। খলিফাতুল্লাহ উপাধির প্রথম ধারক হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করলেন, তখন সম্ভবত দাজলা-ফুরাত বিধৌত অঞ্চলে বসবাস করেন, বর্তমনে যাকে ইরাক বলা হয়। তাওরাতে হাবীল, কাবীল ও শীস তাঁর এই তিন সন্তানের নাম পাওয়া যায়। এক সূত্রমতে, তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৯৩০ বছর। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭২]

আদম নামকরণের কারণ : অল্লামা ইবনে হাজার (র.) আদম ও হাওয়া সম্পর্কে বলেন, এ নাম দুটি সুরইয়ানী। আল্লামা জাওহারী ও জাওয়ালকী (র.) বলেন, এ নাম দুটি আরবি। আল্লামা সালাবী (র.) বলেন, হিব্রু ভাষায় মাটিকে আদাম বলার কারণে তার নাম আদম রাখা হয়েছে। কারো মত হলো, ভূ-ত্বক তথা اَدِيْم থেকে সৃষ্ট বলেই তিনি আদম। আর কারো কারো মতে দেহের পিঙ্গল বর্ণের (اُدْمَة) কারণে তার নাম আদম। কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, اٰدَم শব্দটি اَدَمَتْ তথা خَلَطَتْ (মিশ্রিত হয়েছে) শব্দ হতে গৃহীত। যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর দেহাবয়বের খামির পানি ও মাটির মিশ্রণে প্রস্তুত হয়েছে, তাই তাকে আদম বলে নামকরণ করা হয়েছে। হাওয়া (আ.)-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

٣٥. ﴿وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ﴾ تَأْكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ ﴿وَزَوْجُكَ﴾ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ وَكَانَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ ﴿الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا﴾ أَكْلًا ﴿رَغَدًا﴾ وَاسِعًا لَا حَجْرَ فِيْهِ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ بِالْأَكْلِ مِنْهَا وَهِيَ الْحِنْطَةُ أَوْ الْكَرْمُ أَوْ غَيْرُهُمَا ﴿فَتَكُوْنَا﴾ فَتَصِيْرَا ﴿مِنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾ اَلْعَاصِيْنَ.

৩৫. এবং আমি বললাম, হে আদম, আপনি انت সর্বনামটি اسكن-এর মধ্যকার انت-এর تاكيد হয়েছে, যেমন পরবর্তী শব্দ زوجك-কে তার উপর عطف করা যায়। ও আপনার সঙ্গিনী হওয়া, এটা মদ্দ (দীর্ঘালয়)-সহ পড়া হয়। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখানে থেকে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে ও বাধাহীন আহার করো। আর আহার করতে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা গম বা আঙ্গুর বা অন্য কোনো বৃক্ষ ছিল। তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অর্থাৎ, অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٣٦. ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ إِبْلِيْسُ أَذْهَبَهُمَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَأَزَالَهُمَا نَحَّاهُمَا ﴿عَنْهَا﴾ أَيْ الْجَنَّةِ بِأَنْ قَالَ لَهُمَا هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَقَاسَمَهُمَا بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَهُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ فَأَكَلَا مِنْهَا ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ﴾ مِنَ النَّعِيْمِ ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوْا﴾ إِلَى الْأَرْضِ أَيْ أَنْتُمَا بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا ﴿بَعْضُكُمْ﴾ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ ﴿لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ مِنْ ظُلْمِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ مَوْضِعُ قَرَارٍ ﴿وَمَتَاعٌ﴾ مَا تَتَمَتَّعُوْنَ بِهِ مِنْ نَبَاتِهَا ﴿إِلٰى حِيْنٍ﴾ وَقْتَ انْقِضَاءِ آجَالِكُمْ.

৩৬. কিন্তু শয়তান ইবলিস তাদের উভয়কে সরিয়ে দিল। অপর এক কেরাতে فازالهما পঠিত হয়েছে। অর্থ হলো উভয়কে সরিয়ে নিয়ে গেল। তা থেকে অর্থাৎ, জান্নাত থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল তাদেরকে ইবলিস বলেছিল, আমি কি তোমাদেরকে স্থায়ী করার বৃক্ষ প্রদর্শন করব? সে তাদের উভয়ের নিকট আল্লাহর শপথ করে বলল, নিশ্চয়ই সে তাদের হিতকামীদের একজন। ফলে তারা উভয়ে এ বৃক্ষ হতে আহার করল এবং এভাবে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আবাসে ছিল, সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, পৃথিবীর দিকে তোমরা তোমাদের অনাগত সন্তান-সন্ততিসহ নেমে যাও একে অন্যের বংশধরদের একজন অপরজনের শত্রুরূপে একজন অপরজনের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করার কারণে। এবং পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস অবস্থানস্থল ও জীবিকা রইল তার উপর উদগত শস্যাদি যা তোমরা উপভোগ করবে তা কিছু কালের জন্যে তোমাদের নির্দিষ্ট বয়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ. تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ

ইসমে যমীরটি তাকীদ স্বরূপ : معطوف عليه ও عطف-এর মধ্যে সামঞ্জস্য জরুরি। এজন্যে اسكن ফে'লের পর وزوجك-এর পূর্বে তাকীদস্বরূপ ইসমে যমীর ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে ইসমের عطف ইসমের সাথে হয়। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ

হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি : মুফাসসির (র.) এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, হযরত আদমের স্ত্রী হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি আদমের বাম পাঁজরের হাড় দ্বারা। এ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর চোখে গভীর ঘুম দিয়ে দেন। তারপর বাম পাঁজর থেকে একটি হাড় খুলে নেন। সে হাড় থেকে সৃষ্টি করেন হযরত হাওয়া (আ.)-কে। হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে এ ঘটনাই প্রচলিত। এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয়, নারীকে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করার কারণেই প্রত্যেক পুরুষের বাম পাঁজরের একটি হাড় কম।

পুরুষের ডান পাশে ১৮টি হাড় থাকে এবং বাম পাশে থাকে ১২টি। প্রাচীনকাল থেকেই এমন ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্লেমিশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ভেসালিয়াস প্রমাণ করেন যে, পুরুষ-নারী উভয়েরই পাঁজরে হাড়ের সংখ্যা সমান। মানবদেহের পাঁজরের হাড়ের সংখ্য মোট ১২ জোড়া অর্থাৎ, ২৪টি। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১]

তবে কুরআনে হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে রয়েছে- خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ـ (النساء) এর অতিরিক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়নি। হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরের বাম হাড় থেকে সৃষ্টির ঘটনাটি মূলত বাইবেলের বর্ণনা। তা ছাড়া নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ـ (رواه مسلم في صحيحه برقم : ١٤٦٨)

বাইবেলের বর্ণনা এবং উপরিউক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে মূল পাঁজরের বাম হাড় থেকে হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকেও এর কাছাকাছি বিবরণ বর্ণিত রয়েছে।

তবে কতিপয় মুহাক্কি বলেন, হযরত আদম (আ.)-এর পাজর থেকে হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো বক্তব্য নেই। আর মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, পুরুষের সাথে অসামঞ্জস্যতা ও অভিমানের ক্ষেত্রে পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সাথে তুলনা করা। এর দ্বারা গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ তা ছাড়া রেওয়ায়াতটির শব্দও এ অভিমতটির সমর্থন করে। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে- خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ তথা নারীজাতি সৃষ্টি করা হয়েছে; শুধু হাওয়া (আ.)-এর কথা বলা হয়নি। তা ছাড়া কোনো হাদীসের শব্দমালা হলো- أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ; এতে সরাসরি তাশবীহের শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

[আল বাহরুল মুহীত : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৪; আল মুফাসসাল ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম : পৃষ্ঠা ২৫৮]

قَوْلُهُ : لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ـ بِالْاَكْلِ مِنْهَا

ফল খেতে জোরালোভাবে নিষেধ করা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ-এর তাফসীরে بِالْاَكْلِ مِنْهَا বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, لَا تَقْرَبَا-এর মাঝে স্থানগত নৈকট্য থেকে নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য নয়; বরং ভক্ষণ না করার অর্থকে জোরালো করা উদ্দেশ্য। মূলত ফল খাওয়াটাই ছিল নিষিদ্ধ, কিন্তু সতর্কতামূলকভাবে বৃক্ষের কাছে ঘেষতেও বারণ করা হয়েছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا;

قَوْلُهُ : عَنْهَا ـ اَيِ الْجَنَّةِ

عَنْهَا-এর যমীরের مَرْجِع নির্ধারণ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা عَنْهَا-এর مَرْجِع উল্লেখ করেছেন। তিনি যমীরটির مَرْجِع নির্ধারণ করেছেন اَلْجَنَّة; অবশ্য কেউ কেউ عَنْهَا-এর مَرْجِع নির্ধারণ করেছেন الشَّجَرَةَ শব্দটিকে। সেক্ষেত্রে عَنْ-টি كَارণবাচক হবে এবং بَاءِ الْمُسَبَّبِيَّة-এর অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ, ঐ গাছের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাতে পারল।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَزَلَّ : সীগাহ اثبات فعل ماضى مطلق معروف وَاحد مذكر غائب বহছ افعال মাসদার الإِزْلَالُ মূলবর্ণ (ز ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف অর্থ- স্থানচ্যুত করল, পদস্খলন ঘটাল। زَلَّةٌ অর্থ- পদস্খলন। অবাধ্যতা কিংবা ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনের অর্থ তাতে নেই। اَزَلَّ-এর مشتق منه দুটি হতে পারে-

১. زَلَّةٌ যার অর্থ- اِسْتِرْسَالُ الرَّجُلِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ অনিচ্ছাকৃতভাবে পদস্খলন হওয়া।

২. زَلَّ যার অর্থ- بُعْدُ عَنِ الْمَكَانِ নির্ধারিত স্থান থেকে দূরে যাওয়া।

এ অর্থের সময় اَخْرَجَهُمَا হলো فَاَزَلَّهُمَا-এর তাকীদ ও বয়ান। [মুফরাদাত, কুরতুবী]

عَدُوٌّ : শব্দটি فعول-এর ওযনে সিফতের সীগাহ, ইবনে ফারেস (র.) বলেন- عَدُوٌّ শব্দ একবচন ও বহুবচন, মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ সর্বক্ষেত্রে এক। কখনো দ্বিবচন ও মুয়ান্নাছও ব্যবহৃত হয়। শব্দটির বহুবচন হলো عُدُوٌّ ও نصر ينصر-এর মাসদার عَدْوًا অতিরিক্ত করা থেকে নির্গত, যখন এর সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে হয় তখন একে عَدَاوَةٌ ও مُعَادَاةٌ বলা হয়। যেমন- فَيَسُبُّوْا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ; আর যদি এর সম্পর্ক বান্দার দিকে হয়, তাহলে অর্থ হবে নাফরমানি করা, যেমন- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ; আর যদি আল্লাহর দিকে হয়, তাহলে অর্থ হবে নাফরমানির কারণে বান্দাকে শাস্তি দেওয়া, ক্ষমা না করা। যেমন- فَاِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ [মুফরাদাত, লাগাতুল কুরআন]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ ... فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ এ জুমলাটি পূর্বের জুমলা اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الخ-এর উপর عطف হয়েছে; শুধু قُلْنَا ফে'লের উপর নয়। কেননা, উভয়টির কার্যকাল এক ছিল না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, عَطْف الفعل على الفعل তথা اِذْ قُلْنَا-কে قُلْنَا-এর উপরও عطف করা সহীহ আছে। সময়ের ভিন্নতা তার জন্যে প্রতিবন্ধক নয়। কেননা, اِذْ হলো فعل محذوف-এর মাফঊলে বিহী। তাকদীরী ইবারত হবে এভাবে–

وَاذْكُرْ وَقْتَ قَوْلِنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا وَقَوْلِنَا لِآدَمَ اسْكُنْ أَى اذْكُرِ الْوَقْتَيْنِ وَمَا وَقَعَ فِيْهِمَا. (حاشية الجمل : ٦١)

وَزَوْجُكَ أَنْتَ-এর মধ্যে اُسْكُنْ যমীরটি اُسْكُنْ-এর মাঝে বিদ্যমান ফায়েলের যমীরের তাকীদ আর وَزَوْجُكَ আতফ হয়েছে ফায়েলের উপর। اَلْجَنَّةَ শব্দটি اسْكُنْ-এর মাফঊলে বিহী। وَكُلَا مِنْهَا-এর মাঝে مِنْهَا অংশটি كُلَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর رَغَدًا শব্দটি উহ্য مفعول مطلق-এর সিফাত হতে পারে। মূলরূপ হবে– أَكْلًا رَغَدًا; অথবা মাসদারটি ইসমে ফায়েল অর্থে كُلَا-এর ফায়েল থেকে হালও হতে পারে। মূলরূপ হবে– كُلَا رَاغِدَيْنَ; حَيْثُ شِئْتُمَا অংশটুকু মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে كُلَا-এর যরফ হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ ..... وَمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ

هُمَا মাফঊলে বিহী, اَلشَّيْطٰنُ ফায়েল, فَأَخْرَجَهُمَا জুমলায়ে معطوفه;

بَعْضُكُمْ অংশটি মুবতাদা, لِبَعْضٍ অংশটুকু عَدُوٌّ শব্দটির সাথে مُتَعَلِّقٌ। এই জুমলায়ে ইসমিয়াটি اِهْبِطُوْا-এর ফায়েল থেকে হাল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। মূলরূপ হলো– اِهْبِطُوْا مُتَعَادِّيْنَ; وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ-এর وَاو-টি عَاطِفة, لَكُمْ فِي الْأَرْضِ অংশদুটি উহ্য অগ্রবর্তী খবরের সাথে মুতা'আল্লিক। আর مستقر শব্দটি হলো পশ্চাদবর্তী মুবতাদা। وَمَتَاعٌ অংশটুকু مستقر-এর উপর আতফ হয়েছে। إِلٰى حِيْنٍ অংশটুকু مَتَاع-এর উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। মূলরূপ হলো– مَتَاعٌ مُمْتَدٌّ إِلٰى حِيْنٍ

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا

فَأَزَلَّهُمَا শব্দের কেরাত : ৩৬ নং আয়াতে উল্লিখিত فَأَزَلَّهُمَا শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.)-এর কেরাত অনুযায়ী শব্দটির زَاء বর্ণের পর আলিফবিহীন পড়া হয়। রসমে উসমানীতেও শব্দটিতে আলিফবিহীন লিখিত হয়েছে।

খ. ইমাম হামযা (রা.) শব্দটির زاء বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে فَأَزَالَهُمَا পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ .... فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

رَغَدًا শব্দের ব্যাখ্যা : رَغَدًا আরবি অভিধান অনুযায়ী নিয়ামত ও আহার্য বস্তুকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোনো প্রকার শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এতো পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। অর্থাৎ, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফল-মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করতে থাক। ওগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোনো চিন্তাও করতে হবে না।

নিষিদ্ধ গাছের পরিচয় : কুরআনে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধের কথা বর্ণিত আছে; কিন্তু সেটি কী গাছ ছিল, কুরআন কারীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোনো নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোনো কোনো মুফাসসির সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আঙ্গুর গাছ বলেছেন। অনেকে বলেছেন, আঞ্জীরের গাছ। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট রেখে দেওয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (তোমরা উভয়ে জালেমের অন্তর্ভুক্ত হবে) অর্থাৎ, যদি এ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা উভয়েই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা আল্লাহর হুকুমকে অপাত্রে রেখেছে। কারণ, ظُلْمٌ-এর মূল অর্থ হলো- وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ তথা কোনো বস্তুকে তার নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে রাখা। এই স্পষ্ট ঘোষণা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায়, সে সময় জান্নাত পুরস্কার বা অমরত্ব লাভের নিবাস ছিল না; বরং সেখানে আহকাম ও আদেশ-নির্দেশ ছিল। এই যখন ছিল জান্নাতের সে সময়ের স্বরূপ, তখন জান্নাতে শয়তানের প্ররোচনার অনুপ্রবেশ কিংবা আদমের সেখান থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি হওয়ার অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৯]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ... مَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ

শয়তানের প্ররোচনার পদ্ধতি : কুরআনে কারীমের শব্দ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর যে নির্দেশ পালন করেননি, তা সাধারণ পাপীদের মতো ছিল না; বরং শয়তানের প্ররোচনায় কোনো ধোঁকায় লিপ্ত হয়েই নিষিদ্ধ কাজটি করে ফেলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্যে কীভাবে জান্নাতে গেল? যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান কীভাবে তাদেরকে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই শয়তান তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০০]

২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জান্নাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে (কারো মতে ময়ূর ও সাপের সাথে যোগসাজস করে) প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী- قَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান শুধু ওয়াসওয়াসা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাইরে থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে প্ররোচিত করে। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৬২]

হযরত আদম (আ.) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ : হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কীভাবে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন? এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যথা-

১. তিনি মনে করেছিলেন, نَهْى-টা ছিল نَهْيِ تَنْزِيْهِى; তাহরীমি নয়।

২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. ইবলিস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন, নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৩]

হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণস্থল : হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে অবতরণ করেছেন- এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ বর্ণনায় ভারতের কথা পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে আরো অনেক মতামত রয়েছে। যেমন-

১. ইবনে আবী হাতেম ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আ.)-কে সাফা পাহাড়ে এবং হযরত হাওয়া (আ.) মারওয়া পাহাড়ে অবতরণ করানো হয়েছিল।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ ভারত অঞ্চলে হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর: শাওকানী]

৩. অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইবনে আবী হাতেম থেকে বর্ণিত আছে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ হয়েছে।

৪. আর ইবনে আবী সাদ এবং ইবনে আসাকির (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আ.) ভারতে অবতরণ করেছেন এবং হযরত হাওয়া (আ.) জিদ্দায় অবতরণ করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আদম (আ.) হাওয়া (আ.)-এর খোঁজে জিদ্দায় আগমন করেন। আর ওখানের কোনো স্থানে হযরত হাওয়া (আ.)-এর ওফাত হয়েছে। 'জিদ্দাহ' তে তার কবরের চিহ্ন আছে। লোকমুখে বলা হয় এ শহরের নামকরণের কারণও এটাই। এ ব্যাপারে এটা একটি নিদর্শন যে, হযরত আদম (আ.)-ও হেজাযের কোথাও হয়তো অবস্থান করেছেন এবং ইন্তেকালও করেছেন।

৫. তাফসীরে খাযিনে আছে, হযরত আদম (আ.) ভারতের স্বরণদ্বীপে (সিংহল) এবং হযরত হাওয়া (আ.) জিদ্দায় অবতরণ করেন। আর ইবলিস অবতরণ করে বসরার আয়লা নামক স্থানে। [তাফসীরে খাযিন ১, পৃষ্ঠা ৫]

এগুলো ছাড়াও পরস্পর বিরোধী আরো বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করাও সম্ভব নয়। এ কথা স্পষ্ট যে, প্রকৃত অবতরণ এক-ই জায়গায় হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন বিধায় বিভিন্ন জায়গার কথা বলেছেন। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২]

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া : এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ.)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য হলো, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ নবীগণ (আ.)-কে গোটা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাদের দ্বারাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থি ছোট বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলির উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দ্বীন ও শরিয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আ.) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্যে তাঁদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাও এ শ্রেণিভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হলো, কোনো ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোনো নবী (আ.) জেনে-শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থি কোনো কাজ করেননি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরিয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনক ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরিয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে এ ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবারে নবীগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলিকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

বোকাদের বেহেশত : মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও বস্তুবাদী সম্প্রদায় বেহেশতকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণায় তো আদন বলতে সিরিয়া ও মিশরের কোনো বাগান উদ্দেশ্য। যেখানে আনন্দ থেকে এ দু'জনকে বের করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা বেহেশত থেকে তাদের অবতরণ করাকে অস্বীকার করে তারপর তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করে যে, সর্বপ্রথম কোথায় অবতরণ করেছেন? কেউ বলে ইরান, কেউ বলে মিশর এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ হিন্দুস্তানের ভূ-খণ্ড সরদ্বীপের কথা বলেন। তারপরও আরাফাতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই এ স্থানকে আরাফাত বলা হয়। আর ওখানেই কোনো স্থানে হযরত হাওয়া (আ.)-এর ওফাত হয়েছে "জিদ্দাহ" তে তার কবরের চিহ্ন আছে। বলা হয় এ শহর এর নামকরণের কারণও এটাই। এ ব্যাপারে এটা একটি নিদর্শন যে, হযরত আদম (আ.)-ও হেজাযেই কোথাও হয়তো অবস্থান করেছেন এবং ইন্তেকালও করেছেন।

সীমানার সংরক্ষণ : وَلَا تَقْرَبَا الخ আয়াত দ্বারা প্রকৃত শায়খগণের ঐ অভ্যাসের মূলনীতি বের হয়ে আসে যে, কোনো কোনো সময় তারা শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদিত কার্যাবলি থেকেও বিরত থাকেন। যাতে করে অনুমতিবিহীন কাজের দিকে ধাবিত না হয়ে যায়। যেমন উল্লিখিত বৃক্ষের নিকটে যাওয়া সরাসরি কোনো প্রকার মন্দ কাজ ছিল না; বরং বৈধ ছিল। কিন্তু খাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য এটাকেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ الخ : আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, যাকে নিষেধ করা হয়েছে সেও যেন নিজেকে শয়তানি ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ মনে না করে।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ .... فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

اَنْتَ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, হযরত আদম (আ.)-ই ছিলেন মূল সম্বোধিত, হযরত হাওয়া (আ.)-এর অবস্থান ছিল تَابِع বা অনুবর্তী। উক্ত আয়াতে জান্নাত হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়ের বসবাসের স্থান হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যাকে আরবিতে সংক্ষেপে اُسْكُنَا الْجَنَّةَ বলা যেত। যেমন كُلَا এবং لَا تَقْرَبَا ফে'লদ্বয়ের মাঝে উভয়কে একই সীগাহ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে তা না করে اَنْتَ وَزَوْجُكَ শব্দ ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধিত সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ শব্দেই বলা হয়েছে যে, তোমার স্ত্রীও তোমার সাথে জান্নাতে থাকবে। সুতরাং এ থেকে দুটি মাসয়ালা জানা যায়।

১. স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব।

২. এই বসবাসের মধ্যেও স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী। যে ঘরে স্বামী থাকবে, স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকা উচিত। [জামালাইন]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ

মুবহাম শব্দ ব্যবহার করা : আলোচ্য অংশটুকুতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে কোত্থেকে বের করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। এই অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, তাদের সুখ-শান্তির বিষয়টিকে বড় করে উপস্থাপন করা; যাতে পাঠক নিজের কল্পনাশক্তি দ্বারা সেই নিয়ামতটুকু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। যদি এখানে স্পষ্ট করে مِنَ النَّعِيْمِ অথবা مِنَ الْجَنَّةِ বলা হতো, তাহলে পাঠক ও শ্রোতার মাঝে এ অনুভূতিটুকু জাগিয়ে তোলা হতো না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

নিষেধের ক্ষেত্রে মুবালাগা : আলোচ্য আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো, নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ থেকে নিষেধ করা। কিন্তু তা ব্যক্ত করা হয়েছে নিষিদ্ধ গাছের নিকটবর্তী হওয়া থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। এর পিছনে উদ্দেশ্য হলো, নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ থেকে মুবালাগার সাথে সুদৃঢ়ভাবে নিষেধ করা।

✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

ইবলিসের পরিচয় : শয়তানকেই আলোচ্য আয়াতে তার গুণবাচক নাম ইবলিস দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান হলো সেই পাপিষ্ঠ সত্তা, যে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে দূরে সরে গেছে।

الشَّيْطَانَ (رَاغَبَ) اَىْ تَبَاعَدَ فَيُقَالُ مِنْ شَطَنَ اَىْ بَعُدَ سُمِّىَ بِهٖ لِبُعْدِهٖ عَنِ الْخَيْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ (معالم)

নাফরমানির কারণে জান্নাত থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। পৃথক কোনো ক্ষমতা তার নেই। পাপকর্মে মানুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অসুন্দরকে সুন্দরের মোড়কে তুলে ধরার কাজে সে অত্যন্ত সুনিপুণ। দূরত্ব ও ব্যবধান তার জন্যে কোনো সমস্যাই নয় এবং স্থূল প্রতিবন্ধকতা যে কোনো ধরনেরই হোক, তার উদ্দেশ্যের পথে তা প্রতিবন্ধক হতে পারে না। [তাফসীরে মাজেদী]

٣٧. ﴿فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ﴾ أَلْهَمَهُ إِيَّاهَا وَفِي قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ آدَمَ وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ أَيْ جَاءَتْهُ وَهِيَ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا﴾ الْآيَةُ فَدَعَا بِهَا ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ قَبِلَ تَوْبَتَهُ ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ﴾ عَلٰى عِبَادِهِ ﴿الرَّحِيْمُ﴾ بِهِمْ

৩৭. অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কয়েকটি বাণী পেলেন। অর্থাৎ, এই বাণীসমূহ আল্লাহ তা'আলা তার উপর ইলহাম করেন। অপর এক কেরাতে آدم শব্দটি নসব এবং كلمات শব্দটি রফা সহকারে রয়েছে। অর্থাৎ, আদম (আ.)-এর নিকট কিছু বাণী আসল। তা হলো, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (পূর্ণ আয়াত)। তখন তিনি এই বাণীর মাধ্যমে দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন তাঁর তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ এবং তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٣٨. ﴿قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا﴾ مِنَ الْجَنَّةِ ﴿جَمِيْعًا﴾ كَرَّرَهُ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ ﴿فَإِمَّا﴾ فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الزَّائِدَةِ ﴿يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى﴾ كِتَابٌ وَرَسُوْلٌ ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ فَآمَنَ بِيْ وَعَمِلَ بِطَاعَتِيْ ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.

৩৮. আমি বললাম, তোমরা এই স্থান থেকে জান্নাত থেকে নেমে যাও সকলেই। পরবর্তী বাক্যটিকে এর উপর عطف করার উদ্দেশ্যেই এই বাক্যটি تكرار (পুনরাবৃত্তি) করা হয়েছে। অনন্তর যদি এখানে ان شرطية-এর ن অক্ষরটিকে ما زائدة-এর মাঝে ادغام করা হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে তোমার নিকট কোনো পথনির্দেশ কিতাব ও রাসূল আসে, তখন যারা আমার পথনির্দেশ মানবে অনন্তর আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আমার আনুগত্য করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না পরকালে। কেননা তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣٩. ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ﴾ كُتُبِنَا ﴿اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ مَاكِثُوْنَ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُوْنَ.

৩৯. আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে ও আমার নির্দেশনামাকে অর্থাৎ, আমার কিতাবসমূহকে অস্বীকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। সর্বদা অবস্থান করবে। তারা ধ্বংস হবে না এবং বের হতেও পারবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ

আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) رَبَّنَا ظَلَمْنَا ..... الخ-কে আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত বাণী বলেছেন। এটি বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী। কেউ বলেন, সে বাক্যটি ছিল নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ أَنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (بيضاوي)

قَوْلُهٗ : كرره لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ

عطف দ্বারা اتصال উদ্দেশ্য : আলোচ্য ক্ষেত্রে اهبطوا-কে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে। ৩৬ নং আয়াতে প্রথম هبوط দ্বারা মেহনত ও চেষ্টা সাধনার ক্ষেত্রে দুনিয়ার দিকে অবতরণকে বুঝানো হয়েছে।

যেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্যে বহু মেহনত করতে হবে। পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ হবে। আর এ هبوط-টি হবে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্যে। আর ৩৮ নং আয়াতে দ্বিতীয় هبوط দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানের মধ্যেই মানুষ শরিয়তের বিধি-বিধানেরও মুকাল্লাফ হবে। অর্থাৎ, দু'বার اهبطو বলার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন।

উভয় মাকসাদের মধ্যখানে فتلقى آدم من ربه জুমলায়ে মু'তারিজাটি এসেছে বিধায় هبوط-কে তাকরার করা হয়েছে। যাতে দ্বিতীয় মাকসাদটি দ্বিতীয়টির সাথে এবং প্রথম মাকসাদটি প্রথমটির সাথে মিলিত হয়। এ উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) ليعطف عليه বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন। এখানে عطف শব্দ দ্বারা পারিভাষিক عطف উদ্দেশ্য নয়; বরং عطف দ্বারা اتِّصال (সংযোগ) বুঝানো উদ্দেশ্য।

তবে আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, প্রথম অবতরণের নির্দেশ ছিল জান্নাত থেকে দুনিয়ার আকাশে আর দ্বিতীয় অবতরণের নির্দেশ ছিল সেখান থেকে পৃথিবীতে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَلَقّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব تفعل মাসদার اَلتَّلَقِّيُ মূলবর্ণ (ل-ق-ي) জিনস ناقص يائي অর্থ- সে লাভ করল, পেল।

اَلتَّوَّابُ : মুবালাগার সীগাহ, অর্থ-

১. অধিক তওবাকারী, যেমন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

২. অধিক তওবা কবুলকারী, যেমন- اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ কুরআন মাজীদে التواب একবচনে শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। বাবে نصر থেকে تَوْبًا تَوْبَةً অর্থ- তওবা গ্রহণ করা, ফিরে আসা, তওবার তৌফিক দেওয়া। যেমন- ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا; تَوْبَة-এর মূল অর্থ اَلرُّجُوْعُ ফিরে আসা, ফিরে তাকানো। যদি শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর দিকে হয়, তাহলে على-এর মাধ্যমে মুতা'আদ্দী হয়। তখন অর্থ হয়- বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি দেওয়া, অর্থাৎ, তওবা কবুল করা। আর যদি বান্দার দিকে সম্পর্ক হয়, তাহলে الى অথবা মাধ্যম ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। তখন অর্থ হয়- লজ্জিত হয়ে বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। এ থেকে اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী চারটি জিনিসের সমষ্টির নাম তওবা। ১. اَلنَّدَمُ بِالْقَلْبِ ২. اَلْاِسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ ৩. اَلْاِضْمَارُ عَلٰى اَنْ لَا يَعُوْدَ ৪. اَلْاِقْلَاعُ بِالْبَدَنِ [কুরতুবী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৩; মুফরাদাত, লুগাতুল কুরআন]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَتَلَقّٰى آدَمُ ..... هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

فَتَلَقّٰى ফে'ল, آدَمُ ফায়েল, كَلِمَاتٌ মাফ'উল, مِنْ رَبِّهٖ অংশটি উহ্য শিবহুল ফে'ল نَازِلَةً-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। فَتَلَقّٰى শিবহুল ফে'লটি كَلِمَاتٍ এর হাল হয়েছে।

اِنَّهٗ-এর মাঝে هٗ হলো اَنْ-এর ইসম। আর পরবর্তী هُوَ যমীরটি হলো ضمير الفصل; اَلتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ মাওসূফ-সিফাত মিলে খবর।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا ..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ-এর মধ্যে اِنْ শর্তিয়ার তাকীদের জন্যে مَا-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى বাক্যটি শর্ত। فَمَنْ تَبِعَ-এর فَاء টি رَابِطَةٌ; পরবর্তী مَنْ-টি শর্তের অর্থ ধারণকারী ইসমে মাওসূল। تَبِعَ هُدَايَ বাক্যটি হলো শর্ত এবং الخ ... فَلَا خَوْفٌ বাক্যটি জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলা হয়ে পূর্ববর্তী শর্তের জাযা হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ

آدَمُ শব্দের কেরাত : ৩৭ নং আয়াতে উল্লিখিত آدم শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.)-এর মতে, اٰدَمُ শব্দটির م বর্ণে পেশযোগে পঠিত হয়েছে।

খ. ইবনে কাসীর (র.) শব্দটির م বর্ণে যবরযোগে পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ .... هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم

হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া : تلقى শব্দের অর্থ– আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ.) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كَلِمَات তথা যেসব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্য শেখানো হয়েছিল, তা কী ছিল– এ সম্পর্কে মুফাসসির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে– رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

নিষিদ্ধ ফল খাওয়াকে مَعْصِيَة বলার কারণ : হযরত আদম (আ.)-এর জন্যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াটা গুনাহ ছিল না; কিন্তু তা তার জন্যে অনুমোদিত ছিল না। তাই বাহ্যত সেটাকে মহান আল্লাহ مَعْصِيَة বা গুনাহ বলেই আখ্যায়িত করেছেন এবং তা থেকে তওবা করার কিছু শব্দ শিখিয়ে দিলেন, যাতে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে এ অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারেন। মূলত এটি حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ এ মূলনীতির আলোকে বিবেচ্য।

কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর ৩০০ বছর পর্যন্ত লজ্জায় আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করেননি। কেউ বলেন, গোটা জমিনবাসীর চোখের অশ্রু একত্র করা হলেও হযরত দাউদ (আ.)-এর চোখের অশ্রুর পরিমাণ অধিক হবে। আর হযরত দাউদ (আ.)-সহ সকল মানুষের অশ্রু একত্র করা হলেও হযরত আদম (আ.)-এর অশ্রুর পরিমাণ বেশি হবে। [তাফসীরে খাযিন সূত্রে হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৪]

তওবার আলোচনায় শুধু হযরত আদম (আ.)-এর কথা উল্লেখের কারণ : হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) দুজনেই ভুল করেছিলেন। কিন্তু فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ বলে দোয়া ও তওবা-ইসতিগফার শুধু হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, নারীগণ পুরুষের অনুগামী হয়ে থাকে। আর تابع-এর আলোচনায় متبوع এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই শুধু হযরত আদম (আ.)-এর ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য সূরা আ'রাফে উভয়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ (اعراف : ٢٣)

قَوْلُهٗ : قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا ..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় : قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেজন্যেই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্যে এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা ঐশী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলিফা হিসেবে।

মানবজাতির আবাসস্থল দুনিয়া : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর তওবা কবুল করলেও জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না; বরং দুনিয়াতে বসবাস করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা বহাল রাখলেন। কেননা, এটাই তার প্রজ্ঞা ও সার্বিক কল্যাণ অনুযায়ী দুনিয়াতে তার দ্বারা নবুয়তের কার্যাদি সম্পন্ন করলেন। বলাবাহুল্য তাঁকে পৃথিবীর জন্যে খলিফা বানানোর জন্যেই সৃজন করা হয়েছিল; জান্নাতের জন্যে নয়। [তাফসীরে উসমানী]

আল্লাহওয়ালাদের পুরস্কার : فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ বলে আল্লাহ তা'আলা আসমানি হেদায়েতের অনুসারীগণের জন্যে দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমত তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ত তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خَوْف ও حَزَن-এর মাঝে পার্থক্য : خَوْف আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حَزَن বলা হয়, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। এ দুটি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধান রয়েছে।

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) خَوْف ও حَزَن-এর পার্থক্য সম্পর্কে বলেন–

اَلْخَوْفُ غَمٌّ يَلْحَقُ الْاِنْسَانَ مِنْ تَوَقُّعِ اَمْرٍ فِى الْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَزَنُ غَمٌّ يَلْحَقُهٗ مِنْ فَوْتٍ فِي الْمَاضِيْ.

কোনো বিপদ আপতিত হওয়ার আগে তজ্জন্য যে কষ্ট ও আশঙ্কা হয়, তার নাম خَوْف আর আপতিত হওয়ার পর যে দুঃখ হয় তাকে বলা হয় حَزَن; যেমন– কোনো রুগ্‌ণ ব্যক্তির মরে যাওয়ার কল্পনায় যে কষ্ট অনুভূত হয়, সেটা خَوْف; আর মরে যাওয়ার পর যে বেদনার সম্মুখীন হতে হয় তাকে حَزَن বলা হয়। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ৯, পার্শ্বটীকা ৫]

অলিগণের চিন্তামুক্ত থাকার কারণ : এখানে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ-এর ন্যায় لَا حَزَنٌ عَلَيْهِمْ না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন, যাঁরা আল্লাহর ওলীর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী। তাঁরা ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজ কিংবা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোক। কেননা, এদের মধ্যে কেউই এমন নয়, যে স্বভাব ও ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং সেজন্যে দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহর ওলীগণ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বিলীন করে দেন। এজন্যে কোনো ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে কখনো বের করা হবে কি?

ক. বের করা হবে না

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ : আর যারা অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে। [সূরা বাকারা : ৩৯]

এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২০টি আয়াত রয়েছে। যথা–

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
বাকারা	৭৫, ৮১, ১৬৭,২১৭	ইউনুস	২৭	আহযাব	৬৪-৬৫
আলে ইমরান	১৬	নাহল	২৯	হাশর	১৭
নিসা	১৪	আম্বিয়া	৯৯	মুজাদালা	১৭
মায়েদা	৩৭, ৮০	যুমার	৭২	তাগাবুন	১০
আরাফ	৩৬	মুমিন	৭৬	জিন	২৩
তাওবা	৬৩, ৬৮	সাজদা	২৮	বায়্যিনাহ	৬

খ. বের করা হবে

ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ.

অর্থ : অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে।

[সূরা সাফফাত : ৬৮]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরিউক্ত ক-অংশের আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর সেখান থেকে তাদেরকে আর বের করা হবে না। এভাবে কোনো কোনো আয়াত خُلُوْد ও وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ শব্দও প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদেরকে উষ্ণ পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর পুনরায় জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। কারণ উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে– فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ.

অর্থাৎ, তারা যাক্কুম ফল ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে। অতঃপর তাদেরকে ফুটন্ত উষ্ণ পানি প্রদান করা হবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে– ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কাফেরদের জাহান্নাম থেকে বের করে উষ্ণ পানি পান করানো হবে। অতঃপর আবার জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং এ আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উষ্ণ পানি পান করানোর জন্যে কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না; বরং জাহান্নাম যেহেতু প্রশস্ত ও বিস্তৃত স্থান, সেহেতু তাতে জাহান্নামিদের জন্যে বিভিন্ন স্তর ও ধাপ থাকবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে নির্দিষ্ট নিবাস বা ঠিকানা থাকবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করে অন্য স্তরে বা কক্ষে নিয়ে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। অতঃপর পুনরায় স্ব স্ব নিবাসে ফিরে আসবে।

সুতরাং এবার বোধগম্য হয়ে গেল যে, مَاءٌ حَمِيْمٌ (উষ্ণ পানি) জাহান্নামের বাইরেও অবস্থিত নয় এবং তা পান করার জন্যে জাহান্নামিদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়াও অত্যাবশ্যক নয়। এভাবে رجوع الى الجحيم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– رُجُوْعٌ اِلٰى دَرَكَاتِ الْجَحِيْمِ وَمُسْتَقَرَّتُهُمْ অর্থাৎ, জাহান্নামের এক স্তর থেকে অপর স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা। অতএব, এখন আর শেষোক্ত আয়াতখানার সাথে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

[তাফসীরে রুহুল মা'আনী ও জামাল]

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

أ. ترجم الاية الكريمة ثم فسرها على نهج المصنف العلام رح.

ب. كيف خلق الله آدم؟ ولم سُمِّيَ آدم دون غيره من أسماءٍ؟ .

ج. ما المراد بالمسميات وما هى الاشياء الداخلة في كلها اوضح . ثم اذكر النسبة بين آدم والملائكة في الإطلاع بالمسميات وعلمها، بالتيقظ التام .

د. الام اشار سبحانه وتعالى بقوله ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ اوضح ايضاحا تاما .

ه. مَا هِيَ الحكمة في أن يجعل الله آدم خليفةً دون غيره؟ ثم بين العمل المشهور الذي دل عليه الآية الأولى مع بيان حكمه وطريقته وفوائده وتوبته بالنصوص الشرعية .

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة .

ب. ما هي الحكمةُ فِي أن يأمُرَ الله تعالى ملائكته أن يسجدوا لادمَ؟ بين مع ايضاح حكم السجدة لغير الله .

ج. بين اعراب لفظ "ابليس" ثم اذكر استثناء ابليس متصل ام منقطع؟ اذكر بحيث يتضح انه كان من الملائكة ام لا؟

د. لم امتنع ابليس من سجود آدم؟ وكم مدة كانَتِ الملائكة في سجود آدم ؟

ه. فسر قوله وكان من الكافرين بحيث يتضح الايراد عليه والجواب عنه .

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

أ. ترجم الاية الكريمة ثم فسرها تفسيرًا بليغًا .

ب. اذكر محل اعراب انت ثم بين وجه ذكره منفصلا، وهو مستتر في اسكن .

ج. استخرج المسائل الفقهية المودعة في الآية حول الزوج والزوجة .

د. قوله : "فتكونا" كم نوعا للفاء وما هي؟ وما المراد بها ههنا؟ وما تَقْتضي الفاء في مثل هذا المقام ؟

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ . قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

أ. ترجم الايتين الكريمتين موضحة .

ب. حَلِّ لُغَات الكلمات الآتية فتلقى، تاب عليه، اهبطوا .

ج. فإن قيل ان إبليس كان كافرا والكافر لا يدخل الجنة فكيف دخل هو وازل آدم وحواء الذي هو سبب هبوطهما؟ أجب متفكرا .

د. اذكر مرجع الضمير في قوله منها ثم بين وجه ذكر اهبطوا دون اخرجوا وذكر صيغة الجمع دون المثنى .

ه. ما معنى الخوف والحزن وماالفرق بينهما؟ اوضح متيقظا.

রুকূ' : ৫

دَعْوَةُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى الْإِيْمَانِ بِالتَّذْكِيْرِ بِالنِّعَمِ عَلَيْهِمْ

অবতীর্ণ নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বনী ইসরাঈলকে ঈমানের প্রতি আহ্বান

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণের নির্দেশ
- ❑ আল্লাহকে ভয় করার আদেশ
- ❑ বনী ইসরাঈলের প্রতি কুরআনের উপর ঈমান আনার আদেশ
- ❑ সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করতে নিষেধ
- ❑ বনী ইসরাঈলের প্রতি নামাজ আদায়ের নির্দেশ
- ❑ নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে
- ❑ আল্লাহর প্রতি বিনয়ীদের জন্যে নামাজ কঠিন নয়

٤٠. ﴿يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ﴾ أَوْلَادَ يَعْقُوْبَ ﴿اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ أَيْ عَلَى آبَائِكُمْ مِنَ الْإِنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَفَلْقِ الْبَحْرِ وَتَظْلِيْلِ الْغَمَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِيْ ﴿وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ﴾ الَّذِيْ عَهِدْتُهُ إِلَيْكُمْ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﴿اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ الَّذِيْ عَهِدْتُ إِلَيْكُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ ﴿وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ﴾ خَافُوْنِ فِيْ تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ دُوْنَ غَيْرِيْ.

৪০. হে বনী ইসরাঈল, অর্থাৎ, ইয়াকূবের সন্তানগণ তোমরা স্মরণ করো আমার সে নিয়ামতের কথা যে নিয়ামত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি প্রদান, সমুদ্র বিদীর্ণকরণ, মেঘের মাধ্যমে ছায়া প্রদান ইত্যাদি দিয়ে; যেন আমার নির্দেশ মান্য করে আমার শোকর আদায় কর এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ করো মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন সম্পর্কে আমার সাথে তোমাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল। আমিও এর বিনিময়ে তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর যে অঙ্গীকার প্রদান করেছিলাম, সে অঙ্গীকার পূরণ করব এবং তোমরা শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো। অর্থাৎ, অঙ্গীকার পূরণ না করার বিষয়ে আমাকেই ভয় করো; অন্য কাউকে নয়।

٤١. ﴿وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ مِنَ التَّوْرَاةِ بِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي التَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ ﴿وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ﴾ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّ خَلْفَكُمْ تَبَعٌ لَّكُمْ فَإِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ ﴿وَلَا تَشْتَرُوْا﴾ تَسْتَبْدِلُوْا ﴿بِاٰيٰتِيْ﴾ الَّتِيْ فِيْ كِتَابِكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ عَرَضًا يَسِيْرًا مِنَ الدُّنْيَا أَيْ لَا تَكْتُمُوْهَا خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُوْنَهُ مِنْ سَفَلَتِكُمْ ﴿وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ﴾ خَافُوْنِ فِيْ ذٰلِكَ دُوْنَ غَيْرِيْ.

৪১. আর দৃঢ়বিশ্বাস করো তার প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ, কুরআন সমর্থকরূপে যা তোমাদের নিকট আছে। অর্থাৎ, তাওরাতের। কারণ তাওহীদ ও নবুয়তের ক্ষেত্রে কুরআন তাওরাত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না কিতাবীদের মধ্যে। কেননা তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসারী হবে। ফলে তাদের গুনাহও তোমাদের উপরই বর্তাবে। এবং তোমরা আমার আয়াতের অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যে স্তুতিবাক্য রয়েছে তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করো না অর্থাৎ, এর পরিবর্তে গ্রহণ করো না জগতের এই অতি সামান্য বিনিময়। অর্থাৎ, নীচুস্তরের ভক্তদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করে থাক, তা হারানোর ভয়ে সে আয়াতগুলো গোপন করো না। তোমরা শুধুমাত্র আমাকে ভয় করো অর্থাৎ, এই বিষয়ে একমাত্র আমাকেই ভয় করো, অন্য কাউকে নয়।

٤٢. ﴿وَلَا تَلْبِسُوا﴾ تَخْلِطُوا ﴿الْحَقَّ﴾ الَّذِيْ أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الَّذِي تَفْتَرُوْنَهُ ﴿وَ﴾ لَا ﴿تَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ نَعْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُ الْحَقُّ.

৪২. তোমরা মিশ্রিত করো না গুলিয়ে ফেলো না সত্যকে যা আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি, তা মিথ্যার সাথে যা তোমারা নিজেরা মনগড়ভাবে তৈরি করেছ এবং তোমরা সত্য অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রশংসাবাণীসমূহ গোপন করো না অথচ তোমরা জান যে, তা সত্য।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اَىْ عَلٰى اٰبَائِكُمْ

নবী যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করার হেতু : আলোচ্য আয়াতাংশ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ-এর তাফসীর عَلٰى آبَائِكُمْ দ্বারা করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নটি হলো, اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ দ্বারা রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ বাক্যের ব্যাখ্যায় যে সকল নিয়ামতকে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটিও নবী যুগের ইহুদিদের মাঝে বিদ্যমান ছিল না। এরপরও নবী যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হলো কেন?

মুফাসসির (র.) عَلٰى آبَائِكُمْ বলে এ উত্তর প্রদান করছেন যে, আয়াতাংশে مضاف-কে حذف করা হয়েছে। মূল ইবারত হবে– اَنْعَمْتُ عَلٰى آبَائِكُمْ; সুতরাং এখন কোনো প্রশ্ন বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ : بِاَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِيْ

নিয়ামতের স্মরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্দেশ মান্য করা : এ বাক্যটির সম্পর্ক হলো اُذْكُرُوْا-এর সাথে।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইহুদিরা তো সর্বদাই এ সকল নিয়ামত স্মরণ করে আসছে। সুতরাং যে জিনস তারা ভুলেনি, তা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য কী ছিল? এর জবাবেই মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, এখানে اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ দ্বারা শুধু নিয়ামতসমূহ স্মরণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সেসব নিয়ামতের শোকর আদায় করা উদ্দেশ্য। কেননা বনী ইসরাঈল এসব নিয়ামতের যথাযথ শোকর আদায় করেনি। এজন্যে তাদেরকে বিস্মৃতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : دُوْنَ غَيْرِيْ

حصر-এর প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.) এ ইবারতটুকু দ্বারা فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ-এর মাঝে থাকা حصر-এর অর্থটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ আয়াতের আলোচ্য অংশটুকুতে مفعول به ফে'লের আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

প্রথম অস্বীকারকারী না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ও তার নিরসন : উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটেছে মক্কায় এবং তিনি সর্বপ্রথম মক্কাতেই নবুয়তের দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কার কাফেররা তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করেছে, এ হিসেবে তো সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হলো মক্কার কাফেররা; মদিনার ইহুদিরা নয়। তাহলে ইহুদিদেরকে প্রথম অস্বীকারকারী বলার কারণ কী? মুফাসসির (র.) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ অংশটুকু দ্বারা এ প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে প্রথম অস্বীকারকারী দ্বারা আহলে কিতাবিদের মধ্য থেকে যারা প্রথম অস্বীকারকারী হবে, তাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَا تَشْتَرُوْا. تَسْتَبْدِلُوْا. بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

لَا تَشْتَرُوْا-এর তাফসীর تَسْتَبْدِلُوْا-এর দ্বারা করার উদ্দেশ্য : এখানে لَا تَشْتَرُوْا-এর তাফসীর تَسْتَبْدِلُوْا উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এখানে ক্রয় করার প্রকৃত অর্থ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, بَاء হরফটি ثَمَن-এর উপর দাখেল হয়নি; বরং এখানে দাখেল হয়েছে مَبِيْع তথা آيَاتِى-এর উপর। সুতরাং آيَاتِى হবে ثَمَن এবং ثَمَنًا হবে مَبِيْع। অর্থাৎ, আয়াতের বিনিময়ে মূল্য খরিদ করো না। আর এটা বাস্তবে অসম্ভব। এজন্যে اِشْتِرَاء দ্বারা রূপক অর্থে اِسْتِبْدَال বা পরিবর্তন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُوْنَهٗ

রাসূল ﷺ-এর গুণাবলি বর্ণনার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের আশঙ্কা : কা'ব ইবনে আশরাফসহ ইহুদি আলেমগণ ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাধারণ জনগণ ও অশিক্ষিতদের থেকে বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতো। প্রতি বছর তারা তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল, ফলফলাদি ও নগদ অর্থ গ্রহণ করতো। তাই তারা আশঙ্কা করল যে, যদি আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রকৃত গুণাবলি তাদেরকে বলে দেই, তাহলে আমাদের উক্ত পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। ফলে তারা তাওরাতে তাঁর গুণাবলি বিকৃত করে ফলে। তাদের কাছে কেউ মুহাম্মদ ﷺ-এর বর্ণনা ও বিবরণ জানতে চাইলে তারা প্রকৃত বিবরণ গোপন করে বিকৃতভাবে বলে দিত।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ : بنى মূলত بنين ছিল। ইযাফতের কারণে جمع-এর নূন পড়ে গেছে। ابن শব্দটি بنين-এর বহুবচন, যা بِنَاء থেকে নির্গত হয়েছে। بِنَاء-এর অর্থ হলো- وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ অর্থাৎ, একটি জিনিসের ভিত্তি আরেকটি জিনিসের উপর স্থাপন করা। অতএব اِبْن-ও পিতার فرع, যেহেতু اِبْن-এর ভিত্তি পিতার উপর। হিব্রু ভাষায় হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নাম اِسْرَائِيْل। শব্দটি আরবি না আজমি-এ নিয়ে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে, শব্দটি অনারবি। এটি عَلَم ও عُجْمَة হওয়ার কারণে غير منصرف হয়েছে। اِسْرَائِيْل শব্দটি মুরাক্কাবে এযাফী বা দুটি শব্দের দ্বারা যৌগিক। অর্থ- عَبْدُ الله তথা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরগণ, যারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশোদ্ভূত, তাদেরকে হিব্রু ভাষায় বনী ইসরাঈল বলা হয়।

نِعْمَةٌ : نِعْمَةٌ-এর বহুবচন نِعَمٌ; কিন্তু এখানে اسم جنس হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। শব্দটি لفظا যদিও একবচন, কিন্তু معنى বহুবচন; কেননা, ইযাফত استغراق-এর জন্যে ব্যবহার হয়, যেমন- আল্লাহর বাণী- وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا;

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر معروف বহছ امر حاضر বাব افعال মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و. ف. ي) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা পূর্ণ করো।

لَا تَلْبِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر معروف বহছ نهى বাব ضرب মাসদার اَللَّبْسُ মূলবর্ণ (ل. ب. س) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মিশ্রিত করো না। اَللَّبْسُ শব্দের মূল অর্থ হলো- سِتْرُ الشَّيْءِ তথা কোনো কিছুকে ঢেকে ফেলা। এর রূপক অর্থ হলো, অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট কথা বলা, যাতে বক্তব্য ও উদ্দেশ্য বিগড়ে যায়। কিংবা মিথ্যাকে শব্দের চাকচিক্যে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া, যা অনেক সময় নির্ভেজাল মিথ্যার চেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৯]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ .... وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

يَا হরফে নেদা بَنِي মুযাফ اِسْرَائِيْل মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুনাদা। اُذْكُرُوْا ফে'ল, ضَمِير ফায়েল, نِعْمَتِي হলো মাফ'উল, اَلَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ মাওসূল ও সেলা মিলে نِعْمَتِيْ-এর সিফাত। واو হরফে আতফ, اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ-এর মাঝে اياي হলো উহ্য একটি ফে'লের মাফ'উল। পরবর্তী ফে'লটি হলো সেই উহ্য ফে'লের করীনা। মূলরূপ হলো- اِرْهَبُوْنِيْ; اِيَّايَ-কে সরাসরি পরবর্তী فَارْهَبُوْا-এর মাফ'উল বলা যাবে না। কারণ, পরবর্তী ফেয়েলের মাফ'উল উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ .... وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

وَاو হরফে আতফ اٰمِنُوْا ফে'ল তার মাঝে বিদ্যমান اَنْتُمْ যমীর ফায়েল, بِمَا-এর بَاء হরফে জার مَا ইসমে মাওসূল, اَنْزَلْتُ ফে'ল তার মাঝে বিদ্যমান اَنَا যমীর ফায়েল, ه উহ্য যমীর ذو الحال - مصدقا হাল, যুলহাল ও হাল মিলে مفعول به, ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী ও তার মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। لَام হরফে জার, مَا ইসমে মাওসূল, معكم - ثبت উহ্য ফেয়েলের মাফ'উলে ফীহি হয়ে সেলাহ, মাওসূল ও সেলা মিলে মাজরূর এবং জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক مصدقا-এর সাথে। واو হরফে আতফ لَا تَكُوْنُوْا ফে'লে নাকেস যমীর হলো ইসমে নাকেস। আর اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ হলো খবরে নাকেস। واو হরফে আতফ لَا تَكُوْنُوْا ফে'ল যমীর ফায়েল بِاٰيٰتِيْ - لَا تَشْتَرُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, ثَمَنًا قَلِيْلًا হলো به مفعول; واو হরফে আতফ অর্থাৎ, اُذْكُرُوْا-এর উপর আতফ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ ... وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

لَا تَلْبِسُوْا ফে'ল, যমীর তার ফায়েল, الْحَقَّ মাফ'উলে বিহী بِالْبَاطِلِ - لَا تَلْبِسُوْا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ। ফে'ল ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ تَكْتُمُوا الْحَقَّ-মা'তূফ - وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ জুমলা হয়ে تَلْبِسُوْا অথবা تَكْتُمُوْا-এর যমীর থেকে হাল ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকুর যোগসূত্র

বনী ইসরাঈলকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতসমূহ : পূর্ববর্তী রুকুগুলোতে মুমিন, কাফের, মুনাফিক ও তাদের পরিণাম, মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

এখন পঞ্চম রুকু থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি রুকুতে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে আল্লাহ তা'আলার এক প্রিয় ও মাকবুল বান্দার সন্তানাদির এক বিশেষ জনগোষ্ঠীকে তাওহীদের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি তাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তাদেরকে অনেক সুযোগ দেওয়ার পরও তারা সে নিয়ামতকে হাতছাড়া করেছে। এমনকি তাদের বংশধারার সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতায় চরমভাবে তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। তাই তাদের নিকট থেকে সেই নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে এক ইসমাঈলী পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্যে হেদায়েত সর্বজনীন করে দেওয়া হয়। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭]

يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ বলে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন সময়ে বংশ পরম্পরায় যে অনুগ্রহ করা হয়েছে এবং তারা যে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে, বিশদভাবে তার উল্লেখ শুরু হয়েছে। কেননা মানবসন্তানের সকল শাখা-প্রশাখার মাঝে বনী ইসরাঈলকেই সবচেয়ে মর্যাদাবান মনে করা হতো। জ্ঞান ও কিতাবের অধিকারী, নবুয়ত লাভকারী এবং আম্বিয়া (আ.) সম্পর্কে বেশি জানাশোনা সম্প্রদায়রূপে তাদেরকে গণ্য করা হতো। হযরত ইয়াকূব (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত প্রায় চার হাজার নবীর আবির্ভাব হয়েছে কেবল তাদের মধ্যেই। এ কারণে আরব জনসাধারণের দৃষ্টি তাদের দিকেই নিবদ্ধ ছিল যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নাকি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই এখানে তাদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহরাজি ও তাদের দোষ-ত্রুটি বিশদভাবে তুলে ধরা হলো, যাতে তারা লজ্জিত হয়ে ঈমান আনে। তা না হলে অন্তত অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন যেন তাদের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে। [তাফসীরে উসমানী]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا .... وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

বনী ইসরাঈল বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতের ইসরাঈল (اِسْرَائِيْل) হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা)। যা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম। উলামায়ে কেরামের মতানুসারে রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কোনো নবীর একাধিক নাম নেই। কেবল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দুটি নাম রয়েছে– ইয়াকূব ও ইসরাঈল। পবিত্র কুরআন এক্ষেত্রে তাদেরকে বনী ইয়াকূব বলে সম্বোধন না করে বনী ইসরাঈল নাম ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য হলো, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা 'আব্দুল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহর আরাধনাকারী বান্দার বংশধর এবং তাদের সকলের তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত।

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার : এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– "এবং তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করো।" হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, তাওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে– وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম। [সূরা মায়েদা : রুকূ ৩]

সকল রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনা সে অঙ্গীকারেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাসূল ﷺ-ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া নামাজ, যাকাত এবং অন্যান্য সদকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভুক্ত। যার মূল অর্থ হলো রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান ও তাঁর পুরোপুরি অনুসরণ। এজন্যেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ– মুহাম্মদ ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ। أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ অংশে আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুখ-সম্পদ দ্বারা গৌরবান্বিত করবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা : তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর জিকির ও অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে তার দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ (তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।) এখানে উম্মতে মুহাম্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন– একেবারে সরাসরি।

অঙ্গীকার পালন করার গুরুত্ব : اَوْفُوْا بِعَهْدِيْ আদেশটি দ্বারা বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলি পালন করা আবশ্যক আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। সূরা মায়েদাতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে– اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (তোমরা কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করো)। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে। এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

অঙ্গীকার পূর্ণ করার স্তরসমূহ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন– أَوْفُوْا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ এ আয়াতে বান্দা ও আল্লাহর অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বান্দার পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদাত এর স্বীকারোক্তি করা। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জান ও মালের হেফাজত করা। বান্দাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর পথে নিঃশেষ করে দেওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জাত ও সিফাতের আলো দ্বারা বান্দাকে সুসজ্জিত করা। আর অন্যান্য স্তরগুলো মধ্যম পর্যায়ের। অথবা এটা বলা যায় যে, বান্দাদের পক্ষ থেকে প্রথম স্তর হচ্ছে আমলসমূহ দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদকে প্রমাণ করা। আর মধ্যম স্তর হচ্ছে গুণাবলি দ্বারা তাওহীদকে প্রকাশ করা। আর সর্বশেষ স্তর হচ্ছে সত্তার একত্ববাদ। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ পরিচয় ও আচরণ যা প্রতিটি স্তরের জন্যে উপযুক্ত, তা ঐ স্তরের বান্দার উপর বর্ষণ করা।

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا .... وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

প্রথম পর্যায়ের কাফেরদের শাস্তি তুলনামূলক বেশি : 'কুফর' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থায় অত্যন্ত নিন্দনীয়। সব মানুষকেই কুফর-শিরক থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে যারা কুফরি করে, পরবর্তী লোকজন সাধারণত তারই অনুসরণ করে থাকে। এ কারণে তাদের অপরাধ অন্যদের চেয়ে একটু বেশি হবে। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ (اَلْعَنْكَبُوْت) অর্থাৎ, তারা অবশ্যই তাদের বোঝাসমূহ বহন করবে, বহন করবে তাদের বোঝার সাথে আরো অনেক বোঝা। [আহকামুল কুরআন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪]

ثَمَنٌ قَلِيْلٌ-এর ব্যাখ্যা : ثَمَنًا قَلِيْلًا-এর অংশের মর্মার্থ হলো, পার্থিব ও বস্তুগত স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতকে দুনিয়ার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাবে। কেননা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদও আখেরাতের মোকাবিলায় সামান্য। [তাফসীরে মাজেদী

اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান ✪

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

খতমে কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা : পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের প্রতি ইসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্য কুরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোয়া-কালাম ও অযীফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। আর কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের হানাফী ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ হলো এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরিয়তের বিধান-ব্যবস্থার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। সুতরাং এ অনুমতি বিশেষ প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম এবং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে। উপলব্ধি করা উচিত যে, পারিশ্রমিকের আশায় যে পড়ছে, সে-ই যখন কোনো ছওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কী পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ী এবং প্রথম যুগের উম্মতের কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত। [মাআরিফুল কুরআন]

কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা : কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা- এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) জায়েজ বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ কুরআনকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন-যাপনের ব্যয়ভার ইসলামি বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার থেকে নির্বাহ হতো। কিন্তু বর্তমানে ইসলামি শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজন অনুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যেসব কাজের উপর দীন ও শরিয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মতো এগুলোর জন্যে বেতন গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ

ইযাফত : আয়াতের আলোচ্য অংশে نعمة শব্দটি আল্লাহ তা'আলা নিজ সত্তার দিকে ইযাফত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, নিয়ামতের বড়ত্ব ও অনুগ্রহের বিস্তৃতি প্রকাশ করা। কারণ, إِضَافَة-এর দ্বারা মর্যাদা প্রকাশ পায়। যেমন– বলা হয়– نَاقَةُ اللهِ ও بَيْتُ اللهِ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

ইস্তিয়ারা : আলোচ্য অংশটিতে اشتراء তার মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং তা استعارة-এর ভিত্তিতে استبدال অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ

তাকরার বা পুনরুক্তি : আলোচ্য অংশে اَلْحَق শব্দটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দ্বিতীয় বাক্যটিকে لَا تَكْتُمُوْهُ বললেও উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা যেত। এ তাকরার বা পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হলো, নিষিদ্ধ কর্মটির জঘন্যতা প্রকাশ করা। কারণ যমীরের পরিবর্তে সরাসরি ইসম ব্যবহার করলে তাকীদ ও দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। এটি اِطْنَاب -এরই একটি অবস্থা।

✪ تَعَارُفُ الْأَقْوَام : জাতি পরিচিতি

বনী ইসরাঈলের পরিচয় : সুপ্রসিদ্ধ নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বসবাস ছিল যথাক্রমে ইরাক, সিরিয়া ও হেজাযে (২১৬০-১৯৮৫ খ্রিষ্টপূর্ব)। তার ঔরস থেকে সুপ্রসিদ্ধ বংশধারা নেমে এসেছে। প্রথমটি মিসরীয় স্ত্রী হাজেরা (আ.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। এ বংশধারা 'বনী ইসমাঈল' নামে পরিচিত।

পরবর্তী সময়ে এরই একটি শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে কুরাইশ। তাদের বসবাস ছিল আরবে। দ্বিতীয়টি ইরাকী স্ত্রী সারার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকূব ওরফে হযরত ইসরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। এটি বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। এ বংশের বসবাস ছিল সিরিয়া। তৃতীয় একটি বংশধারাও এসেছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরা এর মাধ্যমে। তবে বনী কাতুরা নামীয় বংশধারা ইতিহাসে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি।

ক্ষমতার পালাবদল : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৈত্রিক জন্মভূমি ছিল ইরাক। তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছেলে ইউসুফ (আ.) গোলাম হয়ে মিসর গমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে মিসরে নিয়ে আসেন। সে সুবাদে বনী ইসরাঈলরা মিসরে অবস্থান করতে থাকে এবং সুদীর্ঘ চারশ বছর তারা মিসরের শাসনকার্য পরিচালনা করে। পরবর্তীকালে শাসনক্ষমতা চলে যায় ফেরাউনদের হাতে। ফেরাউনের সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলদের নিপীড়ন করতো।

কালক্রমে এক সময় হযরত মূসা (আ.) তৎকালীন ফেরাউনের মুখোমুখি হন। নিপীড়িত বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাদের সুসংগঠিত করেন এবং ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে তাদেরকে নিয়ে তিনি হিজরত করেন। খবর পেয়ে বাহিনীসহ ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু নেয়। সামনে পড়ে লোহিত সাগর। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বনী ইসরাঈল সমুদ্র পাড়ি দেয়। আর ফেরাউন নির্মমভাবে নিমজ্জিত হয় দলবলসহ সমুদ্রে। এরপর সিনাই অঞ্চলে আশ্রয় নেয় বনী ইসরাঈল। সিনাই মিসরেরই একটি দ্বীপাঞ্চল।

তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী জাতি : বনী ইসরাঈল জাতিই পৃথিবীতে তাওহীদের একমাত্র পতাকাবাহী ছিল। একে একে বহু নবী-রাসূল তাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। তাদের কোনো কোনো গোত্র হেজায ও পার্শ্ববর্তী বিশেষত ইয়াসরিব [পরবর্তীতে মদিনা] ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো আবাদ করে। বনী ইসরাঈল ছিল তাদের জাতীয় ও বংশীয় পরিচয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ছিল ইহুদি ও কিতাবী। বিকৃত আকারে হলেও তাওরাত কিতাব তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। ওহী ও নবুয়তের ধারা এবং শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কিত আকিদা -বিশ্বাসে কোনো না কোনোভাবে তারা বিশ্বাসী ছিল। তারা জাদুটোনা ও অন্যান্য নীচ কর্মেও পটু ছিল। ব্যবসাকর্মেও তাদের বেশ দক্ষতা ছিল। এই ধর্মীয় ও পার্থিব শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হেজায ভূখণ্ডে তারা ছিল যথেষ্ট প্রতাপশালী। হেজাযের সাধারণ অধিবাসীরা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। তারা একদিকে যেমন ইহুদিদের ধর্মজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রায়শ তাদের কাছে ঋণ জমা রাখত। ফলে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রের বেশির ভাগ প্রয়োজনে তাদেরকেই তারা শেষ ভরসা মনে করতো। সর্বোপরি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ এবং পবিত্র লোক কাহিনীগুলোতে এক সমাগত নবীর সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল এবং গোটা আরব তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল। [তাফসীরে মাজেদী]

٤٣. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾ صَلُّوْا مَعَ الْمُصَلِّيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهٖ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَكَانُوا يَقُوْلُوْنَ لِأَقْرِبَائِهِمْ الْمُسْلِمِيْنَ اُثْبُتُوْا عَلَى دِيْنِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهٗ حَقٌّ.

৪৩. তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। নামাজিদের সাথে নামাজ আদায় করো। অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে। এই আয়াত তাদের পুরোহিতদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা নিজেদের মুসলিম নিকটাত্মীয়দের বলত, মুহাম্মদের ধর্মের উপর অবিচল থাকো। কারণ, তা সত্য ধর্ম।

٤٤. ﴿أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ بِالْإِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ تَتْرُكُوْنَهَا فَلَا تَأْمُرُوْنَهَا بِهٖ ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ﴾ التَّوْرَاةَ وَفِيْهَا الْوَعِيْدُ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ سُوْءَ فِعْلِكُمْ فَتَرْجِعُوْنَ فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ.

৪৪. তবে কি তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছ অর্থাৎ, মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের আর নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে ভুলে যাচ্ছ? অর্থাৎ, নিজেরা তা পরিত্যাগ কর, নিজেদেরকে এ সম্পর্কে নির্দেশ দাও না অথচ তোমরা কিতাব অর্থাৎ, তাওরাত অধ্যয়ন কর। আর তাতে কথার সাথে কাজের বৈপরীত্যের কারণে ধমকির কথা রয়েছে। তবুও কি তোমরা তোমাদের এই কাজ মন্দ হওয়া সম্পর্কে বোঝ না? তবে তোমরা ফিরে আসতে। ভুলে যাওয়ার বিষয়টিই এই আয়াতে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِي-এর মূল স্থান।

٤٥. ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا﴾ أُطْلُبُوْا الْمَعُوْنَةَ عَلَى أُمُوْرِكُمْ ﴿بِالصَّبْرِ﴾ الْحَبْس لِلنَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَهُ ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهٖ وَفِي الْحَدِيْثِ كَانَ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقِيْلَ : الْخِطَابُ لِلْيَهُوْدِ لِمَا عَاقَهُمْ عَنِ الْإِيْمَانِ الشَّرَهُ وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ فَأُمِرُوْا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصَّوْمُ لِأَنَّهٗ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ وَالصَّلَاةَ لِأَنَّهَا تُوْرِثُ الْخُشُوْعَ وَتَنْفِي الْكِبْرَ ﴿وَإِنَّهَا﴾ أَيْ الصَّلَاةَ ﴿لَكَبِيْرَةٌ﴾ ثَقِيْلَةٌ ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ﴾ السَّاكِنِيْنَ إِلَى الطَّاعَةِ.

৪৫. তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো অর্থাৎ, তোমাদের বিষয়াদিতে সাহায্য চাও। ধৈর্য অর্থাৎ, নফসের নিকট অনুভিপ্রেত বিষয়সমূহের উপর নিজেকে স্থির রেখে ও নামাজের মাধ্যমে। নামাজের অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে এই স্থানে আলাদাভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ যখনই কোনো সমস্যায় পড়তেন তৎক্ষণাৎ নামাজে মনোনিবেশ করতেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা লোভ ও ক্ষমতার মোহ ছিল তাদের ঈমান আনার পথে অন্তরায়। তাই তাদের ধৈর্য অর্থাৎ, রোজার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ রোজা প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রশমিত করে। আর নামাজেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়। কেননা এটা মানুষের মধ্যে বিনয়ের জন্ম দেয় এবং অহংকার বিদূরিত করে। আর অবশ্যই এটা সালাত কঠিন ভারি বোঝা বিনয়ীগণ অর্থাৎ, ইবাদতের প্রতি যারা আনুগত্য ও অনুরাগ রাখে, তারা ব্যতীত অন্য সকলের নিকট।

٤٦. ﴿الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ﴾ يُوْقِنُوْنَ ﴿أَنَّهُمْ مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيْهِمْ.

৪৬. যারা ধারণা করে নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে পুনরুত্থানের মাধ্যমে এবং পরকালে তাঁর দিকেই তারা ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : صَلُّوْا مَعَ الْمُصَلِّيْنَ

وَارْكَعُوْا-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اِرْكَعُوْا-এর তাফসীর صَلُّوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ হয়েছে। অর্থাৎ, রুকু বলে পূর্ণ নামাজ উদ্দেশ্য। কারণ, পূর্বের কোনো শরিয়তে জামাতের সাথে সালাতের বিধান ছিল না। আর ইহুদিদের নামাজে সেজদাসহ অন্যান্য সব কিছু ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্যে رَاكِعِيْنَ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণকে বোঝানো হয়েছে, যে নামাজে রুকুও অন্তর্ভুক্ত আছে। আয়াতের অর্থ হবে– তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযিদের সাথে নামাজ আদায় করো।

قَوْلُهُ : تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ . تَتْرُكُوْنَهَا

نِسْيَان-কে تَرْك দ্বারা ব্যাখ্যার কারণ : نِسْيَان-এর শাব্দিক অর্থ হলো– غِيَابُ الشَّيْءِ عَنِ الذَّاكِرَةِ فَلَا يَذْكُرُهُ; আর এর ফলাফল হলো, সে বস্তুটি বর্জন করা। এজন্যে মুফাসসির (র.) تَنْسَوْنَ-এর ব্যাখ্যা করেছেন تَتْرُكُوْنَ দ্বারা। কারণ تَرْك হলো نِسْيَان-এর আবশ্যকীয় বিষয়।

قَوْلُهُ : فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ

الْاِسْتِفْهَامُ الْاِنْكَارِيُّ-এর ক্ষেত্রে বর্ণনা : أَتَأْمُرُوْنَ আয়াতটিতে اِسْتِفْهَام দ্বারা اِنْكَار উদ্দেশ্য। আয়াতে দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। ১. অন্যকে সৎকাজের আদেশ করা। ২. নিজে সৎকাজ না করা। আলোচ্য استفهام দ্বারা শুধু দ্বিতীয় বিষয়টি اِنْكَار করা উদ্দেশ্য। কারণ, ভালো কাজের আদেশ করা মন্দ নয়। মন্দ হলো, নিজে আমল না করা। فجملة النسيان ..... الخ অংশটি দ্বারা মুফাসসির (র.) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : وَالصَّلٰوةُ : اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ .... الخ

নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখের কারণ : আয়াতে ইবাদতের মধ্যে শুধু নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর কারণ হিসেবে বলেছেন– اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهَا অর্থাৎ, নামাজের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপের জন্যে তা বিশেষভাবে ভিন্ন করে উল্লেখ করা হয়েছে। হাশিয়াতুল জামালে বলা হয়েছে–

لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَصَرْفِ الْمَالِ فِيْهِمَا وَالتَّوَجُّهِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَالْعُكُوْفِ فِي الْعِبَادَةِ وَاِظْهَارِ الْخُشُوْعِ بِالْجَوَارِحِ وَاِخْلَاصِ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ وَمُجَاهَدَةِ الشَّيْطَانِ وَمَنَاجَاةِ الْحَقِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّكَلُّمُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَكَفُّ النَّفْسِ عَنْ شَهْوَتَيِ الْفَرْجِ وَالْبَطْنِ . (حاشية الجمل : جا صـ١٨)

অর্থাৎ, নামাজের কথা ভিন্নভাবে উল্লেখের কারণ হলো, এটি বিভিন্ন রকমের ইবাদতের সমন্বয়কারী। এর মধ্যে আত্মিক ও শারীরিক ইবাদত তথা তাহারাত ও সতর আবৃত করা, সম্পদ ব্যয় করা, কা'বা অভিমুখী হওয়া, ইবাদতের জন্যে অবস্থান করা, বিনয় নম্রতা, নিয়তের ইখলাস, শয়তানের সাথে লড়াই, কুরআন তেলাওয়াত, কালেমা শাহাদাত পাঠ এবং নফসকে গুপ্তাঙ্গ এবং পেটের কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি আমল রয়েছে।

قَوْلُهُ : اَلْخَاشِعِيْنَ . السَّاكِنِيْنَ اِلَى الطَّاعَةِ

خُشُوْع-এর মূল অর্থের প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.) اَلسَّاكِنِيْنَ দ্বারা اَلْخَاشِعِيْنَ-এর মূল অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْخُشُوْعُ-এর অর্থ হলো– اَلسُّكُوْنُ; এ অর্থেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ

قَوْلُهُ : وَاِنَّهَا أَيِ الصَّلَاةِ

هَا-এর مَرْجِع নির্ণয় : মুফাসসির (র.) اِنَّهَا-এর যমীরটির مرجع নির্ণয় করেছেন الصلاة; অন্যান্য মুফাসসিরগণ বিভিন্ন আরো مرجع উল্লেখ করেছেন। কারো মতে, এর مرجع হলো اَلْاِسْتِعَانَةُ; কারো মতে, এর দ্বারা সমস্ত আদেশ ও নিষেধ উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ এর مرجع নির্ধারণ করেছেন اَلْمَذْكُوْرَةُ শব্দটিকে যা দ্বারা اَلصَّبْرُ ও اَلصَّلَاةُ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : يَظُنُّوْنَ . يُوْقِنُوْنَ

ظَن দ্বারা ইয়াকীন উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) يُوْقِنُوْنَ বলে বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে ظَن দ্বারা يَقِيْن উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন, يُوْقِنُوْن বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতের প্রতি ইশারা করা। আলোচ্য স্থানে তিনি يَظُنُّوْنَ-এর জায়গায় يَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : صَلُّوْا مَعَ الْمُصَلِّيْنَ

وَارْكَعُوْا-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اِرْكَعُوْا-এর তাফসীর صَلُّوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ হয়েছে। অর্থাৎ, রুকু বলে পূর্ণ নামাজ উদ্দেশ্য। কারণ, পূর্বের কোনো শরিয়তে জামাতের সাথে সালাতের বিধান ছিল না। আর ইহুদিদের নামাজে সেজদাসহ অন্যান্য সব কিছু ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্যে رَاكِعِيْنَ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণকে বোঝানো হয়েছে, যে নামাজে রুকুও অন্তর্ভুক্ত আছে। আয়াতের অর্থ হবে– তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযিদের সাথে নামাজ আদায় করো।

قَوْلُهُ : تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ . تَتْرُكُوْنَهَا

نِسْيَان-কে تَرْك দ্বারা ব্যাখ্যার কারণ : نِسْيَان-এর শাব্দিক অর্থ হলো– غِيَابُ الشَّيْءِ عَنِ الذَّاكِرَةِ فَلَا يَذْكُرُهُ; আর এর ফলাফল হলো, সে বস্তুটি বর্জন করা। এজন্যে মুফাসসির (র.) تَنْسَوْنَ-এর ব্যাখ্যা করেছেন تَتْرُكُوْنَ দ্বারা। কারণ تَرْك হলো نِسْيَان-এর আবশ্যকীয় বিষয়।

قَوْلُهُ : فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ

الْاِسْتِفْهَامُ الْاِنْكَارِيُّ-এর ক্ষেত্রে বর্ণনা : أَتَأْمُرُوْنَ আয়াতটিতে اِسْتِفْهَام দ্বারা اِنْكَار উদ্দেশ্য। আয়াতে দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। ১. অন্যকে সৎকাজের আদেশ করা। ২. নিজে সৎকাজ না করা। আলোচ্য استفهام দ্বারা শুধু দ্বিতীয় বিষয়টি اِنْكَار করা উদ্দেশ্য। কারণ, ভালো কাজের আদেশ করা মন্দ নয়। মন্দ হলো, নিজে আমল না করা। فجملة النسيان ..... الخ অংশটি দ্বারা মুফাসসির (র.) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : وَالصَّلٰوةُ : اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ .... الخ

নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখের কারণ : আয়াতে ইবাদতের মধ্যে শুধু নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর কারণ হিসেবে বলেছেন– اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهَا অর্থাৎ, নামাজের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপের জন্যে তা বিশেষভাবে ভিন্ন করে উল্লেখ করা হয়েছে। হাশিয়াতুল জামালে বলা হয়েছে–

لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَصَرْفِ الْمَالِ فِيْهِمَا وَالتَّوَجُّهِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَالْعُكُوْفِ فِي الْعِبَادَةِ وَاِظْهَارِ الْخُشُوْعِ بِالْجَوَارِحِ وَاِخْلَاصِ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ وَمُجَاهَدَةِ الشَّيْطَانِ وَمَنَاجَاةِ الْحَقِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّكَلُّمُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَكَفُّ النَّفْسِ عَنْ شَهْوَتَيِ الْفَرْجِ وَالْبَطْنِ . (حاشية الجمل : ج١ ص١٨)

অর্থাৎ, নামাজের কথা ভিন্নভাবে উল্লেখের কারণ হলো, এটি বিভিন্ন রকমের ইবাদতের সমন্বয়কারী। এর মধ্যে আত্মিক ও শারীরিক ইবাদত তথা তাহারাত ও সতর আবৃত করা, সম্পদ ব্যয় করা, কা'বা অভিমুখী হওয়া, ইবাদতের জন্যে অবস্থান করা, বিনয় নম্রতা, নিয়তের ইখলাস, শয়তানের সাথে লড়াই, কুরআন তেলাওয়াত, কালেমা শাহাদাত পাঠ এবং নফসকে গুপ্তাঙ্গ এবং পেটের কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি আমল রয়েছে।

قَوْلُهُ : اَلْخَاشِعِيْنَ . السَّاكِنِيْنَ اِلَى الطَّاعَةِ

خُشُوْع-এর মূল অর্থের প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.) اَلسَّاكِنِيْنَ দ্বারা اَلْخَاشِعِيْنَ-এর মূল অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْخُشُوْعُ-এর অর্থ হলো– اَلسُّكُوْنُ; এ অর্থেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ

قَوْلُهُ : وَاِنَّهَا أَيِ الصَّلَاةِ

هَا-এর مَرْجِع নির্ণয় : মুফাসসির (র.) اِنَّهَا-এর যমীরটির مرجع নির্ণয় করেছেন الصلاة; অন্যান্য মুফাসসিরগণ বিভিন্ন আরো مرجع উল্লেখ করেছেন। কারো মতে, এর مرجع হলো اَلْاِسْتِعَانَةُ; কারো মতে, এর দ্বারা সমস্ত আদেশ ও নিষেধ উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ এর مرجع নির্ধারণ করেছেন اَلْمَذْكُوْرَةُ শব্দটিকে যা দ্বারা اَلصَّبْرُ ও اَلصَّلَاةُ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : يَظُنُّوْنَ . يُوْقِنُوْنَ

ظَن দ্বারা ইয়াকীন উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) يُوْقِنُوْنَ বলে বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে ظَن দ্বারা يَقِيْن উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন, يُوْقِنُوْن বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতের প্রতি ইশারা করা। আলোচ্য স্থানে তিনি يَظُنُّوْنَ-এর জায়গায় يَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ

اَلْخَاشِعِيْنَ শব্দের নুসখা : ৪৫ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْخَاشِعِيْنَ শব্দের দুটি নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় اَلْخَاشِعِيْنَ শব্দটির خ বর্ণের পর অতিরিক্ত الف যোগে লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি اَلْخٰشِعِيْنَ শব্দটির خ বর্ণে খাড়া যবরযোগে লিখিত আছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

رَاجِعُوْنَ শব্দের নুসখা : ৪৬ নং আয়াতে উল্লিখিত رَاجِعُوْنَ শব্দের দুটি নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় رَاجِعُوْنَ শব্দটির ر বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি رٰجِعُوْنَ শব্দটির ر বর্ণে খাড়া যবরযোগে লিখিত আছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْث : হাদীস তথ্য

৪৫ নং আয়াতে وَفِي الْحَدِيْثِ ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (র.) নিম্নের হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا يَحْيٰى بْنُ، زَكَرِيَّا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّوْلِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَخِيْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ صَلّٰى.

সূত্র : হোযায়ফা (রা.) সূত্রে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭, হাদীস নং ১৩১৯, হাদীসটি مقبول; মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ দুয়ালী ব্যতীত হাদীসটির প্রত্যেক রাবী ছেকাহ। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হাদীসটি مقبول;

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ... مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ আয়াত পর্যন্ত ঈমানের মূলমন্ত্রের আহ্বান ও কুফর থেকে বিরত থাকার উপদেশ ছিল। وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ الخ আয়াতগুলোতে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত মদিনার জনৈক ইহুদির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। সে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়স্বজনকে বলত, যে দীনের (ইসলামের) উপর তোমরা আছ এর উপর অবিচল থেকো। এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, মুহাম্মদ ﷺ যা নির্দেশ করেন তা সত্য শাশ্বত ও চিরন্তন। এভাবে ইহুদিরা অপরকে নসিহত করতো। কিন্তু নিজেরা তা পালন করতো না।

[আসবাবে নুযূল : পৃষ্ঠা ২৭; লুবাব : পৃষ্ঠা ৮]

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ... وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

ঈমানের প্রকার : ঈমানের পরবর্তী শাখা-প্রশাখার বিধানাবলি দু'প্রকার। কোনো কোনো আমল প্রকাশ্য এবং কোনো কোনো আমল অপ্রকাশ্য। আবার অপ্রকাশ্য আমলও দু'প্রকার, শারীরিক ইবাদত এবং আর্থিক ইবাদত। নামাজ শারীরিক ইবাদত এবং যাকাত আর্থিক ইবাদত। আর خُشُوْع ও خُضُوْع হলো আধ্যাত্মিক ও কলবী ইবাদত।

ইকামাতে সালাতের পরিচয় : কুরআনে কারীমে যতবার নামাজের তাগিদ দেওয়া হয়েছে, সাধারণ اقامة শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। اِقَامَةُ الصَّلٰوة অর্থ হলো– নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় শর্তাবলি ও নিয়মাবলি রক্ষা করে নামাজ আদায় করা। শুধু নামাজ পড়াকে اِقَامَةُ الصَّلٰوة বলা হয় না। নামাজের যত গুণাবলি, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই اِقَامَةُ الصَّلٰوة [অর্থাৎ, নামাজ কায়েম করা]-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন– কুরআনে কারীমে আছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, নিশ্চয় নামাজ মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।] নামাজের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামাজ উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাজিকে অশ্লীল ও ন্যাক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা তারা নামাজ পড়েছে বটে; কিন্তু তা কায়েম করেনি।

صَلٰوة-এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদত, যাকে নামাজ বলা হয়।
সূরা বাকারার ৩নং আয়াতের 'তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা'-এর অধীনে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যদিও এখানে সমসাময়িক বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামাজ ও যাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী-ইসরাঈলের উপরই ফরজ ছিল। সূরা মায়েদার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাজ ও যাকাত ফরজ ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ এবং ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। ধনীদের উপর যাকাত দেওয়া ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করবে না, কেয়ামত দিবসে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। নিম্নে যাকাতবিষয়ক আলোচনা প্রদত্ত হলো।

زكوة-এর আভিধানিক অর্থ : زكوة শব্দটি বাবে نصر-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে–

১. اَلنَّمُوُّ তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ اِذَا نَمَا
২. اَلطَّهَارَةُ তথা পবিত্রতা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى
৩. اَلْبَرَكَةُ তথা প্রাচুর্য। যেমন বলা হয়– زَكَتِ الْبُقْعَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا
৪. اَلْمَدْحُ তথা প্রশংসা। যেমন বলা হয়– زَكّٰى نَفْسَهٗ اِذَا مَدَحَهَا

যাকাতকে এজন্যে زَكٰوة বলা হয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

زكوة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–
اَلزَّكٰوةُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ لِمُسْلِمٍ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى.
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরিয়ত প্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

২. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন– اَلزَّكٰوةُ اِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْاِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَى الْفُقَرَاءِ
৩. সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন– هِيَ اِخْرَاجُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الثَّرْوَةِ الْمَمْلُوْكَةِ كُلَّ سَنَةٍ حَسَبَ اَدَاءِ الشَّرِيْعَةِ
৪. লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلزَّكٰوةُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ
৫. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র.) বলেন–
اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِيْ فَرَضَهَا اللّٰهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.
৬. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন– اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوْبَةِ وَالنَّفْقَةِ وَالْحَقِّ وَالْعَفْوِ

যাকাত ফরজ হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরজ হয়, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. **ইবনে খোযায়মার অভিমত :** ইবনে খোযায়মা (র.) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরজ হয়।
দলিল : তাঁর দলিল হলো হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীস হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব (রা.) কর্তৃক। আর এটা তো হিজরতের পূর্বের ঘটনা।

২. **জমহুরের অভিমত :** জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরজ হয়।
দলিল–
ক. আল্লাহ তা'আলার বাণী–
وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ.
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনা, যাতে জাকাতের উল্লেখ রয়েছে।
খ. হযরত কায়েস (রা.) বলেন– اَمَرَنَا النَّبِيُّ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيْضَةُ الزَّكٰوةِ সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমজানের ঈদের দিনে দেওয়া হয়। আর صدقة যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরজ হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরজ হয়েছে।

রুকুর পরিচয় : رُكُوْع-এর শাব্দিক অর্থ– ঝোঁকা বা নত হওয়া। অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি সেজদার স্থলেও ব্যবহার হয়। কেননা, সেটাও ঝোঁকারই সর্বশেষ স্তর। শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। اِرْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ অংশটি রুকুর পারিভাষিক অর্থ তথা নামাজের রুকু উদ্দেশ্য।

صَلٰوة-এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদত, যাকে নামাজ বলা হয়। সূরা বাকারার ৩নং আয়াতের 'তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা'-এর অধীনে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যদিও এখানে সমসাময়িক বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামাজ ও যাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী-ইসরাঈলের উপরই ফরজ ছিল। সূরা মায়েদার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাজ ও যাকাত ফরজ ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ এবং ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। ধনীদের উপর যাকাত দেওয়া ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করবে না, কেয়ামত দিবসে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। নিম্নে যাকাতবিষয়ক আলোচনা প্রদত্ত হলো।

زكوة-এর আভিধানিক অর্থ : زكوة শব্দটি বাবে نصر-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে–

১. اَلنَّمُوُّ তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ اِذَا نَمَا

২. اَلطَّهَارَةُ তথা পবিত্রতা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

৩. اَلْبَرَكَةُ তথা প্রাচুর্য। যেমন বলা হয়– زَكَتِ الْبُقْعَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا

৪. اَلْمَدْحُ তথা প্রশংসা। যেমন বলা হয়– زَكّٰى نَفْسَهٗ اِذَا مَدَحَهَا

যাকাতকে এজন্যে زَكٰوة বলা হয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

زكوة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–

اَلزَّكٰوةُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ لِمُسْلِمٍ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরিয়ত প্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

২. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন– اَلزَّكٰوةُ اِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْاِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَى الْفُقَرَاءِ

৩. সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন– هِيَ اِخْرَاجُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الثَّرْوَةِ الْمَمْلُوْكَةِ كُلَّ سَنَةٍ حَسَبَ اَدَاءِ الشَّرِيْعَةِ

৪. লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلزَّكٰوةُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ

৫. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র.) বলেন–

اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِيْ فَرَضَهَا اللّٰهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.

৬. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন– اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوْبَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْحَقِّ وَالْعَفْوِ

যাকাত ফরজ হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরজ হয়, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. **ইবনে খোযায়মার অভিমত :** ইবনে খোযায়মা (র.) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরজ হয়।

দলিল : তাঁর দলিল হলো হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীস হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব (রা.) কর্তৃক। আর এটা তো হিজরতের পূর্বের ঘটনা।

২. **জমহুরের অভিমত :** জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরজ হয়।

দলিল–

ক. আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ.

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনা, যাতে জাকাতের উল্লেখ রয়েছে।

খ. হযরত কায়েস (রা.) বলেন– اَمَرَنَا النَّبِيُّ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيْضَةُ الزَّكٰوةِ সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমজানের ঈদের দিনে দেওয়া হয়। আর صدقة যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরজ হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরজ হয়েছে।

রুকুর পরিচয় : رُكُوْع-এর শাব্দিক অর্থ– ঝোঁকা বা নত হওয়া। অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি সেজদার স্থলেও ব্যবহার হয়। কেননা, সেটাও ঝোঁকারই সর্বশেষ স্তর। শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। اِرْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অংশটি রুকুর পারিভাষিক অর্থ তথা নামাজের রুকু উদ্দেশ্য।

২. জাতিগত অহংকার : ইহুদিরা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। অতএব, ইসমাঈলী বংশ থেকে নবুয়ত পাওয়া রাসূল ﷺ-কে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার স্বরূপ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো)। অর্থাৎ, ধৈর্যধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা, সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ়-সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যপন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দেবে না।

আর নামাজ দ্বারা যশ-খ্যাতি আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা, নামাজের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। যখন যথানিয়মে ও যথাযথভাবে নামাজ আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও মানব-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

নামাজ কঠিন হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার : নামাজকে ভারি মনে হওয়ার কারণ হলো, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। নামাজ এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কথা বলা, হাসা, খাওয়া, হাঁটা-চলা করা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্য-বাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কষ্ট বোধ করতে থাকে। সারকথা, নামাজের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তিবোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে, মনের চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এ সমস্যার সমাধান শুধু মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ হলো– سُكُوْنُ الْقَلْبِ বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামাজ সহজসাধ্য হওয়ার মাধ্যমরূপে আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, মনের স্থিরতা কীভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব; বরং এর প্রতিবিধান হলো, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা নিজ থেকেই বেরিয়ে যাবে। স্থিরতার দরুন নামাজ অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাজের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহঙ্কার এবং যশ-খ্যাতির প্রতি মোহও হ্রাস পাবে। তা ছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ করা সম্ভব হবে।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

নামাজের জামাত সম্পর্কে আলেমদের মতানৈক্য : নামাজ ফরজ হওয়াটা وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারা বোঝা যায়। আর اِرْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (রুকুকারীদের সাথে রুকু করো) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। জামাতে নামাজ আদায়ের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

ক. আহলে যাহেরের মতে, জামাত নামাজ সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত।

খ. ইমাম আহমদ (র.)-এর এ বিষয় দুটি উক্তি আছে। একটি হলো জামাত ফরজে আইন; নামাজ সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত। তাঁর দ্বিতীয় উক্তি হলো জামাত ওয়াজিব; নামাজ সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত নয়।

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম উক্তি, জামাত ফরজে কেফায়া আর দ্বিতীয় উক্তি, সুন্নাত। দ্বিতীয় উক্তিটিই তাঁর মাযহাবে অগ্রগণ্য। ইমাম মালেক (র.)-ও জামাতকে মুস্তাহাব বা সুন্নত বলেন। [আরিযাতুল আহওয়াযী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬]

ঘ. এ ব্যাপারে আহনাফের দু'রকম উক্তি আছে।

১. জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) প্রমুখ মুহাক্কিকগণ এ মতই পোষণ করেছেন।

২. ইমাম কুদূরী, হেদায়া, কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার, তানভীরুল আবসার গ্রন্থকার প্রমুখ হানাফী আলেমগণের মতে, জামাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আল্লামা তাহতাভী মারাকিল ফালাহ-এর হাশিয়াতে এ মতটিকেই বিশুদ্ধমত বলেছেন। হানাফী মাযহাবে এ মতের উপরই ফতোয়া। হানাফীগণের এ দুটি উক্তির মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হলেও এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তা বর্জনকারী ফাসেক। কারণ, একদিকে জামাত ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে খুবই ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অপরদিকে সাধারণ ওজরের ফলে জামাত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَاقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ অতএব, উভয় রকম হাদীসের সমন্বয়ে সুন্নতে মুয়াক্কাদাই প্রমাণিত হয়। আর যারা ওয়াজিব, ফরয বা শর্ত বলেছেন, তাঁরা কেবল ভয়-ভীতি ও জামাত তরকের উপর ধমকের হাদীসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছেন।

আর যারা কেবল অনুমতির হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যেমন– ইমাম শাফেয়ী ও মালেক, তাঁরা জামাতকে সুন্নতে মুয়াক্কাদা বলেছেন। হাদীসেও জামাতকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাবোধক শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ [মা'আরিফুল কুরআন]

আয়াতগুলোর সূক্ষ্ম বিষয়াদি : নামাজ ও যাকাত আবশ্যিক হওয়া এ ধরনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও এগুলোর সময় এবং শর্তসমূহ, জাকাতের পরিমাণ ও শর্তাবলির বর্ণনা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মধ্যে এসেছে। হ্যাঁ, اِرْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ দ্বারা কাজি বায়জাবী (র.) জামাতের সাথে নামাজ পড়া ফরজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। হানাফীদের দৃষ্টিতে যেহেতু জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা তবে ওয়াজিবের নিকটবর্তী অথবা বলা হবে যে আয়াত দ্বারা তো ওয়াজিবই মানা হয়; কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। অর্থাৎ, জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইমাম ও মুক্তাদির মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই কিতাবের বাহ্যিক ওয়াজিবকে ছেড়ে দিতে হবে। জুমার নামাজে যদিও অপরের উপর নির্ভর করতে হয়; কিন্তু জুমা সংঘটিত হওয়ার শর্তগুলোর মধ্য থেকে জামাত পাওয়া যাওয়াও ১টি শর্ত রয়েছে। তাই এটাকে ফরজ এবং ওয়াজিব বলা যায়।

ক্বাজী বায়জাবী (র.) স্বীয় শাফেয়ী মাযহাব মতে, উক্ত আয়াত দ্বারা কাফেররা শরয়ি আহকাম ও ফুরূ'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। যেমন– নামাজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের নির্দেশ আহলে কিতাব তথা কাফেরদেরকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হানাফিয়্যাদের পক্ষ থেকে সাহেবে মাদারিক (র.) বলেছেন যে, উক্ত আয়াতের পূর্বের আয়াত وَاٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ -এর মধ্যে ঈমান গ্রহণ করার আহ্বান উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তাক্বদীরী ইবারত এমন যে اَسْلِمُوْا وَاعْمَلُوْا عَمَلَ اَهْلِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, কাফেররা পরকালের ধর-পাকড়ের হিসেবে তো উসূল ও ফুরূ' এর মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু দুনিয়াতে শুধু মুআমালাত [আদান-প্রদান] শাস্তির বিধানসমূহ এবং দুনিয়াবী শৃঙ্খলার মূলনীতিগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইবাদতের মুকাল্লাফ তারা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান গ্রহণ না করবে। [কামালাইন খ. ১, পৃ. ৬৩]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

মাজাযে মুরসাল : আলোচ্য অংশে رُكُوْع দ্বারা صَلَاة উদ্দেশ্য। কারণ, রুকু পরিপূর্ণ নামাজের একটা অংশ। একে বলা হয়– تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ মূল উদ্দেশ্য হলো– صَلُّوْا مَعَ الْمُصَلِّيْنَ; অতএব, এখানে মাজাযে মুরসাল হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ الخ

ইস্তিফহাম : আলোচ্য আয়াতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদেরকে ভর্ৎসনা করা।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاٰمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَناً قَلِيْلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ.

أ. ترجم الآية الكريمة موضحة.

ب. كيف يصح خطاب الله تعالى بنى إسرائيل بقوله : ولا تكونوا أول كافر به وقد كفر قبلهم مشركوا العرب؟

ج. بين المراد بقوله تعالى : ولا تشتروا وأوضح لماذا يتعذر المعنى الحقيقي فيه؟

د. أعرب قوله تعالى : وإياى فاتقون.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

أ. فسر الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما.

ب. لمن الخطاب في الآيتين؟ اوضح.

ج. حقق الكلمات الآتية : الصبر، والصلاة، والخاشعين ثم بين وجه انحصار الاستعانة في الصبر والصلاة حيث يتضح المرام.

রুকূ' : ৬

بَيَانُ تَنْجِيَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ فِرْعَوْنَ

ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদানের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ গোটা জগদ্বাসীর উপর বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠত্ব দান
- ❑ বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী
- ❑ বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের নির্যাতনের বর্ণনা
- ❑ বনী ইসরাঈলের অলৌকিকভাবে সাগর পাড়ি দেওয়ার ঘটনা
- ❑ বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার শাস্তি
- ❑ মান্না-সালওয়ার অবতরণ
- ❑ নগরীতে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ ও বনী ইসরাঈলের হঠকারিতা

٤٧. ﴿يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِيْ ﴿وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ﴾ أَيْ آبَاءَكُمْ ﴿عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ عَالَمِيْ زَمَانِهِمْ.

৪৭. হে বনী ইসরাঈল, তোমরা স্মরণ করো আমার সে নিয়ামতের কথা যে নিয়ামত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এবং (স্মরণ করো) তোমাদেরকে অর্থাৎ, তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে বিশ্বে অর্থাৎ, তাদের সময়কার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

٤٨. ﴿وَاتَّقُوْا﴾ خَافُوْا ﴿يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ﴾ فِيْهِ ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿وَلَا يُقْبَلُ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ ﴿مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ أَيْ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلَ ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ﴾ [الشعراء : ١٠٠] ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ فِدَاءٌ ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ﴾ يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

৪৮. তোমরা সেদিনের জন্যে সাবধান হও ভয় করো যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না তা হলো, কেয়ামত দিবস এবং কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না لا تقبل ফে'লটি تا ও يا অর্থাৎ, مذكر ও مؤنث উভয়রূপেই পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো সুপারিশই গৃহীত হবে না। যেমনটি অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, তারা বলবে, হায়! আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই! এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ মুক্তিপণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সাহায্য পাবে না। আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে রক্ষা করা হবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : عَلَى الْعٰلَمِيْنَ عَالَمِيْ زَمَانِهِمْ

الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা তৎকালীন যুগ উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-এর তাফসীরে عَالَمِيْ زَمَانِهِمْ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে عالم বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছুর উপর বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব আবশ্যক হয়। অথচ সমগ্র জাতি থেকে উম্মতে মুহাম্মদি শ্রেষ্ঠ। মুফাসসির (র.) عَالَمِيْ زَمَانِهِمْ দ্বারা এর উত্তর দিয়েছেন যে, عَالَم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তৎকালীন যুগের বনী ইসরাঈল।

قَوْلُهٗ : يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ ... هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

يَوْم দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী- يَوْمًا لَا تَجْزِيْ الخ-এর মধ্যে يَوْم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেয়ামত দিবস।

قَوْلُهٗ : فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ

কাফেরদের আক্ষেপ বর্ণনা : কেয়ামতের দিন কাফেরদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। অথচ তারা মনে করে যে, তাদের জন্যে সুপারিশ করা হবে। কেয়ামতের দিন যখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, আসলেই আমাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী নেই। মুফাসসির (র.) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ উল্লেখ করে এ আক্ষেপের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

فَضَّلْتُ : সীগাহ متكلم বহুছ واحد বহুছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّفْضِيْلُ মূলবর্ণ (ف.ض.ل) জিনস صحيح অর্থ- আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহুছ امر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و.ق.ي) জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমরা ভয় করো, সাবধান হও।

لَا تَجْزِيْ : সীগাহ مؤنث غائب বহুছ واحد مؤنث غائب বহুছ نفي فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج.ز.ي) জিনস ناقص يائي অর্থ- সে প্রতিদান দেবে না, তা কাজে আসবে না।

لَا يُؤْخَذُ : সীগাহ مؤنث غائب বহুছ واحد مؤنث غائب বহুছ نفى فعل مضارع مجهول বাব نصر মাসদার اَلْأَخْذُ মূলবর্ণ (أ.خ.ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গৃহিত হবে না, নেওয়া হবে না।

عَدْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَعْدَال অর্থ- বিনিময়, সমকক্ষ, ন্যায়, ন্যায্যতা, বাবে ضرب থেকে - عدَلَ الشَّيْئَ بِالشَّيْئِ একটি বস্তুকে আরেকটির সমান করা, عَدَلَ بِرَبِّه শরীক করা। যেমন- ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ .... فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

يَا হরফে নেদা, بَنِى اِسْرَائِيْل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুনাদা হয়েছে। اُذْكُرُوْا ফে'ল اَنْتُمْ ফায়েল نِعْمَتِى মাফ'উল, التى ইসমে মাওসুল اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ জুমলা হয়ে সেলা, মাওসুল ও সেলা মিলে نِعْمَتِى-এর সিফাত হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। واو হরফে আতফ أَنِّى فَضَّلْتُكُمْ-এর يا মুতাকাল্লিম ان-এর ইসম ضَمِيْر ফে'ল فَضَّلْتُ ফায়েল كم মাফ'উলে বিহী, عَلَى الْعٰلَمِيْنَ মুতা'আল্লিক فَضَّلْتُ ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল মাফউল ও মুতা'আল্লিক মিলে إن এর خبر; অতঃপর জুমলা ইসমিয়া হয়ে نِعْمَتِي-এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا ..... وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

واو হরফে আতফ اِتَّقُوْا ফে'ল ضمير তার ফায়েল يَوْمًا মাওসূফ لَا تَجْزِيْ ফে'ল نَفْسٌ ফায়েল عَنْ نَفْسٍ মুতা'আল্লিক لَا تَجْزِيْ ফে'লের সাথে شَيْئًا মাফ'উলে বিহী। ফে'ল ফায়েল ও মাফ'উল মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আতফ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ জুমলা হয়ে মাতূফে اول আর واو হলো হরফে আতফ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ জুমলা হয়ে মাতূফে সানী واو হরফে আতফ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ জুমলা হয়ে মাতূফে সালেস। মা'তূফ আলাইহ তার মা'তূফ মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে اِتَّقُوْا ফে'লের মাফ'উলে বিহী হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

لَا يَقبل শব্দের কেরাত : ৪৮ নং আয়াতে উল্লিখিত لَا يُقْبَلُ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.)-এর কেরাত অনুযায়ী শব্দটি مذكر হিসেবে ي যোগে لَا يُقْبَلُ পড়া হয়।

খ. আবূ আমর ও ইবনে কাসীর (র.) শব্দটিকে مؤنث হিসেবে ت যোগে لَا تُقْبَلُ পড়েছেন।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ

اَلَّتِيْ শব্দের লিখনশৈলী : ৪৭ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلَّتِيْ শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. এশিয়া উপমহাদেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় اَلَّتِيْ শব্দে ইয়ায়ে মাজহুল যোগে লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি ইয়ায়ে মারুফযোগে اَلَّتِيْ লিখিত হয়েছে।

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ

পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকুর যোগসূত্র : পূর্বের রুকুতে বনী ইসরাঈলের উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচ্য রুকু থেকে ঐ নিয়ামতগুলোরই বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। যেগুলোর মধ্যে একদিকে আল্লাহর প্রতিদানের কথা উল্লেখ আছে, অপরদিকে তাদের অযোগ্যতাসমূহের কথাও আছে। সেই সাথে তাদেরকে কেয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ... عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব অবসানের কারণ : বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব অবসানের কারণ হলো, কুরআনের বিরোধিতা করা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আদিকাল থেকে কুরআন নাযিল হওয়া পর্যন্ত তারাই ছিল সমগ্র পৃথিবীর অপরাপর সকল জাতির চেয়ে সেরা জাতি। অন্য কোনো সম্প্রদায় তাদের সমপর্যায়ের ছিল না। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় عَطْفُ نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-এর আতফ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ দ্বারা অর্থাৎ, -এর উপর হওয়া দ্বারা, যার উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করা হয়েছে। নিয়ামত দানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অপূর্ণতা রাখা হয়নি। কিন্তু তারা যখন শেষ নবী ﷺ এবং কুরআনের বিরোধিতা শুরু করল, তখন তাদের সে শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল এবং তাদেরকে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট উপাধি দেওয়া হলো। অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীগণ ভূষিত হলেন خَيْرُ الْاُمَّةِ তথা শ্রেষ্ঠ উম্মতের মহামূল্য ভূষণে। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ১০, টীকা. ৪]

বস্তুত বনী ইসরাঈলীদের এ বিপর্যয়ের বড় একটি কারণ ছিল, পরকাল সম্পর্কে তারা নির্ভয় হয়ে গিয়েছিল। তারা এমন চিন্তায় নিমজ্জিত ছিল যে, আমরা বিশিষ্ট নবীদের সন্তান, বড় বড় অলি ও নেক বান্দাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক, তাঁদের অসিলাতেই আমরা জান্নাত পেয়ে যাব, আমাদের কোনো প্রকার সাজাপ্রাপ্ত হবো না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا ... وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন : আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের কথা বলা হয়েছে। কেননা, বিচার দিবসের শাস্তি-পুরস্কারের বিশ্বাসই হলো মানুষের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টির একমাত্র নিয়ামক। কিন্তু ইসরাঈলের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বহু বিকৃতি সাধনের ফলে এ বিশ্বাস একেবারে মুছে গিয়েছিল। সামনে কেয়ামত দিবসের যে সকল বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে ইসরাঈলী আকিদা ও বিশ্বাস খণ্ডন করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ অংশটুকু দ্বারা সেই আকিদা ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত ইহুদি লালন করে থাকে যে, তারা তাদের পূর্ববর্তীদের পুণ্যকর্মের সুবাদে পরিত্রাণ লাভ করবে এবং নবী-রাসূলের বংশধর হওয়ার কারণে ক্ষমতা লাভ করবে।

[ইহুদি ধর্মের বিশ্বকোষ : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২১-এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী]

শাফায়াত ও মুক্তিপণ সংশ্লিষ্ট আকিদা খণ্ডন : ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরেকটি আকিদা ছিল যে, তারা কেয়ামতের দিন শাফায়াত ও মুক্তিপণের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। অর্থাৎ, আমল ও আকিদা যেমনই হোক, পূর্ববর্তীরা সুপারিশ করে তাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করে বলা হয়েছে– যাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়নি, তারা কোনো দিক থেকে এতটুকু সাহায্যও পাবে না, যাতে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে। পরিত্রাণ পাওয়া তো দূরের কথা।

আয়াতের সারকথা : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তখন তার প্রকৃত বন্ধুমহল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ে সচেষ্ট হয়। এটা নিষ্ফল হলে সুপারিশ দ্বারা তাকে রক্ষা করার তদবির করে। এটাও যদি ব্যর্থ হয়, তখন ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত যদি এতেও কাজ না হয়, তখন তার সাহায্যকারীদের একত্র করে বাহুবলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে এসবের উল্লেখ করে ঘোষণা করেন, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যতই নিকটতম হোক না কেন, উপরিউক্ত চার পদ্ধতির কোনো পদ্ধতিতেই কোনো কাফেরের উপকার করতে পারবে না।

বনী ইসরাঈলরা বলত, আমরা যত পাপই করি না কেন, আমাদের শাস্তি হবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ নবী-রাসূলগণ আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যে শাফায়াতের কথা বলেন, এ আয়াত দ্বারা তা রদ হয় না। কারণ, অন্যান্য বহু আয়াতেও তার تائيد উল্লেখ আছে। [তাফসীরে উসমানী; পৃষ্ঠা ১০, পার্শ্ব টীকা. ৫]

শাফায়াত সংক্রান্ত ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন : মু'তাযিলা সম্প্রদায় কেয়ামতের দিন শাফায়াত গ্রহণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে। এর স্বপক্ষে তারা وَاتَّقُوْا يَوْمًا ... الخ আয়াতটি দ্বারা দলিল পেশ করে। এছাড়া আয়াতুল কুরসীর مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ অংশটুকু দ্বারাও তারা দলিল পেশ করে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, শাফায়াত একটি স্বীকৃত বিষয়। কুরআন-হাদীসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

তাছাড়া রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ. (قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِي : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ)

[সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ২৪৩৫; সুনানে আবূ দাউদ : হাদীস নং ৪৭৩৯]

আর মু'তাযিলাদের প্রদত্ত দলিলগুলো সঠিক নয়। কারণ, উভয় আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো কাফেরের জন্যে কোনো মুমিনের শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। মুফাসসিরগণ আয়াতগুলোর এ তাফসীরই করেছেন।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

আমের উপর খাসের আতফ : আলোচ্য অংশটুকু আতফ হয়েছে– نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ-এর উপর। এ نِعْمَة শব্দটি ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও تفضيل-কে তার উপর আতফ করা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকে عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, নিয়ামতের পরিপূর্ণতা বোঝানো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

নাকেরা ব্যবহার : আলোচ্য আয়াতে يَوْم শব্দটি নাকেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভয়াবহতা বোঝানোর জন্যে। মূল রূপ হলো– وَاتَّقُوْا يَوْمًا شَدِيْدَ الْهَوْلِ পরবর্তীতে نَفْس শব্দটিকে নাকেরা অবস্থায় আনা হয়েছে ব্যাপকতা বোঝানোর জন্যে। অর্থাৎ, কেউই কারো উপকার করতে পারবে না।

✪ اَلتَّعَارُضُ فِي الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

ক. বিষয় : পরকালে কেউ কারো কাছ থেকে কোনো উপকার পাবে কী?

ক. উপকৃত হতে পারবে না				খ. উপকৃত হতে পারবে			
وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. অর্থ : আর সেদিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। [সূরা বাকারা : ৪৮] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৫টি আয়াত রয়েছে। যথা–				جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. অর্থ : তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। এ আয়াতের সমর্থনে আরো ২টি আয়াত রয়েছে। যথা–			
সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
বাকারা	১২৩	দোখান	৩৯	মুমিন	৮	তূর	২১
লোকমান	৩৩	ইনফিতার	১৯				

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ক-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কেয়ামত দিবসে যদি কারো থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না। পিতা পুত্র থেকে এবং পুত্র পিতা থেকেও কোনো ফায়দা লাভ করতে পারবে না। এক বন্ধু অপর বন্ধু থেকে কোনো উপকার অর্জন করতে সক্ষম হবে না। মানুষের জন্যে নিজের চেষ্টাই ফলপ্রদ হবে। অপরের চেষ্টা ও আমল কোনো কাজে আসবে না। কেয়ামত দিবসে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জন্যে কোনো বিষয়ে কোনো কিছু করার মালিক হবে না।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের অধিবাসীগণের মধ্যে যারা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, তারা নিজ নিজ পরিবারবর্গের সদস্যগণ তথা বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানাদির উপকার সাধন করতে পারবেন। কারণ, খ-অংশের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাগণের জন্যে জান্নাতে বহু উঁচু আসন বরাদ্দ থাকবে। তাদের সাথে তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রীগণ ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা মুমিন তারাও উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন, যদিও তারা আমলের দিক দিয়ে উঁচু স্তরের অধিকারী নন। কিন্তু সৎকর্মে খাঁটি মুমিনগণের সম্মানার্থে তাদের স্বজনদেরকেও উচ্চাসনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যাতে এক নম্বরের খাঁটি ঈমানদারগণের চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যায় এবং আনন্দময় জীবনযাপনে প্রগতির স্রোতধারা অব্যাহত থাকে। যেমন একটি রেওয়ায়াতে جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ ... আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ (رض) قَالَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ : اَيْنَ اُمِّيْ؟ اَيْنَ وَلَدِيْ؟ اَيْنَ زَوْجَتِيْ؟ فَيُقَالُ : لَمْ يَعْمَلُوْا مِثْلَ عَمَلِكَ : يَقُوْلُ : كُنْتُ اَعْمَلُ لِيْ وَلَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ الآيَةَ .... (رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ وَاَبُو الشَّيْخِ، رُوْحُ الْمَعَانِيْ ١٤٣/١٣)

অর্থ, হযরত ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। মুমিন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই বলবে, আমার মাতা কোথায়? আমার সন্তানাদি কোথায়? আমার স্ত্রী কোথায়? তখন বলা হবে, ওরা তো আপনার মতো আমল করেনি। মুমিন বান্দা বলবে, আমি তো সব আমল আমার জন্যেও করেছি এবং তাদের জন্যেও করেছি। অতঃপর হযরত ইবনে জুবাইর উপরিউক্ত جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا ..... আয়াতখানা পাঠ করলেন।

এভাবে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ আয়াতে তো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (তাদের সাথে তাদের সন্তানাদিকে আমি সংযুক্ত করে উচ্চাসনে পৌঁছে দেব)। এ আয়াতের তাফসীরও এভাবে হাদীস দ্বারা করা হয়েছে যে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِيْ دَرَجَتِهٖ فِيْ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانُوْا دُوْنَهُ فِي الْعَمَلِ لَتَقَرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَرَأَ الآيَةَ ..... اَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهَنَّادٌ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ اَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيْ فِيْ سُنَنِهٖ. (رُوْحُ الْمَعَانِيْ (٣٢/٢٧)

অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মুমিন বান্দার সন্তানাদিকে তার সাথে তার স্তরে পৌঁছে দেবেন, যদিও আমলের দিক দিয়ে তাদের মর্তবা কম হয়, যাতে তাদের দরুন মুমিন বান্দার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .

তাফসীরে রুহুল মা'আনীর লেখক বলেছেন যে, বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সুস্পষ্টতার দরুন বোঝা যায়, মুমিন বান্দাগণের সাথে তাদের সন্তানাদি, মাতাপিতা ও স্ত্রীগণ তথা স্বজনদেরকে সবসময়ের জন্যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রাখা হবে। শুধু সাক্ষাতের জন্যে স্বজনদেরকে মুমিন বান্দাগণের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে এমনটা নয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত খ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, এক মানুষ দ্বারা অপর মানুষ পরজগতে উপকৃত হবে, তবে ক-অংশের আয়াত দ্বারা এর উল্টো বোঝা যায়। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হলো।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ক-অংশের আয়াতে উল্লিখিত প্রথম نَفْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুমিন লোক। আর দ্বিতীয় نَفْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের ব্যক্তি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে, কোনো মুমিন ব্যক্তি কোনো কাফের ব্যক্তির কোনো বিষয়ে উপকার করতে পারবে না। অর্থাৎ, যদি কোনো মুমিন লোকের নিকটাত্মীয় বা বন্ধু কাফের হয়, তাহলে উক্ত কাফেরদেরকে মুমিন লোকের সম্মানার্থে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না।

এভাবে لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ الخ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–

لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ مُؤْمِنٌ عَنْ وَلَدِهِ الْكَافِرِ وَلَا مَوْلُوْدٌ مُؤْمِنٌ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ الْكَافِرِ.

অর্থাৎ, কোনো মুমিন পিতা কাফের পুত্রের জন্যে এবং কোনো মুমিন পুত্র কাফের পিতার জন্যে কেয়ামত দিবসে কোনো বিষয়ে উপকার প্রদান করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে يَوْمٌ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আয়াতের মর্মার্থ–

لَا يُغْنِيْ مَوْلًى مُؤْمِنٌ عَنْ مَوْلًى كَافِرٍ شَيْئًا.

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى আয়াতে سعى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سعْى إِيْمَانِى অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ নিজ ঈমানের মাধ্যমে চেষ্টা-সাধনা করে উপকার অর্জন করতে পারবে। অপরের ঈমান কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং মুমিন লোকের ঈমান দ্বারা কাফের ব্যক্তি কোনো ফায়দা অর্জন করতে পারবে না।

এভাবে يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ আয়াতেও দ্বিতীয়োক্ত نفس শব্দ দ্বারা কাফের ব্যক্তি উদ্দেশ্য। অবশ্য খ-অংশের আয়াত মুমিনগণের ব্যাপারে প্রয়োজ্য যে, একজন মুমিন লোক অপর মুমিন লোক থেকে ফায়দা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ, জান্নাতের অধিকারী তো একমাত্র মুমিনগণ হবে। এজন্যে একজন মুমিনের সৎকর্ম ও তাকওয়াপূর্ণ কাজের দরুন পরকালে তার মুমিন নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণও জান্নাতের মধ্যে উচ্চাসনের অধিকারী হবে। সূরা রাদের ২৩ নং আয়াত ও সূরা মুমিন আয়াত নং ৮ এ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ -এ مَنْ صَلَحَ-এর তাফসীর হযরত ইবনে যোবায়ের مَنْ اٰمَنَ-এর দ্বারা করেছেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত মুজাহিদ থেকেও বর্ণিত আছে।

সূরা তূরের আয়াত নং ৮-এর মধ্যে তো وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ ঈমান শব্দকে প্রকাশ্যভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ তিন আয়াতের সারাংশ হবে, পরকালে একজন মুমিন অপর মুমিন থেকে উপকার লাভ করতে পারবে এবং একে অপরকে ফায়দা পৌঁছাতেও সক্ষম হবে। অতএব এখন উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই।

খ. বিষয় : কেয়ামত দিবসে কারো সুপারিশ কবুল হবে কিনা?

ক. সুপারিশ কবুল হবে না

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থ : এবং তার পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশও কবুল করা হবে না; কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। [সূরা বাকারা : ৪৮]

এ আয়াত সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা–

সূরা	আয়াত
বাকারা	১২৩

খ. সুপারিশ কবুল হবে

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا.

অর্থ : যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। [সূরা মারইয়াম : ৮৭]

এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৪টি আয়াত রয়েছে। যথা–

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
আম্বিয়া	২৮	যুখরুফ	৮৬
সাবা	২৩	নাজম	২৬

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কারো ব্যাপারে কোনো সুপারিশ কবুল করা যাবে না এবং কারো সুপারিশের মাধ্যমে কেউ উপকৃতও হতে পারবে না, যা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাযহাব। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, পরকালে কিছু লোক এমনও বিদ্যমান থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অপরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং তাদের সুপারিশ কবুলও হবে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। সুতরাং ক-অংশের আয়াতের সাথে খ-অংশের আয়াতের দ্বন্দ্ব হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মর্মার্থ মানবজাতির শ্রেণিভেদের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, ক-অংশের আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যদি কেউ কোনো কাফের ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে, তাহলে তা কবুল হবে না- لَا تُقْبَلُ مِنَ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ شَفَاعَةٌ فِيْ حَقِّ الْكَافِرَةِ আর খ-অংশের আয়াত মুমিনগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম, ফেরেশতাগণ ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ পাপী মুমিনদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত সুপারিশ কবুলও করবেন। [হাশিয়াতুস সাভী ও মাদারিকুত তানযীল]

২. আয়াতগুলোর সারমর্ম সময়ের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, ক-অংশের আয়াতের মর্মার্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের উপর ভিত্তিশীল। আর খ-অংশের আয়াতের সারমর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ের উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও খাঁটি মুমিন বান্দাগণ পাপী ও গুনাহগার ঈমানদারগণের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুলও হবে। [রূহুল মা'আনী]

গ. বিষয় : কেয়ামত দিবসে কাফেরদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী হবে কি না?

ক. সুপারিশকারী হবে				খ. সুপারিশকারী হবে না
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ অর্থ : এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং তার থেকে ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করা হবে না। [সূরা বাকারা : ১৮] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৩টি আয়াত রয়েছে। যথা–				فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ অর্থ : অতএব আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। [সূরা শু'আরা : ১০০]
সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	
বাকারা	১২৩	মুমিন	১৮	
মুদ্দাছছির	৪৮			

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের জন্যে তা সুপারিশকারী হবে, তবে সুপারিশকারীর সুপারিশ কবুল করা হবে না। কেননা, উক্ত আয়াতগুলোতে حَرْفُ النَّفْيِ (নাবোধক অব্যয়) দ্বারা শুধু সুপারিশ কবুল ও গ্রহণ করাকে বাতিল করা হয়েছে। সুপারিশকারী হওয়া বাতিল করা হয়নি। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কেয়ামত দিবসে কাফেরদের পক্ষে সুপারিশকারী হবে, তবে উক্ত সুপারিশকারীর সুপারিশ কবুল হবে না।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারীই হবে না। কেননা উক্ত আয়াতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা বলবে– فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ (আমাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী নেই)। সুতরাং এ আয়াতটি ক-অংশের আয়াতের বিরোধী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, কাফেরদের জন্যে কেয়ামত দিবসে কোনো সুপারিশকারী হবে না। যেমনটা খ-অংশের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ (মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে) বলা হয় যে, কোনো সুপারিশকারী হবে, তাহলেও তার সুপারিশ কবুল ও মঞ্জুর হবে না। যেমনটা ক-অংশের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত মানব-দানব একত্রে সম্মিলিত হয়েও যদি কোনো কাফেরের পক্ষে সুপারিশ করে, তাহলেও তা কবুল করা হবে না। অতএব, ক-অংশের আয়াত عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ (মেনে নেওয়া)-এর উপর নির্ভরশীল। আর খ-অংশের আয়াতটি عَلٰى سَبِيْلِ الْوَاقِعِ তথা বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

٤٩. ﴿وَ﴾ اُذْكُرُوْا ﴿إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ﴾ أَيْ آبَاءَكُمْ وَالْخِطَابُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ لِلْمَوْجُوْدِيْنَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا بِمَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى آبَائِهِمْ تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِيُؤْمِنُوا ﴿مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ﴾ يُذِيْقُوْنَكُمْ ﴿سُوْٓءَ الْعَذَابِ﴾ أَشَدَّهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ نَجَّيْنَاكُمْ ﴿يُذَبِّحُوْنَ﴾ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ ﴿اَبْنَآءَكُمْ﴾ الْمَوْلُوْدِيْنَ ﴿وَيَسْتَحْيُوْنَ﴾ يَسْتَبْقُوْنَ ﴿نِسَآءَكُمْ﴾ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهُ إِنَّ مَوْلُوْدًا يُوْلَدُ فِي بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكِكَ ﴿وَفِيْ ذٰلِكُمْ﴾ الْعَذَابِ أَوْ الْإِنْجَاءِ ﴿بَلَآءٌ﴾ابْتِلَاءٌ أَوْ إِنْعَامٌ ﴿مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ﴾

৪৯. আর স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বপুরুষকে। এখানে এবং এর পরবর্তী স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের পিতৃ-পুরুষদের উপর যে অনুগ্রহ হয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করে ঈমান আনে। ফেরাউন সম্প্রদায় হতে, তারা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন কষ্ট দিত ভোগ করাত। يَسُوْمُوْنَكُمْ বাক্যটি نَجَّيْنٰكُمْ-এর كم সর্বনাম থেকে حال হয়েছে। তারা জবাই করতো বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য يَسُوْمُوْنَكُمْ-এর বয়ান। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত ছেড়ে দিত জনৈক গণকের কথায়। সে বলেছিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক সন্তান ভূমিষ্ট হবে, যে তোমার সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ হবে এবং তাতে উক্ত উৎপীড়ন অথবা নিষ্কৃতিদানে তোমাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাসংকট পরীক্ষা ও অনুগ্রহ ছিল।

٥٠. ﴿وَ﴾ اُذْكُرُوا ﴿إِذْ فَرَقْنَا﴾ فَلَقْنَا ﴿بِكُمُ﴾ بِسَبَبِكُمْ ﴿الْبَحْرَ﴾ حَتّٰى دَخَلْتُمُوْهُ هَارِبِيْنَ مِنْ عَدُوِّكُمْ ﴿فَاَنْجَيْنٰكُمْ﴾ مِنَ الْغَرَقِ ﴿وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ﴾ قَوْمَهُ مَعَهُ ﴿وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ﴾ إِلٰى انْطِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ

৫০. আর স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের কারণে সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম আর শত্রু থেকে পলায়নপর অবস্থায় তোমরা তাতে প্রবেশ করলে অনন্তর তোমাদেরকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তোমরা সমুদ্র তাদেরকে গ্রাস করতে দেখছিলে।

٥١. ﴿وَاِذْ وٰعَدْنَا﴾ بِأَلِفٍ وَدُوْنَهَا ﴿مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً﴾ نُعْطِيْهِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَاةَ لِتَعْمَلُوْا بِهَا ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ الَّذِيْ صَاغَهُ لَكُمُ السَّامِرِيُّ إِلٰهًا ﴿مِنْ بَعْدِهٖ﴾ أَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ إِلٰى مِيْعَادِنَا ﴿وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ﴾ بِاتِّخَاذِهِ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا.

৫১. যখন মূসার জন্যে চল্লিশ রাত্রি নির্ধারণ করেছিলাম এখানে وَعَدْنَا ক্রিয়াটি الف-সহ এবং الف ব্যতীত উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। এ সময়সীমার পর তাকে তাওরাত প্রদান করব, যেন তোমরা তদনুযায়ী আমল করতে পার। অতঃপর তোমরা আমার নির্ধারিত সময় পূরণার্থে মূসার প্রস্থানের পর গো-বৎসকে সামেরী যা তোমাদের জন্যে গড়েছিল, তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করায় তোমরা হলে জালিম। কারণ ইবাদত যার জন্যে উপযুক্ত, তাকে ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রকে তোমরা নির্ধারণ করেছিলে।

٥٢. ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ﴾ مَحَوْنَا ذُنُوْبَكُمْ ﴿مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ الِاتِّخَاذِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ.

৫২. অনন্তর আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি তোমাদের পাপসমূহ মুছে দিয়েছি। তারপরও বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণের পর যাতে তোমরা তোমাদের উপর আমার প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

٥٣. ﴿وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ﴾ التَّوْرَاةَ ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ عَطْفُ تَفْسِيْرٍ أَيْ الْفَارِقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ بِهٖ مِنَ الضَّلَالِ.

৫৩. যখন আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব অর্থাৎ, তাওরাত ও ফুরকান اَلْفُرْقَانُ শব্দটি اَلْكِتَابُ عَطْفُ تَفْسِيْر হয়েছে। অর্থাৎ, সত্য-মিথ্যা এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ। যাতে তোমরা তাঁর মাধ্যমে গোমরাহি থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারো।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : سُوْءَ الْعَذَابِ. اَشَدَّهٗ

سوء العذاب দ্বারা উদ্দেশ্য : سُوْء অর্থ মন্দ। আর سُوْءَ الْعَذَابِ অর্থ হলো মন্দ আযাব। অতএব প্রশ্ন হতে পারে, আযাবতো পুরোটাই মন্দ। এর তো কোনো ভালো দিক নেই। তাহলে سُوْءَ الْعَذَابِ-এর অর্থ কী?

এরই জবাবে মুসান্নিফ (র.) اَشَدَّهٗ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, سُوْءَ الْعَذَابِ দ্বারা اَشَدَّ الْعَذَابِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, প্রচণ্ড কষ্টদায়ক শাস্তি।

قَوْلُهٗ : يُذَبِّحُوْنَ. بَيَانٌ بِمَا قَبْلَهٗ

بَيَانٌ بِمَا قَبْلَهٗ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, يُذَبِّحُوْنَ ... الخ অংশটুকু পূর্ববর্তী سُوْءَ الْعَذَابِ-এর ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এখানে بَيَان দ্বারা নাহুশাস্ত্রের بَيَان উদ্দেশ্য নয়; বরং শাব্দিক অর্থে বিবরণ উদ্দেশ্য। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বনী ইসরাঈলের প্রতি মিসরীয়দের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে বলেন, ফেরাউনের কর্মচারী হিসেবে বনী ইসরাঈলরা বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিল। যারা শক্তিশালী ও কর্মক্ষম, তাদেরকে পাহাড় থেকে পাথর কাটা, প্রাসাদ নির্মাণের পাথর ও মাটি বহন করা, ইট বানানো, মিস্ত্রির কাজ করা প্রভৃতি দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখেছিল। আর যারা দুর্বল, তাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের কর। নারীরা নিয়োজিত ছিল সূতাকাটা ও কাপড় বোনার কাজে। এ থেকে বোঝা যায় মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য بَيَانٌ بِمَا قَبْلَهٗ-এর মর্মার্থ হলো– بَعْضُ بَيَانٍ بِمَا قَبْلَهٗ অর্থাৎ, তন্মধ্য থেকে কিছু বর্ণনা করা।

قَوْلُهٗ : ذٰلِكُمْ. اَلْعَذَابِ أَوِ الْاِنْجَاءِ بَلَاءٌ. اِبْتِلَاءٌ وَاِنْعَامٌ

بَلَاء শব্দের অর্থের বর্ণনা : بَلَاءٌ-এর বিভিন্ন অর্থ আছে। ذٰلِكُمْ দ্বারা মিশরীয়দের অত্যাচারের দিকে ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে اِبْتِلَاء তথা বিপদ, আর উদ্ধার করার প্রতি ইঙ্গিত হলে অর্থ হবে اِنْعَام তথা অনুগ্রহ। মুফাসসির (র.) উপরিউক্ত তাফসীর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য মুফাসসিরগণের মতে, ذٰلِكُمْ দ্বারা اَلْعَذَاب এবং بَلَاء দ্বারা اِبْتِلَاء উদ্দেশ্য হওয়াই অগ্রগণ্য অভিমত।

قَوْلُهٗ : اَلْكِتَابَ. اَلتَّوْرَاةَ. وَالْفُرْقَانَ. عَطْفُ تَفْسِيْرٍ الخ

ফুরকান দ্বারা উদ্দেশ্য : শব্দগত দিক থেকে ফুরকান অর্থ এমন বিষয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য করা যেতে পারে। যেমন, লিসানুল আরবে রয়েছে– كُلُّ مَا فَرَّقَ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهُوَ فُرْقَانٌ; এ অর্থেই কুরআনের অপর নাম হচ্ছে ফুরকান।

এতে বোঝা যায়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী যে কোনো আসমানি গ্রন্থকেই ফুরকান বলা যেতে পারে। اَلْفُرْقَانُ ও اَلْكِتَابُ উভয়ের মাঝে عَطْفُ تَفْسِيْر-এর সম্পর্ক এবং উভয় শব্দেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওরাত। তাওরাতের দুটি গুণগত দিক হলো, প্রথম তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিসেবে আল-কিতাব, দ্বিতীয়ত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে আল-ফুরকান।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

نَجَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوي অর্থ– আমরা মুক্তি দিয়েছিলাম। কোনো কাজ পর্যায়ক্রমে হওয়া হলো تفعيل-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্যে কতিপয় ঐতিহাসিক বলেন যে, সকল ইসরাঈলী মিসর থেকে একসাথে বের হয়নি; বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সবার শেষে সবচেয়ে বড় দলটি বের হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে এবং পথ ভুলে তারা নদী পথে পার হয়েছিল।

آلُ : ال ও اَهْل শব্দ দুটি আভিধানিকভাবে সমার্থক; পরিবার-পরিজন, অনুগত জন, স্বগোত্রীয় জন কিংবা একই ধর্মমতের অনুসারী। তবে ব্যবহারগতভাবে শব্দ দুটি মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো– اَهْل শব্দটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য; পক্ষান্তরে ال শব্দটি শুধুমাত্র অভিজাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের বেলায় ব্যবহার হয়। اٰل فُلَان বাক্যের ক্ষেত্রে কখনো শুধু মুযাফ উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো মুযাফ ইলাইহি উদ্দেশ্য হয়। এর নিয়ম হলো– যখন ال -এর মুযাফ ইলাইহিটিকে যদি পৃথকভাবে আগে উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় বার মুযাফ ইলাইহি হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তখন শুধু মুযাফ উদ্দেশ্য হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ; অন্যথায় উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। যেমন– مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ;

يَسُوْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلسَّوْم মূলবর্ণ (س ـ و ـ م) জিনস اجوف واوي অর্থ- তারা চাপিয়ে দেয়, আরোপ করে। سوم-এর দুটি অর্থ রয়েছে–

ক. اَلطَّلَبُ (কামনা করা, অন্বেষণ করা) এ থেকেই سَامَ السِّلْعَةَ اِذَا طَلَبَهَا-এর ব্যবহার রয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে– يَبْغُوْنَ اَيْ يَطْلُبُوْنَ تَعَذِيْبَكُمْ

খ. اَلدَّوَامُ (স্থায়িত্ব) এ থেকেই سائمة العذاب; তখন আয়াতের অর্থ হবে– يُدِيْمُوْنَ تَعْذِيْبَكُمْ

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব استفعال মাসদার الاستحياء মূলবর্ণ (ح ـ ي ـ ي) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা জীবিত রাখে।

কারো কারো মতে, يَسْتَرِقُّوْنَ (তারা দাসী বানায়)। কেউ কেউ বলেন, اَلْحَيَاءُ (ح বর্ণে যেরযোগে) অর্থ হলো নারীর লজ্জাস্থান। এ থেকে অর্থ হবে– তারা নারীর লজ্জস্থান খোঁজ করতো। অর্থাৎ, ফেরাউনের কর্মচারীরা, নারী গর্ভবতী কিনা, তা যাচাই করতো।

وَاعَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُوَاعَدَةُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوي অর্থ– আমরা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। শব্দটি مجرد ثلاثي থেকেও হতে পারে। যথা– বাব ضرب মাসদার اَلْعِدَةُ ও اَلْوَعْدُ অর্থ– আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যদি শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে হয়, তখন উভয় পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করা উদ্দেশ্য হবে। হযরত মূসা (আ.) উপস্থিতির অঙ্গীকার করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর যদি وَعَدْنَا ছুলাছী মুজাররাদ থেকে হয়, তাহলে শুধু একপক্ষ থেকে অঙ্গীকার উদ্দেশ্য হবে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ .... مِنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

يَسْتَحْيُوْنَ এবং يُذَبِّحُوْنَ জুমলা হয়ে حال হয়েছে اٰلِ فِرْعَوْنَ অথবা نَجَّيْنٰكُمْ থেকে يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ জুমলা দুটি মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে يَسُوْمُوْنَ বাক্যটি থেকে বদল হয়েছে। فِيْ ذٰلِكُمْ অংশটি অগ্রবর্তী খবর এবং بَلَاءٌ مِنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ পশ্চাদবর্তী মুবতাদা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰي : وَاِذْ فَرَقْنَا ... وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

واو হরফে আতফ, الخ .... اِذْ فَرَقْنَا পুরো বাক্যটি উহ্য اُذْكُر-এর মাফ'উল হয়েছে। فَرَقْنَا ফে'ল ضمير ফায়েল بِكُمْ মুতা'আল্লিক الْبَحْر মাফ'উল فَاَنْجَيْنَاكُمْ জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহ واو হরফে আতফ اَغْرَقْنَا ফে'ল ضمير যুলহাল اٰلِ فِرْعَوْنَ মাফ'উলে বিহী واو হালিয়া اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ জুমলা হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ... وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

اتَّخَذْتُمْ ফে'ল ضمير ফায়েল وَاعَدْنَا ফে'ল موسى প্রথম মাফ'উল আর اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বিতীয় মাফউল। ثُمَّ হরফে আতফ الْعِجْلَ প্রথম মাফউল আর দ্বিতীয় মাফ'উল উহ্য রয়েছে। তা হলো- اِلٰهًا; مِنْ بَعْدِهٖ মুতা'আল্লিক واو হালিয়া اَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ বাক্যটি اتَّخَذْتُمْ-এর ফায়েল থেকে হাল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : اِبْتِلَاءٌ وَاَنْعَامٌ

وانعام শব্দের লিখনশৈলী : ৪৯ নং আয়াতের তাফসীরাংশে দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির শুরু অংশে শুধুমাত্র واو-যোগে وَاِنْعَامٌ লিখিত আছে।

খ. তবে সহীহ লিখনশৈলী হবে শব্দটির শুরু ভাগে او-যোগে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى

وَعدنا শব্দের কেরাত : ৫১নং আয়াতে উল্লিখিত وَعَدْنَا শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) -এর কেরাত অনুযায়ী শব্দটির واو বর্ণে খাড়া যবরযোগে وٰعَدْنَا হবে।

খ. ইমাম আবূ আমর (রা.) শব্দটি واو বর্ণে মাদ্দবিহীন শুধুমাত্র যবরযোগে وَعَدْنَا পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ

আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক : পূর্বের يٰبَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ الخ সহ অপরাপর আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের প্রতি যেসব নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ থেকে ধারাবাহিকভাবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া শুরু হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ .... مِنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

বনী ইসরাঈলের আসল আবাসভূমি ছিল ফিলিস্তিনে। পরবর্তীতে ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতা ইয়াকূব (আ.) ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে মিসরে বনী ইসরাঈলের আগমন ঘটে। বনী ইসরাঈলরা মিসরে শান্তিতেই ছিল। পরবর্তীতে তাদের উপর ফেরাউনের অত্যাচার শুরু হয়।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, ফেরাউন একবার স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে একটি আগুনের কুণ্ডলি বের হয়ে গোটা মিসরকে ঘিরে ফেলেছে। বিস্ময়ের ব্যাপারে হলো সে আগুন কেবল কিবতিদেরই জ্বালিয়ে দিচ্ছে; বনী ইসরাঈলের কাউকে স্পর্শ করছে না। গণকরা ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। ফলে সে ইসরাঈলের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করতে নির্দেশ দেয়। এভাবেই মূলত বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের অত্যাচার শুরু হয়। وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ .... الخ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের সে কঠিন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বনী-ইসরাঈলের দাসত্বের যুগ : উক্ত তিনটি আয়াতে তিনটি ঘটনার দিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। প্রথম ঘটনা তো হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে কঠিন পরীক্ষার ছিল। যার মধ্যে পুরো জাতি আক্রান্ত ছিল। বনী-ইসরাঈলের গোত্র দাসত্বের জিঞ্জিরে পূর্ব থেকেই কষে বাঁধা ছিল। এর মধ্যে যা কিছু ত্রুটি ছিল, তা ঐ কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। যা হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাবের আশঙ্কাকে রোধ করার ব্যাপারে ফেরাউনের লোকজনের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল। অজস্র নিষ্পাপ ও নিরাপরাধ শিশুদেরকে শুধু হযরত মূসা (আ.) হতে পারেন– এ সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল।

আকবর এলাহাবাদী (র.) বুদ্ধিমত্তার ভাষায় বলেন–

افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوچا ✡ یوں تو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

অর্থ : এভাবে শিশুদের হত্যার কারণে যত অধিক দুর্নাম তার হয়েছে, ততো অধিক দুর্নাম তার হতো না। আফসোস যে, ফেরাউন বর্তমান পাশ্চাত্যের ন্যায় কলেজ স্থাপন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চিন্তা করেনি।

অর্থাৎ, মূসা (আ.) ভূমিষ্ট হলে মানুষ হেদায়েতের পথে চলে আসবে। আর ফেরাউনের জুলুম ও কুফরের রাজত্ব ধ্বংস হবে। তাই ফেরাউন দেশবাসীকে পথভ্রষ্টতার ধোঁকার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) নামের সেই শিশুটি যাতে জন্ম না হতে পারে, সে পরিকল্পনা নিয়ে অসংখ্য শিশুকে হত্যা করে অনেক দুর্নামের ভাগী হয়েছে। তাই আল্লামা আকবর এলাহাবাদী (র.) আক্ষেপ করে বলেছেন যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ও পথভ্রষ্টতায় রাখার জন্য ফেরাউনের অসংখ্য শিশুকে হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না; বরং বর্তমানে পাশ্চাত্যের ন্যায় কলেজ স্থাপন করেও দেশবাসীকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো। যদি ফেরাউনের কলেজ স্থাপনের পদ্ধতি জানা থাকতো। শুধু তাই নয়, বরং দাসত্বের জিঞ্জিরগুলোকে আরো অধিক কষাণোর জন্য এবং নিজেদের কামনা-বাসনাসমূহের শিকার বানানোর জন্য মেয়েদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হতো। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সূত্র ও অস্ত্রগুলোকে অধিক শক্তিশালী করা। আর এটাও যে, যে সকল ঈর্ষান্বিত লোকদের ধমনীতে গরম রক্ত হবে। তাদের কোমর ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সামানাদি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।

দাসত্ব থেকে মুক্তি : মোটকথা আল্লাহ তা'আলা ঐ নিকৃষ্ট বিপদ থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে সে দ্বিতীয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) বনীইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তাদের পৈত্রিক জন্মভূমি সিরিয়ার অন্তর্গত কেনআনের দিকে [যা মিশর থেকে ৪০ দিনের পথ [দূরত্ব] উত্তর দিকে ছিল] ভ্রমণ করছিলেন। হযরত ইউসূফ (আ.)-এর বরকতময় লাশের বাক্সও সাথে ছিল। এমতাবস্থায় লোহিত সাগর সামনে পড়ল এবং ফেরাউনের বিরাট সৈন্যদল পেছন থেকে সসৈন্যে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য চলে আসছিল। কঠোর হতবুদ্ধিতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার বরকতে ও তার লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের মাঝে বিরাট খান্দানের জন্য বারটি শুষ্ক রাস্তা খুলে দেওয়া হলো। যেগুলোর দ্বারা বনী-ইসরাঈল তো নিরাপদে পার হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউনের বিরাট সৈন্য বাহিনী ডুবে মরলো। حس کم شد جہان پاک شد অথ– "খড়কুটু আবর্জনা কমেছে জগৎ পবিত্র হয়েছে" জালেম ও শত্রুদের ধ্বংসকে এমনভাবে নিজ নয়নে দর্শন করা দ্বিগুণ নিয়ামত।

قَوْلُهٗ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ : হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বনী ইসরাঈল মিসর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে সাগর পড়ে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সাগর বিভক্ত হয়। মধ্যখানে সৃষ্টি হয় শুষ্ক রাস্তা। বনি ইসরাঈল পার হয়ে যায় আর ফেরাউন সে পথ ধরে পার হতে চাইলে দলবলসহ ডুবে মরে।

بِكُمْ : তোমাদের জন্য অর্থাৎ, তোমাদের [রক্ষার] জন্য। তোমাদের পথ করে দেওয়ার জন্য।

فَرَقْنَا الْبَحْرَ. اَيْ فَرَقْنَا لَكُمْ (مَعَالِم) اَيْ فَرَقْنَا بِسَبَبِكُمْ وَبِسَبَبِ اِنْجَائِكُمْ. (كَشَّاف)

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ .... وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে فَرْقُ الْبَحْرِ বা সমুদ্রকে বিভক্ত করার যে কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সমুদ্রের মধ্যখানে শুষ্ক পথ বের হওয়া উদ্দেশ্য।

আল্লামা আব্দুল মাজেদ (র.) বলেন, এটা খুব অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ ঘটনা নয়। এর দৃষ্টান্ত দূর ও নিকট অতীতেও পাওয়া যায়। সুনামি বা সামুদ্রিক ভূমিকম্পের সময় এ ধরনের অবস্থা প্রায়ই দেখা দেয়। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারিতে (রমযান ১৩৫২ হিজরি) ভারতের বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর পাটনায় দুপুর আড়াইটার সময় এক বিরাট জনসমষ্টি স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল যে, গঙ্গার মতো সুবিশাল নদীর পানি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে শুষ্ক তলদেশ বেরিয়ে এসেছে এবং এ অস্বাভাবিক অবস্থা চার থেকে পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীতে তাতে অবিশ্বাস্য গতিতে তলদেশ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে এবং নদী স্বাভাবিকভাবে পুনঃপ্রবাহিত হয়ে চলছে। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পাইওনিয়ার ১৯৩৪ সালের ২০ জানুয়ারী সংখ্যায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯]

বনী ইসরাঈলের অতিক্রম করা সমুদ্র নির্ণয় : বনী ইসরাঈলের আবাসভূমির পশ্চিমে ছিল নীলনদের অবস্থান। পক্ষান্তরে ইসরাঈলীদের সিরিয়া অভিমুখী পথ ছিল পূর্ব দিকে। নীলনদের সাথে সে পথের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। মিসর থেকে সিরিয়া অভিমুখী পথের নিকটেই ছিল লোহিত সাগর। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ .... الخ আয়াতে লোহিত সাগরের সংকীর্ণ উত্তর মাথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মিসরের পূর্বাংশে যেখানে বর্তমানে 'সুয়েজ খাল' খনন করা হয়েছে, তার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের মানচিত্রে সমুদ্র দুই ত্রিভুজের আকারে বিভক্ত দেখা যায়। উক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের পশ্চিম ত্রিভুজটিই এখানে উদ্দেশ্য। বনী ইসরাঈল সেটা পার হয়েই সিনাই উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিল। অতএব, সাধারণ মানুষের মাঝে যে ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে নীলনদ পাড়ি দিয়েছিলেন, তা সঠিক নয়। –[প্রাগুক্ত]

বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক যাত্রা : ফেরাউন ও মিসরীয় প্রশাসনের উৎপীড়ন-নিপীড়ন বছরের পর বছর সহ্য করার পর অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে গোটা ইসরাঈলী সম্প্রদায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বরকতময় লাশের বাক্স সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে পিতৃভূমি সিরিয়ার অন্তর্গত কেনান ও ফিলিস্তিনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে নৈশকালে যাত্রা করে। কিন্তু রাতের আঁধারে তারা পথ ভুলে লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা শুরু করে। কেনান মিসর থেকে ৪০ দিনের পথ দূরে ছিল। অন্যদিকে এ খবর পাওয়ামাত্র ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে পিছু ধাওয়া করে। ইসরাঈলীদের সামনে তখন সমুদ্র, ডানে ও বামে পর্বতশ্রেণি এবং পিছনে মিসরীয় বাহিনী। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তার লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরে বারটি গোত্রের জন্যে বারটি শুষ্ক রাস্তা খুলে দেওয়া হলো।

বনী ইসরাঈল তো নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউনের বিরাট সৈন্য বাহিনী ডুবে মারা গেল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাওরাত এটাকে ইসরাঈলীদের যাত্রা বলে অভিহিত করেছে। নিশ্চিতভাবে এ যাত্রার সঠিক সময় নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। আধুনিক গবেষকগণ একে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা বলেছেন। অনেকের মতে এটা খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৪৭ সালের ঘটনা। [তাফসীরে মাজেদী : কণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى .... وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

গো-বৎসের প্রতিমূর্তি তৈরি এবং তার পূজা অর্চনা : এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল। আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর খেদমতে বনী ইসরাঈলরা আরজ করল যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যদি আমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো শরিয়ত নিয়ে এসো, তবে আমরা তা জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে নেব। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তুমি তূর-পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার ইবাদতে নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে শরিয়ত স্বরূপ একটি কিতাব দান করব।

হযরত মূসা (আ.) তাই করলেন, ফলে তাওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশ দিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকতে নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল, হযরত মূসা (আ.) একমাস রোজা রাখার পর ইফতার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে রোজাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বিধায় হযরত মূসা (আ.)-কে আরো দশ দিন রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। [মাআরিফুল কুরআন]

اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিবারাত্রি চল্লিশ দিন। কোনো কোনো তাফসীরকারের বর্ণনা মতে অবস্থানের সময়টা ছিল জিলকদের পূর্ণমাস এবং জিলহজের প্রথম দশদিন। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, সুফী-সাধকদের সুপরিচিত চিল্লার উৎস মূলত এটাই।

বাছুর নির্মাণ ও পূজা করা : হযরত মূসা (আ.)-এর তাওরাত কিতাব আনতে যাওয়ায় ৪০ দিনের অনুপস্থিতিতে মূসা সামেরী নামে একব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে সেটি জীবন্ত হয়ে উঠে। আর এতেই অশিক্ষিত বনী ইসরাঈল বাছুরটির পূজা করতে শুরু করে দেয়।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে বাছুর পূজার সূচনা : বাছুরপূজার অনুপ্রবেশ ইসরাঈলীদের মধ্যে ঘটলো কীভাবে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। এক বর্ণনামতে, মিসরীয়দের গো-পূজারই প্রতিবিম্ব ছিল এটা। অন্যমতে, এটা ছিল কেনানী মুশরিক সম্প্রদায়ের প্রতিবেশি হওয়ার প্রভাব। তৃতীয় মতে, গো-বৎস মূলত চন্দ্র দেবতার প্রতিমূর্তি ছিল এবং গো-বৎস পূজা চন্দ্র পূজারই সমার্থক ছিল।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

বনী ইসরাঈলের প্রতি ক্ষমার বিবরণ : গো-বৎস পূজা ও শিরকের মতো জঘন্যতম অপরাধের শাস্তি তো গোটা সম্প্রদায়েরই পাওয়া উচিত ছিল। কেননা একদলের অপরাধ ছিল শিরক করা, আর অন্যদের অপরাধ ছিল দর্শকের ভূমিকা পালনপূর্বক অপরাধে উৎসাহ জোগানো। অথচ বাস্তবে নির্দিষ্ট একটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্টরা তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ ... الخ বলে এ ক্ষমার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

فُرْقَان-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ..... الخ

আলোচ্য আয়াতটিতে كِتَابَ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। কিন্তু فُرْقَانَ দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা–

১. ফুরকান দ্বারা সেই শরয়ী বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা বৈধ-অবৈধের জ্ঞান লাভ হয়।

২. হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহকে ফুরকান বলা হয়েছে, যার দ্বারা সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও কাফের-মুমিনের পার্থক্য বোঝা যায়।

৩. তাওরাতকেই ফুরকান বলা হয়েছে। কারণ, তাওরাত যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তেমনি তার দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যও হয়ে যায়। [তাফসীরে উসমানী]

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত মূসা (আ.)-এর পরিচয় : مُوْسٰى এটা ইবরানী শব্দ। مُوْ অর্থ– বৃক্ষ; سى অর্থ– পানি। হযরত মূসা (আ.) ইমরানের ছেলে এবং قهات-এর নাতি ছিলেন। যিনি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নাতি ছিলেন। ইরানের বাদশা মনুচেহের -এর জমানায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫২৭ সনে হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ইসরাঈলী সিলসিলার সর্বাধিক খ্যাত ও মর্যাদার অধিকারী পয়গাম্বর। তাওরাতের বর্ণনা মতে, তিনি একশ বিশ বছর বয়স পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা মতে, হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী। তাঁর মৃত্যু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০৭ সালে।

ফেরাউনের পরিচয় : ফেরাউন নির্দিষ্ট কোনো বাদশার নাম নয়; বরং এটা প্রাচীন মিসর অধিপতিদের উপাধি বিশেষ। যেমন কিছুকাল পূর্বেও জার্মান অধিপতিকে সিজদার এবং রুশ অধিপতিকে জার বলা হতো।

হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন ফেরাউনের নাম : আহলে কিতাবদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন ফেরাউনের নাম ছিল قَابُوْس (কাবুস)। ওয়াহাব (র.) বলেন, তার নাম ছিল وَلِيْدُ بْنُ مَصْعَبِ بَنِ رَيَّانَ (ওলীদ ইবনে মাসআব ইবনে রাইয়ান)। এ বিষয়ে কিতাবী ঐতিহাসিকগণ ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের মাঝে একটি মতভেদ রয়েছে। আহলে কিতাব ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালে দুজন ফেরাউন বিগত হয়েছে। ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের সময়কার ফেরাউন এবং সাগর পাড়ি দেওয়ার সময়কার ফেরাউন ভিন্ন ব্যক্তি। বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা এটাই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে কুরআনের বর্ণনারীতি থেকে ধারণা করা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের সময়ের ফেরাউন এবং নবুয়ত পরবর্তী সময়ের ফেরাউন একই ব্যক্তি। মুসলিম পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের অভিমত এটিই।

সামেরীর পরিচয় : সামেরীর আসল নাম মূসা। সে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের মুনাফিক। জন্মগতভাবে সে ছিল জারজ সন্তান। বংশগতভাবে ইসরাঈলী ছিল। তার মা লজ্জা এবং দুর্নামের ভয়ে তাকে পাহাড়ের গুহায় প্রসব করে সেখানেই ফেলে আসে। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে লালন-পালন করেছিলেন এবং সে স্বর্ণকার ছিল। সে বনি ইসরাঈল জাতিকে একটি নতুন হাঙ্গামায় লিপ্ত করে দিল। অর্থাৎ, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা একটি গো-বৎস তৈরি করে জাতিকে এর উপাসনায় লাগিয়ে দিল। যা দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের ভিত্তি কম্পিত হয়ে গেল। সুতরাং ফিরে আসার পর হযরত মূসা (আ.) যখন এ দৃশ্য দেখেছেন, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং অসন্তুষ্টির কারণে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বুঝানোর পর গোত্রের লোকেরা তওবা করেছে।

লক্ষ্য করুন! কওমের মধ্যে একই নামে দু'জন মূসা, কিন্তু উভয়ের মাঝে জমিন ও আকাশের পার্থক্য রয়েছে। একজন আল্লাহর পুণ্যবান ও উচ্চ-মর্যাদাশীল পয়গাম্বর, অপরজন- কুচক্রী ও হারামজাদা। একজন তার শত্রু ফেরাউনের হাতে লালিত-পালিত এবং শত্রুর পাহারাদারীতে তাঁকে নিরাপদে রাখা হচ্ছে আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা ও ফেরাউনের ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু মূসা সামিরীর লালন-পালন হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.)-এর মতো সম্মানিত ফেরেশতা করেছেন। তারপরও সে হতভাগা রয়ে যায়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, পরিচর্যা ও শিক্ষাদান ঐ সময়ই কার্যকর হয় যখন মাণিক্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃতিতে আমানত রাখা হয়। اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِىَ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ [হতভাগা সেই হয়, যে নিজ মায়ের উদরে হতভাগা থাকে]

تهی دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل [যোগ্য পথ প্রদর্শক দ্বারা শূন্য কিসমতওয়ালার কী উপকার হবে?]

اِذِ الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيْدًا مِنَ الْاَزَلِ ✡ فَقَدْ خَابَ مَنْ رَبِّىْ وَخَابَ الْمُؤَمَّلُ

অর্থ : যখন সে মানুষটিকে অবিনশ্বর এর পক্ষ থেকে সৌভাগ্যবান করে সৃষ্টি না করা হবে, তখন অবশ্যই ব্যর্থ হবে লালন পালনকারী এবং নিরাশ হবে আশার পাত্র।

فَمُوْسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ.

অতএব ঐ মূসা যাকে লালন-পালন করেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.), সে হয়েছে কাফের আর ঐ মূসা (আ.) যাকে লালন-পালন করেছে ফেরাউন, তিনি হয়েছেন পয়গাম্বর।

লোহিত সাগরে নিমজ্জিত ফেরাউনের পরিচয় : আলোচ্য আয়াতের ঘটনায় কোন ফিরাউনের মৃত্যু হয়েছিল সে সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কিছু সংখ্যক ফেরাউনের মমি পাওয়া গেছে এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ের ফেরাউনের পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে তৃতীয় তুতমোজেস-এর পুত্র এবং অষ্টাদশ রাজবংশের (১৫৮৭-১৩৭৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) দ্বিতীয় আমেনহোতেপ-এর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ের ফেরাউন। কিন্তু অন্যরা মনে করেন যে, উনিশতম রাজবংশের (১৩৭৫-১২০২ খ্রি. পূ.) দ্বিতীয় রামসেস ছিলেন অত্যাচারী ফেরাউন এবং তার উত্তরাধিকারী ফেরাউন মারনেপতাহ-এর সময়ে হিজরত (বনী ইসরাঈলীদের) সংঘটিত হয়েছিল। এই তিনজন ফেরাউনের মমিও এখন শনাক্তকৃত।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : হযরত মূসা (আ.)-কে তূর পাহাড়ে কত দিনের জন্যে ডাকা হয়েছিল?

ক. চল্লিশ দিনের জন্যে	খ. ত্রিশ দিনের জন্যে
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. অর্থ : আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছিলাম চল্লিশ রাত্রির। [সূরা বাকারা : ৫১]	وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَّأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ أَرْبَعِيْنَ. অর্থ : আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে তার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে চল্লিশ রাত্র দ্বারা। [সূরা আ'রাফ : ১৪২]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি (আল্লাহ) হযরত মূসা (আ.)-কে তূর পাহাড়ে চল্লিশ রাত অবস্থান করার জন্যে আহ্বান জানালাম, যাতে আমি তাকে তাওরাত কিতাব প্রদান করতে পারি।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি (আল্লাহ) মূসা থেকে ত্রিশ রাত (দিনসহ)-এর অঙ্গীকার নিয়েছি। অতঃপর অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ রাত (দিনসহ) পূর্ণ করে দিয়েছি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উল্লিখিত ক ও খ অংশের আয়াতের মাঝে শুধু إِجْمَال ও تَفْصِيْل-এর পার্থক্য রয়েছে। ক ও খ অংশের আয়াতের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, প্রথমে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) থেকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত তূর পাহাড়ে অবস্থান করে ইবাদতের মশগুল থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ফলে হযরত মূসা (আ.) সেখানে লাগাতার ইফতার করা ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত রোজা রেখেছেন, যাকে صَوْمُ الْوِصَالِ বলা হয়। যখন হযরত মূসা (আ.) ত্রিশতম দিবসে পৌঁছলেন, তখন ইফতার করে ফেলেন, যার দরুন রোজা অবস্থায় তার মুখে যে গন্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশক ও কস্তুরীর চেয়েও উত্তম ও পছন্দনীয়, সে গন্ধ দূরীভূত হয়ে গেল। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ দিন রোজা রাখার আহ্বান জানালেন, ফলে সর্বমোট চল্লিশ দিন রোজা রাখা হলো। সুতরাং ক-অংশের আয়াতে সংক্ষিপ্তাকারে চল্লিশ দিন রোজা রাখার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর খ-অংশের আয়াতে বিস্তারিতভাবে হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে চল্লিশ দিন রোজা রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, إِجْمَال ও تَفْصِيْل-এর মাঝে যেহেতু কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সেহেতু ক ও খ অংশের আয়াতের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব বাকি নেই। [হাশিয়াতুল জামাল, খাযেন, মাদারিকুত তানযীল, বয়ানুল কুর'আন]

٥٤. ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ﴾ الَّذِيْنَ عَبَدُوا الْعِجْلَ ﴿يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ إِلٰهًا ﴿فَتُوْبُوْا إِلٰى بَارِئِكُمْ﴾ خَالِقِكُمْ مِنْ عِبَادَتِهٖ ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أَيْ لِيَقْتُلَ الْبَرِيْءُ مِنْكُمْ الْمُجْرِمَ ﴿ذٰلِكُمْ﴾ الْقَتْلُ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ﴾ فَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذٰلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ لِئَلَّا يُبْصِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمَهُ حَتّٰى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوُ سَبْعِيْنَ أَلْفًا ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ ﴿إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

৫৪. আর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, যারা গো-বৎসের উপাসনা করেছিল হে আমার জাতি! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ। সুতরাং তোমরা তওবা করো তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, তোমাদের স্রষ্টার নিকট এর উপাসনা হতে এবং নিজেদেরকে তোমরা হত্যা করো অর্থাৎ, তোমাদের নির্দোষ ব্যক্তি দোষীজনকে যেন হত্যা করে। এটাই অর্থাৎ, এই হত্যা করাই তোমাদের জন্যে স্রষ্টার নিকট উত্তম। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এই কাজ করার তাওফীক দিলেন। হত্যা করার সময় একজন অপরজনকে দেখে যেন কোনোরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়, সে উদ্দেশ্যে ঘনকালো একখণ্ড মেঘ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রেরণ করেন। ফলে তখন তোমাদের প্রায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হলেন অর্থাৎ, তোমাদের তওবা কবুল করলেন তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٥. ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ﴾ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوْسٰى لِتَعْتَذِرُوْا إِلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهٗ ﴿يَا مُوْسٰى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾ عِيَانًا ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ الصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ﴾ مَا حَلَّ بِكُمْ.

৫৫. তোমরা যখন বলেছিলে আর তখন তোমরা গো-বৎস উপাসনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট ওজর প্রদানের উদ্দেশ্যে মূসার সঙ্গে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ তা'আলার কালামও শুনেছিলে। হে মূসা! আমরা আল্লাহকে সরাসরি সামনাসামনি না দেখা পর্যন্ত তোমার উপর কখনো ঈমান আনব না। অনন্তর তোমাদেরকে বজ্র মহা হুঙ্কার গ্রাস করল। ফলে তোমরা মারা গেলে আর তোমাদের উপর কী আপতিত হলো তা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

٥٦. ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ﴾ أَحْيَيْنَاكُمْ ﴿مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ نِعْمَتَنَا بِذٰلِكَ

৫৬. অতঃপর মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করলাম জীবন দান করলাম, যাতে তোমরা আমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করো।

٥٧. ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيْقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِي التِّيْهِ ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ﴾ فِيْهِ ﴿الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى﴾ هُمَا التُّرَنْجَبِيْنُ وَالطَّيْرُ السُّمَانٰى بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا ﴿كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ وَلَا تَدَّخِرُوْا فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ وَادَّخَرُوْا فَقَطَعَ عَنْهُمْ ﴿وَمَا ظَلَمُوْنَا﴾ بِذٰلِكَ ﴿وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾ لِأَنَّ وَبَالَهٗ عَلَيْهِمْ.

৫৭. আমি ছায়া দিলাম তোমাদের উপর মেঘ দ্বারা তীহ ময়দানে সূর্য-তাপ হতে রক্ষা করার জন্যে হালকা মেঘ দ্বারা তোমাদের ঢেকে রেখেছিলাম, এবং তোমাদের নিকট সেখানে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম এ দুটি হলো তুরানজবীন এবং সুমানা পাখি السُّمَانٰى শব্দটির م অক্ষর تخفيف এবং الف অক্ষর قَصْر করে পঠিত হয়। আর বলেছিলাম, তোমাদেরকে যে রিজিক দান করেছি; তার উত্তম অংশ থেকে আহার করো আর তা সঞ্চয় করে রেখো না। কিন্তু তারা নিয়ামতের না-শোকরি করল এবং তা সঞ্চয় করে রাখল। ফলে তা বন্ধ হয়ে গেল। আর তারা এর মাধ্যমে আমার উপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেদের প্রতিই অন্যায় করছিল। কেননা, তাদের এ আচরণের মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ ـ اَلَّذِيْنَ الخ

قوم দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) اَلَّذِيْنَ عَبَدُوْا الْعِجْلَ বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে قَوْم দ্বারা বিশেষভাবে ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা গো-বৎস পূজা করেছিল।

قَوْلُهٗ : حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً ـ عِيَانًا

উহ্য প্রশ্নের জবাব দান : মুফাসসির (র.) عِيَانًا শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– جَهْرَةً শব্দটির সম্পর্ক صَوْت তথা শব্দের সাথে। কারণ, جَهْرة শব্দটি جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ-এর মাসদার। অতএব এটি رُؤْيَة-এর অর্থে ব্যবহার করার কারণ কী?

উত্তর : এখানে جَهْرة শব্দটি رُؤْيَة-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে মাজাযরূপে। কারণ, جَهْرة ও رُؤْيَة শব্দ দুটির মধ্যে মুনাসাবাত খুবই স্পষ্ট।

قَوْلُهٗ : فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ـ الصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ

اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং পরে উল্লিখিত ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ-কে তার قرينة সাব্যস্ত করেছেন। এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত। কেউ কেউ اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা বেহুঁশ হওয়া বুঝিয়েছেন। তারা فَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন এবং وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-কে তার قرينة সাব্যস্ত করে থাকেন। কেননা, اِفَاقَة তো غَشى থেকেই হয়ে থাকে, মৃত্যু থেকে নয়।

মুফাসসির (র.)-এর اَلصَّيْحَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– صَيْحة جِبْرَائِيْل; রবী ইবনে আনাস থেকে ইবনে জারীর এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন। মুফাসসির (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা আকাশ থেকে নেমে আসা আগুন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ مَا حَلَّ بِكُمْ

تنظرون-এর উহ্য মাফঊল নির্ণয় : মুফাসসির (র.) এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে تَنْظُرُوْنَ ফে'লের মাফ'ঊলটি উহ্য রয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلتُّرَنْجِبِيْنَ : বিশেষ এক প্রকার হালকা মিষ্টি খামির কে বলা হয়।

سَلْوٰى : কবুতরের চেয়ে ছোট, চড়ুই এর চেয়ে বড় এক প্রকার পাখী, যাকে بٹیر বলা হয়; তিতির জাতীয় পাখী। তারা এ পাখি অনায়াসে ধরে নিজেরা ভুনা করে খেত। অথবা পাকানো বা ভুনা করা অবস্থায় পেত।

بَارِئُ : শব্দটির অর্থ– خَالِق সৃষ্টিকারী। বলা হয়– بَرَأَ اللّٰهُ الْخَلْقَ اَيْ خَلَقَهُمْ কেউ কেউ اَلْبَارِئُ এবং اَلْخَالِق-এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন– بارئ অর্থ– اَلْمُبْدِعُ الْمُحْدِثُ; আর خَالِق অর্থ– اَلْمُقَدِّرُ النَّاقِلُ مِنْ حَالٍ بَرِئَ اِلٰى حَالٍ; শব্দমূলে একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তু পৃথক হওয়ার অর্থ রয়েছে। যখন রোগী সুস্থ হয়, তখন বলা হয় بَرِئَ الْمَرِيْضُ مِنْ مَرَضِهٖ; ঋণগ্রস্ত যখন ঋণমুক্ত হয় তখন বলা হয়– بَرِئَ الْمَدْيُوْنُ مِنَ الدَّيْنِ; এ থেকেই আল্লাহর সিফতী নাম اَلْبَارِئُ হয়েছে। কেননা, তিনি সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং عَدَمْ থেকে পৃথক করে وُجُوْد-এ এনেছেন। আর এ থেকেই اَلْبَرِيَّةُ بِمَعْنَى الْخَلِيْقَةِ (اَلْمَخْلُوْقُ)-এর ব্যবহার রয়েছে। কেননা মাখলুক عَدَم থেকে পৃথক হয়ে وجود-এ এসেছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى .... التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

قَالَ ফে'ল, مُوْسٰى ফায়েল, لِقَوْمِهٖ অংশটি قَالَ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّق। يَا হরফে নেদা قَوْم মুনাদা اِسْمُ ـ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اِنَّ ফে'ল ضمير ফায়েল اَنْفُسَكُمْ মাফ'ঊল بِاتِّخَاذِكُمْ মুতা'আল্লিক ظَلَمْتُمْ ফে'লের সাথে। الْعِجْلَ শব্দটি اِتِّخَاذ মাসদারে مَفْعُوْل بِهٖ; فَتُوْبُوْا ফে'ল ضمير ফায়েল اِلٰى بَارِئِكُمْ মুতা'আল্লিক فَتُوْبُوْا ফে'লের সাথে। فَاقْتُلُوْا ফে'ল ضمير ফায়েল اَنْفُسَكُمْ মাফ'ঊলে বিহী ذٰلِكُمْ মুবতাদা خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ অংশটি হলো খবর।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْتُمْ ... وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

واو হরফে আতফ اِذْ মাফ'উলে ফীহি قُلْتُمْ ফে'ল ضَمِيْر ফায়েল। يَا হরফে নেদা مُوْسٰى মুনাদা لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ হলো জাওয়াবে নেদা। نرى ফে'ল الله যুলহাল جَهْرَةً হলো হাল। অথবা نرى-এর ضمير হলো যুলহাল جَهْرَةً হলো হাল অথবা جَهْرَةً উহ্য ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক মূল ইবারত হবে– نَجْهَرُ جَهْرَةً وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ;

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ ..... اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

পূর্বের আয়াতগুলোতে ফেরাউন থেকে মুক্তি, তাওরাত প্রদান ইত্যাদি নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত আরো কিছু নিয়ামত ও তাদের হঠকারিতার আলোচনা করা হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ ... اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

বাছুর পূজার তওবা : হযরত মূসা (আ.)-এর অবর্তমানে বনী ইসরাঈল যে বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তওবার পদ্ধতি হিসেবে বাছুর পূজারীদের হত্যার আদেশ দিলেন। উক্ত হত্যার পদ্ধতি ছিল– যারা সামেরীর গো-বৎসর পূজা করেনি, তারা পূজারীদেরকে হত্যা করবে। উল্লেখ্য তখন বনী ইসরাঈলে তিন শ্রেণির লোক বিদ্যমান ছিল, প্রথম শ্রেণি বাছুর পূজা থেকে নিজেরাও বিরত থেকে ছিল অন্যদেরকেও বাধা দিয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণির লোকজন গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণির মানুষ নিজেরা পূজা করেনি, তবে অন্যদের বাধাও দেয়নি। ফলে তৃতীয় শ্রেণি সম্পর্কে নির্দেশ ছিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদেরকে হত্যা করো, যাতে উভয় শ্রেণির তওবা হয়ে যায়। আর প্রথম শ্রেণি এ তওবার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে তাদের তওবার প্রয়োজনই হয়নি। [জামালাইন]

তওবা কার্যকরের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ : যখন হযরত মূসা (আ.) অপরাধীদের হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তারা বলল, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানার ধৈর্য আমাদের নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে দুই হাতে হাঁটু বেঁধে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যে তার বাঁধন খুলবে কিংবা হত্যাকারীর দিকে তাকাবে, তার তওবা গ্রহণ করা হবে না। ফলে সকলে সেভাবে বসল এবং হত্যাকারীরা তাদেরকে হত্যার জন্যে উদ্যত হলো। কিন্তু আত্মীয়তার খাতিরে অন্তরের দয়া-মমতার কারণে তাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করলেন, আমরা এ বিধান পালন করতে পারছি না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে কালো মেঘমালা দিয়ে পুরো এলাকা ঢেকে দিলেন। যাতে হত্যাকারী নিহতকে চিনতে না পারে। এভাবে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত ৭০ হাজার অপরাধীকে হত্যা করা হয়। এ করুণ অবস্থা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে কায়মনোবাক্যে তাদের মুক্তির জন্যে দোয়া করেন। ফলে মেঘমালা সরে যায় এবং তাদের তওবা কবুলের ঘোষণা প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আমি নিহত ও হত্যাকারী উভয়কেই জান্নাত দান করব? এরপর যারা নিহত হয়, তারা শহীদ আখ্যা পায়। অবশিষ্টরাও ক্ষমা লাভে ধন্য হয়। গো-বৎসের উপাসনার শাস্তি অনুযায়ী সকলের নিহত হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তওবা কার্যকরের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন এবং ছয় লক্ষ থেকে শুধু ৭০ হাজার নিহত হওয়ার পর ক্ষান্ত করেছেন এবং নিহত ও আহত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বাছুর পূজার কারণে কঠিন শাস্তি হওয়ার কারণ : বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি জাতি ছিল এবং সাধারণ ধমকিতে ভয় করতো না তাই কঠোর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি 'কতল' নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের তওবা হলো 'কতল'। যেমন– বিবাহিত ব্যক্তির জেনার শাস্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা। বনী ইসরাঈলকে এ ধরনের কঠিন শাস্তির মূল কারণ ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ; তাই এর শাস্তি স্বরূপ পার্থিব জীবনকে বিলীন করে দাও।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ .... وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

ওজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চাওয়ার শাস্তি : আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে ওজরখাহী করার জন্যে। হযরত মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্যে তুর পাহাড়ে নিয়ে যান।

সত্তর জন নিহত হওয়ার ঘটনার সময়কাল : বনী ইসরাঈলের সত্তর জনের উপর বজ্রপাতের এ ঘটনা কখন ঘটেছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হুকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন অলি নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন, এ ঘটনা ঘটে 'কতলে তওবা'র হুকুম প্রয়োগের পর।

হযরত মূসা (আ.) সে জামাতকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

إِنِّيْ أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِيَدٍ شَدِيْدَةٍ فَاعْبُدُوْنِي وَلَا تَعْبُدُوْا غَيْرِي

তখন তারা সকলে হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলে– لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللهَ جَهْرَةً

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

মৃত্যুর পর ইহকালেই জীবনদান অন্যতম নিয়ামত : বজ্রাহত হয়ে বনী ইসরাঈলের সত্তরজনের মৃত্যুর পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমি নিজেই হত্যা করে ফেলেছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানি পূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাদের পুনর্জীবন দান করলেন। সাধারণত, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে কাউকে জীবিত করা হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে তাদেরকে জীবিত করলেন। যাতে তারা এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

মু'তাযিলাদের দাবি খণ্ডন : মু'তাযিলারা فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ দ্বারা আল্লাহর দর্শন অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করে। তারা যেহেতু অসম্ভবের আবদার করেছিল তাই তাদের উপর এ বজ্র পড়েছে। তাদের এ দাবি সঠিক নয়। দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন যুক্তির নিরিখে সম্ভব। হযরত মূসা (আ.)-এর আবদার رَبِّ اَرِنِيْ তার প্রমাণ বহন করে। বনী ইসরাঈল আল্লাহকে দেখতে না পারার কারণ হলো, ক্ষমতাসুলভ তারা অধিক নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করেছে। তাই তারা এ শাস্তি পেয়েছে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭১]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ .... يَظْلِمُوْنَ

তীহ প্রান্তরের ঘটনা : শাম (সিরিয়া) দেশে বনী ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সময়ে তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। তখন 'আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ফেরাউন ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দেন। বনী ইসরাঈল এতদুদ্দেশে মিসর থেকে রওয়ানা হয়। শামের সীমান্তে পৌঁছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করেন যে, তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর দিক-বিদিকশূন্য হয়ে বিচরণ করতে থাকে। সে সময় হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় আল্লাহ তা'আলা সে প্রান্তরে সাদা সাদা মেঘমালা দ্বারা তাদেরকে ছায়া প্রদান করেন। যাতে সূর্যের তাপযন্ত্রণা লাঘব হয়। আর সেখানে তাদের আহারের জন্যে মান্না-সালওয়া নামীয় সুস্বাদু খাবার নাযিল করেন। সেই অন্ধকার রাতে পথচলার জন্যে একটি আলোর স্তম্ভও তৈরি করে দেন। [মা'আরিফুল কুরআন, কওমে ইয়াহুদ আওর হ্যাম]

বনী ইসরাঈলের অকৃতজ্ঞ হওয়ার ফলাফল : উল্লিখিত নিয়ামত দেওয়ার সাথে সাথে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, গুদামজাত করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি। এ গায়েবি ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে কখনো এমনটি না করা চাই। অন্যথায় নিয়ামতের না-শোকরী হবে। কিন্তু তারা এর কদর না করে হুকুমের বিরোধিতা করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। –[প্রাগুক্ত]

✪ تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ وَالطَّعَامِ : স্থান ও খাবার পরিচিতি

اَلتِّيْهُ : هُوَ الْاَرْضُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْمِصْرِ وَقَدْرُهٗ تِسْعُ فَرَاسِخَ অর্থাৎ, তীহ প্রান্তরটি শাম (সিরিয়া) ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, তার পরিমাণ হলো নয় ফারসাখ। (এক ফারসাখ তিন মাইল। কারো কারো মতে– বারো হাজার গজ যা আনুমানিক আট কিলোমিটার পরিমাণ।) আর সিরিয়ার অন্তর্গত কেনান হলো মিশর থেকে ৪০ দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

تِيْه শব্দটি বাবে ضرب-এর মাসদার। অর্থ– বিভ্রান্ত হওয়া, দিশেহারা হওয়া। যেহেতু এ ময়দানটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং আসবাব ও উদ্ভিদশূন্য ছিল, যার কারণে দর্শকগণ অস্থির ও দিশেহারা, হতো তাই এর নাম تِيْه রাখা হয়েছে। [মিসবাহুল লুগাত]

اَلْمَنُّ وَالسَّلْوٰى : مَنُّ এক প্রকার সুস্বাস্থ্যকর খাদ্য, যা ধনিয়ার সদৃশ শিশির বিন্দুর ন্যায় তাদের চারপাশে পড়ে জমে থাকত। سَلْوٰى এক প্রকার পাখি, যাকে বটের (بٹیر) বলা হয়। সন্ধ্যাকালে তাদের চারপার্শ্বে হাজার হাজার পাখি এসে জমা হতো। অন্ধকার হলে তারা সেগুলো ধরে আনত এবং কাবাব বানিয়ে খেত। বহুদিন যাবত এটাই ছিল তাদের খাদ্য। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ১১, পার্শ্ব টীকা, ৭]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ

ইজায : আলোচ্য অংশটুকুর মূলরূপ হলো– قُلْنَا لَهُمْ كُلُوْا; এখানে قُلْنَا لَهُمْ অংশটুকু উহ্য রাখার দ্বারা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকে إِيْجَاز বলে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا ظَلَمُوْنَا

ইজায : আলোচ্য অংশের মূলরূপ হলো– فَظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ بِأَنْ كَفَرُوْا وَمَا ظَلَمُوْنَا بِذٰلِكَ এখানে فَظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ অংশটুকু উহ্য রেখে শুধু وَمَا ظَلَمُوْنَا বলা হয়েছে। এই উহ্য ইবারতটুকুর করীনা হলো পরবর্তী وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অংশটুকু।

٥٨. ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ لَهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ التِّيهِ ﴿اُدْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَوْ أَرِيحَا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ وَاسِعًا لَا حَجْرَ فِيهِ ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ﴾ أَيْ بَابَهَا ﴿سُجَّدًا﴾ مُنْحَنِيْنَ ﴿وَقُولُوا﴾ مَسْأَلَتُنَا ﴿حِطَّةٌ﴾ أَيْ أَنْ تَحُطَّ عَنَّا خَطَايَانَا ﴿نَغْفِرْ﴾ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فِيهِمَا ﴿لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا.

৫৮. যখন আমি তাদেরকে বললাম, তীহ প্রান্তর থেকে বের হওয়ার পর এ জনপদে বায়তুল মুকাদ্দাস কিংবা আরীহায় প্রবেশ করো, অনন্তর যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত আহার করো এতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই এবং তার পর্যাপ্ত ফটক দিয়ে প্রবেশ করো অবনতভাবে নতশিরে এবং বলো আমাদের প্রার্থনা হলো, ক্ষমা অর্থাৎ, আপনি আমাদের পাপসমূহ বিদূরিত করে দিন। তাহলে আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব نَغْفِر ক্রিয়াটি এক কেরাতে يَاء ও تَا সহকারে রয়েছে مَجْهُوْل হিসেবে। এবং অবশ্যই আমি আনুগত্যের মাধ্যমে সদাচারকারীদের প্রতিদান বৃদ্ধি করে দিব।

٥٩. ﴿فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا﴾ مِنْهُمْ ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ﴾ فَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ وَدَخَلُوْا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا﴾ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ مُبَالَغَةً فِي تَقْبِيْحِ شَأْنِهِمْ ﴿رِجْزًا﴾ عَذَابًا طَاعُونًا ﴿مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ﴾ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ أَيْ خُرُوْجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ أَقَلُّ.

৫৯. তাদের মধ্য থেকে যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। তারা বলেছিল, আমাদের প্রার্থনা হলো যবের দানা। আর তারা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে প্রবেশ করেছিল। তাই যারা অন্যায় করেছিল, তাদের উপর আমি প্রেরণ করলাম তাদের অবস্থার জঘন্যতার আধিক্য প্রকাশার্থে যমীরের পরিবর্তে الذين ظلموا অর্থ اسم ظاهر عليهم না বলে ব্যবহার করা হয়েছে। আকাশ হতে শাস্তি আযাব অর্থাৎ, মহামারি; কারণ, তারা পাপাচার করেছিল তাদের ফিসক অর্থাৎ, আনুগত্য পরিত্যাগ করার কারণে এ অবস্থা হয়েছিল। ফলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের সত্তর হাজার বা কিছু কম সংখ্যক লোক ধ্বংস হয়েছিল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَادْخُلُوْا الْبَابَ . اَيْ بَابَهَا

الباب দ্বারা উদ্দেশ্য : الباب দ্বারা নগর প্রাচীরের প্রবেশদ্বার বুঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালে নগরের চার পাশে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করা হতো। শহরে প্রবেশ করতে হলে সে প্রবেশদ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হতো।

قَوْلُهٗ : سُجَّدًا . مُنْحَنِيْنَ

سُجَّدًا দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরে খাযিনে উল্লেখ রয়েছে, এখানে সেজদা দ্বারা মাটিতে কপাল রাখা উদ্দেশ্য নয়; বরং রুকুর মতো মাথা ঝুঁকানো উদ্দেশ্য।

سُجَّدًا-এরপর مُنْحَنِيْنَ এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বুঝানো হয়েছে যে, سُجَّدًا শব্দটি حَال হিসেবে নসব বিশিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقُوْلُوْا . مَسْئَلَتُنَا : حِطَّةٌ اَيْ اَنْ تَحُطَّ الخ

মুবতাদা উহ্য মানার কারণ : মুফাসসির (র.) حطة-এর পূর্বে مَسْئَلَتُنَا বৃদ্ধি করে নাহুশাস্ত্রের তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এখানে মুবতাদাটি উহ্য রয়েছে। মুবতাদা উহ্য মানার কারণ হলো, قَوْل-এর مَقُوْلَة সর্বদা জুমলা হওয়া আবশ্যক। অথচ حِطَّة শব্দটি মুফরাদ। এ আপত্তি থেকে বাঁচার জন্যে মুফাসসির (র.) مَسْئَلَتُنَا শব্দটি حِطَّة-এর পূর্বে উহ্য মুবতাদা মেনে জুমলা বানানো হয়েছে।

حِطَّة শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য– 'আমরা ক্ষমা-মার্জনা চাই' একথা বলা। হুবহু حِطَّة শব্দ বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটি আরবি শব্দ। আর বনী ইসরাঈলের ভাষা ছিল হিব্রু। حِطَّة অর্থ– তওবা-ইস্তিগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা। অর্থাৎ, আপনি আমাদের পাপসমূহ দূর করে দিন। এর তাৎপর্য ছিল যে, অন্তরের বিনয়ের সাথে মুখেও তওবা-ইস্তিগফার করতে করতে প্রবেশ করবে। اَيْ اَنْ تَحُطَّ দ্বারা মুফাসসির (র.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ হুবহু حطة শব্দটিই উচ্চারণ করার কথা বলেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই নির্ভরযোগ্য।

قَوْلُهٗ : اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا . مِنْهُمْ

কতিপয় লোক বক্তব্য বিকৃত করেছে : مِنْهُمْ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের সবাই এই বাক্য পরিবর্তনের অপরাধ করেনি; বরং কতিপয় লোক এ অপরাধ করেছিল। তাছাড়া সূরা আরাফের ৬২ নং আয়াতে مِنْهُمْ-সহ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ الخ এখানে فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ বলা যথেষ্ট ছিল, কারণ পূর্বে اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইসমে যাহের আনার কারণ কী? মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে যমীরের পরিবর্তে সরাসরি ইসম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো তাদের অবস্থার জঘন্যতা তুলে ধরা। [হাশিয়াতুল জামাল]

قَوْلُهٗ : رِجْزًا . عَذَابًا طَاعُوْنًا

رِجْزًا-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) عَذَابًا طَاعُوْنًا দ্বারা رِجْزًا-এর ব্যাখ্যা করেছেন যার অর্থ হলো, তাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ মহামারি অবতীর্ণ হয়েছিল। আর মুফাসরি (র.) এই তাফসীরটি করেছেন একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) উসামা ইবনে যায়েদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে মহামারি সম্পর্কে কোনো হাদীস শুনেছেন কিনা? তখন উসামা ইবনে যায়েদ (র.) বলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ أَوْ عَلٰى مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ... الخ

(وَقَالَ شُعَيْبُ الارنؤوط وأصْحَابُهُ : إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ)

[মুসনাদে আহমদ : খণ্ড ৩৬, পৃষ্ঠা ৯৫; হাদীস নং ২১৭৬২]

তবে এ শাস্তি সম্পর্কে আরো বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন কারো মতে, এ رِجْزٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আকাশ থেকে নেমে আসা আগুন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر معروف امر حاضر বাব نصر মাসদার اَلْأَكْلُ মূলবর্ণ (أ . ك . ل) জিনস مهموز فا অর্থ– তোমরা আহার করো, খাও।

شِئْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر معروف فعل ماضى مطلق اثبات বাব فتح মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ي . ء) জিনস مركب (اجوف يائى + مهموز لام) অর্থ– তোমরা ইচ্ছা করেছ।

اَسْبَاطًا : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اِسْبٌ অর্থ– নিতম্ব।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا .... فَكُلُوْا

واو হরফে আতফ قلنا اذ বাক্যটি পূর্ববর্তী وَإِذْ قُلْتُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে। اُدْخُلُوْا ফে'ল ضمير ফায়েল هٰذِهِ الْقَرْيَةَ মাফ'উলে ফীহি। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে مقول হয়েছে।

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ রَغَدًا-এর মাঝে كُلُوْا ফে'ল ضمير ফায়েল مِنْهَا মুতা'আল্লিক حَيْثُ شِئْتُمْ মাফউলে ফীহি হয়েছে। رَغَدًا মাফ'উল অথবা فَكُلُوْا ফে'ল থেকে মাফউলে মুতলাক অর্থাৎ, اَكْلًا وَاسِعًا অথবা فَكُلُوْا-এর ضمير থেকে হাল হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا .... بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

فَبَدَّلَ ফে'ল الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ফায়েল قَوْلًا মাওসূফ غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ সিফাত। মাওসুফ ও সিফাত মিলে মাফ'উল হয়েছে। فَبَدَّلَ বাক্যটি بَدْل-এর উপর আতফ হয়েছে। اَرْسَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অংশটি فأَرْسَلْنَا .... الخ-এর متعلق, رِجْزًا হলো أَرْسَلْنَا-এর মাফ'উল। مِنَ السَّمَاءِ অংশটি رِجْزًا-এর উহ্য شِبْهُ الْفِعْل সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। মূলরূপ হলো– أَرْسَلْنَا رِجْزًا نَازِلًا مِنَ السَّمَاءِ; بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-এর ما টি مصدرية; মূলরূপ হবে– بِكَوْنِ فِسْقِهِمْ; অংশটি أَرْسَلْنَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ

نَغْفِرْ শব্দের কেরাত : ৫৮নং আয়াতে উল্লিখিত نَغْفِرْ শব্দের কয়েকটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) ও অধিকাংশ কারীর কেরাত অনুযায়ী শব্দটির শুরু অংশে ن-যোগে نَغْفِرْلَكُمْ পড়া হয়।

খ. ইমাম নাফে (র.) শব্দটিকে ي-যোগে মাজহুলরূপে يُغْفَرْ لَكُمْ পড়েছেন।

গ. ইবনে আমের (র.) শব্দটিকে ت-যোগে মাজহুলরূপে تُغْفَرْ لَكُمْ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ .... وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

ঘটনার স্থানকাল নির্ণয় : وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا ... الخ আয়াতে নগরে প্রবেশের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এটাও ময়দানে তীহের ঘটনা। যখন মান্না ও সালওয়া খেতে খেতে তাদের মন বিরক্ত হয়ে উঠল, তখন তারা অভ্যাস মোতাবেক সাধারণ খাবারের আবদার করতে লাগল। আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুম হলো যে, তোমরা যে খাদ্যের আবদার করছ, সেটা নগরবাসীর খাদ্য, এখানে কোথায় পাবে? যদি তোমাদের সে খাদ্যের প্রয়োজন থাকে, তবে তোমাদের সামনে যে শহর রয়েছে, সেখানে যাও। কিন্তু প্রবেশকালে কথায় ও কাজে আদব রক্ষা করতে হবে।

আর কোনো কোনো মুফাসসির এ ঘটনাকে সে শহরের সাথে সংযুক্ত মনে করেছেন, যে শহর জিহাদের মাধ্যমে জয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জিহাদের হুকুম অমান্য করার কারণে ৪০ বছর পর্যন্ত তারা ময়দানে তীহের মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরছিল। অবশেষে হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.)-এর নেতৃত্বে এ জিহাদ সমাপ্ত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করেন। তখন শহরে প্রবেশের সময় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা অহংকারী ও বিজয়ীরূপে প্রবেশ করবে না; বরং নম্র ও বিনীতভাবে প্রবেশ করো। এমন করলে অতীতের গুনাহ আমি ক্ষমা করে দেব এবং ভবিষ্যতে একাগ্রতার সাথে নেক আমলকারীদের অধিক পুরস্কার দেব। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর হুকুমকে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল– حِنْطَةٌ فِيْ شَعْرَةٍ; আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে উপহাসের পাত্র বানানোর পরিণামে তাদের উপর আযাব নেমে এসেছে।

[কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭২]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ..... بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

বনী ইসরাঈলকে শাস্তি প্রদানের কারণ : فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ .... الخ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী-ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে حطة বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও তারা অবাধ্যতাবশত সে শব্দের পরিবর্তে حِنْطَة বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানি শাস্তি অবতীর্ণ হলো। এ শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল– যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি; বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّة অর্থ– মার্জনা চাওয়া। আর حِنْطَة অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা কুরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে– নিঃসন্দেহে এবং সর্বসম্মতভাবে হারাম। কেননা, এটা এক ধরনের تَحْرِيْف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন। তাই আল্লাহপ্রদত্ত শব্দে বিবৃতির কারণে তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হলো।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا ... بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

শরিয়তের নসসমূহ পরিবর্তন করার বিধান : শরিয়তের বিভিন্ন নসসমূহ, যেমন– কুরআন, হাদীস ইত্যাদি, পরিবর্তন করা যায় কিনা সে সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কোনো কোনো বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্যে শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েজ নয়। যেমন, আযানের জন্যে নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোনো শব্দ পাঠ করা জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে নামাজের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, ছানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে-কুনূত ও রুকু-সেজদার তসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোনো রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েজ নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কুরআন মজিদের শব্দাবলিরও একই হুকুম। অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলিতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এসব শব্দাবলির অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যেখানে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তাহলে একে শরিয়তের পরিভাষায় কুরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। কুরআন পাঠ করার জন্যে যে ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ, কুরআন শুধু অর্থের নাম নয়; বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলিতে তা নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কুরআন। فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ... الخ আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যত বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশে যে শব্দটি বাতলে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধান ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থি। কাজেই তারা আসমানি আজাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য, শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ-এর মতে এ পরিবর্তন জায়েজ। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (র.) থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েজ; কিন্তু শর্ত হচ্ছে, বর্ণনাকারীকে আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকতে হবে-যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার : আলোচ্য অংশটুকুতে যমীর ব্যবহার করে فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ বললেও যথেষ্ট হতো। কিন্তু সেটা না করে সরাসরি ইসম ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَكَانَ الضَّمِيْرِ বলা হয়। এখানে এমন করার কারণ হলো তাদের জঘন্যতা প্রকাশ করা এবং তাদের কাজের সুতীব্র নিন্দা জানানো।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ

নাকেরা ব্যবহার : আলোচ্য অংশটুকুতে رِجْز শব্দটি নাকেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা আজাবের ভয়াবহতা ও বিশালতা বোঝানো হয়েছে।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. أوضح تفسير المصنف (رح) لِلْآيات الكريمة بحيث ينكشف الغبار.

ج. ما معنى الشكر وما حقيقته وما فائدة الشكر؟ اكتب ممثلا بالتفكر التام.

د. ما هو التعارض الظاهري بين الآيتين ما هو الحل عندك؟ اوضح متيقظا.

ه. أَعرِبْ قوله تَعَالٰى : وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقانَ لعلكم تهتدون.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ

أ. ترجم الاية الكريمة موضحة.

ب. فسر الآية على نهج المصنف العلام رح.

ج. كم نعمة انعمها الله عليهم من بداية زمان موسى الى نهايته؟

د. كم إعْرَابًا للكلمة "جَهْرَةً"؟ أوضِحْ كُلَّ الإعْرَاب.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

أ. ترجم الإيتين الكريمتين فصيحة.

ب. قوله : لن نؤمن لك فان قيل ان الايمان يتعدى بنفسه او بالباء لا باللام، وقد تعدى ههنا باللام اجب عنه متفكرا، ثم فسر الجمل الآتية ١. فأخذتكم الصاعقة ـ ٢. وظللنا عليكم الغمام ٣. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.

ج. حَلِّ لُغَات الألفاظ الآتية : نرى، الله، انزلنا، التيه، المن والسلوى، ثم بين اللطيفة المودعة في قوله كلوا من طيبات ما رزقنكم بالإيضاح التام.

د. أعرِبْ قوله تعالى : مَا رزقْنَاكُمْ.

ه. اكتب ما حصلتَ منَ الهداية والإرشادِ من اللآتيين الكريمتين.

رُكُوْع : ৭

بَيَانُ تَعَدُّدِ النِّعَمِ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكُفْرِهِمْ بِهَا

বনী ইসরাঈলের উপর বিভিন্ন নিয়ামতসমূহ ও তা অস্বীকারের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের জন্যে পাথর হতে অলৌকিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন পানির ব্যবস্থা
- জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিষেধাজ্ঞা
- বনী ইসরাঈলের মান্না-সালওয়ার প্রতি অরুচি
- হযরত মূসা (আ.)-এর ভর্ৎসনা
- নিকটবর্তী শহরে গমনের ঐশী প্রত্যাদেশ
- বনী ইসরাঈলের প্রতি লাঞ্ছনা ও গজবের কারণ

٦٠. ﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى﴾ أَيْ طَلَبَ السُّقْيَا ﴿لِقَوْمِهٖ﴾ وَقَدْ عَطِشُوْا فِي التِّيْهِ ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ وَهُوَ الَّذِيْ فَرَّ بِثَوْبِهٖ خَفِيْفٌ مُرَبَّعٌ كَرَأْسِ رَجُلٍ رُخَامٌ أَوْ كَذَّانٌ فَضَرَبَهٗ ﴿فَانْفَجَرَتْ﴾ اِنْشَقَّتْ وَسَالَتْ ﴿مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ﴾ سَبْطٍ مِنْهُمْ ﴿مَشْرَبَهُمْ﴾ مَوْضِعَ شُرْبِهِمْ فَلَا يُشْرِكُهُمْ فِيْهِ غَيْرُهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ.

৬০. আর স্মরণ করো যখন মূসা (আ.) আপন জাতির জন্যে পানি প্রার্থনা করলেন তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইলেন। যখন তারা তীহ ময়দানে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। এটি সে পাথর যে পূর্বে একবার তার কাপড় চোপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল। তা ছিল মস্তকাকৃতির হালকা, চতুষ্কোণ একটি সাদা বা মসৃণ পাথর। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাতে আঘাত করলেন। ফলে তা থেকে উপগোত্রসমূহের সংখ্যা অনুপাতে বারোটি ঝরনা ধারা প্রবাহিত হলো অর্থাৎ, তা ফেটে গেল এবং পানি বয়ে চলল। প্রতিটি লোক তাদের গোত্র নিজ নিজ পানশালা পানি পান করার নির্ধারিত স্থান চিনে নিল। এতে একদল অপরদলের সাথে শরিক ছিল না। আর তাদেরকে বললাম, আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক থেকে তোমরা পানাহার করো এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।

حَالٌ শব্দটি তার আমেল لَا تَعْثَوْا থেকে مُفْسِدِيْنَ مُؤَكِّدَةٌ হয়েছে। عَثِيَ ক্রিয়াটির মধ্যাক্ষর ث-তে যেরযোগে। এর অর্থ– অনর্থ সৃষ্টি করল।

٦١. ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ﴾ أَيْ نَوْعٍ ﴿وَاحِدٍ﴾ وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوٰى ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا﴾ شَيْئًا ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ﴾ لِلْبَيَانِ ﴿بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا﴾ حِنْطَتِهَا ﴿وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ﴾ لَهُمْ مُوْسٰى ﴿أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى﴾ أَخَسُّ ﴿بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ﴾

৬১. যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা, আমরা এক প্রকার খাবারে অর্থাৎ, একই প্রকারের খাদ্য মান্না ও সালওয়ায় কখনো তুষ্ট হব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো! তিনি যেন আমাদের জন্যে উৎপাদন করেন কিছু ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সবজি, কাঁকুর, গম, মসুর ও পেয়াজ। এখানে مِنْ শব্দটি بَيَان-এর জন্যে। তিনি হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি উত্তম উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিম্নতর নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে পরিবর্তন করতে চাও?

أَشْرَفُ أَتَأْخُذُوْنَهُ بَدَلَهُ وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوْا فَدَعَا اللهَ تَعَالٰى فَقَالَ تَعَالٰى ﴿اهْبِطُوْا﴾ انْزِلُوْا ﴿مِصْرًا﴾ مِنَ الْأَمْصَارِ ﴿فَإِنَّ لَكُمْ﴾ فِيْهِ ﴿مَا سَأَلْتُمْ﴾ مِنَ النَّبَاتِ ﴿وَضُرِبَتْ﴾ جُعِلَتْ ﴿عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ ﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾ أَيْ أَثَرُ الْفَقْرِ مِنَ السُّكُوْنِ وَالْخِزْيِ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لُزُوْمَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِهِ ﴿وَبَآءُوا﴾ رَجَعُوْا ﴿بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ط ذٰلِكَ﴾ أَيِ الضَّرْبُ وَالْغَضَبُ ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ﴿كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ﴾ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أَيْ ظُلْمًا ﴿ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ﴾ يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَدَّ فِي الْمَعَاصِيْ وَكَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيْدِ. لَهُ

অর্থাৎ, তার পরিবর্তে এটা গ্রহণ করতে চাও? প্রশ্নবোধক أ (হামযাটি) إِنْكَار অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা (তাদের দাবি থেকে ফিরে আসতে অসম্মতি জানাল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা নেমে যাও অবতরণ করো শহরসমূহের কোনো একটি শহরে। তোমরা যা চাও অর্থাৎ, শাক-সবজি তথায় তা আছে। আর জুড়ে দেওয়া হলো লাগিয়ে দেওয়া হলো তাদের উপর লাঞ্ছনা অবমাননা ও হীনতা এবং দরিদ্রতা। اَلْمَسْكَنَة শব্দটি سُكُوْن হতে নির্গত। অর্থাৎ, এগুলো তাদের উপর আপতিত থাকবে। মুদ্রার সাথে যেমন তার ছাপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি তারা সম্পদশালী হলেও এ অবস্থা সর্বদা তাদের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকবে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ সহকারে প্রস্থান করল ফিরল। এটা অর্থাৎ তাদের উপর এ ছাপ ও ক্রোধ এজন্যে যে, بِأَنَّهُمْ-এর ب বর্ণটি কারণবাচক তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত অস্বীকার করতে এবং নবীগণকে যেমন হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে অন্যায়ভাবে জুলুম করে হত্যা করতো। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পাপাচারের সীমা অতিক্রম করার দরুন তাদের এ পরিণতি। এ স্থানে ذٰلِكَ শব্দটি তাকীদের উদ্দেশ্যে পুনরুক্ত হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ: اِضْرِبْ بِعَصَاكَ. الْحَجَرَ. وَهُوَ الَّذِيْ فَرَّ بِثَوْبِهِ

আঘাতকৃত পাথর নির্ণয় : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, الْحَجَر শব্দটির আলিফ-লামটি নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক। এর দ্বারা নির্দিষ্ট একটি পাথর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় বর্ণিত পাথরটি। ঘটনাটি হলো, হযরত মূসা (আ.) নিজ স্বভাবগত ও শরয়ী লজ্জার কারণে গোসল ইত্যাদির সময়ে কারো সামনে উলঙ্গ হতেন না। এদিকে মানুষজন মনে করতো যে, তার একশিরা তথা 'অণ্ডকোষ ফুলে যাওয়া' রোগ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ ভুল ধারণাকে দূর করার জন্যে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, একবার হযরত মূসা (আ.) গোসল করার জন্যে কোনো প্রস্রবণে ঢুকেছেন এবং বস্ত্র খুলে কোনো সাধারণ পাথরের উপর কিংবা হযরত শোআইব (আ.) থেকে বরকত স্বরূপ যে পাথর তিনি পেয়েছিলেন তার উপর রেখেছেন। গোসল শেষ করে পাথর থেকে কাপড় নিতে গেলে তা বস্ত্র নিয়ে যেখানে এলাকাবাসীর কাচারীতে লোকজন অভ্যাস অনুযায়ী সমবেত হতো। সেদিকে ছোটা শুরু করল। হযরত মূসা (আ.)-ও পাথরের পেছনে বস্ত্রের জন্যে দৌড় দিলেন। এভাবে তিনি উলঙ্গ অবস্থায় সে সভাস্থলে পৌঁছে গেলেন, যেখানে লোক সমবেত ছিল। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে দেখে নিজেদের ভুল ধারণা বুঝতে পারল। তারপর মুসা (আ.)-এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, এ পাথরটিকে সংরক্ষণ করে রেখো। এ পাথরটি সাদা ও নরম ছিল। এক হাত পরিমাণ চতুর্ভুজ কিংবা এর চেয়ে কিছু কম। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, প্রতি কোণে তিন তিনটি উঁচু প্রান্ত যেগুলো থেকে ১২টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যেতো। এই তাফসীরটি সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র.) থেকে বর্ণিত।

অন্য একটি অভিমত হচ্ছে যে, এটি অনির্দিষ্ট পাথর ছিল। আল্লাহর কুদরতকে প্রকাশ করার জন্যে। এ অভিমতটি অধিক ন্যায়সঙ্গত।

[কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৪]

قَوْلُهُ : فَضَرَبَهُ : فَانْفَجَرَتْ

উহ্য মা'তূফ আলাইহি নির্ণয় : فَانْفَجَرَتْ-এর পূর্বে মুফাসসির (র.) فَضَرَبَهُ উল্লেখ করে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, فَانْفَجَرَتْ এর শুরুর فَاء টি الفاء الفَصِيْحَة; আর اِنْفَجَرَتْ বাক্যটি قُلْنَا-এর উপর আতফ হয়নি; বরং উহ্য فَضَرَبَهُ-এর উপর আতফ হয়েছে। কারণ, আল্লাহর আদেশের পর হযরত মূসা (আ.) পাথরে আঘাত করেছেন। ফলে পাথর থেকে ঝরনা উৎসারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, اَلْفَاءُ الْفَصِيْحَةُ সেই فاء-কে বলা হয়, যা পূর্ববর্তী উহ্য ইবারতের কথা বোঝায়।

قَوْلُهُ اِثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا- بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ

গোত্রের সংখ্যা অনুপাতে : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, তাদের গোত্র যেহেতু বারোটি ছিল, তাই পাথর থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ গোত্র সংখ্যার সমপরিমাণ, তাদের গোত্র সংখ্যা যদি আরো বেশি থাকত, তাহলে আরো বেশি প্রবাহিত হতো। আর তারা বারোটি গোত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান ছিল বারোজন।

قولُهُ : مَشْرَبَهُمْ – مَوْضَعَ شُرْب

مَشْرَبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : مشرب -এর ব্যাখ্যায় مَوْضَعَ شُرْب উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَشْرَب শব্দটি اسم ظرف; مصدر ميمي নয়। কেননা مصدر -এর সুরতে অর্থ শুদ্ধ হয় না।

قَوْلُهُ : مُفْسِدِيْنَ. حَالَ مُؤَكِّدَةٍ لِعَامِلِهَا

مُفْسِدِيْن শব্দটি হালের প্রকার নির্ণয় : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, مُفْسِدِيْنَ শব্দটি সাধারণ হাল নয়; বরং لَا تَعْثُوْا -এর حال مؤكدة হয়েছে। কেননা عثى ও مُفْسِدِيْن -এর অর্থ এক ও অভিন্ন।

قَوْلُه : لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ اَىْ نَوْعٍ مِنْهُ – وَاحِد

طعام واحد দ্বারা উদ্দেশ্য : طعام واحد -এর উপর এ আপত্তি হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলকে তীহ প্রান্তরে প্রদত্ত খাবার একটি ছিল না; বরং মান্না-সালওয়া নামীয় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাদ্য ছিল। মুফাসসির (র.) সে আপত্তিকে এই বলে দূর করেছেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ধরনের খাবার। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, طَعَامٌ وَاحِدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয় বস্তুকে মিশ্রিত করে তারা এক প্রকার খাবার তৈরি করে নিত।

قَوْلُه : يُخْرِجُ لَنَا – شَيْئًا

مِنْ -এর প্রকার বর্ণনা : মুফাসসির (র.) আয়াতাংশ يُخْرِجْ لَنَا এরপর شَيْئًا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِمَّا تُنْبِتُ -এর من টি تَبْعِيْضِيَّة (আংশিকতা জ্ঞাপক); بيانية (বর্ণনাবাচক) নয়। অর্থাৎ, কিছু ভূমিজাত দ্রব্য। সুতরাং مِمَا تُنْبِتُ ও مِن بَقْلِهَا উভয় ক্ষেত্রের من অর্থগতভাবে ভিন্ন। উভয় হরফে যর আতফ ব্যতীত একই ফে'লের সঙ্গে মুতা'আল্লিক হওয়াতে সমস্যা নেই।

قَوْلُهُ : فُوْمِهَا – حِنطَتِهَا

فُوْم-এর অর্থ : মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা فُوْم-এর বর্ণনা করেছেন যে, فُوْم-এর অর্থ হলো গম। কতিপয় মুফাসসির فُوم-এর এ অর্থই বলেছেন। তবে সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো, فُوْم শব্দটির অর্থ হলো রসুন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে আলোচ্য ক্ষেত্রে فُوْم-এর পরিবর্তে ثُوْم রয়েছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন, ডাল ও পিঁয়াজের সাথে গমের তুলনায় রসুনের উল্লেখটাই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা ছাড়া তাওরাতে এ সম্পর্কিত বর্ণনাতেও রসুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِصْرا – مِنَ الْاَمْصَارِ

مِصْر দ্বারা উদ্দেশ্য : مِصْر দ্বারা এখানে কোনো নির্দিষ্ট শহরকে বোঝানো হয়নি। এমনকি প্রসিদ্ধ মিসর শহরকেও বোঝানো হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হলো শাম দেশের যে কোনো একটি এলাকায় চলে যাও। مِصْر -এর تَنْوِين -ও এদিকেই ইঙ্গিত করে। মুফাসসির (র.) مِنَ الْاَمْصَار বলে সেটিই বুঝিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : اَلْمَسْكَنَةُ أَىْ أَثَرُ الْفَقْرِ

উহ্য মুযাফ উল্লেখ : মুফাসসির (র.) اَلْمَسْكَنَةُ-এর তাফসীর করতে أثر শব্দটি বৃদ্ধি করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ দারিদ্র উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হলো দারিদ্রের ছাপ। কারণ অনেক ইহুদি বহু ধনসম্পদের মালিক। আর আয়াতে তাদের বাহ্যিক ধনসম্পদ উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্তরে যে দারিদ্রের ছাপ রয়েছে তা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : لُزُوْمِ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِهٖ

ইবারতের বিন্যাস সংশোধন : এ ইবারতটুকু مَقْلُوْبٌ তথা উল্টো হয়েছে। এটি এভাবে হওয়া উচিত ছিল- لُزُوْمُ أَثَرِ السِّكَّةِ لِلدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ আর سِكَّة অর্থ-এমন অঙ্কিত লোহা যা দ্বারা মুদ্রায় ছাপ দেওয়া হয়।

قَوْلُهٗ : وَكَرَّرَه لِلتَّاكِيْدِ

পুনরুক্তির কারণ বর্ণনা : ذٰلِكَ ইসমুল ইশারাকে তাকীদের জন্যে দ্বিতীয়বার নেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا-এর ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا ..... الخ ছিল। উভয় ذٰلِكَ-এর مرجع অভিন্ন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اِسْتَسْقٰى : সীগাহ وَاحِدْ مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব استفعال মাসদার اَلْاِسْتِسْقَاءُ মূলবর্ণ (س-ق-ي) জিনস ناقص يائي অর্থ- সে পানি প্রার্থনা করল, পানির জন্যে দোয়া করল।

اِضْرِبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّرْبُ মূলবর্ণ (ض-ر-ب) জিনস صحيح অর্থ- আপনি আঘাত করুন। ضرب -এর মূল অর্থ হলো- إِيْقَاعُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ (একটি বস্তুর উপর অন্য বস্তু ফেলে দেওয়া)। যেহেতু এর ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তাই শব্দটি বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যথা-

১. ضَرْبُ الْمِثَالِ (উদাহরণ দিল) ضَرْبُ الْمِثَالِ অর্থ হলো ذِكْرُ شَيْءٍ أَثَرُه يَظْهَرُ فِيْ غَيْرِه যেহেতু مِثْل -এর প্রভাব مُمَثَّلٌ لَه -এর উপর পতিত হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

২. ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ (ভ্রমণ করল) চলাফেরা মূলত ভূমির উপর দিয়ে হয় বিধায় এ অর্থটি করা হয়। এ অর্থেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

৩. ضَرَبَ طَرِيْقًا (রাস্তা বানাল) যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ

৪. ضَرَبَ الشَّيْءَ بِه (কোনো কিছু দ্বারা কোনো বস্তুতে আঘাত করল) ৬০ নং আয়াতে اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ দ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য। এটিই এর স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ অর্থ। এর অর্থ- হাঁটাচলা করা ঐ সময় ধর্তব্য হয় যখন তার পরে فِيْ আসে। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খান পাহাড়ে চলে যাওয়ার অর্থ করেছেন। এ অনুবাদ যেভাবে শব্দ ও অভিধানের পরিপন্থি তদ্রূপ ইতিহাসেরও পরিপন্থি।

৫. ضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (অপমানে নিমজ্জিত করা) যেমন وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

مُرَبَّعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার اَلتَّرْبِيْعُ মূলবর্ণ (ر-ب-ع) জিনস صحيح অর্থ- চার কোণবিশিষ্ট, বর্গাকৃতি। চতুর্দিকে এক গজ দীর্ঘ।

رُخَامٌ : অর্থ- শ্বেত মর্মর, মার্বেল পাথর।

كَذَّانٌ : ك বর্ণে যবর ও ذ বর্ণে তাশদীদ ও যবরযোগে। অর্থ- নরম পাথর।

لَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهي حاضر معروف বাব نصر - ضرب - سمع মাসদার العثى (س) - اَلْعَثْوُ(ن) মূলবর্ণ (ن) (ع-ث-و) অথবা (ض) (ع-ث-ى) জিনস ناقص (س، ض) ناقص واوي (ن) يائي অর্থ- তোমরা বিশৃঙ্খলা করো না।

بَقْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে بُقُوْلٌ ، اِبْقَالٌ ; কাণ্ডহীন উদ্ভিদ।

قِثَّاءُ : বহুবচন, একবচনে قثائة অর্থ– কাকড়ি, শসা।

اَلْمَسْكَنَةُ : এটি اَلسُّكُوْنُ থেকে নির্গত। اَلسُّكُوْنُ অর্থ হলো শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া। এ থেকেই مفعيل ওযনে مِسْكِيْن শব্দটি নির্গত। কেননা মিসকিনের চালচলনে চঞ্চলতা থাকে না।

سِكَّة : অর্থ– লোহার ছাঁচ, যা দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার উপর ছাপ দেওয়া হয়। বহুবচনে سِكَك যেমন سِدْرة-এর বহুবচন سِدَرٌ আসে।

بَاءُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضي مطلق معروف মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب - و - أ) জিনস مركب অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তন করেছে। যেমন বলা হয়- بَاءَ المَبَاتِ اى رَجَعَ اِلَى المَنْزِلِ ; এছাড়া এর আরো বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন ১. اِحْتَمَلُوْه ২. اِسْتَحَقُّوْهُ ৩. لَاَزِمُوْهُ ৪. اَقَرُّوْا بِهِ ;

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَولُهٗ : وَاذ اسْتَسْقى مُوسى ..... فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

وَاذ اسْتَسْقى مُوْسى জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মা'তুফ আলাইহ فاء তাকিবিয়্যাহ قُلْنَا ফে'ল ও ফায়েল হয়ে قوء ; اضْرِبْ الخ এটা হচ্ছে مَقُوْلُ ; اِنْفَجَرَتْ ফে'ল اِثْنَتَا عَشَرَ মুমাইয়াজ এবং عَيْنًا হলো تمييز। তামঈয ও مميز মিলে اِنْفَجَرَتْ -এর ফায়েল হয়েছে। مَشْرَبَهُمْ ... قد علم বাক্যটি مستأنفة ; তারকীবে এর কোনো স্থান নেই। مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ অংশটুকু পূর্ববর্তী كلوا অথবা اشرَبُوْا -এর যে কোনোটির মুতা'আল্লিক হতে পারে। مُفْسِدِيْنَ হালে মুয়াক্কাদাহ হয়েছে لتعثوا থেকে।

قَوْلُهٗ : وَاِذْ قُلْتُم يٰمُوْسى .... وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

قُلْتُمْ ফে'ল ও ফায়েল। يَا مُوْسى الخ মাকুল মিলে وَاِذِ اسْتَسْقى-এর উপর আতফ। رَبَّكَ মাফ'উল, يخرج এরপর তার মাফ'উল মাহযূফ। তা হলো شَيْئًا ; مما এর من টি تبعيضية ; ما মাউসূলাহ تُنْبِتُ الخ জুমলা সেলাহ। مِنْ بَقْلِهَا-এর من-টি বয়ানিয়া যা তার মাজরূরসহ يخرج -এর উহ্য মাফ'উলের উহ্য হালের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে - مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ كَائِنًا مِنْ بَقْلِهَا ; এ সব মিলে উহ্য شَيْئًا -এর বয়ান হয়েছে। يخرج জওয়াবে امر হয়েছে اُدْعُ -এর, তাই মাজযূম হয়েছে اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الخ পুরো জুমলা مقول হয়েছে قَالَ ফে'লের। اِهْبِطُوْا জুমলায়ে ইনশাইয়া, لكم হলো ان-এর খবর এবং مَا سَأَلْتُمْ হলো ان -এর ইসম ; مستأنفة জুমলায়ে ضربت ; غضب মাউসূফ, من الله সিফাত بغضب من الله অংশটি بَاءُوْا -এর فاعل থেকে উহ্য حال-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। মূলরূপ হলো ; بَاءُوْا متلبسين بغضب الله يَقْتُلُوْنَ . بِغَيْرِ الْحَقِّ এর যমীর থেকে হাল হওয়ার কারণে মহল হিসেবে منصوب হয়েছে। মূল ইবারত হলো- يَقْتُلُوْنَهُمْ . مُبْطِلِيْنَ ; ذٰلِكَ মুবতাদা, بِمَا عَصَوْا খবর।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُه تَعَالى : مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّئِهَا

قثئها শব্দের লিখনশৈলী: ৬১নং আয়াতে উল্লিখিত قِثَّئِهَا শব্দে দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় قِثَّاْئِهَا শব্দটির ث বর্ণে খাড়া যবরযোগে লিখিত হয়েছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ث বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে قِثَّائِهَا লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالى : وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

بَاءُوْا শব্দের লিখনশৈলী: ৬১নং আয়াতে উল্লিখিত بَاءُوْا শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির শেষে বহুবচনের আলিফসহ بَاءُوْا লিখা হয়েছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির শেষাংশে আলিফবিহীন بَاءُوْ লিখা হয়।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার পার্থক্য

قَوْلُهٗ : اَشْرَفُ اىْ تَاْخُذُوْنَه

تأخذونه শব্দের ইমলা: ৬১ নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত تَأْخُذُوْنَه শব্দের দুটি ইমলা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির শুরুতে প্রশ্নবোধক হামযাবিহীন লিখিত আছে।

খ. সহীহ ইমলা হবে শব্দটির শুরু অংশে প্রশ্নবোধক হামযাসহ; কারণ এটি অর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : واذ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আসমানি খাদ্য তথা মান্না ও সালওয়ার আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে গায়বি পানি ও গায়বি ঝরনাসমূহের আলোচনা হচ্ছে, যা হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ খাবারের পরে পানির প্রয়োজন হয়। যেমনিভাবে অলৌকিকভাবে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, অনুরূপভাবে অলৌকিকভাবে পানিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরত এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত ও রেসালাত প্রকাশ পেয়ে অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয় এবং গায়বি পানাহারের ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তরের অবস্থা সঠিক হয়ে যায়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى..... وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

পানির জন্যে প্রার্থনা: বনী ইসরাঈল তীহপ্রান্তরে পিপাসার্ত হয়ে পড়লে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে পানির ব্যবস্থা করার আবেদন জানায়। তখন হযরত মূসা (আ.) আপন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা পানির ব্যবস্থা করে দেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের ফলে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো।

আয়াত দ্বারা হানাফীগণের দলিল বর্ণনা: وَاِذِ اسْتَسْقٰى..... আয়াতটি দ্বারা কোনো কোনো আলেম হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন। কারণ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, ইস্তেস্কা (পানির জন্যে প্রার্থনা) এর মূল হলো দোয়া। হযরত মূসা (আ)-এর শরিয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন ইমাম আযম আবূ হানিফা (র) বলেন, ইস্তেস্কার মূল বিষয় হলো পানির জন্যে দোয়া করা। এ দোয়া কোনো কোনো সময়ে ইস্তেস্কার নামাজের আগেও করা হয়েছে। যেমন-ইস্তেস্কার নামাজের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর ঈদগাহে তশরিফ নেওয়া এবং সেখানে নামাজ খুতবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনো নামাজ বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন- বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমার খুতবায় পানির জন্যে দোয়া করেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি: হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে একটি লাঠি নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যান্য নবীগণের কাছে তা পৌঁছে যায়। এক পর্যায়ে তা হযরত শোআইব (আ.)-এর হস্তগত হয়। তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে তা প্রদান করেন। اِضْرِبْ بِعَصَاكَ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সে লাঠিটি উদ্দেশ্য।

[হাশিয়াতুল জামাল:খণ্ড ১,পৃষ্ঠা ৮৫]

হযরত মূসা (আ.)-এর আঘাতকৃত পাথরের সংশ্লিষ্ট আলোচনা: হতে পারে اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ দ্বারা বিশেষ কোনো পাথর বোঝানো হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) তা তাঁর থলের ভেতর রাখতেন। পানির প্রয়োজন হলে তাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন। তখন তা থেকে পানি নির্গত হতো। প্রয়োজন শেষে ফের আঘাত করলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত। এ সুরতে الف لام টি হবে আলিফ লামে আহদী। আবার নির্দিষ্ট কোনো পাথর না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আবূ ওয়াহহাব বলেন, এটি নির্দিষ্ট কোনো পাথর ছিল না; বরং হযরত মূসা (আ.) যে কোনো পাথরে আঘাত করলেই তা থেকে ঝারনা সৃষ্টি হতো। এ সুরতে الف لام – টি আলিফ লামে জিনসী হবে। আর এমনটি হওয়াই মু'জিযার জন্যে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যে কোনো শহরে প্রবেশের নির্দেশ: আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে যখন তাদের অবাধ্যতার কারণে তীহ উপত্যকায় ঘুরপাক খাওয়ার এক পর্যায়ে অতীষ্ঠ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া করেছিল, তখন তিনি তাদের দোয়া কবুল করত যেকোনো শহরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى .... ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

ইহুদিদের লাঞ্ছনার বিবরণ : ইহুদিদের সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা হলো, তারা সর্বদা মুসলিমজাতি কিংবা খ্রিষ্টানদের অধীনস্থ প্রজা হিসেবে জীবনযাপন করছে। কারো কাছে ধনৈশ্বর্য থাকলেও রাজক্ষমতা থেকে চিরদিনের জন্যে তারা বঞ্চিত, অথচ রাজক্ষমতাটাই ছিল সম্মানের বিষয়। আর দারিদ্র এভাবে যে, কার্পণ্যের কারণে তাদেরকে অভাবীদের চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে হয়। আর এটাও তো অনস্বীকার্য যে, ঐশ্বর্য থাকে অন্তরে, ধনে নয়। তাই বিত্তবান হয়েও তারা ঐশ্বর্যহীন। আর যে সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের দান করেছেন, তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন তারা তার গযব ও ক্রোধের পাত্রে পরিণিত হয়েছে।

[তাফসীরে উসমানী: পৃষ্ঠা ১১]

ইহুদিদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার মর্মার্থ : উল্লিখিত আয়াতে ইহুদিদের শাস্তি, চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা- গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজব ও রোষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের লাঞ্ছনার মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীর (র.) বলেন, "তারা যত ধন সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন , বিশ্ব - সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবে।"

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহহাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ হলো, ইহুদিরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মার্থ সূরা আলে ইমরানের এক আয়াতে রয়েছে- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্যে লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। 'আল্লাহ প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যমের' অর্থ হলো যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন- অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক, যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানব প্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে জিজিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কুরআনের আয়াতে مِنَ النَّاسِ বলা হয়েছে; مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে ইহুদিরা সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সারকথা , ইহুদিরা দুঅবস্থা ব্যতীত সদা সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে-

১. আল্লাহপ্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে; যার ফলে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রসূতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে।

২. শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও হতে পারে।

মোদ্দাকথা, ইহুদিদের লাঞ্ছনা ও অসহায়তার মধ্যে এটাও একটি যে, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি অন্যায়ভাবে সমরাস্ত্রের বলে কোথাও জমিনের কোনো অংশ শুধু কাগজে-কলমে দখল করে নিয়েও থাকে, সেটাও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্যে ও উস্কানিতে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। সেটাকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাষ্ট্র বলতে পারে না। তা সত্ত্বেও জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে অপদস্থ অবস্থায় থাকা এবং ইজ্জত ও সম্মানের ক্ষেত্রে স্থান না পাওয়া এসবই লাঞ্ছনার মূল বিষয়। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণীকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেনি।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, ইসরাঈলে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর : বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা ইহুদিদের বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালোভাবে জানেন যে, এ রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের নয়; বরং তা আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি মাত্র। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান শক্তি ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা আমেরিকা ও ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটি অনুগত-আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

আল্লাহর গজবের ব্যাখ্যা : আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদিদের উপর আল্লাহর গজব রয়েছে। এর প্রমাণ হলো, প্রাচীনকালে বুখতে নসর ছাড়াও অনতিদূরকালে হিটলারের ন্যায় চেঙ্গিসী দাসত্ব ও গণহত্যা সম্পর্কে যে কোনো ঐতিহাসিকই অবহিত আছেন। আর আখেরাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

بِغَيْرِ الْحَقِّ বলার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ অংশটুকু জুড়ে দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এসব কাজ তাদের দৃষ্টিতেও অন্যায়ই ছিল। অর্থাৎ এ কাজটি নিতান্ত অন্যায় বলে নিজেরাও উপলব্ধি করতো; কিন্তু হঠকারিতা, প্রতিহিংসা, পার্থিব মোহ তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল। সামনের অংশে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

স্থায়ী লাঞ্ছনার একটি কারণ নবী হত্যা : ইসরাঈলরা কোনো এক সকালে তিন শত নবীকে হত্যা করেছিল এবং বিকেলে আনন্দ-উল্লাসের সাথে তরি-তরকারির হাট বাজার করেছিল। আল্লাহ তাআলা وَيَقْتُلُوْنَ আয়াত দ্বারা তাদের এহেন জঘন্যতম কাজের বর্ণনা দিয়ে তাদের চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদিরা হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইহুদিরা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল। এ ছাড়া বনী ইসরাঈল একদিনে ৪০ জন নবীকে হত্যা করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী ও অভিশপ্ত জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। [তাফসীরে হক্কানী ও তাফসীরে কাশশাফ]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُه تَعَالى : مِنْ رِزْقِ اللّٰه

اَللّٰه শব্দের দিকে ইযাফত : আলোচ্য অংশে رِزْق শব্দটিকে اللّٰه -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপনের জন্যে। পাশাপাশি এটা এ কথাও বোঝাচ্ছে যে, এ রিজিক ছিল সরাসরি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ; ফলে তা অর্জনে শ্রম ব্যয় করতে হতো না।

قَوْلُهٗ تَعَالى: مِنْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ

মাজাযে আকলী : সত্যিকারের ফসল উৎপন্নকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু মাটি যেহেতু ফসল উৎপাদনের একটি سَبَب (মাধ্যম), তাই আয়াতে اِنْبَات -এর নিসবত اللّٰه -এর দিকে না করে রূপকার্থে الأَرْض -এর দিকে করা হয়েছে। এটাকে মাজাযে আকলী বলে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

ইস্তিয়ারায়ে মাকানিয়্যাহ : আলোচ্য অংশটিতে ইহুদিদেরকে হীনতা ও লাঞ্ছনার বেষ্টন করাকে তাঁবুর বেষ্টনের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁবু খাটানোর পর তা যেমন তাঁবুবাসীকে তাঁর চারদিক থেকে ঘিরে, রাখে তেমনিভাবে লাঞ্ছনা ইহুদিদেরকে সর্বদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

أ. ترجم الأية الكريمة ثم فسرها على نهج المصنف العلام.

ب. قوله" اهبطوا " الخطاب لمن ؟ ومتى قال ذلك، ثم اوضح الجواب عما يرد على ظاهر قوله" وضربت عليهم الذلة والمسكنة" فاننا نرى أن اليهود احسن الناس احوالا واعلاهم منزلة وراحة وعيش تنعم.

ج. كم نبيا قتلوهم اذكر اسماء بعضهم ثم اجب عما يشكل قوله" بغير حق" بأن قتل الانبياء لا يكون الا بغير حق فما فائدة بذكره.

رُكُوْع ٨ : রুকূ' ৮

جَزَاءُ كُفْرِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقِصَّةُ أَصْحَابِ السَّبْتِ

বনী ইসরাঈলের কুফরীর শাস্তি এবং আসহাবুস সাবতের ঘটনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ যে সকল ইহুদি ও খ্রিষ্টান ঈমান আনবে, তাদের শুভ পরিণাম
- ❑ বনী ইসরাঈলের উপর পাহাড় তুলে ধরা
- ❑ আসহাবুস সাবতের সীমালঙ্ঘন ও তার শাস্তি
- ❑ বনী ইসরাঈলের গরু জবাইয়ের ঘটনা
- ❑ বনী ইসরাঈলের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর কথোপকথন
- ❑ জবাইয়ের ঘটনায় বনী ইসরাঈলের গরুর বৈশিষ্ট্যাবলি

٦٢. ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ ﴿وَالَّذِيْنَ هَادُوْا﴾ هُمُ الْيَهُوْدُ ﴿وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ﴾ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ أَوِ النَّصَارٰى ﴿مَنْ اٰمَنَ﴾ مِنْهُمْ ﴿بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بِشَرِيْعَتِهِ ﴿فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ﴾ أَيْ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ رُوْعِيَ فِيْ ضَمِيْرِ "اٰمَنَ" وَ "عَمِلَ" لَفْظُ مَنْ وَفِيْمَا بَعْدَهُ مَعْنَاهَا.

৬২. নিশ্চয় যারা পূর্ববর্তী নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও যারা ইহুদি হয়েছে অর্থাৎ ইহুদিগণ এবং খ্রিষ্টান ও সাবিয়ীগণ ইহুদি অথবা খ্রিষ্টানদের একটি সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে যারাই আমাদের নবীর যুগে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করেছে ও তার শরিয়ত মতো সৎকাজ করেছে তাদের জন্যে প্রতিদান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের কর্মের ছওয়াব রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

اٰمَنَ ও عمل ফে'লদ্বয়ের মাঝে বিদ্যমান যমীরে من-এর শব্দগত দিক এবং পরবর্তী যমীরগুলোতে তার অর্থগত দিক বিবেচিত হয়েছে।

٦٣. ﴿وَ﴾ اُذْكُرْ ﴿إِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ﴾ عَهْدَكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ ﴿وَ﴾ قَدْ ﴿رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ﴾ الْجَبَلَ اقْتَلَعْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَيْكُمْ لَمَّا أَبَيْتُمْ قَبُوْلَهَا وَقُلْنَا ﴿خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ ﴿وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ﴾ بِالْعَمَلِ بِهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ النَّارَ أَوِ الْمَعَاصِيَ.

৬৩. আর তোমরা স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম অর্থাৎ তাওরাত অনুসারে আমল করার অঙ্গীকার আর তুর পাহাড় তোমাদের উপর তুলে ধরছিলাম অর্থাৎ যখন তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তখন উক্ত পাহাড়টি সমূলে উঠিয়ে তোমাদের উপর ধরেছিলাম। এবং বলেছিলাম শক্তভাবে গ্রহণ করো যা আমি তোমাদের দিয়েছি আমলে রূপায়িত করার মাধ্যমে এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ করো যাতে তোমরা জাহান্নামের অগ্নি বা পাপকার্য হতে রক্ষা পেতে পার।

٦٤. ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أَعْرَضْتُمْ ﴿مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ الْمِيْثَاقِ عَنِ الطَّاعَةِ ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ لَكُمْ بِالتَّوْبَةِ أَوْ تَأْخِيْرِ الْعَذَابِ ﴿لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ الْهَالِكِيْنَ.

৬৪. অতঃপর এর আনুগত্যের এ অঙ্গীকারের পরও তোমরা মুখ ফিরালে তা উপেক্ষা করলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া যদি না থাকত, তোমাদের তওবা বা শাস্তি পিছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُه : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا

فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا দ্বারা উদ্দেশ্য : প্রথমে বলা হয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا; এরপর আবার বলা হচ্ছে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তবে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর উদ্দেশ্য হলো সে সকল লোক, যারা فترة-এর যুগে ঈমান এনেছে। যেমন ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, বোহায়রা রাহেব, সালমান ফারসি ও হাবীব নাজ্জার প্রমুখ। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাসূল ﷺ-এর যুগও পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ রাসূল ﷺ নবী হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরপর আল্লামা সুয়ূতী (র.) بِالْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি উদ্দেশ্য যারা রাসূল ﷺ-এর যুগে তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। এ জন্যেই আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর ব্যাখ্যায় زَمَنَ نَبِيِّنَا উল্লেখ করেছেন। এ অংশ দুটির এ তাফসীর করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, একই বক্তব্যে اٰمَنُوْا শব্দটি দু'বার ব্যবহার হলেও উভয়টির مِصْدَاق ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাকরার হওয়ার আপত্তি আর থাকে না। শব্দগত দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। [হাশিয়াতুল জামাল]

قَوْلُهٗ رُوْعِيَ فِيْ ضَمِيْرِ اٰمَنْ .....الخ

যমীরের বচনগত পার্থক্যের কারণ : مَنْ اٰمَنَ এবং مَنْ عَمِلَ উভয় জায়গায় اٰمَنَ ও عَمِلَ একবচনের যমীরটির مرجع হলো مَنْ আর একইভাবে فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ এর هم যমীরদ্বয়ের مرجع -ও হলো من ;

মুফাসসির (র.) رُوْعِيَ فِيْ ضَمِيْرِ مَنْ اٰمَنَ-এ ইবারত দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, একবচনের যমীরগুলোর ক্ষেত্রে مَنْ-এর শব্দগত দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং বহুবচনের যমীরগুলোর ক্ষেত্রে مَنْ-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্যও রাখা হয়েছে। কারণ আলোচ্য আয়াতে مَن শব্দের দিক দিয়ে একবচন এবং অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন।

قَوْلُهٗ : مِيْثَاقَكُمْ عَهْدَكُمْ بِالْعَمَلِ

অঙ্গীকারের ব্যাখ্যা : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, মুখে কেবল যিকির ও আলোচনা করলেই তা যথেষ্ট হবে না; বরং আসল কাজ হলো আমল করা। আল্লাহ তা'আলা নিয়ামতসমূহ গণনা করার উদ্দেশ্যে দেননি; বরং নিয়ামত ভোগ করে নেক আমল করবে এটাই নিয়ামত প্রদানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ

واو-এর তারকীবগত অবস্থান : এখানে رفعنا-এর পূর্বে قد শব্দটি উহ্য ধরে মুফাসসির এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে واو-টি حالية হয়েছে, عاطفة নয়। অতএব, বাক্যটি পূর্ববর্তী اَخَذْنَاهُمْ এর حال হয়েছে। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট معطوف عليه এবং معطوف -এর মাঝে ترتيب জরুরি। কিন্তু পাহাড় তোলার ঘটনাটি আগে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ঘটনা পরে ঘটেছে।

قَوْلُهٗ : تَتَّقُوْنَ النَّارَ اَوِ الْمَعَاصِيَ

تَتَّقُوْنَ -এর উহ্য মাফ'উল নির্ণয় : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে تَتَّقُوْنَ -এর মাফ'উল উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلنَّارَ অথবা اَلْمَعَاصِيْ;

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب اثبات فعل ماضي مطلق معروف বহছ نصر মাসদার اَلْهُوْدُ মূলবর্ণ (ه. و. د) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা ইহুদি মতবাদ বা ধর্ম গ্রহণ করল, তওবা করল, প্রত্যাবর্তন করল। যেমন- اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ

اَلْيَهُوْدُ : শব্দটি আরবি হলে অর্থ হবে- تَابَ তথা তওবা করল কিংবা رجع তথা প্রত্যাবর্তন করল। যেহেতু ইহুদিরা নিজের প্রাণনাশের মাধ্যমে বাছুর পূজা থেকে তওবা কিংবা প্রাত্যাবর্তন করেছিল, তাই তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। আর শব্দটি অনারবি হলে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছেলে يَهُوْذَا থেকে আরবি করা হয়েছে। আরবি বানাতে গিয়ে ذ কে د দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

اَلصَّابِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহুছ اسم فاعل বাব فتح ও كرم মাসদার اَلصَّبُوْءُ মূলবর্ণ (ص.ب.ء) জিনস مهموز اللام অর্থ– ধর্মান্তরিতগণ, সাবেয়ীগণ। এক জিনিসকে ছেড়ে অন্য জিনিস গ্রহণ করা। শব্দটির একবচন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর বলেন, এর একবচন হলো صابئٌ আর নাফে (র.) বলেন, এর একবচন হলো صابٍ অর্থাৎ তিনি صَبَوْا মাসদার (আকৃষ্ট হওয়া) হতে নিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ সুতরাং আভিধানিকভাবে সাবি হলো যারা এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। ইহুদি ও নাসারা ধর্ম থেকে বের হয়ে নক্ষত্র পূজা করার কারণে তাদেরকে صابية বলা হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُه تَعَالٰى: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.....وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اٰمَنُوْا। مَنْ الَّذِيْنَ انَّ মাউসূল সেলাহ মিলে اِنَّ-এর ইসম; من শর্তিয়া মুবতাদা بِاللّٰهِ اٰمَنَ খবর। فَلَهُمْ-এর فاء হলো জাযাইয়্যাহ لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম أجرهم عند ربهم হলো মুবতাদা মুয়াখখার। মুবতাদা মুয়াখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে اِنَّ-এর খবর।

قَوْلُه تَعَالٰى:وَاِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

إِذْ أَخَذْنَا অংশটুকু উহ্য اذكر-এর মাফ'উল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। وَرَفَعْنَا আতফ হয়েছে أَخَذْنَا-এর উপর فوقكم হলো رفعنا-এর যরফ এবং الطور হলো তার মাফ'উল। خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُمْ.... الخ অংশটুকু উহ্য قلنا -এর مقولة হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। আর উহ্য قُلْنَا-টি أخذنا-এর ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। মূলরূপ হলো– وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ، قَائِلِيْنَ خُذُوْا বাক্যটি আতফ হয়েছে خذوا-এর উপর।

قَوْلُه تَعَالٰى ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ..... لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

ثم এখানে বিলম্বের অর্থ প্রকাশক حرف العطف; এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তারা প্রথমে আদেশ মেনেছিল। পরবর্তীতে তারা বিমুখ হয়েছে। مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অংশটুকু মুতা'আল্লিক হয়েছে تَوَلَّيْتُمْ-এর সাথে, فَلَوْلَا-এর فاء টি عَاطِفَة; لَوْلَا শর্তের অর্থ ধারণকারী অংশটুকু মুবতাদা এবং পরবর্তী عَلَيْكُمْ অংশটুকু فضل -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে, এর খবর উহ্য রয়েছে, তাহলো مَوْجُوْدَةٌ আর رَحْمَتُهُ আতফ হয়েছে فضل-এর উপর। لَكُنْتُمْ-এর লামটি لَوْلَا উত্তরের لام; كُنْتُمْ হলো ফে'লে নাকেস ও যমীর হলো তার ইসম। مِنَ الْخٰسِرِيْنَ অংশটুকু كُنْتُمْ -এর উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بين الآياتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُه تَعَالٰى: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا..... وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

পূর্বের আয়াতে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও অন্যায় কর্মসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। যা দেখে মনে হতে পারে যে, যদি তারা ক্ষমা চেয়ে ঈমানও আনতে চায় তাহলে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা দূর করার জন্যে এখানে একটি সূক্ষ্মনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি চাই সে মুসলমান হোক, নাসারা হোক, সে ইহুদি কিংবা সাবিয়ী হোক যদি সে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমান আনে, দীনের আবশ্যকীয় বিষয়ে বিশ্বাস রাখে এবং শরিয়ত মোতাবেক নেক আমল করে, তাহলে সে সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। [জামালাইন : খণ্ড ১. প্রষ্ঠা ১৩৫]

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযুল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত সালমান ফারসী (রা.) স্বজাতির নাম উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তারা জাহান্নামি। এ কথা শুনে হযরত সালমান (রা.) বলেন, আমার চারদিক তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখন তাঁর সান্ত্বনাস্বরূপ এ আয়াত নাজিল হয়। [ইবনে জারির: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৬]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُه تَعَالٰى: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আয়াতের সারমর্ম : ছওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। ছওয়াবের অধিকারী হওয়ার জন্যে শর্ত হলো আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান আনা এবং সৎকর্ম করা। এটা বলার কারণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল এ আত্মগরিমায় লিপ্ত ছিল যে, আমরা নবীগণের বংশধর, আমরা সর্বোতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট উৎকৃষ্টতম। [তাফসীরে উসমানী: ১৩]

اَلَّذِيْنَ هَادُوْا বলার উদ্দেশ্য : পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। এ কারণে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে 'বনী ইসরাঈল' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে মূলত ইহুদি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আর ইহুদি ধর্মবিশ্বাস অবলম্বনকারী বনী ইসরাঈলের লোকও হতে পারে আবার অন্য গোত্রের লোকও হতে পারে। যেমন ইহুদিদের সংস্পর্শে এসে অনেক আরব ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এই মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে এখানে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান হতে হবে সব ধরনের শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার উপর শুধু ঈমান তো কোনো না কোনো রকমে প্রায় সব মানুষেরই আছে। ঈমানের আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে প্রধানতম হলো, রাসূলের প্রতি ঈমান রাখা। কারণ রাসূলই আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দাদের সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করছেন এবং সোজা পথ দেখিয়েছেন। একইভাবে পরকালের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে পরকাল সম্পর্কিত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা। একে অপরের মধ্যে লীন হওয়া এবং বারবার জন্ম নেওয়ার মতো ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস যা অন্যান্য ধর্মে রয়েছে, পরকালের প্রতি এমন ঈমান আনার ধারণা সঠিক নয়। [তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

তাওরাতের বিধান স্বীকার করতে বাধ্য করা : তাওরাত নাজিল হওয়ার পর বনী ইসরাঈল এর সত্যায়ন ও আস্থা লাভের উদ্দেশ্যে ৭০ নেতাকে বাছাই করে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা কুদরতি বিভিন্ন আশ্চর্যময় বস্তু স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও জাতির সামনে এসে ভুলমিশ্রিত বক্তব্য দিয়ে বলে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যদি তোমাদের আমল করা সহজভাবে সম্ভব হয় তবে করো। নতুবা আমল না করলেও চলবে। তাই আমল থেকে পরিত্রাণের জন্যে এবার তারা এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে যে, আমাদের দ্বারা সে হুকুম মোতাবেক আমল করা সম্ভব নয়। এ কারণে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে সাবধান করেছেন যে, এ মুহূর্তে বিধানকে শক্তভাবে ধরো এবং সে অনুযায়ী আমল করো। নতুবা এরপর তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

এ ঘটনায় প্রশ্ন হতে পারে, মাথার উপর পাহাড় উঠিয়ে তাওরাত স্বীকার করিয়ে নেওয়া তো স্পষ্ট জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া ও জবরদস্তি করার নামান্তর, যা কুরআনের আয়াত لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা বিধান আরোপের ভিত্তি স্বাধীন ইচ্ছার উপর আর জবরদস্তি তো সেই ইচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে এর উত্তর হলো, এটি মোটেই জবরদস্তিমূলক দীন কবুল করানোর জন্যে নয়। বনী ইসরাঈল তো দীন পূর্বেই কবুল করে নিয়েছে। যদ্দরুন তারা বারংবার হযরত মূসা (আ.)-কে তাগাদা দিয়ে আসছিল যে, আমাদেরকে বিধান সংবলিত কোনো কিতাব এনে দাও! আমরা তার অনুসরণ করব। তারা এর পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন তাওরাত দেওয়া হলো, তখন তাদের সে প্রতিশ্রুতির কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে তা ভঙ্গ করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। তাদের সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে ফেরানোই ছিল পাহাড় চাপানোর মূল উদ্দেশ্য, দীন কবুল করানো নয়। [তাফসীরে উসমানি : পৃষ্ঠা ১৩]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوا الخ

আয়াতের সারমর্ম : ছওয়াব ও প্রতিদান বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কেবল বিশ্বাস ও সৎকর্ম শর্ত। যার মধ্যে এ শর্ত পাওয়া যাবে, সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। এটা বলার কারণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল এ আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত ছিল যে, আমরা নবীগণের বংশধর, আমরা সর্বোতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উৎকৃষ্টতম। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা. ১৩]

বনী ইসরাঈল ও ইহুদির মাঝে পার্থক্য : এ যাবৎ আলোচনা চলে আসছিল বনী ইসরাঈল নামের এক বিশেষ গোষ্ঠী সম্পর্কে। তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন তাদের ধর্মমত এবং আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো اَلَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল একটা বংশগত নাম। একটি গোত্র – বংশ বা একটি জাতির নাম। উচ্চ বংশ মর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতো। নিজেদের পূর্বপুরুষ সাধু সজ্জন ছিল বলে তারা মহা আনন্দিত ছিল। ইতিহাস পুনরাবৃত্তিকালে এ বংশগত নাম নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন তাদের ধর্মমত ও তাদের বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এখন এমন নাম নেওয়া প্রয়োজন যাতে কোনো গুণ-পরিচয় প্রকাশ পায়, যাতে বংশ-গোত্র-পরিবারের পরিবর্তে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। اَلَّذِيْنَ هَادُوْا সে প্রয়োজন পূরণ করছে। কুরআনে আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ অসংখ্য অগণিত, সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রায় কাছাকাছি কিন্তু একে অপর থেকে ভিন্ন অর্থের জন্য কুরআন মাজীদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখে। আরবে এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা জন্মগত এবং বংশগতভাবে ইহুদি ছিল না; বরং তারা ছিল আরব বা বনী ইসমাঈল তথা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর; কিন্তু ইহুদিদের সংসর্গ সান্নিধ্যে প্রভাবিত এবং তাদের জ্ঞান গরিমা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে তারা প্রথমে ওদের আচার আচরণ এবং পরে আকিদা বিশ্বাস অবলম্বন করে নেওয়া আর এভাবে ধীরে ধীরে তারা ইহুদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। اَلْيَهُوْد না বলে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا বলার একটা সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, এতে তাদের আকিদা বিশ্বাস যে মৌলিক নয়; বরং পরবর্তীকালে গ্রহণকৃত, সে কথা ভালোভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ..... لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

আল্লাহর করুণার ব্যাখ্যা : فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ দ্বারা লক্ষ্য হলো সে সকল ইহুদি, যারা মহানবী ﷺ-এর সময়ে উপস্থিত ছিল। রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান না আনাও যেহেতু পূর্বোল্লিখিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোনো আজাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আজাব দেওয়া হতো। এটা একান্তই আল্লাহর রহমত। তবে কারো কারো মতে হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, আজাব অবতীর্ণ না হওয়া মহানবী ﷺ-এরই বরকত। তাই মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাবকেই আল্লাহর রহমত ও করুণা বলে উল্লেখ করেছেন।

ইসলামের বিধানের দৃষ্টিতে সব সমান : মোটকথা কানুনের ব্যাপকতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মুসলমানদের কানুন ব্যাপক, চাই আমাদের অনুকূল ও আনুগত্যের বুলি বোলনেওয়ালা হোক কিংবা বিরোধী হোক, সকলে ভালোভাবে শ্রবণ করে নাও যে, এখন মুক্তি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুকরণের মধ্যে সীমিত। এর দ্বারা কথার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে যে, ইসলামের এ ব্যাপক ও সাধারণ বিধানে আমাদের ও তোমাদের পার্থক্য নেই। কালো ও সুন্দরের ব্যবধান নেই। ভৌগলিক কিংবা বংশের হিসেবে পৃথকতার কোনো প্রশ্ন নেই, ইসলামের দৃষ্টিতে সকলে সমান। কারো সাথে না ব্যক্তিগত সখ্যতা রয়েছে। আর না কারো সাথে শত্রুতা রয়েছে। যেমন কোনো বাদশা ঘোষণা করে দেয় যে, আইনের দৃষ্টিতে সব সমান; মন্ত্রী হোক কিংবা ফকির বাধ্যগত গোলাম হোক অথবা বিরোধী শত্রু। যে কানুনের সম্মান ঠিক রাখবে সে দয়া ও মহব্বতের পাত্র হবে। তা না হলে শাস্তির যোগ্য হবে। উক্ত বর্ণনার পর যদি اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা খালেছ মুমিনগণও উদ্দেশ্য হয়, তবুও আয়াতে কারীমার অর্থ ও উদ্দেশ্য একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। [কামালাইন : খণ্ড. ১,পৃষ্ঠা ৭৮]

বিপথগামী ওলামা (عُلَمَاء سُوْء) এবং ভুল পথের মাশায়েখ : তওরাত নাজিল হওয়ার পর বনী ইসরাঈল সত্যায়ন ও আস্থা লাভের উদ্দেশ্যে বাছাই করে উম্মতের ৭০ আউলিয়াকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা কুদরতি বিভিন্ন আশ্চর্যময় বস্তু স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও জাতির সামনে এসে ভুলমিশ্রিত বক্তব্য পেশ করল যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যদি তোমাদের দ্বারা সে মুতাবেক আমল করা সহজভাবে সম্ভব হয় তবে কর। নতুবা আমল না করলেও চলবে।

কিছু তো তাদের জন্মগত দুষ্টামি, কিছু বিধানাবলির কঠোরতা। তাই আমল থেকে পরিত্রাণের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল যে আমাদের দ্বারা সে হুকুম মুতাবেক আমল করা সম্ভব নয়। এ কারণে পাহাড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে সাবধান করেছেন যে, এ মুহূর্তে বিধানকে শক্তভাবে ধর এবং সে অনুযায়ী আমল কর। [প্রাগুক্ত]

দুনিয়াবি রাজত্বের কর্ম পদ্ধতি: যেমন সরকারিভাবে পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে ডিউটি আদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বাধ্য করা হবে। ডিউটি আদায়, না করলে সে শাস্তির যোগ্য ও বরখাস্তের যোগ্য হবে এবং এ পদ্ধতিকে ইনসাফ বলা হবে।

আল্লাহর ব্যাপক রহমত থেকে দুনিয়াতে মুমিনদের ন্যায় কাফেররাও উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু পরকালে আল্লাহর বিশেষ রহমতের যোগ্য শুধু মুমিনগণ হবে এবং আল্লাহর ফযল ও রহমতের সত্যায়ন নবী করীম ﷺ-ও হতে পারেন, যার অস্তিত্বের অসিলায় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বর্তমান ইহুদি সম্প্রদায় দুনিয়াবি আজাব থেকে নিরাপদে রয়েছে। -[প্রাগুক্ত]

اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُه تَعَالٰى : خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

হযফের মাধ্যমে ঈজায : আলোচ্য অংশে কিছু ইবারত উহ্য রাখার মাধ্যমে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মূলরূপ ছিল- قُلْنَا لَهُمْ خُذُوْا

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

নির্দেশবাচক শব্দ : আলোচ্য অংশটিতে أمر (নির্দেশবাচক শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে তুচ্ছতা ও ধিক্কার প্রকাশের জন্যে।

✪ تَعَارُفُ الْأَقْوَامِ : জাতি পরিচিতি

নাসারা বা খ্রিষ্টান জাতি : النَّصَارٰى শব্দটি বহুবচন, একবচন نَصْرَانِى; যারা নিজেদেরকে হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মত হওয়ার দাবি করে, তাদেরকে নাসারা বা খ্রিষ্টান বলে।

নামকরণ : শাম দেশে বর্তমান ফিলিস্তিনে nazareth বা নাসারা নামে একটা গোত্র আছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৭০ মাইল উত্তরে রোম সাগরের ২০ মাইল পূর্বে গ্যালিলী অঞ্চলে তাদের বসবাস। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিবাস এ অঞ্চলে ছিল। এ কারণে তাকে ইয়াসূ নাসেরী বলা হয়। আরবি উচ্চারণে নাসেরাকে নাসরানও বলা হয়। এ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে বলা হয় নাসারানী।

ইমাম রাগেব (র.) বলেন- سَمُّوا بِذٰلِكَ اِنْتِسَابًا اِلٰى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও নাসারাদের নামকরণের কারণ সংক্রান্ত একটি বর্ণণা পাওয়া যায়-

سُمِّيتِ النصارى لانَّ قَرْيَة عِيْسى بْنَ مريمَ كانَتْ تُسَمّٰى نَاصِرَةً وكَانَ اَصْحَابُهٗ يُسَمُّوْنَ النَّاصِرِيْنَ.

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন- سَمُّوا بِذٰلِكَ الْقَرْيَةِ كانَتْ تُسَمّٰى نَاصِرَةً كَانَ يَنْزِلُهَا عِيْسى فَلَمَّا يُنْسَبُ اَصْحابَهٗ اِلَيْهِ قِيْلَ النَّصَارٰى

কেউ কেউ একে আরবি শব্দ মনে করে তা نصرة থেকে নিষ্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, যেহেতু তারা বলেছিল; نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ -তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়। কিন্তু উপরিউক্ত উক্তিটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩]

সাবেয়ীর পরিচয় : সাবেয়ী এর শাব্দিক অর্থ হলো – যে কেউ নিজেকে দীন ত্যাগ করে অপরের দীন গ্রহণ করে বা অপরের দীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। صَابِئُوْنَ (saloians) নামে একটা ধর্মীয় দল ছিল, যারা আরবের উত্তর পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাসী ছিল। কারণ এরা মূলত আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে 'নাসারা-ই ইয়াহইয়া' বলতো। যেহেতু এরা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মত। হযরত ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীগণ সাবিয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। এমনকি হযরত ওমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ هُمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ مِثْلُ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكَعْبَةِ. (معالم)

বেশ বড় বড় কয়েকজন তাবেয়ীও তাদেরকে আহলে কিতাব বা তাওহীদবাদী মনে করতেন। যেমন ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন- هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ (اِبْنِ جَرِيْرٍ عَنِ السُّدِّيْ)

ইবনে যায়েদ (র.) তাদেরকে তাওহীদবাদী মনে করতেন। কাতাদা, হাসান বসরী (র.) থেকে তো এও বর্ণিত আছে যে, তারা কিতাবধারী ছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজেও ছিলেন ইরাকী। এ কারণে সাবিয়ীদের সম্পর্কে সরাসরি জানার তাঁর সুযোগ ছিল। তারা ফতোয়া হলো তাদের হাতে জবাই করা পশু হালাল এবং এদের নারীদের সাথে বিয়েও জায়েজ। (قرطبي) قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رحمه الله لَا بأسَ بِذَبَائِحِهِمْ ونِكَاحِ نِسَائِهِمْ.

✪ تَعَارُفُ الْاَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

তূর পাহাড়ের পরিচয় : পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় اَلطُّوْرُ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে اَلطُّوْرُ শব্দটির অর্থ হলো পাহাড়। একইভাবে হিব্রু (ইরানী) ভাষাতেও 'তূর' অর্থ হলো পাহাড়। মূলত হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনায় যে পাহাড়টির উল্লেখ করা হয় তা سِيْنَاء পর্বতমালার একটি পাহাড়। সাইনা পর্বতমালার একটি পাহাড়ে মূসা (আ.) ইতেকাফের জন্যে গমন করেন এবং তাওরাত লাভ করেন। এই পর্বতটি বর্তমানে جبل موسى বা طور سيناء নামে পরিচিত এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে সাধারণভাবে যাকে 'তূর পর্বত' বলা হয়, তা মূলত 'সাইনা পর্বতমালা' বা 'সিনাই পর্বতমালা'-এর অংশ। এটি মিশরের অন্তর্গত। পবিত্র কুরআনে 'তূর বলার কারণে এটি 'তূর পর্বত' নামে প্রসিদ্ধ।

আল্লামা তাবারী (র.) বর্ণনা করেন। طُوْرِ سِيْنَاء হলো সেই পর্বত, যাতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করেন। এটি সাইনা উপত্যকায় جَبَلُ الطُّوْرِ (তূর পর্বত) নামে প্রসিদ্ধ।

ভৌগলিক অবস্থান : তূর পাহাড়ের অবস্থান সম্পর্কে ইবনে যায়েদ বলেন, এটি শামে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু তার এ অভিমতটি সঠিক নয়। এ পাহাড়টি বর্তমানে ফিলিস্তিনে অবস্থিত। এ পাহাড়টি جَبَلُ الطُّوْرِ নামে পরিচিত। এটি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নিকট পবিত্র একটি পাহাড়। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত তূর পর্বত এটি নয়; এর সঠিক অবস্থান যেমনটি মুজামুল বুলদানে বর্ণিত আছে যে, এটি আইলার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমান মানচিত্র অনুযায়ী পাহাড়টি মিশরের সিনাই উপদ্বীপে অবস্থিত।

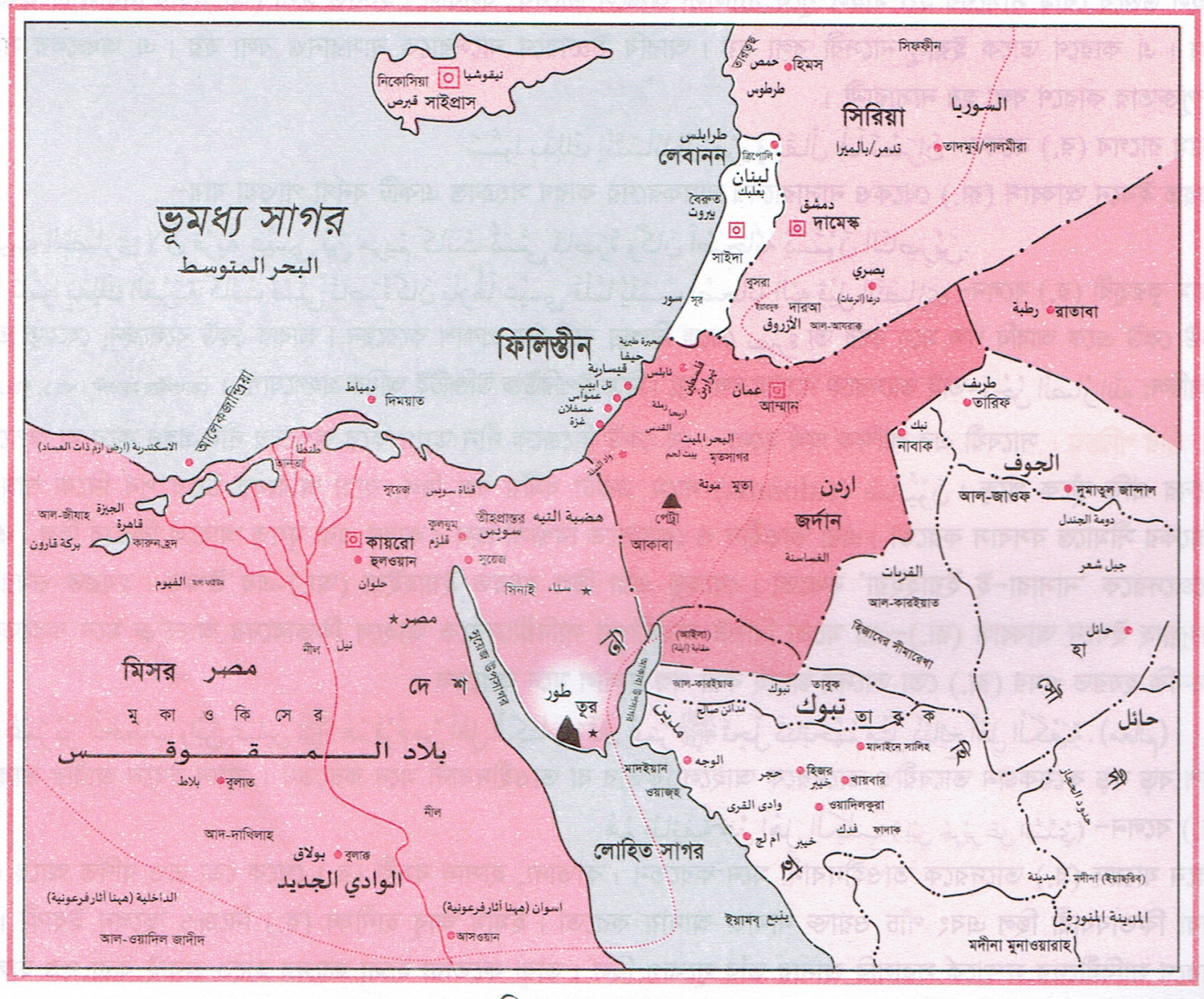

চিত্রে : তূর পাহাড়

٦٥. ﴿وَلَقَدْ﴾ لَام قَسَم ﴿عَلِمْتُمُ﴾ عَرَفْتُمْ ﴿الَّذِينَ اعْتَدَوْا﴾ تَجَاوَزُوا الْحَدَّ ﴿مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ بِصَيْدِ السَّمَكِ وَقَدْ نَهَيْنَاهُمْ عَنْهُ وَهُمْ أَهْلُ أَيْلَةَ ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ مُبْعَدِيْنَ فَكَانُوا وَهَلَكُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

৬৫. এবং তোমরা নিশ্চয় لام-টি কসমের জন্যে অবগত আছ তোমরা চিন তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার মাছ শিকার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছিল সীমালঙ্ঘন করেছিল। অথচ আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম তারা ছিল আয়লার অধিবাসী আমি তাদেরকে বলেছিলাম তোমারা ঘৃণিত বিতাড়িত বানর হয়ে যাও। ফলে তারা বানরে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তিন দিন পর সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

٦٦. ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ أَيْ تِلْكَ الْعُقُوبَةَ ﴿نَكَالًا﴾ عِبْرَةً مَانِعَةً مِنِ ارْتِكَابِ مِثْلِ مَا عَمِلُوْا ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ أَيْ لِلْأُمَمِ الَّتِيْ فِي زَمَانِهَا وَبَعْدَهَا ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ﴾ اللهَ وَخُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ.

৬৬. আমি তা অর্থাৎ ঐ শাস্তি তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের অর্থাৎ যে সকল উম্মত এ সময় বিদ্যমান ছিল এবং পরে যারা আগমন করবে, তাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষামূলক, অনুরূপ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রতিরোধক হিসেবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ করেছি। এখানে মুত্তাকিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো তা দ্বারা কেবল তারাই উপকৃত হতে পারে, অন্যরা নয়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَلَقَدْ- لَام قَسَمٍ

উহ্য مُقْسَم بِهٖ-এর প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.) ولقد এরপর لَام قَسَمٍ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে مُقْسَم به উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হলো- وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ;

قَوْلُهٗ : لَقَدْ عَلِمْتُمْ

علمتم-এর এক মাফ'উলবিশিষ্ট হওয়ার কারণ : ظَنَنْتُ، حَسِبْتُ، علمتُ এ ধরনের ফে'লগুলো দুটি মাফ'উল দাবি করে। অথচ এখানে عَلِمْتُمْ ফে'লটির শুধু একটি মাফ'উল উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ হলো عَلِمْتُمْ এখানে عَرَفْتُمْ-এর অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এখন এক মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দী হওয়া শুদ্ধ।

قَوْلُهٗ : وَهُمْ أَهْلُ أَيْلَةَ

স্থান নির্ধারণ : আলোচ্য অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) ঘটনাটির স্থান উল্লেখ করেছেন, মুফাসসির (র.) যে স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুসারে। কেউ কেউ বলেন, এটি মাদইয়ানের ঘটনা। কেউ বলেন, এটি মাদাইয়ান ও আইনূনার মধ্যবর্তী মুকান্না নামক এলাকার ঘটনা। কিন্তু শেষোক্ত অভিমতদ্বয় গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهٗ : وَهَلَكُوْا بَعْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

বানর প্রজাতি আয়লাবাসীর বংশধর নয়: মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, বর্তমানে যে বানর দেখা যায়, এগুলো আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে অঙ্গ বিকৃতিস্বরূপ যে, বানর হয়েছিল, সে বানর নয়। মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদি সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোনো ধরনের মম্পর্ক নেই। [মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهٗ : فَجَعَلْنَاهَا أَىْ تِلْكَ الْعُقُوْبَةَ

ها যমীরের مرجع নির্ণয় : فَجَعَلْنَاهَا-এর ها সর্বনাম দ্বারা عُقُوْبَة তথা শাস্তি উদ্দেশ্য হতে পারে। মুফসসির (র.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। আকৃতি বিকৃত উম্মতও অর্থ হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

قَوْلُهٗ : لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا أَىْ لِلأُمَمِ الَّتِيْ .....الخ

لما بين يديها الخ-এর ব্যাখ্যা : لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا أى للأمم .... الخ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) : এর ব্যাখ্যা করেছেন। মুফাসসির (র.) এর মতে এর দ্বারা তাদের সমকালীন জাতি ও পরবর্তী জাতিসমূহ উদ্দেশ্য। এর তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরগণ অন্যান্য আরো বিভিন্ন অভিমত উল্লেখ করেছেন। তবে এ সম্পর্কে সবচেয়ে শক্তিশালী অভিমত হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেন–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنَ الْقُرٰى ومَا خَلْفَهَا مِنَ الْقُرٰى. وقَالَ سَعِيْدُبْنُ جُبَيْرٍ : أَىْ مَنْ يَحْضُرُهَا مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

عَلِمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مثبت فعل ماضي مطلق معروف বাব سمع মাসদার العلم মূলবর্ণ (ع.ل.م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিশ্চিতরূপে জান। 'ইলম' শব্দটি তাহকীক বা নিশ্চিত করে জানা অর্থে কুরআন মাজীদে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْعِلْمُ-এর সামর্থক শব্দ হিসেবে اَلْمَعْرِفَةُ শব্দটি ব্যবহার হয়; কিন্তু علم ও معرفة-এর মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা–

১. معرفة কেবল 'যাত' বা সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হওয়াকে বোঝায়। আর علم ذات-এর সাথে সাথে তার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে জানাকে বোঝায়। যেমন– عَرَفْتُ زَيْداً وَعَلِمْتُ زَيْداً ضَاحِكاً

২. مَعْرِفة-এর পূর্বে অজ্ঞতা আবশ্যক। পক্ষন্তরে علم-এর পূর্বে অজ্ঞতা জরুরি নয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে معْرِفة-এর ব্যবহার শুদ্ধ নয়।

৩. علم-এর ব্যবহার اِدْرَاكُ الْكُلِّيَاتِ-এর ক্ষেত্রে হয়, আর معْرِفة-এর ব্যবহার اِدْرَاكُ الْجُزْئِيَاتِ-এর ক্ষেত্রে হয়।

৪. علم -এর ব্যবহার مُدْرِكٌ بِالْقَلْبِ বা অন্তর দিয়ে অনুভব করার ক্ষেত্রে হয় আর معرفة-এর ব্যবহার مدرك بالحواس বা পাঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার ক্ষেত্রে হয়।

نَكَالًا : মূলবর্ণ (ن - ك - ل) জিনস صحيح অর্থ– দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। نَكَال শব্দটি نكل থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো اَلْمَنْعُ (নিষেধ করা, বিরত রাখা)। যেহেতু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি শাস্তিপ্রাপ্তকে পুনরায় অপরাধ করা থেকে এবং অন্যদেরকে তার মতো অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে, তাই তাকে نكال বলা হয়। পক্ষন্তরে শাস্তি যদি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক না হয়, তাহলে نكال ব্যবহার হয় না। কারণ عقاب শব্দটি نكال -এর চেয়ে ব্যাপক।

مُبْعَدِيْنَ : এটি মাজরূর অবস্থায় রয়েছে। সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব افعال মাসদার اَلْإِبْعَادُ মূলবর্ণ (ب. ع. د) জিনস صحيح অর্থ– বিতাড়িত।

اَلسَّبْتُ : শব্দটি মূলত বাবে ضرب-এর মাসদার। এর অর্থ হলো– قَطْعُ الْعَمَلِ তথা কর্ম বন্ধ রাখা, শেষ করা, শনিবার। যেহেতু শনিবারে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির সকল কাজ শেষ করেছিলেন, তাই একে يَوْمُ السَّبْتِ বলা হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ: বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُه تَعَالَى : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا.....كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.

الَّذِينَ اعتدَوْا مِنْكُمْ ; حرف تحقيق হলো قد ; استئنافية টি– واو ; لقد-এর লামটি উহ্য কসমের جواب-এর শুরুতে এসেছে। عَلِمْتُمْ -এর মাফ'উল বিহী হয়েছে। مِنْكُمْ অংশটুকু اعتدوا -এর যমীর থেকে উহ্য হালের মুতা'আল্লিক আর فِي السَّبْتِ হলো اعْتَدَوْا -এর সাথে মুতা'আল্লিক فقلنا لهم كونوا ....الخ -এর فاء -টি– عاطفة; ফলে পরবর্তী বাক্যটি আতফ হয়েছে اعْتَدَوْا -এর উপর। قِرَدَةً শব্দটি موصوف এবং خَاسِئِيْنَ হলো সিফাত صفة ও موصوف মিলে كُوْنُوْا-এর خبر বাক্যটি قُلْنَا এর মাকুলা হিসেবে নসবের স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً ..... وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ

এ পুরো বাক্যটি فاء দ্বারা আতফ হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য الخ ..... تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ-এর উপর। فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً অংশটির ها যমীরটি হলো جَعَلْنَا-এর প্রথম মাফ'উল এবং نَكَالاً শব্দটি দ্বিতীয় মাফ'উল হয়েছে। لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا অংশটুকু জার মাজরূর মিলে نَكَالاً-এর উহ্য সিফাতের মুত'আল্লিক হয়েছে। ما দুটি মাউসূলা مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ অংশটুকু আতফ হয়েছে نَكَالاً-এর উপর।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : وَقَدْ نَهَيْنَاكُمْ عَنْهُ

قَدْ نَهَيْنَاكُمْ শব্দের নুসখা : ৬৫নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত শব্দটিতে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় قَدْ نَهَيْنَاكُمْ লিখিত আছে ।

খ. অন্য নুসখায় শব্দটি قَدْ نَهَيْنَاهُمْ রূপে পাওয়া যায় ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

خَاسِئِيْنَ শব্দের নুসখা : ৬৫নং আয়াতে উল্লিখিত خَاسِئِيْنَ শব্দটিতে দু'ধরনের লিখনশৈলী রয়েছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় خ বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে লিখিত আছে ।

খ. কুরআনি লিখনশৈলীতে শব্দটির خ বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে خٰسِئِيْنَ রূপে লিখিত আছে।

قَوْلُهٗ : مُبْعَدِيْنَ فَكَانُوْهَا

فكانوها শব্দের নুসখা : ৬৫নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত শব্দটিতে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির শেষাংশে ها লিখিত আছে ।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি শেষাংশে আলিফযোগে فَكَانُوْا রূপে লেখা পাওয়া যায় ।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بين الآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا ..... كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

পূর্বের আয়াতে বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যদি না থাকতো, তাহলে তোমরা যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ, তার ফলশ্রুতিতে তোমাদেরকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়াই হতো যথার্থ প্রতিদান। এখন এ আয়াতে দৃষ্টান্তস্বরূপ শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন ও অস্বীকার করার পার্থিব ক্ষতি বর্ণনা করা হচ্ছে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী উম্মতকে তাওরাতে শনিবার দিবসটি ইবাদতে কাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা সে বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ফলে তাদেরকে নসখ বা বিকৃতির আজাব দেওয়া হয়েছিল।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ ..... كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

বনী ইসরাঈলের মাঝে শনিবারের গুরুত্ব : এখানে اَلسَّبْتُ দ্বারা শনিবার উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন- اَلسَّبْتُ দ্বারা এখানে تَعْظِيْم বা সম্মান উদ্দেশ্য। اَىْ تَعْظِيْمِ يَوْمُ السَّبْتِ; কেউ কেউ বলেন فِيْ حُكْمِ يَوْمِ السَّبْتِ অর্থাৎ, শনিবারের বিধানের ব্যাপারে। اَلسَّبْتِ বা শনিবার দিনটি ইহুদিদের নিকট অতি পবিত্র একটি দিন, যেমন খ্রিষ্টানদের জন্যে রবিবার। এ দিনটি কেবল আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। এ দিন ব্যবসা বাণিজ্য, কাজ কারবার, চাষাবাদ, কৃষিকর্ম ও শিকার ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা ছিল অত্যন্ত কঠোর। কারণ এ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

আয়লাবাসীর অবাধ্যতা ও শাস্তির বর্ণনা : মুসাবীর বর্ণনায় পাওয়া যায় হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়ে আয়লা নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক ইহুদি বসবাস করতো। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১০১৪ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭৩ অব্দ পর্যন্ত। বনী ইসরাঈলের জন্যে শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্যে নির্ধারিত এটি দিন। এ দিনে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। আয়লাবাসীরা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মাছ শিকার ছিল তাদের প্রধান পেশা। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মাছ শিকারে নেমে পড়ে। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে مسخ তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি সাধনের শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা প্রথম প্রথম কলাকৌশলের অন্তরালে এবং পরে তারা প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে মাছ শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোক তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দল বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বাস করতো আর অপরভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতো। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে কান্না করতো।

ঘটনার সময়কাল : এই ঘটনাটি কোন যুগে ঘটেছিল তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মাঝে মতবিরোধ আছে। কারো কারো মতে হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়ে এ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ও ইমাম রাযী (র)-এর বর্ণনা থেকে উপলব্ধিকরা যায় যে, উপরিউক্ত অভিমতটি সঠিক নয়। আল্লামা হিফযুর রহমান সিওহারভী (র) বলেন, এ ঘটনাটি হযরত মূসা (আ.) ও দাউদ (আ.)-এর মধ্যবর্তীকালে কোনো সময়ে ঘটেছিল, যখন আয়লা জনপদে কোনো নবী ছিলেন না।

[কাছাছুল কোরআন (অনুবাদ) : খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ২৩০-২৫৮]

نَكَال ও مَوْعِظَة শব্দদ্বয় উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা আয়লাবাসীর কথা উল্লেখের পর বলেছেন, তিনি এ ঘটনাকে نَكَال (দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি) ও مَوْعِظَة (উপদেশ) বানিয়েছেন। এর কারণ হলো এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণি ও অনুগত শ্রেণি। অবাধ্যদের জন্যে এ ঘটনাটি অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نَكَال তথা শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্যে এটা আনুগত্যে অবিচল থাকার উপকরণ। এজন্যে একে موعظة তথা উপদেশপ্রদ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দু'আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান : এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে শাস্তি হিসেবে শুধু বানর হওয়ার কথা বলা হলো, অথচ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ অর্থাৎ, শূকর হওয়ার বিবরণও রয়েছে।

উত্তর : ক. اَصْحَابُ السَّبْتِ বানর হয়েছিল আর اصْحَابُ الْمَائِدَةِ শূকর হয়েছিল।

খ. اصْحَابُ السَّبْتِ-এর মধ্যে যারা যুবক ছিল, তারা বানর হয়েছিল, আর যারা বৃদ্ধ ছিল, তারা শূকর হয়েছিল।

হীলাসংক্রান্ত সন্দেহ নিরসন : আসহাবুস সাবত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা প্রথমেই সরাসরি মাছ শিকার করেনি; বরং তারা সমুদ্র থেকে নালা কেটে আনত। পরে সেখানে পানির সাথে মাছ প্রবেশ করলে নালার মুখ বন্ধ করে দিত এবং পরদিন রবিবার গিয়ে সে মাছ তুলে আনত। এর উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ হীলাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আল্লাহর কোনো বিধান থেকে বাচাঁর জন্যে কিংবা অন্য কোনো অসদুদ্দেশ্যে যে হীলা করা হয়, তা অবৈধ। বনী ইসরাঈলের হীলা এ প্রকারেরই ছিল। পক্ষান্তরে অনেক সময় হারাম থেকে বাচাঁর জন্যে হীলার প্রয়োজন হয়। এ হীলা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য ও বৈধ।

দীনি ব্যাপারে হীলা বাহানার তাৎপর্য : এ আয়াতে ইহুদিদের যে সীমালঙ্ঘনের কথা আলোচিত হয়েছে এবং যে কারণে তাদের উপর مسخ তথা বিকৃতির শাস্তি নেমে এসেছিল, বর্ণনার আলোকে প্রতিয়মান হয় যে, সেটা শরয়ী হুকুমের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ ছিল না; বরং তা ছিল এমন হিলা বা কৌশল যা দ্বারা শরয়ী হুকুম অমান্য করা আবশ্যক হয়। যেমন সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনে মাছের লেজে ডুরি বেঁধে সমুদ্রের এক কোণে ছেড়ে রাখা এবং পরের দিন অনায়াসে তা শিকার করা বা সমুদ্রের কিনারে গর্ত করে রাখা; যাতে নিষিদ্ধ দিনে মাছ সেখানে ঢুকে পড়ে এবং পরের দিন তা শিকার কারা যায়– এটা হচ্ছে ঐ ধরনের হীলা যাতে শুধু শরয়ী হুকুমের লঙ্ঘনই হয় না; বরং তা বিদ্রূপ বা উপহাসও হয়। তাই তো এ ধরনের হীলার আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে বড় রকমের অবাধ্য ও নাফরমান আখ্যা দিয়ে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করা হয়েছে। [জামালাইন : ১৪০]

ফিকহী হীলা : তবে উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা ফিকহী হীলা হারাম প্রমাণিত হয় না। তন্মধ্য হতে কিছু হীলা তো স্বয়ং রাসূল ﷺ -ও বাতলে দিয়েছেন। যেমন এক কেজি উত্তম দামী খেজুরের বদলায় দুই কেজি কম দামি খেজুর ক্রয় বিক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সুদ থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ একটি হীলা বাতলে দিয়েছেন। তা হলো জিনস এর বিনিময়ে জিনস তাবাদুলা না করে মূল্যের বিনিময়ে বেচা-কেনা করা। যেমন দুই কেজি কম দামি খেজুর দুই দিরহামে বিক্রি করে দুই দিরহাম দ্বারা এক কেজি উত্তম খেজুর খরিদ করা জায়েজ আছে। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হলো হুকুমে শরয়ী পালন করা, তা বাতিল ও অমান্য করা উদ্দেশ্য নয়। [জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪০]

শরিয়তের দৃষ্টিতে হীলা : হীলা অর্থ- مَهَارَاتُ تَدَابِيْر বা কৌশলের দক্ষতা। হারাম ও পাপ থেকে বাঁচার জন্যে শরিয়ত সমর্থিত কোনো পথ অনুসরণকে ফকীহগণের পরিভাষায় 'হীলা' বলে। এজন্যই কেউ কেউ হারাম থেকে পলায়নের পথকে হীলা বলেছেন- اِنَّهَا هُوَ الْهَرْبُ مِنَ الْحَرَامِ

সারকথা হলো, হারাম থেকে বাঁচার পথকে হীলা বলে। হারামের শিকার হওয়া অথবা নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে প্রতারিত করাকে হীলা বলে না।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, আমাদের ফিকহি গ্রন্থগুলোর এমন কিছু হীলাও উল্লিখিত হয়েছে দীনের মেজাজ ও রুচির সাথে যেগুলো খাপ খায় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা এগুলোকে জায়েজ বলেছেন কিংবা উৎসাহিত করেছেন; বরং এই জাতীয় হীলা গ্রন্থবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো, যদি কোনো ব্যক্তি এমনটি করেই বসে তাহলে তার বিধান কী হবে? কী হবে তার পরিণতি। কারো কারো আপত্তির জবাবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (র) এ কথাই লিখেছেন। ইমাম সারাখসী (র) হীলার বৈধ-অবৈধ বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শেষে সারনির্যাস হিসেবে লিখেছেন, সারকথা হলো হারাম থেকে মুক্তি ও হালাল পর্যন্ত পৌঁছার লক্ষ্যে গৃহীত হীলা উত্তম। যদি কারো হক নষ্ট করা কিংবা কোনো অন্যায় লোভে হীলার পথ গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেটা হারাম। মোটকথা দ্বিতীয় প্রকারের হীলা নাজায়েজ। আর প্রথমোক্তটি জায়েজ। যেমন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এমন 'ডেগ' রান্না না কর, যার অর্ধেক হালাল আর অর্ধেক হারাম, তাহলে তুমি তালাক। এমতাবস্থায় এই মাথা গরম ব্যক্তির স্ত্রীকে হীলা বলে দেওয়া হয়েছে - মদের 'ডেগ' খোসাসহ ডিম রান্না করবে। খোসার কারণে ডিমের ভেতর মদ পৌঁছতে পারবে না। ফলে তার অর্ধেক হালাল আর অর্ধেক হারাম 'ডেগে' রান্না করা হয়ে যাবে। তালাকের মতো 'নিকৃষ্ট মুবাহ' এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এই নারী। ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে তার খান্দান-পরিবার।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, ফিকহ গ্রন্থে বর্ণিত হীলাগুলোর মূল প্রেরণা হলো হারাম থেকে রক্ষা পাওয়া, পাপের পথ বন্ধ করা এবং শরিয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে ভালো করে বুঝতে হবে, যদি কেউ হীলার অন্তরালে পাপের পথে পা বাড়ায় হীলার খোলস পরে অন্যের প্রতি জুলুম ও অবিচারের চেষ্টা করে, তাহলে তা নিশ্চিত হারাম, ও জঘন্য অপরাধ; বরং এটা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়ারই নামান্তর। কিন্তু আল্লাহকে কি ধোঁকা দেওয়া যায়? يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়, অথচ তারা তো নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাব নিপতিত হয়েছিল এই কারণে যে, তারা আল্লাহর দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে শনিবারে মাছ শিকার করেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই দিন মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। তারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছিল কৌশলের আড়ালে। পবিত্র কুরআনে [উক্ত আয়াতে] এই কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

প্রনিধানযোগ্য যে, হীলা বিষয়টি সাধারণ তো বটেই, আলেম সম্পদায়ের জন্যও অত্যন্ত নাজুক। তাই চূড়ান্ত ঠেকা ছাড়া এই প্রাঙ্গনে পা রাখা সঙ্গত নয়। স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের পূর্বসূরীগণ হীলার পথ দেখিয়ে গেছেন হারাম থেকে বাচাঁর লক্ষ্যে, হীলাকে হালাল ও পবিত্র হিসেবে বরণ করার উদ্দেশ্যে নয়। [দেখুন, হালাল হারাম : মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী,পৃ. ৪৬ - ৪৮]

মৌলিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতি : আর মুফাসসিরগণের মধ্যে মুজাহিদ (র)-এর অভিমত হচ্ছে এটা যে, বাহ্যিক বিকৃতি হয়নি; বরং মৌলিক বিকৃতি উদ্দেশ্য। আহ্মক ও নির্বোধ ব্যক্তিকে যেমনভাবে গরু ও গাধা বলা হয়, সেটাই এখানে উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত প্রকৃত অর্থ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানীগণ মনে করেন যে, যে ব্যক্তি শরিয়তকে প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দেয় না, তার আধ্যাত্মিক নূর ধ্বংস হয়ে আত্মা বিকৃত হয়ে যায় এবং যে প্রাণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে প্রাণীর স্বভাবই তার মধ্যে, দেখা দিবে। এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিকৃতি।

✪ تَعَارُفُ الْاَمَاكِن : স্থান পরিচিতি

আয়লার পরিচয়: أَيْلَة শব্দটি أ বর্ণে যবর ও ي বর্ণে সাকিন। আবুল মুনযির (র) বলেন, শহরটির নামকরণ করা হয়েছে আয়লাহ বিনতে মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ.)-এর নামে। তাওরাতে শহরটিকে 'ঈলাত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে শহরটি ঈলাত নামেই পরিচিত। [মুজামুল বুলদান: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯২; তাফসীরে মাজেদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯]

ভৌগলিক অবস্থান : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আয়লার অবস্থান সম্পর্কে বর্ণিত আছে সেটা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। আরব ভৌগলিকগণ বলেন, মিসর থেকে মক্কার গমনপথের পাশে শহরটি অবস্থিত। শহরটি বর্তমানে ইসরাঈলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এটি ইসরাঈলের সর্বদক্ষিণে লোহিত সাগরের উত্তর দিকে আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর নগরী।

মৈত্রী চুক্তি: রাসূল ﷺ তাবুকে অবস্থানকালে আয়লা থেকে ইউহান্না ইবনে রুবা এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং জিযিয়ার বিনিময়ে মুসলিমদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

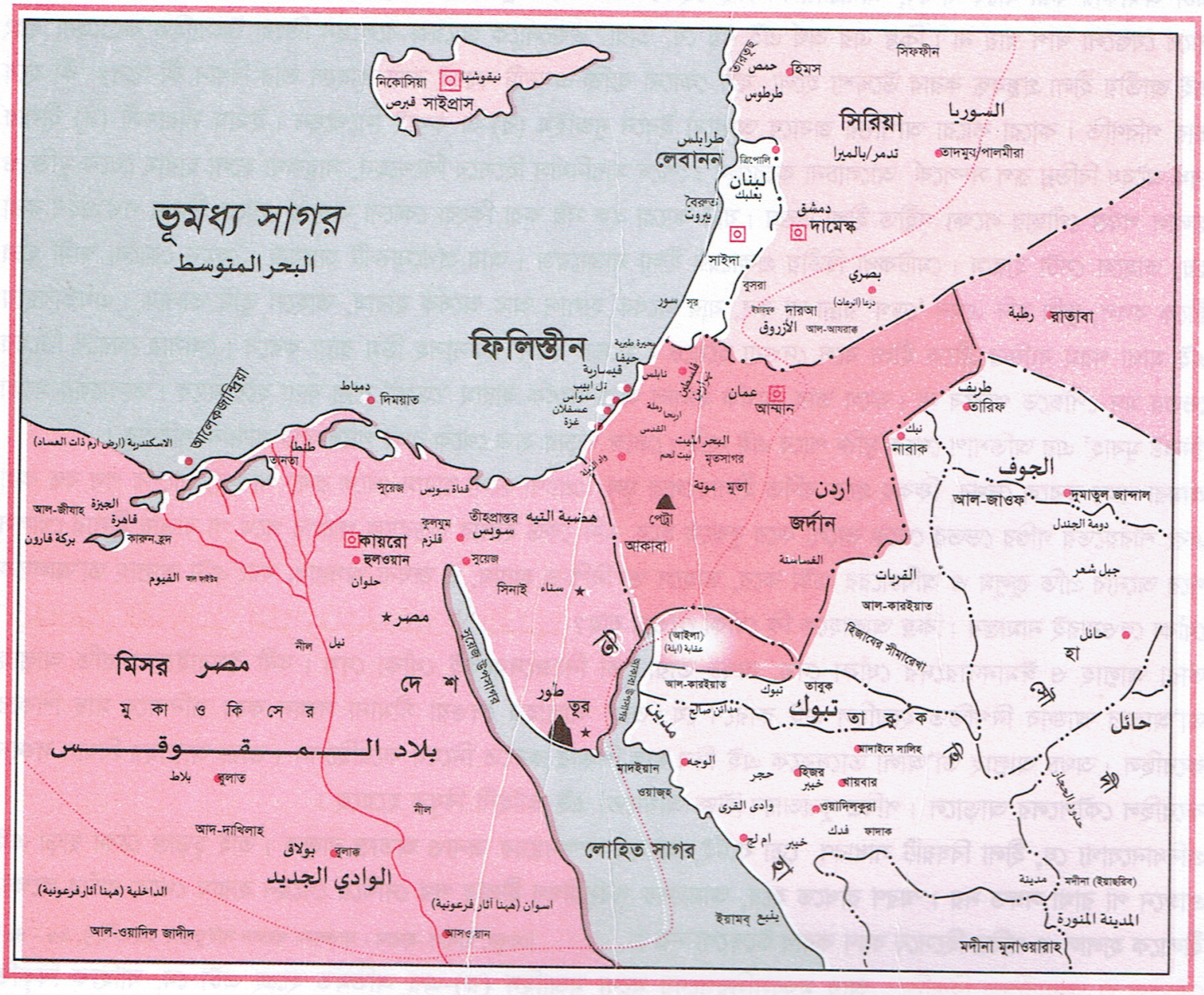

চিত্রে : আয়লা

٦٧. ﴿وَ﴾ اُذْكُرْ ﴿إِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ﴾ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيْل لَا يُدْرٰى قَاتِلُهُ وَسَأَلُوْهُ أَنْ يَدْعُوَ اللّٰهَ أَنْ يُبَيِّنَهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ مَهْزُوًّا بِنَا حَيْثُ تُجِيْبُنَا بِمِثْلِ ذٰلِكَ ﴿قَالَ أَعُوْذُ﴾ أَمْتَنِعُ ﴿بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾ اَلْمُسْتَهْزِئِيْنَ.

৬৭. আর স্মরণ করো যখন মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আর তাদের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল; কিন্তু হত্যাকারী সম্পর্কে কারো কিছু জানা ছিল না। তখন তারা হযরত মূসা (আ.) এর নিকট অনুরোধ জানালো, এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্যে তিনি যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন। অনন্তর তিনি সেজন্যে আল্লাহ তা'আল্লার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? আমাদেরকে উপহাসের পাত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছ? তাইতো আমাদেরকে এ ধরনের জবাব দিচ্ছ। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিচ্ছি বিরত হচ্ছি। অজ্ঞদের উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া হতে।

٦٨. فَلَمَّا عَلِمُوْا أَنَّهُ عَزَمَ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ﴾ أَيْ مَا سِنُّهَا ﴿قَالَ﴾ مُوْسٰى ﴿إِنَّهُ﴾ أَيِ اللّٰهَ ﴿يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ﴾ مُسِنَّةٌ ﴿وَّلَا بِكْرٌ﴾ صَغِيْرَةٌ ﴿عَوَانٌ﴾ نِصَفٌ ﴿بَيْنَ ذٰلِكَ﴾ الْمَذْكُوْرِ مِنَ السِّنِيْنَ ﴿فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ﴾ بِهٖ مِنْ ذَبْحِهَا.

৬৮. যখন তারা বুঝতে পারল যে মূসা (আ.) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তারা বলল, আমাদের খাতিরে তোমার প্রভুর নিকট বল, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তা কী? অর্থাৎ গাভীটির বয়স কী হবে? তিনি মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তা এমন গাভী যা বৃদ্ধও না বয়স্কও না, অল্প বয়স্কও না, ছোটও না, মধ্য বয়সী। উল্লিখিত বয়সসমূহের মাঝামাঝি সুতরাং তা জবাই করা সম্পর্কে তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ, তা করো।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ..... مَهْزُوًا

هُزُوًا দ্বারা উদ্দেশ্য : هُزُوًا-এর তাফসীরে مَهْزُوًا উল্লেখ করে মুফাসসির (র) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, هُزُوًا হলো ইসমে মাফ'উলের সমার্থক মাসদার। অবশ্য শব্দটি মুবালাগাস্বরূপ মাসদার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, অথবা هُزُوً শব্দের পূর্বে একটি মুযাফ উহ্যও ধরা যায়। যেমন- ذَوِيْ هُزُوٍ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مِنَ الْجَاهِلِيْنَ . اَلْمُسْتَهْزِئِيْنَ

نَفْيُ الْجَهَالَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য : বনী ইসরাঈল স্বীয় নবী ও রাসূল হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি هُزُوًا বা ঠাট্টার অপবাদ আরোপ করেছিল। সে হিসেবে هُزُوًا কে নাকচ করা উচিত ছিল; কিন্তু তা না করে আয়াতে جَهَالَة -কে নাকচ করে ..... قَالَ اَعُوْذُ مِنَ الْجاهِلِيْنَ উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসির (র) এর সমাধানে اَلْمُسْتَهْزِئِيْنَ তাফসীর করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে نفي الجهالة দ্বারা মূলত نفي الْاِسْتِهْزاءِ -ই উদ্দেশ্য। কারণ তাবলীগের ব্যাপারে هُزُوً অর্থাৎ ঠাট্টা করা মূর্খতার নামান্তর। সুতরাং جهالة -কে নাকচ করার দ্বারা মূলত اِسْتِهْزاء-কেই নাকচ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : تَعَالٰى .... يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ أَيْ مَا سِنُّهَا

مَا هِيَ-এর ব্যাখ্যা مَا سِنُّهَا দ্বারা করার কারণ : মুফাস্নিফ (র) এভাবে তাফসীর করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে ما দ্বারা যদিও কোনো বস্তুর ماهية সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু এটা قاعدة اكثرية ; এখানে ما দ্বারা গাভীর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। কেননা গাভীর حقيقة ও ماهية সম্পর্কে তারা পূর্ব থেকেই অবগত ছিল।

কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাঈল গাভীর গোশেতের স্পর্শে মৃতব্যক্তির জীবিত হওয়ার সংবাদ শুনে এত অধিক বিস্মিত হয়েছেন যে, মনে করেছিল. এটি কোনো সাধরণ গাভী হবে না, তাই مَجْهُوْلُ الْجِنْسِ-কে مَجْهُوْلُ الْوَصْفِ পর্যায়ে রেখে ما শব্দের দ্বারা প্রশ্ন করেছে।

قَوْلُهٗ : لاَ فَارِضٌ . مُسِنَّةٌ ولاَ بِكْرٌ . صَغِيْرَةٌ

فارض ও بكر -এর লিঙ্গ বর্ণনা : فارض শব্দটি কিয়াস বহির্ভূত ইসমে ফায়েল যা مذكر ও مؤنث উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। একইভাবে بكر শব্দটি মুবালাগা প্রকাশক সিফাতে মুশাব্বাহা যা مذكر ও مؤنث উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তাই মুফাসসির (র.) শব্দ দুটির পরে যথাক্রমে مُسِنَّة ও صَغِيْرَة বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শব্দ দুটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهٗ : بَيْنَ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ السِّنِيْنَ

ذٰلِكَ-এর مُشَارٌ إِلَيْهِ-এর বর্ণনা : بين শব্দটি একাধিক বস্তুর 'মাঝে' বোঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শব্দটি ذلك -এর দিকে মুযাফ হয়েছে যা একবচন। তাই মুফাসসির (র) ব্যাখা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ذٰلِكَ একবচন হলেও الْمَذْكُوْر কে مشار اليه ধরে নিয়ে তা একাধিক বস্তুর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ بَيْنَ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْفَارِضِ وَالْبِكْرِ

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

بَقَرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে بَقَرَاتٌ; এটির ইসমে জিনস হলো بقر; শব্দটি পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় ধরনের গরুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। তবে আলোচ্য আয়াতে গাভী উদ্দেশ্য। শব্দটি বাবে نصر-এর মাসদার بقر থেকে নির্গত। যার অর্থ- شقا অর্থাৎ বিদীর্ণ করা। গরু যেহেতু জমিন বিদীর্ণ করে, তাই গরুকে بقرة বলা হয়।

اَلْجَاهِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহুছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার الجهل মূলবর্ণ (ج - ه - ل) জিনস صحيح অর্থ- অজ্ঞরা, মূর্খরা। جهل-এর আভিধানিক অর্থ- অজ্ঞতা। ইমাম রাগেব (র) বলেন- الجهلُ فعلُ الشَّيْءِ بِخَلاَفِ ما حقُّه يفْعَلُ অর্থাৎ, কোনো কাজ তার যথাযথ পন্থার পরিপন্থিরূপে সম্পাদন করা।

فَارِضٌ : সীগাহ واحد مذكر বহুছ اسم فاعل বাব نصر বা كرم মাসদার اَلْفُرُوْضُ বা اَلْفَرَاضَةُ মূলবর্ণ (ف- ر- ض) জিনস صحيح অর্থ- বয়স্ক গাভী। সুতরাং لاَ فَارِضٌ অর্থ- যে গাভী বয়স্ক নয়। শব্দটি مذكر ও مؤنث উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

بِكْرٌ : বহুছ الصفة المشبهة বাব نصر মাসদার اَلْبُكُوْرُ মূলবর্ণ (ب - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ- অল্পবয়সী। শব্দটি مذكر ও مؤنث উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

عَوَانٌ : মধ্যম, মাঝবয়সী। বহুবচন عون সহজকরণার্থে واو-এর ضمة-কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে।

نصفٌ : بِفَتْحِ النُّوْنِ والصَّادِ একবচন, বহুবচনে اَنْصَاف অর্থ- মধ্যবয়সী, মাঝবয়সী, প্রৌঢ়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى..... مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى -এর তারকীব পূর্ববর্তী وإذْ قَالَ -এর মতোই। إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً অংশটুকু হলো قَالَ -এর মাকুল يَأْمُرُكُمْ ..... الخ অংশটুকু إن-এর খবর হয়েছে। كُمْ যমীরটি يَأْمُرُ -এর মাফ'উল বিহী أَنْ تَذْبَحُوْا অংশটুকু منصوب بنزع الخافض হিসাবে নসবের স্থানে রয়েছে। মূলরূপ ছিল- يَأْمُرُكُمْ بِأَنْ تَذْبَحُوا কারণ, أمر মাসদারটি ب অব্যয়যোগে ব্যবহার হয়। أَتَتَّخِذُنَا-এর মাঝে হামযাটি প্রশ্নবোধক অব্যয় আর نا যমীরটি হলো تَتَّخِذُ-এর প্রথম মাফ'উল। هُزُوًا শব্দটি হলো تَتَّخِذُ-এর দ্বিতীয় মাফ'উল। تَتَّخِذُنَا هُزُوًا বাক্যটি পূর্ববর্তী قَالُوْا-এর মাকুলা হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। بِاللّٰهِ অংশটুকু أَعُوْذُ এর সাথে মুতা'আল্লিক আর أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ বাক্যটি مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। এর মূলরূপ হলো- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ অংশটুকু اكون-এর উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالُوْا ادْعُ لَنَا .....فَافْعَلُوْا مَاتُؤْمَرُوْنَ

أُدْعُ لَنَا رَبَّكَ-এর মাঝে لَنَا হলো أُدْعُ-এর সাথে متعلق আর رَبَّكَ হলো তার মাফ'উল। يُبَيِّنْ ফে'লটি أمر-এর جواب হিসেবে مجزوم হয়েছে। لَنَا অংশটি يُبَيِّنُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। ما هي এর ما টি حرف الاصتفهام যা মুবতাদা হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে।

قَالَ হলো ফে'ল ও ফায়েল إِنَّه يَقُوْلُ .... الخ হলো قَالَ -এর মাফ'উল। إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا..... الخ হলো يَقُوْلُ -এর মাফ'উল। إِنَّهَا-এর إِنَّ হলো الحرف المشبه بالفعل এবং ها যমীরটি হলো ان-এর اسم بقرة হলো إِنَّ-এর খবর। لَا فَارِضَةٌولَا بِكْرٌ অংশটুকু মা'তূফ আলাইহি মিলে بقرة-এর প্রথম সিফাত হয়েছে। لا দুটি নাবাচক, তারকীবে এগুলোর কোনো স্থান নেই। عَوَانٌশব্দটি بقرة-এর দ্বিতীয় সিফাত। بَيْنَ ذَلِكَ অংশটুকু মুযাফ ইলাইহি মিলে عَوَانٌ উহ্য সিফাতের ظرف হয়েছে।

✪ الرَّسمُ الْعُثْمَانِيّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى: عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ

عَوَانٌ শব্দের লিখনশৈলী : ৬৮নং আয়াতে উল্লেখিত عَوَانٌ শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী রয়েছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচালিত জালালাইনের নুসখায় عَوَانٌ শব্দটির ن বর্ণে اِقْلَاب -এর م -বিহীন লিখিত আছে ।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ن বর্ণে اِقْلَابُ -এর م -যোগে عَوَانٌ লিখা হয়।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بين الآيات : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ اللّٰه يأْمُركُم ..... أَكُون مِنْ الْجَاهِلِينَ

পূর্বের আয়াতে বনী ইসরাঈল তথা আয়লার অধিবাসীদের ওয়াদা ভঙ্গ ও এর পরিণতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে তাদের খোদায়ী বিধান পালনে গড়িমসি ও হঠকারিতার আরেকটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারাও আল্লাহ তা'আলার ওহীর প্রতি আশ্বস্ত না হয়ে নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছিল।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

গাভী জবাই করার ঘটনা : বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত । জনৈক ব্যক্তি এক কন্যার বিবাহ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই সে এর প্রতিশোধ হিসেবে কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তাফসীরে জালালাইনের টীকায় রয়েছে, বনী ইসরাঈলের মাঝে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার ভাতিজারা বর্ণনান্তরে তার চাচাতো ভাইয়েরা সে ব্যক্তির মীরাসের প্রতি লোভী হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং শহরের প্রবেশদ্বারে তার মরদেহ ফেলে রাখে। তারপর তারাই আবার তার রক্তপণের দাবি তোলে। এ ব্যাপারে বিবাদ দেখা দিলে তারা হযরত মূসা (আ)-এর কাছে মকদ্দমা পেশ করে। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রকৃত ঘাতকের সন্ধান লাভের জন্যে দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি গাভী জবাই করত তার গোশতের খণ্ড দিয়ে মরদেহে আঘাত করার নির্দেশ দেন। এ আয়াতে সে ঘটনাই আলোচিত হয়েছে।

গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের হেকমত : প্রশ্ন হতে পারে হত্যাকারীর নাম জানার জন্যে এ পদ্ধতি কেন গ্রহণ করা হলো? আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেই তো পারতেন। মুফাসসিরগণ এ পদ্ধতি গ্রহণের বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করেন। যেমন–

১. যদি হযরত মূসা (আ) ওহীর মাধ্যমে হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিতেন, তাহলে সম্ভাবনা ছিল, তারা হযরত মূসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলে বসত এবং তার কথা বিশ্বাস করত না; কিন্তু যখন একজন মৃতব্যক্তি জীবত হয়ে সংবাদ দিতে শুরু করল তখন মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কোনো অবকাশ থাকল না।

২. গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের মাঝে এ হেকমত নিহিত ছিল যে, বনী ইসরাঈল বুঝতে পারবে যে, গরু এবং তার বাছুরকে তারা উপাস্য বানিয়েছিল, তা পূজার যোগ্য নয়; বরং জবাই হওয়ার যোগ্য।

হযরত মূসা (আ)-এর বক্তব্যকে ঠাট্টা মনে করার কারণ : হযরত মূসা (আ.)-এর আদেশকে বনী ইসরাঈলরা ঠাট্টা মনে করেছিল। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এর কারণ হতে পারে–

১. বনী ইসরাঈল গরুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশে গদগদ ছিল। তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, এমন এক সম্মানিত ও পুণ্যাত্মা প্রাণী বধ করার আদেশ দেওয়া হবে। তাই তারা মনে করল যে, হযরত মূসা (আ.) তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন।

২. এর ব্যাখ্যা হলো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে নিহত ও ঘাতক সম্পর্কে; অথচ আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন গাভী জবাই করার। দুটি বিষয়ের মাঝে বাহ্যিক কোনো যোগসূত্র না থাকায় তারা এটিকে ঠাট্টা মনে করেছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالُوْا ادْعُ لَنَا ..... فَفَعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

গাভীর গুণাবলি সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের প্রশ্ন : হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে গাভী জবাইয়ের আদেশ শুনে বনী ইসরাঈল এটাকে ঠাট্টা মনে করেছিল। তারপর হযরত মূসা (আ.) যখন اَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ বলে নির্দেশের বাস্তবতার প্রতি সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন, তখন বনী ইসরাঈলের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে, এ বিধান তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে মানবসৃষ্ট নয়, সুতরাং তা অবশ্যই পালন করতে হবে। সেই সাথে তারা এটাও মনে করল যে, নিঃসন্দেহ গাভীটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও বিস্ময়কর গাভী হবে। তাই তারা এ সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তা কেমন? বয়স কত? রং কী? ইত্যাদি ইত্যাদি।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে নির্গত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

দীন সম্পর্কে ঠাট্টা করার বিধান : ফকীহ ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত হতে এ বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে দীন ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপহাস করা ভয়াবহ গুনাহের কাজ। অতএব এরূপ আচরণকারী ব্যক্তি কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে। [কুরতুবী]

এ সম্পর্কে তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে– يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاِسْتِهْزَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ অর্থাৎ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়ে উপহাস করা মহা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত

তবে পরিছন্ন কৌতুক ও নির্দোষ রসালাপের সঙ্গে উপহাস বা ঠাট্টার বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। এতদুভয়ের পার্থক্য মৌলিক। নির্দোষ কৌতুক তো খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন এবং পরবর্তীতে দীনের বরেণ্যগণের মাঝেও তা বরাবর প্রচলিত ছিল।

[তাফসীরে মাজেদী: ১খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩২]

٦٩. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ﴿شَدِيْدُ الصُّفْرَةِ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ إِلَيْهَا بِحُسْنِهَا أَيْ تُعْجِبُهُمْ.

৬৯. তারা বলল, তোমার প্রতিপালককে আমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল যে, তার রং কী হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সেটা এমন হলুদবর্ণের গাভী, তার রং উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের, যার প্রতি দৃষ্টিদানকারীগণকে তার সৌন্দর্য আনন্দ দান করে তাদেরকে মুগ্ধ করে।

٧٠. ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ﴾ أَ سَائِمَةٌ أَمْ عَامِلَةٌ ﴿إِنَّ الْبَقَرَ﴾ أَيْ جِنْسُهُ الْمَنْعُوْتُ بِمَا ذُكِرَ ﴿تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ لِكَثْرَتِهِ فَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى الْمَقْصُوْدِ ﴿وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللهُ لَمُهْتَدُوْنَ﴾ إِلَيْهَا وَفِي الْحَدِيث لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوْا لَمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ اٰخِرَ الْأَبَدِ

৭০. তারা বলল, আমাদের জন্যে তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কী? অর্থাৎ তা কি মাঠে মুক্তভাবে বিচরণকারী না আমিলা বা কার্যে নিযুক্ত গাভী? কারণ উল্লিখিত বিশেষণযুক্ত গাভীর জাত বহুসংখ্যক থাকায় গাভীর প্রদত্ত বিবরণ আমাদেরকে সন্দেহে উপনীত করেছে। সুতরাং অভিপ্রেত গাভীটি আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা তার দিশা পাব। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তারা যদি ইনশাআল্লাহ না বলত, তবে কখনো আর তাদেরকে উক্ত গাভী সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলে দেওয়া হতো না।

٧١. ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ﴾ غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ ﴿تُثِيْرُ الْأَرْضَ﴾ تُقَلِّبُهَا لِلزِّرَاعَةِ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُوْلٍ دَاخِلَةٌ فِي النَّفْيِ ﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ الْأَرْضَ الْمُهَيَّأَةَ لِلزِّرَاعَةِ ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ مِنَ الْعُيُوْبِ وَآثَارِ الْعَمَلِ ﴿لَّا شِيَةَ﴾ لَوْنَ ﴿فِيْهَا﴾ غَيْرَ لَوْنِهَا ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ نَطَقْتَ بِالْبَيَانِ التَّامِّ فَطَلَبُوهَا فَوَجَدُوهَا عِنْد الْفَتَى الْبَارِّ بِأُمِّهِ فَاشْتَرَوْهَا بِمِلْءِ مِسْكِهَا ذَهَبًا؟ ﴿فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ﴾ لِغَلَاءِ ثَمَنِهَا وَفِي الْحَدِيْث لَوْ ذَبَحُوْا أَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتْ لَأَجْزَأَتْهُمْ وَلٰكِنْ شَدَّدُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ

৭১. সে বলল, তিনি বলেছেন তা এমন এক গাভী যা কার্যে ব্যবহৃত নয় কাজ করিয়ে যাকে লাঞ্ছিত করা হয়নি। যা দ্বারা জমি কর্ষণ করা হয়নি চাষের উদ্দেশ্যে মাটি উলট পালট করা হয়নি, এখানে تُثِيْرُ الْاَرْضَ বাক্যটি ذَلُوْلٌ -এর বিশেষণস্বরূপ ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং এটাও পূর্বোক্ত لَا ذَلُوْلٌ অর্থাৎ না অর্থব্যঞ্জক মর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থাৎ, যে জমি কৃষির জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে পানি সেচ করা হয়নি সমস্ত মিশ্রণমুক্ত অর্থাৎ, তার রঙ অন্য কোনো রংয়ের মিশ্রণ হতে মুক্ত। তারা বলল, এতক্ষণে তুমি সত্যসহ এসেছ অর্থাৎ পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছ। অনন্তর তারা অনুসন্ধান করে মাতার প্রতি বাধ্য জনৈক যুবকের নিকট ঐ ধরনের একটি গাভী পেল ও তার চামড়া ভর্তি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা ক্রয় করল। অবশেষে তারা তা জবাই করল যদিও অত্যধিক মূল্যের কারণে তারা তা করতে উদ্যত ছিল না। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা যদি প্রথমে যে কোনো একটি গাভী জবাই করতো তবে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু তারা নিজেদের উপর বিষয়টিকে [বার বার প্রশ্ন করে] কঠিন করে ফেলায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের জন্যে কঠিন করে দেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : اَلنَّاظِرِيْنَ . اِلَيْهَا

اَلنَّاظِرِيْنَ-এর মুতা'আল্লিক নির্ণয় : اَلنَّاظِرِيْنَ শব্দের তাফসীর اِلَيْهَا بِحُسْنِهَا করে মুফাসসির (র) اَلنَّاظِرِيْنَ-এর মুতা'আল্লিক উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এর মুতা'আল্লিক উল্লেখ করেছেন إِلَى الْحِكْمَةِ الَّتِيْ مِنْ أَجْلِهَا أُمِرْنَا আর কেউ কেউ এর মুতা'আল্লিক উল্লেখ করেছেন– إِلَى الْبَقَرَةِ الْمَقْصُوْدَةِ

قَوْلُهُ : اِنَّ اَلْبَقَرَةَ أى جِنْسَه الْمَنْعُوْتَ بِمَا ذُكِرَ

পুংলিঙ্গের ফে'ল ব্যবহারের যথার্থতা : এর দ্বারা মুফাসসির (র) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিলেন। তা হলো এখানে تَشَابَهَ শব্দটি مُذَكر-এর সীগাহ। অথচ গাভী তো স্ত্রীলিঙ্গ। এর উত্তর হলো, এখানে اَلْبَقَرَةَ দ্বারা جِنْسُ الْبَقَرِ উদ্দেশ্য। এ হিসেবে মুযাক্কারের সীগাহ تَشَابَهَ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : لاَ ذَلُوْلٌ غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ

لا টি غير-এর সমার্থক: لَا ذَلُوْلٌ হলো بَقَرَةٌ-এর সিফাত। এর মাঝে لَا-টি হরফ। অথচ হরফ সিফাতও হতে পারে না এবং সিফাতের অংশও হতে পারে না। এজন্য মুফাসসির (র) غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ বলে বুঝিয়েছেন যে, এখানে لا টি غير-এর সমার্থক। আর غَيْر সিফাত হতে পারে।

قَوْلُهُ : وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُوْلٍ دَاخِلَةٌ فِي النَّفِي

সিফাতটি নফীর অন্তর্ভুক্ত : نَفِى যেমনিভাবে موصوف-এর শুরুভাগে আসে তেমনিভাবে সিফাতের প্রথমেও আসে। মুফাসসির (র) এ ইবারত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, تُثِيْرُ الْاَرْضَ দ্বারা গাভী থেকে اِثَارَةُ الْاَرْضِ -এর نفي করা উদ্দেশ্য ; ثابت করা নয়। কারণ এটা পূর্ববর্তী لَا ذَلُوْلٌ -এর নফীর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ : وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ . اَلْاَرْضَ الْمُهَيَّئَةَ لِلزَّرْعِ

حال বলে محل উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র) ইঙ্গিত করলেন যে, আয়াতে اَلْحَرْثُ শব্দটির ক্ষেত্রে حَال বলে مَحَل উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ক্ষেত চাষাবাদ বলে উদ্দেশ্য হলো চাষাবাদের জন্যে প্রস্তুতকৃত ভূমি বা ক্ষেত।

قَوْلُه: لَا شِيَةَ . لَوْنَ فِيْهَا. غَيْرُ لَوْنِهَا

গাভীর রং : شِيَةَ শব্দের অর্থ– রং। অতএব আয়াতের বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, পূর্বে গাভীর রং বলা হয়েছে হলুদ। পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে,لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ, তাতে কোনো রং থাকবে না। এর সমাধানে মুফাসসির (র.) বলেছেন এখানে উদ্দেশ্য হলো গাভীর নিজস্ব রং তথা গাঢ় হলুদ রং ছাড়া অন্য কোনো রং থাকবে না। কারণ شِيَةَ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এক রং আরেক রঙের সাথে মিশ্রিত করা । সুতরাং সাধারণভাবে রঙকে নাকচ করা হয়নি; বরং এমন রঙকে নাকচ হয়েছে যা অন্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

قَوْلُهُ : جِئْتَ بِالْحَقِّ . نَطَقْتَ بِالْبَيَانِ التَّامِّ

حَق দ্বারা উদ্দেশ্য : এ ইবারত দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে, حق দ্বারা بَاطِل -এর বিপরীতার্থক حَق বোঝানো উদ্দেশ্য নয় এবং তারা এটাও বুঝতে চায়নি যে, পূর্বে দু'বার যা বলা হয়েছিল তা বাতিল ছিল; বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো এখন আপনি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিলেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দ বিশ্লেষণ

فَاقِعٌ : অর্থ– গাঢ় হলুদ। অনেক গাঢ় হলুদ বোঝানোর জন্যে اَصْفَرُ فَاقِعٌ ব্যবহার হয়। গাঢ় কালো বোঝনোর জন্যে اَسْوَدُ حَالِكٌ ব্যবহার হয় আর গাঢ় সাদা বোঝানোর জন্যে اَبْيَضُ دَقِيْقٌ ব্যবহার হয়। গাঢ় লাল বোঝানোর জন্যে اَحْمَرُ قَانِيٌ ব্যবহার হয়। আর গাঢ় সবুজ বোঝানোর জন্যে اَخْضَرُ نَاضِرٌ ব্যবহার হয়। [লোগাতুল কুরআন]

شِيَةَ : এ শব্দটি মূলত وشى -এর মাসদার। এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থে মুবালাগার জন্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ– এক বর্ণের প্রাণীর মাঝে অন্য বর্ণের দাগ থাকা। এখানে সরাসরি অর্থ হবে– চিহ্ন, দাগ।
شية শব্দটি মূলত وشي ছিল। واو-কে হযফ করে তার হরকতটি شين -এ দেওয়া হয়েছে। واو-এর পরিবর্তে শেষে ة জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বহুবচনে شِيَاة
مِسْكٌ : একবচন, বহুবচনে مُسُوْكٌ ; অর্থ– চামড়া।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالى : فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

فَاقِعٌ لَّوْنُهَا-এর তারকীব সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা–
১. فَاقِعٌ হলো صِيْغَة صِفَت এবং لَوْنُهَا তার ফায়েল।
২. فَاقِعٌ হলো خبر مقدم আর لَوْنُهَا হলো مبتدأ مؤخر
৩. فَاقِعٌ হলো صفراء-এর সিফাত। আর لَوْنُهَا মুবতাদা এবং تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ খবর।
تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ এটি بَقَرَة -এর সিফাত হওয়ার কারণে محلا مرفوع হয়েছে। কেউ বলেন, এটি بَقَرَة বা لَوْنُهَا -এর যমীর থেকে حال হিসেবে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ

شَاء মুতা'আদ্দী ফে'ল। তার মাফ'উল উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হবে– اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِدايَتَنَا لِلْبَقَرَةِ ; এ শর্তের জাযা মাহযূফ আছে পরবর্তী لَمُهْتَدُوْنَ হলো তার করীনা। ইবারত হবে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِدايَتَنَا اِهْتَدَيْنَا ; رِعَايَةُ الْفَاصِلَة বা আয়াতের শেষে শব্দের ছন্দমিল অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ কে اسْمِ اِنَّ এবং خَبَرِ اِنَّ -এর মাঝে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالَ إِنَّه يَقُوْلُ ..... وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

لَا ذَلُوْلٌ অংশটুকু بَقَرَة -এর প্রথম এবং وَلاَ تَسْقِى الْحَرْثَ تُثِيْرُ الأَرْضَ বাক্যটি দ্বিতীয় সিফাত -এর واو-টি عاطفة ; لا টি পূর্ববর্তী لَا -এর তাকিদের জন্যে এসেছে। تَسْقِى الْحَرْثَ বাক্যটি تثير الأرض বাক্যটির উপর আতফ হয়েছে। এরপর مُسَلَّمَةٌ শব্দটি بقرة -এর তৃতীয় এবং لاَ شِيَةَ فِيْهَا চতুর্থ সিফাত হয়েছে। قَالُوْا الْآنَ جِئْت -এর মাঝে الْآنَ হলো এর যরফ।

✪ الرَّسْمُ الْعُثْمَانِىّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى:..... تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ

النَّاظِرِيْنَ শব্দের লিখনশৈলী: ৬৯ নং আয়াতে উল্লিখিত النَّاظِرِيْنَ শব্দটির দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–
ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় اَلنَّاظِرِيْنَ শব্দটির ن বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে লিখিত আছে।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ن বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَلنّٰظِرِيْنَ লিখিত হয়।

تَشَابَهَ শব্দের লিখনশৈলী : ৭০ নং আয়াতে উল্লিখিত تشابه শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–
ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় تَشَابَهَ শব্দটির ش বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে লিখিত আছে।
খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ش বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে تَشٰبَهَ লিখিত হয়।

✪ تَخْرِيجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস তথ্য

قَوْلُهُ تَعَالى : إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ

আল্লামা সুয়ূতী (র)-এ অংশটির তাফসীর করতে গিয়ে বলেন وَفِى الْحَدِيْثِ لَوْ لَم يَسْتَثْنُوْا لَمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ آخر الْأَبَد-এর দ্বারা তিনি সে হাদীসটির প্রতি ইশারা করেছেন যা আল্লামা তাবারী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَانَ يَقُوْلُ : إِنَّمَا أُمِرَ الْقَوْمُ بِأَدْنٰى بَقَرَةٍ وَلٰكِنَّهُمْ لَمَّا شَدَّدُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ شُدِّدَ عَلَيْهِمْ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوْا لَمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ آخِرَ الْأَبَدِ.

তা ছাড়া এ হাদীসটিই ইমাম তাবারী (র) ইবনে জুরাইজ থেকে মুরসাল ও মু'আল্লাকভাবে বর্ণনা করেছেন।

[তাফসীরে তাবারী: খণ্ড১, পৃষ্ঠা৩৪৭– ৩৪৮]

অবশ্য আবী হাতেম (র) তার তাফসীরগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটার লফয ভিন্ন। যথা– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْلاَ أَنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالُوْا وَإِنَّا إِنْ شَاءَاللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ لَمَا أُعْطُوْا وَلَكِنْ اِسْتَثْنُوْا একইভাবে ইবনে মারদুইয়াহ তাঁর তাফসীরগ্রন্থে হাদিসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ সবগুলো বর্ণনা উল্লেখের পর বলেন– وَهٰذَا غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهٖ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَوْلُه تَعَالٰى : فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

আল্লামা সূয়ূতী (র) এ অংশের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন–

وَفِى الْحَدِيْثِ: لَوْ ذَبَحُوْا أَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتْ لأَجْزَأَتْهُمْ وَلٰكِنْ شَدَّدُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

ইমাম সূয়ূতী (র) যে শব্দে বর্ণনা করেছেন হুবহু এ শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায়নি; বরং হাদীসটি ভিন্ন শব্দে বিদ্যমান, যেমনটি إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ আয়াতটির অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একই অর্থে একটি হাদীসটি আল্লামা হাইছামী (র) مَجْمَعُ الزَّوَائِد-এ বাযযার (র)-এর বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেন। হাদীসটির শব্দ হলো–

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ لَوْ أَخَذُوْا أَدْنٰى بَقَرَةٍ لَأَجْزَأَتْهُمْ أَوْ لأَجْزَأَتْ عَنْهُمْ

আল্লামা হাইছামী (র) এ হাদীসের মান সম্পর্কে বলেন- فِيْهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهٖ ثِقَاتٌ ; اَخْرَجَه سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِى سُنَنِهٖ عَنْ عِكْرَمَةَ مُرْسَلًا بَيْنَ السَّطْرِ -এ রয়েছে জালালাইনের [জালালাইন পৃষ্ঠা১২]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بين الآياتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: قَالُوْا ادْعُ لَنَا..... تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

পূর্বের আয়াতে গাভীর বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল, এখন এ আয়াতে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রথমটি ছিল مَعْقُوْلِى বিষয় আর দ্বিতীয়টি مَحْسُوْسِى বিষয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: قَالَ إِنَّه يَقُوْلُ ..... وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

যে যুবকের নিকট গাভীটি ছিল তার পরিচয় ও ঘটনা : তার পিতা ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন সৎ মানুষ। তার একটি গাভী ছিল, যাকে সে বন জঙ্গলে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেছিল। ইন্তেকালের পূর্বে স্ত্রীকে অসিয়ত করে গেলেন যে, আমার শিশু সন্তানটি বড় হলে এ গাভীটি তাকে দেবে। ছেলেটি তার পিতার ইন্তেকালের পর বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতো। কাঠ বিক্রির পয়সাগুলোকে যুবক তিন ভাগে ভাগ করতো। এক অংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতো। আরেক অংশ মায়ের জন্যে খরচ করতো। বাকি এক তৃতীয়াংশ গরিব দুঃখীকে দান করে দিত। অনুরূপভাবে ছেলেটি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করতো। এক ভাগে ঘুমাত। একভাগে মায়ের খেদমত করতো। একভাগে আল্লাহর ইবাদত করতো। ছেলেটি বড় হওয়ার পর মা তাকে বলল, তোমার পিতা তোমার জন্যে মীরাস হিসেবে একটি গাভী রেখে গেছেন। সেটি অমুক মাঠে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছে। তুমি সেখানে গিয়ে এ বলে আওয়াজ দাও যে হে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর প্রভু! আমার পিতার আমানতস্বরূপ দেওয়া গাভীটি প্রদান করুন! আর গাভীটির নিদর্শন হলো সেটি গাঢ় হলুদ বর্ণের। খুবই চমৎকার গাভী। যুবক তার মায়ের নির্দেশে মাঠে গেল এবং দেখল গাভীটি সেখানে বিচরণ করছে। মায়ের বর্ণিত নিদর্শন ও গুণাবলি তার মাঝে প্রত্যক্ষ করল। মায়ের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আহ্বান করার সাথে সাথে গাভীটি তার সামনে চলে আসে। যুবক যখন গাভীর ঘাড় ধরে টানতে লাগল, তখন গাভী বলল, হে মায়ের বাধ্য সন্তান! তুমি আমার উপর আরোহণ করো ! তোমার আরাম হবে । যুবক বলল, আমার জননীর নির্দেশ হলো তোমার গর্দান ধরে নিয়ে যাওয়া, আরোহণ করা নিষেধ আছে। গাভী বলল হে যুবক ! তুমি যদি আমার কথামত আমার উপর সওয়ার হতে, তাহলে কখনো আমি তোমার বাধ্য হতাম না। তোমার মায়ের আনুগত্যের কারণে তোমার এ মর্তবা হাসিল হয়েছে যে, পাহাড়কেও যদি নির্দেশ কর তাহলে সেও তোমার সামনে চলতে শুরু করবে।

মোটকথা যুবক গাভীটি নিয়ে তার মায়ের কাছে পৌঁছল। মা বলল, হে ছেলে ! তুমি তো খুব গরিব; দিনে কাঠ সংগ্রহ করে ফের রাতে তখন দাঁড়িয়ে বন্দেগী করা তোমার জন্যে কষ্টকর। তাই ভালো মনে করছি যে, তুমি এ গাভীটি বিক্রি করে ফেল। যুবক সন্তান জিজ্ঞেস করল কত দামে বিক্রি করব? মা বললেন, তিন দিনার মূল্যে বিক্রি কর। এটি সে সময়ের বাজারদর ছিল। সেই সঙ্গে মা বলে দিলেন, যদি ক্রেতা এর চেয়ে মূল্য বেশি দিতে বলে, তাহলে বিক্রির পূর্বমুহূর্তে ফের আমার কাছে জেনে নিবে। যুবক মায়ের নির্দেশ মত গাভীটি বিক্রি করার জন্যে বাজারে নিয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা যুবকের মাতৃভক্তি পরীক্ষা করার জন্যে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে গাভীর দাম জিজ্ঞাসা করলে যুবক বলল, গাভীর মূল্য তিন দিনার। ফেরেশতা বলল, আমার কাছ থেকে ছয় দিনার গ্রহণ কর এবং গাভীটি আমাকে দিয়ে দাও। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। যুবক বলল, তুমি যদি গাভীর সমপরিমাণ স্বর্ণও আমাকে দান কর তবুও আমি আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করব না। একথা বলে মায়ের কাছে গমন করল এবং ক্রেতার আগ্রহের কথা জানাল। মা বললেন, সে তো ক্রেতা নয়; বরং ফেরেশতা। সে তোমার পরীক্ষা নিতে এসেছে। তাকে বরং জিজ্ঞাসা কর যে, আমরা এ গাভীটি বিক্রি করব কিনা?

যুবক গাভী বিক্রি করার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে ফেরেশতা বলেন, এখনই তা বিক্রি করো না। হযরত মূসা (আ)-এর কওম তোমার কাছে একটি নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে এটি ক্রয় করতে আসবে। তুমি তাদের কাছে গাভীর চামড়া পরিপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে। ছেলেটি গাভী নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো।

এদিকে বনী ইসরাঈলের উপর এমন একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ হলো। ফলে তারা খুঁজতে খুঁজতে এসে যুবকের কাছ থেকে চামড়া ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গাভীটি ক্রয় করে জবাই করে।

গাভী সংক্রান্ত ঘটনার পর্যালোচনা: গাভী সংগ্রহ সম্পর্কে তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে পূর্বোক্ত ঘটনার মতো আরো বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বর্ণিত আছে, এর সবই মূলত ইসরাঈলী বর্ণনা। কিন্তু বহুল প্রসিদ্ধির কারণে অনেকেই এ ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাগুলোর সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)- বলেন ওবায়দা, আবুল আলিয়া ও সুদ্দী (র) প্রমুখ থেকে বনী ইসরাঈলের গাভী সংক্রান্ত যে সকল ঘটনা বর্ণিত আছে সেগুলো পরস্পর বিরোধী। এগুলো হয়তো বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু এসব ঘটনাকে সত্য বা মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ নেই। অতএব এসব বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না। তবে যেসব ঘটনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সত্য বলে সাব্যস্ত হয় তা গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৯৩; কাছাছুল কুরআন (অনুবাদ) : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৮]

আয়াতের বিরোধ নিরসন : আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে فذبحوها অর্থাৎ, বনী ইসরাঈল গাভী জবাই করেছে। পরে বলা হয়েছে– وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ, তারা গাভী জবাই করা তো দূরের কথা, জবাইয়ের কাছেও পৌঁছেনি। আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশ ও শেষাংশে বাহ্যত পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান হলো–

১. نَفْى ও اِثْبَات -এর বিষয়টি اِخْتِلَافُ الْاَوْقَاتِ বা সময়ের ভিন্নতা হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমে তো জবাই করার ধারে কাছেও ছিল না; বরং বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা সবকিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তাদের দলিল প্রমাণ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং খোঁজাখুজির পর বর্ণিত গাভীরও সন্ধান পেয়ে গেছে, তখন অগত্যা জবাই করতেই হলো। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যা– فَذَبَحُوْهَا فِى الزَّمَانِ الثَّانِىْ وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ فِىْ الزَّمَانِ الْاَوَّلِ

২. نَفْى ও اِثْبَات-এর বিষয়টি اِخْتِلَافُ الْاِعْتِبَارَيْنِ হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ, এক দৃষ্টিতে তারা জবাই করার উপক্রম ছিল না। অপর দৃষ্টিতে জবাই করেছে। এখন হলো কোন দৃষ্টিকোণে তারা জবাই করতে চায়নি। এর কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা–

ক. হয়তো তারা লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় জবাই করতে চায়নি। কারণ এতে প্রকৃত ঘাতকের সন্ধান ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

খ. অধিক মূল্যের কারণে। কেননা তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল গাভীর চামড়া ভর্তি স্বর্ণ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে অবশেষে তা জবাই করতেই হয়েছে। সুতরাং দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হওয়ার কারণে আর কোনো বিরোধ থাকল না। তবে এসব কারণগুলো মূলত ইসরাঈলী বর্ণনা নির্ভর হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

التَّدْرِيْبَات: অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة ثم حقق الالفاظ الآتية" اليهود والنصارى والصابئين " مع بيان وجه تسميتهم بها.

ب. فان قيل انه لا يستقيم قوله " من آمن بالله " بعد قوله " ان الذين آمنوا" فان ذلك يقتضى المغايرة.

ج. بين القاعدة النحوية المودعة في قوله " ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ثم اوضح معنى قول المصنف تحت هذه الآية" روعي في ضمير امن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها ثم اذكر تركيبها.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة .

ب. اوضح تفسير المصنف للاية .

ج. بين محل اعراب قوله" ورفعنا فوقكم الطور "خذوا ما آتيناكم ثم بين مفعول قوله "تتقون".

د. ما معنى لعل في قوله " لعلكم " وما يدل عليه وكيف نسب إلى الله وهو لا يليق بشانه تعالى أجب متفكرا.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : "وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ " ظاهره يدل على قبول الحق والدين بالاجبار والاكراه وهو خلاف القانون الشرعي لقوله تعالى في موضع آخر " لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ الخ " اوضح الجواب عنه متيقظا .

قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين . فجعلنها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.

ب. حقق الكلمات الآتية : اعتدوا ، قردة ، خاسئين ، نكالا . ثم بين ان الخطاب بقوله " ولقد علمتم " لمن ؟ ومن المراد بقوله " الذين اعتدوا".

ج. لاى سبب حدث الاعتداء في السبت لا في غيره؟ اوضح مع بيان الواقعة المعتلقة بالآية.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ـ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ.

أ. ترجم الآيات الكريمة موضحة.

ب. حقق الكلمات الآتية : وما كادوا ، فادارأتم ، ثم فسر الآيات الكريمة كما فسرها المصنف العلام جلال الدين السيوطى رحمه الله .

ج. أوضح الحاجة التي مست الى ذبح البقرة دون غيرها مع بيان واقعة صاحب البقرة والمستفاد منها مفصلا.

د. بين ما استفدت من الآيات الكريمة موضحا.

রুকূ' : ৯

ذِكْرُ عِنَادِ الْيَهُوْدِ لِلرُّسُلِ وَ أَمَانِيِّهِمِ الْكَاذِبَةِ

রাসূলদের প্রতি ইহুদিদের হঠকারিতা ও তাদের মিথ্যা আশার বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ ইহুদিদের মাঝে হত্যার ঘটনা
- ❑ ইহুদিদের উপদেশ গ্রহণ না করা
- ❑ ইহুদিদের পাম্পরিক কথোপকথন
- ❑ ইহুদি পণ্ডিতদের তাওরাত বিকৃতি ও তার পরিণতি
- ❑ জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ইহুদিদের বক্তব্য ও তার জবাব
- ❑ গুনাহগার ও নেককারদের পরিণতি

٧٢. ﴿وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَاْتُمْ﴾ فِيْهِ إِدْغَامُ الدَّالِ فِي التَّاءِ أَيْ تَخَاصَمْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ ﴿فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ﴾ مُظْهِرٌ ﴿مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ مِنْ أَمْرِهَا وَهٰذَا اعْتِرَاضٌ وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ.

٧٢. আর স্মরণ করো যখন তোমরা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যেও দোষারোপ করেছিলে اِدّٰرَاْتُمْ শব্দটিতে تاء কে دال-এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়ে পরস্পর দোষারোপ ও বিবাদ করেছিলে। এ বিষয়ে তোমরা তার ব্যাপারে যা গোপন রেখেছিলে আল্লাহ তাআলা তা উদঘাটন করে প্রকাশ করেছেন। وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ; এটা ঘটনাটির শুরুর কথা।

٧٣. ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ﴾ أَيِ الْقَتِيلَ ﴿بِبَعْضِهَا﴾ فَضَرَبَ بِلِسَانِهَا أَوْ عَجْبِ ذَنَبِهَا فَحَيِيَ وَقَالَ قَتَلَنِيْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ لِابْنَيْ عَمِّهِ وَمَاتَ فَحُرِمَا الْمِيْرَاثَ وَقُتِلَا قَالَ تَعَالٰى ﴿كَذٰلِكَ﴾ الْإِحْيَاءُ ﴿يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ﴾ دَلَائِلَ قُدْرَتِهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ تَتَدَبَّرُوْنَ فَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى إِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلٰى إِحْيَاءِ نُفُوْسٍ كَثِيْرَةٍ فَتُؤْمِنُوْنَ.

٧٣. অনন্তর আমি বললাম, এর কোনো অংশ দ্বারা তাকে নিহত ব্যক্তিটিকে আঘাত করো। অতঃপর তারা ঐ গাভীটির জিহ্বা অথবা লেজের গোড়ার ভাগ দ্বারা তাকে আঘাত করল। এতে সে জীবিত হয়ে বলল, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। আর এ দু'জন ছিল তার চাচাত ভাই। অতঃপর পুনরায় সে মারা গেল। ফলে তারা দু'জন মীরাস থেকে বঞ্চিত হলো এবং উভয়কেই হত্যা করা হলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে পুর্ণজীবন দানের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন অর্থাৎ তাঁর কুদরতের প্রমাণাদি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার অর্থাৎ চিন্তা করতে পার এবং জানতে পার যে, যিনি একটি প্রাণের পুনরুজ্জীবন দানের যেমন ক্ষমতা রাখেন তেমনিভাবে বহু প্রাণের পুনরুজ্জীবন দানেও তিনি নিশ্চয় সক্ষম। এতে তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ ..... وَهٰذَا اِعْتِرَاضٌ

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ বাক্যটির তারকীবগত অবস্থান : এ বাক্যটি جملة معترضة বা মধ্যবর্তী বাক্য। কারণ فَقُلْنَا হলো মা'তূফ এবং فَدَّرَأْتُمْ হলো মা'তূফ আলাইহি। এর মাঝখানে وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ الخ এটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বা নতুন বাক্য। এখানে مُعْتَرِضَةٌ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে ভবিষ্যতে এ ঘটনা ঘটার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপন করা বিষয় প্রকাশ করবেনই।

قَوْلُهٗ : هُوَ اَوَّلُ الْقِصَّةِ

ঘটনার শুরু অংশ পরে আনার কারণ : اِدّٰرَءْتُمْ থেকে ঘটনার শুরু অংশের বর্ণনা পূর্বে وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً-এর মাঝে ঘটনার পরের অংশের বিবরণ ছিল। তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে শেষ অংশটিকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অগ্রপশ্চাতের কারণ হলো ইহুদিদের মন্দ কর্মসমূহ একত্রে বর্ণনা করা।

আল্লামা সোলায়মান জামাল (র.) এই ইবারতটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। কারণ যমীরের পূর্বে তার مَرْجِعْ উল্লেখ থাকা আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য ইবারতে هُوَ যমীরটির مَرْجِعْ উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যান্য মুফাসসিরগণ এই আপত্তির উত্তর দিয়েছেন যে যমীরটির مَرْجِعْ হলো اَلْمَضْمُوْنَ السَّابِقِ; অতএব, কোনো আপত্তির আর সুযোগ থাকল না।

قَوْلُهٗ : فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ أَيِ الْقَتِيْلَ

পুরুষবাচক যমীর ব্যবহারের কারণ বর্ণনা : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা اِضْرِبُوْهُ এর মাফ'উলের যমীরটির مَرْجِعْ উল্লেখ করেছেন। কারণ, ইতঃপূর্বে نَفْسٌ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যা مُؤَنَّثٌ ; কিন্তু এখানে যমীরটি مُذَكَّرْ;

অবশ্য কেউ কেউ বলেন– تَذْكِيْرُ الضَّمِيْرِ لِتَذْكِيْرِ الْمَعْنٰى কারণ যখন যমীর مُذَكَّرٌ হয় এবং অর্থ مُؤَنَّثْ হয় অথবা তার উল্টো হয়, তাহলে যমীরকে مُذَكَّرْ বা مُؤَنَّثْ আনা উভয় সুরতে জায়েজ।

قَوْلُهٗ بِبَعْضِهَا. فَضَرَبَ بِلِسَانِهَا

গাভীর যে অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল: অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে গাভীর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মুফাসসির (র.) তন্মধ্য হতে দুটি অভিমত .উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. গাভীর জিহ্বা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

২. লেজের গোঁড়া দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, একটি হাড্ডি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সবগুলোই ইসরাঈলী বর্ণনা যার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন–

لَمْ يَأْتِ مِنْ طَرِيْقٍ صَحِيْحٍ بَيَانُ الْعُضْوِ الَّذِيْ ضَرَبُوْهُ بِهٖ.

قَوْلُهٗ : كَذٰلِكَ. الْاَحْيَاءِ ..... الخ

গাভীর ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য: আলোচ্য তাফসীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবেকের দাবি হলো, এমন বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর তাদের ঈমান নসীব হবে। সুতরাং বুঝা গেল, এরপরও যারা ঈমান আনল না তারা মূলত বিবেকশূন্য মানুষ।

মুফাসসির (র.) এখানে এদিকেও ইঙ্গিত দিলেন যে, كَذٰلِكَ-এর সম্বোধন মক্কার মুশরিকদেরকে করা হয়েছে। যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করতো এখানে আহলে কিতাবরা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা পরকাল ও পুনরুত্থান বিশ্বাস করতো। এ সুরতে كَذٰلِكَ ..... الخ জুমলায়ে মু'তারিযা বা মধ্যবর্তী বাক্য হবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ: শব্দবিশ্লেষণ

اِدّٰرَأْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّدَارُؤُ মূলবর্ণ (د.ر.ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা পরস্পর দোষারোপ করেছ। اِدَّارَئْتُمْ মূলত تَدَارَأْتُمْ ওযনে تَفَاعَلْتُمْ ছিল। تَاء এবং دَال হরফ দুটি مُتَقَارِبُ الْمَخْرَجَ হওয়ায় تَاء কে دَال দ্বারা পরিবর্তন করে دَال কে دَال -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এরপর শুরুতে সাকিন হওয়ার কারণে আলিফ যোগ করা হয়েছে। অবশেষে اِدَّارَئْتُمْ হয়েছে। دَرْءٌ মাঝে ঝগড়া করার অর্থ যেমন রয়েছে, তদ্রূপ প্রতিহত করা ও প্রতিরোধ করার অর্থও রয়েছে। পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ [সূরা নূর : ৮] وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ [সূরা কাসাস: ৫৪]

اَلْقَتِيْلَ : সীগাহ واحد বহছ اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةِ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق.ت.ل) জিনিস صحيح অর্থ- নিহত ব্যক্তি।

يُحْيِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح.ي.ي) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তিনি জীবিত করেন, প্রাণময় করেন।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ ..... مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ এর মাঝে اِذْ -এর আমেল উহ্য আছে। অর্থাৎ اُذْكُرُوْا اِذْ قَتَلْتُمْ, واو হরফে আতফ اِذْ হলো حِيْنَ-এর অর্থে قَتَلْتُمْ, مضاف ফে'ল ও ফায়েল نَفْسًا মাফ'উলে বিহী, সব মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে মা'তূফ আলাইহি হয়েছে। فَاء হরফে আতফ اِدّٰرَئْتُمْ فِيْهَا ফে'ল ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলা আতেফা হলো, وَاو ইতেরাযিয়া, লফযে اَللّٰه মুবতাদা مُخْرِجٌ শিবাহ ফেল هُوَ যমীর শিবহে ফায়েল مَا ইসমে মাওসূল كُنْتُمْ ফেলে নাকেস, যমীর اَنْتُمْ ইসমে নাকেস تَكْتُمُوْنَ ফে'ল ও ফায়েল মিলে খবরে নাকেস, ফে'লে নাকেস তার ইসম ও খবর নিয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে مُخْرِجٌ শিবাহ ফে'লের মাফ'উলে বিহী مُخْرِجٌ শিবহে ফে'ল ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর লফযে اَللّٰه মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة مُعْتَرِضَة

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَقُلْنَا اضْرِبُوْه..... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن

فَاء আতেফা قُلْنَا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قَوْل; اِضْرِبُوْا ফে'ল ফায়েল هُ মাফ'উলে বিহী بِبَعْضِهَا মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে مَقُوْلَة হয়ে মাফ'উলে বিহী قُلْنَا ফে'ল-এর। ফে'ল,ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে পুনরায় মা'তূফ পূর্বের قَتَلْتُمْ نَفْسًا -এর মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে আতফ হয়েছে وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى -এর উপর।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ

পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রু'কূর যোগসূত্র : পূর্বের রু'কূর শেষে গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। এখন وَاِذْ قَتَلْتُمْ الخ আয়াতে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ কেন প্রদান করা হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পূর্বে দীনি ব্যাপারে ইহুদিদের হঠকারিতার বিবরণ ছিল। আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তারা কীরূপ বাহানা এবং গড়িমসি করতো তার আলোচনা ছিল। এ আয়াতে দুনিয়াবি ব্যাপারে তাদের আচরণ কীরূপ ছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদের মোহ তাদের মাঝে এ পরিমাণ প্রবল ছিল যে, সম্পদের মোহে একটি মূল্যবান প্রাণ হত্যা করতে পর্যন্ত তারা দ্বিধাবোধ করেনি। তারপর আবার এ হত্যার দায়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপানোর হীন চেষ্টায় লিপ্ত হলো। আর পরবর্তীতে ঘাতকের পরিচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিও বলে দেওয়া হচ্ছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ ..... مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

আয়াতের উদ্দিষ্ট সম্প্রদায় : আলোচ্য আয়াতে قَتَلْتُمْ -এর مُخَاطَبْ বা সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো নবীযুগের ইহুদিরা। কিন্তু উদ্দেশ্য তাদের পূর্বপুরুষগণ। কারণ পূর্বপুরুষের এসব অন্যায়কর্মে তাদের সমর্থন ছিল।

বহুবচনের ফে'ল قَتَلْتُم বলার কারণ : আলোচ্য আয়াতে قَتَلْتُمْ বলার কারণে প্রশ্ন হতে পারে, হত্যাকারী তো একজনই ছিল। তারপরও এখানে বহুবচনের সীগাহ قَتَلْتُمْ ব্যবহার করা হলো কেন। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেছেন।

১. যেহেতু নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারী কে তা জানা যায়নি, তাই গোটাজাতির দিকে তার নিসবত করা হয়েছে।

২. হত্যাকারী দু'জন ছিল। তাই جَمْع فَوْقَ الوَاحِدِ হিসেবে বহুবচন আনা হয়েছে।

৩. হত্যাকারী অনেক লোকই ছিল। কেননা মৃতব্যক্তির ওয়ারিশরা সবাই একমত হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তাই বহুবচন দ্বারা সবার প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ ..... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن

জবাইকৃত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার তাৎপর্য : এখানে প্রশ্ন হতে পারে মৃত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার হুকুম দেওয়া হলো কেন ?

এর উত্তর হলো যদি জীবিত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার হুকুম দেওয়া হতো তাহলে এ সংশয় হতে পারত যে, সম্ভবত জীবিত প্রাণীর রুহ মৃতের মাঝে প্রবেশ করার কারণে সে জীবিত হয়েছে। তখন এটা তেমন বিস্ময়কর হতো না।

একজনের বক্তব্য দ্বারা কেসাস সাবস্ত হওয়ার কারণ: কেসাস সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য ঘটনাটিতে শুধু মৃতব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাই কেসাস সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে নিহত ব্যক্তি সঠিকই বলবে। তাই এ স্থানে শুধু নিহতের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَتُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ বিবেকের দাবিতো এই যে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান নসীব হবে। সুতরাং বুঝা গেল এরপরও যারা ঈমান আনল না, তাদের বিবেক নেই।

মুফাসসির (র.) এখানে এদিকেও ইঙ্গিত দিলেন যে, كَذَالِكَ-এর সম্বোধন মক্কার মুশরিকদেরকে করা হয়েছে। যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করত। এখানে আহলে কিতাবরা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা পরকাল ও পুনরুত্থান বিশ্বাস করত। এ সুরতে كَذَالِكَ..... الخ জুমলায়ে মু'তারিযা হবে।

মৃত্যুর পর পুনজীবন : জীবন এবং আত্মার বাস্তবতা একটি সূক্ষ্ম বাল্বের হৃৎপিণ্ড। যা ফ্লাগ বা সুইচ এর মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। সেটা যদি ফিউজ [অকেজো] হয়ে যায় তখন ইঞ্জিনিয়ার [আল্লাহ তা'আলা] পুনরায় কানেকশান ঠিক করে দিতে পারেন। উক্ত ঘটনার মধ্যে সেটার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আর এটাই মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বাস্তবতা। এ প্রমাণকে অসম্ভব মনে করার কিছুই নেই।

٧٤. ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ أَيُّهَا الْيَهُوْدُ صَلُبَتْ عَنْ قَبُوْلِ الْحَقِّ ﴿مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ اَلْمَذْكُوْرِ مِنْ إِحْيَاءِ الْقَتِيْلِ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾ فِي الْقَسْوَةِ ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ مِنْهَا ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ﴾ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الشِّيْنِ ﴿فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ﴾ يَنْزِلُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سِفْلٍ ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ﴾ وَقُلُوْبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِيْنُ وَلَا تَخْشَعُ ﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ.

৭৪. হে ইহুদিরা! এরপর নিহত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দানের উল্লিখিত ঘটনা এবং তৎপূর্ববর্তী নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল। সত্য গ্রহণ করা সম্পর্কে তা শক্ত হয়ে পড়ল কাঠিন্যের ক্ষেত্রে তা পাথরের মতো কিংবা তদপেক্ষা কঠিনতর। কতক পাথর এমন যা হতে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যা বিদীর্ণ হয়ে যায় يَتَشَقَّقُ-এর ت অক্ষরটিকে (ش বর্ণে রূপান্তর করে) তৎপরবর্তী অক্ষর ش -এ اِدْغَام করা হয়েছে। এবং পরে তা হতে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এমন যা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ধ্বসে পড়ে উপর হতে নিচে গড়িয়ে পড়ে। অথচ তোমাদের হৃদয় এমন যে এতে প্রভাবান্বিত হয় না। কোমল হয় না, বিনয়াবনত হয় না আর তোমরা যা কর আল্লহ তা'আল সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় তিনি তোমাদের পাকড়াও করা পিছিয়ে রেখেছেন। অপর এক কেরাতে يَعْلَمُوْنَ [নাম পুরুষ] রূপে পঠিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে حَاضِر এর প্রতি اِلْتِفَات হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ . اَلْمَذْكُوْرِ مِنْ اِحْيَاءِ الْقَتِيْلِ

مُشَارٌ إِلَيْهِ ও اِسْمُ الْاِشَارَةِ -এর সামঞ্জস্য : পূর্বে বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার অনেক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেসবের প্রতি ইশারা করার জন্য একবচনের শব্দ ذٰلِكَ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই মুফাসসির (র.) اَلْمَذْكُوْر শব্দ দ্বারা তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمَذْكُوْرُ-এর তাবীল করে ذٰلِكَ দ্বারা একাধিক বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে মুফাসসির (র.) اَلْمَذْكُوْرُ শব্দে এ ইঙ্গিতও করেছেন যে, ثُمَّ -এর عَطْف পূর্বের সকল ঘটনার বিষয়বস্তুর প্রতি হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِي الْقَسْوَةِ

وَجْهُ الشَّبَهِ বর্ণনা : আলোচ্য আয়াতের অংশটুকুতে তাশবীহে মুরসাল হয়েছে। কারণ এখানে أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু وَجْهُ الشَّبَهِ উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হলো فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِي الْقَسْوَة আর قَسْوَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَدَمُ التَّأَثُّر বা প্রতিক্রিয়া না হওয়া। অর্থাৎ তাদের অন্তর নসিহত গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে পাথরের মতো।

قَوْلُهٗ : أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً مِنْهَا

قَسْوَةٌ -এর তারকীবগত অবস্থান নির্ণয় : মুফাসসির (র.) قَسْوَةٌ-এর পর مِنْهَا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, قَسْوَةٌ শব্দটি اِسْمُ التَّفْضِيْل-এর তামঈয হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ

অন্য কেরাত ও তার সংশ্লিষ্ট বালাগাত বর্ণনা : وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ বলে মুফাসসির (র.) আলোচ্য আয়াতে ইবনে কাছীরের কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি এখানে تَعْمَلُوْنَ -এর পরিবর্তে يَعْمَلُوْنَ পড়েছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর কেরাত অনুযায়ী আলোচ্য অংশে حَاضِرْ থেকে غَائِبْ-এর প্রতি اِلْتِفَات করা হয়েছে। এ ইলতিফাতের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিদের কর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা। যেন বক্তা ঘৃণার কারণে সরাসরি তাদেরকে সম্বোধনও করতে চাচ্ছে না।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ: শব্দবিশ্লেষণ

قَسَتْ : সীগাহ غائب বহছ واحد مؤنث اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَسْوَةُ বা اَلْقَسَاوَةُ মূলবর্ণ (ق.س.و) জিনস ناقص واوي অর্থ– তা কঠিন হলো, শক্ত হলো।

يَشَّقَّقُ : সীগাহ غائب বহছ واحد مذكر اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّشَقُّقُ মূলবর্ণ (ش.ق.ق) জিনস مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ অর্থ– তা ফেটে যায়, বিদীর্ণ হয়, টুকরা টুকরা হয়। শব্দটি মূলত يتشقق ছিল ت কে ش বর্ণে রূপান্তর করার পর দুটি ش কে একটিতে اِدْغَام করা হয়েছে।

يَهْبِطُ : সীগাহ غائب বহছ واحد مذكر اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه.ب.ط) জিনস صحيح অর্থ– তা গড়িয়ে পড়ে, নীচে নেমে আসে।

نُزُوْلُ ও هُبُوْط শব্দদ্বয় সমার্থক হওয়ার পরও ব্যবহারে পার্থক্য রয়েছে। هُبُوْطٌ-এর সম্পর্ক যদি মানুষের দিকে হয় তাহলে অসম্মানের সাথে অবতরণের অর্থ হয়। যেমন– اِهْبِطُوْا مِصْرًا পক্ষান্তরে نُزُوْل ব্যবহার হয় সম্মানের সাথে অবতরণ। যেমন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ ..... عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অংশটি قَسَتْ-এর মুতা'আল্লিক। فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ-এর فَاء টি عَاطِفَة; هِيَ হলো মুবতাদা كَالْحِجَارَةِ অংশটুকু উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক হতে পারে। আবার كَاف কে مِثْل-এর সমার্থক ধরে নিয়ে মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর হতে পারে اَوْ اَشَدُّ قَسْوَة অংশটুকু كَالْحِجَارَةِ-এর উপর আতফ হয়েছে। কারণ উভয় অংশই খবর হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে قَسْوَةٌ শব্দটি اَشَدُّ ইসমে তাফযীলটির তাময়ীয হয়েছে।

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ-এর واو-টি اِسْتِئْنَافِيَّة অংশটুকু اَنَّ-এর উহ্য খবরের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে لَمَا يَتَفَجَّرُ-এর লামটি তাকীদবাচক; তারকীবে এর কোনো স্থান নেই। مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ অংশটুকু মাওসূল-সেলাহ মিলে اِنَّ-এর ইসম হয়েছে وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ এবং وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ বাক্য দুটি وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ বাক্যটির উপর আতফ হয়েছে الخ ... وَمَا اللّٰهُ বাক্যটি اِسْتِئْنَافِيَّة এবং وَمَا اللّٰهُ-এর مَا টি لَيْسَ-এর সমার্থক।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

تَعْمَلُوْن শব্দের কেরাত : ৭৪নং আয়াতে উল্লিখিত تَعْمَلُوْنَ শব্দে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) শব্দটিকে يَعْمَلُوْنَ (ي - যোগে) পড়েছেন।

খ. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে تَعْمَلُوْنَ (ت যোগে) পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ ..... وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

পূর্বের আয়াতগুলোতে বনী ইসরাঈলের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর বিধিবিধান পালনে হীলা বাহানা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করতো। এখন ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। তা হলো তাদের قَسْوَةُ الْقَلْبِ বা অন্তরের রূঢ়তা। সে সাথে এখানে তাদের উক্ত قَسْوَةُ الْقَلْبِ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা দিবা রাত্রি আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নবীর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করছ; কিন্তু তারপরও অন্তর নরম হয় না। এটা কেমন কথা!

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ ..... وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

ইহুদিদের অন্তর পাথরের চেয়ে কঠিন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন, তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন। কারণ এসব দলিল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও একজন বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে কাঠিন্য থাকা অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি নিদর্শন হৃদয় বিগলিত হওয়ার মতো ছিল।

বিশেষভাবে নিহতের জীবিত হওয়া এবং ঘাতকের নাম বলা একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এরূপ কুদরত দেখার পরও তাবদের মন বিগলিত হলো না এবং সত্য গ্রহণ করার প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হলো না। অথচ পাথর এত শক্ত হওয়ার পরও কতক পাথর থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, কতক পাথর ফেটে ঝরনা নির্গত হয়। আবার কতক পাথর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ সকল পাথর থেকেও কঠিন। [মা'আরিফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে ثُمَّ-এর অর্থ : ثُمَّ অব্যয়টি تَرَاخِي الزَّمَانِ বা কালের দূরত্ব বুঝায়। তবে আলোচ্য আয়াতে ثُمَّ-এর ব্যবহার مَجَاز হিসেবে اِسْتِبْعَاد-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এত সব দলিল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও একজন বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে কাঠিন্য থাকা অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি নিদর্শন হৃদয় বিগলিত হওয়ার মতো ছিল। বিশেষভাবে নিহতের জীবিত হওয়া ও ঘাতকের নাম বলা এক মহা বিস্ময়কর নিদর্শন।

مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অংশটি তাকীদ বুঝানোর জন্য : এটি اِسْتِبْعَاد-এর অধিক তাকীদ বুঝানোর জন্য এসেছে। কেননা ثُمَّ দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ দ্বারা ও তাই বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের পাষাণত্ব আরো প্রকট হওয়াকে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে।

একবচনের যমীরের বিপরীতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহারের কারণ : আলোচ্য আয়াতে فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ-এর মধ্যে هِيَ হলো একবচনের যমীর। কিন্তু هِيَ-এর مَرْجِعْ হলো قُلُوْب যা বহুবচন। এ জন্যেই مُشَبَّهْ بِهْ হিসেবে বহুবচনের শব্দ حِجَارَةٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

পাথরের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ: লোহা পাথরের চেয়ে শক্ত ও কঠিন। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ তারপরও আলোচ্য আয়াতে কাঠিন্যের ক্ষেত্রে ইহুদিদের অন্তরকে পাথরের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, লোহাকে আগুনে প্রজ্বলিত করলে লোহা নরম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পাথরকে কখনো কোনো ভাবে নরম করা যায় না। পবিত্র কুরআনে এসেছে وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিলাম। সেজন্য পাথরের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً-এর أو শব্দের অর্থ : أو কালিমাটি সন্দেহ প্রকাশের অর্থে ব্যবহার হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার কালামে সন্দেহ থাকা অসম্ভব। তাহলে আলোচ্য আয়াতে أَوْ শব্দটির অর্থ কী, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। যথা–

১. এখানে اَوْ অব্যয়টি অথবা অর্থে নয়; বরং তা بَلْ-এর সমার্থক।
২. اَوْ এখানে অনুমতির অর্থ প্রকাশ করছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে– তাদের হৃদয়কে পাথর মনে করা কিংবা তার চেয়েও কঠিন মনে করা উভয়টিই বৈধ ও যথার্থ।
৩. اَوْ অব্যয়টি تَوْزِيْع বা প্রকরণবোধক। এ অভিমতটি সর্বোত্তম। তখন অর্থ হবে তাদের হৃদয়গুলো দু'প্রকারের। যথা–
   ক. কিছু পাথরের ন্যায় কঠিন। খ. কিছু পাথরের চেয়েও অধিকতর কঠিন। [তাফসীরে মাজেদী : খ.১,পৃ. ১৩৮]

পাথরের শ্রেণিবিন্যাস ও তার উদ্দেশ্য : আয়াতে তিন প্রকারের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণিবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. কিছু পাথর থেকে এত বেশি পানি নির্গমণ হয় যা থেকে নদী–নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা সৃষ্টজীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এর চেয়েও কঠিন। ফলে সৃষ্টজীবের কষ্টে তাদের চোখ অশ্রু সজল হয় না।
২. কিছু পাথর থেকে কম পানি নিঃসরণ হয়। এ প্রকারের পাথর প্রথম প্রকারের পাথরের তুলনায় বেশি কঠিন হয়। আর ইহুদিদের অন্তর এর চেয়েও কঠিনতর।
৩. কিছু কিছু পাথর উপরিউক্ত দুই প্রকার পাথর থেকেও কঠিন। এসব পাথর থেকে কোনো প্রকারের পানি নির্গত হয় না। তবুও তা কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলার ভয়ে উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ তৃতীয় প্রকারের পাথর থেকেও কঠোর। তাদের অন্তরে কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রবেশ করে না।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ

ইস্তিয়ারায়ে মাকনিয়্যাহ তাবইয়্যাহ : আলোচ্য আয়াতে বহু নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও উপদেশ না মানার ক্ষেত্রে অন্তরের অবস্থাকে কঠিন পাথরের অবস্থার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এটাকে পরিভাষায় ইস্তি'আরায়ে মাকনিয়্যাহ তাবইয়্যাহ বলে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَشَدُّ قَسْوَةً

আধিক্য প্রকাশ : আলোচ্য অংশে সরাসরি اَلْقَسَاوَةُ মাসদার থেকে اِسْمُ التَّفْضِيْل ব্যবহার করে أَقْسٰى বলা যেত। কিন্তু তার পরিবর্তে এ বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে কঠোরতার ক্ষেত্রে আধিক্য বুঝানোর জন্য। কারণ أَشَدُّ قَسْوَةً অক্ষর সংখ্যা এবং কাঠামোগতভাবে বড়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

মাজাযে আকলী : আলোচ্য অংশে خَشْيَة-এর দিকে حِجَارَةٌ-এর ইসনাদটি মাজাযে আকলীর ভিত্তিতে হয়েছে।

٧٥. ﴿أَفَتَطْمَعُوْنَ﴾ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ أَيِ الْيَهُود ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ﴾ طَائِفَةٌ ﴿مِنْهُمْ﴾ أَحْبَارُهُمْ ﴿يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللهِ﴾ فِي التَّوْرَاةِ ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ﴾ يُغَيِّرُوْنَهُ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ﴾ فَهِمُوْهُ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ أَيْ لَا تَطْمَعُوْا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ بِالْكُفْرِ.

৭৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা কি আশা কর যে, তারা অর্থাৎ ইহুদিরা তোমাদের কথায় ঈমান নিয়ে আসবে? অথচ তাদের একদল এক সম্প্রদায় অর্থাৎ শিক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায় তাওরাতে আল্লাহ তা'আলার বাণী শ্রবণ করতো। অতঃপর হৃদয়ঙ্গম করার পর বুঝার পরও তা বিকৃত করতো পরিবর্তিত করে নিত অথচ তারা জানত যে তারা মিথ্যা রচনাকারী। أَفَتَطْمَعُوْنَ-এর هَمْزَةٌ টি অসম্মতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তোমরা এ ব্যাপারে আশাবাদী হয়ো না। কেননা তারা পূর্ব হতেই কুফরি করে আসছে।

٧٦. ﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ أَيْ مُنَافِقُوا الْيَهُوْد ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قَالُوْا اٰمَنَّا﴾ بِأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِيْ كِتَابِنَا ﴿وَإِذَا خَلَا﴾ رَجَعَ ﴿بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا﴾ أَيْ رُؤَسَاؤُهُمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنَافِقُوْا لِمَنْ نَافَقَ ﴿أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ﴾ أَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ أَيْ عَرَّفَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿لِيُحَآجُّوْكُمْ﴾ لِيُخَاصِمُوْكُمْ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُوْرَةِ ﴿بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ فِي الْآخِرَةِ وَيُقِيْمُوْا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِيْ تَرْكِ اتِّبَاعِهٖ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهٖ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ أَنَّهُمْ يُحَاجُّوْنَكُمْ إِذَا حَدَّثْتُمُوْهُمْ فَتَنْتَهُوا.

৭৬. আর তারা অর্থাৎ ইহুদি মুনাফিকরা যখন মুমিনগণের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ নবী। আর তাঁর সম্পর্কে আমাদের গ্রন্থে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যখন নিভৃতে ফিরে যায় এবং একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন তাদের ঐ নেতারা যারা মুনাফিকরূপেও ঈমান আনেনি, তারা এ মুনাফিকদেরকে বলে আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর যে গুণাবলি তোমাদের অবহিত করেছেন তোমরা কি তাদেরকে মুমিনগণকে তা বলে দাও? পরিণামে যেন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে বিবাদ করতে পারে لِيُحَاجُّوْكُمْ-এর لَام টি صَيْرُوْرَة বা শেষ পরিণাম অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। পরকালে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তার নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণ পরিত্যাগ করার বিষয়ে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এই কথা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। তোমরা কি অনুধাবন কর না যে, তাদেরকে যদি এ কথা বলে দাও তবে তোমাদের বিরুদ্ধে তারা সেটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করবে? তাই তোমাদের একাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

٧٧. قَالَ اللهُ تَعَالٰى ﴿أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ﴾ اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ ﴿أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ﴾ مَا يُخْفُوْنَ وَمَا يُظْهِرُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ فَيَرْعَوُوْا عَنْ ذٰلِكَ.

৭৭. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা কি জানে না প্রশ্নটি এ স্থানে تَقْرِيْر বা বক্তব্যের সুসাব্যস্তকরণের জন্য এসেছে। আর তৎপরবর্তী واو অক্ষরটি ব্যবহার হয়েছে عَطْف-এর জন্য। যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে। অর্থাৎ এ বিষয়েই হোক বা অন্য কোনো বিষয়েই হোক তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে সবকিছুই তিনি জানেন সুতরাং তারা যেন উক্ত কাজ হতে নিবৃত্ত হয়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : أَفَتَطْمَعُوْنَ . اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ

সম্বোধিত ব্যক্তি নির্ণয় : মুফাসসির (র.) اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে রাসূল ﷺ ও মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। অবশ্য কারো কারো মতে শুধু রাসূল ﷺ-ই হলেন সম্বোধিত ব্যক্তি। আর বহুবচনের সীগাহ সম্মানার্থে আনা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : يُحَرِّفُوْنَهٗ . يُغَيِّرُوْنَهٗ

يُحَرِّفُوْنَهٗ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) يُحَرِّفُوْنَهٗ -এর তাফসীর يُغَيِّرُوْنَه দ্বারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাওরাতের মধ্যে রাসূল ﷺ-এর যেসমস্ত গুণ ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে তারা পরিবর্তন করতো। যেমন তাওরাতে রাসূল ﷺ-এর গঠন প্রকৃতির বিবরণ এসেছে حَسَنُ الْوَجْهِ طَوِيْلٌ اَزْرَقُ الْعَيْنِ سَبْطُ الشَّعْرِ أَكْحَلُ الْعَيْنِ رَبْعَةٌ جَعْدُ الشَّعْرِ তদস্থলে তার লিখে দিল।

قَوْلُهٗ : يَعْلَمُوْنَ . أَنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ

মাফ'উল ও দ্বিরুক্তির সন্দেহ নিরসন : يَعْلَمُوْنَ ফে'লটি মুতা'আদ্দী। তাই তার মাফ'উলের দিকে ইঙ্গিত করে আলোচ্য অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত ইবারত দ্বারা দ্বিরুক্তির সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে যে, عَقَلُوْا ও يَعْلَمُوْنَ সমার্থক তারপরও শব্দ দুটি পাশাপাশি একই আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে উভয়ের মাফ'উল ভিন্ন হওয়ার কারণে। মূলরূপ হলো عَقَلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اِفْتِرَائَهُمْ; সুতরাং এখানে কোনো তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

قَوْلُهٗ : وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ

প্রশ্নের উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.)-এর মতে আলোচ্য আয়াতের أَفَتَطْمَعُوْنَ -এর মধ্যে প্রশ্নবোধক হামযাটি হলো, اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ (না-বাচক প্রশ্নবোধক হামযা) অর্থাৎ এ আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করে বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে- তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথা মানবে? অথচ তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল যারা জেনে-শুনে আল্লাহ তা'আলার কালাম বিকৃত করতো। এমন লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে আদৌ আশা নেই। তারা ঈমান আনবে না।

قَوْلُهٗ : وَاِذَا خَلَا . رَجَعَ . بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ

خَلَا শব্দের সেলাহ প্রসঙ্গ : خَلَا-এর صِلَه হিসেবে اِلٰى ব্যবহার হয় না। অথচ اِذَا خَلَا . رَجَعَ . بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ -এর মাঝে خَلَا-এর صِلَة হিসেবে اِلٰى-এর ব্যবহার হয়েছে। তাই মুফাসসির (র.) خَلَا-এর তাফসীর رَجَعَ-এর দ্বারা করে বুঝিয়েছেন যে, خَلَا শব্দের মাঝে رَجَعَ-এর অর্থ রয়েছে। তাই তার صِلَة হিসেবে اِلٰى অব্যয়ের ব্যবহার যথার্থ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : لِيُحَاجُّوْكُمْ لِيُخَاصِمُوْكُمْ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُوْرَةِ

লামের অর্থ বর্ণনা : আলোচ্য আয়াতে لَام لِلصَّيْرُوْرَة দ্বারা لَام لِلْعَاقِبَة উদ্দেশ্য। উক্ত ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে لَام টি تَعْلِيْل -এর জন্য নয়; বরং صَيْرُوْرَة তথা عَاقِبَةٌ বা পরিণাম বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ পাবে। لِيُحَاجُّوْكُمْ -এর মুতা'আল্লিক হলো تُحَدِّثُوْنَهُمْ-এর সঙ্গে, فَتَحَ اللّٰهُ -এর সঙ্গে নয়।

قَوْلُهٗ : عِنْدَ رَبِّكُمْ . فِى الْآخِرَة

তর্কের সময় নির্ণয় : মুফাসসির (র.) عِنْدَ رَبِّكُمْ -এর তাফসীর فِى الْاٰخِرَة দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ তর্ক- বিতর্ক বা তাদের বিরুদ্ধে দলিল কায়েম করা কেয়ামত দিবসে সংঘটিত হবে।

قَوْلُهٗ : اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ..... فَتَنْتَهُوْا

اِسْتِفْهَام -এর জবাব : মুফাসসির (র.) এ শব্দটি বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, اِسْتِفْهام -এর جوا-টি উহ্য রয়েছে। আর فَتَنْتَهُوْا টি جَوَابُ اِسْتِفْهَام হওয়ার কারণে نُوْن اِعْرَابِي বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো কোনো নুসখায় نُوْنِ اِعْرَابِيْ বহাল আছে। তখন এটি تَعْقِلُوْنَ -এর উপর عَطْف হবে।

قَوْلُهٗ : أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ ..... وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ

واو-টি এসেছে আতফস্বরূপ : যে وَاوٌ টি لَا يَعْلَمُوْنَ الخ -এর পূর্বে এসেছে তা عَطْف -এর জন্য। আর এর مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হলো أَلَا يَتَأَمَّلُوْنَ وَلَا يَعْلَمُوْنَ এর দ্বারা মুফাসসির (র.) বাক্যাংশটুকুর তারকীব বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি আল্লামা যামাখশারী (র.) -এর অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম সিবাওয়াইহের মতে, আলোচ্য অংশে কোনো উহ্য নেই। মূলরূপ ছিল- وأَلَا يَعْلَمُوْنَ الخ ; حَرْفُ الْاِسْتِفْهَام বাক্যের অগ্রভাগ দাবি করে বিধায় তাকে আগে নেওয়া হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ: শব্দবিশ্লেষণ

تَطْمَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহুছ معروف مضارع বাব سَمِعَ মাসদার اَلطَّمْعُ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা আশা করছ , তোমরা লোভ কর, লালায়িত হও, ভরসা রাখ। এখানে আশা-ভরসা অর্থে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর অর্থ করেছেন اَفَتَرْجُوْ يَا مُحَمَّد (হে মুহাম্মদ ! আপনি কি আশা পোষণ করছেন।) শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) امید ও থানভী (র.) تَوَقُّع অর্থে নিয়েছেন। দুটি শব্দের অর্থ- আশা-ভরসা।

يَرْعَوُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহুছ معروف مضارع বাব فَتَحَ মাসদার اَلْاِرْعَوَوْا মূলবর্ণ (ر - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- তারা বিরত থাকে। কোনো কোনো নুসখায় فَيَرْعَوُوْا-এর পরিবর্তে فَيَرْغَبُوْا আবার কোনো কোনো নুসখায় فَيَعْرَضُوْا عَنْ ذٰلِكَ রয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: أَفَتَطْمَعُوْنَ ..... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

حَرْفُ الْعَطْفِ একত্র হলে তারকীবের পদ্ধতিটি সূরা বাকারার ৪৪নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ ও أَفَتَطْمَعُوْنَ لَكُمْ فِىْ إِيْمَانِهِمْ مَنْصُوْب بِنَزْعِ الْخَافِضْ مُلরূপ হলো أَنْ يُؤْمِنُوْا অংশটুকু يُؤْمِنُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। وَقَدْ كَانَ..... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ পুরো অংশটুকু হাল হয়েছে। فَرِيْقٌ مِنْهُمْ অংশটুকু كَانَ-এর ইসম ও وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ..... يَسْمَعُوْنَ পুরো অংশটুকু كَانَ-এর খবর হয়েছে।

يُحَرِّفُوْنَه বাক্যটি يَسْمَعُوْنَ-এর উপর আতফ হয়েছে। مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ অংশটুকু মুতা'আল্লিক হয়েছে يُحَرِّفُوْنَهٗ-এর সাথে। وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অংশটুকু হাল হয়েছে। يُحَرِّفُوْنَ-এর ফায়েল থেকে।

قَوْلُهٗ : وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ ..... أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

قَالُوْا الخ শর্ত اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ الخ শর্ত لَقُوْا امَنَّا জাওয়াবে শর্ত। আর এমনিভাবে اِذَا হরফে শর্ত জাওয়াবে শর্ত بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ -এর মধ্যে مَا মওসূলা কিংবা মওসূফা অথবা মাসদারিয়া।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ ..... وَمَا يُعْلِنُوْنَ

প্রথমে أَ হরফে ইস্তেফহাম يَلُوْمُوْنَهُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। واو হরফে আতফ لَا يَعْلَمُوْنَ ফে'ল ও ফায়েল أَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, اَللّٰه ইসমে اَنَّ; يَعْلَم ফে'ল ও ফায়েল مَا মওসূলা يُسِرُّوْنَ জুমলা ফে'লিয়া হয়ে সেলাহ, ও মাওসূল মিলে মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ مَايُعْلِنُوْنَ মওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে يَعْلَمُ ফে'লের মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّه হয়ে খবরে اَنَّ; اَنَّ তার ইসম ও খবর মিলে لَا يَعْلَمُ-এর মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّه হয়ে মা'তূফ আলাইহি। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে جُمْلَة مُسْتَانِفَة

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ : تَعَالٰى : يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ

كَلَام শব্দের লিখনশৈলী : ৭৫ নং আয়াতে উল্লিখিত كَلَام শব্দের দু'টি লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির لَام বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফ যোগে كَلَام লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির لام বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে كَلٰم লিখিত হয়।

تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اَىْ مُنَافِقُوالْيَهُوْدِ

مُنَافِقُوْا শব্দের লিখনশৈলী : ৭৬নং আয়াতের তাফসীর অংশে مُنَافِقُوا শব্দে দু'ধরনের নুসখা পাওয়া যায়।

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি مُنَافِقُوْنَ অর্থাৎ আলিফসহ লেখা আছে।

খ. নিয়ম অনুযায়ী বহুবচনের শুধু نُوْن বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই আলিফ ব্যতীত مُنَافِقُو হবে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوا ..... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের قَسْوَةُ الْقَلْبِ বা অন্তরের রূঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঐ সকল মুসলমানকে সম্বোধন করা হচ্ছে যারা দয়াপরবশ হয়ে ইহুদিদেরকে বহু সময় নসিহত করতো এবং সদা এ আশা পোষণ করতো যে, কোনোভাবে তারা ঈমান গ্রহণ করে নিক। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আকাঙ্ক্ষা ও কামনা বর্জন করার জন্য বলেছেন; কারণ ইহুদিদের অন্তর কঠোরতা ও রূঢ়তার চূড়ান্তে উপনীত হয়েছে। সুতরাং তাদের ঈমান গ্রহণের আশা করা বৃথা চেষ্টা মাত্র।

قَوْلُهُ تَعَالٰى: أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ ..... وَمَا يُعْلِنُوْنَ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ আয়াতে বলা হয়েছে, ইহুদি ও মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার আশঙ্কায় মুমিনদের সম্মুখে তাওরাতে নবী করীম ﷺ এর সত্যতার স্বীকারোক্তির ব্যাপারে একে অন্যকে ভর্ৎসনা করেছে। তাদের ধারণা ছিল এভাবে গোপন করার দ্বারা আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে কোনো দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না। তাই اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ আয়াতে তাদের সে ধারণা সম্পর্কে ধমক দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই তো মহান আল্লাহর গোচরীভূত।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى: أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوا ..... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের সাথে ইহুদিদের মৈত্রী ছিল, একইভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীও ছিল। ফলে আনসাররা কামনা করতো ,ইহুদিগণ যেন ইসলাম গ্রহণ করে । তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ .... أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

ইহুদিদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যারা সকালবেলা নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করতো। মুসলমানদের সাথে উঠাবসা করতো। আপন প্রভাব বাড়াতে তাওরাতে বর্ণিত রাসূল ﷺ এর গুণাবলি ও নিদর্শনাবলি প্রকাশ করে দিত। অনন্তর সন্ধ্যায় ফিরে মানব-শয়তান উবাই ও কা'ব ইবনে আশরাফের মতো নেতৃস্থানীয়দের দরবারে বসলে তারা ভর্ৎসনা করে বলত, বোকার দল! তোমরা তোমাদের জ্ঞান গরিমা ও তাওরাতের জ্ঞান দিতে গেলে কেন ওদেরকে ? এই মুসলমানগণ কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। বলবে এই ইহুদি সম্প্রদায় আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি তাওরাত খুলে দেখিয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ .... الخ.

فَرِيْقٌ-এর উদ্দেশ্য নির্ণয় : وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ .... الخ বলে আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের কোন দলকে বুঝনো হয়েছে, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর তূর পর্বতে গমনকারী বনী ইসরাঈলের ৭০ জন ব্যক্তির দলটি উদ্দেশ্য। তারা আল্লাহর বাণী শোনার জন্য হযরত মূসা (আ.) এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে স্বজাতির নিকট মহান আল্লাহর বাণীর অপব্যাখ্যা করে বলত যে, আল্লাহর শেষ কথা আমরা শুনেছি যে, এসব বিধান তোমরা যদি পালন করতে সক্ষম হও তবে পালন করবে, অন্যথায় তোমাদের পালন না করারও অনুমতি আছে। সেক্ষেত্রে كَانَ-এর অর্থ হবে ছিল। অর্থাৎ তখন এর দ্বারা ইহুদিদের পূর্বপুরুষের অতীতকালীন কর্মকাণ্ড উদ্দেশ্য হবে।

২. মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা তাওরাত বুঝানো হয়েছে, আর বিকৃতি সাধন বলতে এর মাঝে শব্দের ও অর্থের ক্ষেত্রে বিকৃতি সাধন বুঝানো হয়েছে আর এর দ্বারা ইহুদি পণ্ডিতগণ উদ্দেশ্য। কারণ তারা রজম ও মুহাম্মদ ﷺ এর গুণাবলি সম্পর্কিত তাওরাতের বিবরণ বিকৃত করতো। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ১৫]

সেক্ষেত্রে كَانَ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর যুগের ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

ইহুদিদের তিনটি দলের বর্ণনা : উপরিউক্ত দুটি আয়াতে ইহুদিদের তিনটি দলের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই তিন ধরনের ইহুদিদের ব্যাপারে ঈমান গ্রহণের আশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যথা–

১. يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰه .... وهُمْ يَعْلَمُوْنَ অংশটুকু দ্বারা প্রথম দলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এরা হলো ইহুদি পণ্ডিতগণ যারা রাসূল ﷺ ও রজমসংক্রান্ত তাওরাতের বিধিবিধান বিকৃত করতো।

২. وَإِذَا لَقُوا..... قَالُوْا اٰمَنَّا অংশটুকু দ্বারা ইহুদিদের দ্বিতীয় দলটির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এরা ছিল ইহুদি মুনাফিক। এদের সর্দার ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই।

أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ..... قَالُوْا أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ অংশটুকু দ্বারা ইহুদিদের তৃতীয় দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরা ছিল প্রকাশ্য কাফের ইহুদি সম্প্রদায়।

পুনরুক্তির সন্দেহ নিরসন : وَإِذَا لَقُوا..... قَالُوْا اٰمَنَّا অংশটুকু সূরা বাকারার ১৪নং আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও ইহুদি মুনাফিকদের সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা কেউ কেউ তাকরারের আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু এ আপত্তি গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ সূরা বাকারার ১৪নং আয়াতে মুসলমানদের সাথে মুনাফিকদের আচার-আচরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ স্থানে তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যেহেতু উদ্দেশ্য বদলে গেছে। তাই পুনরুক্তির সন্দেহ করা ঠিক হবে না।

ইহুদি পণ্ডিতদের জ্ঞান গভীরতা : যেন এ নির্বোধেরা মনে করছিল যে, ইসলামের রাসূল ﷺ ও ইসলামের অনুসারীরা যা কিছু [ধর্মীয়] জ্ঞান অর্জন করবে, তা শুধু ইহুদিদের বলে দেওয়ার সূত্রেই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোনো সূত্র তাদের জন্য নেই। ইলম ও জ্ঞানের এসব দরজা তাদের জন্য রুদ্ধ। তাদের এ দ্বিবিধ অজ্ঞানতার অজ্ঞতা (جَهْلِ مركَّبْ) ঠিক তদ্রূপ, যেমন বর্তমানে গোটা ফিরিঙ্গি সমাজ [পশ্চাত্যবাসী] অজ্ঞানতার আধাঁরে নিমজ্জিত। এ বিশেষ অজ্ঞরা কুরআন শরীফ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে লাগলে প্রথমে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয় যে, কুরআনে যা কিছুই উল্লিখিত হয়েছে, তা ইহুদিদের প্রচলিত তাওরাত ও খ্রিষ্টানদের প্রচলিত ইঞ্জীল এবং এ ধরনের অন্যান্য মানব রচিত সূত্র হতেই আহরিত ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং এতে কোনো অদৃশ্য জাগতিক সংযোগ-সহায়তা ওহী ও ইলহাম [অন্তরে ঐশী বাণীর উদ্ভাসন] জাতীয় কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনাও নেই।

তর্কের সময়কাল নির্ণয় : لِيُحَاجُّوْكُمْ-এর একটি অর্থ হলো, এরা কেয়ামতের দিন তোমাদের স্বীকারোক্তি দানে বাধ্য করবেন। মুফাসসিরগণের অনেকেই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। তবে কোনো কোনো মুফাসসির এর মতে এ অর্থ হবে- এ দুনিয়াতেই তোমাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ দাঁড় করিয়ে দেবে। কেননা প্রথমত ইহুদিরা তো আখেরাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী ছিল না। দ্বিতীয়ত সেখানে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তো এ ধরনের বাহ্যিক উপাদানের প্রয়োজনও নেই। সেখানে তো সব প্রমাণ উন্মোচিত হবে। এজন্যই এখানে যেন আল্লাহ তা'আলার কিতাব দ্বারা প্রমাণ পেশ করাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তথা عِنْدَ رَبِّكُمْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

তিবাক : আলোচ্য অংতটিতে يُسِرُّوْنَ ও يُعْلِنُو দুটি বিপরীতার্থবোধক শব্দ একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে বালাগাতের পরিভাষায় اَلطِّبَاق বলা হয়। এটি اَلْمُحَسَّنَاتُ الْبَدِيْعِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত।

٧٨.﴿وَمِنْهُمْ﴾ أَيِ الْيَهُوْدُ ﴿أُمِّيُّوْنَ﴾ عَوَامٌّ ﴿لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ﴾ اَلتَّوْرَاةَ ﴿إِلَّا﴾ لٰكِنْ ﴿أَمَانِيَّ﴾ أَكَاذِيْبَ تَلَقَّوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوْهَا ﴿وَإِنْ﴾ مَا ﴿هُمْ﴾ فِيْ جَحْدِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُوْنَهُ ﴿إِلَّا يَظُنُّوْنَ﴾ ظَنًّا وَلَا عِلْمَ لَهُمْ.

৭৮.তাদের ইহুদিদের মধ্যে কতক রয়েছে নিরক্ষর সাধারণ মানুষ اِلَّا টি لٰكِنْ -এর অর্থে। কিছু মিথ্যা আশা ব্যতীত যা তারা তাদের পণ্ডিতদের নিকট হতে লাভ করে থাকে অনন্তর তারা এতে আস্থা পোষণ করে, কিতাব অর্থাৎ তাওরাত সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকার করা এবং তাদের অন্যান্য মনগড়া বিষয়ে তারা কেবল এ স্থানে اِنْ শব্দটি مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মিথ্যা ধারণা করে বেড়ায়, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো সঠিক জ্ঞান নেই।

٧٩.﴿فَوَيْلٌ﴾ شِدَّةُ عَذَابٍ ﴿لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ﴾ أَيْ مُخْتَلِقًا مِنْ عِنْدِهِمْ ﴿ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ مِنَ الدُّنْيَا وَهُمُ الْيَهُوْدُ غَيَّرُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ فِي التَّوْرَاةِ وَآيَةَ الرَّجْمِ وَغَيْرَهَا وَكَتَبُوْهَا عَلٰى خِلَافِ مَا أُنْزِلَ ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ﴾ مِنَ الْمُخْتَلَقِ ﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ﴾ مِنَ الرُّشٰى.

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি তাদের জন্য যারা নিজ হস্তে কিতাব রচনা করে অর্থাৎ নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যারোপ করে অতঃপর দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ের জন্য বলে এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে । তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলি এবং রজম ও এই ধরনের অন্যান্য আয়াতসমূহ তারা পরিবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতারিতের বিপরীত কথা লিখে রাখত। তাদের হাত যা মনগড়া বিষয় রচনা করে তার জন্য কঠিন শাস্তি এবং তারা যা অর্থাৎ যে ঘুষ ইত্যাদি উপার্জন করে তদ্দরুন তাদের কঠিন শাস্তি।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَمِنْهُمْ اَىْ الْيَهُوْدِ . اُمِّيُّوْنَ . عَوَامٌّ

اُمِّيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : আরবে اُمِّيُّوْنَ বলে তো আরব জাতিকে বুঝানো হয়। কেননা اَلْاُمَّةُ الْاُمِّيَّةُ আরবদেরকেই বলা হয়। তবে এখানে اُمِّيُّوْنَ দ্বারা সাধারণ ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। এজন্যেই মুফাসসির (র.) عَوَام শব্দ দ্বারা এর তাফসীর করেছেন। কারণ اَحْبَارُ الْيَهُوْد বা ইহুদি পণ্ডিত ব্যতীত সকলকেই عَوَام বলা হয়।

قَوْلُهٗ : إِلَّا . لٰكِن

ইস্তিছনার প্রকার বর্ণনা : لٰكِنْ বলার দ্বারা اِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِع -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এটি اِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعْ হওয়ার কারণ হলো, এখানে মুস্তাছনা তথা اَمَانِى মুস্তাছনা মিনহু তথা কিতাবের جِنْس নয়। কেউ কেউ ইস্তিছনাটিকে মুত্তাসিল বলেছেন। তখন অর্থ হবে- لَا يَقْرَأُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّا قِرَاءَةً عَارِيَةً عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْنٰى

قَوْلُهٗ : أَمَانِيَّ . أَكَاذِيْبَ ..... الخ

اَمَانِىَّ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এখানে أَكَاذِيْبَ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, أَمَانِيَّ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব বস্তু, যেগুলো তারা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতো। আর পরবর্তী ظَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব বস্তু যেগুলো তারা নিজেরা রচনা করতো।

قَوْلُهٗ : وَإِنْ ـ مَا

إِنْ -এর অর্থ বর্ণনা : এটি ان-এর তাফসীর। মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে إِنْ টি نافية যার অর্থ- مَا; إِنْ নাফিয়া জুমলায়ে ইসমিয়া ও ফে'লিয়া উভয় প্রকার বাক্যের উপর আসে। جُمْلَه اِسْمِيَّه-এর উদাহরণ إِنْ هُمْ إِلاَّ ইত্যাদি। আর جُمْلَه فِعْلِيَّه-এর উদাহরণ إِنْهُمْ إِلاَّ يَخْرُجُوْنَ ও يَظُنُّوْن إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ

قَوْلُهٗ : فَوَيْلٌ ـ شِدَّةُ عَذَابٍ

وَيْلٌ-এর অর্থ : মুফাসসির (র.) وَيْلٌ-এর ব্যাখ্যা شِدَّةُ عَذَابٍ দ্বারা করেছেন হযরত ইবনে আব্বস (রা.)-এর অনুসরণে। রঈসুল মুফসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে- اَلْوَيْلُ الْوَادِيْ فِيْ جَهَنَّمَ لَوْ سِيْرَتْ فِيْهِ الْجِبَالُ لَاَنْمَاعَتْ وَلَذَابَتْ مِنْ حَرِّهٖ
অর্থাৎ وَيْل হলো জাহান্নামের এমন একটি উপত্যকা, যেখানে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তার উষ্ণতায় তা বিগলিত হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : بِاَ يْدِيْهِمْ أَىْ مُخْتَلِقًا مِنْ عِنْدِهِمْ

হাত দিয়ে রচনার ব্যাখ্যা : লেখা তো হাত দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তারপরও يَكْتُبُوْنَ-এর পরে بِاَيْدِيْهِمْ-এর উল্লেখ করা হয়েছে তাকীদস্বরূপ। যেমন- وَلاَ طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ আয়াতে بِجَنَاحَيْهِ হলো طَائِر -এর তাকীদ। মুফাসসির (র.) বলেন যে, بِاَيْدِيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مِنْ عِنْدِهِمْ অর্থাৎ তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে রচনা করতো।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দ বিশ্লেষণ

اُمِّيُّوْنَ : এটি اُمِّيٌّ-এর বহুবচন। যার অর্থ- وهُوَ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ ولاَ يَكْتُبُ তথা উম্মী বলা হয়, যে ব্যক্তি লেখাপড়া জানে না। কেউ কেউ বলেন اُمُّ الْقُرٰى-এর দিকে নিসবত করে উম্মী বলা হয়। কেননা মক্কার অধিবাসীরা পড়ালেখা জানত না। আর কারো কারো মতে শব্দটি اُمّ-এর দিকে নিসবতকৃত। যেহেতু নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞানের ক্ষেত্রে মায়ের জন্ম দেওয়া নবজাতকের মতো, তাই তাকে اُمِيّ বলা হয়। শব্দটি দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিশেষিত করা হলে তা দ্বারা নিন্দা উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ-এর দিকে নিসবত করা হলে তা দ্বারা প্রশংসা উদ্দেশ্য।

اَمَانِيَّ : শব্দটি বহুবচন। একবচনে اُمْنِيَّةٌ; اَفْعُوْلَة -এর ওযনে। اُمْنِيَّة মূলত اُمْنُوْيَة ছিল مَرْمِيٌّ -এর কায়েদা অনুযায়ী তালীল হয়েছে। এর মূল অর্থ مَا يَقْدِرُهُ الْاِنْسَانُ فِيْ نَفْسِهٖ مِنْ مُنى قَدْرٍ অর্থাৎ মানুষ নিজ মনে যে আশা লালন করে। পড়া বা বলার আগে যেহেতু বর্ণের কল্পনা করে নিতে হয় তাই اُمْنِيَّةَ-এর এক অর্থ পড়া। যেমন اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ আরেক অর্থ মিথ্যা বলা। কারণ মিথ্যা বলার আগে চিন্তা করে অবাস্তব বিষয় তৈরি করতে হয়। যেমন হযরত উসমান (রা.) বলেন- مَا تَغَنَّيْتُ وَمَا تَمَنَّيْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ

تَلَقَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مطلق معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّلَقِّىُ মূলবর্ণ (ل.ق.ي) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা লাভ করল, তারা শিখে নিল।

يَخْتَلِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার الْاِخْتِلَاقُ মূলবর্ণ (خ.ل.ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা রচনা করে, তারা আবিষ্কার করে।

الظَّنَّ : ظن শব্দের অর্থ- আন্দাজ করা, অনুমান, সন্দেহ। এর প্রয়োগ কখনো অকাট্য দলিল দ্বারা নিশ্চিত জানার বিপরীতও হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রমাণ ছাড়া ইলমকে অথবা অশুদ্ধ দলিল দ্বারা জানাকে কিংবা অকাট্য দলিলহীন ইলমকেও ظَنّ বলা হয়।

وَيْلٌ : আরবি ভাষায় শব্দটি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন- وَيْحٌ ও وَيْسٌ ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। ইমাম আহমদ (র.), ইমাম তিরমিযী (র.) এবং ইমাম আবূ ইয়ালা (র.) প্রমুখ যে রেওয়ায়েত দ্বারা এটাকে দোজখের কূপ বলেছেন অথবা ইবনে জারীর (র.) দোজখের পাহাড় বলেছেন, এ সবগুলোতেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি প্রকাশ হচ্ছে তাই সব অর্থই শুদ্ধ।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ ..... إِلَّا يَظُنُّوْنَ

اَلْكِتَابَ হরফে আতফ وَ হলো مِنْهُمْ-এর অর্থে মুবতাদা। أُمِّيُّوْنَ মাওসূফ لَا يَعْلَمُوْنَ ফে'ল ও ফায়েল মুস্তাছনা মিনহু إِلَّا হরফে ইস্তেছনা أَمَانِيَّ মুস্তাসনা মুনকাতি। মুস্তাছনা মিনহু ও মুস্তাছনা মিলে মাফ'উলে বিহী لَا يَعْلَمُوْنَ ফে'ল ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হয়ে أُمِّيُّوْنَ-এর সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে মা'তূফ আলাইহি হয়েছে। وَ হরফে আতফ اِنْ হরফে নাফী هُمْ মুবতাদা إِلَّا হরফে হসর يَظُنُّوْنَ ফে'ল যমীর ফায়েল اَلَّا بَاطِيْل মাফ'উলে বিহী আওয়াল মাহযূফ حَقًّا মাফ'উলে বিহী ছানী মাহযূফ। يَظُنُّوْنَ ফে'ল স্বীয় ফায়েল এবং উভয় উহ্য মাফ'উল মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে আতফ হয়েছে وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ -এর উপর।

قَوْلُهُ تَعَالٰى: فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ..... وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ

وَيْلٌ শব্দটি মুবতাদা। সাধারণত মুবতাদার জন্য মারেফা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে وَيْلٌ শব্দটি নাকেরা হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হতে পেরেছে। কারণ এখানে বাক্যটি দ্বারা دُعَاء উদ্দেশ্য যেমনিভাবে سَلَامٌ عَلَيْكَ বলা বৈধ। لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ ..... ثَمَنًا قَلِيْلًا পুরো অংশটুকু উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর হয়েছে। পরবর্তী فَوَيْلٌ -গুলোর ক্ষেত্রেও একই তারকীব প্রযোজ্য।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ ..... وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ

পূর্বের আয়াতগুলোতে ইহুদি কিতাবধারী শিক্ষিত লোকদের আলোচনা ছিল। আলোচ্য দুটি আয়াতে প্রথম আয়াতে মূর্খ ও সাধারণ লোকদের অবস্থা চিত্রায়িত হচ্ছে। দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় তাদের আলেমদের মন্দ স্বভাবের বর্ণনা করা হচ্ছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ .... وَاِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ

ইহুদিদের কাল্পনিক ধ্যানধারণা : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْن .... আয়াতটিতে ইহুদিদের চতুর্থ দল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরা হলো সাধারণ ইহুদি লোকজন। তাদের তো খবরই ছিল না তাওরাতে কী লেখা আছে? তাদের ছিল কেবল কিছু মিথ্যা আশা, যা তাদের পণ্ডিতরা তাদের বলত। যেমন জান্নাতে ইহুদি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন ইত্যাদি।

قَوْلُه اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْن

ইহুদিদের মিথ্যা আশাগুলো হলো- আমাদের পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ আমাদের ক্ষমা করিয়ে দিবেন, আমরা তো আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট প্রিয়জনদের সন্তান, আমাদের কীসের চিন্তা! ইত্যাদি। এ ধরনের ভিত্তিহীন ও আজেবাজে ধ্যানধারণা তারা পোষণ করত। এ অবস্থা সাধারণ ইহুদিদের। এসব লোক 'পশুতুল্য' না লিখক, না পাঠক; বাপ-দাদার তালুকদারীর ধ্বজাধারি নিজেদের কল্পনার তৈরি খোশখেয়ালী ও মনে মনে পোলাও খেতে অভ্যস্ত ও কল্পনাভিলাষে গা ভাসিয়ে দিতে আত্মহারা ছিল। ইঞ্জীলে কোথাও মাসীহ ঈসা (আ.)-এর জবানীতে এবং কোথাও [পোপ] পল এর মুখে ইহুদিদের এ ধরনের অলীক কল্পনামত্ততার কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৪]

اَمَانِيَّ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত اَمَانِيَّ-এর দুটি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. এরা শুধু তাদের কতগুলো মিথ্যা বাসনাকে লালন পালন করতে থাকে। বাস্তবতা ও তথ্যনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যেগুলোর কোনো সংযোগ নেই। [তাফসীরে কাবীর, ইবনে জারীর]

২. মিথ্যা বিবরণ অপ্রামাণ্য ও অবাস্তব কল্প কাহিনীতে নিমগ্ন থাকে। অধিকাংশ তাফসীরকার হতে এ অর্থ উদ্ধৃত হয়েছে, বিভিন্ন মিথ্যা [অবাস্তব] উক্তি, যা তারা তাদের বিদ্বানদের নিকট হতে শুনে অন্ধ অনুকরণ করে তা উদ্ধৃত করেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ ..... وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ

নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের কর্মকাণ্ড : আলোচ্য আয়াতে বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরা সে সকল লোক যারা তাদের মূর্খ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে লিখে দিত এবং তা মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী বলে চালিয়ে দিত। যেমন নবী করীম ﷺ-এর দেহ মোবারকের গঠন তাওরাতে এ শব্দগুলো দ্বারা লেখা ছিল حَسَنُ الْوَجْهِ. جَعْدُ الشَّعْرِ. كُحْلُ الْعَيْنِ. رَبْعَةٌ [সুন্দর চেহারা, কোকড়ানো চুল, সুরমা চোখ, মধ্যম দেহ] এ শব্দগুলো পরিবর্তন করে তারা লিখেছে طَوَالٌ. أُزْرَقُ. سَبْطُ الشَّعْرِ [লম্বা দেহ, নীল চোখ ও সোজা চুলবিশিষ্ট] এমনিভাবে জেনার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা ছিল। এ হুকুমকে তারা جَلْدٌ তথা বেত্রাঘাত এবং تَسْوِيْدٌ অর্থাৎ মুখে কালি মাখা দ্বারা পাল্টে দিয়েছে।

বিকৃতি করার পদ্ধতি : ইহুদিরা هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ বলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কীভাবে মিথ্যারোপ করতো, তার বিবরণ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে।

১. তাওরাতে রাসূল ﷺ এর যেসব গুণ ও চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তারা তার বিপরীত রচনা করে তা আরবে প্রচার করতো এবং তাওরাতের মূল কপি গোপন করে রাখত। রাসূল ﷺ সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তারা সে বিকৃত কপিটি বের করে বলত– هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

২. তারা তাওরাতের শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি করতো না; বরং ব্যাখ্যার মধ্যে পরিবর্তন করতো এবং সে মর্মটি আল্লাহর দিকে নিসবত করতো।

আলোচ্য আয়াতে ثَمَنٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে ثَمَنٌ শব্দটি শুধু নগদ অর্থ ও বিনিময় মূল্যই বুঝায় না; বরং আল্লাহ তা'আলার বাণীর বিনিময়ে সম্মান, নেতৃত্ব সহ যা কিছু পাওয়া যায় তাকেও ثَمَنٌ বুঝায়। ইমাম রাগেব (র.) বলেন كُلُّ مَا يَحْصُلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُه অধিকাংশ মুফাসসিরও এখানে ثَمَنٌ শব্দের ব্যাপক অর্থ তথা যে কোনো পার্থিব বিনিময় অর্থে গ্রহণ করেছেন। ثَمَنٌ দ্বারা এখানে পার্থিব উপকরণই বুঝানো হয়েছে।

مِمَّا يَكْسِبُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : (তারা যা অর্জন করতো); তারা কী অর্জন করতো এ ব্যাপারে দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং দুটি ব্যাখ্যাই স্বস্থানে সঠিক।

১. তাদের পাপের ভাণ্ডার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা তাদের কর্মতৎপরতা দ্বারা নিজেদের পাপের স্তূপ বাড়িয়ে চলছে।

২. তাদের স্বার্থান্ধ তাপ্রসূত বিকৃতি ও [তাদের ভাষায়] কল্যাণপ্রসূ মিথ্যার বদৌলতে যা আর্থিক স্বার্থ [ঘুষ] হাসিল করে। সেটাই এখানে উদ্দেশ্য।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি বিধান :

কুরআন বেচাকেনার বিধান : এখানে কোনো কোনো আহলে যাহের আলেম বাহ্য শব্দ থেকে এরূপ বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনের কপি বেচাকেনা উভয়ই নাজায়েজ। কিন্তু চার মাযহাবের ইমামগণের মতে কুরআন বেচাকেনা বৈধ। কেননা এখানে বেচাকেনা হয়ে থাকে কাগজ, অনুলিখন, মুদ্রণ ইত্যাদির বিনিময়ে। আল্লাহ তা'আলার আয়াত তো কেউ বেচাকেনা করে না।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ..... فَوَيْلٌ لَّهُمْ

তাকরার : আলোচ্য আয়াতে وَيْلٌ শব্দটি তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে ইহুদিদের হীনকর্মকাণ্ডগুলোর শাস্তির ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ

ইতনাব : আলোচ্য অংশটিতে اَيْدِيْهِمْ অংশটুকু বর্ণনা করার দ্বারা اِطْنَاب করা হয়েছে। কারণ লেখা হয় হাত দিয়েই। এ ইতনাবের উদ্দেশ্য হলো, মাজাযের সম্ভাবনা দূরীভূত করে বিষয়টিকে আরো দৃঢ়তর করে তোলা।

৮০. রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেন, তখন তারা বলে কিছুতেই আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না আক্রান্ত করবে না আমাদেরকে অল্প গুটিকয়েক দিন ব্যতীত তাদের পূর্বপুরুষদের বাছুরপূজার সমপরিমাণ সময় অর্থাৎ চল্লিশ দিন। এর পর আজাব দূর হয়ে যাবে হে মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে বলুন তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এ বিষয়ে কোনো চুক্তি অঙ্গীকার নিয়েছ اَتَّخَذْتُمْ শব্দটিতে প্রশ্নবোধক হামযা এর উল্লেখই যথেষ্ট হওয়ার কারণে هَمْزَةُ الْوَصْل টি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না? না, বস্তুত এমন কোনো চুক্তি হয়নি বরং اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহার হয়েছে আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তোমরা এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না।

৮১. নিশ্চয় জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং সেখানে তোমরা সদাসর্বদা অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি পাপকার্য শিরক করে এবং যার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে خَطِيْئَةٌ শব্দটির এবচন ও বহুবচন উভয়রূপ পাঠই রয়েছে। অর্থাৎ তা তার উপর প্রবল হয়ে যায় এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে ফেলে। এভাবে যে মুশরিকরূপে তার মৃত্যু হলো। বস্তুত তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে। اُوْلٰئِكَ هُمْ ـ خَالِدُوْنَ এ শব্দগুলো مِنْ-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

৮২. আর যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎ কাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

٨٠. ﴿وَقَالُوْا﴾ لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِيُّ النَّارَ ﴿لَنْ تَمَسَّنَا﴾ تُصِيْبَنَا ﴿النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً﴾ قَلِيْلَةً أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ آبَائِهِمْ الْعِجْلَ ثُمَّ تَزُوْلُ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ﴿أَتَّخَذْتُمْ﴾ حُذِفَتْ مِنْهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ اِسْتِغْنَاءً بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ ﴿عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا﴾ مِيثَاقًا مِنْهُ بِذٰلِكَ ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ﴾ بِهٖ لَا ﴿أَمْ﴾ بَلْ ﴿تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾.

٨١. ﴿بَلٰى﴾ تَمَسَّكُمْ وَتُخَلَّدُوْنَ فِيْهَا ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ شِرْكًا ﴿وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ﴾ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ أَيْ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ وَأَحْدَقَتْ بِهٖ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ﴿فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ رُوْعِيَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ.

٨٢. ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : لَنْ تَمَسَّنَا ـ تُصِيْبَنَا

تَمَسَّنَا-এর ব্যাখ্যা : تُصِيْبَنَا এটি تَمَسَّنَا-এর ব্যাখ্যা। মূলত مَسَّ বলা হয় কোনো বস্তুর চামড়ার সাথে এমনভাবে মিলিত হওয়া যে, স্পর্শশক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এর জন্য اِصَابَةٌ হলো অপরিহার্য। মুফাসসির (র.) তাই এখানে এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : أَتَّخَذْتُمْ ـ حُذِفَتْ مِنْهُ ... الخ

أَتَّخَذْتُمْ -এর মূলরূপ বর্ণনা : أَتَّخَذْتُمْ-এর মূলরূপ ছিল- أَاِتَّخَذْتُمْ; প্রথমটি হলো همزة الاستفهام আর দ্বিতীয়টি হলো همزة الوصل; আর এখানে هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ -আসার কারণে আর همزة الوصل-এর প্রয়োজন থাকেনি। তাই সেটাকে হযফ করা হয়েছে। আলোচ্য ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) এই মূলরূপ এবং পরিবর্তনের পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

তাফ.জালালাইন (প্রথম খণ্ড) বাংলা-২৪৮-ক

قَوْلُهٗ : فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ بِهٖ لَا ، اَمْ ـ بَلْ

এ স্থানে اَمْ মুনকাতিয়াহ بَلْ-এর অর্থে ব্যবহৃত এবং হামযায়ে এস্তেফহাম اِتَّخَذَ-কে অস্বীকার করার জন্য আর بَلْ-এর অর্থ– বিরত রাখা ও স্থানান্তরের জন্য। তাই মুফাসসির (র.) হামযার উত্তর উহ্য لَا نافية দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। যেন হামযার অধীনে نَفِيْ এবং اَمْ-এর অধীনে اِثْبَات রয়েছে।

قَوْلُه : بَلٰى ..... تَمَسُّكُم

بَلٰى-এর অর্থ প্রকাশ : بَلٰى ব্যবহার হয় نَفِيْ-এর জবাবে সে বিষয়টিকে জোরালোভাবে প্রমাণিত করার জন্য। যেহেতু لَنْ تَمَسَّنَا এর মাঝে ইহুদিরা দীর্ঘ সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাকে নাকচ করে ছিল, তাই এখন আল্লাহ তা'আলা بلى-এর মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। মুফাসসির (র.) تَمَسُّكُمْ শব্দটি বৃদ্ধি করে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ـ شِرْكًا

سَيِّئَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর অনুসরণে سَيِّئَةٍ-এর ব্যাখ্যা شِرْكًا দ্বারা করেছেন সে সকল লোকদের আকিদা খণ্ডন করার জন্য যারা বলে, পাপী মুসলমান চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

قَوْلُهٗ : خَطِيْئَتُهٗ ـ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ

خَطِيْئَتُهٗ শব্দের কেরাত বর্ণনা : মুফাসসির (র.) এ অংশ বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে خَطِيْئَتُهٗ শব্দটির দু'টি কেরাত বর্ণিত রয়েছে। যথা خَطِيْئَتُه শব্দটি এক কেরাতে বহুবচনরূপে এবং অপর কেরাতে একবচনরূপে ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أَيْ اِسْتَوْلَتْ..... بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا

اَحَاطَتْ بِهٖ -এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা اَحَاطَتْ بِهٖ -এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির পাপরাশি তার উপর প্রবল হয়ে যায় তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং কোনো কল্যাণ তার মধ্যে অবশিষ্ট না থাকে এমনকি তার মধ্যে تَصْدِيْق بِالْقَلْبِ ও اِقْرَار بِاللِّسَانِ ও বাকি না থাকে। এরূপ ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তাদের পরিণাম হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

✪ حَلُّ لُغَاتُ الْأَلْفَاظ : শব্দবিশ্লেষণ

اَيَّامٌ : শব্দটি মূলত اِيْوَام ছিল يَوْمٌ -এর বহুবচন واو কে ياء বানিয়ে ياء-এর মধ্যে- اِدْغَام করা হয়েছে।

وَعَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مطلق معروف اثبات فعل ماضي বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ - اَلْوَعِيْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوي অর্থ– তিনি ভয় দেখালেন। وَعْدٌ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা–

১. প্রতিশ্রুতি দেওয়া এর মাসদার হলো اَلْوَعْدُ ـ اَلْعِدَةُ ـ اَلْمَوْعِدَةُ ইত্যাদি। যেমন– কুরআনে এসেছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّات

২. ধমক দেওয়া, ভয় দেখানো। সেক্ষেত্রে মাসদার হবে اَلْوَعِيْدُ যেমন-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا ..... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

لَنْ تَمَسَّنَا الخ জুমলা مفعول، اَلْاَيَّامُ যরফিয়্যাতের কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে كَسَبَ ফে'ল ও ফায়েল مَنْ মুবতাদা, اَصْحَابُ النَّارِ খবর। জুমলা জাওয়াবে শর্ত ان হামযায়ে এস্তেফহামের অর্থে اَيْ الْاَمْرَيْنِ كَائِنٌ এমতাবস্থায় اَمْ মুত্তাসিলা হবে। আর তা না হয় بَلْ অর্থে مُنْقَطِعَةٍ হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.... هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

واو হরফে আতফ اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল اٰمَنُوْا ফেল ও ফায়েল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاو হরফে আতফ وَعَمِلُوالصّٰلِحٰتِ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে খবর اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুবতাদা এর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়ে আতফ হয়েছে পূর্বের বাক্যের উপর।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে , ইহুদিরা তো কেবল বলেছি لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً এখানে তারা তো আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি । তারপরও اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الخ কী ভাবে বলা হলো?

উত্তর : যদিও তাদের একথা সরাসরি মিথ্যারোপ নয়; কিন্তু লাযেমীভাবে তাতে اِفْتِرَاء প্রামাণিত হয় । কেননা এ ধরনের নিশ্চয়তার সাথে আল্লাহর দিকে নিসবত না করে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না । যেন তারা আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করেই বলেছে যে, তিনি আমাদের কে কেবল অল্প কয়েকদিন আজাব দেবেন ।

قَوْلُه تَعَالٰى : بَلٰى مَنْ كَسَبَ ....اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

سَيِّئَةٌ ও خَطِيْئَةٌ-এর মাঝে পার্থক্য : سَيِّئَةٌ সাধারণত ঐ গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যা স্বেচ্ছায় করা হয় । আর خَطِيْئَةٌ-এর ব্যবহার অনিচ্ছাকৃত গুনাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । এ পার্থক্য অধিকাংশের ভিত্তিতে, অন্যথায় একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার হয়ে থাকে ।

পাপাচারী মুমিন ক্ষমার যোগ্য : اَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র সে সকল লোক যারা সম্পূর্ণই বাতিলপন্থি এবং তাদের মৃত্যুও কুফরি ও ধর্মহীন অবস্থায় হবে । পক্ষান্তরে মুমিন যতই পাপাচারী হোক না কেন, তারা কোনো অবস্থাই এ আয়াতের লক্ষ্য হবে না । কেননা অন্তত মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাসের স্তর তো তার আছেই । আহলুস সুন্নাতের সকল মনীষীই এখানে কুফর উদ্দেশ্য করেছেন । মুতাযিলা, খারেজী প্রভৃতি বাতিলপন্থি ফেরকা এ আয়াত দ্বারা পাপাচারী মুমিনের ক্ষমা না পাওয়ার প্রমাণ পেশ করে থাকে । তা স্পষ্টতই বাতিল । [তাফসীরে মাজেদী খণ্ড১, পৃষ্ঠা ১৪৮]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ..... وَالَّذِيْنَ..... اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ

فَاء উল্লেখ ও অনুল্লেখের কারণ : উল্লিখিত আয়াত দুটির প্রথমটিতে আর্থৎ জাহান্নামীদের পরিণতি বর্ণনায় اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ 'ফা' পরিণতিবোধক অব্যয় সহকারে এবং জান্নাতিদের ক্ষেত্রে فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ 'ফা' অব্যয় ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে । অথচ উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকারের বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । বর্ণনাভঙ্গির মাঝে এ পার্থক্যের কারণ কী, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বক্তব্য হলো, প্রথম فَاء যুক্ত ক্ষেত্রটি জাহান্নামিদের জন্য হুমকির । আর হুমকির ক্ষেত্রে তার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বিষয়টিতে অতিরিক্ত দৃঢ়তা বুঝানোর লক্ষ্যে একটি বর্ণ অধিক উল্লেখ করেছেন । আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি শুধু ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির, যাতে বিপরীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই । এজন্য 'ফা' বিহীন اُولٰئِكَ ই যথেষ্ট ।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى: اَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُهُ

ইস্তিয়ারা : আলোচ্য আয়াতটিতে خَطَايَا (গুনাহসমূহ) কে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে যারা চারদিক থেকে অবরোধ আরোপ করেছে । এখানে ইস্তিয়ারার জন্য اِحَاطَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, গুনাহের পরিমাণ ছওয়াবের চেয়ে বেশি ।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কবীরা গুনাহকারী কি সর্বদা জাহান্নামে থাকবে?

ক. চিরকালের জন্য	খ. কিছুকালের জন্য
بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُهُ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থ : হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই দোজখের অধিবাসী । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । [সূরা বাকারা : ৮১] এ আয়াতের সমর্থনে আরো তিনটি আয়াত রয়েছে । যথা–	وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থ : আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ । [সূরা তাওবা আয়াত ৭২] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে । যথা– সূরা যিলযাল, আয়াত– ৭

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
নিসা	১৪	জ্বিন	২৩
নিসা	৯৩		

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কবীরা গুনাহকারী সবসময় জাহান্নামে থাকবে । কারণ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর নাফরমানি করা, শরিয়তের সীমা অতিক্রম করা ও জেনেশুনে অন্যায়ভাবে কোনো মুমিন মানুষকে হত্যা করা এসব কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । যারা এসব কাজে লিপ্ত হবে তারা সর্বদা জাহান্নামে বসবাস করবে । এটি মু'তাযিলাদের মাযহাব ।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে , ইহুদিরা তো কেবল বলেছি لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً এখানে তারা তো আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি । তারপরও اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الخ কী ভাবে বলা হলো?

উত্তর : যদিও তাদের একথা সরাসরি মিথ্যারোপ নয়; কিন্তু লাযেমীভাবে তাতে اِفْتِرَاء প্রামাণিত হয় । কেননা এ ধরনের নিশ্চয়তার সাথে আল্লাহর দিকে নিসবত না করে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না । যেন তারা আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করেই বলেছে যে, তিনি আমাদের কে কেবল অল্প কয়েকদিন আজাব দেবেন ।

قَوْلُه تَعَالٰى : بَلٰى مَنْ كَسَبَ ....اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

سَيِّئَةٌ ও خَطِيْئَةٌ-এর মাঝে পার্থক্য : سَيِّئَةٌ সাধারণত ঐ গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যা স্বেচ্ছায় করা হয় । আর خَطِيْئَةٌ-এর ব্যবহার অনিচ্ছাকৃত গুনাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । এ পার্থক্য অধিকাংশের ভিত্তিতে, অন্যথায় একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার হয়ে থাকে ।

পাপাচারী মুমিন ক্ষমার যোগ্য : اَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র সে সকল লোক যারা সম্পূর্ণই বাতিলপন্থি এবং তাদের মৃত্যুও কুফরি ও ধর্মহীন অবস্থায় হবে । পক্ষান্তরে মুমিন যতই পাপাচারী হোক না কেন, তারা কোনো অবস্থাই এ আয়াতের লক্ষ্য হবে না । কেননা অন্তত মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাসের স্তর তো তার আছেই । আহলুস সুন্নাতের সকল মনীষীই এখানে কুফর উদ্দেশ্য করেছেন । মুতাযিলা, খারেজী প্রভৃতি বাতিলপন্থি ফেরকা এ আয়াত দ্বারা পাপাচারী মুমিনের ক্ষমা না পাওয়ার প্রমাণ পেশ করে থাকে । তা স্পষ্টতই বাতিল । [তাফসীরে মাজেদী খণ্ড১, পৃষ্ঠা ১৪৮]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ..... وَالَّذِيْنَ..... اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ

فَاء উল্লেখ ও অনুল্লেখের কারণ : উল্লিখিত আয়াত দুটির প্রথমটিতে আর্থৎ জাহান্নামীদের পরিণতি বর্ণনায় اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ 'ফা' পরিণতিবোধক অব্যয় সহকারে এবং জান্নাতিদের ক্ষেত্রে فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ 'ফা' অব্যয় ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে । অথচ উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকারের বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । বর্ণনাভঙ্গির মাঝে এ পার্থক্যের কারণ কী, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বক্তব্য হলো, প্রথম فَاء যুক্ত ক্ষেত্রটি জাহান্নামিদের জন্য হুমকির । আর হুমকির ক্ষেত্রে তার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বিষয়টিতে অতিরিক্ত দৃঢ়তা বুঝানোর লক্ষ্যে একটি বর্ণ অধিক উল্লেখ করেছেন । আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি শুধু ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির, যাতে বিপরীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই । এজন্য 'ফা' বিহীন اُولٰئِكَ ই যথেষ্ট ।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى: اَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُهُ

ইস্তিয়ারা : আলোচ্য আয়াতটিতে خَطَايَا (গুনাহসমূহ) কে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে যারা চারদিক থেকে অবরোধ আরোপ করেছে । এখানে ইস্তিয়ারার জন্য اِحَاطَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, গুনাহের পরিমাণ ছওয়াবের চেয়ে বেশি ।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : কবীরা গুনাহকারী কি সর্বদা জাহান্নামে থাকবে?

ক. চিরকালের জন্য	খ. কিছুকালের জন্য
بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُهُ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থ : হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই দোজখের অধিবাসী । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । [সূরা বাকারা : ৮১] এ আয়াতের সমর্থনে আরো তিনটি আয়াত রয়েছে । যথা–	وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থ : আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ । [সূরা তাওবা আয়াত ৭২] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে । যথা– সূরা যিলযাল, আয়াত– ৭

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
নিসা	১৪	জ্বিন	২৩
নিসা	৯৩		

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কবীরা গুনাহকারী সবসময় জাহান্নামে থাকবে । কারণ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর নাফরমানি করা, শরিয়তের সীমা অতিক্রম করা ও জেনেশুনে অন্যায়ভাবে কোনো মুমিন মানুষকে হত্যা করা এসব কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । যারা এসব কাজে লিপ্ত হবে তারা সর্বদা জাহান্নামে বসবাস করবে । এটি মু'তাযিলাদের মাযহাব ।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে যদিও সে ফাসেক বা ফাজের তথা গুনাহগার হয়। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাযহাব। আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহের দরুন দীর্ঘকাল জাহান্নামের শাস্তিতে লিপ্ত রাখবেন, যদি তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে করেন। অতঃপর ঈমানের বদৌলতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করবে। খ-অংশের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন এবং সূরা যিলযালের আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে উক্ত সৎকর্মের বিনিময় পাবে। আর সৎকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু হলো ঈমানদারের ঈমান, যদিও নাকি ঈমানদার আমলশূন্য হয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ঈমানদার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে। অতএব, খ-অংশের আয়াতদ্বয় ক-অংশের আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব নিরসন : বাস্তবে তো সেটাই হবে যা খ-অংশের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও কবীরা গুনাহের পাপে পাপিষ্ঠ হয়। যেমন এর পক্ষে একটি হাদীসেও পরিস্কারভাবে নির্দেশনা প্রদান করে–

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمْ اَلنَّبْرَاس شَرْحُ الْعَقَائِدِ)

অর্থ- হযরত আবূ যার গেফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী আকরাম ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম এমতাবস্থায় যে তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমাচ্ছেন। অতঃপর আমি নবীজী ﷺ-এর নিকট দ্বিতীয়বার আগমন করলে তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰه পাঠ করবে এবং পবিত্রতম কালেমার উপর মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরজ করলাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন যদিও ব্যভিচার বা চুরি করে। অতঃপর আমি আবার আরজ করলাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে। রাসূল ﷺ এবারও ইরশাদ করলেন, ব্যভিচার বা চুরি করে। এরপর আমি আবার আরজ করলাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে এবারও রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যদিও ব্যভিচার বা চুরি করে। অতঃপর চতুর্থবার রাসূল ﷺ বললেন, আবূ যারের নাক ধুলোমিশ্রিত হোক। অর্থাৎ আবূ যার যতই অপছন্দ করুক না কেন উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারী ও মুসলিম]

বাকি রইল সেসব আয়াত যেগুলোতে কবীরা গুনাহগারকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলা হয়েছে। যেমন উপর্যুক্ত ক অংশের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহগার চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। সুতরাং এ আয়াতগুলোতে তাবীল করা হবে, যাতে অন্যান্য আয়াতের সাথে বিরোধ মিটে যায়।

সূরা বাকারার ৮১ নং আয়াত بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ-এর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ তাবীল করা হয়েছে যে– بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً-এর মধ্যে سَيِّئَةً শব্দটি দ্বারা গুনাহে কবীরা নয়; বরং শিরক উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে অত্র আয়াতে سَيِّئَةً-এর তাফসীর শিরকের দ্বারা বর্ণিত আছে। এভাবে হযরত ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এবং ইবনে জারীর হযরত আবূ ওয়ায়েল, মুজাহিদ, কাতাদা, আতা ও রবী (রা.) থেকে سَيِّئَةً ও خَطِيْئَة শব্দের তাফসীর কুফর ও শিরক বর্ণনা করেন। সুতরাং এ তাফসীর অনুসারে বুঝা গেল যে, এ আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফেররা সর্বকাল জাহান্নামে বসবাস করবে। গুনাহগার মুমিন মুসলমানগণ নয়।

সূরা নিসার ১৪ নং আয়াত وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيُدْخِلْهُ نَارًا-এর ক্ষেত্রে এরূপ তাবীল করা হয়েছে যে وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ-এর মধ্যে حُدُوْد শব্দ দ্বারা جَمِيْعُ حُدُوْد উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল ﷺ-এর নাফরমানি করবে এবং আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সীমা অতিক্রম করবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, সে কাফের হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাওহীদ তথা একত্ববাদের সীমারেখা। যে ব্যক্তি তাওহীদের সীমানা অতিক্রম করে, সে মুসলমানের মধ্যে গণ্য হতে পারে না, ফলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবে। [তাফসীরে রুহুল মা'আনী, নিবরাস]

সূরা নিসার ৯৩নং আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا-এর ক্ষেত্রে এ তাবীল করা যায় যে উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলো– وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا لِكَوْنِهٖ مؤْمِنًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে মুমিন হওয়ার কারণে হত্যা করবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। আর এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে আছে যে, কোনো মুমিনকে মুমিন হওয়ার কারণে হত্যা করা কুফরি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এ হত্যা ঈমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের অন্যতম দলিল। সুতরাং ঈমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা কুফরি। আর যে ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। অতএব, এ আয়াতও কাফেরদের চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার উপর সংবাদ বহন করে; মুমিনগণ নয়। [নিবরাস]

অথবা উক্ত আয়াতের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি হালাল মনে করে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। কেননা কোনো মুমিনকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহকে হালাল মনে করা কুফরি। সুতরাং যে ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।

[রূহুল মা'আনী, তাফসীরে খাযেন, জালালাইন শরীফ]

সূরা জিনের ২৩ নং আয়াত–وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -এর ক্ষেত্রে এ তাবীল ও ব্যাখ্যা করা হয় যে وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর নাফরমানি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ ও রিসালাতের ক্ষেত্রে নাফরমানি করা। কারণ এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে তাওহীদ একত্ববাদ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের সারমর্ম হবে এটাই যে– مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالتَّوْحِيْدِ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে বিশ্বাস করবে না সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। সুতরাং এ আয়াত ও কাফেরদের ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার সংবাদ বহন করে। অতএব এ ব্যাখ্যা ও বিশ্লষণের পর আলোচিত আয়াতসমূহের মাঝে আর কোনো দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট নেই।

التَّدْرِيْبَات: অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَّاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين موضحة

ب. كيف اتى بلفظ ثم فى قوله "ثم قست قلوبكم" فانها موضوعة للتراخى فى الزمان ولا تراخى ههنا اذ قسوة قلوبهم فى الحال اجب متفكرا ثم اثبت قسوة قلوبهم ببيان انواع الحجارة مع بيان "المشار اليه" لذلك.

ج. حقق الكلمات الآتية : قست، يتفجر، يشقق، افتطمعون، يحرفونه.

د. من المخاطب فى قوله "افتطمعون" وما المراد بكلام الله؟ وما حرفوه وما هو المفعول ليعلمون اكتب بالتيقظ التام.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ـ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. بين فاعل قوله لقوا وقالوا الثانى ومفعول تعقلون وفسر قوله "اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم" كما فسر المصنف العلام ثم اوضح تفسير الآية الثانية.

ج. كم فرقة لليهود اقتبس كلها من الآية الدالة عليها ثم بين احوالهم موضحا.

د. فسر الآية الأخيرة كما فسر المصنف العلام مع بيان انه كيف قال "ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا" وقد اخذوا اموالا كثيرة احيانا وفى زماننا لا يحصى قدره.

ه. أوضح المستفادات من الآيات المذكورة فردا فرداثم اذكر اسباقك منها.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

أ. ترجم الآيات الكريمة فصيحة.

ب. ما افادك تعقيب قوله "قل اتخذتم الخ عن قولهم " وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة" اوضح ايضاحا تاما.

ج. فسر الايات الكريمة كما قرئ على اذانكم.

د. بين فائدة تعبير الاية الثانية بالسداد مع اقتضاء المحل اغلاظه.

ه. بين وجه ذكر الاية الثالثة بعد الثانية موضحا.

رُكُوْع : ١٠ بَيَانُ أَخْذِ الْمِيْثَاقِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَنَقْضِهِمُ الْمِيْثَاقَ

রুকূ' : ১০ বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- আল্লাহ তা'আলার ইবাদত, সদাচরণ ও নামাজ-রোজা সম্পর্কে ইহুদিদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
- ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিবরণ
- পরস্পর রক্তপাত না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
- পরস্পরকে ঘরছাড়া না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
- প্রতিশ্রুতির সাথে ইহুদিদের একমত পোষণ
- ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও এর শাস্তি

٨٣. ﴿وَ﴾ اُذْكُرْ ﴿اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ﴾ فِي التَّوْرَاةِ وَقُلْنَا ﴿لَا تَعْبُدُوْنَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ ﴿اِلَّا اللّٰهَ﴾ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوْا ﴿وَ﴾ أَحْسِنُوا ﴿بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا﴾ بِرًّا ﴿وَّذِي الْقُرْبٰى﴾ الْقَرَابَةَ عَطْفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ ﴿وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ﴾ قَوْلًا ﴿حَسَنًا﴾ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهٖ مُبَالَغَةً ﴿وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾ فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهٖ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرَادُ آبَاؤُهُمْ ﴿اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ﴾ عَنْهُ كَآبَائِكُمْ.

৮৩. আর স্মরণ করো যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম তাওরাতে এবং বলেছিলাম, তোমরা ইবাদত করো না। تَعْبُدُوْنَ ক্রিয়াটি تَاء-যোগে এবং يَاء-যোগে উভয়রূপেই পাঠ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো। বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ; কিন্তু نَهْي অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে لَا تَعْبُدُوْا রয়েছে। আর পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, নৈকট্যের অধিকারী ذِي الْقُرْبٰى শব্দটি الْوَالِدَيْنِ-এর উপর عَطْف হয়েছে এতিম ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে যেমন, সৎকাজের আদেশ দান, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য কথা বলা, আত্মীয়স্বজনের সাথে কোমল ব্যবহার করা ইত্যাদি حُسْنًا শব্দটি অন্য কেরাতে مصدر হিসেবে ح-এ পেশ ও س-এ সুকূনসহ রয়েছে। এমতাবস্থায় একে বিশেষণরূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো মুবালাগা প্রকাশ করা সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দেবে। আর তোমরা এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলে। অতঃপর স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা অর্থাৎ, ইহুদিদের পূর্বপুরুষগণ মুখ ফিরিয়ে নিলে। অর্থাৎ, তা পূরণ করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে। تَوَلَّيْتُمْ ক্রিয়াপদটিতে غَيْبَة হতে اِلْتِفَات হয়েছে। 'তোমরা' বলে এ স্থানে মূলত ইহুদিদের পূর্বপুরুষগণকে বোঝানো হয়েছে। আর তোমরাও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় এর অবাধ্যাচারী।

٨٤. ﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ﴾ وَقُلْنَا ﴿لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ﴾ تُرِيْقُوْنَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ﴾ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهٖ ﴿ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ﴾ قَبِلْتُمْ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقَ ﴿وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ﴾ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ.

৮৪. আর স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করো না অর্থাৎ, পরস্পরকে হত্যা করে রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং তোমাদের নিজেদেরকে স্বীয় গৃহ হতে বহিষ্কার করো না অর্থাৎ, পরস্পরকে গৃহচ্যুত করবে না অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে উক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিয়েছিলে আর নিজেদের উপর তোমরাই তার সাক্ষী।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَ. اذْكُرْ. اِذْ اَخَذْنَا

اِذْ-এর তারকীব ও আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তির বর্ণনা : মুফাসসির (র.) এখানে اُذْكُرْ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِذْ হরফটি مَحَلًّا مَنْصُوْب যার আমেল اُذْكُر উহ্য রয়েছে। আর اُذْكُرْ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। اَىْ اُذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ ﷺ;

قَوْلُهٗ : مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ. فِى التَّوْرَاةِ

مِيْثَاق দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে মুফাসসির (র.) فِى التَّوْرَاةِ বৃদ্ধি করে সে অঙ্গীকারের কথা বুঝিয়েছেন, যা তাদের থেকে তাওরাতে নেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এ অঙ্গীকার হযরত মূসা ও অন্যান্য নবী (আ.)-এর জবানে নেওয়া হয়েছিল। আবার কেউ বলেন– اِنَّهٗ مِيْثَاقٌ اَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ فِىْ اَصْلَابِ آبَائِهِمْ كَالذَّرِّ;

قَوْلُهٗ : وَقُلْنَا. لَا تَعْبُدُوْنَ

لَا تَعْبُدُوْنَ-এর পূর্বে قُلْنَا বৃদ্ধির কারণ : বক্তব্যকে পূর্বের সাথে তথা وَاِذْ اَخَذْنَا-এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য لَا تَعْبُدُوْنَ-এর পূর্বে মুফাসসির (র.) قُلْنَا বৃদ্ধি করেছেন যাতে اَخَذْنَا-এর ন্যায় এখানেও جَمْعْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ হয়। অন্যথায় একই বক্তব্যে একই মুখাতাবের জন্য غَائِب এবং حَاضِرْ-এর সীগাহ ব্যবহার অপরিহার্য হয়। কেননা بَنِىْ اِسْرَائِيْل হলো اِسْمُ ظَاهِر আর اِسْمُ ظَاهِر গায়েবের হুকুমে হয়ে থাকে। অথচ এরপর لَا تَعْبُدُوْنَ রয়েছে। এর মুখাতাবও হলো বনী ইসরাঈল। অথচ এটি হলো حَاضِرْ -এর সীগাহ। সুতরাং এভাবে একই বক্তব্যের মাঝে خِطَاب بِالْغَائِبْ এবং خِطَاب بِالْحَاضِر আসে। এ থেকে বাঁচার জন্য মুফাসসির (র.) قُلْنَا বৃদ্ধি করেছেন। যাতে اَخَذْنَا এবং قُلْنَا-এর মাঝে مُطَابَقَة হয়ে যায়। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯]

তা ছাড়া মুসান্নিফ (র.) قُلْنَا শব্দ উহ্য মেনে لَا تَعْبُدُوْنَ-কে قُلْنَا -এর مَقُوْلَة হয়ে নসবের স্থানেও اَخَذْنَا-এর উপর عَطْف করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ বাক্যটি مِيْثَاق-এর তাফসীর হওয়ার, আর তখন قُلْنَا-এর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهٗ : خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ

নাহীর অর্থে মুযারের ব্যবহার : মুফাসসির (র.) বলেন, لَا تَعْبُدُوْنَ শব্দটি مُضَارِعْ مَنْفِىْ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ হওয়ার কারণে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে এটি جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ এবং لَا تَعْبُدُوْا-এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْد বাক্যটি مَنْفِىْ হয়ে نَهِىْ-এর অর্থে।

جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-কে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -এর মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য হলো, তাদের দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত প্রকাশ হওয়া খুবই দুষ্কর।

قَوْلُهٗ : وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوْا

কেরাতের পার্থক্য বর্ণনা : আয়াতে لَا تَعْبُدُوْنَ শব্দটিতে দু'ধরনের কেরাত রয়েছে। প্রসিদ্ধ কেরাত لَا تَعْبُدُوْنَ জুমলায়ে খবরিয়া। আর অন্য কেরাতে لَا تَعْبُدُوْا স্পষ্ট সীগায়ে নাহীর সাথে রয়েছে। কিন্তু এ কেরাত বিরল। যার দিকে قُرِئَ দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, মুফাসসির (র.)-এর অভ্যাস হলো, قِرَاءَة مُتَوَاتِرَة-কে وَفِىْ قِرَاءَة শব্দ দ্বারা আর قِرَاءَة شَاذَّة -কে وَقُرِئَ দ্বারা ব্যক্ত করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ও রয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

فَقَبِلْتُمْ বৃদ্ধির কারণ : মুফাসসির (র.) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ-এর পূর্বে قَبِلْتُمْ বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, تَوَلَّيْتُمْ-এর আতফ اَقِيْمُوْا-এর উপর হয়নি; বরং উহ্য একটি ফে'লের উপর হয়েছে। কারণ সেক্ষেত্রে عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ আবশ্যক হয় যা বৈধ নয়।

قَوْلُهٗ : وَ . أَحْسِنُوْا . بِالْوَالِدَيْنِ

তারকীবগত সন্দেহ নিরসন : এখানে اَحْسِنُوْا শব্দটি উহ্য ধরে মুফাসসির (র.) একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তা হচ্ছে- بِالْوَالِدَيْنِ অংশটি বাহ্যত আতফ হয়েছে لَا تَعْبُدُوْنَ-এর উপর। আর جَارْ ও مَجْرُوْر-এর عَطْف ফে'লের উপর ব্যাকরণগত দিক দিয়ে অশুদ্ধ। যখন اَحْسِنُوْا উহ্য ধরা হয়েছে, তখন এ আপত্তি শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া মুফাসসির (র.) اَحْسِنُوْا আমরের সীগাহ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف-টি হয়েছে لَا تَعْبُدُوْنَ-এর অর্থের উপর; শব্দের উপর নয়।

قَوْلُهٗ : بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا . بِرًّا

اِحْسَان দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) اِحْسَانًا-এর ব্যাখ্যায় بِرًّا শব্দের উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِحْسَان দ্বারা শুধু আর্থিক اِحْسَان বোঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা সব ধরনের সদ্ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَذِى الْقُرْبٰى . الْقَرَابَة

قُرْبٰى-এর শব্দগত দিক উল্লেখ : মুফাসসির (র.) اَلْقُرْبٰى -এর তাফসীরে اَلْقَرَابَة উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, قُرْبٰى শব্দটি رَجْعٰى-এর মতো মাসদার; বহুবচন নয়। অর্থাৎ, اَهْلُ الْقَرَابَةِ আর قَرَابَة দ্বারা صَلْبِىْ ও رِحْمِىْ উভয় ধরনের আত্মীয় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ . قَوْلًا . حَسَنًا

উহ্য মাওসূফ উল্লেখ : মুফাসসির (র.)-এর মতে, শব্দটি হলো- حَسَنًا (س ও ح বর্ণে যবরযোগে)। حَسَنًا শব্দটি ইসমে সিফাত। তাই قَوْلًا উল্লেখ করে মুফাসসির (র.) তার উহ্য মাওসূফটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهٖ لِلْمُبَالَغَةِ

সিফাতহিসেবে মাসদার নেওয়ার কারণ : حُسْنًا শব্দটির দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী শব্দটি ح বর্ণে পেশ ও س বর্ণে সাকিনযোগে রয়েছে। সেক্ষেত্রে শব্দটি মাসদার। আর মাসদার সিফাত হতে পারে না। তাই মুফাসসির (র.) আলোচ্য বক্তব্য দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এখানে مُبَالَغَة স্বরূপ মাসদারের মাধ্যমে সিফাত আনা হয়েছে। যেমন- زَيْدٌ عَدْلٌ;

قَوْلُهٗ : فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ

ইলতিফাতের বর্ণনা : পূর্বে বনী ইসরাঈলকে غَائِب-এর সীগাহ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল। তাই এখানে ثُمَّ تَوَلَّوْا বলা উচিত ছিল। কিন্তু تَوَلَّيْتُمْ বলা দ্বারা বুঝা গেল এখানে غَيْبَ থেকে حَاضِر-এর দিকে اِلْتِفَات হয়েছে। আর এ اِلْتِفَات দ্বারা ইহুদিদের পূর্বপুরুষরা উদ্দেশ্য; সমসাময়িক ইহুদিরা নয়। এ বিষয়টিই মুফাসসির (র.) ....فِيْهِ اِلْتِفَات বলে স্পষ্ট করেছেন। অবশ্য কেউ বলেন, এখানে সম্বোধন ব্যাপকভাবে হয়েছে। উত্তরসূরি-পূর্বসূরি সকলেই তাতে অন্তর্ভুক্ত আছে।
মূলত اِلْتِفَات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্বের বাক্যের ধারাকে পরিবর্তন করে দেওয়া। যা দ্বারা আনন্দ ও স্বাদ জন্মে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির বিরক্তি দূর হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ . عَنْهُ كَاٰبَائِكُمْ

তাকারারের সন্দেহ নিরসন : وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ এবং ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ-এর অর্থ একই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাকরার করা হয়েছে। কারণ, উভয়টির সম্বোধিত গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন। تَوَلَّيْتُمْ -এর সম্বোধন পূর্বপুরুষদের প্রতি আর وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ-এর সম্বোধন উত্তরসূরি ইহুদিদের প্রতি করা হয়েছে। সুতরাং বস্তুত এখানে কোনো তাকরার নেই। এ বিষয়টিই মুফাসসির (র.) كَاٰبَائِكُمْ দ্বারা বুঝিয়েছেন।
কেউ কেউ বলেন- وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বাক্যটির মূলরূপ হলো- وَاَنْتُمْ قَوْمٌ عَادَتُكُمُ الْاِعْرَاض;

قَوْلُهٗ : تُرِيْقُوْنَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করার ব্যাখ্যা : لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ-এর মর্মার্থ হলো নিজের রক্ত প্রবাহিত করো না। আর বাস্তবতা হলো, কেউ নিজের রক্ত প্রবাহিত করে না; বরং অন্যের রক্ত প্রবাহিত করে। তাহলে এখানে নিজের রক্ত প্রবাহিত করতে নিষেধ করার মর্মার্থ কী?
মুফাসসির (র.) تُرِيْقُوْنَهَا বলে উক্ত প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো পরস্পরকে হত্যা করে নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করো না। অনুরূপভাবে وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ-এর ক্ষেত্রেও।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

دِمَاءَ : শব্দটি دَمٌ-এর বহুবচন। دِمَاءٌ মূলে دِمَاوٌ ছিল। اَلِفِ زَائِدَة-এর পর وَاو হওয়ার কারণে তা হামযা হয়ে গেছে। যেহেতু এ হামযাটি وَاو থেকে রূপান্তরিত। তাই এটি غَيْرِ مُنْصَرِفٌ হবে না।

تُرِيْقُوْنَ : সীগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহছ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِرَاقَةُ মূলবর্ণ (ر-و-ق) বা (ر-ى-ق) জিনস اجوف واوى বা يائى অর্থ- তোমরা প্রবাহিত কর, তোমরা ঝরাও।

اَلْيَتَامٰى : শব্দটি বহুবচন একবচনে يَتِيْمٌ; মানুষের মধ্যে যেসব বাচ্চার পিতা মারা যায় এবং প্রাণীদের মধ্যে যেসব বাচ্চার মা মারা যায় তাদেরকে يَتِيْمٌ বলা হয়।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহছ فِعْلٌ مَاضِىْ مُطْلَقٌ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّى মূলবর্ণ (و-ل-ى) জিনস لَفِيْفٌ مَفْرُوْق অর্থ- তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ ..... مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْن

وَاو হরফে আতফ اِذْ মুযাফ اَخَذْنَا ফে'ল, যমীর ফায়েল مِيْثَاقَ بَنِى اِسْرَائِيْلَ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফ'উলে বিহী। اَخَذْنَا ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে উহ্য اُذْكُرُوْا-এর মাফ'উল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا الخ-এর মাঝে وَاو হরফে আতফ لَا تَعْبُدُوْنَ ফে'ল, যমীর ফায়েল اِلَّا হরফে হসর, লফযে اَللّٰه মাফ'উলে বিহী সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি। وَاو হরফে আতফ تُحْسِنُوْنَ উহ্য ফে'ল ও ফায়েল باء হরফে জার ذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْن মা'তূফ আলাইহি اِحْسَانًا মাফ'উলে মুতলাক وَاو হরফে আতফ اَلْوَالِدَيْن মাতূফে ছালেছ। মা'তূফ আলাইহি তার তিন মা'তূফের সাথে মিলে মাজরূর। জার, মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক تُحْسِنُوْنَ উহ্য ফে'লের সাথে। تُحْسِنُوْنَ ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে প্রথম মা'তূফ।

وَاو হরফে আতফ قُوْلُوْا ফে'ল ও ফায়েল لِلنَّاسِ মুতা'আল্লিক حُسْنًا সিফাত قَوْلًا উহ্য মাওসূফের। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফ'উলে মুতলাক। قُوْلُوْا ফে'ল, ফায়েল, মুতা'আল্লিক ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলা হয়ে দ্বিতীয় মা'তূফ। وَاو হরফে আতফ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে জুমলা হয়ে তৃতীয় মা'তূফ। وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ পূর্বের মতো চতুর্থ মা'তূফ।

ثُمَّ হরফে আতফ تَوَلَّيْتُمْ ফে'ল ضَمِيْر যুলহাল وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ জুমলায়ে খবরিয়া হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুস্তাছনা মিনহু اِلَّا হরফে মুস্তাছনা قَلِيْلًا মাওসূফ مِنْكُمْ উহ্য كَائِنَة-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুস্তাছনা। মুস্তাছনা মিনহু ও মুস্তাছনা মিলে ফায়েল। تَوَلَّيْتُمْ ফে'ল ও ফায়েল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে পুনরায় মা'তূফ হলো لَا تَعْبُدُوْنَ الخ মা'তূফ আলাইহি-এর উপর। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে আতেফা হলো।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَة : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

لَا تَعْبُدُوْنَ শব্দের কেরাত : ৮৩ নং আয়াতে উল্লিখিত لَا تَعْبُدُوْنَ শব্দের তিনটি কেরাত রয়েছে। যথা-

ক. ইবনে কাসীর, হামযা ও কেসায়ী (র.) لَا يَعْبُدُوْنَ (ي -যোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) لَا تَعْبُدُوْنَ (ت -যোগে) পড়েছেন।

قَوْلُهُ : وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

حُسْنًا শব্দের কেরাত : ৮৩ নং আয়াতে উল্লিখিত حُسْنًا শব্দের দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

ক. হামযা ও কেসায়ী (র.) حَسَنًا (ح ও س বর্ণে যবরযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) حُسْنًا (ح বর্ণে পেশ ও س বর্ণে সুকূনযোগে) পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূ'র যোগসূত্র

পূর্বের রুকূ'র শেষ দিকে ইহুদিদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাদেরকে অল্প কয়েক দিন নয় বরং চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের দাবি হলো তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কয়েক দিন নয়; বরং চিরদিন আজাব ভোগ করতে হবে। বিশেষভাবে যখন এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل :শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ .... وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْن

মদিনা শরীফে দুটি ইহুদি গোত্রের বসবাস ছিল। একটি বনূ কুরাইযা অপরটি বনূ নযীর। উভয় গোত্রে পারস্পরিক হানাহানি লেগেই থাকত। মদিনা শরীফের মুশরিকরাও ছিল দু'দলে বিভক্ত। আওস ও খাযরাজ। এরাও একে অপরের শত্রু ছিল। বনূ কুরায়যা আওস গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল এবং বনূ নযীর খাযরাজ গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল। যুদ্ধ বিগ্রহে প্রত্যেকেই মিত্রের সাহায্য করতো। একে অন্যের উপর জয়ী হতে পারলে দুর্বলদের নির্বাসিত করতো এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিত। তাদের এসব মন্দ কর্মের কথা উল্লেখ করে তা থেকে বারণকল্পে এ আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫২]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ :আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ..... وَأَنْتُمْ مُعْرِضُوْن

আল্লাহর ইবাদতের পর পিতামাতার অধিকার উল্লেখের কারণ : সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক অধিকার হলো পিতামাতার। কারণ সন্তান জন্মের মাধ্যম বাহ্যিকভাবে পিতামাতা হন। তাই আল্লাহ তা'আলা নিজ অধিকারের সাথে পিতামাতার অধিকার ও খেদমতকেও বলে দিয়েছেন। আল্লাহর অধিকারের বিষয়টি আগে আনার দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, যদি উভয় অধিকারের মধ্যে কোনো সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে যায়, তখন প্রথমটিই অগ্রাধিকারযোগ্য থাকবে।

এমনিভাবে اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ-এর নীতি দ্বারা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের অধিকারসমূহেরও শিক্ষাদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا দ্বারা একথা বুঝিয়েছেন যে, শুধু পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথেই ভালো ব্যবহার করবে বিষয়টি এরূপ নয়; বরং সাধারণ লোকজনও যেন তোমাদের সাধারণ সহানুভূতি এবং উত্তম ব্যবহার থেকে বঞ্চিত না থাকে। যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে, সে সৎ হোক বা অসৎ, সুন্নী হোক বা বিদ'আতী। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-কে নবুয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَيِّنًا অর্থাৎ, তোমরা উভয়েই ফেরাউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো স্বার্থ আদায়ের জন্য সত্য গোপন করবে না।

সালাত ও জাকাতের উদ্দেশ্য : وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতাংশে সালাত এবং জাকাত দ্বারা বনী ইসরাঈলের প্রতি ফরজকৃত সালাত ও জাকাত উদ্দেশ্য। এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্বোধন করা হচ্ছে। কেউ বলেন, এখানে সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো নবীযুগের ইহুদিরা এবং সালাত ও জাকাত দ্বারা ইসলামি শরিয়তের সালাত ও জাকাত উদ্দেশ্য।

এ সুরতে প্রশ্ন হয় যে, ঈমান ব্যতীত সালাত এবং জাকাতের কোনো মূল্য নেই। ইহুদিদেরকে এ নির্দেশ কীভাবে প্রদান করা হলো? এর উত্তর হলো, এখানে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দ্বারা ঈমান আনয়নের নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ .... وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْن

مِيْثَاق-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে مِيْثَاق বলার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইহুদিদের কাছ থেকে কঠিন অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। কারণ مِيْثَاق শব্দটি শুধু শপথ সহকারে দৃঢ় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْن দ্বারা এ বিষয়টি সুদৃঢ় হয়।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ :কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ

নাহী অর্থে খবরের ব্যবহার : আলোচ্য অংশে খবরের ফে'ল দ্বারা নিষেধাজ্ঞা বুঝানো উদ্দেশ্য। এমন করার কারণ হলো, নিষেধটি থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব বুঝানো।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

সিফাত হিসেবে মাসদারের ব্যবহার : আলোচ্য অংশে حُسْنًا মাসদারটি সিফাত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। মূলরূপ হলো- قَوْلًا ذَا حَسَنٍ অথবা قَوْلًا حُسْنًا; সরাসরি মাসদার ব্যবহার করে মুবালাগা প্রকাশ করা হয়েছে।

৮৫. অতঃপর তোমরাই হে ব্যক্তিগণ! নিজেদেরকে হত্যা করছ তোমাদের একজন অপরজনকে হত্যা করছে এবং তোমাদের নিজেদের এক দলকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করছ। অন্যায় পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে জুলুমের মাধ্যমে। تَظَّاهَرُوْنَ শব্দে ت-কে ظ অক্ষরে إِدْغَام করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে تخفيف সহকারে تَاء-কে হযফ করে পঠিত রয়েছে। অর্থ হলো– তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করছ। যদি তারা তোমাদের নিকট বন্দিরূপে আসে। أُسْرى শব্দটি অন্য কেরাতে أَسْرٰى-রূপে রয়েছে। তখন তাদের মুক্তিপণ দাও। অন্য কেরাতে تَفْدُوْهُمْ রয়েছে। অর্থাৎ, তখন তোমরা অর্থ কিংবা অন্য কিছু দিয়ে তাদেরকে বন্দিদশা হতে মুক্ত করে আন। যা তাদের উক্ত অঙ্গীকারভুক্ত একটি বিষয়। অথচ তাদের هُوَ সর্বনামটি ضَمِيْرُ الشَّأْن; وَهُوَ مُحَرَّمٌ বাক্যটি تُخْرِجُوْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ অর্থাৎ, মুক্তিপণ দান পরিত্যাগ করা যেমন অবৈধ ছিল [তেমনি এটাও অবৈধ] বনূ কুরাইযা আউস গোত্রের সাথে এবং বনূ নযীর খাযরাজ গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাই যুদ্ধে প্রত্যেকটি গোত্র স্ব-স্ব বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিত, বিপক্ষ দলের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করতো এবং তাদেরকে গৃহচ্যুত করতো। আবার যখন কারো হাতে অন্য দলের কোনো বন্দি হতো উক্ত ইহুদি গোত্রদ্বয় পরস্পর মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে আনত। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, কেনই বা লড়াই করলে আর কেনই বা পণ দিয়ে মুক্ত করে আনলে? তারা বলত, আমাদের মুক্তিপণের আদেশ করা হয়েছে। যদি বলা হতো, তবে এদের সাথে লড়াই করো কেন? তারা বলত, আমাদের মিত্রপক্ষ লাঞ্ছিত হবে এই লজ্জায় আমরা যুদ্ধ করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে মুক্তিপণের বিধানে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে হত্যা, বহিষ্কার ও অন্যায়কর্মে সহযোগিতা বর্জন করার বিধান প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র ফল পার্থিব জীবনের হীনতা লাঞ্ছনা ও হেয়তা। বনী কুরাইযাকে হত্যা করা এবং বনূ নযীরকে সিরিয়ায় বহিষ্কার এবং তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করার মাধ্যমে তারা লাঞ্ছিত হয়েছিল। আর কেয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। يَعْمَلُوْنَ ফে'লটি تاء ও ياء-যোগে পঠিত।

٨٥. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ﴾ يَا ﴿هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ﴾ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاء فِي الْأَصْل فِي الظَّاء وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّخْفِيفِ عَلٰى حَذْفِهَا تَتَعَاوَنُوْنَ ﴿عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ﴾ بِالْمَعْصِيَةِ ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ الظُّلْمِ ﴿وَإِنْ يَّأْتُوْكُمْ أُسٰرٰى﴾ وَفِي قِرَاءَةٍ أَسْرٰى ﴿تُفٰدُوْهُمْ﴾ وَفِي قِرَاءَةٍ تَفْدُوْهُمْ تُنْقِذُوْهُمْ مِنَ الْأَسْرِ بِالْمَالِ أَوْ غَيْرِه وَهُوَ مِمَّا عُهِدَ إِلَيْهِمْ ﴿وَهُوَ﴾ أَيْ الشَّأْن ﴿مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُخْرِجُوْنَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ أَيْ كَمَا حَرَّمَ تَرْكُ الْفِدَاء وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُوا الْأَوْسَ وَالنَّضِيْرُ الْخَزْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ وَتَفْدُوْنَهُمْ قَالُوا أُمِرْنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ حَيَاءً أَنْ يَسْتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا قَالَ تَعَالٰى ﴿أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ﴾ وَهُوَ الْفِدَاءُ ﴿وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾ وَهُوَ تَرْكُ الْقَتْل وَالْإِخْرَاج وَالْمُظَاهَرَة ﴿فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ﴾ هَوَانٌ وَذُلٌّ ﴿فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ وَقَدْ خُزُوا بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ إِلَى الشَّام وَضَرْبِ الْجِزْيَة ﴿وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ.

٨٦. ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ﴾ بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ﴾ يُمْنَعُونَ مِنْهُ.

৮৬. তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে নিয়েছে অর্থাৎ, পরকালের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবে না। অর্থাৎ, তা হতে তাদেরকে রক্ষা করাও হবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : ثُمَّ اَنْتُمْ . يَا . هَؤُلَاءِ

উহ্য নেদা উল্লেখকরণ : মুফাসসির (র.) মাঝখানে يَا উহ্য ধরে ইঙ্গিত করলেন যে, هَؤُلَاءِ শব্দটি মহল হিসেবে مُنَادٰى হয়ে মানসূব। তার حَرْفِ نِدَا উহ্য রয়েছে। এ সুরতে হরফে নেদা ও মুনাদা মিলে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হবে।

قَوْلُهٗ : وَهُوَ اَىْ الشَّأْنُ

মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে وَهُوَ-এর هُوَ যমীরটি যমীরে শান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো বিষয়ের গুরুত্ব কিংবা ভয়াবহতা বুঝানোর উদ্দেশ্যে ضَمِيْرُ الشَّأن ব্যবহার করা হয়।

قَوْلُهٗ : مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ وَتُخْرِجُوْن

মুফাসসির (র.) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ وَتُخْرِجُوْنَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ ..... এবং পরবর্তী ... وَتُخْرِجُوْنَ -এর মাঝে হাল-যুলহালের সম্পর্ক। আর এর মধ্যবর্তী ... وَهُوَ مُحَرَّمٌ অংশটুকু হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ;

قَوْلُهٗ : وَكَانَتْ قَرِيْظَةُ

আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা : এখান থেকে মুফাসসির (র.) আয়াত সংশ্লিষ্ট পূর্ণ ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَظَاهَرُوْنَ : সীগাহ تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّظَاهُرُ মূলবর্ণ (ظ.ه.ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করলে।

مُحَرَّمٌ : সীগাহ وَاحِدِ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمِ مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْمُ মূলবর্ণ (ح.ر.م) জিনস صحيح অর্থ- নিষিদ্ধ, বারণকৃত।

تُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ.م.ن) জিনস مَهْمُوْزِ فَاء অর্থ- তোমরা ঈমান আনবে।

يُرَدُّوْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِب বহছ اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر.د.د) জিনস مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ অর্থ- তারা নিক্ষিপ্ত হবে।

لَا يُخَفَّفُ : সীগাহ وَاحِدِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِيْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْفِيْفُ মূলবর্ণ (خ.ف.ف) জিনস مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ অর্থ- তা লাঘব করা হবে না, কমানো হবে না।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ .... وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

ثُمَّ হরফে আতফ, أَنْتُمْ মুবতাদা هَؤُلَاءِ অংশটুকু উহ্য হরফে নেদার মুনাদা। وَالْعُدْوَان .... تَقْتُلُوْنَ পর্যন্ত পুরো বাক্যটি খবর। وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ অংশটি عَطْف হয়েছে تَقْتُلُوْنَ -এর উপর। আর مِنْ دِيَارِهِمْ-এর মাঝে যমীরটি فَرِيْقًا -এর দিকে ফিরেছে।

عَلَيْهِمْ বাক্যটি تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَان-এর ফায়েল থেকে হাল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَان অংশটি تَظَّاهَرُوْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। تَظَاهَرُوْنَ অংশটুকু بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَان -এর ফায়েল থেকে উহ্য হালের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। মূলরূপ হলো– تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ حَالَ كَوْنِهِمْ مُتَلَبِّسِيْنَ بِالْاِثْمِ وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ .... اِخْرَاجُهُمْ আর এ অংশটি حَالِيَّة টি-واو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُم বাক্যটির جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ اِسْتِئْنَافِيَّةٌ;
وَهُوَ .... اِخْرَاجُهُمْ বাক্যটি مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ অংশটি অগ্রবর্তী খবর এবং اِخْرَاجُهُمْ অংশটি পশ্চাদবর্তী মুবতাদা হয়েছে। وَهُوَ .... اِخْرَاجُهُمْ বাক্যটি মূলত تُخْرِجُوْن-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্য اَنْ يَّأْتُوْكُمْ الخ হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বা মধ্যবর্তী বাক্য।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَان

تَظَاهَرُوْن শব্দের কেরাত : ৮৫নং আয়াতে উল্লিখিত تَظَاهَرُوْن শব্দটিতে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. ইবনে কাসীর ও আবূ আমর (র.) تَظَّاهَرُوْن (ظ বর্ণে তাশদীদযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) تَظَاهَرُوْن (ظ বর্ণ তাশদীদ ব্যতীত মাদসহ) পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ

اُسٰرٰى শব্দের কেরাত : ৮৫ নং আয়াতে اُسٰرٰى শব্দটিতে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. হামযা (র.) اَسْرٰى (س বর্ণে সুকূনযোগে) পড়েছেন।

খ. ইমাম হাফস (র.) اُسٰرٰى (س বর্ণে মাদসহ) পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ اَسْرٰى تُفٰدُوْهُم

تُفٰدُوْهُمْ শব্দের কেরাত : ৮৫ নং আয়াতে উল্লিখিত تُفٰدُوْهُمْ শব্দে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

১. আবূ আমর ও ইবনে আমের (র.) تَفْدُوْهُمْ (ت বর্ণে যবর ও ف বর্ণে সুকূনযোগে) পড়েছেন।

২. ইমাম হাফস (র.) تُفٰدُوْهُمْ (ت বর্ণে পেশ ও ف বর্ণে মাদসহ) পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْن

يَعْمَلُوْن শব্দের কেরাত : ৮৬ নং আয়াতে উল্লিখিত يَعْمَلُوْنَ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. নাফে, ইবনে কাসীর ও আবূ বকর (র.) يَعْمَلُوْن (ى -যোগে) পড়েছেন।

২. ইমাম হাফস (র.) تَعْمَلُوْن (ت -যোগে) পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে ওসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

تَظَاهَرُوْنَ শব্দের লিখনশৈলী : تَظَاهَرُوْنَ শব্দটির ক্ষেত্রে তাফসীরে জালালাইন ও রসমে উসমানীর মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

ক. তাফসীরে জালালাইনের নুসখায় শব্দটি লেখা হয়েছে– تَظَاهَرُوْن (ظ বর্ণের পরে আলিফ যোগে)

খ. রসমে ওসমানী হলো– تَظْهَرُوْنَ (ظ বর্ণের উপর খাড়া যবর)

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ .... وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

শরিয়তের পূর্ণ বিধান মান্য করা আবশ্যক : এখানে كِتَاب দ্বারা ইহুদিদের আসমানি কিতাব তাওরাত উদ্দেশ্য। ইহুদিদের বিপক্ষে পরোক্ষ অভিযোগ সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কুরআনকে বিশ্বাস করার কথা তো ভিন্ন বিষয়, তোমরা তাওরাতেরও পূর্ণ আনুগত্য করছ না। اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ আয়াতাংশ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি শরিয়তের কতক বিধান মেনে চলে আর যেসব বিধান তার স্বভাব-চরিত্র বা স্বার্থবিরোধী, তা মানতে দ্বিধা করে, তাহলে কতককে মেনে চলার দ্বারা তার কোনো উপকার লাভ হবে না।

আল্লাহর সাথে ইহুদিদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ : তাওরাতে ইহুদিদের থেকে তিনটি বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। যথা–

১. পরস্পরে খুনাখুনি করবে না।

২. কাউকে দেশান্তর করবে না।

৩. যদি কেউ বন্দি হয়ে যায়, তবে আর্থিক বিনিময় দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনবে।

উক্ত তিনটি অঙ্গীকারের মধ্যে অতি সহজ ছিল তৃতীয় অঙ্গীকারটি। তাই ইহুদিরা প্রথম দুটি অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে শুধু তৃতীয়টি মানত। মদিনার ইহুদি গোত্র কুরাইযার সাথে আউস এবং নযীরের সাথে খাযরাজের মৈত্রীচুক্তি ছিল। ইহুদি গোত্রদুটি তাদের মৈত্রীদের সাথে মিলে পরস্পর যুদ্ধ করতো, একে অপরকে গৃহছাড়া করতো। আবার যুদ্ধ শেষ হলে তাওরাতের অঙ্গীকারের দোহাই দিয়ে নিজেরাই বন্দিদেরকে ছাড়িয়ে আনত। এটাকেই اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৪]

كُفْر দ্বারা রূপকার্থ উদ্দেশ্য : وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ-এর মাঝে كُفْر দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যবহারিক কুফর। যেরূপ কোনো খারাপ আমলকে ঘৃণিতরূপে পেশ করার জন্য নিকৃষ্ট শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। এখানে এর দ্বারা প্রকৃত كُفْر উদ্দেশ্য নয়; বরং রূপক অর্থ (দৃশ্যত كُفْر) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এখানে উদ্দেশ্য হলো, তাদের সে খারাপ আমলের মন্দতা প্রকাশ করা। অতএব, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের জন্য এ আয়াত দ্বারা কবীরা গুনাহকারীকে ঈমানের সীমা থেকে বহিষ্কার করা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের জন্য কবীরা গুনাহকারীকে কুফরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দলিল পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, আলোচ্য আয়াতে كُفْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كُفْر-এর মতো কার্যকলাপ করা। প্রকৃত কাফের হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

ইহুদিদের দুনিয়াবি শাস্তি : فَمَا جَزَاءُ অংশটি দ্বারা যারা কতক বিধান মানে এবং কতককে অস্বীকার করে, তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। আর তা ছিল খুবই ভয়াবহ ও অত্যন্ত কঠিন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় خِزْيٌ শব্দটি নাকেরা ব্যবহার করার মাধ্যমে। এ ভবিষ্যদ্বাণী অল্প কদিনের ব্যবধানে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইহুদি প্রতাপশালী গোত্র বনূ নযীর ও বনূ কুরাইযা গোত্রদুটি অল্প কয়েক বছরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই চরম ধ্বংসের শিকার হয়। নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় চতুর্থ হিজরিতে যখন আউস ও খাযরাজ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনূ কুরাইযার সাতশত যুবককে হত্যা করা হয়েছে এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দি করা হয়েছে। বনূ নযীরকে সিরিয়ায় দেশান্তর করা হয়েছে। সূরা আহযাব এবং সূরা হাশরে এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা বিদ্যমান আছে। আর পরকালে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা পরকালে পতিত হবে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৪]

সংশয় ও তার নিরসন : عَلٰى هٰذَا اَشَدِّ الْعَذَابِ-এর ক্ষেত্রে ইমাম রাযী (র.) এ সন্দেহ করেছেন যে ইহুদিরা বেশির চেয়ে বেশি কাফের ছিল। তাদের শাস্তিকে যখন اَشَدِّ [কঠিনতম] বলা হয়েছে। তবে দাহ্‌রিয়া সম্প্রদায় যারা ইহুদিদের চেয়েও অধিক অপরাধী। কেননা তারা সরাসরি আল্লাহকেই অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি কীভাবে কম হবে?

আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে এর উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, اَشَدِّيَتْ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান উদ্দেশ্য নয় যে, مُفَضَّل এবং مُفَضَّل عَلَيْهِ -এর প্রয়োজন হবে বরং اَشَدِّيَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য চিরস্থায়ী ও সর্বদা শাস্তি যা কাফির ও মুশরিক এবং দাহরিয়া সকলের জন্য হবে। অথবা কাফের থেকে নিম্ন শ্রেণির লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে اِضَافِيْ اَشَدِّيَتْ উদ্দেশ্য।

মোটকথা : দুনিয়াবি শাস্তি, লাঞ্ছনা ও অবমাননা ইহুদিদের উপর এভাবে হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর বরকতময় জীবদ্দশায়ই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে চতুর্থ হিজরিতে যখন রাসূল ﷺ-এর সততার উপর আউস ও খায্‌রাজ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন হযরত সা'আদ ইবনে মুআয (রা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনূ কোরায়যার সাতশত যুবককে হত্যা করা হয়েছে এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দি করা হয়েছে। বনূ নযীরকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সূরা আহ্‌যাব এবং সূরা হাশরের মধ্যে উল্লিখিত দুটি ঘটনার বাস্তবতা বিদ্যমান আছে। আর পরকালে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা পরকালে পতিত হবে। [কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৪]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

নাকেরা ব্যবহার : আলোচ্য আয়াতে خِزْيٌ শব্দটি নাকেরা ব্যবহার করার দ্বারা এর ভয়াবহতা এবং তীব্রতা বুঝানো উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ

মাজায : অন্যকে হত্যা করলে কেসাসের মাধ্যমে হত্যাকারী নিজে নিহত হবে। তাই এখানে অন্যকে হত্যা করার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে নিজেকে হত্যা বলে। অতএব, تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ অংশটি মূলত মাজায হয়েছে।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة موضحة.

ب. كم قراءة فى قوله لا تعبدون، وحسنا، اكتب ثم اذكر من المخاطب بقوله "ثم توليتم مع ايضاح تحقيق قوله" بنى اسرائيل".

ج. ظاهر معنى "بنى اسرائيل واليهود والنصارى يدل على الخير فلم نستشيط عضبانا عليهم، اوضح حيث يكشف المراد.

د. كم قسما للحق المشروع فى الاسلام وما هى؟ وخلاصة الاسلام ما هى؟ اكتب مع بيان ان الآية المذكورة هل تشتمل على هذين الامرين؟ وان كان الجواب بنعم فكيف؟ اوضح حيث يتضح المرام، ثم بين آيات موافقات لهذه الآية.

ه. بين ما استفدت من ترتيب اجزاء الآية، كما ترى بحيث يندفع الانغلاق ثم اوضح اهمية الاوصاف المودعة فى الآية بالتفكر التام.

و. كم موضعا ذكر فيه امر الزكوة مع اقامة الصلاة اذكر بعضها مع بيان حكمة ذلك.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ - ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.

ب. فسر الآيتين الكريمتين كما فسرها المصنف العلام بالايضاح التام.

ج. حقق الالفاظ الآتية : تسفكون، تشهدون، تظاهرون، اسرى، تفدوهم، ثم ركب قوله "وهو محرم عليكم اخراجهم"

د. بين ما استفدت من الآية ما التعليم منها.

রুকূ' : ১১

بَيَانُ جَرَائِمِ الْيَهُوْدِ الَّتِي ارْتَكَبُوْهَا وَقَبَائِحِهِمْ

ইহুদিদের কৃত বিভিন্ন অপরাধ ও মন্দ কাজের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ঈমানী দাওয়াতে ইহুদিদের প্রশ্ন ও তার জবাব
- ইহুদিদের হঠকারিতার বর্ণনা
- পার্থিব জীবনের প্রতি ইহুদিদের লোভাতুর হওয়া
- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিভিন্ন নবীগণকে কিতাব ও মু'জিযা প্রদান
- ইহুদিদের দ্বারা নবীগণের শহীদ হওয়ার ঘটনা
- রাসূল ﷺ-এর প্রতি ইহুদিদের কটাক্ষ ও তার জবাব
- ইহুদিদের কুরআন অস্বীকার ও এর পরিণতি

٨٧. ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ﴾ التَّوْرَاةَ ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ﴾ أَيْ أَتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا فِيْ إِثْرِ رَسُوْلٍ ﴿وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ﴾ الْمُعْجِزَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوْتٰى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ ﴿وَاَيَّدْنٰهُ﴾ قَوَّيْنَاهُ ﴿بِرُوْحِ الْقُدُسِ﴾ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوْفِ إِلَى الصِّفَةِ أَيْ الرُّوْحُ الْمُقَدَّسَةُ جِبْرِيلُ لِطَهَارَتِهِ يَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا ﴿اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ ۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى﴾ تُحِبُّ ﴿اَنْفُسُكُمُ﴾ مِنَ الْحَقِّ ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ تَكَبَّرْتُمْ عَنِ اتِّبَاعِهِ جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الِاسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيخُ ﴿فَفَرِيْقًا﴾ مِنْهُمْ ﴿كَذَّبْتُمْ﴾ كَعِيسٰى ﴿وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ﴾ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ أَيْ قَتَلْتُمْ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى.

৮৭. আর নিশ্চয় মূসাকে কিতাব তাওরাত দিয়েছি অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি অর্থাৎ, এক রাসূলের পিছনে অপর রাসূলকে প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম তনয় ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি মু'জিযা যেমন- মৃতকে জীবন দান, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীর রোগমুক্ত করা এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি শক্তিশালী করেছি। رُوْحُ الْقُدُسِ বাক্যটিতে صِفَة-এর প্রতি مَوْصُوْف-এর اَلرُّوْحُ الْمُقَدَّسَةُ তিনি إِضَافَتْ হয়েছে। মূলত ছিল হলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। পবিত্রতার জন্য তিনি এই নামে অভিহিত হন। যে স্থানেই হযরত ঈসা (আ.) গমন করতেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে থাকতেন তারপরেও তোমরা সৎপথে অবিচল থাকলে না। তবে কি যখনই কোনো রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু সত্য এনেছেন, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তোমাদের পছন্দ নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ তা অনুসরণ করা হতে। এটা كُلَّمَا-এর জবাব। প্রশ্নতব্য বিষয়টিও এটাই। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং তাদের কতককে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে। আর কতককে হত্যা করেছ যেমন- হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে। تَقْتُلُوْنَ ক্রিয়াটি مُضَارِعْ; যা এখানে অতীতে সংঘটিত বিষয়টিকে ঘটমানরূপে চিহ্নিত করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٨. ﴿وَقَالُوْا﴾لِلنَّبِيِّ اسْتِهْزَاءً ﴿قُلُوْبُنَا غُلْفٌ﴾ جَمْعُ أَغْلَفَ أَيْ مُغَشَّاةٌ بِأَغْطِيَةٍ فَلَا تَعِي مَا تَقُوْلُ قَالَ تَعَالٰى ﴿بَلْ﴾ لِلْإِضْرَابِ ﴿لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ﴾ أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقَبُوْلِ ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ وَلَيْسَ عَدَمُ قَبُوْلِهِمْ لِخَلَلٍ فِي قُلُوْبِهِمْ ﴿فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ﴾ مَا زَائِدَةٌ لِتَأْكِيْدِ الْقِلَّةِ أَيْ إِيْمَانُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا .

৮৮.তারা নবীকে উপহাস করে বলে আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত, غُلْفٌ শব্দটি أَغْلَفُ-এর বহুবচন। অর্থাৎ, পর্দায় আবৃত। ফলে তুমি যা বল তা সংরক্ষণ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বরং بَلْ শব্দটি إِضْرَاب (প্রসঙ্গ পরিবর্তন) অর্থে। আল্লাহ তা'আলা তাদের লানত দিয়েছেন তাঁর রহমত হতে তাদেরকে বিতাড়িত করেছেন এবং সত্য গ্রহণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন।সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে তাদের এই প্রত্যাখ্যান হৃদয়ের গঠন-ত্রুটির কারণে নয়। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। مَا শব্দটি অতিরিক্ত। قُلَّةٌ-এর তাকীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ঈমান অতি সমান্যই।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : بِرُوْحِ الْقُدُسِ مِنْ اِضَافَةِ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ

رُوْحُ الْقُدُسِ-এর স্বরূপ বর্ণনা : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) رُوْحُ الْقُدُسِ শব্দটি মৌলিক গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, মূলত শব্দটি ছিল اَلرُّوْحُ الْمُقَدَّسَةُ; কিন্তু পরবর্তীতে মাওসূফকে সিফাতের দিকে ইযাফত করে বলা হলো- رُوْحُ الْقُدُسِ এ গঠনপদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো- رُوْحُ ও اَلْقُدُسُ-এর মাঝে সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রকাশ করা। মাওসূফ-সিফাতের অবস্থায় اَلْقُدُسُ-এর নিসবত হয় رُوْحُ-এর প্রতি। আর ইযাফতের ক্ষেত্রে হয় এর উদ্দেশ্যটা। যার কারণে اِخْتِصَاص সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهُ : يَسِيْرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ

হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : উপরিউক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুফাসসির (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, উহ্য প্রশ্নটি হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.) তো সকল নবীকেই শক্তি যুগিয়েছেন। তাহলে এখানে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা বলা হলো কেন? এর উত্তর হলো আল্লহ তা'আলা তাঁকে শিশুকাল থেকে আসমানে তুলে নেওয়া পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে ছায়ার মতো লেগে থেকে তাঁকে সাহায্য করেছেন। এখানে তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَلَمْ تَسْتَقِيْمُوْا . اَفَكُلَّمَا

اَفَكُلَّمَا-এর মা'তূফ আলাইহি নির্ণয় : এ অংশটুকু দ্বারা মুাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, وَلَقَدْ آتَيْنَا .... الْقُدُسِ পর্যন্ত অংশটুকু বর্ণনা করার দ্বারা ইহুদিদের ওয়াদায় স্থীর না থাকার বিষয়টি তুলে ধরা উদ্দেশ্য তা ছাড়া এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَفَكُلَّمَا উহ্য শব্দের উপর আতফ। মূলে ছিল فَلَمْ تَسْتَقِيْمُوْا فَاسْتَكْبَرْتُمْ كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ الخ আর মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহির মাঝে ইস্তিফহামের হামযাটি ধমকের জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ : بِمَا لَا تَهْوٰى . مِنْ الْحَقِّ

উহ্য عَائِد-এর প্রতি ইঙ্গিত : مِنَ الْحَقِّ বলার দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, مَا لَا تَهْوٰى أَنْفُسُكُمْ-এর মাঝে ما-টি ইসমে মাওসূল। আর তার عَائِدْ উহ্য রয়েছে। একইভাবে তিনি এর দ্বারা ما-এর উদ্দেশ্যও বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে সত্য তোমরা পছন্দ করো না।

قَوْلُهُ : اِسْتَكْبَرْتُمْ . تَكَبَّرْتُمْ

اِسْتِفْعَال-টি তলবের অর্থবিহীন : মুফাসসির (র.) اِسْتَكْبَرْتُمْ-এর ব্যাখ্যা تَكَبَّرْتُمْ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, اِسْتَكْبَرْتُمْ-এর মাঝে طَلَبْ-এর অর্থ নেই; বরং হরফের আধিক্য দ্বারা বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ

প্রশ্নের ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য নির্ণয় : মুফাসসির (র.) আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা আয়াতে প্রশ্নটির ক্ষেত্র ও কারণ বর্ণনা করেছেন। যদিও هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ-টি শর্তের শুরুতে এসেছে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জওয়াব সম্পর্কে। মূলরূপ হলো- أَسْتَكْبَرْتُمْ كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ ... الخ; আর এ জিজ্ঞাসা দ্বারা মূলত ধমক উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলার জন্য জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা অসম্ভব।

قَوْلُهٗ : وَفِرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ. اَلْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ اَىْ قَتَلْتُمْ

قَتَلْتُمْ-এর পরিবর্তে تَقْتُلُوْنَ ব্যবহার করার কারণ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। যার মর্মার্থ হলো, تَقْتُلُوْنَ দ্বারা বুঝা যায় ইহুদিরা এ আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ও নবীদেরকে হত্যা করছিল। অথচ এটা বাস্তবের পরিপন্থি। উচিত ছিল كَذَّبْتُمْ-এর মতো قَتَلْتُمْ ব্যবহার করা।

এর সমাধানে মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে জঘন্যতা বুঝানোর জন্য অতীতকে বর্তমানের স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। যেন নবী হত্যার ঘটনা বর্তমানেও দৃষ্টির সামনে রয়েছে। আর এটাকে حِكَايَةُ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ বলা হয়।

قَوْلُهٗ : كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى

হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যা : বহু সংখ্যক নবী বনী ইসরাঈলের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মাঝে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.) অন্যতম। এজন্য মুফাসসির (র.) উদাহরণস্বরূপ তাঁদের দুজনের নাম উল্লেখ করেছেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) শহীদ হয়েছিলেন নাকি তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, সে ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। দুটি অভিমতের ভিত্তিই হলো ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ-এর ইসরাঈলী বর্ণনা। তবে সঠিকতম অভিমত হলো, তিনি ইহুদিদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত কোনো ঘটনা জানা যায় না। আর এ সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো, ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নরের কাছে হযরত যাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা বলে গভর্নরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। ফলে সে হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে ধাওয়া করে। হযরত যাকারিয়া (আ.) জঙ্গলে একটি বৃক্ষের ফাঁকে আত্মগোপন করেন। ঘটনাক্রমে তাঁর চাদরের একটি পার্শ্ব বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। হতভাগারা তা দেখতে পেয়ে বৃক্ষসহ নবীকে করাত দ্বারা চিরে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। [হাশিয়তুস সাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০]

উপরিউক্ত ঘটনাটি ইসরাঈলী বর্ণনা। ইবনে কাসীর (র.) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াতে এ ঘটনাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য মুহাক্কিকগণও এ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

হযরত ইয়াহইয়া (আ.) যাকারিয়া (আ.)-এর পুত্র। তাঁর শহীদ হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এক অসৎ নারীকে তাঁর কোনো এক মাহরাম আত্মীয় বিবাহ করতে চাইলে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাকে বারণ করেন। ফলে সে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বর্ণনায় রয়েছে, সে লোকটি বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নর ছিল। [প্রাগুক্ত]

কিন্তু মুহাক্কিকগণ এ ঘটনাটির সত্যতার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। তবে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার বিবরণ বাইবেলে পাওয়া যায়। সেখানকার বর্ণনা অনুযায়ী এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ইহুদিদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয়। [কাসাসুল কুরআন (অনুবাদ) : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮১]

قَوْلُهٗ : وَقَالُوْا. لِلنَّبِيِّ اِسْتِهْزَاءً

বক্তার যুগ নির্ণয় : আলোচ্য অংশে لِلنَّبِيِّ দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, এ বক্তব্য হলো নবী করীম ﷺ-এর সমসাময়িক ইহুদিদের; পূর্বসূরি ইহুদিদের নয়।

قَوْلُهٗ : قُلُوْبُنَا غُلْفٌ. جَمْعُ اَغْلَفَ

غُلْفٌ-এর অর্থ নির্ণয় : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) غُلْفٌ-এর অর্থ এবং আলোচ্য আয়াতে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কারণ غُلْفٌ শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো- খতনা করা হয়নি যার, অর্থাৎ, তাদের অন্তর পর্দার মাধ্যমে ঢেকে রাখার কারণে কিছুই তারা বুঝতে পারে না।

قَوْلُهٗ : بَلْ. لِلْاِضْرَابِ. لَعَنَهُمُ اللّٰهُ

بَلْ শব্দটির অর্থ নির্ণয় : بَلْ لَعَنَهُمُ الخ আয়াতটির মধ্যে بَلْ শব্দটি اِنْتِقَال বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার হয়েছে। এর দ্বারা তাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ . مَا زَائِدَةٌ لِتَاْكِيْدِ الْقِلَّةِ

ধার্যকৃত বিষয়ের আংশিকের প্রতি ঈমান : مَا يُؤْمِنُوْن-এর ما-টি অতিরিক্ত, তা অর্থগতভাবে ঈমানের স্বল্পতাকে জোরদার করছে। অর্থাৎ, খুবই সামান্য ঈমান। মুফাসসির (র.) اِيْمَانُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا ইবারত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে স্বল্পতা হলো مُؤْمِنٌ بِهٖ-এর দিক থেকে। قَلِيْل শব্দটি ঈমানের গুণবাচক; মূলরূপ হলো– لَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا بِقَلِيْلٍ مِمَّا كُلِّفُوْا بِهٖ (তাদের জন্য ধার্যকৃত বিষয়ের অল্পতেই তারা ঈমান রাখে)। অর্থাৎ, কিতাবের আংশিকের প্রতি তারা ঈমান রাখে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে قَلِيْلًا শব্দটি مُؤْمِنٌ-এর সিফাত। এক্ষেত্রে অর্থ হবে- তাদের অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান আনে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

قَفَّيْنَا : সীগাহ جَمْعْ مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَات فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْفِيَّةُ মূলবর্ণ (ق.ف.و) জিনস نَاقِصِ وَاوِىْ অর্থ– আমি পরে পাঠিয়েছি। قَفَّىْ ফে'লটি দুটি مَفْعُوْل দাবি করে। সাধারণত তার مَفْعُوْل-এর উপর حَرْفِ جَرْ দাখিল হয় না। যেমন– قَفَّيْتُ زَيْدًا عَمْرًوا অর্থাৎ, আমি যায়েদকে ওমরের পিছনে প্রেরণ করেছি। কখনো দ্বিতীয় مَفْعُوْل-এর উপর بِ দাখিল হয়। যেরূপ কুরআন শরীফে ব্যবহার রয়েছে। যেমন– وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ অর্থাৎ, আমি তার পরে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি।

✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ ..... بِرُوْحِ الْقُدُسِ

واو হরফে ইস্তিনাফিয়া কসম অর্থে। لَام হলো উহ্য জাওয়াবে কসম اٰتَيْنَا قَدْ ফে'ল, যমীর ফায়েল مُوْسٰى প্রথম মাফ'উলে বিহী اَلْكِتٰب দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاو হরফে আতফ قَفَّيْنَا ফে'ল, যমীর ফায়েল مِنْ بَعْدِهٖ মুতায়াল্লিকে আওয়াল بِالرُّسُل মুতা'আল্লিকে ছানী সব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। واو হরফে আতফ اٰتينا ফে'ল, যমীর ফায়েল عِيْسٰى মুবদাল মিনহু اِبْنِ مَرْيَمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে বদল। মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে প্রথম মাফ'উলে বিহী اَلْبَيِّنَات দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী এবং সব মিলে মা'তূফ। وَاو হরফে আতফ اَيَّدْنَاهُ ফে'ল, ফায়েল, ه মাফ'উলে বিহী بِرُوْحِ الْقُدُسِ মুতা'আল্লিক সবগুলো মিলে মা'তূফ।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ .... فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْن

وَاو ইস্তিনাফিয়া قَالُوْا ফে'ল ও যমীর ফায়েল قُلُوْبُنَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা غُلْفٌ খবর উভয়টি নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে مَقُوْلَه হিসেবে نَصَبْ-এর স্থানে। بَلْ হরফে আতফ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ফে'ল-মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম ও ফায়েল بِكُفْرِهِم মুতা'আল্লিক لَعَنَهُم ফে'লের সাথে। فَاء হরফে আতফ اِيْمَانا উহ্য মাওসূফ قَلِيْلًا সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফ'উলে মুতলাক মুকাদ্দাম। يُؤْمِنُوْنَ ফে'ল, ফায়েল ও মাউলে মুতলাক মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে আতেফা।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূ'দ্বয়ের মাঝে যোগসূত্র

পূর্বের রুকূ'র শেষ অংশে ইহুদিদের পরস্পর রক্তপাত ও দেশান্তরের আলোচনা করা হয়েছে। একই তাওরাতের কিছু বিধান মানা আর কিছু না মানার জন্য হুমকি ও শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য রুকূ'তে, এগুলোর চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ তথা নবীদেরকে হত্যা করার আলোচনা এসেছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى ... وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

اَلْكِتَاب-এর দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। বনী ইসরাঈলকে একটি পূর্ণ স্বতন্ত্র শরিয়ত দান করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর পরেও অনেক নবীর আগমন ঘটেছে। এ ধারার সর্বশেষ নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। কেমন যেন তিনি বনী ইসরাঈলের নবীদের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একই সাথে পূর্ণ তাওরাত অবতীর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ.)-কে তা বহন করার নির্দেশ দেন।

তখন তিনি তা বহন করে নিয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের সমস্ত হরফের সংখ্যা পরিমাণ ফেরেশতা নাজিল করেছিলেন; কিন্তু তারা তা বহন করতে সক্ষম হলো না। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট তা সহজ করে তার উপর করুণা করলেন। যে কারণে তিনি তা বহন করতে সক্ষম হলেন। [রূহুল মাআনী]

হযরত ঈসা (আ.) ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র নন : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ (মারইয়াম পুত্র ঈসা) দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর নবীসুলভ মাহাত্ম্য সত্ত্বেও একজন মানব সন্তানই ছিলেন। একজন সাধারণ নারীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সুতরাং তিনি ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র- এ সবের কিছুই ছিলেন না। এছাড়া وَاَيَّدْنَاهُ দ্বারাও বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) মানুষ ছিলেন এবং মানুষ হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন। সে জন্য একজন ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করা হতো।

رُوْحُ الْقُدُسِ-এর ব্যাখ্যা : وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অংশটিতে رُوْحُ الْقُدُسِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. এটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উপাধি। যেমন- اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ -ও তাঁর নাম। আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের জন্য সর্বদা তাঁকে ঈসা (আ.)-এর সাথে নিয়োজিত রেখেছেন, আলোচ্য আয়াতে بِرُوْحِ الْقُدُسِ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. 'রূহুল কুদুস' দ্বারা ইসমে আযম বুঝানো হয়েছে, যার বরকতে হযরত ঈসা (আ.) মৃতদেরকে জীবিত করতেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব : হযরত ঈসা (আ.)-এর অতিরিক্ত কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব ছিল। যার কারণে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অন্যতম হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.) সর্বদা তাঁর সঙ্গী হওয়া এবং সবধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ.) স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.)-কে হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বারা সহযোগিতার বিবরণ : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সহযোগিতা বিভিন্ন সময়ে হয়েছিল ১. সর্বপ্রথম ফুঁকের মাধ্যমে মায়ের উদরে গর্ভধারণ করা। ২. ভূমিষ্টের সময় শয়তানি ক্রিয়া ও প্রভাবসমূহ থেকে সংরক্ষণ করা। ৩. আজীবন ইহুদি শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। ৪. অবশেষে যখন তাকে শহীদ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তখন আল্লাহর নির্দেশে জীবিত অবস্থায় নিরাপদে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। [কামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৬]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ .... فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ

ইহুদিদের হৃদয় আচ্ছাদিত : ইহুদিরা প্রকাশ্যে গর্বভরে বলে বেড়াত যে, ইসলামের দাওয়াত বা এ নতুন নবী যা কিছুই করে ফেলুক না কেন, আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না, আমরা তাঁর কথার অনুসরণ করছি না। কারণ, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত। অতএব, এ নবীর কোনো কর্মকাণ্ড আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করবে না।

ইহুদিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জবাব দিয়ে পবিত্র কুরআন বলছে যে, তাদের আত্মম্ভরিতা কোনো গর্ব-গৌরবের বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং আল্লাহর অভিশাপের লক্ষণমাত্র।

আর এ অভিশাপ ও গযবের শিকার হওয়া তাদের সজ্ঞান কুফরি এবং আল্লাহ তা'আলার নবীর বিরোধিতা ও গোয়ার্তুমির কারণে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ : فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ

আলোচ্য আয়াতাংশের فَرِيْقًا শব্দটি مَفْعُوْلٍ بِهٖ; যার আমেল হলো كَذَّبْتُمْ; যা পরবর্তীতে এসেছে। এখানে গুরুত্ব বুঝানো বা আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাফ'উলকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত ঈসা (আ.)-এর পরিচিতি : হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলীদের নবুয়তধারার মধ্যে সর্বশেষ নবী। ঈসায়ী বর্ষ [ঈসাব্দ ও খ্রিষ্টাব্দ] তাঁরই নামে প্রচলিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গর্ভে বায়তুল মুকাদ্দাসের একপ্রান্তে জন্ম লাভ করেন। শাম দেশের [বর্তমান সিরিয়া-ফিলিস্তিন] গালীল পার্বত্য অঞ্চলে নাসিরা নামক স্থানে ছিল হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পূর্বপুরুষদের আবাস।

শাম দেশ তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন একটি আধা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ছিল। হেরোদ ছিল তখনকার শামের শাসক। খ্রিষ্ট বর্ষপঞ্জীতে শুরু থেকেই তিন বছরের ভুল চলে আসছে। অর্থাৎ, খ্রিষ্ট বর্ষপঞ্জীর প্রথম বছর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম সন নয়; বরং তিন বছর পর তার জন্ম হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ৩য় খ্রিষ্টাব্দে তার জন্ম। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিশ্বাসমতে, ৩৩ বছর বয়সে তিনি জীবিত অবস্থায় [আর খ্রিষ্টানদের মতে, তিন দিন মৃত থাকার পর] আকাশে উত্থিত হয়েছেন। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬]

হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পরিচিতি : মারইয়াম বিনতে ইমরান ইবনে মাশান ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি অভিজাত পরিবারের কন্যা ছিলেন। মারইয়াম (আ.)-এর মাতার নাম ছিল হান্নাহ। ইমরান ও হান্নাহ উভয়ই পরহেজগার ছিলেন। ইমরান ছিলেন সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর বংশধর। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ একমত। অতএব, মারইয়াম (আ.)-ও সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। আর হান্নাহ সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, তিনিও দাউদ (আ.)-এর বংশধর ছিলেন।

মারইয়াম হলো হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হলো খাদেম। ইমরান-হান্নাহ দাম্পতির সন্তান হচ্ছিল না। তখন হান্না মানত করেন যে, তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে বায়তুল মাকদিসের খাদেম হিসেবে ওয়াফক করবেন। এ কারণেই তাঁর এই নাম দেওয়া হয়েছে। খ্রিষ্ট বর্ণনা মতে, তাঁর মৃত্যু ৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। [প্রাগুক্ত]

৮৯. যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল অর্থাৎ আল কুরআন যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের নিকট রয়েছে অর্থাৎ তাওরাত। আর তারা এর পূর্বে অর্থাৎ, কুরআন আসার পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে (এর অসিলায়) বিজয় প্রার্থনা করতো সাহায্য প্রার্থনা করতো, তারা বলত, হে আল্লাহ! শেষ জামানায় প্রেরিতব্য নবীর অসিলায় তুমি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। তারা যে সত্য সম্পর্কে অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা হিংসা ও ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় তা প্রত্যাখ্যান করল। দ্বিতীয় لَمَّا-এর জবাবটি প্রথমোক্ত لَمَّا-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত।

٨٩. ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ مِنَ التَّوْرَاةِ هُوَ الْقُرْآن ﴿وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ﴾ قَبْلَ مَجِيْئِهِ ﴿يَسْتَفْتِحُوْنَ﴾ يَسْتَنْصِرُوْنَهُ ﴿عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ أُنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ آخِرَ الزَّمَانِ ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا﴾ مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بِعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ ﴿كَفَرُوْا بِهٖ﴾ حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْأُوْلَى دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ الثَّانِيَةِ ﴿فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾.

৯০. তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে অর্থাৎ পুণ্যফলের স্বীয় হিস্যা বিক্রয় করেছে। اِشْتَرَوْا এ স্থানে بَاعُوْا [বিক্রয় করা] অর্থে ব্যবহৃত। بِئْسَمَا-এর مَا শব্দটি نَكِرَة এবং شَيْئًا অর্থে ব্যবহৃত। পুনরায় مَا শব্দটি بِئْسَ-এর ফায়েলের تَمْيِيْزٌ; আর اَنْ يَّكْفُرُوْا হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ; আর তাদের বিক্রয় হলো, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ কুরআন হিংসাপরায়ণ হয়ে بَغْيًا শব্দটি يَكْفُرُوْا-এর مَفْعُوْلٌ لَهُ; অর্থাৎ, ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা তা পরিত্যাগ করে অর্থাৎ, তাদের এ পরিত্যাগ কত নিকৃষ্ট! শুধু এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য হতে রেসালাতের জন্য যাকে ইচ্ছা তার উপর স্বীয় অনুগ্রহ ওহী অবতীর্ণ করেন। يُنَزِّلُ ক্রিয়াটি তাশদীদহীন ও তাশদীদসহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। সুতরাং অবতীর্ণ ওহী প্রত্যাখ্যান করায় তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উপর তাওরাত বিনষ্ট করেও হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করে তারা পূর্বে যে ক্রোধের পাত্র হয়েছিল ক্রোধসহ ফিরল প্রত্যাবর্তন করল। বিরাটত্ব ও ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে غَضَبٌ শব্দটি نَكِرَة ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান অবতীর্ণ ওহী অস্বীকার করার কারণে। আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক অবমাননাকর শাস্তি রয়েছে।

٩٠. ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا﴾ بَاعُوْا ﴿بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ﴾ أَيْ حُظَّهَا مِنَ الثَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنٰى شَيْئًا تَمْيِيْزًا لِفَاعِلِ بِئْسَ وَالْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِّ ﴿اَنْ يَّكْفُرُوْا﴾ أَيْ كُفْرُهُمْ ﴿بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ مِنَ الْقُرْآن ﴿بَغْيًا﴾ مَفْعُوْلٌ لَهُ لِيَكْفُرُوا أَيْ حَسَدًا عَلٰى ﴿اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ﴾ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ ﴿مِنْ فَضْلِهٖ﴾ الْوَحْيِ ﴿عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ﴾ لِلرِّسَالَةِ ﴿مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ﴾ رَجَعُوا ﴿بِغَضَبٍ﴾ مِنَ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَالتَّنْكِيْرُ لِلتَّعْظِيْمِ ﴿عَلٰى غَضَبٍ﴾ اسْتَحَقُّوْهُ مِنْ قَبْلُ بِتَضْيِيْعِ التَّوْرَاةِ وَالْكُفْرِ بِعِيْسٰى ﴿وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾ ذُوْ إِهَانَةٍ.

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ ـ قَبْلَ مَجِيْئِهِ

মুযাফ ইলাইহটি উহ্য : যেহেতু قَبْلُ শব্দটি مَبْنِىٌّ; সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে مُضَافٌ اِلَيْهِ-টি مَحْذُوْفٌ مَنْوِىٌّ; মুফাসসির (র.) مَجِيْئِهِ উল্লেখ করে সে মুযাফ ইলাইহির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : يَسْتَفْتِحُوْنَ . يَسْتَنْصِرُوْنَ

طَلَبٌ-টি اِسْتِفْعَال-এর অর্থে : মুফাসসির (র.) এখানে এ তাফসীর করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে اِسْتِفْعَال দ্বারা طَلَب-এর অর্থ উদ্দেশ্য; মুবালাগা নয়।

قَوْلُهٗ : فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا . مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بِعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ

مَا عَرَفُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য : مِنَ الْحَقِّ الخ এটি مَا عَرَفُوْا-এর তাফসীর। এর দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, ما-টি ইসমে মাওসূল যার عَائِدْ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) বলেন, مَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম ﷺ-এর আগমন। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ-এর মহান সত্তা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : فَلَمَّا جَاءَهُمْ .... وَ جَوَابُ لَمَّا الْأُوْلٰى

প্রথম لَمَّا-এর উহ্য জবাব নির্ণয় : মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতটি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এখানে لَمَّا দুটি রয়েছে। كَفَرُوْا বাক্যটি দ্বিতীয় لَمَّا-এর جَوَاب; আর প্রথম لَمَّا-এর جَوَاب উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় لَمَّا-এর جَوَاب-ই তার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতএব, প্রথম لما-এর মূলরূপ হলো وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ .... كَفَرُوْا بِهٖ

قَوْلُهٗ : بِئْسَمَا اشْتَرَوْا . بَاعُوْا

اشْتَرَوْا-এর অর্থ বর্ণনা : اَلْاِشْتِرَاءُ শব্দটি ক্রয় করা এবং বিক্রয় করা উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র.) اشْتَرَوْا-এর পরে بَاعُوْا বলে বুঝিয়েছেন যে, اِشْتَرَوْا এখানে بَاعُوْا-এর অর্থে। আর জীবন যেহেতু কোনো পণ্য নয়, তাই এখানে বাস্তব বিক্রয় উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বীয় আত্মা বিক্রির অর্থ হলো, তারা ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাতে নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। যেন নফস হলো ঈমানের স্থলে পণ্য আর কুফর হলো মূল্য।

قَوْلُهٗ : مَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْئًا تَمْيِيْز

بِئْسَمَا-এর তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির এ অংশটুকু দ্বারা بِئْسَمَا অংশটুকুর তারকীব বর্ণনা করেছেন যে, بِئْسَ হলো فِعْلُ الذَّمِّ; আর مَا-টি شَيْءٌ-এর সমার্থক নাকেরা। এটি بِئْسَ-এর উহ্য ফায়েলের তামঈয হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। মূলরূপ হলো- بِئْسَ شَيْئًا

قَوْلُهٗ : وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ . أَنْ يَكْفُرُوْا أَيْ كُفْرُهُمْ

أَنْ يَكْفُرُوْا-এর তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) أَيْ كُفْرِهِمْ বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, أَنْ-টি مَصْدَرِيَّة ফলে পরবর্তী অংশটুকু মাসদারের তাবীল হয়ে اَلْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ হবে।

قَوْلُهٗ : بَغْيًا مَفْعُوْلٌ لَهٗ لِيَكْفُرُوْا اَىْ حَسَدًا

بَغْيًا শব্দের ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ (র.) بَغْيًا-এর তাফসীর حَسَدًا করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে بَغْيًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- হিংসা। কারণ, بَغْيٌ অর্থ-অন্বেষণ করা, কামনা করা। আর কামনার বিভিন্ন ধরন আছে। তন্মধ্যে কারো নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনা করাকে حَسَدٌ বলে।

قَوْلُهٗ : عَذَابٌ مُهِيْنٌ . ذُوْ اِهَانَةٍ

مُهِيْنٌ-এর ব্যাখ্যা : এটি مُهِيْنٌ-এর তাফসীর। مُهِيْنٌ হলো আজাবের দূত বা ফেরেশতা। আজাবের দিকে তার নিসবতটা مَجَاز হিসেবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে লাঞ্ছিতকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। আজাব হলো কারণ। এটাকে مُجَازٌ عَقْلِيٌّ বলে। মুফাসসির (র.) ذُوْ اِهَانَةٍ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَسْتَفْتِحُوْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاح মূলবর্ণ ف.ت.ح জিনস صَحِيْحٌ অর্থ- তারা বিজয় প্রার্থনা করতো।

بَغْيًا : শব্দটির মূল অর্থ- কামনা করা, তালাশ করা, চাওয়া। কামনা করার অনেক ধরন হতে পারে। যথা-

১. হিংসা করে অন্যের নেয়ামত চলে যাওয়ার কামনা করা।
২. অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করার আশা করা।
৩. জেনা করতে মন চাওয়া। যেমন- وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا;
৪. অহংকার করতে চাওয়া। যেমন- اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ

بَاءُوْا : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ إِثْبَاتِ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُوْءُ মূলবর্ণ (ب.و.ء) জিনস مَهْمُوْزِ لَام ও اَجْوَفْ وَاوِىْ (مركب) অর্থ- তারা প্রত্যাবর্তন করল। بَاءَ بِشَيْءٍ -কোনো কিছু নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

مُهِيْنٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ إِسْمِ فَاعِلْ বাব اِفْعَال মাসদার اَلْإِهَانَةُ মূলবর্ণ (ه.و.ن) জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ- লাঞ্ছনাদায়ক।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ ..... فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

وَاو হরফে ইস্তিনাফিয়া لَمَّا যরফিয়া শর্তের অর্থে। جَاءَهُمْ ফে'ল-মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম كِتٰبٌ ফায়েল مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ জার-মাজরূর মুতা'আল্লিক كِتٰبٌ মাওসূফের উহ্য সিফাতে আওয়াল। مُصَدِّقٌ শিবা ফে'ল, لَام হরফে জার مَا মাওসূল مَعَهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফে মুতা'আল্লিক ثٰبِتٌ উহ্য ফে'লের সাথে, উহ্য ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলা মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক مُصَدِّقٌ শিবা ফে'লের সাথে। শিবা ফে'ল মুতা'আল্লিকের সাথে মিলে সিফাতে ছানী كِتٰبٌ-এর। মাওসূফ তার উভয় সিফাত মিলে جَاءَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। جَاءَ ফে'ল তার ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া।

وَاو হালিয়া كَانُوْا ফে'লে নাকেস যমীর তার ইসম مِنْ قَبْلُ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম يَسْتَفْتِحُوْنَ ফে'লের সাথে। يَسْتَفْتِحُوْنَ ফে'ল যমীর ফায়েল عَلٰى হরফে জার اَلَّذِيْنَ মাওসূলা كَفَرُوْا ফে'ল যমীর ফায়েল, জুমলা হয়ে সেলা। মাওসূল সেলা মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতায়াল্লিকে ছানী يَسْتَفْتِحُوْنَ-এর সাথে, يَسْتَفْتِحُوْنَ ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে খবরে كَانُوْا; كَانُوْا তার ইসম ও খবর মিলে جملة فعلية ناقصة হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ

اَنْ يُّنَزِّلَ শব্দের কেরাত : ৯০ নং আয়াতে উল্লিখিত اَنْ يُّنَزِّلَ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে বাবে تَفْعِيْل থেকে ز বর্ণে তাশদীদসহ اَنْ يُّنَزِّلَ পড়েছেন।

খ. আবূ আমের ও ইবনে কাসীর (র.) শব্দটিকে বাবে اِفْعَال থেকে ز বর্ণে তাশদীদবিহীন اَنْ يُّنْزِلَ পড়েছেন।

اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِىْ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ ✪

فَبَاءُوْا শব্দের লিখনশৈলী : ৯০ নং আয়াতে উল্লিখিত فَبَاءُوْا শব্দের দুটি লিখনশৈলী পাওয়া যায়। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির وَاو বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে فَبَاءُوْا লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির وَاو বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফবিহীন فَبَاءُو লেখা হয়।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ .... فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে মদিনার বনূ কুরাইযা ও বনূ নযিরের ইহুদিরা আউস ও খাযরাজের সাথে যুদ্ধ করার সময় শেষ নবীর অসিলা দিয়ে বিজয় প্রার্থনা করে বলত- اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِىِّ الْمَبْعُوْثِ اٰخِرَ الزَّمَانِ; কিন্তু রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর তারা তাকে অস্বীকার করে বসে। তখন একবার হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, দাউদ ইবনে সালামা (রা.) প্রমুখ তাদেরকে বলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ, আমরা যখন মুশরিক ছিলাম, তখন তোমরাই হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অসিলায় সাহায্য কামনা করতে এবং আমাদেরকে তাঁর আবির্ভাবের কথা বলতে। তখন বনূ নযীরের এক ব্যক্তি বলে উঠে, মুহাম্মদ ﷺ যে গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন তা আমরা চিনি না। আর আমরা যার আবির্ভাবের কথা আলোচনা করতাম, তিনি সে ব্যক্তি নন। তখন সূরা বাকারার ৮৯ নং আয়াতটি নাজিল হয়। [আত-তাফসীরুল মুনীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২; তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা- ১৬০]

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ .... وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ

পূর্বের আয়াতে জেনে-বুঝে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি কুফরের আলোচনা ছিল। এখানে তার নিন্দা করা হচ্ছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ .... فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

কুরআন مُصَدِّقٌ হওয়ার ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে كِتَابٌ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য, কুরআন مُصَدِّقٌ বলার কারণ হলো, কুরআন পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আর পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে তাওরাত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এখানে تَصْدِيْقٌ বলতে কী উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা–

১. تَصْدِيْقٌ বা সত্যায়ন করার অর্থ হলো, সব اُصُوْل এবং অধিকাংশ فَرْعْ-এর মাঝে কুরআন তাওরাতের অনুসারী।

২. কেউ কেউ বলেন, তাওরাতে পবিত্র কুরআনের যে গুণাবলি এসেছে, কুরআন সে গুণাবলি অনুযায়ীই নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ أَنْفُسَهُمْ ..... وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

রাসূল ﷺ-কে ইহুদিদের অস্বীকারের কারণ : পবিত্র কুরআন বহুবার এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইহুদিদের কুফর ও সত্য প্রত্যাখান কোনো ইজতেহাদি ভ্রান্তি নয়; বরং তা ছিল শুধুমাত্র এ ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণে যে, নবুওয়ত ইসরাঈলী বংশধারা থেকে না হয়ে ইসমাঈল বংশীয় একজন কেন পেয়ে গেল? আলোচ্য আয়াতেও ... بَغْيًا عَلَى অংশটুকু দ্বারা তাদের কুফরের এ কারণটি বর্ণনা করা হয়েছে।

দু'বার ক্রোধের ব্যাখ্যা : ক্রোধের উপর ক্রোধ-এর বিভিন্ন তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে। যথা–

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালাত প্রত্যাখ্যান করে এ ইহুদিরা প্রথমবার ক্রোধের পাত্র হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি অস্বীকৃতির কারণে তারা ক্রোধের পাত্র হলো। এটি হযরত হাসান, শাবী, ইকরিমা, আবুল আলিয়া ও কাতাদা (র.) প্রমুখের অভিমত। [তাফসীরে কাবীর]

২. প্রথম গজবের কারণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ও অকারণে রিসালাতের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান এবং দ্বিতীয়বার গজবের কারণ, তাদের হঠকারিতা, বিদ্বেষ ও মনোবৃত্তি তাড়িত হওয়া। কেননা তারা সত্য নবীকে অস্বীকার করল এবং তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলো। [তাফসীরে কাশশাফ, তাফসীরে বায়যাভী]

৩. কেউ কেউ বলেছেন, গজবের দ্বিরুক্তি দ্বারা পুনরাবৃত্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং তাকীদ ও জোরদার করা ও প্রচণ্ডতা বুঝানো। [তাফসীরে কাবীর]

আজাব মাত্রই অপমানকর নয় : لِلْكَافِرِيْنَ-এর لَامْ টি لَامْ الْاِخْتِصَاصْ; আর عَذَابٌ-এর পর مُهِيْن সিফাত যোগ করা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সব শাস্তি অপমানকর নয়। মুসলমানদেরকে তাদের পাপের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করা; তাদেরকে অপমান করা নয়। পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে অপমান করার জন্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ : فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহর : এখানে যমীরের স্থলে ইসমে যাহের আনা হয়েছে। এর হেকমত হলো এ কথা বুঝানো যে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত হওয়ার কারণ হলো কুফর।

قَوْلُهُ : عَذَابٌ . مُهِيْنٌ

সববের প্রতি ইসনাদ : আলোচ্য অংশে إِهَانَةٌ-কে عَذَابٌ-এর দিকে ইসনাদ করা হয়েছে। কারণ, عَذَابٌ-এর দ্বারা إِهَانَةٌ অর্জিত হবে। অর্থাৎ, عَذَابٌ-এর প্রতি إِهَانَةٌ-এর ইসনাদটি হয়েছে سَبَبٌ-এর ভিত্তিতে। এটি عِلْمُ الْبَيَانِ-এর অন্তর্ভুক্ত একটি শৈলী।

٩١. ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ ﴿قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ أَيْ اَلتَّوْرَاةِ قَالَ تَعَالٰى ﴿وَيَكْفُرُوْنَ﴾ الْوَاو لِلْحَالِ ﴿بِمَا وَرَآءَهٗ﴾ سِوَاهُ أَوْ بَعْدَه مِنَ الْقُرْآنِ ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ حَال ﴿مُصَدِّقًا﴾ حَالٌ ثَانِيَة مُؤَكِّدَة ﴿لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ﴾ أَيْ قَتَلْتُمْ ﴿اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ بِالتَّوْرَاةِ وَقَدْ نُهِيْتُمْ فِيْهَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَالْخِطَابُ لِلْمَوْجُودِينَ مِنْ زَمَن نَبِيِّنَا بِمَا فَعَلَ آبَاؤُهُمْ لِرِضَاهُمْ بِهِ.

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ কুরআন ইত্যাদি করেছেন, তোমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তখন তারা বলে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ, তাওরাত আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা প্রত্যাখ্যান করে وَيَكْفُرُوْنَ-এর وَاو অক্ষরটি حَالِيَّة; তা ছাড়া সবকিছুই অর্থাৎ, তা ব্যতীত বা তৎপরবর্তী যেমন- কুরআন। অথচ তা সত্য وَهُوَ الْحَقُّ বাক্যটি হাল এবং সমার্থক مُصَدِّقًا শব্দটি দ্বিতীয় হাল এবং প্রথমটির تَاكِيْد স্বরূপ যা তাদের নিকট আছে তার। তাদেরকে বলুন যদি তোমরা তাওরাতের বিশ্বাসী ছিলে, তবে কেন তোমরা ইতঃপূর্বে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করতে? অর্থাৎ, হত্যা করেছিলে। অথচ তাদেরকে হত্যা করতে তাওরাতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে। এই গর্হিত কাজ যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, তবুও এ স্থানে রাসূলে কারীম ﷺ-এর যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা পূর্বপুরুষদের এই কাজে সন্তুষ্ট ছিল।

٩٢. ﴿وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ﴾ بِالْمُعْجِزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ إِلٰهًا ﴿مِنْۢ بَعْدِهٖ﴾ مِنْ بَعْد ذَهَابه إِلَى الْمِيْقَاتِ ﴿وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ﴾ بِاتِّخَاذِهِ.

৯২. আর নিশ্চয় মূসা (আ.) তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ অর্থাৎ, মুজিযাসহ যেমন লাঠি, হস্ত, সমুদ্র বিদারণ ইত্যাদি নিয়ে আগমন করেছেন। অতঃপর অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ের জন্য তাঁর গমনের পর তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে। আর তা গ্রহণ করায় তোমরা হলে সীমালঙ্ঘনকারী।

٩٣. ﴿وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ﴾ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ ﴿وَ﴾ قَدْ ﴿رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ﴾ اَلْجَبَل حِيْنَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ قَبُوْلِهَا لِيَسْقُط عَلَيْكُمْ وَقُلْنَا ﴿خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ ﴿وَاسْمَعُوْا﴾ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سَمَاع قَبُولٍ ﴿قَالُوْا سَمِعْنَا﴾ قَوْلك ﴿وَعَصَيْنَا﴾ أَمْرَكَ ﴿وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ أَيْ خَالَطَ حُبُّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُخَالِط الشَّرَابُ ﴿بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿بِئْسَمَا﴾ شَيْئًا ﴿يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ﴾ بِالتَّوْرَاةِ عِبَادَةُ الْعِجْلِ ﴿اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ بِهَا كَمَا زَعَمْتُمُ الْمَعْنَى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ

৯৩. আর যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম। তাওরাত অনুসারে কাজ করার এবং যখন তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তখন তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরলাম। যেন তোমাদের উপর তা ভেঙে পড়ে। আর বললাম, যা দিলাম দৃঢ়ভাবে আয়াস ও অধ্যাবসায় সহকারে গ্রহণ করো এবং যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করো। তারা বলল, আমরা শ্রবণ করলাম তোমার কথা ও অমান্য করলাম তোমার নির্দেশ। আর কুফরির কারণে তাদের অন্তরে সিঞ্চিত হয়েছে গো-বৎসের ভালোবাসা অর্থাৎ, শরাবের মিশ্রণের ন্যায় তাদের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভালোবাসা সিঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আপনি তাদেরকে বলুন তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান তো বড় মন্দ জিনিসের অর্থাৎ, বাছুর-পূজার আদেশ করছে তোমাদেরকে, যদি তোমরা সত্যিই তাওরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক যেমনটি তোমরা দাবি কর। অর্থ হলো, তোমরা বিশ্বাসী নও।

لِأَنَّ الْإِيْمَانَ لَمْ يَأْمُرْ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ وَالْمُرَادُ اٰبَاؤُهُمْ أَيْ فَكَذٰلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّوْرَاةِ وَقَدْ كَذَّبْتُمْ مُحَمَّدًا وَالْإِيمَانُ بِهَا لَا يَأْمُرُ بِتَكْذِيْبِهٖ.

কেননা ঈমান কোনোদিন বাছুর পূজার নির্দেশ দিতে পারে না। উদ্দেশ্য হলো তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় মূলত তাওরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী নও। কেননা তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার কর। তাওরাতের প্রতি ঈমান কখনো তাকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয় না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَيَكْفُرُوْنَ - وَالْوَاوُ لِلْحَالِ

يَكْفُرُوْنَ-এর তারকীবগত অবস্থান বর্ণনা : اَلْوَاوُ لِلْحَالِ বলে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, يَكْفُرُوْنَ ... الخ বাক্যটি পূর্ববর্তী قَالُوْا نُؤْمِنُ-এর قَالُوْا-এর ফায়েল থেকে হাল হয়েছে।

قَوْلُهٗ : بِمَا وَرَاءَهٗ سِوَاهُ اَوْ بَعْدَهٗ

وَرَاء-এর অর্থ নির্ণয় : এটি خَلْفُ যা ظَرْفِ مَكَان [পিছনে]-এর অর্থে অধিক ব্যবহার হয় এবং اَمَام [সামনে]-এর অর্থে কম ব্যবহার হয়। বস্তুত এ শব্দটি اَضْدَادُ-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি سِوٰى এবং بَعْدُ-এর অর্থেও ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র.) এখানে بَعْدُ এবং سِوٰى-এর অর্থ নিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : مُصَدِّقًا - حَالٌ ثَانِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ

مُصَدِّقًا-এর তারকীবের বর্ণনা : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) একথা বুঝিয়েছেন যে, مُصَدِّقًا শব্দটি وَهُوَ الْحَقُّ-এর তাকীদ। যেহেতু এটি وَهُوَ الْحَقُّ-এর সমার্থক তাই একে مُؤَكِّدَة বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ - قَتَلْتُمْ .... بِمَا فَعَلَ اٰبَاءُهُمْ

ফে'লে মুযারে ফে'লে মাযির অর্থে ব্যবহার : মুফাসসির (র.) قَتَلْتُمْ দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে تَقْتُلُوْنَ ফে'লে মুযারেটি قَتَلْتُمْ মাযির অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রমাণ হলো- مِنْ قَبْلُ শব্দটি যেহেতু নবীদের হত্যা করা একটি জঘন্যতম কাজ, তাই সেই কর্মটির স্মৃতিচারণ করত مُضَارِعْ-এর সীগাহ আনা হয়েছে। এটা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের হত্যা অতীতকালে অব্যাহত ছিল।

قَوْلُهٗ : بِمَا فَعَلَ اٰبَائُهُمْ لِرِضَاهُمْ بِهٖ

মাজাযের সম্পর্ক উল্লেখ : মুফাসসির (র.) .... بِمَا فَعَلَ অংশটি দ্বারা مَجَازِ عَلَاقَةْ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো مُلَابَسَةْ; যেহেতু নবীযুগের ইহুদিরা তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল, তাই تَقْتُلُوْنَ বা হত্যার নিসবতটি তাদের দিকেই করা হয়েছে। যদিও হত্যার কাজটি সংঘটিত হয়েছে ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩]

قَوْلُهٗ : بِالْبَيِّنَاتِ اَيِ الْمُعْجِزَاتِ

اَلْبَيِّنَات দ্বারা اَلْمُعْجِزَاتِ উদ্দেশ্য : কারো কারো মতে, اَلْبَيِّنَاتِ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে তাওরাত উদ্দেশ্য। কিন্তু এ অভিমতটি শক্তিশালী নয়। কারণ اَلْبَيِّنَاتِ শব্দটি বহুবচন। অথচ তাওরাত একবচন। মুফাসসির (র.) এ অভিমতটিকে খণ্ডনের জন্যই اَلْمُعْجِزَاتِ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে بَيِّنَاتٌ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) উদাহরণস্বরূপ তিনটি মু'জিযা উল্লেখ করেছেন। তবে মোট মু'জিযা ছিল নয়টি। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

১. লাঠি : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এ লাঠির সাথে হযরত মূসা (আ.) পানি ও খাবার রাখতেন। এটা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে চলত। তিনি তার সাথে কথা বলতেন। তা দিয়ে জমিনে আঘাত করলে এক দিনের খাবার বেরিয়ে আসত। জমিনে পুতে রাখলে তা থেকে পানি নির্গত হতো। জমিন থেকে তুলে ফেললে পানি বন্ধ হয়ে যেত। কোনো ফল খাওয়ার ইচ্ছা করলে সেটা জমিনে পুতে রাখতেন। তারপর তা থেকে দুটি শাখা বের হয়ে একটি গাছ হয়ে যেত। তারপর সেখানে ফল ধরত। কখনো কোনো কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে চাইলে সেটা কূপের ভিতর ঝুলিয়ে দিতেন এবং তার থেকে দুটি শাখা দুটি বালতির মতো হয়ে যেত। রাতের বেলা সেটি আলোকবর্তিকা হতো। কোনো দুশমন সামনে পড়লে তা দিয়ে তিনি মোকাবিলা করতেন।

২. হাতের মু'জিযা : মুফাসসির (র.) اَلْيَدُ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর হস্ত সংক্রান্ত মুজিযার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হস্ত সংক্রান্ত মুজিযাটি হলো, হযরত মূসা (আ.) যখন ডান হাত বগলের নীচে রাখার পর বের করতেন, তখন সেটা উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকত। আবার যখন বগলে প্রবেশ করাতেন, তখন আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যেত।

৩. সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা : এ অংশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা উদ্দেশ্য, যা وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ . اِلٰهًا

উহ্য মাফ'উল নির্ণয় : মুফাসসির (র.) এ শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে اِتَّخَذْتُمْ দু'মাফ'উলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়েছে। তার দ্বিতীয় মাফ'উলটি হলো উহ্য اِلٰهًا।

قَوْلُهٗ : مِنْ بَعْدِهٖ أَيْ بَعْدَ ذَهَابِهٖ إِلَى الْمِيْقَاتِ

দুর্বল অভিমত খণ্ডন : مِنْ بَعْدِهٖ-এর পরে بَعْدَ ذَهَابِهٖ বলে মুফাসসির (র.) উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা ছাড়া কারো কারো অভিমত হলো, مِنْ بَعْدِهٖ অর্থ হলো– مِنْ بَعْدِ مُجِيْئِهٖ; এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর উপস্থিতিতে বাছুর বানানো হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। অথচ এটি ভুল। بَعْدَ ذَهَابِهٖ إِلَى الْمِيْقَاتِ বলে মুফাসসির (র.) সে অভিমতটি খণ্ডন করে বলেছেন যে, ঐ ঘটনা ঘটেছিল তাওরাত লাভের জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর গমনের পরে।

قَوْلُهٗ : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ . عَلَى الْعَمَلِ

অঙ্গীকার নির্ণয় : عَلَى الْعَمَلِ যোগ করে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, اَخْذُ الْمِيْثَاق দ্বারা ঐ সাধারণ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য নয়, যা রুহ জগতে বনী আদম থেকে নেওয়া হয়েছিল; বরং সে অঙ্গীকার উদ্দেশ্য, যাতে বিশেষভাবে ইহুদিদের তাওরাতে আমল করার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল।

قَوْلُهٗ : وَ . قَدْ . رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

قَدْ উহ্য মানার কারণ : মাঝির সীগাহ হাল হতে হলে قَدْ থাকা প্রয়োজন, চাই প্রকাশ্য হোক বা উহ্য হোক। এখানে যেহেতু প্রকাশ্য قَدْ নেই। তাই মুফাসসির (র.) قَدْ উল্লেখ করলেন।

قَوْلُهٗ : وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ أَىْ خَالَطَ حُبُّهٗ

উহ্য মুযাফ নির্ণয় : حُبُّهٗ বলে মুফাসসির (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, الْعِجْلَ-এর মুযাফ উহ্য রয়েছে। কারণ উহ্য মুযাফ ছাড়া অর্থ সঠিক হয় না।

قَوْلُهٗ : كَمَا زَعَمْتُمُ الْمَعْنٰى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

ইহুদিদের দাবির খণ্ডন : তোমাদের ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের পূর্বের উক্তি نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا; মুফাসসির (র.) এর দ্বারা ইহুদিদের বক্তব্য খণ্ডনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করলেন যে, উপরিউক্ত প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখ না, শুধুমাত্র মুখে মুখে বল।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّ الْاِيْمَانَ ... الخ

ইহুদিদের কাফের বলার কারণ বর্ণনা : মুফাসসির (র.) অংশটুকু বৃদ্ধি করে لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-এর عِلَّةْ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের দাবি এজন্য সঠিক নয় যে, তাওরাত আল্লাহর কিতাব। তার প্রতি ঈমান কখনো বাছুর পূজার নির্দেশ দিতে পারে না। অথচ তোমরা তার পূজা করেছ। যে জিনিসের নির্দেশ তাওরাতে নেই তা পালন করা তাওরাতের প্রতি ঈমানের লক্ষণ হতে পারে না।

قَوْلُهٗ : وَالْمُرَادُ آبَائُهُمْ

ইসনাদে মাজাযীর প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِسْنَادِ مَجَازِىْ হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বপুরুষদের কর্মকে উত্তরসূরিদের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّوْرٰاةِ

নবীযুগের ইহুদিদেরকে পূর্বপুরুষদের অপরাধের কারণে ভর্ৎসনার হেতু : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) রাসূল ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিদেরকে পিতৃপুরুষদের কর্মের কারণে ভর্ৎসনা করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদিরা পূর্বসূরিদের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট ও একমত ছিল এবং সে কারণে তারা লজ্জিত এবং অনুশোচনাকারীও ছিল না। আর অপরাধের প্রতি সন্তুষ্ট ও একমত হওয়ার অপরাধের শামিল। তাই তাদেরকেও ভর্ৎসনার مخاطب বানানো হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَقْتُلُوْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اِثْبَاتِ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق.ت.ل) জিনস صَحِيْحُ অর্থ- তারা হত্যা করে।

الْبَيِّنٰت : শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো البينة মূলবর্ণ ب.ى.ن জিনস يائى اجوف অর্থ- প্রমাণসমূহ, দলিলসমূহ।

اِتَّخَذْتُم : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اِثْبَاتِ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا.خ.ذ) জিনস مَهْمُوْزِ فَاء অর্থ- তোমরা বানিয়েছিলে। اِتِّخَاذٌ শব্দটি যদি প্রাথমিকভাবে কোনো কিছু বানানো অর্থে ব্যবহার হয়, তখন এক মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দি হয়। যেমন- اِتَّخَذْتُ سَيْفًا اَىْ صَنَعْتُهُ; আর যদি تَحْوِيْل তথা صَيَّرَ বা جَعَلَ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়, তখন এক মাফ'উলের দিকে মুতায়াদ্দি হয়। যেমন- اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا

ظٰلِمُوْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمِ فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ.ل.م) জিনস صَحِيْح অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী।

اُشْرِبُوْا : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتِ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِشْرَابُ মূলবর্ণ (ش.ر.ب) জিনস صحيح অর্থ- তাদের অন্তরে সিঞ্চিত হয়েছে।

قُلُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قَلْبٌ জিনস صحيح মূলবর্ণ (ق.ل.ب) অর্থ- অন্তরগুলো বা অন্তরসমূহ।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ .... كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

قُلْ ফে'ল ও ফায়েল فَاء জাযাইয়্যা لِمَ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম اَللّٰهِ اَنْبِيَاءَ تَقْتُلُوْنَ ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে শর্তে মুকাদ্দামের জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে مُؤَكِّدَةْ; মুয়াক্কাদ ও তাকীদ মিলে মাকুলায়ে মাফ'উলে বিহী। قُلْ ফে'ল, ফায়েল এবং মাকুলায়ে মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা মুস্তানিফা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَقَدْ جَاءَكُمْ .... وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

وَلَقَدْ-এর তারকীব পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। جَاءَكُمْ مُّوْسٰى ফে'ল-ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী, بِالْبَيِّنَاتِ মুতা'আল্লিক جَاءَ ফে'লের সাথে। ফে'ল-ফায়েল মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ আলাইহি ثُمَّ হরফে আতফ اِتَّخَذْتُم ফে'ল যমীর যুলহাল وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ জুমলা খবরিয়া হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। العجل মাফ'উলে বিহী আওয়াল, اِلٰهًا মাফ'উলে বিহী ছানী مِنْ بَعْدِهِ হলো মুতা'আল্লিক। اِتَّخَذْتُم ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে জুমলা আতেফা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

وَاِذْ-এর ইরাব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। اَخَذْنَا ফে'ল ফায়েল مِيْثَاقَكُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী। জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاو হরফে আতফ رَفَعْنَا ফে'ল-ফায়েল فَوْقَكُمْ যরফে মুতা'আল্লিক رَفَعْنَا ফে'লের সাথে। الطُّوْرَ মাফ'উলে বিহী, ফে'ল, ফায়েল মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে জুমতলা আতেফা। خُذُوْا ফে'ল ও ফায়েল জুমলা হাল হিসেবে نَصْبْ-এর মহলে।

ما ইসমে মাওসূল اٰتَيْنَاكُمْ জুমলা হয়ে সেলা بِقُوَّةٍ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক উহ্য ফে'লের সাথে। وَاسْمَعُوْا পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। قَالُوْا ফে'ল-ফায়েল মিলে قول; سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে মাকুলা। وَاو হরফে আতফ اُشْرِبُوْا ফে'লে মাজহুল যমীর নায়েবে ফায়েল فِىْ قُلُوْبِهِمْ মুতা'আল্লিক اُشْرِبُوْا ফে'লের সাথে। الْعِجْلَ মাফ'উলে বিহী।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَات : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ .... إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের একটি মন্দ কর্ম উল্লেখ করে তাকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا-এর দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা। আলোচ্য আয়াতে আরো একটি মন্দ কর্ম উল্লেখ করে সে দাবিকে আরো জোরালোভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

ইহুদিদের উক্তি ও কুরআনের উত্তর : আলোচ্য আয়াতের اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ-এর মাঝে مَا-এর ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যায় যে, اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা ইঞ্জিল ও কুরআন উভয় গ্রন্থই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহুদিদের বক্তব্য হলো, "আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না", ইহুদিদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি "যা (তাওরাত) আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে" এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাজিল হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান কেন আনব? আল্লাহ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

১. অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

২. অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মাজীদ, যাতে তাওরাতেরও সত্যায়ন করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৩. আল্লাহপ্রদত্ত সকল গ্রন্থের মতেই পয়গাম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোনো দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কর্মকাণ্ড সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ..... وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

ইহুদিদের হঠকারিতার বর্ণনা : এখানে ইহুদিদের অস্বীকার ও হঠকারিতার প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে যে, তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের অনুসারী। যার শরিয়তের কারণে তোমরা অন্যান্য সত্য শরিয়তসমূহকে অস্বীকার কর, স্বয়ং তিনি নিজেই তোমাদেরকে প্রকাশ্য বহু মুজিযা দেখিয়েছিলেন। যেমন– বিস্ময়কর লাঠি, সমুজ্জ্বল হাত, সাগরে বিদারণ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর পক্ষ হতে সহীফা আনতে কয়েকদিনের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন তোমরা সমেরীর কথায় বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে। অথচ হযরত মূসা (আ.) তখন জীবিত এবং নবুয়তের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সে সময় হযরত মূসা (আ.) ও তার শরিয়তের উপর তোমাদের বিশ্বাস কোথায় ছিল? এখন শেষ নবীর প্রতি আক্রোশ ও বিদ্বেষবশত হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তকে এমনভাবে আকড়ে ধরেছ যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ কর্ণপাত করছ না। নিশ্চয় তোমরাও জালেম, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও জালেম। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা– ১৮]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا ..... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

ইহুদিদের বক্তব্য سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের বক্তব্য سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কারণ, ইহুদিদের মাথার উপর পাহাড় তোলা হয়েছিল আদেশ মানতে বাধ্য করার জন্য, তাহলে তারা আদেশ না মানা সত্ত্বেও কোনো শাস্তি হলো না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুফাসসিরগণের অভিমত হলো–

১. তারা মুখে سَمِعْنَا বলেছে; কিন্তু عَصَيْنَا মুখে বলেনি; বরং স্বীকার করার পরপরই অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ভাবভঙ্গির ভাষায়ই তারা যেন এ কথা বলছিল, শুনলাম কিন্তু মানলাম না।

২. عَصَيْنَا শব্দটি سَمِعْنَا-এর পর তৎক্ষণাৎ বলেনি; বরং কিছুক্ষণ পরে বলেছে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বলা' রূপক অর্থে, 'জিহ্বার বলা' উদ্দেশ্য নয়। কারো কারো অবস্থা দ্বারা যা বুঝা যায়, তাকে বলেছে বলে ব্যক্ত করা যায়, যদিও সে মুখে তা বলেনি। যেহেতু তাদের এ কথাটি বাস্তব বিচারে হৃদয়ের কথা ছিল না।

সাধারণভাবেও আরবি ভাষায় اَلْقَوْلُ শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। মুখে উচ্চারণ করা কখনো সে অর্থের জন্য অপরিহার্য নয়। ইমাম রাগেব (র.) পবিত্র কুরআনে এ শব্দের ব্যবহার বিভিন্ন অর্থে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ নাম্বারে তিনি লিখেছেন, ভাবের নির্দেশনা বা دَلَالَةُ الْحَالِ; তিনি এর প্রমাণে জনৈক কবির পঙ্‌ক্তিও উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কিছুকে নির্দেশ করার অর্থেও اَلْقَوْلُ বলা হয়। যেমন কবির ভাষায়– اِمْتَلَأَ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِىْ [হাউজ পানিতে ভরে গেল এবং সে বলে উঠল, বেশ হয়েছে]। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৬]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِى الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ

ইস্তিয়ারায়ে মাকনিয়্যাহ : আলোচ্য আয়াতে বাছুর-প্রীতিকে সুমিষ্ট পানীয়ের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু مشبه به উল্লেখ করা হয়নি; বরং এর পরিবর্তে مُشَبَّهٌ بِهٖ -এর সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটা হলো– اَلْاَشْرَابُ; ফলে ইস্তিয়ারায়ে মাকনিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ

কটাক্ষ করা : আলোচ্য অংশে اِيْمَانٌ -এর প্রতি اَمْرٌ -এর ইসনাদ করা হয়েছে কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে– اَصَلَاتُكَ تَاْمُرُكَ; একইভাবে اِيْمَانُكُمْ -এর মাঝে ইহুদিদের প্রতি اِيْمَانٌ -এর ইযাফত হয়েছে কটাক্ষের জন্য।

٩٤. ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ أَيِ الْجَنَّة ﴿عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً﴾ خَاصَّةً ﴿مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ﴾ كَمَا زَعَمْتُمْ ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ عَلٰى أَنَّ الْأَوَّلَ قَيْدٌ فِي الثَّانِي أَيْ إِنْ صَدَقْتُمْ فِي زَعْمِكُمْ أَنَّهَا لَكُمْ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يُؤْثِرُهَا وَالْمُوْصِلُ إِلَيْهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوْهُ.

৯৪. তাদের বলুন, যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট পরকালের বাসস্থান অর্থাৎ, জান্নাত অন্য লোক ব্যতীত কেবল বিশেষভাবে তোমাদের জন্যই হয় যেমন তোমরা ধারণা পোষণ কর তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি সত্যবাদী হও। মৃত্যু কামনার সাথে দুটি শর্ত যুক্ত। তার প্রথমটি দ্বিতীয়টির قَيْد অর্থাৎ, পরকালের আবাস কেবলমাত্র তোমাদের- এ ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক আর তা যার হবে সে নিশ্চয় তাকেই সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিবে। সে স্থানে পৌঁছার পন্থা হচ্ছে মৃত্যুবরণ, সুতরাং তা কামনা করো।

٩٥. ﴿وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ﴾ مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمُسْتَلْزِمُ لِكِذْبِهِمْ ﴿وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾ اَلْكَافِرِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ.

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অস্বীকার করা যা তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার পরিচায়ক। তারা কখনো তা কামনা করবে না আর আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্বন্ধে অবহিত। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল দেবেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ: اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ. الْجَنَّةُ

اَلدَّارُ الْآخِرَةُ-এর ব্যাখ্যা : اَلدَّارُ الْآخِرَةُ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির (র.)-এর جَنَّةٌ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, اَلدَّارُ الْآخِرَةُ তো ব্যাপক। তাতে জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টি শামিল রয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা নিজেদেরকে শুধু জান্নাতেরই অধিবাসী মনে করতো।

قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ

দুটি শর্তের একটি মাত্র জবাব ও তার হেতু : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো, এখানে شَرْط রয়েছে দুটি। অথচ جَزَاء হলো একটি। আর আতফ ব্যতীত দুটি শর্তের সঙ্গে একটি জাযার সম্পর্ক রাখা জায়েজ নেই। এর উত্তরে মুফাসসির (র.) একটি প্রসিদ্ধ কায়েদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, দুটি শর্তের মধ্যখানে جَزَاء আসলে جَزَاء -টি দ্বিতীয় শর্তের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং প্রথম শর্তটি দ্বিতীয় শর্তের قَيْد হয়। সে হিসেবে এখানে جَزَاء হলো فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ; প্রথম শর্তটি হলো- اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ আর দ্বিতীয় শর্ত হলো- اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ; প্রকৃত ইবারত হবে এভাবে- اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِىْ زَعْمِكُمْ اَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَاصَّةٌ لَكُمْ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

মুফাসসির (র.)-এর ইবারতে সামান্য ত্রুটি আছে, তিনি যা বুঝাতে চাইছেন তার জন্যে সঠিক ইবারত হলো-

تَعَلَّقَ تَمَنِّيْهِ بِالشَّرْطَيْنِ

قَوْلُهُ: وَالْمُوْصِلُ اِلَيْهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوْهُ

'মৃত্যু কামনা করো' এ নির্দেশের কারণ : এখানে شَرْط এবং جَزَاء-এর মাঝে সামঞ্জস্য নেই। কেননা, যদি পরকাল ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তাহলে পরকালের কামনা করতে আদেশ দেওয়া উচিত, মৃত্যুর কামনা করার নয়।

মুফাসসির (র.) وَالْمُوْصِلُ الخ বলে এর জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, পরকালে পৌঁছার মাধ্যম হলো মৃত্যু। তা ব্যতীত সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়। এজন্যে ইহুদিদেরকে মৃত্যু কামনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

خَالِصَةً : সীগাহ وَاحِدِ مُؤَنَّث বহছ اِسْمِ فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْص মূলবর্ণ (خ . ل . ص) জিনস صحيح অর্থ- নিষ্কলুষ, মিশ্রণহীন, শুধু।

لَنْ يَّتَمَنَّوْا : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِيْ تَاكِيْد بِلَنْ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّمَنِّىْ মূলবর্ণ (م.ن.ى) জিনস نَاقِصِ يَائِىْ অর্থ- তারা কখনো কামনা করবে না।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ .... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

এ জুমলাটি شَرْط আর فَتَمَنَّوا হলো তার جَزَاء; এখানে دَار হলো اِسْمِ كَانَ; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। উত্তম হবে যদি এর পূর্বে একটি مُضَاف উহ্য ধরা হয়। যেমন- نَعِيْمُ الدَّارِ; কেননা পরকাল মুমিন কাফের সকলের জন্যই হবে। কিন্তু পরকালের নেয়ামত সকলের জন্য নয়। আর এর خَبَر সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা-

১. খবর হবে خَالِصَةً তখন তার مُتَعَلِّقْ হবে উহ্য এবং خَالِصَةً-কে حَال হিসেবে নসব প্রদান করবে।
২. খবর হবে لَكُمْ তখন عِنْدَ-টি خَالِصَةً-এর জন্য ظَرْف হবে।
৩. খবর হবে عِنْدَ তখন خَالِصَةً শব্দটি حَال হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ .... وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

واو ইস্তিনাফিয়া لَنْ يَّتَمَنَّوْا ফে'ল যমীর তার ফায়েল ০ মাফ'উলে বিহী اَبَدًا যরফে মুতা'আল্লিক لَنْ يَّتَمَنَّوْا ফে'লের সাথে। بَاء হরফে জার مَا মাওসূল قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ জুমলা হয়ে সেলা। মাওসূল সেলা মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ ফে'লের সাথে। ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يُوْثِرُهَا

يُوْثِرُهَا শব্দের লিখনশৈলী : ৯৪ নং আয়াতের তাফসীরাংশে يُوْثِرُهَا শব্দটির দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত হয়েছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির وَاو বর্ণের উপর হামযাবিহীন يُوْثِرُهَا লিখিত আছে।

খ. সহীহ ইমলা বা লিখনশৈলী হলো, শব্দটির واو বর্ণের উপর হামযাযোগে يُؤْثِرُهَا; কারণ, শব্দটি এখানে বাবে اِفْعَال থেকে 'প্রাধান্য দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত। আর এ অর্থটি (ء . ث . ر) মাদ্দায়ই নিহিত আছে (و . ث . ر) মাদ্দায় নয়। কারণ, (و . ث . ر) মাদ্দায় এর অর্থ হলো, বিছানা মাড়ানো, যা এখানে সামঞ্জস্যশীল নয়।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ .... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

পূর্বের আয়াতগুলোতে ইহুদিদের বেশ কয়েকটি ভ্রান্ত দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে আরেকটি দাবি খণ্ডন করা হচ্ছে। ইহুদিরা বলত, আমরা ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে যাবে না এবং পরকালে আমাদের কোনো শাস্তি হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যদি নিশ্চিত জান্নাতি হও, তাহলে মরতে ভয় পাও কেন? [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা- ১৮]

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ .... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

ইবনে জারীর আবুল আলীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন- ইহুদিরা দাবি করেছিল, আমরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না। আমাদের কোনো প্রকার আজাবের স্বাদ নিতে হবে না। এর উত্তরে সূরা বাকারার ৯৪-৯৬ নং আয়াতগুলো নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كَانَتْ ... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

নবীযুগের ইহুদিদের প্রতি চ্যালেঞ্জ : فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ দ্বারা খেতাব করা হয়েছে নবী করীম ﷺ-এর যুগের ইহুদিদেরকে, সকল যুগের সকল ইহুদি উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا .... وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

সংশয় নিরসন : এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। অতএব, ইহুদিরা মনে মনে মৃত্যুর কামনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো না। উত্তর হলো, তারা মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করতো। কারণ, এতে তাদেরই জয় হতো এবং নবী করীম ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। এরূপ কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে, তারা অবশ্যই একে ফলাও করে প্রচার করতো।

মৃত্যু কামনা করার শরয়ী বিধান : হাদীস শরীফে বিনা প্রয়োজনে কিংবা দুনিয়াবি বিপদাপদে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। দীর্ঘ হায়াতের কারণে তওবা এবং নেক আমল করার সুযোগ পাওয়া অনেক বড় নিয়ামত। হ্যাঁ, যদি অন্তরে আল্লাহর দীদারের আগ্রহ প্রবল হয়ে যায় তখন ভিন্ন কথা।

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- اِنَّهٗ يَتَمَنّٰى الْمَوْتَ فَلَمَّا اُحْتُضِرَ قَالَ حَبِيْبٌ جَاءَ عَلٰى فَاقَةٍ

এখানে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কীভাবে মৃত্যুর কামনা করলেন। অথচ হাদীসে মৃত্যু কামনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضَرٍّ نَزَلَ بِهٖ وَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَاَمِتْنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ.

এর জবাবে আলেমগণ বলেন, হাদীসে দুনিয়ার কষ্টক্লেশের কারণে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু জান্নাতের নাজ-নিয়ামতের আশায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর থেকে যেসব আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত রয়েছে, তা ঐ সময় ছিল যখন মৃত্যুর আলামত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন থেকে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

أُمْر-কে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার : أَمْر-এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, কোনো কাজ সম্পাদনের আদেশ করা। কিন্তু فَتَمَنَّوُا দ্বারা أمر-এর এই স্বাভাবিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে أَمْر ব্যবহার করা হয়েছে تَعْجِيْز তথা مُخَاطَب-এর অক্ষমতা প্রকাশের জন্য।

قَوْلُهٗ : قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

মাজায : اَيْدِيْ শব্দটি দ্বারা এখানে রূপকার্থে নফস বুঝানো হয়েছে। কেননা, অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

٩٦. ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ﴾ لَامُ قَسَمٍ ﴿اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَّ﴾ أَحْرَصَ ﴿مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا﴾ الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ عَلَيْهَا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَصِيْرَهُمْ اِلَى النَّارِ دُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ ﴿يَوَدُّ﴾ يَتَمَنّٰى ﴿اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ﴾ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى أَنْ وَهِيَ بِصِلَتِهَا فِيْ تَأْوِيْلِ مَصْدَرٍ مَفْعُوْلِ يَوَدُّ ﴿وَمَا هُوَ﴾ أَيْ أَحَدهمْ ﴿بِمُزَحْزِحِهٖ﴾ مُبْعِدِهٖ ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ النَّارِ ﴿اَنْ يُّعَمَّرَ﴾ فَاعِلُ مُزَحْزِحِهٖ أَيْ تَعْمِيره ﴿وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فَيُجَازِيْهِمْ.

৯৬. নিশ্চয় লামটি কসমের জন্যে আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সকল মানুষ এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষা যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী না, অধিকতর লোভী দেখতে পাবেন। কেননা তারা জানে পরকালে তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে মুশরিকরা পরকাল অস্বীকার করে তাদের প্রত্যেকে কামনা করে আকাঙ্ক্ষা করে সহস্র বছর আয়ু পাওয়ার। لَوْ-টি اَنْ-এর ন্যায় مَصْدَرْ - এর অর্থ প্রকাশ করে। এটা স্বীয় صِلَة -সহ مَصْدَرْ রূপে يَوَدُّ ক্রিয়ার مَفْعُوْل হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভ এটি مُزَحْزِحِهٖ-এর ফায়েল অর্থাৎ, এই আয়ু লাভ তাকে তাদের একজনকেও শাস্তি হতে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা। يَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ياء ও تاء-যোগে পাঠ রয়েছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল দেবেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَلَتَجِدَنَّهُمْ . لَامُ قَسَمٍ

তারকীবগত সন্দেহ নিরসন : উক্ত ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে لَتَجِدَنَّهُمْ হলো جَوَابُ قَسَمٍ; আর وَاللّٰه উহ্য قَسَم; মুফাসসির (র.) এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথা বুঝিয়েছেন যে, لَتَجِدَنَّهُمْ বাক্যটি পূর্ববর্তী لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ -এর উপর আতফ হয়েছে। কারো কারো মতে, لَتَجِدَنَّهُمْ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ; এ তাফসীর দ্বারা সে অভিমত খণ্ডন করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أَحْرَصَ . مِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا

وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا-এর তারকীবগত অবস্থান বর্ণনা : মুফাসসির (র.) وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا-এর মাঝে اَحْرَصُ উহ্য ধরে একথা বুঝিয়েছেন যে, وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا আতফ হয়েছে النَّاس -এর উপর। মুফাসসির (র.) বলেন, النَّاس-এর মাঝে সকল মানুষ শামিল। তার উপর وَمَنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا অংশটি আতফ করা হয়েছে। একে عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ বলে। মুফাসসির (র.) لِعِلْمِهِمْ بِأَنْ .... الخ অংশটুকু দ্বারা এ عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ -এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদিরা নিজেদের জাহান্নামে যাওয়ার কথা জানে। পক্ষান্তরে মুশরিকরা পরকালকে বিশ্বাসই করে না। তাই মুশরিকদের তুলনায় ইহুদিদের জীবনের প্রতি মায়া অনেক বেশি।

قَوْلُهٗ : يَوَدُّ . يَتَمَنّٰى

يَوَدُّ-এর অর্থ নির্ণয় : اَلْوُدّ শব্দটি সাধারণত বিদ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। اَلتَّمَنِّيْ শব্দটি বিদ্যমান এবং বিদ্যমান নয়, উভয় ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। দীর্ঘ আয়ু কোনো বিদ্যমানবস্তু নয়। তাই মুফাসসির (র.) يتمنى বলে বুঝিয়েছেন যে, আয়াতে اَلْوُدُّ দ্বারা اَلتَّمَنِّيْ-এর অর্থটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : لَوْ . مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَنْ الخ

لَوْ-এর প্রকার বর্ণনা : এখানে لَوْ শব্দটি اَنْ مَصْدَرِيَّة -এর অর্থে; শর্তিয়া নয়। কেননা, এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে لَوْ শব্দটি اَنْ مَصْدَرِيَّة-এর অর্থ দেয়। ফলে يُعَمَّرُ অংশটি মাসদার হয়ে يَوَدُّ-এর মাফ'উল হবে। আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এখানে لَوْ শব্দটি شَرْطِيَّةٌ এবং তার جَزَاء উহ্য রয়েছে। তা হলো– لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ لَسَرَّ بِذٰلِكَ; এক্ষেত্রে يَوَدُّ-এর মাফ'উল মাহযূফ হবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مُزَحْزِح : সীগাহ اِسْمِ فَاعِلْ বহছ وَاحِدِ مُذَكَّرْ বাব اَلْفَعْلَلَةُ মাসদার اَلزَّحْزَحَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ح ـ ز ـ ح) জিনস مُضَاعَفِ رُبَاعِيْ অর্থ– দূরকারী, অপসারণকারী।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَتَجِدَنَّهُمْ .... وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

وَاو হরফে আতফ وَاللّٰهُ উহ্য কসম, لَام উহ্য কসমের জওয়াব تَجِدَنَّ ফে'ল ও ফায়েল هُمْ যুলহাল اَحْرَصَ মুযাফ النَّاس মুযাফ ইলাইহি عَلٰى حَيَاة মুতা'আল্লিক اَحْرَصَ-এর সাথে। জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاو হরফে আতফ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا মুতা'আল্লিক উহ্য اَحْرَصَ-এর সাথে। উহ্য اَحْرَصَ মুতা'আল্লিকসহ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি-মা'তূফ মিলে মাফ'উলে ছানী تَجِدَنَّ ফে'লের يَوَدُّ ফে'ল اَحَدُهُمْ যুলহাল لَوْ মাসদারিয়া গায়রে আমেলা يُعَمَّرُ ফে'ল যমীর নায়েবে ফায়েল اَلْفَ سَنَةٌ মুরাক্কাবে এযাফী হয়ে মাফ'উলে ফীহি। সব মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মাফ'উলে বিহী। وَاو হালিয়া مَا হলো لَيْسَ-এর অর্থে, هُوَ হলো لَيْسَ-এর ইসম, بَاء যায়েদা مُزَحْزِحِ শিবা ফে'ল মুযাফ ، যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফ'উলে বিহী। مِنَ الْعَذَابِ মুতা'আল্লিক مُزَحْزِحِ-এর সাথে। اَنْ মাসদারিয়া يُعَمَّرُ ফে'ল ضَمِيْر নায়েবে ফায়েল مُزَحْزِحِ শিবা ফে'ল। ফায়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'আল্লিক মিলে শিবা জুমলা হয়ে খবরে مَا; مَا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে হাল اَحَدُهُمْ যুলহালের। যুলহাল ও হাল মিলে يَوَدُّ ফে'লের ফায়েল। يَوَدُّ ফে'ল তার ফায়েল ও মাফ'উলের সাথে মিলে জুমলা হয়ে হাল হয়েছে تَجِدَنَّهُمْ-এর هُمْ থেকে। যুলহাল ও হাল মিলে মাফ'উলে আওয়াল। تَجِدَنَّ ফে'ল, ফায়েল, প্রথম মাফ'উল ও দ্বিতীয় মাফ'উল মিলে জুমলা হয়ে জাওয়াবে কসম, কসম ও জওয়াবে কসম মিলে জুমলা মুস্তানিফা।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَة : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

يَعْمَلُوْنَ শব্দের কেরাত : ৯৬ নং আয়াতে উল্লিখিত يَعْمَلُوْنَ শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে يَعْمَلُوْنَ-"ইয়া" যোগে পড়েছেন।

খ. কাতাদা, আরাজ ও ইয়াকূব (র.) শব্দটিকে تَعْمَلُوْنَ-"তা" যোগে পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَتَجِدَنَّهُمْ .... بِمَا يَعْمَلُوْنَ

পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের মৃত্যু কামনা না করার আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে জীবনের প্রতি তাদের ভালোবাসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা জীবনের প্রতি খুবই লোভী।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ .... بِمَا يَعْمَلُوْنَ

জীবনের প্রতি লোভাতুর হওয়ার হেতু : আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদিরা শুধু পরকালের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না; বরং তাদের ধারণা মতে পরকালের যাবতীয় আরাম-আয়েস ও নিয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নিয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালোভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَحْرَصَ مِنَ النَّاسِ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا

আমের উপর খাসের আতফ : النَّاس হলো আম শব্দ। পরবর্তীতে তার উপর مِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا আতফ হয়েছে। অতএব, وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا হলো تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ অর্থাৎ, প্রথমে ব্যাপকভাবে বলার পর বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ বিশেষভাবে বলার কারণ হলো, জীবনের প্রতি ইহুদিদের লোভের مُبَالَغَة বুঝানো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : عَلٰى حَيَاة

নাকেরা ব্যবহার : আলোচ্য অংশে حَيَاة শব্দটি নাকেরা ব্যবহার করা হয়েছে বিশিষ্টতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ, তারা শুধুমাত্র দীর্ঘ হায়াত কামনা করে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلْفَ سَنَةٍ

কিনায়া : এখানে হাজার বছর দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা দীর্ঘ হায়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রুকূ' : ১২

قِصَّةُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- যে ফেরেশতাদের শত্রু, সে আল্লাহরও শত্রু
- রাসূল ﷺ-এর আগমনের পর ইহুদিদের কর্মকাণ্ড
- হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের অবতরণের ঘটনা
- ইহুদিরা ঈমান আনলে তার সুফল পেত
- মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও জান্নাতের সুসংবাদ

٩٧. وَسَأَلَ اِبْنُ صُورِيَّا النَّبِيَّ ﷺ أَوْ عُمَرَ (رض) عَمَّنْ يَأْتِي بِالْوَحْيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقَالَ هُوَ عَدُوُّنَا يَأْتِيْ بِالْعَذَابِ وَلَوْ كَانَ مِيْكَائِيْلُ لَآمَنَّا لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْخِصْبِ وَالسِّلْمِ فَنَزَلَ ـ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ فَلْيَمُتْ غَيْظًا ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ﴾ أَيِ الْقُرْآنَ ﴿عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ﴾ بِأَمْرِ ﴿اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ ﴿وَهُدًى﴾ مِنَ الضَّلَالَةِ ﴿وَّبُشْرٰى﴾ بِالْجَنَّةِ ﴿لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ـ

৯৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা হযরত ওমর (রা.)-কে ইবনে সুরিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কোন ফেরেশতা ওহী বহন করে নিয়ে আসেন? তিনি বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। সে বলল, সে তো আমাদের শত্রু। সে আজাব নিয়ে আসে। যদি মিকাঈল ফেরেশতা হতেন, তবে নিশ্চয় আমরা ঈমান আনতাম। কেননা, তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনয়ন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের বলুন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু সে ক্ষোভে মরে যাক, সে তো আল্লাহর অনুমোদনে নির্দেশে আপনার হৃদয়ে তা অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ করে যা তার সম্মুখ বিষয়ের তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য গোমরাহি হতে হেদায়েত ও জান্নাতের শুভ সংবাদ।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : سَأَلَ اِبْنُ صُوْرِيَّا النَّبِيَّ ﷺ اَوْ عُمَرَ (رض

শানে নুযূল সংক্রান্ত মতপার্থক্য : মুফাসসির (র.) أو উল্লেখ করেছেন تَنْوِيْع-এর জন্য। কারণ ইবনে সুরিয়ার প্রশ্ন সংক্রান্ত ঘটনাটি নিয়ে বর্ণনার পার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, সে নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিল, যেমনটি মুসনাদে আহমদে রয়েছে। অন্য রেওয়াওয়েত অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তর হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। যেমনটি ইমাম তাবারী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ. فَلْيَمُتْ غَيْظًا

উহ্য জাযা নির্ণয় : এখানে এ বাক্যটি উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো, مَنْ كَانَ-এর মাঝে مَنْ -টি হলো شَرْطِيَّة আর فَلْيَمُتْ হলো তার جَزَاء; কেউ কেউ উহ্য جَزَاء হিসেবে ভিন্ন ইবারতও উল্লেখ করেছেন। যেমন–

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَلَا وَجْهَ لِعَدَاوَتِهِ.

قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ. اَىْ الْقُرْآن

যমীরের مَرْجِعْ নির্ণয় : نَزَّلَهُ-এর মাঝে মানসূব যমীরটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রতি ফিরার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা সঠিক নয় বিধায় মুফাসসির (র.) اَلْمَشْهُوْرُ كَالْمَذْكُوْرِ হিসেবে যমীরের مَرْجِعِ নির্ণয় করেছেন اَلْقُرْآن; যদিও পূর্বে শাব্দিকভাবে اَلْقُرْآن উল্লেখ নেই। কিন্তু اَلْمَشْهُوْرُ كَالْمَذْكُوْرِ নীতিমালার আলোকে اَلْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসবে না।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْخَصْب : শব্দটি خ বর্ণে যের ও ص বর্ণে সাকিনযোগে। শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَخْصَاب; অর্থ- সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য, সচ্ছলতা।

مُصَدِّق : সীগাহ وَاحِدِ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمِ فَاعِلْ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ (ص . د . ق) জিনস صحيح অর্থ- সত্যায়নকারী, সমর্থক।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ مَنْ كَانَ ... وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

مَنْ শর্তের অর্থ ধারণকারী ইসমে মাওসূল, كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ বাক্যটি সেলা ও শর্ত, مَنْ -এর জওয়াব উহ্য রয়েছে। তা হলো- فَلَا مُوْجِبَ لِعَدَاوَتِهٖ; পরবর্তী فَإِنَّهُ বাক্যটি উহ্য জওয়াবের উপর আতফ হয়েছে।

عَلٰى قَلْبِكَ অংশটি نَزَّلَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক, بِإِذْنِ اللّٰهِ অংশটি نَزَّلَهُ -এর মাফ'উলের যমীরের উহ্য হালের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অংশটি দ্বিতীয় হাল। هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ অংশটি مُصَدِّقًا-এর উপর আতফ হয়েছে।

✪ الرَّسْمُ الْعُثْمَانِىّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَهُدًى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

هدے শব্দের লিখনশৈলী : ৯৭ নং আয়াতে উল্লিখিত هُدًى শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত হয়েছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় هُدًى শব্দটির دَال বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুল লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির دال বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফ هُدًى রূপে লিখা হয়।

✪ تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ مَنْ كَانَ ..... وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আল্লামা সুয়ূতী (র.) আলোচ্য আয়াতটির পূর্বে শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে وَسَأَلَ اِبْنُ صُوْرِيَّا.... বলে নিম্নোক্ত হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعِجْلِيُّ، وَكَانَتْ لَهُ هَيْئَةٌ رَأَيْنَاهُ عِنْدَ حَسَنٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ، عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ، إِذْ قَالُوا: اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، قَالَ: «هَاتُوا» قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ، قَالَ: «تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ» قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ، وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ قَالَ: «يَلْتَقِي الْمَاءَانِ، فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنَثَتْ» قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: "كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَائِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ قَالَ أَبِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الْإِبِلَ «- فَحَرَّمَ لُحُومَهَا» ، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: «مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ - أَوْ فِي يَدِهِ - مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ، يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ» قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: «صَوْتُهُ» قَالُوا: صَدَقْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ قَالَ: «جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»، قَالُوا: جِبْرِيلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوُّنَا، لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ، لَكَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

শুআইব আল-আরনাউত বলেন- حَدِيْثٌ حَسَنٌ دُوْنَ قِصَّةِ الرَّعْدِ ، فَقَدْ تَفَرَّدَ بِهٖ بُكَيْرُ بْنُ شِهَابٍ، وَهُوَ لَم يَرْوِ مِنْهُ سِوٰى اِثْنَيْنِ

[মুসনাদে আহমদ : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৫, হাদীস নং ২৪৮৩]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْن : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূ'র যোগসূত্র

পূর্বের রুকূ'তে ইহুদিদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করা হলে তারা গ্রহণ না করার জন্য نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا বলে বাহানা দিয়েছিল। এখন এ রুকূ'তে ঈমান না আনার আরো দুটি বাহানা উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ .... اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ

সূরা বাকারার ৯৭-৯৮ নং আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। ইহুদিদের ধর্মপণ্ডিত ইবনে মুগিরা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আবুল কাসেম! আমাদের এমন কিছু প্রশ্নের জবাব দিন, যা নবীগণ ব্যতীত অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তারা বলল– مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ তিনি বললেন- وَلِيِّ جِبْرَيْل অর্থাৎ, ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। আর তিনি সকল নবীরই বন্ধু। তারা বলল, আমরা আপনার কথা মানব না। যদি জিবরাঈল ছাড়া অন্য কোনো ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতো, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কারণ কী? তারা বলল, জিবরাঈল তো আমাদের শত্রু। সেই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। [ফাতহুল কাদীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সুরিয়া নবী করীম ﷺ-কে বলল, আপনার কাছে কোন ফেরেশতা আসমান থেকে ওহী নিয়ে আসেন? রাসূল ﷺ বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। সে বলল, সে তো আমাদের শত্রু। তদস্থলে যদি মিকাঈল হতো, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। কেননা জিবরাঈল কেবল আজাব ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসে, সে আমাদের সাথে বারবার শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩]

৩. মদিনার উঁচু অঞ্চলে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ভূমি ছিল। সেখানে ছিল ইহুদিদের বসবাস। তিনি সেখানে গেলে তাদের সাথে বসতেন এবং তাদের কথাবার্তা শুনতেন। একদিন তারা হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে তুমিই আমাদের অধিক প্রিয়ভাজন। আমরা তোমার ব্যাপারে আশাবাদী। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এখানে তোমাদের ভালোবাসায় আসিনি। আর আমি যে তোমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তা এজন্য নয় যে, আমি আমার ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান; বরং আমি তোমাদের সাথে উঠাবসা করি, যাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে বসীরত বৃদ্ধি হয় এবং তোমাদের কিতাবে বর্ণিত তার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারি। তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে কোন ফেরেশতা আগমন করেন? তিনি বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। তারা বলল, সে তো আমাদের শত্রু। সে আমাদের গোপন তথ্যাবলি সম্পর্কে মুহাম্মদ ﷺ-কে অবগত করে দেয়। সে আজাব, দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে। আর হযরত মিকাঈল (আ.) শান্তি ও স্বচ্ছলতা নিয়ে আসেন। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ ... وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

ভ্রান্ত মতবাদ উন্মোচন : হযরত জিবরাঈল (আ.) এক মহান ফেরেশতার নাম। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা নবীগণের কাছে আল্লাহ তা'আলার ওহী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত। ইহুদিরা ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-কেও একজন বড় ফেরেশতারূপে স্বীকার করে। প্রচলিত তাওরাতেও তার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত এরূপ ধরণা করেছিল যে, তার দায়িত্ব ওহী বহন করা নয়; বরং তার কাজ হচ্ছে আজাব ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসা এবং আমাদের গোপন তথ্যাবলি সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে অবগত করা।

ওহী বহনের দায়িত্ব পালন করে অন্য এক ফেরেশতা হযরত মিকাঈল (আ.)। নিজেদের এ মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমালোচনায় লিপ্ত হতো যে, এ নবুয়তের দাবিদার তো নিজের কাছে ওহী আসা সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম নিয়ে থাকেন। অথচ সে তো ওহীবাহক নয়। এখানে ইহুদিদের এ ভ্রান্ত বক্তব্যের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমের তিনটি গুণ : আয়াতে لِلْمُؤْمِنِيْنَ .... مُصَدِّقًا অংশটুকুতে পবিত্র কুরআনের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

১. সত্যায়নকারী। বিগত সহীফাসমূহ ও পূর্ববর্তী নবীগণকে সত্য বলে ঘোষণা করে অর্থাৎ, তার আহ্বান কোনো অভিনব ও অভূতপূর্ব বিষয় নয়।
২. কুরআন নিজেই একটি হেদায়েতনামা ও পথনির্দেশিকা।
৩. ঈমানদারদের জন্য তা সুসংবাদের বাহক।

✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

ইবনে সুরিয়ার পরিচয় : নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া। কেউ কেউ বলেন, তার নাম হলো اِبْنِ صُوْر; সে বনূ সালাবা গোত্রের ব্যক্তি এবং ফাদাকের অধিবাসী। সে ইহুদি পণ্ডিত ছিল। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাজিল হয়েছে। ইবনে সুরিয়া মুসলমান হয়েছে কিনা, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কারো মতে, সে মুসলমান হয়েছিল। যেমন- যাহহাকের সূত্রে সালাবী (র.) বলেন, সূরা বাকারার ১২১ নং আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া প্রমুখের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আয়াতটি হলো- اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

তবে কারো কারো অভিমত হলো, ইবনে সুরিয়া ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে যায়। যেমন- اَلتَّارِيْخُ الْمُظَفَّرِيْ -এর বর্ণনায় রয়েছে। একইভাবে ইবনে ইসহাক (র.) রচিত সীরাতগ্রন্থেও এমনই বর্ণিত হয়েছে।

[আল-ইসাবা ফী তামইয আস-সাহাবা]

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচয় : হযরত জীবরাঈল (আ.) হলেন ওহীবাহক একজন ফেরেশতা। তিনি প্রসিদ্ধ চার ফেরেশতার একজন। জিবরাঈল শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ। جَبَرٌ শব্দের অর্থ ব্যক্তি, বান্দা এবং اِيْلٌ অর্থ হলো আল্লাহ। অতএব, জীবরাঈল অর্থ হলো- আল্লাহর বান্দা। বুখারী শরীফে ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত আছে- جَبَرٌ وَمِيْكٌ وَسَرَافٌ عَبْدٌ، إِيْلٌ اَللّٰهُ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নামের অনেকগুলো উচ্চারণ আরবিতে রয়েছে। কিন্তু আমাদের মাঝে প্রচলিত "জিবরাঈল" উচ্চারণটি কোথাও প্রমাণিত নেই। আরবিতে জিবরাঈল নামের উচ্চারণগুলো নিম্নরূপ-

১. ج বর্ণে যেরযোগে جِبْرِيْل
২. ج বর্ণে যবরযোগে جَبْرِيْل
৩. ج ও ر বর্ণে যবর এবং হামযার পরে ي -যোগে خَنْدَرِيْن ওযনে جَبْرَئِيْل
৪. ء পরবর্তী ى বিহীন جَبْرَئِل
৫. শেষে তাশদীদযুক্ত লাম সহকারে جَبْرَئِلُّ
৬. ج বর্ণে যের, ر ও হামযার মধ্যবর্তী আলিফযোগে جِبْرَائِل
৭. ج বর্ণে যবরযোগে جَبْرَال
৮. ج বর্ণে যবর ও ي বর্ণে যেরযোগে جَبْرَِيل
৯. ج বর্ণে যের, ر বর্ণে যবর এবং দুই ইয়াযোগে যার প্রথমটি যবরযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি যেরযুক্ত جِبْرَيِيل
১০. ج বর্ণে যবর এবং ر যবরযুক্ত ও সাকিনযুক্ত ي সহকারে جَبْرَيْل
১১. ج বর্ণে যের, ر বর্ণে যবর এবং দুই হামযাযোগে যার প্রথমটি যবরযুক্ত ও দ্বিতীয়টি যেরযুক্ত جِبْرَأَئِيْل

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো, তিনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- ذِيْ قُوَّةٍ مَتِيْن; তিনি আমানতদার এবং সম্মানিত। যেমন কুরআনে রয়েছে- عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْن

এছাড়া হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁর ছয়শো ডানা রয়েছে। কুরআন কারীমে জিবরাঈল (আ.)-কে رُوْحُ الْقُدُس. رُوْحٌ اَلرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ইত্যাদি গুণবাচক নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٨ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ﴾ بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا بِلَا هَمْزَةٍ وَبِهٖ بِيَاءٍ وَدُوْنِهَا ﴿وَمِيْكٰلَ﴾ عَطْفٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مِيْكَائِيْلَ بِهَمْزَةٍ وَيَاءٍ وَفِيْ أُخْرٰى بِلَا يَاءٍ ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾ أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ لَهُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ.

৯৮. যে কেউ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিবরাঈল শব্দটি ج বর্ণে কাসরা বা ফাতহাসহ হামযাসহ বা তা ব্যতিরেকে এবং ي-সহ বা তা ব্যতিরেকেও পাঠ করা যায় ও মিকাঈলের শত্রু শব্দটি الْمَلٰئِكَة-এর উপর عَطْف হয়েছে। এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ-এর পর্যায়ভুক্ত। অপর এক কেরাতে শব্দটি مِيْكَائِيْل হামযা ও ي -সহ এবং আরেক কেরাতে ي ব্যতীত রয়েছে। সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু। لَهُمْ-এর স্থলে لِلْكَافِرِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে।

٩٩. ﴿وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ﴾ أَيْ وَاضِحَاتٍ حَالٌ رَدًّا لِقَوْلِ بْنِ صُوْرِيَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ ﴿وَّمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ﴾ كَفَرُوْا بِهَا.

৯৯. হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট পরিষ্কার নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। بَيِّنَات শব্দটি حال হয়েছে। ইবনে সুরিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল, তুমি কিছু নিয়ে আমাদের কাছে প্রেরিত হওনি। এ আয়াতটি তার প্রতিবাদ। সত্যত্যাগীরা ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না। তারা নিদশর্নাবলি অস্বীকার করেছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : جِبْرِيْل - بِكَسْرِ الْجِيْمِ ... الخ

جِبْرِيْل শব্দের কেরাত বর্ণনা : আল্লামা সুয়ূতী (র.) جِبْرِيْل শব্দটির মোট চারটি কেরাত বর্ণনা করেছেন। যথা–

১. بِكَسْرِ الْجِيْمِ অর্থাৎ ج বর্ণে কাসরাসহকারে। এটি হলো নুসখায় বর্ণিত কেরাত। অর্থাৎ جِبْرِيْل

২. وَفَتْحِهَا অর্থাৎ, ج বর্ণে ফাতহাসহকারে شَمْوِيْل ওযনে جَبْرِيْل; بِلَا هَمْزَةٍ -এর সম্পর্ক এই দুই কেরাতের সাথে। আর وَبِهٖ بِيَاءٍ وَدُوْنَهَا অংশটুকু দ্বারা বাকি দুই কেরাত বুঝিয়েছেন।

৩. بِهٖ بِيَاءٍ অর্থাৎ, হামযা এবং হামযা-পরবর্তী ইয়া সহকারে سَلْسَبِيْل ওযনে جَبْرَئِيْل

৪. وَدُوْنَهَا অর্থাৎ, হামযা-পরবর্তী ইয়া ব্যতীত جَحْمَرِشٌ ওযনে جَبْرَئِل

অতএব, وَبِهٖ بِيَاءٍ وَدُوْنَهَا অংশটুকু শুধু وَفَتْحُهَا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, এ চারটি কেরাতই প্রসিদ্ধ সাত কেরাতের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ : وَفِيْ قِرَاءَةٍ مِيْكَائِيْل ..... بِلَا يَاءٍ

مِيْكٰلٌ শব্দের কেরাতের বর্ণনা : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একথা বুঝিয়েছেন যে, مِيْكٰلٌ শব্দের আরো দুটি কেরাত বর্ণিত রয়েছে। যথা– ১. مِيْكَائِيْلٌ ২. مِيْكَائِلٌ;

قَوْلُهٗ : فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ - أَوْقَعَهُ ... الخ

যমীরের স্থলে ইসমে যাহের ব্যবহার করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ না বলে عَدُوٌّ لَهُمْ বলাই যথেষ্ট ছিল। কারণ, পূর্বে তাদের আলোচনা হয়েছে। তবে এখানে তাদের এ অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, তারা ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে কাফের হয়ে গেছে, তাই যমীরের স্থলে ইসমে জাহের ব্যবহার করা হয়েছে। মুফাসসির (র.) أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ الخ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ . وَاضِحَاتٍ حَالٌ

সিফাত হওয়ার ধারণা : খণ্ডন আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির কারণে কেউ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ-এর মাঝে بَيِّنٰتٍ -কে اٰيٰتٍ-এর সিফাত মনে করতে পারে। তাই মুফাসসির (র.) বলে দিয়েছেন, بَيِّنٰتٍ শব্দটি হাল, সিফাত নয়। কারণ, بَيِّنٰت শব্দটি কোনো اِسْم صِفَة নয়; তাই তা সিফাত হতে পারে না।

قَوْلُهٗ : رَدٌّ لِقَوْلِ اِبْنِ صُوْرِيَا

جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ আনার কারণ বর্ণনা : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য مَعْطُوْف عَلَيْهِ তথা مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ এবং مَعْطُوْف তথা وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُوْنَ -এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ আনার কারণ বর্ণনা করা।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

عَدُوٌّ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَعْدَاء ; اَلْعَدُوُّ ضِدُّ الصَّدِيْقِ وَهُوَ الَّذِىْ يُرِيْدُ اِنْزَالَ الْمُضَارِّ بِهٖ অর্থাৎ, عَدُوٌّ হলো صَدِيْقٌ -এর পিরীত শব্দ। عَدُوّ বলা হয় যে কারো ক্ষতি কামনা করে।

رُسُلٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে رَسُوْل মূলবর্ণ ر.س.ل জিনস صحيح অর্থ- রাসূলগণ।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ .... اَللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ

আলোচ্য আয়াতে و অব্যয়টি 'অথবা' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যে কেউ এদের যে কারো শত্রু হবে, সে সকলেরই শত্রু। مَنْ হলো ইসমে মাওসূল, যাতে শর্তের অর্থ রয়েছে। مِيْكٰلَ .... كَانَ অংশটুকু হলো শর্ত। এর জবাব উহ্য রয়েছে। তা হলো فَلْيَمُتْ غَيْظًا আর فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ অংশটুকু উহ্য জবাবের উপর আতফ হয়েছে। এ বাক্যটি সরাসরি জবাব হতে পারে না। جَوَابُ الشَّرْطِ -এর মাঝে শর্তের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি যমীর আবশ্যক, যা এই বাক্যে নেই। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৪]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ..... اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ

وَاو হরফে ইস্তিনাফিয়া واللهِ উহ্য কসম لَام উহ্য জওয়াবে কসমের রাবেতা قَدْ اَنْزَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল اِلَيْكَ মুতা'আল্লিক اَنْزَلْنَا ফে'লের সাথে। اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফ'উলে বিহী। সব মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاو হরফে আতফ مَا يَكْفُرُ بِهَا ফে'ল মুতা'আল্লিক اِلَّا হরফে হসর اَلْفَاسِقُوْنَ ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি, মা'তূফ মিলে উহ্য জওয়াবে কসম। কসম ও জওয়াবে কসম মিলে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ

جِبْرِيْل শব্দের কেরাত : ৯৮ নং আয়াতে উল্লিখিত جِبْرِيْل শব্দটির কয়েকটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) جِبْرِيْل শব্দটির ج ও ر বর্ণে যেরযোগে পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা ও কিসায়ী (র.) جَبْرَئِيل শব্দটির ج বর্ণে যবর, ب বর্ণে সুকূন ও ر বর্ণে যবর এবং ر-এরপর হামযাযোগে পড়েছেন।

গ. ইবনে কাসীর (র.) جَبْرَيْل শব্দটির ج বর্ণে যবর, ب বর্ণে সুকূন ও ر বর্ণে যবরযোগে পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ

مِيْكٰلَ শব্দের কেরাত : ৯৮ নং আয়াতে উল্লিখিত مِيْكَلَ শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ك বর্ণে খাড়া যবরযোগে مِيْكَلَ পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে' (র.) শব্দটির ك বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে مِيْكَائِلَ পড়েছেন।

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ .... فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ

পূর্বের আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে ইহুদিদের শত্রুতার বিবরণ ছিল, এখন এ আয়াতে সে শত্রুতার হুকুম ও পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ .... اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা ইবনে সুরিয়া নামের এক ইহুদি পণ্ডিত হুজুর ﷺ-এর দরবারে এসে বলতে থাকে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতের মাধ্যমে নবীর যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের জানা রয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি নিদর্শনও তোমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আল্লাহ তা'আলাও তোমার নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করেননি। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। [ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৪; আসবাবে নুযূল : পৃষ্ঠা ৩৩; লুবাব : পৃষ্ঠা ১৬; বায়যাবী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ عَدُوًّا .... لِلْكٰفِرِيْنَ

জিবরাঈল ফেরেশতার সাথে শত্রুতা করার পরিণাম : হযরত জিবরাঈল (আ.) আজাব, দুর্ভিক্ষ এবং গোপন তথ্য উন্মোচনসহ যা কিছু নিয়ে আসেন তা তো কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই নিয়ে আসেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে ঐশী প্রত্যাদেশ দেওয়া, তা-ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই হয়ে থাকে। নিজের পক্ষ থেকে কিছুই করেন না। অতএব, এ কারণে তাকে শত্রু মনে করা নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু না। উপরন্তু তার সঙ্গে শত্রুতা ও কু-ধারণা পোষণ প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেই দুশমনি করা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে শত্রুতার মর্মার্থ : আলোচ্য আয়াতে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন মহা ক্ষমতাধর। তাঁর সাথেও কি শত্রুতা করা যায়?

এর সমাধানে আলেমগণ বলেন– ১. এখানে রূপক অর্থে আল্লাহর বিরোধিতা উদ্দেশ্য। ২. এখানে مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, عَدَاوَةُ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ দ্বারা মাজাযীভাবে عَدَاوَةُ اللّٰهِ উদ্দেশ্য।

হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য আয়াতে جِبْرِيْل ও مِيْكَائِيْل -এর আতফ করা হয়েছে اَلْمَلَائِكَة -এর উপর। কেননা, তারা উভয়ে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। এটিকে عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ বলা হয়। এভাবে عَطْف করার ফায়েদা হলো অন্যান্য ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের উভয়ের বিশেষ মর্যাদার প্রতি সতর্ক করা। আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, জিবরাঈল (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারে ইহুদিদের শত্রুতা পোষণের দাবি খণ্ডন করার জন্য। আর তার সাথে হযরত মিকাঈল (আ.)-এর নাম জুড়ে দেওয়ার কারণ হলো তিনি রিজিকের ফেরেশতা। আর রিজিক হলো শরীরের খাদ্য। তেমনিভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন ওহীবাহক ফেরেশতা। আর ওহী হলো রুহের খোরাক। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ওহীর মর্যাদার কারণে। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫]

কেউ কেউ বলেন, ইহুদিরা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ওহীবাহক হওয়ার কথা প্রত্যাখ্যানের সময় সঙ্গে সঙ্গে এ দুই ফেরেশতার সঙ্গে তাদের যথাক্রমে শত্রুতা ও আকর্ষণ এবং অনুরাগের কথাও প্রকাশ করেছিল। এদিকে লক্ষ্য রেখেই কুরআনি জবাবেও দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২]

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ .... عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ

ফকীহগণ এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে বলেছেন, মাসূম সত্তাসমূহ, যেমন- নবী, রাসূল, ফেরেশতা, এদেরকে অস্বীকার করা কুফরি। স্পষ্টভাবে কেউ যদি এমন কাউকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

একইভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের ফজিলত তাওয়াতুরের স্তরে উপনীত, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধাচরণও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَإِنَّ اللّٰهَ .... الخ

জুমলায়ে ইসমিয়া ব্যবহার : আলোচ্য বাক্যটি হলো جَوَابُ الشَّرْطِ; এখানে جَوَابُ الشَّرْطِ হিসেবে জুমলায়ে ইসমিয়া ব্যবহার করা হয়েছে অধিক নিন্দা প্রকাশের জন্য। কারণ, জুমলায়ে ইসমিয়া স্থায়িত্ব বুঝায়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার : আলোচ্য অংশে عَدُوٌّ لَهُمْ -এর পরিবর্তে عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ বলে অর্থাৎ যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ফেরেশতার সাথে শত্রুতা পোষণ করা কুফরি। ফলে হযরত জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করার কারণে ইহুদিগণ কাফের বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ

আতফ : وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ অংশটি পূর্ববর্তী مَلَائِكَة অংশের উপর আতফ হয়েছে। مَلَائِكَة শব্দটির মাঝে جِبْرِيْل وَمِيْكٰلَ এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারপরও আলাদা শব্দ ব্যবহার করে আতফ করা হয়েছে তাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। এটাকে عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ বলে।

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত মিকাঈল (আ.)-এর পরিচয় : হযরত মিকাঈল (আ.) একজন ফেরেশতা। প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, সৃষ্টি জগতে খাদ্য সরবরাহ ও বৃষ্টি বর্ষণ তাঁর দায়িত্বে অর্পিত। শরিয়ত বিষয়ক ক্ষেত্রে হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তা'আলা ও নবীর মধ্যে বিশেষ মাধ্যম, তদ্রূপ জাগতিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে হযরত মিকাঈল (আ.) মাধ্যম। প্রথমজন হলেন উলুহিয়্যাতের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয়জন হলেন আল্লাহ তা'আলার রবূবিয়্যাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাওরাতে হযরত মিকাঈল (আ.) প্রসঙ্গে অত্যন্ত সমীহ প্রকাশ করে আলোচনা হয়েছে। তাই ইহুদিরা তাকে জাতীয় রক্ষক মনে করে।

مِيْكٰلَ শব্দের ব্যাখ্যা ও তার কেরাত : مِيْكٰلَ শব্দটির বিশ্লেষণে কেউ বলেছেন, এটি مَلَكُوْت اللّٰه থেকে নির্গত আবার কেউ বলেছেন, ميك অর্থ عَبْد বা বান্দা আর ايل অর্থ الله অর্থাৎ, مِيْكَائِيْل হচ্ছে- আব্দুল্লাহ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত جِبْرًا অর্থ عَبْدٌ আর مِيْكًا অর্থ عُبَيْد [তাসগীর রূপে] সুতরাং جِبْرَائِيْل অর্থ- عُبَيْدُ اللهِ এবং مِيْكَائِيْل অর্থ عَبْدُ اللهِ; [হাশিয়াতুল জামাল]

١٠٠. ﴿أَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا﴾ اللهَ ﴿عَهْدًا﴾ عَلَى الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ إِنْ خَرَجَ أَوِ النَّبِيِّ أَنْ لَا يُعَاوِنُوا عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ ﴿نَبَذَهُ﴾ طَرَحَهُ ﴿فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ﴾ بِنَقْضِهِ جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ ﴿بَلْ﴾ لِلِانْتِقَالِ ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾.

১০০. তবে কি যখনই তারা আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ, যখন রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাব হবে, তখন তারা এ নবীর উপর ঈমান আনবে বা মুশরিকদেরকে কোনোরূপ সাহায্য করবে না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তখন তাদের মধ্য হতে একদল তা ছুড়ে ফেলে ভঙ্গ করে। نَبَذَهُ বাক্যটি كُلَّمَا-এর জবাব। আর এটি হচ্ছে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের ক্ষেত্র; বরং بَلْ শব্দটি প্রসঙ্গান্তরের জন্য। তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

١٠١. ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ﴾ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللهِ﴾ أَيِ التَّوْرَاةَ ﴿وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ﴾ أَيْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيْهَا مِنَ الْإِيمَانِ بِالرَّسُوْلِ وَغَيْرِهِ ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ مَا فِيْهَا مِنْ أَنَّهُ نَبِيٌّ حَقٌّ أَوْ أَنَّهَا كِتَابُ اللهِ.

১০১. আর যখন আল্লাহর নিকট হতে তাদের কাছে যা আছে, তার সমর্থক রাসূল মুহাম্মদ ﷺ আগমন করলেন, তখন যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে তাওরাতকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলল। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন এবং এ জাতীয় অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় তাওরাতে ছিল তার উপর তারা আমল করল না। যেন তারা জানে না যে তিনি সত্য নবী বা তাওরাত আল্লাহ তা'আলার কিতাব।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : كَفَرُوْا بِهَا. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا

كَفَرُوْا بِهَا -এর আতফ উহ্য اَوَ كُلَّمَا -এর সাথে : اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا -এর পূর্বে كَفَرُوْا بِهَا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَوَ كُلَّمَا -এর আতফ পূর্বের সাথে নয়; বরং مَعْطُوْف عَلَيْه উহ্য রয়েছে আর হামযাটি তার সাথেই সম্পৃক্ত। উহ্য ইবারতটি হবে– اَكَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ الْبَيِّنَاتِ; এটি আল্লামা যামাখশরী (র.)-এর অভিমত। মুফাসসির (র.) তাঁর অভিমতটি এক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন।

قَوْلُهُ : اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا. اللّٰهَ .... اَوِ النَّبِيَ

اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا عَهْدًا -এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اَوِ النَّبِيَ দ্বারা আলোচ্য আয়াতাংশের দুটি সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা-

১. ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যখন আখেরী জমানার নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তার প্রতি ঈমান আনবে।

২. রাসূল ﷺ-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তার বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না।

[জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৯]

قَوْلُهُ : وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ

اِسْتِفْهَام -এর মহল নিয়ে আলোচনা : اَوَ كُلَّمَا -এর হামযাটি হলো اِنْكَارِيْ -এর জন্যে, আর وَاو হরফে আতফ كُلَّمَا হলো ظَرْفِ زَمَان শর্তের অর্থবাহক نَبَذَهُ فَرِيْقٌ হলো শর্ত। اِسْتِفْهَام -এর মহল হলো نَبْذُ الْعَهْدِ অর্থাৎ তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল।

قَوْلُهٗ : بَلْ ـ لِلْاِنْتِقَالِ ـ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

بَلْ শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, بل এখানে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য; পূর্বের বক্তব্য বতিল প্রমাণিত করার জন্য নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

عَاهَدُوْا : সীগাহ اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُعَاهَدَة মূলবর্ণ (ع.ه.د) জিনস صَحِيْحٌ অর্থ- তারা অঙ্গীকার করল।

اُوْتُوْا : সীগাহ اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْل جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِيْتَانُ মূলবর্ণ (ا.ت.ى) জিনস مُرَكَّبٌ (مَهْمُوْز فَاء ও نَاقِص يَائِى) অর্থ- তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। শব্দটি মূলত اُوْتِيُوْا ছিল। ي বর্ণে পেশ এবং তার পূর্বাক্ষরে যের পড়াটা দুষ্কর বিধায় ي-এর হরকত পূর্বাক্ষরে দিয়ে ي-কে সাকিন করা হয়েছে। এখন ي ও واو দুটি বর্ণই সাকিন হওয়ায় ي -কে বিলুপ্ত করার ফলে اُوْتُوْا-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا عَهْدًا

এখানে هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَام الْاِنْكَارِى -টি হলো عَاطِفَة; আর واو-টি হলো মাতূফ আলাইহি উহ্য রয়েছে। মূলত ইবারত হবে- أكفرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ الْبَيِّنَاتِ وَكُلَّمَا عَاهَدُوْا ; كُلَّمَا হলো ظَرْفِ زَمَانِ যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। عَهْدًا শব্দটি عَاهَدُوْا -এর মাফ'উল বিহী হতে পারে। সেক্ষেত্রে عَاهَدُوْا হবে أَعْطَوْا-এর সমার্থক এবং প্রথম মাফ'উল উহ্য থাকবে। মূলরূপ হবে- أَعْطُوا اللّٰهَ عَهْدًا, অথবা عَهْدًا শব্দটি মাফ'উলে মুতলাক হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ ..... كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

وَاوْ হরফে আতফ لَمَّا ইসমে যরফ মুযাফ جَاءَ ফে'ল هُمْ মাফ'উলে বিহী رَسُوْلٌ মাওসূফ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ উহ্য كَائِنٌ শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাতে আওয়াল مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ হলো সিফাতে ছানী। মাওসূফ তার উভয় সিফাত মিলে ফায়েল جَاءَ ফে'লের। جَاءَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে যরফে মুতা'আল্লিক মুকাদ্দাম نَبَذَ ফে'লের সাথে। نَبَذَ ফে'ল فَرِيْقٌ মাওসুফ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَاب হলো كَائِنُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল, كِتَابَ اللّٰهِ মাফ'উলে বিহী وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ মাফ'উলে ফীহি كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ-এর মাঝে كَانَ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, এটি তার ইসম ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে হাল فَرِيْقٌ থেকে। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে ফীহি ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে আতফ হয়েছে পূর্বের আয়াতে اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا-এর উপর।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِى : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا عَهْدًا

عَاهَدُوْا শব্দের লিখনশৈলী : ১০০ নং আয়াতে উল্লিখিত عَاهَدُوْا শব্দের দুটি লিখনশৈলী বর্ণিত হয়েছে। যথা-

ক. জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ع বর্ণের পর অতিরিক্ত আলিফযোগে عَاهَدُوْا-রূপে লিখিত আছে।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ع বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে عٰهَدُوْا-রূপে লিখা হয়।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ .... لَا يَعْلَمُوْنَ

পূর্বের আয়াতে ব্যাপকভাবে ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের বিশেষ একটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى أَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا .... أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ যখন ইহুদিদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাওরাতে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তখন মালেক ইবনুস সাইফ নামক জনৈক ইহুদি পণ্ডিত বলে উঠল, আল্লাহর কসম! আমাদের কিতাবে মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে কোনো অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়নি। তার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাজিল হয়। [আদ-দুররুল মানসূর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৪]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَوَ كُلَّما عَاهَدُوْا .... بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম : ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস অনেক পুরনো। তাওরাত, ইঞ্জিল এবং প্রাচীন ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফ প্রমুখের রচনাবলি এ সবের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের অবাধ্যতার সীমালঙ্ঘন আরো স্পষ্ট করে বলেন- بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ অঙ্গীকার রক্ষা তো পরের কথা, তাদের অনেকে তো এ কথার স্বীকারোক্তিও করে না যে, তাদের সাথে কখনো অঙ্গীকার হয়েছিল। এখানে لَا يُؤْمِنُوْنَ আভিধানিক অর্থে- অঙ্গীকারের কথা বিশ্বাসই করে না বা স্বীকারই করে না। অবশ্য لَا يُؤْمِنُوْنَ ঈমানের পারিভাষিক অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ এরা নিজেদের আসমানি কিতাব ও সহীফার প্রতি ঈমান এনেছিলই বা কবে? ওরা ওদের কিতাবকেও সত্য বলে স্বীকার করে না। [তাফসীরে কাবীর, মাদারেক]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ .... كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

রাসূল ﷺ তাওরাতের সত্যায়নকারী : রাসূল ﷺ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাওরাতের সত্যায়নকারী যে, তাওরাতে তাঁর যে গুণাগুণ ও বিবরণ ছিল, তিনি সেসব গুণাবলি অনুযায়ী অধিভুক্ত হয়েছেন। কেউ বলেন, তিনি তাওরাতে বর্ণিত তাওহীদ, বিধিবিধান, পূর্ববর্তী জাতির সংবাদ, উপদেশ ও হেকমতের সত্যায়ন করেন।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : رَسُوْلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

নাকেরা : رَسُوْلٌ শব্দটি নাকেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। একইভাবে পরবর্তীতে مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ বলা হয়েছে গুরুত্ব ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করার জন্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : نَبَذَ .... وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ

কিনায়া : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা তাওরাতকে বাস্তবিকভাবেই পিঠের পিছনে ছুঁড়ে ফেলা উদ্দেশ্য নয়। এটি দ্বারা ইহুদিদের তাওরাতের বিধান না মানার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

١٠٢. ﴿وَاتَّبَعُوْا﴾ عَطْفٌ عَلٰى نَبَذَ ﴿مَا تَتْلُو﴾ أَيْ تَلَتْ ﴿الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى﴾ عَهْدِ ﴿مُلْكِ سُلَيْمٰنَ﴾ مِنَ السِّحْرِ وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نُزِعَ مُلْكُهُ أَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ وَتَضُمُّ إِلَيْهِ أَكَاذِيبَ وَتُلْقِيْهِ إِلَى الْكَهَنَةِ فَيُدَوِّنُوْنَهُ وَفَشَا ذٰلِكَ وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِيْنُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَخْرَجُوهَا فَوَجَدُوْا فِيْهَا السِّحْرَ فَقَالُوْا إِنَّمَا مَلَكَكُمْ بِهٰذَا فَتَعَلَّمُوْهُ فَرَفَضُوْا كُتُبَ أَنْبِيَائِهِمْ.

১০২. আর তারা অনুসরণ করে اتَّبَعُوْا বাক্যটি نَبَذَ -এর উপর عطف হয়েছে। সোলায়মানের রাজত্বে অর্থাৎ তার যুগে শয়তানরা যা অর্থাৎ যে জাদু সম্পর্কে আবৃত্তি করে আবৃত্তি করতো। হযরত সোলায়মান (আ.) যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন তখন শয়তান তাঁর সিংহাসনের তলদেশে জাদু সম্পর্কিত কিছু বিষয় পুঁতে রেখেছিল। অথবা শয়তান জিনরা আকাশে কান পেতে কিছু বিষয় জেনে নিত এবং তার সাথে বহু মিথ্যার সংমিশ্রণ করে গণকদেরকে তা অবহিত করতো। তারা এগুলো সংকলন করে রাখত। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজত্বকালে তার খুবই প্রসার ঘটে এবং এ কথারও খুব প্রচার প্রসার হয় যে, জিনেরা গায়েব ও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সোলায়মান (আ.) যেসব গ্রন্থসমূহ একত্র করে পুঁতে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান লোকজনকে ঐ লুক্কায়িত বিষয়সমূহের সন্ধান দেয়। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোতে জাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা বলতে লাগল, এর সাহায্যেই সোলায়মান তোমাদের উপর এত বড় রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। অনন্তর তারা তা শিখে নিল এবং নবীগণের উপর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ পরিত্যাগ করে বসল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : مَا تَتْلُوْ . اَىْ تَلَت

মাযির অর্থে মুযারে ব্যবহার : تَتْلُوْا হলো مُضَارِعْ-এর সীগাহ। কিন্তু তা মাযির অর্থে। এর উদ্দেশ্য দ্বারা হলো حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ অর্থাৎ, অতীতকালীন ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করা যেন সে বিষয়টি বর্তমানে দৃষ্টির সামনে সংঘটিত হচ্ছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) تَتْلُوْا -এর তাফসীরে تَلَت উল্লেখ করে এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى . عَهْدِ . مُلْكِ سُلَيْمَانَ مِنَ السِّحْرِ

উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.) عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ-এর মাঝে عَهْدِ শব্দটি বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَافْ উহ্য আছে। আর কেউ কেউ বলেন, এখানে مُلْك দ্বারা রূপক অর্থে عَهْد বা যুগ উদ্দেশ্য। مَا تَتْلُوْا -এর بَيَانْ হয়েছে। অর্থাৎ, مَا-টি ইসমে মাওসূল এবং তা দ্বারা سِحْر উদ্দেশ্য। مِنَ السِّحْرِ বাক্যটি

قَوْلُهُ : وَكَانَ دَفَنَتْه .... نُزِعَ مُلْكُهُ

হযরত সোলায়মান (আ.) সংক্রান্ত প্রথম ঘটনা : আলোচ্য অংশে মুফাসসির (র.) জাদুর গ্রন্থাবলি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে ফেলা সংক্রান্ত দুটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। وَكَانَ دَفَنَتْه ... مُلْكُه অংশটুকু দ্বারা তিনি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া সংক্রান্ত লোকমুখে প্রচলিত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ- হযরত সোলায়মান (আ.)-এর কোনো স্ত্রী ৪০ দিন মূর্তিপূজা করেছিল। কিন্তু তিনি টের পাননি। তাই আল্লাহ তা'আলা নবীর অবস্থান বিবেচনায় সমসংখ্যক দিন ভর্ৎসনাস্বরূপ সিংহাসন থেকে দূরে রেখেছেন।

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব ছিল মূলত একটি আংটির মধ্যে। সেটি ছিল জান্নাত থেকে প্রাপ্ত একটি আংটি হযরত সোলায়মান (আ.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় সেটি খুলে রেখে যেতেন।

একদিনের ঘটনা তিনি আংটিটি খুলে আমেনা নামে তার এক স্ত্রীর কাছে রেখে গেলেন। ইত্যবসরে صَخْرُ الْمَارِدْ নামক একটি জিন হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে তার স্ত্রীর কাছে এসে বলল, আমার আংটিটি দাও তো! তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন। আংটি হস্তগত হওয়ার কারণে জিন-ইনসান, পশু-পাখি, হাওয়া-বাতাস সবকিছুই তার অনুগত হয়ে যায়। এমনকি সে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। এ সময় সে জাদুসংক্রান্ত কিছু পুস্তক হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে রেখে দেয়। এদিকে হযরত সোলায়মান (আ.) ফিরে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলেন। স্ত্রী তাঁকে চিনতে পারলেন না। তাই বললেন, তুমি সোলায়মান নও। সোলায়মান তো আংটি নিয়ে গেছে। তখন হযরত সোলায়মান (আ.) বুঝলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যাই হোক ৪০ দিন পূর্ণ হলে সে জিন সিংহাসন থেকে উড়ে যায় এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আংটিটি সমুদ্রে ফেলে দেয়। একটি মাছ তা গিলে ফেলে। ঘটনাক্রমে মাছটি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর হাতে ধরা পড়ে। তিনি মাছের পেট থেকে আংটিটি নিয়ে পরিধান করেন এবং এর ফলে তার রাজত্ব ফিরে আসে। তারপর তিনি صَخْرُ الْمَارِدْ নামক জিনকে ডেকে পাঠান। সে হাজির হলে তাকে একটি পাথরের ভিতর গর্ত করে বন্দি করেন এবং শিসা ও লোহা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে সেটি সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষেপ করেন। [তাফসীরে খাজিনের সূত্রে হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮]

ঘটনাটির একটি অংশ আল্লামা মহল্লী (র.) সূরা সোয়াদ -এর ৩৪ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে উল্লেখ করেন।

ঘটনাটি পর্যালোচনা : ঘটনাটি ইসরাঈলী বর্ণনা এবং সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী। বিবেক এবং শরিয়তের উসূল অনুযায়ী কোনোভাবেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১. কাযী ইয়ায (র.) বলেন–

لَا يَصِحُّ مَا نَقَلَهُ الْاَخْبَارِيُّوْنَ مِنْ تَشَبُّهِ الشَّيْطَانِ بِسُلَيْمَانَ وَتَسَلُّطِهٖ عَلٰى مُلْكِهٖ وَتَصَرُّفِهٖ فِيْ اُمَّتِهٖ بِالْجُوْرِ فِيْ حُكْمِهٖ وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا يَتَسَلَّطُوْنَ عَلٰى مِثْلِ هٰذَا اَوْ قَدْ عَصَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْاَنْبِيَاءَ مِنْ مِثْلِ هٰذَا.

২. আল্লামা যামাখশরী (র.) বলেন–

اِنَّ مَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيْثِ الْخَاتِمِ وَالشَّيْطَانِ وَعِبَادَةِ الْوَثَنِ فِيْ بَيْتِ سُلَيْمَانَ فَمِنْ اَبَاطِيْلِ الْيَهُوْدِ.

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ সংক্রান্ত একাধিক বর্ণনা তার তাফসীর গ্রন্থে নকল করার পর বলেন–

هٰذَا كُلُّهٗ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِيْ لَا نُصَدِّقُهَا وَلَا نُكَذِّبُهَا. [দরসে জালালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৮]

৪. আল্লামা আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, এ ঘটনা বর্ণনা করা জায়েজ নয়।

قَوْلُهٗ : أَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ ..... وَدَفَنَهَا

হযরত সোলায়মান (আ.) সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনা : এ অংশটুকুতে মুফাসসির (র.) সিংহাসনের নীচে জাদুর গ্রন্থাদি পুঁতে ফেলার দ্বিতীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো– শয়তানরা আসমানে ওড়ার সময় ফেরেশতাদের বিভিন্ন আলোচনা শুনে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করে গণকদেরকে বলত। এর দ্বারা গণকরা ভবিষ্যদ্বাণী করতো। তারা এ সংক্রান্ত গ্রন্থাদিও রচনা করে। ফলে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজত্বকালে জাদুর খুবই প্রসার ঘটল এবং এ কথারও খুব প্রচার-প্রসার হলো যে, জিনেরা গায়েব ও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সোলায়মান (আ.) জনগণের এ ভ্রান্ত ধারণা ভাঙার উদ্দেশ্যে জাদুটোনা সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ একত্র করে পুঁতে রাখেন। মুফাসসিরগণ এ ঘটনাটিকেই সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : فَلَمَّا مَاتَ .... رَفَضُوْا كُتُبَ أَنْبِيَائِهِمْ

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর পর জাদুর প্রসার : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচ থেকে জাদুর বইপুস্তক উদ্ধারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা হলো– একদা শয়তান বনী ইসরাঈলের কিছু মানুষের কাছে এসে বলল, তোমরা সোলায়মানের সিংহাসনের নীচে গর্ত করো। শয়তানের কথা মতো তারা সিংহাসনের নীচে গর্ত করে ঐ সবকিছু পেল, যা হযরত সোলায়মান (আ.) পুঁতে রেখেছিলেন। তখন শয়তান বলল, হযরত সোলায়মান (আ.) এগুলোর সাহায্যেই জিন, ইনসান, পাখি ইত্যাদি বশ করে রাজত্ব করতেন। এ ঘটনার পর মানুষের মাঝে প্রচারিত হলো যে, হযরত সোলায়মান (আ.) জাদুকর ছিলেন। ফলে বনী ইসরাঈলরা সেসব গ্রন্থ থেকে জাদু চর্চা শুরু করে দিল। [হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯]

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

تَتْلُوْا : সীগাহ وَاحِدِ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ ت . ل . و জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- সে পাঠ করে।

অভিধানে تَتْلُوْ ফে'লের ভিন্ন অর্থবোধক দুটি মাসদার রয়েছে। যথা- ১. যদি এর মাসদার تَلْوًا হয়, তাহলে অর্থ হবে পিছনে আসা। পদাঙ্ক অনুসরণ করা। ২. আর যদি এর মাসদার تِلَاوَةٌ হয় তাহলে অর্থ হবে পড়া, পড়ে শুনানো, অর্থ অনুধাবন করা, তেলাওয়াত শব্দটি আসমানি কিতাবাদির জন্য নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে কেরাত শব্দটি ব্যাপক, আলোচ্য আয়াতে শয়তানের ধারণা অনুযায়ী তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কারণ, তাদের ধারণা ছিল, তারা আল্লাহর কালাম পাঠ করছে। তেলাওয়াতের সম্পর্ক যদি আল্লাহর দিকে হয়, তাহলে اِنْزَال অর্থ হয়। যেমন- ذٰلِكَ نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اَىْ نُنَزِّلُ

تَسْتَرِقُ : সীগাহ وَاحِدِ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِسْتِرَاق মূলবর্ণ (س . ر . ق) জিনস صَحِيْحٌ অর্থ- সে চুরি করতো।

اَلْكَهَنَة : এটি كَاهِن-এর বহুবচন। অর্থ- জ্যোতিষী।

يُدَوِّنُوْنَ : সীগাহ جَمَعَ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّدْوِيْن মূলবর্ণ د . و . ن জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তারা সংকলন করে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانِ

عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ الشَّيَاطِيْن ফায়েল تَتْلُوْا ফে'ল ও ফায়েল مَا ইসমে মাওসূল اتَّبَعُوْا ফে'ল ও وَاو হরফে আতফ মুতা'আল্লিক হয়ে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে সেলা। মাওসূল ও সেলা মিলে মাফ'উলে বিহী اتَّبَعُوْا ফে'লের। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে আতফ হয়েছে পূর্বের আয়াতে نَبَذَ -এর উপর।

تَخْرِيْجُ الْاَحَادِيْثِ : হাদীস-তথ্যসূত্র

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانِ

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) وَرَفَضُوْا كُتُبَ اَنْبِيَائِهِمْ বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَخْبَرَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَنْبَأَ جَرِيْرٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيِّهِمْ؟ قَالَ : مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ: فَمَا الْخَبَرُ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُمْ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَلِيًّا خَارِجٌ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ لَا أَبَا لَكَ لَوْ شَعَرْنَا ذٰلِكَ مَا أَنْكَحْنَا نِسَاءَهُ، وَلَا قَسَمْنَا مِيْرَاثَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا سَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذٰلِكَ إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَانُوا يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَجِيءُ بِكَلِمَةِ حَقٍّ قَدْ سَمِعَهَا النَّاسُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا سَبْعِينَ كِذْبَةً، فَيُشْرِبَهَا قُلُوبَ النَّاسِ، فَأَطْلَعَ اللهُ عَلَى ذٰلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا تَحْتَ الْكُرْسِيِّ، فَلَمَّا مَاتَ سُلَيْمَانُ قَامَ شَيْطَانٌ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِ سُلَيْمَانَ الَّذِي لَا كَنْزَ لِأَحَدٍ مِثْلُ كَنْزِهِ الْمُمْتَنِعِ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَأَخْرَجُوهُ فَإِذَا هُوَ سِحْرٌ فَتَنَاسَخَتْهَا الْأُمَمُ فَبَقَايَاهَا مِمَّا يَتَحَدَّثُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عُذْرَ سُلَيْمَانَ "، فَقَالَ: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ.

হাদীসটি আল্লামা হাকেম (র.) اَلْمُسْتَدْرِكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ গ্রন্থে ৩০৫০ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা যাহাবী (র.) এ মাওকূফ হাদীসটিকে صَحِيْحٌ বলেছেন। [মুস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯১]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا .... مُلْكِ سُلَيْمَانَ

পূর্বের আয়াতে এ বিবরণ ছিল যে, ইহুদিরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মূল তাওরাত থেকে বিমুখ ছিল। এ আয়াতে আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হয়ে তারা যা গ্রহণ করেছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا ... عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ

আয়াতে বর্ণিত ইহুদিদের সময়কাল নির্ণয় : আয়াতটি দ্বারা কোন যুগের ইহুদি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, হযরত সোলায়মান (আ.)-এর যুগের ইহুদিরা। কোনো মুফাসসির বলেন, রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদিরা। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি উভয় অভিমতেরই সম্ভাবনা রাখে। কারণ ইহুদিদের মাঝে জাদুবিদ্যার প্রচলন সুবিদিত। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর যুগের সময়কাল ইহুদিদের মাঝে যেমন এর প্রচলন ছিল। নবী করীম ﷺ-এর যুগেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এমনকি ইহুদিরা নবী করীম ﷺ-কেও জাদু করেছিল।

اَلشَّيَاطِيْن-এর মর্ম সম্পর্কে মতপার্থক্য : আলোচ্য অংশে اَلشَّيَاطِيْن শব্দটির উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রয়েছে–

১. কোনো কোনো অভিধানবিদ ও তাফসীরবিদ বলেন, এখানে اَلشَّيَاطِيْن দ্বারা ইবলিস উদ্দেশ্য নয়; বরং مَرَدَةِ الْجِنِّ তথা খবীস ও ঔদ্ধত, দুর্ধর্ষ জিনরাই এখানে উদ্দেশ্য; যারা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল। অর্থাৎ, ঔদ্ধত জিনরা।

২. কেউ কেউ এখানে মানুষ শয়তান উদ্দেশ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, সেসব অবাধ্য ও পিশাচ লোকেরা, যারা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো এবং তার নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ রটাত এবং যারা জাদু ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। এটি মু'তাযিলা মুতাকাল্লিমদেরকে অভিমত।

৩. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মুফাসসিরগণ উভয় অর্থের অবকাশ রেখেছেন অর্থাৎ জিন বা মানব শয়তান কিংবা উভয় সম্প্রদায়। একথাটিই তাফসীরে বায়যাভীতে এভাবে বর্ণিত রয়েছে– اَلشَّيَاطِيْنُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَوْ مِنْهُمَا

✪ تَعَارُفُ الْاَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর পরিচয় : হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.) [খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৯৭০-৯৭১] তিনি একজন প্রখ্যাত নবী ছিলেন। তাঁর বংশধারা ইয়াহুদা হয়ে ইয়াকূব (আ.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। তাওরাতের বর্ণনানুযায়ী তাঁর মায়ের নাম ছিল বিনতে সাবা। যিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর উজির উরাইয়্যার স্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত দাউদ (আ.) তাঁকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্ম হয়। কিন্তু এ ঘটনাটিকে ওলামায়ে কেরাম ভ্রান্ত ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব, এটা তাঁর মায়ের নাম হতে পারে না। অন্য কোনো রেওয়ায়েতে তাঁর মাতার নামের উল্লেখ নেই।

তিনি নবী হওয়ার পাশাপাশি একজন শাসকও ছিলেন। শাম ও ফিলিস্তীন ছাড়িয়ে তার রাজ্যসীমা পূর্বে ইরাকের ফোরাত [ইউফ্রেটিস] নদীর তীর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮]

قَالَ تَعَالٰى تَبْرِئَةً لِسُلَيْمَانَ وَرَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ فِي قَوْلِهِمْ اُنْظُرُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ سُلَيْمَانَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَمَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ أَيْ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ لِأَنَّهُ كُفْرٌ ﴿وَلٰكِنَّ﴾ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ ﴿الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ كَفَرُوْا ﴿وَ﴾ يُعَلِّمُوْنَهُم ﴿مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ أَيْ أُلْهِمَاهُ مِنَ السِّحْرِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ اللَّامِ الْكَائِنَيْنِ ﴿بِبَابِلَ﴾ بَلَدٍ فِيْ سَوَادِ الْعِرَاقِ ﴿هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ﴾ بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْمَلَكَيْنِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هُمَا سَاحِرَانِ كَانَا يُعَلِّمَانِ السِّحْرَ وَقِيْلَ مَلَكَانِ أُنْزِلَا لِتَعْلِيْمِهِ ابْتِلَاءً مِنَ اللهِ لِلنَّاسِ ﴿وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ﴾ زَائِدَةٌ ﴿أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ﴾ لَهُ نُصْحًا ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ بَلِيَّةٌ مِنَ اللهِ لِلنَّاسِ لِيَمْتَحِنَهُمْ بِتَعْلِيْمِهِ فَمَنْ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ بِتَعَلُّمِهِ فَإِنْ أَبٰى إِلَّا التَّعْلِيْمَ عَلَّمَهُ.

ইহুদিরা বলত, হযরত সোলায়মান (আ.) একজন জাদুকর ছিলেন। আর মুহাম্মদকে দেখ, তিনি সোলায়মানকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করে তার আলোচনা করেন। তাদের এ অভিযোগের প্রতিবাদ ও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নির্দোষতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন সোলায়মান কুফরি করেননি অর্থাৎ, তিনি জাদুর আমল করেননি, কেননা তা কুফরি; বরং لٰكِنَّ -এর নূন বর্ণে তাশদীদ এবং সাকিন উভয়রূপেই পড়া যায়। শয়তানরাই সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ বাক্যটি كَفَرُوْا-এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। আর তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যা বাবেলে ইরাকের একটি শহর হারুত ও মারুত هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ শব্দদ্বয় اَلْمَلَكَيْنِ থেকে بَدَلْ অথবা عَطْفِ بَيَان হয়েছে। ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ, যে জাদুবিদ্যা তাদের উপর ইলহাম করা হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। اَلْمَلَكَيْنِ শব্দটির লাম বর্ণে এক কেরাত অনুযায়ী যের দিয়েও পড়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হারুত ও মারুত ছিল দুই জাদুকর। মানুষকে তারা জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো দুই ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ জাদু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উপদেশাচ্ছলে এই কথা না বলে তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না مَا অতিরিক্ত যে, আমরা মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। জাদুর শিক্ষা দ্বারা তিনি তাদের পরীক্ষা করবেন যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে না সে মুমিন বলে গণ্য হবে। সুতরাং তুমি তা শিক্ষা গ্রহণ করে কুফরি করো না। তবে কেউ যদি সকল কিছু প্রত্যাখ্যান করে শুধু তা শিক্ষা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হতো, তবে তারা তাকে তা শিক্ষা দিতেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ اَىْ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ

জাদুর আমল করা কুফরি : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহুদিরা তো হযরত সোলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলেছিল তাই وَمَا سِحْرُ سُلَيْمَانَ বলা উচিত ছিল। এখানে مَا كَفَرَ দ্বারা لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ উদ্দেশ্য। সেই সাথে বুঝা গেল শুধু জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কুফরি নয়; বরং عَمَلٌ بِالسِّحْرِ অর্থাৎ, জাদু অনুযায়ী আমল করা হলো কুফরি।

قَوْلُهٗ : وَ ـ يُعَلِّمُوْنَهُمْ ـ مَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

وَاو -এর আমল বর্ণনা : ওয়াও (واو) কখনো এক বাক্যাংশকে অপর বাক্যাংশের সঙ্গে, কখনো এক শব্দকে অপর শব্দের সঙ্গে এবং কখনো এক বাক্যাংশকে অপর শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে। এখানে مَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ পূর্ববর্তী النَّاس -এর উপর আতফ হয়েছে। মুফাসসির (র.) وَاو -এরপর يُعَلِّمُوْنَهُمْ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : مَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اَىْ اُلْهِمَاهُ

এখানে اُنْزِلَ দ্বারা এলহাম পাঠানো উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) اُنْزِلَ -এর তাফসীরে اُلْهِمَاهُ উল্লেখ করায় একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে اُنْزِلَ দ্বারা ওহীর পদ্ধতি اِنْزَال উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে اُنْزِلَ দ্বারা اِلْهَام করা তথা সাধারণ অর্থে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৩]

قَوْلُهٗ : اَلْكَائِنَيْنِ ـ بِبَابِلَ

بِبَابِلَ -এর তারকীব বর্ণনা : মুফাসসির (র.) এটি উহ্য ধরে ইঙ্গিত করলেন যে, সামনের بِبَابِلَ অংশটি الْمَلَكَيْنِ -এর উহ্য সিফাতের ظَرْفٍ مُسْتَقِرٌّ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ بَدْلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْمَلَكَيْنِ

হারুত ও মারুতের ব্যাখ্যা : এ দুটি শব্দ স্থান হিসেবে الْمَلَكَيْنِ থেকে بَدْلُ الْكُلِّ হয়ে মাজরূরের স্থানে রয়েছে। অথবা عَطْفِ بَيَان হয়েছে। তারকীব অনুযায়ী এ অর্থ দাঁড়ায়, শয়তানরা মানুষকে জাদু শেখাত এবং দুই ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা শেখাত।

قَوْلُهٗ : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ ـ زَائِدَة

এখানে مِنْ শব্দটি অতিরিক্ত : মুফাসসির (র.) বলেন, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ -এর মধ্যে مِنْ শব্দটি অতিরিক্ত। তারকীবে এর কোনো স্থান নেই।

قَوْلُهٗ : قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَان

হারুত ও মারুতের পরিচয় : হারুত ও মারুত -এর পরিচয় সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। মুফাসসির (র.) তন্মধ্যে দুটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। যথা-

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হারুত ও মারুত দু'জন জাদুকর ছিল। মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। এটি مَلَكَيْنِ -এর লামে যেরযুক্ত কেরাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ. হারুত ও মারুত মানুষ নয়; বরং দু'জন ফেরেশতা ছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির পরীক্ষাস্বরূপ জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নাজিল করা হয়। এটি লাম বর্ণে যবরযুক্ত কেরাতের ক্ষেত্রে এবং এ অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مَا اُنْزِلَ : সীগাহ وَاحِدِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفْيِ فِعْلِ مَاضِى مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِنْزَلُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– তা অবতারিত হয়নি।

فِتْنَةٌ : এটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– পরীক্ষা। যেমন কুরআনে রয়েছে– إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

আলোচ্য আয়াতে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। শব্দটি সীমাহীন কষ্ট প্রদান ও নির্যাতনের অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে– إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ

فَتَنَ عَنْ অর্থ হলো– বিরত রাখা, ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন কুরআনে আছে–

وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ.

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَعَالٰى وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ ... فَلَا تَكْفُرْ

وَاو ইস্তিনাফিয়া مَا كَفَرَ ফে'ল سُلَيْمٰنُ ফায়েল وَاو হরফে আতফ لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلشَّيٰطِيْنَ ইসমে لٰكِنَّ; كَفَرُوْا জুমলা ফে'লিয়া হয়ে খবরে يُعَلِّمُوْنَ ফে'ল, উহ্য যমীর ফায়েল النَّاس প্রথম মাফ'উলে বিহী السِّحْر মাফ'উলে বিহী ছানী। ফে'ল, ফায়েল উভয় মাফ'উল মিলে জুমলা হয়ে لٰكِنَّ-এর খবরে ছানী।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُه تَعَالٰي : لٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ

وَلٰكِنَّ শব্দের কেরাত : ১০২ নং আয়াতে উল্লিখিত لٰكِنَّ শব্দের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ن বর্ণে তাশদীদসহ لٰكِنْ পড়েছেন।

খ. ইমাম হামযা, কিসায়ী ও ইবনে আমের (র.) শব্দটির ن বর্ণে সূকূনযোগে لٰكِنَّ পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰي : وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

اَلْمَلَكَيْنِ শব্দের কেরাত : ১০২ নং আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلْمَلِكَيْنِ শব্দের দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ل বর্ণে যবরযোগে اَلْمَلَكَيْنِ পড়েছেন।

খ. জমহুর কারী শব্দটি ل বর্ণে যেরযোগে اَلْمَلِكَيْنِ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰي : وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ..... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, কুরআনে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হলে মদিনার ইহুদিরা বলল, মুহাম্মাদের কর্মকাণ্ড কত আশ্চর্যের ! সে দাবি করে বলে যে, দাউদের পুত্র নবী! অথচ সে তো জাদুকর ছিল। তখন وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ অংশটুকু নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ..... فَلَا تَكْفُرْ

হযরত সোলায়মান (আ.) নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ: মুসলমানগণ এমনিতেই নবীগণের গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার আকিদা পোষণ করে। তারপরও আলোচ্য আয়াতে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার কারণ হলো, ইহুদিদের মাঝে হযরত সোলায়মান (আ.) সম্পর্কে মনগড়া ও ভ্রান্ত ঘটনা প্রচলিত আছে, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া তারা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নামে জাদুকর হওয়ার দাবির মাধ্যমে কুফরি-শিরক পর্যন্ত আরোপ করেছে। [তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৯]

তাই হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাদুর পরিচয় : গোপন অদৃশ্য উপকরণ যেমন- গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, জিন শয়তানদের সহায়তা গ্রহণ ইত্যাদি, কাজে লাগিয়ে অভিনব কারিশমা দেখানোকে জাদু বলা হয়। বিশেষ ধরনের সাধনা ইত্যাদির সাহায্যে এ বিদ্যা অর্জিত হয়ে থাকে। মুশরিক ও কিতাবী সম্প্রদায়গুলোতে প্রাচীন যুগ থেকেই বহুল পরিমাণে এর প্রচলন ছিল এবং এখনো রয়েছে। ইসলামি শরিয়তে এটিকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। [তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮১]

জাদুবিদ্যা ও মু'জিযার মধ্যকার পার্থক্য : পয়গাম্বরদের মু'জিযা ও ওলিদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত মনে করে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যথা-

১. জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলিও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার কারণে মানুষ সেগুলোকে অলৌকিক মনে করে। পক্ষান্তরে মু'জিযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই।

২. মু'জিযা বা কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টিগোচরে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র, এবং আল্লাহ তা'আলার জিকির থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

৩. আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি, যে ব্যক্তি মু'জিযা ও নবুয়ত দাবি করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুয়তের দাবি ছাড়া জাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। [মাআরিফুল কুরআন]

হারুত ও মারুতের ঘটনা: ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদুবিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গাম্বরগণের মু'জিযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে 'হারুত' ও 'মারুত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে।

এই ফেরেশতাগণ জাদু দেখানোর পূর্বে মানুষকে সতর্ক করতেন। কিন্তু তারপরও মানুষেরা জাদু শিখতে চাইত এবং জাদু শিখার পর তা অন্যায় কাজে ব্যবহার করতো। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেন-

كَانَا يُعَلِّمَانِ تَعْلِيْمَ اِنْذَارٍ لَا تَعْلِيْمَ دُعَاءٍ اِلَيْهِ كَاَنَّهُمَا يَقُوْلَانِ لَا تَفْعَلْ كَذَا كَمَا لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنْ صِفَةِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ فَأَخْبَرَ بِصِفَتِهٖ لِيَجْتَنِبَهٗ.

ফেরেশতাগণ এ বিষয়টিতে এতই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে শেখানো-বুঝানো তো পরের কথা, যারা তা জানতে চাইত, তাদেরও প্রথমে সর্তক করে দিতেন, তাদের উপদেশ না দিয়ে শেখাতেন না। অর্থাৎ, তারা বলতেন, আমাদের কাছে যা শুনছ, তাকে কুফরির উপকরণ বা মাধ্যম বানিয়ো না। তা শিখে আমল করো না।

[তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড১, পৃষ্ঠা- ১৮৮]

জাদু সম্পর্কিত দায়িত্ব নবীকে না দেওয়ার কারণ : এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ হলো–

১. এতে পয়গাম্বর ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

২. জাদুর ব্যাক্যাবলি মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরে'র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গাম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়াতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। তাই এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا ..... الخ

হারুত ও মারুত সংশ্লিষ্ট যোহরার ঘটনাটি অলীক : কোনো কোনো তাফসীরকার এখানে ইহুদিদের বর্ণিত বাবেলের নামকরা নর্তকী যোহরার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রথমত আয়াতের তাফসীর কোনো অংশেই এবং কোনো দিক দিয়ে সে কাহিনীর প্রতি নির্ভরশীল নয়।

দ্বিতীয়ত উলামায়ে কেরামের মাঝে এর প্রামাণ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনে কাসীর (র.)-সহ মুহাক্কিকগণ সে কাহিনীর প্রামাণ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা পরিষ্কার লিখেছেন যে, কাহিনীটি সম্পূর্ণ বানোয়াট অলীক ও প্রত্যাখ্যাত।

আর একান্ত যদি ঘটনাটি সঠিক মেনেও নেওয়া হয়, তবুও কোনো বিশেষ লক্ষ্যে কোনো ফেরেশতাকে মানব আকৃতি-প্রকৃতি ও আবেগ-অনুভূতি দিয়ে দেওয়ার পরে মানবিক আবেগ-অনুভূতির শিকার হয়ে পড়লে তাতে অসম্ভাব্যতার কোনো দিক নেই, শরিয়তের দৃষ্টিতেও নয়, যুক্তির বিচারেও নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা করেছেন তা পড়ে নেওয়া যেতে পারে।

[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র.) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-১৯০]

জাদুর শরয়ী বিধান : হযরত সোলায়মান (আ.)-এর শরিয়তে জাদু নিঃশর্তভাবে কুফরি ছিল। আর ইসলামি শরিয়তে সামান্য বিশ্লেষণ আছে। তা হলো জাদুকে হালাল মনে করা কুফরি। আর জাদুবিদ্যা শিক্ষা করাকে কেউ বলেন হারাম, কেউ বলেন মাকরুহ, আবার কেউ মুবাহও বলেন। মোটকথা, জাদু প্রয়োগ করার নিয়তে শিখলে তা হারাম হবে। কিন্তু কেউ আত্মরক্ষার জন্য শিখলে তা মুবাহ হবে। [হাশিয়াতুল জামাল: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ১২৯]

অনেকে বলেন, কোনো অবস্থাতেই জাদুবিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ নয়। এমনকি কাফের জাদুকরদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শেখাও হারামের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, কুরআনের বাণী- فَلَا تَكْفُرْ নিঃশর্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায়। [রদ্দুল মুহতার]

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, "জাদু কুফরি ও ফাসেকী হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো, যদি তাতে কুফরি বাক্য থাকে, যেমন- শয়তানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং গ্রহ-নক্ষত্রে শরণাপন্ন হওয়া ইত্যাদি, তবে তা কুফর হবে। চাই তা দিয়ে কারো ক্ষতি সাধন করা হোক বা উপকার করা হোক। আর বাক্য ও মন্ত্রগুলো মুবাহ ধরনের হলে সেক্ষেত্রে শরিয়ত অনুমোদিত নয়, এমন পন্থায় বা ধরনে কারো ক্ষতি সাধন করা হলে কিংবা কোনো অবৈধ ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হলে তা নিষিদ্ধ। আর ক্ষতি সাধন না করা হলে কিংবা কোনো অবৈধ্য উদ্দেশ্যে প্রয়োগ না করা হলে তাকে প্রচলিত ভাষায় জাদু বলা হয় না, বরং তা 'আমল' 'আজীমাত' 'তদবির' 'তাবীজ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। এগুলো মুবাহ ও অনুমোদিত । তবে মন্ত্রের বাক্যগুলো দুর্বোধ্য হলে কুফর হওয়ার সম্ভাবনার কারণে হারাম হবে।

[তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ১৮৯]

পয়গাম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়াশীল হয় কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গাম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গাম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও হয়েছিল। জাদুর প্রভাব হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভাবান্বিত হওয়া কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে- فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ এবং يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ জাদুর কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। [মা'আরিফুল কুরআন: মুফতি শফী (র.)]

✪ تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

বাবেল শহর : প্রাচীন যুগে যে দেশটি বাবেল নামে পরিচিত ছিল সেটি বর্তমান ভূগোলে আরব ইরাক [ইরাকের আরব অঞ্চল] নামে অভিহিত। রাজ্যের রাজধানীও ছিল এ নামে। বাবেল নগরী ফোরাত [ইউফ্রেটিস] নদীর তীরে বর্তমান বাগদাদের প্রায় ৫৩ মাইল [৮৫ কি. মি.] দক্ষিণে, বর্তমান হিল্লার কাছাকাছি অবস্থিত। শহরটি বেশ বড়, আয়তন কয়েক বর্গমাইল। উন্নতি-অগ্রগতির যুগে দেশটি বেশ সুজলা-সুফলা ছিল এবং সম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। নদী-নালা, পানি সেচ ব্যবস্থা, ভবন ও সৌধ এবং বড় বড় দুর্গের চিহ্নাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এতে অন্তত এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, দেশে সুদক্ষ প্রকৌশলীর অভাব ছিল না। দজলা ও ফোরাতের ন্যায় বিখ্যাত নদী দুটি এর সমগ্র অঞ্চল বিধৌত করছিল। এ রাজ্যের সমৃদ্ধিকাল ছিল আনুমানিক ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে। জাদুবিদ্যা ও মদের জন্য দেশটির বিশেষ খ্যাতি ছিল। [তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ১৮৫]

এটি বর্তমানে ব্যাবিলন নামে পরিচিত। ব্যাবিলন সুমেরিয়ান শব্দ। এর অর্থ হলো, ঈশ্বরের দরজা হিব্রু বাইবেলে শহরটি বাবেল নামে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বাবেল অর্থ হলো বিভ্রান্তি।

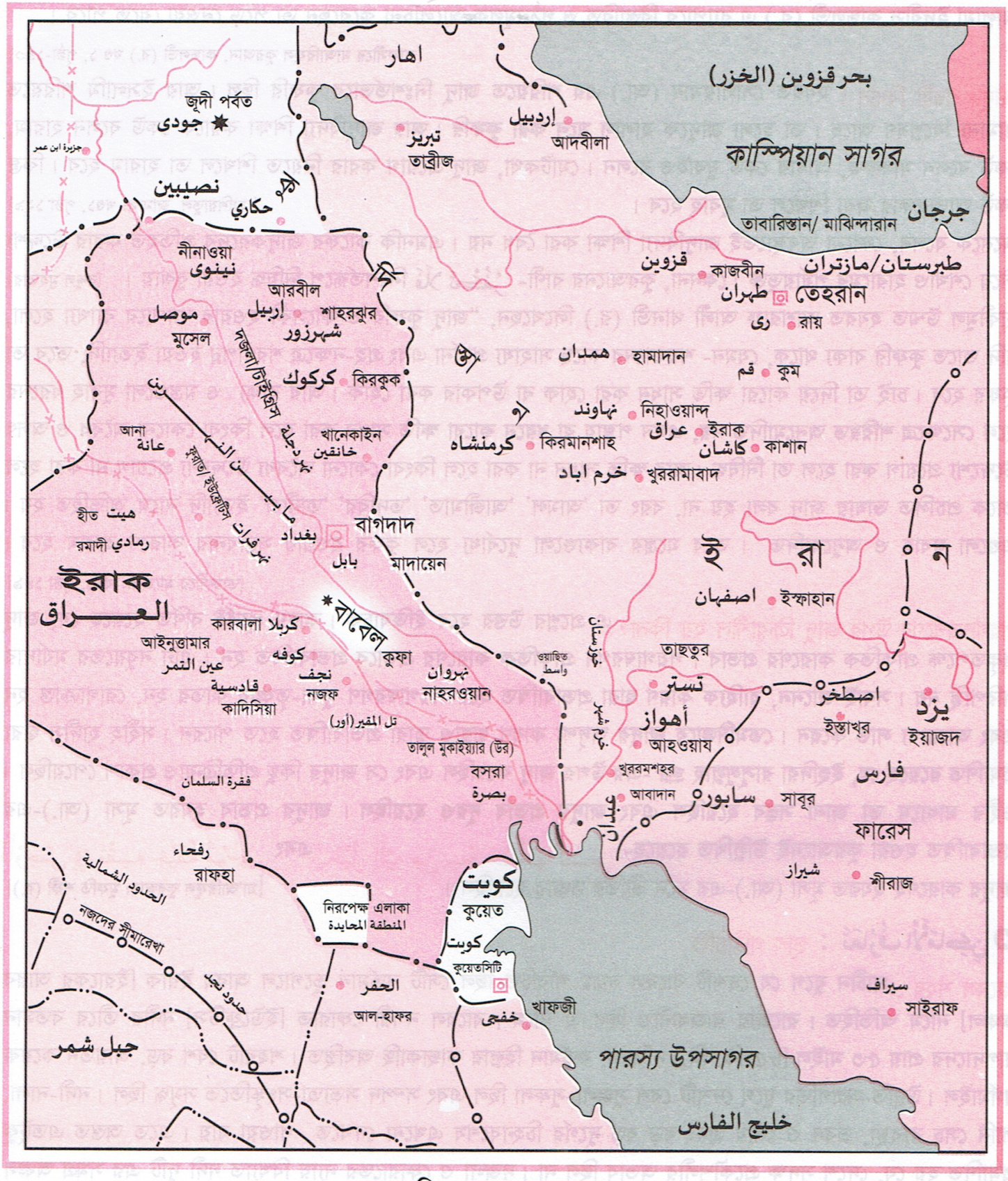

চিত্রে : বাবেল শহর

﴿فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ﴾ بِأَنْ يُبْغِضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ، ﴿وَمَا هُمْ﴾ أَيْ اَلسَّحَرَةُ ﴿بِضَآرِّيْنَ بِهٖ﴾ بِالسِّحْرِ ﴿مِنْ﴾ زَائِدَةٌ ﴿اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ بِإِرَادَتِهِ، ﴿وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ﴾ فِي الْآخِرَةِ، ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ وَهُوَ السِّحْرُ. ﴿وَلَقَدْ﴾ لَامُ قَسَمٍ ﴿عَلِمُوْا﴾ أَيْ اَلْيَهُوْدُ ﴿لَمَنِ﴾ لَامُ اِبْتِدَاءٍ، مُعَلَّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ، وَ«مَنْ» مَوْصُوْلَةٌ ﴿اشْتٰرٰىهُ﴾ اِخْتَارَهُ أَوْ اِسْتَبْدَلَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ ﴿مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ نَصِيْبٌ فِي الْجَنَّةِ. ﴿وَلَبِئْسَ مَا﴾ شَيْئًا ﴿شَرَوْا﴾ بَاعُوْا ﴿بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ﴾ أَيْ اَلشَّارِيْنَ أَيْ حَظَّهَا مِنَ الْآخِرَةِ أَنْ تَعَلَّمُوْهُ حَيْثُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ. ﴿لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ حَقِيْقَةً مَا يَصِيْرُوْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا تَعَلَّمُوْهُ.

অতঃপর তারা তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করত যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বিচ্ছেদ ঘটায় অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত ইচ্ছা ব্যতীত তারা অর্থাৎ, জাদুকররা তা জাদুবিদ্যা দ্বারা কারো مِنْ -টি অতিরিক্ত কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর তারা শিক্ষা করে যা পরকালে তাদের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনো উপকারে আসবে না। সেটা হলো, জাদুবিদ্যা, তারা ইহুদিরা নিশ্চিতভাবে لَامُ الْقَسَمِ টি لَام জানে, যে কেউ لَامُ الْاِبْتِدَاءِ টি لَام; যা তার পূর্ববর্তী শব্দকে আমল করা হতে বারণ করে। مَنْ হলো ইসমে মাওসূল। তা ক্রয় করে গ্রহণ করে বা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিনিময়ে এটা পরিবর্তন করে নেয় পরকালে তার জন্য কোনো অংশ জান্নাতের কোনো অংশ নেই।

আর কতইনা মন্দ বস্তু হিসেবে যার বিনিময়ে তারা বিক্রি করেছে বেচে দিয়েছে নিজেদেরকে অর্থাৎ বিক্রেতা আখেরাতে নিজেদের অংশ। মন্দ বিষয়টি হলো জাদু শিক্ষা করা। কারণ সেটাই তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। যদি তারা জানত যে আজাবে তারা উপনীত হতে যাচ্ছে তার বাস্তবতা, তাহলে তারা জাদু শিখত না।

١٠٣. ﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ﴾ أَيْ اَلْيَهُوْدَ ﴿اٰمَنُوْا﴾ بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ ﴿وَاتَّقَوْا﴾ عِقَابَ اللّٰهِ بِتَرْكِ مَعَاصِيْهِ كَالسِّحْرِ. وَجَوَابُ «لَوْ» مَحْذُوْفٌ أَيْ لَأُثِيْبُوْا، دَلَّ عَلَيْهِ ﴿لَمَثُوْبَةٌ﴾ ثَوَابٌ، وَهُوَ أَيْ لَمَثُوْبَةٌ مُبْتَدَأٌ وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْقَسَمِ ﴿مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ﴾ خَبَرُهُ، مِمَّا شَرَوْا بِهٖ أَنْفُسَهُمْ، ﴿لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ أَنَّهُ خَيْرٌ لَمَا آثَرُوْهُ عَلَيْهِ.

১০৩. যদি তারা অর্থাৎ, ইহুদিরা বিশ্বাস রাখত নবী ও কুরআনের উপর এবং পাপাচার যেমন জাদুবিদ্যা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে ভয় করতো لَوْ-এর জবাব উহ্য রয়েছে। জবাবটি হলো لَأُثِيْبُوْا ; لَمَثُوْبَةٌ শব্দটি তার প্রতি ইঙ্গিত করছে। তবে নিশ্চিতভাবে তার ছওয়াব প্রতিফল এটি মুবতাদা। আর তাতে لَام কসমের জন্য। আল্লাহ তা'আলার নিকট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মা বিক্রয় করেছে তদপেক্ষা অধিক কল্যাণকর হতো। এটি হলো মুবতাদার খবর যদি তারা জানত যে, এটাই তাদের পক্ষে কল্যাণকর তবে তারা এটাকে তার উপর প্রাধান্য দিত না।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ: لِمَنْ لَامُ إِبْتِدَاءٍ مُعَلَّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ

لَمَنْ-এর লামের পরিচয় : لَمَنْ-এর মধ্যকার لَام-টি لَامُ الْإِبْتِدَاءِ-এটি সাধারণত مُبْتَدَأٌ অথবা مُضَارِع-এর শুরুতে আসে। لَمَنْ-এর لَامُ الْإِبْتِدَاءِ-টি পূর্বোক্ত عَلِمُوْا-কে عَمَل করা থেকে বিরত রেখেছে।

قَوْلُهٗ : اشْتَرَاهُ اِخْتَارَهُ أَوْ اِسْتَبْدَلَهٗ

মাজাযী অর্থ বর্ণনা : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) একথা বুঝিয়েছেন যে, اِشْتَرٰي ফে'লটি মাজাযীভাবে اِخْتَارَ কিংবা اِسْتَبْدَلَ অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهٗ: اَنْفُسَهُمْ اَيِ الشَّارِيْنَ اَيْ حَظَّهَا مِنَ الْاٰخِرَةِ اَنْ تَعَلَّمُوْهُ

اَنْفُسَهُمْ-এর যমীর ও উহ্য মুযাফ এবং مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ-এর প্রতি ইঙ্গিত: اَلشَّارِيْنَ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْفُسَهُمْ- এর মধ্যে যমীরের مَرْجِعْ হলো ضَمِيْر مَرْفُوْع -شَرَوْا-এর;
আর حَظَّهَا-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْفُسَهُمْ-এর শুরুতে মুযাফ উহ্য আছে। অর্থাৎ حَظُّ اَنْفُسِهِمْ;
আর মুফাসসির (র.) اَنْ تَعَلَّمُوْهُ বাক্যটুকু উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَبِئْسَ مَا شَرَوْا -এর مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। তা হলো- اَنْ تَعَلَّمُوْهُ;

قَوْلُهٗ: لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ - حَقِيْقَةَ مَا يَصِيْرُوْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا تَعَلَّمُوْهُ

এখানে আজাবের হাকীকত উদ্দেশ্য: মুফাসসির (র.) এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হলো, وَلَقَدْ عَلِمُوْا দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা পরীক্ষা ও আজাবের কথা নিশ্চিতরূপে জানত, অথচ আয়াতের শেষাংশ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আজাবের কথা জানে না। সুতরাং উভয়টির মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়।
মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, তারা আজাবের কথা জানত; কিন্তু আজাবের হাকীকত ও প্রচণ্ডতা সম্পর্কে কিছুই জানত না। সুতরাং আর কোনো বৈপরীত্য থাকল না।

لو-টি শর্তের জন্য : মুফাসসির (র.) مَاتَعَلَّمُوْهُ অংশটিকে لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর জবাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, لَوْ-টি শর্তের অর্থে। তবে কতিপয় মুফাসসিরের মতে, এখানে لَوْ কে تَمَنّٰى এর অর্থে গ্রহণ করা উত্তম।

قَوْلُهٗ : وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ اَيْ لَأُثِيْبُوْا دَلَّ عَلَيْهِ . لَمَثُوْبَةٌ

لَوْ-এর জবাব নির্ণয় : এ ইবারতটুকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا-এর لَوْ-টি শর্তিয়া এবং তার জবাব উহ্য রয়েছে। সেটি হলো- لَأُثِيْبُوْا; আর এই জবাবটি নির্ণয় করা হয়েছে পরবর্তী لَمَثُوْبَةٌ শব্দটির করীনার ভিত্তিতে। সরাসরি لَمَثُوْبَةٌ-কে لَوْ-এর জবাব নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ, لَوْ-এর জবাব মাযীর ফে'ল হওয়া আবশ্যক। আর لَمَثُوْبَةٌ مِنْ ..... الخ হলো জমুলায়ে ইসমিয়া।
তবে কারো কারো মতে, لَمَثُوْبَةٌ বাক্যটি لَوْ-এর জবাব। আর যামীর ফে'লের পরিবর্তে জুমলায়ে ইসমিয়া ব্যবহার করা হয়েছে নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্ব বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهٗ: لَمَثُوْبَةٌ . ثَوَابٌ . وَهُوَ مُبْتَدَأٌ

مَثُوْبَةٌ-এর তারকীব বর্ণনা : وَهُوَ مُبْتَدَأٌ বলে বুঝানো হয়েছে যে, مَثُوْبَةٌ শব্দটি মুবতাদা হয়েছে। পরবর্তীতে مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অংশটি সিফাত হওয়ার কারণে নাকেরা শব্দ মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : مِمَّا شَرَوْا بِهٖ

خَيْرٌ-টি ইসমে তাফযীল : خَيْرٌ শব্দটি সাধারণ ইসম হিসেবে ব্যবহার হয়। আবার খেলাফে কেয়াস فِعْل-এর ওযনে ইসমে তাফসীলের অর্থে ব্যবহার হয়। মুফাসসির (র.) مِمَّا شَرَوْا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, خَيْرٌ শব্দটি এখানে ইসমে তাফযীলের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে অধিকাংশ মুফাসসির (র.)-এর অভিমত হলো, خَيْرٌ শব্দটি সাধারণ فَضِيْلَة বর্ণনার জন্য এসেছে; أَفْضَلِيَّة নয়। যেমন কুরআনের অন্যস্থানে এসেছে- أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

ضَارِّيْنَ : শব্দটি মাজরূর অবস্থায় রয়েছে। সীগার جَمْع مُذَكَّر বাহাছ اِسْم فَاعِل বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرُّ মূলবর্ণ (ض.ر.ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ- ক্ষতিসাধনকারী।

خَيْرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَخْيَارٌ মূলবর্ণ (خ.ي.ر) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ- অধিক কল্যাণকর।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَلَوْ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ..... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

واو ইস্তিনাফিয়া لو হরফে শর্ত ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল هم ইসমে إِنَّ; اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا মা'তূফ আলাইহ মা'তূফ মিলে খবরে إِنَّ, اَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা ইসমিয়া হয়ে ফায়েল ثَبَتَ উহ্য ফে'লের। ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে শর্ত। لَام হরফে رَبْط; مَثُوْبَةٌ মাওসূফ مِنْ عِنْدِ اللهِ মুতা'আল্লিক ثَابِتَة উহ্য শিবা ফে'লের সাথে হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, خير হলো খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ শর্ত, এর جواب-টি হলো مَا تَعْلَمُوْنَ যা উহ্য রয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا

পূর্বের আয়াতে ইহুদিদেরকে কুফর সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا .... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

আয়াতে إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- بِإِرَادَةِ اللهِ তথা আল্লাহর ইচ্ছা। অর্থাৎ, জাদুকররা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। এই আয়াতটুকু দ্বারা বুঝা যায়, জাদুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই; বরং তার কার্যকর হওয়া না হওয়া আল্লাহর ক্ষমতাধীন।

ইহুদিদের জাহেলের স্তরে রাখার কারণ: আয়াতে বারবার বলা হয়েছে لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ; অথচ ইহুদিরা জাদুর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিল। এর কারণ হলো, ইহুদিরা এটা জানা সত্ত্বেও ইহুদিরা 'ইলম' বা জানার বিপরীত কাজ করতো এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। কারণ যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا

এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে রিসালাত যুগের ইহুদিদের প্রতি। এ বক্তব্য পূর্ব আয়াত وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ-এর সঙ্গে সংযুক্ত। মাঝখানে সুলাইমানী যুগের ইহুদি ও তাদের জাদুচর্চা প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। এখন পুনরায় মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পরবর্তী প্রসঙ্গ রিসালাত যুগের সমকালীন ইহুদিদের। এ অংশ وَلَمَّا جَاءَهُمْ-এর সঙ্গে যুক্ত, জাদু প্রসঙ্গে মধ্যবর্তী প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছিল। সুতরাং عَلِمُوْا-এর কর্তা সর্বনাম সে [প্রথমে উল্লিখিত] ইহুদিদের নির্দেশ করবে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীর ভাষ্যে লক্ষ্য করুন- (مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَقِصَّةٌ مُسْتَطْرَدَةٌ فِي الْبَيْنِ فَالضَّمِيْرُ لِأُولٰئِكَ الْيَهُوْدِ - (روح)

কুরআন কি রকম জোরদার দাবি করে দিল- وَلَقَدْ عَلِمُوْا বলে যে, এ ইহুদিরা ভালো করেই জানে যে, জাদু টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র কত কদাকার বিষয়। ইহুদিরা তো বলতে পারত যে, আমরা কী করে জানব? কে আমাদের অবহিত করল। আমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে এসব কথা কোথায়? কিন্তু না, তারা তেমন করে বলতে পারেনি। কেননা যুগ যুগের বিকৃতি, রদবদলের পরেও বর্তমান তাওরাতে এ ধরনের স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান রয়েছে। [তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃষ্ঠা ১৯১]

নাহু শাস্ত্রের পরিভাষা تَعْلِيْق অর্থ শুধু শব্দগতভাবে আমল বাতিল করাকে বলে, মহলগতভাবে নয়। আর যখন أَفْعَال قُلُوْب -এর পরে حَرْف نَفِيْ বা حَرْف إِسْتِفْهَام বা لَام إِبْتِدَأْ আসে, তাহলে اَفْعَالْ قُلُوْبْ কে আমল থেকে مُتَعَلِّق করে দেয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِشْتَرَاهُ

তা খরিদ করল "ه" সর্বনাম যাদু (سِحْر) বুঝায়। اِشْترا এখানে হাকীক অর্থে নয়; বরং মাজাযী অর্থে। অর্থাৎ জাদুকে গ্রহণ করল অর্থাৎ শয়তানরা যা আবৃত্তি করত; তা গ্রহণ করল আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিনিময়ে এবং জাদু গ্রহণ করল আল্লাহ তা'আলার দীনের বিনিময়ে। ইহুদিদের সত্যের আহ্বানে জানানো হচ্ছিল, তাদের কাছে একত্ববাদী ধর্মের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল। অথচ তাদের এদিকে ছিল না কোনো মনোযোগ, কোনো আগ্রহ, তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, বেপরোয়া, একান্ত অমনোযাগী ও নিশ্চিন্ত। নিজেদের জাদুটোনা ও তন্ত্রমন্ত্রে মশগুল এবং সেসব গর্হিত বিষয়কে জীবনে পূর্ণাঙ্গতা দানের স্তরে ভাববার ধান্দায় বিভোর। এদের এ বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে আয়াতের এ অংশে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ

নিজেরা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ নিজেদের জীবনকে আজাব ও ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। بِئْسَمَا شَرَوْا بِهٖ কতই নিকৃষ্ট। সে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে কুফরি ও জাদু ভেল্কী জাতীয় কাজকর্ম, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। বান্দাদের অবস্থার প্রতি পূর্ণ আক্ষেপ ও পরিতাপের ভাষায় ইরশাদ হচ্ছে যে, সত্য দীনের ন্যায় মহা নিয়ামত উপেক্ষা করে এরা কুফরি ও জাদু গ্রহণ করে নিয়েছে। যেন জাহান্নাম কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। যখন তারা যাদু ও কুফরিকে দীন ও সত্যের উপর প্রাধান্য দিল।

জাদু বিদ্যা এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় : মু'তাযিলারা জাদুর ক্রিয়া পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে। অথচ পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) ও যাদুকর কওমের ঘটনাকে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত আয়াতগুলোতেও জাদুর ক্রিয়া ও আছরকে অস্বীকার করা দুষ্কর। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ -এর উপর লবীদ নামক ইহুদির জাদু করা এবং এ বিষয়ে সূরা নাস ও সূরা ফালাক অবতীর্ণ হওয়ার কথা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণনা হয়েছে, যেগুলোকে অস্বীকার করা কঠিন ব্যাপার। এমনিভাবে কতেক লোক উক্ত আয়াতের কারণে বুঝে গেছে যে, জাদুর ক্রিয়া শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। অন্যান্য বিষয়ে জাদুর ক্রিয়া নেই অথচ এটাও সঠিক নয়। কেননা উল্লেখের মধ্যে কোনো একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, সে বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়কে গণ্য করবে না। যদিও কোনো বিশেষ কারণে এ স্থানে জাদুর একটি বিশেষ ক্রিয়াকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে এর দ্বারা এটা কীভাবে বুঝা গেল যে, অন্যান্য ক্রিয়াসমূহ জাদুর মধ্যে একেবারেই হয় না।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

বালাগাতের শৈলী : আলোচ্য অংশে বালাগাতের একটি শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা হলো, কোনো বিষয় জানার পরও কেউ যদি সে অনুযায়ী না চলে তখন বক্তব্যে তাকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ধরে নেওয়া হয়। আলোচ্য অংশে ইহুদিরা জানার পরও আমল না করার কারণে এমনভাবে বলা হয়েছে যে, তারা যেন বিষয়টি জানেই না। এটাকে বালাগাতের পরিভাষায় تَنْزِيْلُ الْعَالِمِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ বলা হয়।

রুকূ' : ১৩

بَيَانُ النَّسْخِ وَحَقْدِ الْيَهُوْدِ وَحَسَدِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

নসখ এবং মুমিনদের প্রতি ইহুদিদের হিংসা বিদ্বেষের বর্ণনা

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ❑ رَاعِنَا বলতে সাহাবীগণকে নিষেধ করা ও এর কারণ
- ❑ নসখের বর্ণনা
- ❑ আহলে কিতাবদের আশঙ্কা ও তার কারণ
- ❑ মুসলমানদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও ইবাদতের নির্দেশ
- ❑ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি ও তার উত্তর
- ❑ যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নির্ভয় থাকবে

١٠٤. ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا﴾ لِلنَّبِيِّ : ﴿رَاعِنَا﴾ أَمْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ. وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهُ ذٰلِكَ، وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ مِنَ الرَّعُوْنَةِ، فَسُرُّوْا بِذٰلِكَ. وَخَاطَبُوْا بِهَا النَّبِيَّ، فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ عَنْهَا، ﴿وَقُوْلُوْا﴾ بَدَلَهَا : ﴿انْظُرْنَا﴾ أَيْ اُنْظُرْ إِلَيْنَا، ﴿وَاسْمَعُوْا﴾ مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهٖ سِمَاعَ قَبُوْلٍ، ﴿وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ مُؤْلِمٌ، هُوَ النَّارُ.

১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীকে রায়িনা বলো না, رَاعِنَا শব্দটি اَلْمُرَاعَاةُ হতে উদগত আদেশসূচক শব্দ। সাহাবীগণ رَاعِنَا বলে নবী ﷺ-কে সম্বোধন করতো। ইহুদিদের ভাষায় এটা رَعُوْنَة হতে নির্গত একটি গালি বিশেষ। এতে ইহুদিরা খুশি হলো এবং নবী করীম ﷺ-কে তা দ্বারা সম্বোধন করতে লাগল। তাই মুমিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে; বরং এর পরিবর্তে انْظُرْنَا অর্থাৎ, আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন বলো। আর তোমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়, তা গ্রহণ করার কানে শ্রবণ করো। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি। তা হলো জাহান্নাম।

١٠٥. ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ﴾ مِنَ الْعَرَبِ، عَطْفٌ عَلٰى «أَهْلِ الْكِتَابِ»، وَ«مِنْ» لِلْبَيَانِ ﴿اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ﴾ زَائِدَةٌ ﴿خَيْرٍ﴾ وَحْيٍ ﴿مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ حَسَدًا لَكُمْ، ﴿وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ﴾ نُبُوَّتِهٖ ﴿مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾.

১০৫. কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা এবং আরবের মুশরিকরা اَهْلُ الْكِتَابِ-এর উপর وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ অংশটি আতফ হয়েছে। مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ-এর من-টি بيانية; তোমাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতার দরুন এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে من-টি অতিরিক্ত। তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ ওহী অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের জন্য নবুয়তের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهٗ ذٰلِكَ

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهٗ ذٰلِكَ-এর ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য : كَانُوْا-এর ضَمِيْر مَرْفُوْع-এর মিসদাক মুমিনগণ, لَهٗ-এর মিসদাক রাসূল ﷺ আর ذٰلِكَ দ্বারা رَاعِنًا-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ: وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ

رَاعِنَا বলতে নিষেধ করার কারণ: মূলত মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা لَاتَقُوْلُوْا رَعِنَا-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যদিও رَاعِنَا-এর বাহ্যিক অর্থ ভালো; কিন্তু যেহেতু ইহুদিদের ভাষায় رَعِنَا শব্দটি رَعُوْنَةٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ আহমক ও গালি বিশেষ। ইহুদিরা رَاعِنَا শব্দটি خَبِيْثٌ অর্থেও ব্যবহার করতো। আর তারা কাউকে নির্বোধ ও বোকা বলতে চাইলে رَاعِنَا বলত। তাই মুসলমানদেরকে তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ: اُنْظُرْ - اَيْ اُنْظُرْ إِلَيْنَا

اُنْظُرْ إِلَيْنَا দ্বারা তাফসীল করার কারণ: মুফাসসির (র.) اُنْظُرْنَا -এর তাফসীর اُنْظُرْ إِلَيْنَا দ্বারা করে ইশারা করেছেন যে, এখানে শব্দটি উহ্য রয়েছে। এর দ্বারা এ প্রশ্নেরও উত্তর হয়ে গেল যে, اُنْظُرْ হলো লাযিম ফে'ল। অথচ এখানে মাফ'উলসহ মুতা'আদ্দী হয়েছে। এইভাবে ঐ সকল ব্যক্তিদের উক্তিও খণ্ডন করা হয়েছে যারা اُنْظُرْنَا-কে اِنْتَظِرْنَا-এর অর্থে নিয়েছেন। [তারভীহুল আরওয়াহ]

قَوْلُهٗ: عَذَابٌ اَلِيْمٌ - مُؤْلِمٌ هُوَ النَّارُ

যমীর ও مَرْجِع-এর সামঞ্জস্যতা নির্ণয়: এখানে প্রশ্ন হয় যে, هُوَ মুবতাদা এবং اَلنَّارُ খবর। মুবতাদা ও খবরের মধ্যে مُطَابَقَة নেই। কেননা, اَلنَّارُ হলো مُؤَنَّث এবং هُوَ হলো مُذَكَّر; এর উত্তর হলো, هُوَ এর مرجع হলো عَذَابٌ; তাই مَرْجِع-এর লিঙ্গের বিবেচনায় هُوَ-কে مُذَكَّر আনা হয়েছে।

قَوْلُهٗ: خَيْرٌ - وَحْيٌ - مِنْ رَّبِّكُمْ

خير-এর ব্যাখ্যা: মুফাসসির (র.) خَيْرٌ-এর তাফসীর করেছেন ওহী। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, خير শব্দটি দ্বারা এ স্থানে সব রকমের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার সমষ্টি তথা জ্ঞান, গায়বি সাহায্য, রাজ্যজয় ইত্যাদি সবকিছুই ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য। [রূহুল মা'আনী, বায়যাবী]

قَوْلُهٗ: اَلْمُشْرِكِيْنَ - مِنَ الْعَرَبِ

مِنَ الْعَرَبِ বৃদ্ধির কারণ: مِنَ الْعَرَبِ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্ন নিরসন করা। তা হলো, আহলে কিতাবরাও মুশরিক ছিল। অতএব, اَهْلُ الْكِتَابِ-এর উপর وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ -কে আতফ করার দ্বারা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ সাব্যস্ত হলো। তাই মুফাসসির (র.) مِنَ الْعَرَبِ বলে বুঝালেন যে, মুশরিক দ্বারা আহলে কিতাব ছাড়া অন্য মুশরিক উদ্দেশ্য। আর তারা হলো আরবের মুশরিকরা।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

رَاعِ : সীগাহ أَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাহছ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُرَاعَاةُ মূলবর্ণ (ر.ع.ى) জিনস نَاقِص يَائِي অর্থ- খেয়াল রাখুন। رَاعِنَا শব্দটি ইহুদিদের ভাষ্যমতে رَعُوْنَة [আহমক] থেকে নির্গত। ইহুদিরা কাউকে বোকা ও নির্বোধ বলতে চাইলে رَاعِنًا বলত। এর শুরুতে حَرْفُ النِّدَاءِ উহ্য রয়েছে এবং শেষে الف অতিরিক্ত।

سُرُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِب বাহাছ إِثْبَات فِعْل مَاضِىْ مُطْلَق مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّرُوْرُ মূলবর্ণ (س.ر.ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ- তারা খুশি হলো।

مَا يَوَدُّ : সীগাহ نَفْى فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف বাহাছ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَوَدَّةُ মূলবর্ণ (و.د.د) জিনস مُرَكَّب (مُضَاعَف ثُلَاثِيْ، مِثَال وَاوِىْ) অর্থ- সে আকাঙ্ক্ষা করবে না, ইচ্ছা করবে না।

يَخْتَصُّ : সীগাহ إِثْبَات فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف বাহাছ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِخْتِصَاصُ মূলবর্ণ (خ.ص.ص) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ- তিনি বিশেষভাবে মনোনীত করেন।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا .... وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

يَاَيُّهَا -এর মাঝে ياء-টি হলো حرفে নেদা, اَيُّ হলো নাকেরা শব্দ, যা মুনাদা হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। هَاء এসেছে تَنْبِيْه -এর জন্য। পরবর্তী اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا অংশটুকু সেলা-মাওসূল মিলে اَيُّ নাকেরাটির সিফাত হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا অংশটুকু সেলা-মাওসূল মিলে مَايَوَدُّ-এর ফায়েল হয়েছে। مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ অংশটুকু উহ্য হাল مَعْدُوْدِيْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। مِنْ رَّبِّكُمْ ..... أَنْ يُّنَزَّلَ অংশটুকু أَنْ দ্বারা মাসদার হয়ে مَا يَوَدُّ -এর মাফ'উল হয়েছে। مِنْ خَيْرٍ-এর মাঝে مِنْ-টি অতিরিক্ত। خَيْرٍ শব্দটি শব্দগতভাবে من-এর মাজরূর হিসেবে জরের স্থানে এবং অর্থগতভাবে يُنَزَّلُ-এর ফা'য়েল হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে। مِنْ رَّبِّكُمْ অংশটুকু خير-এর উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূ'র যোগসূত্র

পূর্বের রুকূ'তে ইহুদিদের জাদু চর্চার বিবরণ ছিল। আলোচ্য রুকূ'তে বলা হচ্ছে যে, জাদুর অনুসরণ ইহুদিদের স্বভাবচরিত্রে এত প্রভাব ফেলেছিল যে, তাদের কথাবার্তা এবং সম্বোধনও জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। রুকূ'র প্রথম আয়াত يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا الخ -এর মাঝে আহলে কিতাবের কুফরির আলোচনা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াত তথা مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ এ আয়াতে তার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের ঈমান না আনা এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের মূল কারণ হলো হিংসা।

✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا ..... عَذَابٌ أَلِيْمٌ

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে এসে তাঁর কথাবার্তা শুনত। তারা যে কথা ভালো করে না শুনত, সেটা দ্বিতীয়বার শুনতে চেয়ে বলত- رَاعِنَا অর্থাৎ, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাদের দেখে দেখে রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক মুসলিমও এ শব্দটি ব্যবহার করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে মুসলিমদেরকে নিষেধ করলেন যে, তোমরা এটা বলো না; বরং اُنْظُرْنَا বলো। ইহুদিরা অসৎ উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করতো। তারা একটু টেনে উচ্চারণ করতে رَاعِنَا অর্থাৎ, আমাদের রাখাল। ইহুদিদের ভাষায় رَاعِنَا শব্দটি خَبِيْث অর্থেও ব্যবহার হতো।

বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ (রা.) ইহুদিদের ভাষা জানতেন। একদিন তিনি তাদেরকে এ শব্দটি বলতে শুনে বললেন-

يَا أَعْدَاءَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَئِنْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ مِّنكُمْ يَقُوْلُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, যদি তোমাদের কাউকে কোনো দিন এ শব্দটি রাসূল ﷺ-এর শানে বলতে শুনি, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। তখন ইহুদিরা বলল, তোমরাও তো বল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... ، وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

মুফাসসিরগণ বলেন, মুসলমানরা তাদের ইহুদি মিত্রদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান জানালে তারা বলত, যে দীনের উপর আমরা আছি, তার চেয়ে এটা সেরা নয়। এটি ভালো হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের ডাকে সাড়া দিতাম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে এই আয়াত নাজিল করেন।

[ইবনে জারীর: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ৩৭৭; ইবনে কাসীর: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯]

✪ تَوْضِيْحُ الآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا .... وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

رَاعِنَا শব্দের হাকীকত : সাহাবীগণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুনলে সাধারণত রাসূল ﷺ-কে বলতেন- رَاعِنَا অর্থাৎ, আমাদের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার সুযোগ দিন।

পক্ষান্তরে হিব্রু ভাষায় رَاعِيْنُوْ শব্দের অর্থ হলো خَبِيْث; কেউ কেউ বলেন, হিব্রু ভাষায় শব্দটি اَلرَّعُوْنَةُ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো নির্বুদ্ধিতা। অতএব, رَاعِنَا অর্থ হলো– হে নির্বোধ। এর শুরুতে হরফে নেদা উহ্য রয়েছে এবং শেষের আলিফটি অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا-এর ব্যাখ্যা : আয়াতে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا এর পরে الخ .... مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ অংশটুকু হলো ব্যাখ্যার জন্য। ইসলাম অস্বীকারকারীদের বড় দল দুটি-

আহলে কিতাব : যারা তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করলেও এগুলোর প্রতিটির বাস্তাবতাকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাদের কাছে আসমানি কিতাব-সহীফাও ছিল। কিন্তু তা ভাষা ও বিষয়গতরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকার ছিল। এরা কুরআন ও রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করতো। أَهْلُ الْكِتَابِ দ্বারা আয়াতে এদেরকে বুঝানো হয়েছে।

মুশরিক : যারা তাওহীদ, রিসালাত, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদিতে মোটেই বিশ্বাসী নয়; বরং এসবের পরিবর্তে তারা নানারকম দেব-দেবী তৈরি করে নিয়েছে। আয়াতে اَلْمُشْرِكِيْنَ দ্বারা এদেরকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি ইহুদিদের বিদ্বেষের কারণ : ইহুদিদের মূল হিংসার বিষয় হলো, তারা বলত নবুয়তের আসল হকদার তো আমরা অর্থাৎ, ইসরাঈলের সন্তানেরা। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর এ উম্মী আরবিরা এ নবুয়ত পেয়ে যাচ্ছে কোন সূত্রে এবং কোন যোগ্যতা বলে? আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য হতে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে রিসালাতপ্রাপ্ত হলে তা ইহুদিদের মনঃপূত হলো না বিধায় হিংসা-বিদ্বেষ শুরু করল।

আয়াতের মর্মার্থ : ইহুদি, মুশরিক নির্বিশেষে কোনো কাফেরই তোমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা পছন্দ করে না। অথচ তারা জানে না যে, নবুয়ত বা যে কোনো প্রকার কল্যাণ শুধু আল্লাহ তা'আলার দান। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে এ সৌভাগ্য দান করেন। এ নিয়ম অনুযায়ীই তিনি নিরক্ষর সম্প্রদায়কে এ সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। [তাফসীরে উসমানী: পৃষ্ঠা ২০]

অতএব, রাসূল ﷺ-এর প্রতি বা তাঁর অনুসারীদের প্রতি হিংসা বা বিরোধিতা কোনো কাজে আসবে না। সর্বক্ষেত্রেই অকেজো বলে প্রমাণিত হবে। কারণ অনুগ্রহদানকারী হলেন শুধু আল্লাহ তা'আলা। এ কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মহান দাতা, তিনি করুণাময়, তার হাতেই রয়েছে বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে নির্গত বিধি-বিধান

১. যে শব্দের অপব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা থাকে, তা ব্যবহার না করা উচিত। যদিও বক্তার উদ্দেশ্য ভালো থাকে। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) লিখেন- وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلٰى تَجَنُّبِ الْاَلْفَاظِ الْمُحْتَمَلَةِ الَّتِيْ فِيْهَا التَّعَرُّضُ لِلتَّنْقِيْصِ অর্থাৎ, এতে প্রমাণ রয়েছে দ্ব্যর্থবোধক সেসব শব্দ পরিহারের, যাতে মানহানি করার অবকাশ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, এ ধরনের শব্দ ব্যবহারকারীর উপর হদ সাব্যস্ত হবে।

২. রিসালাতের অধিকারীর প্রতি শুধু আন্তরিক ভক্তিই যথেষ্ট নয়; বরং বাহ্যিক আচরণ-উচ্চারণও সম্মান-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা অপরিহার্য। ইশারা-ইঙ্গিতেও নবী করীম ﷺ-এর প্রতি অসম্মান ও তুচ্ছতা প্রকাশ করা কুফরি। কেননা ইহুদিরা এখানে ইঙ্গিতেই নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। [মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র.) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৫]

৩. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো বৈধ কাজের দ্বারা যদি অন্যরা অবৈধ কাজের সুযোগ পেয়ে যায়, তবে সে বৈধ কাজটিও অবৈধ হয়ে যায়। এর প্রমাণ বহন করে নিম্নের এই হাদীসটি- রাসূল ﷺ বলেন, আমার ইচ্ছে হয় এই ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় হযরত ইবরাহীমের ভিত্তির ন্যায় করে দিই। কিন্তু কাবাগৃহ ভেঙ্গে ফেললে মূর্খ লোকদের গোমরাহ হওয়ার ভয় রয়েছে, তাই আমি আমার ইচ্ছা কার্যকর করছি না। [তাফসীরে নূরুল কুরআন: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ৩৭৮]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার: এখানে لِلْكَافِرِيْنَ-এর لَامِ اَلِفْ হলো عَهْدِ خَارِجِيْ; এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব ইহুদি যারা রাসূল ﷺ-কে গালি দিত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। তাদের আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। ফলে وَلِلْكَافِرِيْنَ এর স্থালে وَلَهُمْ বলা উচিত ছিল। সে হিসেবে এটি وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহারের উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নবী করীম ﷺ-কে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কুফরি এবং আজাবের কারণ।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مِنْ رَّبِّكُمْ

ইযাফত: আলোচ্য অংশে كُمْ যমীর দ্বারা ঈমানদারগণ উদ্দেশ্য। এখানে رَبْ শব্দটিকে ঈমানদারগণের প্রতি ইযাফত করে মুমিনগণের সম্মান প্রকাশ করা হয়েছে।

١٠٦. وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوْا : «إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهٰى عَنْهُ غَدًا»، نَزَلَ : ﴿مَا﴾ شَرْطِيَّةٌ ﴿نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ﴾ أَيْ نُزِلْ حُكْمَهَا إِمَّا مَعَ لَفْظِهَا أَوْ لَا، وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ مِنْ أَنْسَخَ أَيْ نَأْمُرُكَ أَوْ جِبْرِيْلَ بِنَسْخِهَا، ﴿اَوْ نُنْسِهَا﴾ نُؤَخِّرْهَا، فَلَا نُزِلْ حُكْمَهَا وَنَرْفَعْ تِلَاوَتَهَا، أَوْ نُؤَخِّرْهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ، وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ مِنَ النِّسْيَانِ أَيْ نَنْسِكُهَا وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ ﴿نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ﴾ أَنْفَعُ لِلْعِبَادِ فِي السُّهُوْلَةِ أَوْ كَثْرَةِ الْأَجْرِ، ﴿اَوْ مِثْلِهَا﴾ فِي التَّكْلِيْفِ وَالثَّوَابِ، ﴿اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ وَمِنْهُ النَّسْخُ وَالتَّبْدِيْلُ، وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ.

১০৬. রহিতকরণ সম্পর্কে কাফেররা যখন বিদ্রূপমূলক উক্তি করতে লাগল যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাথিগণকে আজ এক ধরনের হুকুম দেয়, কাল আবার তা নিষেধ করে দেয় তখন নাজিল হলো। আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অর্থাৎ, শব্দাবলিসহ বা কেবলমাত্র হুকুমটিকে অপসৃত করি। ننسخ শব্দটি অপর এক কেরাতে انسخ হতে نون-এ পেশসহ রয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, আপনাকে বা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে যদি তা রহিতকরণের নির্দেশ দেই। বা পিছনে রেখে দিলে অর্থাৎ, এর নির্দেশ যদি অপসৃত না করি আর কেবল পাঠ রহিত করে দেই বা তাকে লাওহে মাহফূযে ছেড়ে রাখি। অপর এক কেরাতে نُنْسِهَا শব্দটি হামযা ব্যতিরেকেও রয়েছে। তখন এটা نسيان [বিস্মৃত হওয়া] ধাতু হতে গঠিত ক্রিয়া। অর্থ হবে তা আপনাকে ভুলিয়ে দেই ও আপনার অন্তর থেকে বিলুপ্ত করে দেই। তা হতে উত্তম সহজতা বা ছওয়াবের আধিক্য হিসেবে বান্দাদের জন্য অধিক লাভজনক কিংবা কষ্ট ও পুণ্যফলে তার সমতুল্য কোনো আয়াত নিয়ে আসি। এটি শর্তের জবাব। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? হুকুম রহিতকরণ ও পরিবর্তন করাও তার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যটি অধিক সুসাব্যস্ত করার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে।

١٠٧. ﴿اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ يَفْعَلُ فِيْهِمَا مَا يَشَاءُ؟ ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ أَيْ غَيْرِهِ ﴿مِنْ﴾ زَائِدَةٌ ﴿وَّلِيٍّ﴾ يَحْفَظُكُمْ ﴿وَّلَا نَصِيْرٍ﴾ يَمْنَعُ عَذَابَهُ عَنْكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ.

১০৭. আপনি কি জানেন না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই? এতদুভয়ের মধ্যে যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন এবং আল্লাহ ছাড়া অর্থাৎ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, যে তোমাদেরকে রক্ষা করবে। مِنْ টি অতিরিক্ত এবং সাহায্যকারীও নেই, যে তোমাদের উপর যদি তার শাস্তি আপতিত হয় তবে তা ফিরিয়ে রাখবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ .... اَيْ نُزِلْ حُكْمَهَا

نَنْسَخْ-এর নির্ণয় ও প্রকার বর্ণনা : اَلنَّسْخُ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- اَلنَّقْلُ اَلتَّحْوِيْلُ ----- اَلتَّبْدِيْلُ; তাই মুফাসসির (র.) এ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نَسَخَ দ্বারা إِزَالَةٌ [দূর করা] উদ্দেশ্য। نَقْل ও تَحْوِيْل ইত্যাদি নয়।

পরবর্তীতে إِمَّا مَعَ لَفْظِهَا أَوَّلًا ইবারতটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) নসখের তিনটি পদ্ধতির দুটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, إِزَالَةُ الْحُكْمِ বা বিধান রহিতকরণটা দুই সুরতে হতে পারে।

১. مَعَ اللَّفْظِ অর্থাৎ, বিধান ও বিধান সংশ্লিষ্ট আয়াত, উভয়টিই নসখ হবে। এটিকে مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ مَعَ التِّلَاوَةِ বলা হয়। যেমন- عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحْرِمْنَ এটি তেলাওয়াতসহ মানসূখের উদাহরণ।

২. بِغَيْرِ اللَّفْظِ অর্থাৎ, শুধু বিধানটি মানসুখ হবে, তেলাওয়াত বাকি থাকবে। একে مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ বলা হয়। যেমন- وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ এটির তেলাওয়াত বাকি আছে; কিন্তু বিধানটি রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ مِنْ اَنْسَخَ

কেরাতের পার্থক্য বর্ণনা : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) نَنْسَخ-এর অপর একটি কেরাত ও তার অর্থ বর্ণনা করেছেন। অন্য কেরাতে শব্দটি بَابِ اِفْعَال থেকে হবে। এ অবস্থায় نَنْسَخْ দুই মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দী হবে। তখন অর্থ হবে আমরা মিটিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়ার নির্দেশ করি। মুফাসসির (র.) نَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرَءِيْل দ্বারা এই কেরাতের অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : اَوْ نَنْسَأْهَا - نُؤَخِّرْهَا

نَنْسَأْ-এর অর্থ ও মর্ম বর্ণনা : نَنْسَأُ শব্দটি اَلنَّسْأ মাসদার থেকে নির্গত। এটি এক مَفْعُوْل দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়। অর্থ হবে, আমরা তা পিছিয়ে দেই। মুফাসসির (র.) نُؤَخِّرْهَا দ্বারা نَنْسَأْهَا-এর তাফসীর করেছেন।

এই تَأْخِيْر-এর পদ্ধতির ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যা মুফাসসির (র.) পরবর্তীতে উল্লেখ করছেন।

فَلَا نُزِلُ حُكْمَهَا وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا অংশটি تَأْخِيْر -এর প্রথম সম্ভাবনা। অর্থাৎ, আয়াতের বিধান বাকি রাখব এবং তেলাওয়াত উঠিয়ে নেব। যেমন- اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ এ আয়াতটির তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু হুকুম রয়ে গেছে। এটি নসখের তৃতীয় প্রকার।

اَوْ نُؤَخِّرْهَا فِيْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ অংশটি تَأْخِيْرٌ-এর দ্বিতীয় সম্ভাবনা। অর্থাৎ تَأْخِيْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো বিধান নাজিল হওয়া পিছিয়ে দিয়ে লাওহে মাহফূযে রেখে দেওয়া।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ

نَنْسَأْ-এর কেরাতের পার্থক্য বর্ণনা: অপর এক কেরাতে শব্দটি نَنْسَهَا হিসেবে রয়েছে। সেক্ষেত্রে اَنْسَاءٌ থেকে নির্গেত হবে এবং দু' مَفْعُوْل দ্বারা مُتَعَدِّىْ হবে। অর্থ হবে, আমরা তোমাকে ঐ আয়াত ভুলিয়ে দিই। মুফাসসির (র.) نُنْسِكَهَا وَنَمْحُهَا مِنْ قَبْلِكَ উল্লেখ করে এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

এ ইবারত থেকে বুঝা যায়, মুফাসসির (র.)-এর সামনে কুরআনের যে নুসখাটি ছিল তাতে نَنْسَأْهَا লেখা ছিল। এ জন্যই তিনি বলেছেন- بِلَا هَمْزٍ; আমাদের মাঝে প্রচলিত নুসখায় শব্দটি بِلَا هَمْزٍ -ই আছে।

মুফাসসির (র.) بِلَا هَمْزٍ مِنَ النِّسْيَانِ অংশটুকু تَلْخِيْصُ الْكَوَاشِيْ থেকে হুবহু নকল করেছেন। কিন্তু ইবারতটি ত্রুটিযুক্ত। যদি মুফাসসির (র.) এর স্থলে وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ وَكَسْرِ السِّيْنِ বলতেন, তাহলে বক্তব্যটি অধিকতার সুস্পষ্ট হতো। কেননা, আলোচ্য ইবারতে অপর একটি অশুদ্ধ কেরাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলো, اَلنِّسْيَان থেকে جَمْعْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ সহকারে نَنْسَهَا; এই সুরতটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই ভুল। শব্দগতভাবে এজন্য যে, এই কেরাতটি বর্ণিত নেই। আর অর্থগতভাবে অশুদ্ধ এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে نِسْيَان তথা ভুলে যাওয়ার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না।

[জামালাইন: খণ্ড১,পৃষ্ঠা ১৯৭]

قَوْلُهُ : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا - اَنْفَعَ لِلْعِبَادِ

নসখ বান্দার উপকারার্থে হয় : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত উত্তম হওয়াটা বান্দাদের উপকারের ভিত্তিতে। এ ভিত্তিতে নয় যে, কুরআনের কোনো আয়াত অপর আয়াতের তুলনায় উত্তম কেননা, আল্লাহ তা'আলার কালাম পুরোটাই উত্তম।

[হাশিয়ায়ে জালালাইন: পৃষ্ঠা ১৬]

قَوْلُهُ : فِيْ السَّهُوْلَةِ أَوْ كَثِيْرَةِ الْأَجْرِ

বান্দার উপকার হওয়ার সুরত বর্ণনা : আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) বর্ণনা করেছেন যে, নসখ বান্দার জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে।

১. فِيْ السَّهُوْلَةِ তথা সহজতার জন্য উপকারী হতে পারে। যেমন ইসলামের প্রথম দিকে বিধান ছিল, একজন মুসলমান দশ জন কাফেরের মোকাবিলায় ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধে করতে হবে; পলায়ন করা যাবে না। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত করে সহজ করা হয়। তা হলো, একজন মুসলমান দু'জন কাফেরের মোকবিলায় ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধ করবে। শত্রুপক্ষ দ্বিগুণের বেশি হলে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে আসার অনুমতি রয়েছে। প্রথম বিধানের চেয়ে এ বিধানটি অনেক সহজ।

২. اَوْكَثْرَةِ الْاَجْرِ তথা ছাওয়াব বেশি হওয়ার দিক দিয়ে উপকারী হতে পারে। যেমন- প্রথম দিকে রোজা রাখা কিংবা রোজা না রেখে ফিদয়া দেওয়া উভয়টিরই অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে শুধু রোজা রাখাই বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর রোজা রাখার মাঝেই ছওয়াব বেশি।

قَوْلُهُ أَوْ مِثْلِهَا - فِيْ التَّكْلِيْفِ وَ الثَّوَابِ

সমতার ক্ষেত্র বর্ণনা: মুফাসসির (র.) فِي التَّكْلِيْفِ وَ الثَّوَابِ দ্বারা নাসেখ ও মানসুখের সমতার ক্ষেত্রটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, কখনো কষ্ট ও ছওয়াবের ক্ষেত্রে নাসেখের বিধান ও মানসুখের বিধান সমান হয়। যেমন- বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বা শরীফের প্রতি কিবলা পরিবর্তন।

نَسْخ শব্দটি পবিত্র কুরআনে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা-

১. اَلْإِزَالَةُ তথা দূর করা। যেমন- فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ-এ অর্থেই বলা হয়- نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ অর্থাৎ, রোদ ছায়াকে দূরীভূত করেছে।

২. اَلنَّقْلُ তথা স্থানান্তরিত করা। এ অর্থেই কোনো গ্রন্থের প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে বলা হয়- نَسَخْتُ الْكِتَابَ কারণ, সেক্ষেত্রে এক বইয়ের তথ্যাবলি অন্য কপিতে স্থানান্তর করা হয়। এ অর্থেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ;

৩. اَلتَّبْدِيْلُ তথা পরিবর্তন করা। যেমন বলা হয়- نَسَخَ الشَّارِعُ السُّوْرَةَ أَوْ الآيَةَ অর্থাৎ, شَارِعْ সে আয়াত পরিবর্তন করলেন। আলোচ্য আয়াতে نَنْسَخْ দ্বারা প্রথম ও তৃতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

نَنْسَخْ : সীগাহ جَمْعْ مُتَكَلِّمْ বহছ إِثْبَات فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فتح মূলবর্ণ (ن-س-خ) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমরা বিদূরিত করি, মিটিয়ে দেই, রহিত করি। পরিভাষায় نَسْخ বলা হয়-

بَيَانُ اِنْتِهَاءِ التَّعَبُّدِ بِقِرَائَتِهَا اَو الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادَ مِنْهَا اَوْ بِهِمَا جَمِيْعًا

نُنْسِهَا : এটা إِنْسَاء থেকে جَمْعْ مُتَكَلِّمْ বহছ إِثْبَات فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْإِنْسَاء মূলবর্ণ (ن-س-ى) জিনস نَاقِص يَائِيْ মূলত نَنْسِيْهَا ছিল। অর্থ- আমি তাকে ভুলিয়ে দেই।

نُنْسَأْ : সীগাহ جَمْعْ مُتَكَلِّمْ বহছ إِثْبَات فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فتح মাসদার اَلنَّسْأ মূলবর্ণ (ن - س - ء) জিনস مَهْمُوْزُاللَّام অর্থ- আমরা বিলম্বিত করি। বলা হয়- نَسَأَ اللهُ فِيْ اَجَلِه আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যু বিলম্বিত করুন। অর্থাৎ, আয়ু বাড়িয়ে দিন। কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে إِنَّمَا النَّسِيْء زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ; এ আয়াতে نَسِيْء অর্থ- বিলম্বিত করা। [লুগাতুল কুরআন]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ..... نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا

مَا শরতিয়্যাহ হয়ে نَنْسَخ ফে'লের মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম نَنْسَخ ফে'ল যমীর তার ফায়েল مِنْ آيَةٍ মুতা'আল্লিক مَا-এর صِفَةْ উহ্য-এর সাথে। ফে'ল, ফায়েল, মাফ'উলে মুকাদ্দাম ও মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ نُنْسِهَا জুমলা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে شَرْطْ; نَأْتِ ফে'ল যমীর তার ফায়েল بِخَيْرٍ মুতা'আল্লিক نَأْتِ ফে'লের সাথে مِنْهَا মুতা'আল্লিক خَبَرْ-এর সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جَوَابُ الشَّرْطِ; শর্ত ও জাওয়াবে শর্ত মিলে جُمْلَة شَرْطِيَّة হলো।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسَخْ

مَا نَنْسَخُ শব্দের কেরাত : ১০৬নং আয়াতে উল্লিখিত مَانَنْسَخْ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে باب فتح থেকে নির্গত হিসেবে مَا نَنْسَخْ পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের (র.) শব্দটিকে بَابِ اِفْعَال থেকে নির্গত হিসেবে مَا نَنْسَخْ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا

نُنْسِهَا শব্দের কেরাত : ১০৬ নং আয়াতে উল্লিখিত نُنْسِهَا শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটি بَابِ اِفْعَال থেকে নির্গত হিসেবে نُنْسِهَا পড়েছেন।

খ. ইমাম আবূ আমের, মুজাহেদ আতা ও ইবনে কাসীর (র.) শব্দটিকে بَابِ فَتَحَ থেকে নির্গত হিসেবে نُنْسِهَا পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا

পূর্বের আয়াতে সাহাবীগণ (রা.)-কে رَاعِنَا-এর পরিবর্তে اُنْظُرْنَا বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব প্রদান করা হচ্ছে এই আয়াতে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ .... عَلٰى شَيْءٍ قَدِيْرٍ

ইহুদিরা তাওরাতকে 'নসখ'-এর অযোগ্য মনে করতো। তাই তারা কুরআনের অনেক বিধান রহিত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেছে, মুহাম্মদ তার অনুসারীদেরকে একবার এক হুকুম প্রদান করে। পরে আবার তা থেকে বারণ করে। এ ধরনের কথা বলে ইহুদিরা মুসলমানদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করতে চাইত যে, তোমরা তো বল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সবটুকুই কল্যাণকর। যদি তা-ই হয়, তাহলে তা রহিত হওয়ার অর্থ কী? যদি প্রথম হুকুমটি ভালো হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়টি খারাপ হবে। আর দ্বিতীয়টি ভালো হলে প্রথমটি খারাপ হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার ওহী ও হুকুম খারাপ হওয়া অসম্ভব। তাদের এহেন বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

[মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী (র.) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা - ১৯৬]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ..... عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

আয়াতে نَسْخ শব্দের উদ্দেশ্য : অভিধানে 'নসখ' শব্দের অর্থ– দূর করা, লিখা। সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে নসখ শব্দ দ্বারা বিধিবিধান দূর করা অর্থাৎ, রহিত করাকে বুঝানে হয়েছে। এ আয়াতের ভিত্তিতেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় একক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নসখ' বলা হয়।

আল্লাহর বিধানে নসখের স্বরূপ : জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারেটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নসখ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যথা–

১. ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে, প্রথমে যদি কোনো আইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বকার আইন পরিবর্তন করা হয়।

২. ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোনো কোনো সাময়িক আইন জারি করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নসখ আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব।

৩. আইন রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না, অন্য আইন জারি করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারি করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহারণত রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এরূপ পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ঔষুধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ পদ্ধতি কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ওষুধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ঔষধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বুঝাবুঝির কারণে ত্রুটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

নসখের তৃতীয় কারণটি আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি নবুয়ত ও আসমানি গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানি গ্রন্থের বিধান নসখ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারি করেছে। এমনিভাবে একই নবুয়ত ও শরিয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর ঐশী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে- لَمْ تَكُنْ نَبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَنَاسَخَتْ অর্থাৎ, এমন নবুয়ত কখনো ছিল না যাতে নসখ ও পরিবর্তন করা হয়নি।

نَسْخ -অস্বীকারের দাবি ও তার খণ্ডন : আবূ মুসলিম ইবনে বাহর প্রমুখ আলেমগণ نَسْخ কে অস্বীকার করেছেন। তারা مَا نَنْسَخ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটিতে পূর্ববর্তী শরিয়তের হুকুম রহিত করার কথা বলা হয়েছে। অথবা আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, কখনো যদি নসখ করা হয়, তাহলে আরো উত্তম বিধান দ্বারাই নসখ হবে।

তবে জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, কুরআনে নসখ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর আবূ মুসলিম (র.) প্রমুখ .... مَانَنْسَخْ আয়াতটির যে, ব্যাখ্যা করেছেন,তা নিতান্ত দুর্বল ও বাস্তবতা বিরোধী। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন-

وَالْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى جَوَازِ النَّسْخِ فِيْ اَحْكَامِ اللهِ تَعَالٰى لِمَا لَهُ فِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَكُلُّهُمْ قَالُوْا بِوُقُوْعِهٖ .

নসখকৃত আয়াতের তেলাওয়াতে বাকি রাখার হেকমত : আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, নসখের মাঝে কখনো বিধান রহিত করার পরও আয়াতটি বিদ্যমান থাকে। এতে ফায়েদা কী? আল্লামা যারকাশী (র.) এর দুটি উত্তর প্রদান করেছেন। যথা-

১. কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু হুকুম জানা ও আমল করা নয়। বরং আল্লাহর কালাম হিসেবে ছওয়াবের উদ্দেশ্যেও কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। নসখকৃত বিধানের আয়াতগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে বান্দা সেগুলো তেলাওয়াতের মাধ্যমে ছওয়াব অর্জন করতে পারে।

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসুখের তুলনায় নাসেখের বিধানটি সহজতর হয়। তাই মানসুখটির তেলাওয়াত বিদ্যমান রাখা হয়েছে বান্দাকে নিয়ামতের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

نَسْخ এর শর্তাবলি : এ কারণেই ফকীহগণ نَسْخ-এর শর্তসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, যে হুকুম নসখ-এর স্থানে পতিত হয়, সেটা স্বয়ং ওয়াজিব লিজাতিহী হতে পারে না। যেমন- ঈমান বিল্লাহ। আর সেটা স্বয়ং নিষিদ্ধও হতে পারবে না। যেমন- কুফর ও শিরক; বরং স্বয়ং হওয়ার ও না হওয়ার সম্ভাবনাময় হতে হবে। এমনিভাবে সে হুকুম সাময়িক কিংবা সর্বদার জন্য হতে পারবে না। চাই সেটার স্থায়িত্ব نَصّ-এর দ্বারা হোক যেমন- خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا এর সাথে নির্ধারিত হোক। অথবা دَلَالَت দ্বারা হোক। যেমন রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর পবিত্র শরিয়ত আর পরিবর্তযোগ্য না হওয়া। অর্থাৎ শরয়ী বিধানাবলিতে রদবদলের সম্ভাবনা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর এখন শরিয়ত স্থায়ী হয়ে গেছে। ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। সংস্কার ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সময় ও স্থান হিসেবে আংশিকভাবে ফকীহগণের ফতোয়ায় জায়েজ ও নাজায়েজ। হালাল ও হারামের দ্বন্দ্ব এবং বিধানাবলিতে সামান্য

পরিবর্তনের ন্যায় যা মনে হয়। এটার কোনো সম্পৃক্ততা সেটার সঙ্গে নেই। আর এ সামান্য দ্বন্দ্ব পবিত্র শরিয়তের স্থায়িত্বে কোনো প্রভাব ফেলে না। মোটকথা نَسْخ -এর সাথে এমন হুকুম হবে না, যা প্রথম থেকেই সাময়িক কিংবা সর্বদার জন্য হয়। কেননা যেটা সাময়িক সেটা তো সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিজে নিজেই শেষ হয়ে যায়। তাই সেটার জন্য نَسْخ অর্থহীন। এমনিভাবে হুকুম যদি স্থায়ী হয় তবে এর ক্ষেত্রে نَسْخ-এর অর্থ মিথ্যা বর্ণনা হবে। কেননা প্রথমে সেটাকে পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যা এখন পরিবর্তনের পর ভুল হয়ে গেল। [প্রাগুক্ত]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব : তাদের মতে نَاسِخ [রহিতকারী] ও مَنْسُوْخ [রহিত] উভয়ের মাঝে এতটুকু সময় থাকতে হবে [শর্ত] যে বান্দা রহিত হুকুম-এর উপর বাস্তবে আমলের সুযোগ পেয়ে যায়। তারপরে نَسْخ শুদ্ধ হবে। কিন্তু আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রহিতের ব্যাপারে শুধু বাস্তবতার বিশ্বাসের সুযোগ পাওয়াই যথেষ্ট, বাস্তবে আমলের শর্ত নেই এবং বিশ্বাসও সরাসরি হোক কিংবা পরোক্ষভাবে স্থলাভিষিক্ততার মাধ্যমে হোক। যেমন মেরাজে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ রহিত হয়ে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত রয়ে গেছে। পূর্বের [পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের] হুকুমের উপর না বাস্তবে আমলের সুযোগ পাওয়া গেছে। আর না বাস্তবতার বিশ্বাসের সময় সুদৃঢ়ভাবে সরাসরি উম্মত পেয়েছে; হ্যাঁ, রাসূল ﷺ মৌলিকভাবে ও প্রতিনিধি হিসেবে বাস্তব এতেকাদকে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। আর সেটাই সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। [প্রাগুক্ত : ১১৭]

নসখ-এর সীমা : আয়াতে যেহেতু نَأْتِ بِخَيْرٍ- এর কয়েদ রয়েছে, তাই পবিত্র কুরআনের জন্য قِيَاس-কে নসখকারী মানা যাবে না এবং অধিকাংশের মতে اِجْمَاع-ও নসখকারী হতে পারে। কিন্তু শাফেয়ীগণ এ ব্যাপারে চিন্তিত যে, এতে বিরোধীরা হানাফীগণের দৃষ্টিতে একে অপরের জন্য রহিতকারী হতে পারে না। হ্যাঁ পবিত্র কুরআন ও নবী করীম ﷺ-এর হাদীস প্রতিবাদের সুযোগ পেয়ে যায় যে, লক্ষ্য কর আল্লাহর বাণীকে তো সর্বপ্রথম তাঁরই পয়গাম্বর অথবা নবীর হাদীসকে তো সর্বপ্রথম আল্লাহই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন ও খণ্ডন করেছেন। কিন্তু হানাফীগণ এ সম্ভাবনাকে অযথা মনে করেন। কেননা প্রথমত বিরোধীদের প্রতিবাদ থেকে এ স্থানেই পরিত্রাণ কঠিন আর যেখানে কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতকে কিংবা এক হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করেছে, সেখানেও তো তাদের প্রতিবাদের আরো বড় সুযোগ রয়েছে যে, স্বয়ং কুরআন নিজের কথাকে নিজেই প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তদ্রূপ হাদীসও । -[প্রাগুক্ত]

দ্বিতীয়ত নসখ-এর অর্থ যখন সময়সীমা বর্ণনা করে দেওয়া, তখন তো প্রতিবাদের কোনোই অবকাশ থাকে না; বরং বলা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুমের শেষ সময় সীমা এবং রাসূল ﷺ আল্লাহর হুকুমের শেষ সময় সীমা বলে দিয়েছেন। আর যেহেতু نَاسِخ এবং مَنْسُوْخ-এর মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া কিংবা সহজ ও ছওয়াবের দিক দিয়ে نَاسِخ টি উত্তম হওয়া। শব্দের উত্তমতা অথবা সমকক্ষতা উদ্দেশ্য নয়। তাই কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি অপরটির জন্য نَاسِخ হওয়া আপত্তির কারণ না হওয়াই যথাযথ। এমনিভাবে نَاسِخ টি সমকক্ষ হওয়া কিংবা مَنْسُوْخ থেকে উত্তম হওয়া ও আপত্তির কারণ হতে পারে না। কেননা এ বিষয়গুলো উপকার এবং ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম হওয়ার পরিপন্থি নয়। نَاسِخ টি مَنْسُوْخ-এর তুলনায় অতি সহজ হওয়া যেমন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিংবা مِيْرَاثُ بِالْقَرَابَةِ দ্বারা مِيْرَاثُ بِالْهِجْرَةِ রহিত হওয়া অথবা দিবারাত্রির রোজার হুকুম দিনের রোজার দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া বা যুদ্ধে একজন মুসলিম সৈন্য দশজন কাফের যোদ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার হুকুম একজন মুসলিম যোদ্ধা দুজন কাফের যোদ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আর نَاسِخ এবং مَنْسُوْخ উভয়টি সাদৃশ্য হওয়ার উপমা হলো যেমন- বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার হুকুম বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া।

পরিবর্তন ব্যতীত নসখ-এর উপমা যেমন– فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً আর نَاسِخ কঠিনতম হওয়ার উপমা যেমন ক্ষমা বিষয়ের আয়াতগুলো যুদ্ধের আয়াতগুলো দ্বারা রহিত হওয়া। অথবা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রোজা রাখা/রোজা না রেখে ফেদিয়া দেওয়ার অনুমতি রোজা রাখাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার হুকুম দ্বারা রহিত করে দেওয়া। -[প্রাগুক্ত]

নসখ-এর জন্য তারিখের পূর্বাপর হওয়া : এমনিভাবে নসখকে নির্ধারণের জন্য আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ জানা অত্যাবশ্যক। যাতে করে পরবর্তী আয়াতকে نَاسِخ [রহিতকারী] এবং পূর্বের আয়াতকে মনসূখ বলা যায়। তাই কোন সূরাগুলো মক্কী, কোন সূরাগুলো মদনী, কোন সূরাগুলো সফরাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন সূরাগুলো সফর ব্যতীত অন্যাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে এ সম্পর্কে অবগতিও জরুরি। যাতে করে আয়াত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সঠিকভাবে জানা যায়।

সুতরাং যে সূরাগুলোতে শুধু نَاسِخ আয়াতসমূহ রয়েছে, সেগুলো সর্বমোট ৬টি সূরা, যে সূরাসমূহে نَاسِخ ও مَنْسُوْخ উভয় প্রকারের আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরা ২৫টি, যে সূরাসমূহে শুধু مَنْسُوْخ আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরা ৪০টি, তবে যে সমস্ত সূরা نَاسِخ ও مَنْسُوْخ উভয় প্রকার আয়াতসমূহ থেকে শূন্য এমন সূরা ৪৩টি, যেগুলোর ব্যাখ্যা পূর্বে চলে গেছে।

অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তীগণের পরিভাষাসমূহের পার্থক্য : এ বিষয়ে مُتَقَدِّمْ ও مُتَأَخِّرْ আলেমগণের পরিভাষায়ও কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। অগ্রবর্তীগণের মনে নসখ-এর ক্ষেত্রে এতবেশি প্রশস্ততার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে যে, বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তনের বেলায়ও তারা نَسْخ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তাই نَسِخ-এর পরিমাণ তাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে। আর পশ্চাদ্বর্তীগণের পরিভাষায় সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তাদের মতে নসখ-এর সংখ্যাও অনেক কম। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) মোট পাঁচটি আয়াত مَنْسُوْخ মানেন। দ্বিতীয় হুকুম নাসিখ-এর জন্য যৌক্তিক হিসেবে যে বিষয়গুলো থাকা অত্যাবশ্যক, আল্লাহ তা'আলা সে আয়াতগুলোতে সে বিষয়গুলোর ইঙ্গিত করেছেন-

১. এর ভিত্তি কল্যাণের উপর হওয়া।
২. নির্দেশদাতা ক্ষমতাশীল হওয়া।
৩. যদি অন্য কেউ বিরোধিতা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা, উক্ত আয়াত সে দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যা আগন্তুক ও তরিকাপন্থির ইচ্ছা ব্যতীত ধ্বংসশীল কিংবা পরাজিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সেটার চেয়ে উত্তম অথবা সেটার তুল্য প্রদান করেন। ধ্বংসশীল বস্তুর ব্যাপারে বান্দার আক্ষেপ করা ঠিক নয়। [কামালাইন খ.১, পৃষ্ঠা.১১৭]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّة : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার : ..... اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ আয়াতে اللّٰه শব্দটি উল্লেখ করার কারণে আলোচ্য অংশে مِنْ دُوْنِه উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে সরাসরি ইসম ব্যবহার করা হয়েছে বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : আল কুরআনের আয়াতে পরিবর্তন সাধিত হয় কি?

ক. আয়াতে পরিবর্তন সাধিত হয়	খ. আয়াতে পরিবর্তন সাধিত হয় না
مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থ– আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। [সূরা বাকারা: ১০৬] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা- সূরা নাহল, আয়াত– ১০২	لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ অর্থ– আল্লাহর কথার কখনো পরিবর্তন হয় না। [সূরা ইউনুস : ৬৪] এ আয়াতের সমর্থনে ১টি আয়াত রয়েছে। যথা- সূরা কাফ, আয়াত– ২৯

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের কোনো কোনো আয়াত পরিবর্তন বা রহিত করে সে স্থলে তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আরেকটি আয়াত অবতরণ করেন। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর বাণীতে কোনো রূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : খ-অংশের আয়াতে আল্লাহর কালিমাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সে ফয়সালা, যা তাঁর ইলমে আযলে নির্ধারিত রয়েছে। তা অবশ্যই পূরণ হবে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হবে না। আর যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়া আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রয়েছে, অমুক সময় পর্যন্ত অমুক বিধান প্রচলিত থাকবে। তার পর তা রহিত হয়ে যাবে। এ ফয়সালার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হবে না। অর্থাৎ, এমন হবে না যে, পরিবর্তনের সময় এসেছে অথচ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সুতরাং সময় মতো পরিবর্তন বা রহিত হওয়া খ-অংশের আয়াতের হুবহু অনুকূল হয়ে গেছে; প্রতিদ্বন্দ্বী হয়নি।

١٠٨. وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا : ﴿أَمْ﴾ بَلْ أ ﴿تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى﴾ أَيْ سَأَلَهُ قَوْمُهُ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ مِنْ قَوْلِهِمْ : «أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً» وَغَيْرِ ذٰلِكَ؟ ﴿وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ﴾ أَيْ يَأْخُذْهُ بَدَلَهُ بِتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَاقْتِرَاحِ غَيْرِهَا ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ﴾ أَخْطَأَ طَرِيْقَ الْحَقِّ، وَالسَّوَاءِ فِي الْأَصْلِ الْوَسَط.

১০৮. মক্কাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মক্কা প্রশস্ত করার এবং সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করার আবেদন জানালে আয়াত নাজিল হয়, তোমরা কি ام শব্দটি بل أ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ মুসাকে করা হয়েছিল? অর্থাৎ, যেরূপ তাঁকে তাঁর সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল? ইতঃপূর্বে। যেমন- বলেছিল, আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের স্বচক্ষে প্রদর্শন করো, ইত্যাদি। এবং যে কেউ ঈমানের স্থলে কুফরির বিনিময় করে অর্থাৎ, সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের উপর পর্যবেক্ষণ ত্যাগ করে এবং অন্য কিছুর আবদার তুলে ঈমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরলপথ হারায়। সত্যপথ হারায়। اَلسَّوَاءَ-এর মূল অর্থ হলো মাঝামাঝি।

١٠٩. ﴿وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ﴾ مَصْدَرِيَّةٌ ﴿يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا﴾ مَفْعُوْلٌ لَهُ كَائِنًا ﴿مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ﴾ أَيْ حَمَلَتْهُمْ عَلَيْهِ أَنْفُسُهُمُ الْخَبِيْثَةُ ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ﴾ فِي التَّوْرَاةِ ﴿الْحَقُّ﴾ فِيْ شَأْنِ النَّبِيِّ، ﴿فَاعْفُوْا﴾ عَنْهُمْ أَيْ اُتْرُكُوْهُمْ، ﴿وَاصْفَحُوْا﴾ أَعْرِضُوْا فَلَا تُجَازُوْهُمْ، ﴿حَتّٰى يَاْتِيَ اللهُ بِاَمْرِهٖ﴾ فِيْهِمْ مِنَ الْقِتَالِ. ﴿اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾.

১০৯. মনের প্রতিহিংসাবশত তাদের নিকট তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই কামনা করে ঈমান আনয়নের পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে। অর্থাৎ, তাদের হীন মানসিকতা এরূপ বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করে। لَوْ শব্দটি এই স্থানে مَصْدَرِيَّةٌ; حَسَدًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهُ; مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ এটা উহ্য كَائِنًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অতএব, তোমরা তাদের ক্ষমা করো অর্থাৎ, তাদের ছেড়ে দাও এবং উপেক্ষা করো বর্তমানে তাদের কোনো প্রতিফল দিও না যতক্ষণ না তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দেশ অর্থাৎ, জিহাদের নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١١٠. ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ﴾ طَاعَةٍ كَصَلٰوةٍ وَصَدَقَةٍ ﴿تَجِدُوْهُ﴾ أَيْ ثَوَابَهُ ﴿عِنْدَ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

১১০. আর তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং উত্তম কাজের মধ্য থেকে যা তোমরা নিজেদের জন্য পেশ কর ছওয়াবের কাজ যেমন- নামাজ, দান ইত্যাদি আল্লাহর নিকট তা অর্থাৎ, তার পুণ্যফল পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দেবেন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَنَزَلَ لَمَّا الخ

শানে নুযূল বর্ণনা : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) أَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ মক্কাবাসী যখন মক্কা নগরীতে প্রশস্ত করে দেওয়া এবং সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার দাবি করল, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। নগর প্রশস্ত করার মর্ম হলো, নগর থেকে পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দেওয়া, যাতে শহর প্রশস্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : أَمْ - بَلْ أ : মুফাসসির (র.) بَلْ، أَ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করছেন যে, এখানে اَمْ শব্দটি مُنْقَطِعَةْ যা بَلْ এবং هَمْزَةُ اِسْتِفْهَام-এর অর্থ।

قَوْلُهُ: وَالسَّوَاءُ فِي الْأَصْلِ اَلْوَسَطُ

سَوَاءٌ শব্দের অর্থ : অর্থাৎ, سَوَاءٌ শব্দটি প্রকৃত পক্ষে وَسْط-এর অর্থে। কেউ কেউ বলেন سَوَاء ইসমে ফায়েলের অর্থে মাসদার। اَلطَّرِيْقُ الْمُسْتَوِيْ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে سَوَاءُ السَّبِيْلِ-এর অর্থ হবে اَىْ مُسْتَوِي সুতরাং السَّوَاء-এর প্রকৃত অর্থ তুলে ধরেছেন।

قَوْلُهُ: حَسَدًا - مَفْعُوْلٌ لَهُ كَائِنًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ : এর তারকীবগত অবস্থান বর্ণনা: মুফাসসির (র.) كَائِنًا -কে উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ اَنْفُسِهِمْ বাক্যাংশটি كَائِنًا মাহযূফের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَسَدًا-এর সিফাত হয়েছে।

قَوْلُهُ : تَجِدُوْهُ أَيْ ثَوَابَهُ

আমল পাওয়ার ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) ثَوَابَهُ বলে একথা বুঝিয়েছেন যে, নেক আমল হুবহু আল্লাহর কাছে পাওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং আমলের ছওয়াব পাওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আমলের ছওয়াব ও প্রতিদান পেয়ে যাবে। হুবহু সে আমলগুলো নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

يَتَبَدَّلُ : সীগাহ وَاحِدِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَات فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّبَدُّلُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- সে পরিবর্তন করবে / করে।

وَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اِثْبَات فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَوَدَّةُ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনস مُرَكَّبْ (مضاعف ثلاثي এবং مثال واوي) অর্থ- সে কামনা করল, আশা করল।

حَسَدًا : এর শাব্দিক অর্থ- হিংসা। পরিভাষায় حَسَد বলা হয় اَلْحَسَدُ تَمَنِّى زَوَالُ نِعْمَةِ الْإِنْسَانِ কারো নিয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনা করা।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ

اَمْ হরফে আতফ ফে'ল যমীর তার ফায়েল اَنْ মাসদারিয়া تَسْئَلُوْا ফে'ল যমীর ফায়েল رَسُوْلَكُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে بِتَاوِيْل মাসদার হয়ে মাফ'উল تُرِيْدُوْنَ ফে'লের। كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى এটি مَفْعُوْلِ مُطْلَقْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب এবং উহ্য মাসদারের সিফাত। মূলরূপ হলো- تَسْئَلُوْا سُؤَالًا مِثْلَ سُؤَالِ مُوْسٰى; কেউ কেউ বলেন, এটি حَالَ-এর ভিত্তিতে মানসূব।

اَنْ تَسْئَلُوْا মাসদার হয়ে تُرِيْدُوْنَ-এর মাফ'উল। সে মাফ'উল থেকে كَمَا سُئِلَ হাল। আর كَمَا-এর মধ্যে كَاف হরফে জরটি مِثْل-এর অর্থে এবং مَا হলো مَصْدَرِيَّةْ।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ ..... سَوَاءَ السَّبِيْلِ

وَاوْ হরফে ইস্তেনাফিয়া, مِنْ হরফে শর্ত يَتَبَدَّلُ ফে'ল যমীর তার ফায়েল الْكُفْرَ মাফ'উলে বিহী بِالْإِيْمَانِ মুতা'আল্লিক يَتَبَدَّلُ-এর সাথে। ফে'ল, ফায়েল মাফ'উল ও মুতা'আল্লিক মিলে শর্ত। فَاء জাযাইয়্যাহ قَدْ ضَلَّ ফে'ল, যমীর ফায়েল سَوَاءَ السَّبِيْلِ মাফ'উলে লাহু। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে মিলে জাওয়াবে শর্ত।

وَدَّ كَثِيْرٌ رَدَّكُمْ الخ-এর মূল ইবারত হবে এভাবে- لَوْ হরফে মাসদার ফে'লের পরে ব্যবহার হলে تَمَنّٰى বা আশা-আকাঙ্ক্ষার অর্থ দেয়। كُفَّارًا; رَدَّ যেহেতু صَيَّرَ-এর অর্থে তাই দুটি মাফ'উলকে নসব দেয়। প্রথম মাফ'উলটি হলো كُمْ আর দ্বিতীয়টি হলো مَصْدَرِيَّة আর مَا হলো مُتَعَلِّقْ مِنْ بَعْدِ টি وَدَّ-এর مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن;

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ .... إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

وَاوْ হরফে ইস্তেনাফিয়া, اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ জুমলা হয়ে মা'তূফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ اٰتُوْا الزَّكٰوةَ জুমলা হয়ে মা'তূফ। وَاوْ হরফে ইস্তেনাফিয়া مَا ইসমে শর্ত تُقَدِّمُوْا ফে'লে শর্ত যমীর ফায়েল لِأَنْفُسِكُمْ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক تُقَدِّمُوْا ফে'লের সাথে। مِنْ خَيْرٍ জার-মাজরূর মিলে উহ্য فِعْل شِبْهُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে পূর্বের مَا-এর সিফাত, ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে শর্ত। تَجِدُوْهُ-এর মাঝে تَجِدُوْا ফে'ল যমীর তার ফায়েল যমীর মাফ'উল, عِنْدَ اللّٰهِ যরফে মুতা'আল্লিক تَجِدُوْا ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে জাওয়াবে শর্ত।

إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-এর মাঝে إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰه ইসমে ان - بِمَا تَعْمَلُوْنَ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম بَصِيْر-এর সাথে। بَصِيْر হলো খবরে إِنَّ;

✪ الرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

اَلْكِتَاب শব্দের লিখনশৈলী : ১০৯ নং আয়াতে উল্লিখিত اَلْكِتَاب শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা:

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ت বর্ণের পর আলিফযোগে اَلْكِتَاب লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ت বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে اَلْكِتٰب লিখা আছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاصْفَحُوْا حتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِه

حَتّٰى শব্দের লিখনশৈলী : ১০৯ নং আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ت বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুল যোগে حَتّٰے লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ت বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফযোগে حَتّٰى লিখিত রয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَمْ تُرِيْدُوْنَ ..... سَوَاءَ السَّبِيْلِ

পূর্বে নসখ সম্পর্কে ইহুদি ও মুশরিকদের সমালোচনা ও আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে মুসলমানদেরকে রাসূল ﷺ -এর উপর ভরসা ও আস্থা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে-

لَاتَكُوْنُوْا فِيْمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِثْلَ الْيَهُوْدِ فِيْ تَرْكِ الثِّقَةِ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَاقْتِرَاحِ غَيْرِهَا فَتَضِلُّوْا وَتَكْفُرُوْا بَعْدَ الْإِيْمَانِ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَدَّ كَثِيْرٌ .... شَيْءٍ قَدِيْرٍ

পূর্বে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাব ঈমানের স্থলে কুফর গ্রহণ করেছিল। আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে তারা মুসলমানদের ব্যাপারেও এ কামনা-বাসনা করে যে, মুসলমানরা কাফের হয়ে যাক।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া ও কুরাইশের কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাদের জন্য পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দাও। আমাদের জমিনকে প্রশস্ত করে দাও। এর মাঝ দিয়ে স্রোতমান নহর জারি করে দাও, তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

মুফাসসিরবৃন্দ বলেন, ইহুদি ও মুশরিকরা রাসূল ﷺ -কে অহেতুক উদ্ভট প্রশ্নবানে জর্জরিত করে উক্ত্যক্ত করতো। তাদের কেউ বলত, হে মুহাম্মাদ ! হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি যেভাবে একত্রে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তুমি একটা কিতাব আসমান থেকে নাজিল কর। আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া বলত "হে মুহাম্মদ! এমন একটা কিতাব আসমান থেকে আনো যাতে লেখা থাকবে مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى اِبْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ "আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবনে আবি উমাইয়ার কাছে। আর মনে রেখো, আমি মুহাম্মাদকে মানুষের কাছে নবী করে পাঠিয়েছি।" (নাউযুবিল্লাহ) এরপর আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ الخ

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (র.) এবং হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর সাথে উহুদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ইহুদিদের একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদেরকে দেখামাত্রই ইহুদিরা বলল, আমরা কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ইহুদি ধর্ম ছাড়া যা কিছু আছে সবই ভ্রান্ত। যদি মুহাম্মাদ ﷺ হকের উপর থাকতেন, তাহলে তার সাথি-সঙ্গীরা নিহত হতো না। অথচ মুহাম্মাদ ﷺ দাবি করে যে, যখন সে যুদ্ধ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। ইহুদিদের এ কথাগুলো শুনে হযরত আম্মার (রা.) বললেন, আচ্ছা বল দেখি, তোমাদের ধর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গের কী বিধান? ইহুদিরা জবাব দিল, এটা তো অত্যন্ত জঘন্য কাজ। হযরত আম্মার (রা.) বললেন, আমরা তো হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে আমৃত্যু তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। সেটা কখনো ভঙ্গ করব না। ইহুদিরা বলল, আম্মার ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। তখন হযরত হুযায়ফা (রা.) জবাব দিলেন–

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ الْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا.

তাঁরা ফিরে এসে রাসূল ﷺ এর নিকট এ ঘটনার বর্ণনা করলে রাসূল ﷺ বলেন– اَصَبْتُمَا الْخَيْرَ وَ اَفْلَحْتُمَا অর্থাৎ তোমরা কল্যাণ করেছ এবং সফল হয়েছ। তারপর এ আয়াত নাজিল হয়– وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ; [জামালাইন: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০২]

✪ تَوْضِيْحُ الآيَاتِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ .....عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

ইহুদিদেরকে সাময়িকভাবে ক্ষমার আদেশ ও এর কারণ: আল্লাহ তা'আলা فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا বলে মুসলিমদেরকে আদেশ করছেন যে, ইহুদিদেরকে ক্ষমা করো, ছেড়ে দাও এবং উপেক্ষা করো, বর্তমানে তাদের কোনো প্রতিশোধ নিও না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সম্পর্কে নির্দেশ আসে। কারণ, ইহুদিদের বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক কথাবার্তায় মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই তাদেরকে আদেশ-উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এ মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে ক্ষমা করে যেতে থাক; প্রতিশোধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখনই সূচনা করো না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ..... تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

لِاَنْفُسِكُمْ -এর বিশ্লেষণ : আলোচ্য আয়াতে وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ-এর মাঝে لِاَنْفُسِكُمْ অংশে সম্বন্ধপদ مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لِنَجَاةِ اَنْفُسِكُمْ নিজেদের কল্যাণ, নিজেদের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য। [বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও প্রতিদান পেয়ে যাবে। হুবহু সে আমগুলো বিদ্যমান দেখা যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

দরখাস্তকৃত এবং দরখাস্ত ছাড়া উভয় মু'জিযাসমূহের পার্থক্যের বিবরণ : মক্কার কাফের ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় এমন উৎসূক যুবকও ছিল, যাদের কাজ ছিল শুধু হাঙ্গামা ও বিরোধকে দমন করা। তারা বিভিন্ন রকমের দরখাস্তকৃত মু'জিযাসমূহ তলব করত। যেগুলোর ব্যাখ্যা সূরা আন'আমে আসবে।

প্রত্যেক কাজের রহস্য ও কল্যাণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জানেন। অন্য কারো কর্ম নির্ধারণের অধিকার নেই। তাই এ ধরনের দরখাস্তসমূহ সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করা হতো। আর যেহেতু আবেদনকারীদের উদ্দেশ্য অধিকাংশই ভুল ছিল এবং তাদের রীতি-নীতিতে বৈরিতা ছিল। এ কারণে আল্লাহর বিধান ও নিয়ম এটাই ছিল যে, এ ধরনের আবদারসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হতো। আর যদি দরখাস্ত পূর্ণ করা হতো । তবে এ শর্তের সাথে যে, তারপরও ঈমান গ্রহণ না করলে তা হলে প্রমাণ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর আজাব আসা নিশ্চিত হয়ে যায়।

এ স্থানে ব্যাপারটি যেহেতু আখেরী উম্মতের, তাদেরকে হালাক ও ধ্বংস করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা নেই। আর এ দিকে বিরোধীদের ভাগ্যে ঈমান গ্রহণের তৌফিকও নেই। তাই তাদের দরখাস্তসমূহ পূর্ণ করা কল্যাণজনক হিসেবে গণ্য করা যায়নি।

[কামালাইন খ.১, পৃষ্ঠা.১১৮]

যুদ্ধ, ক্ষমা ও উপেক্ষা করে দেওয়া : যেহেতু মুসলমানদের সে সময়ের অবস্থার চাহিদা এটাই ছিল যে, পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ এবং কঠোরতা ব্যতীত সময়কে অতিবাহিত করা, বিরোধীদের অপকর্মের শাস্তি উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ হত্যা ও ট্যাক্স-এর বিধানের মাধ্যমে করা হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সহানুভূতি এবং দেখেও না দেখার ভান করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর জাতির প্রকৃত ও ভিতরগত ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি অন্য কিছু সম্ভব নয়। কেননা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিস্বাদ অবস্থা সহ্য করার অভ্যাস সৃষ্টি দ্বারা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বড় বড় কঠিন ও সংকটময় অবস্থাসমূহ হাসিমুখে সহ্য করার ট্রেনিং হয়ে যায়। প্রকৃত যুদ্ধ ও মারামারির অবস্থাতেও এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যেগুলোর মধ্যে ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অতএব আয়াতকে সাময়িক অবস্থাদির উপর ভিত্তি করে مَنْسُوْخ [রহিত] মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা عَفْو এবং صَفْح দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু যুদ্ধ না করা নয়; বরং ব্যাপক অর্থ। যা যুদ্ধ করা ও যুদ্ধ না করা উভয় অবস্থাই গণ্য। আর যেহেতু শত্রুদের বিরোধী কার্যকলাপ দেখে উত্তেজনা আসতে পারে, তাই শুধু বসে থাকাও ন্যায়সঙ্গত নয়। এ যুক্তিসিদ্ধতা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শক্তির প্রস্রবণ-এর দিকে লক্ষ্যকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি ইবাদতের বিধানাবলির প্রোগ্রামসমূহ বলে দিয়েছেন যে, বর্তমানে নিজেকে শারীরিক ও আর্থিক কষ্টসমূহ সহ্যের অভ্যস্ত বানাও। যাতে করে যুদ্ধের বিধানাবলি মেনে নেওয়ার জন্য নিজকে তৈরি করতে পারে। নতুবা প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধের নির্দেশাবলি নিষ্ফল হয়ে থাকবে।

[কামালাইন খ.১, পৃষ্ঠা.১১৯]

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

মাওসূফের প্রতি সিফাতের ইযাফত : আলোচ্য অংশে স্বাভাবিক বর্ণনারীতি اَلطَّرِيْقُ الْمُسْتَوِيْ-এর পরিবর্তে সিফাতকে মাওসূফের দিকে ইযাফত করে سَوَاءَ السَّبِيْلِ বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সত্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও সত্য পথ ত্যাগ করার বিষয়টির জঘন্যতা প্রকাশ করা ।

١١١. ﴿وَقَالُوا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا﴾ جَمْعُ هَائِدٍ ﴿اَوْ نَصٰرٰى﴾ قَالَ ذٰلِكَ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصَارٰى نَجْرَانَ لَمَّا تَنَاظَرُوْا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ قَالَ الْيَهُوْدُ : «لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا الْيَهُوْدُ»، وَقَالَ النَّصَارٰى : «لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا النَّصَارٰى»، ﴿تِلْكَ﴾ اَلْمَقُوْلَةُ ﴿اَمَانِيُّهُمْ﴾ شَهَوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ، ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ : ﴿هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ﴾ حُجَّتَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ﴿اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ فِيْهِ.

১১১. আর তার বলে ইহুদি هُوْد শব্দটি هَائِد-এর বহুবচন। বা খ্রিষ্টান ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে মদিনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিষ্টানরা বিতর্ককালে এ কথা বলেছিল। অর্থাৎ, ইহুদিরা বলেছিল যে, ইহুদি ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর খ্রিষ্টানরা বলেছিল যে, খ্রিষ্টান ছাড়া জান্নাতে আর কেউ প্রবেশ করবে না। এটা এই বক্তব্য তাদের আশা মাত্র মিথ্যা কামনা। তাদেরকে বলুন এতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই কথার উপর তোমাদের প্রমাণ এ বিষয়ে তোমাদের দলিল পেশ করো।

١١٢. ﴿بَلٰى﴾ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ ﴿مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ﴾ أَيِ انْقَادَ لِأَمْرِهِ، وَخُصَّ الْوَجْهُ لِأَنَّهٗ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، فَغَيْرُهُ أَوْلٰى، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ مُوَحِّدٌ ﴿فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ﴾ أي ثَوَابُ عَمَلِهِ اَلْجَنَّةُ، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ فِي الْآخِرَةِ.

১১২. হ্যাঁ নিশ্চয় অন্যান্যরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় চেহারা সমর্পণ করবে। অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করবে। চেহারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সেটি মানব শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সুতরাং এটা যদি অনুগত হয় তবে অন্য অঙ্গসমূহের তো কথাই নেই। আর সে হয় সৎকর্মপরায়ণ তাওহীদপন্থি তাহলে তার জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তার ফল অর্থাৎ, তাঁর কর্মের পুর্ণ্যফল জান্নাত এবং তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না পরকালে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : بَلٰى - يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ

بَلٰى -এর ব্যাখ্যা : بَلٰى যেহেতু না-বাচককে হ্যাঁ-বাচক করার জন্য আসে, তাই মুফাসসির (র.) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ ইবারত নির্ধারণ করেছেন। আর এজন্যই بَلٰى-এর উপর وَقف করা حَسن অর্থাৎ, তারপর مَنْ اَسْلَمَ থেকে নতুন বাক্য।

قَوْلُهٗ: وَخُصَّ الْوَجْهُ لِأَنَّهٗ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ

আয়াতে বিশেষভাবে চেহারা উল্লেখের কারণ : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) আয়াতে وَجْهٌ শব্দটি ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করেছেন যে, চেহারা মানুষের সর্বোত্তম অঙ্গ। সুতরাং এটা সমর্পণ করার দ্বারা পুরো সত্তা সমর্পণ উদ্দেশ্য। وَجْهٌ কে সমস্ত অঙ্গসমূহ থেকে উৎকৃষ্ট এজন্য বলা হয়েছে যে, এটা সেজদার স্থান। যা সমস্ত একাগ্রতার ভিত্তি ও অনুভূতিসমূহের এবং চিন্তা ও ভাবনার খনি।

قَوْلُهٗ: وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - فِي الْآخِرَةِ

মুমিনগণের দুঃখ না থাকার ব্যাখ্যা : فِي الْآخِرَةِ-এর কয়েদ মুসান্নিফ (র.) এজন্য লাগিয়েছেন যে, দুনিয়াতে اَشَدُّ بَلَاءٍ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ-এর দৃষ্টিতে মুমিনগণ ভয়, চিন্তা, দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে বেষ্টিত থাকেন। অতএব, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুমিনগণ আখেরাতে এসব থেকে মুক্ত থাকবে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

هُوْدٌ : هَائِدٌ-এর বহুবচন। যেমন- عَائِذٌ-এর বহুবচন عُوْذٌ, শব্দটি هَادَ يَهُوْدُ থেকে নির্গত। অর্থ হলো ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হওয়া।

هَائِدٌ : শব্দটি تَائِبٌ-এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ, اِنَّا تُبْنَا اِلَيْكَ; যারা গো-বৎস পূজা থেকে তওবা করেছিল তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পুরো সম্প্রদায়কে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়।

اَجْرٌ : শব্দটি একবচন বহুবচনে اُجُوْرٌ মূলবর্ণ (ا- ج - ر) জিনস مَهْمُوْزِ فَاء অর্থ- প্রতিদান, পুরস্কার বা ফলাফল।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ ..... فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّه

بَلٰى হরফে জাওয়াব, مَنْ ইসমে শর্ত اَسْلِمْ ফে'ল যমীর ফায়েল وَجْهَه মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উল لِلّٰهِ মুতা'আল্লিক اَسْلِمْ ফে'লের সাথে واو হালিয়া هُوَ মুবতাদা مُحْسِنٌ হলো খবর। জুমলা হয়ে হাল। فاء জাযাইয়্যাহ لَه উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর মুকাদ্দাম اَجْرُه মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলে মুবতাদা মুয়াখখার। عِنْدَ رَبِّه হলো যরফে মুতা'আল্লিক উহ্য হালের সাথে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ: تِلْكَ ـ اَلْمَقُوْلَةُ ـ اَمَانِيُّهُمْ

اَلْمَقُوْلَةُ শব্দের নুসখা : ১১১ নং আয়াতের তাফসীরাংশে اَلْمَقُوْلَةُ শব্দের দুধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি اِسْمِ مَفْعُوْل হিসেবে اَلْمَقُوْلَةُ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি মাসদার হিসেবে اَلْقَوْلَةُ লিখিত আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ ..... اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

একদা ইয়েমেনের নাজরান থেকে আগত খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধিদল এবং মদিনার ইহুদিগণ রাসূল ﷺ এর দরবারে তর্কে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে তাদের গলার আওয়াজ চড়া হয়ে যায় এবং ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) ও ইঞ্জীল অস্বীকার করে খ্রিষ্টানদেরকে বলে, তোমরা কোনো দীনের উপরই নেই। একইভাবে খ্রিষ্টানরাও হযরত মূসা (আ.) ও তাওরাতকে অস্বীকার করে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা কোনো ধর্মের উপর নেই। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়। [আল-বাহরুল মুহীত: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫০]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

هُوْدًا শব্দটি বহুবচন হওয়ার কারণ : প্রশ্ন হতে পারে, مَنْ كَانَ هُوْدًا বাক্যের كَانَ-এর মুফরাদ যমীরটি كَانَ-এর اِسْم আর هُوْدًا হলো كَانَ এর خَبَر; যা বহুবচন। অথচ كَانَ -এর ইসম ও খবরের মাঝে مُطَابَقَة হওয়া আবশ্যক। এর উত্তর হলো, এখানে كَانَ-এর ইসমের ক্ষেত্রে مَنْ-এর لَفْظ-এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা, لَفْظ হিসেবে مَنْ মুফরাদ আর খবর তথা هُوْد বহুবচন আনার ক্ষেত্রে مَن এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা مَنْ টি مَعْنٰى তথা অর্থ হিসেবে বহুবচন।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি ও কুরআনের উত্তর : খ্রিষ্টান ও ইহুদি উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মকে নাম-ভিত্তিক গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয়প্রাত্র বলে দাবি করতো এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামি ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করতো।

আল্লাহ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন; তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুত ইহুদি-খ্রিষ্টান অথবা ইসলাম, যে কোনো ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দুটি বিষয়-

১. বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তাই প্রকৃত ধর্ম।

২. যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল-খুশিমতো মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও ইবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন। প্রথম বিষয়টি بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে. পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়ত; বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। তা ছাড়া بَلٰى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়ের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান বুঝায় । অর্থাৎ, তোমাদের দাবি নিরেট ভ্রান্ত। সঠিক তা-ই, যা এখন বর্ণিত হচ্ছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ ..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

أَسْلَمَ وَجْهَهُ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার প্রতি আত্মসমর্পণ হলো, শিরকের সংমিশ্রণ ব্যতীত পুরোপুরি তাওহীদের মতবাদ গ্রহণ করা। এজন্যই তাফসীরে কাশশাফে أَسْلَمَ وَجْهَه-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে- اَخْلِصْ نَفْسَهٗ لَا يُشْرِكُ بِهٖ غَيْرَهٗ অর্থাৎ, নিজেকে একনিষ্ঠ করে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না।

وَجْهٌ-এর শাব্দিক অর্থ চেহারা। কিন্তু রূপকার্থে সত্তা বুঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহার হয়। এখানেও এ অর্থই উদ্দেশ্য। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে রয়েছে- وَقَالُوْا وَجْهٌ اِمَّا مُسْتَعَارٌ لِلذَّاتِ وَ اِمَّا مَجَازٌ عَنِ الْقَصْدِ

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ

জুমলায়ে মু'তারিযা ব্যবহার : আলোচ্য অংশটুকু জুমলায়ে মু'তারিযা,পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বাক্যের সাথে এর তারকীবগত কোনো সম্পর্ক নেই। বক্তব্যের মাঝখানে এই জুমলায়ে মু'তারিযা ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবির অসারতা প্রমাণ করা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ

আমরের ব্যবহার : আলোচ্য আয়াতে নির্দেশসূচক ফে'ল ব্যবহার হয়েছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অক্ষমতা প্রকাশের জন্য এবং তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য।

قَوْلُهٗ : مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ

ইস্তেয়ারা : আলোচ্য অংশে وَجْهٌ শব্দটি ইস্তিয়ারার ভিত্তিতে ذَات অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : عِنْدَ رَبِّهٖ

যমীরের পরিবর্তে ইসম ব্যবহার : আলোচ্য অংশের মূলরূপ হলো- مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَهُ কিন্তু আয়াতে عِنْدَهُ-এর পরিবর্তে ইসম ব্যবহার করে عِنْدَ رَبِّهٖ বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা প্রকাশ করা।

✪ تَعَارُفُ الْاَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

নাজরান : এটি ইয়েমেনের একটি এলাকার নাম। নাজরান নামে আরবে বেশকিছু এলাকা রয়েছে। যেমন- ইরাকের কূফার নিকটবর্তী নাজরান। তবে আলোচ্য স্থানে ইয়েমেনের নাজরানই উদ্দেশ্য।

নাম ও নামকরণ : কাঠের যে অংশের উপর ভর করে দরজা ঘোরে, তাকে আরবিতে نَجْرَان বলা হয়। তবে শহরটির নাম নাজরান হয়েছে নাজরান ইবনে সাইদান ইবনে সাবা ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারাব ইবনে কাহতান-এর নামে। কারণ, তিনি এই নগরীর গোড়াপত্তন করেন।

নাজরানে খ্রিষ্টধর্মের আগমন : নাজরান রাসূল ﷺ এর যুগে খ্রিষ্টানপ্রধান অঞ্চল ছিল। নাজরানে খ্রিষ্টধর্মের প্রবেশ সম্পর্কে ওহাব ইবনে মুনাব্বেহের সূত্রে ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, فيميون নামক জনৈক বুযুর্গ খ্রিষ্টান ব্যক্তির মাধ্যমে নাজরানে খ্রিষ্টধর্মের প্রচলন ঘটে। فيميون নামক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যধর্ম অনুসরণ করতেন। আর নাজরাবাসীরা মূলত মুশরিক ছিল। তারা একটি খেজুর গাছের পূজা করতো। ঘটনাক্রমে فيميون ব্যক্তিটি দাস হিসেবে জনৈক নাজরানবাসীর কাছে বিক্রি হয়ে আসেন।

পরবর্তীতে তাঁর কারামত ও সচ্চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে নাজরানবাসীরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তবে মুকাতিল (র.)-এর মতে, আসহাবুল উখদূদের ঘটনার মাধ্যমে নাজরানে খ্রিষ্টধর্মের প্রচলন ঘটে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, নাজরানের বাদশাহ জনৈক বালককে জাদু শেখার জন্য নিয়োগ করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে বালকটি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বালকটি থেকে বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পায়। অবশেষে বাদশাহ এসব জানতে পেরে এ বালককে হত্যা করে। তখন নাজরানের জনসাধারণ এসব কারামত দর্শনে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

রাসূল ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নাজরান : দশম হিজরি সনে রাসূল ﷺ চুক্তির মাধ্যমে নাজরান রাজ্য জয় করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (র.)-এর খেলাফতকালে তিনি নাজরানের খ্রিষ্টানদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। কারণ, রাসূল ﷺ জীবনের শেষ দিকে বলেন- اَخْرِجُوْا الْيَهُوْدَ مِنَ الْحِجَازِ وَأَخْرِجُوْا اَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ বর্ণিত আছে, হযরত আলী (র.) এর খিলাফতকালে নাজরানবাসী হযরত আলী (রা.)-এর কাছে নাজরানে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে নাজরান শহরটি সৌদী আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী একটি শহর।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

أ. أكتب سبب نزول الآية الكريمة ثم ترجمها ترجمة فصيحة.

ب. أكتب حكم سب النبي ﷺ ثم أذكر حكم استعمال الالفاظ المتضمنة لمعنى السب بالدلائل الواضحة.

ج. حقق قوله : راعنا، هود، ود، اهل الكتب، والخير ثم بين معنى ـ انظرنا واسمعوا ـ موضحا.

د. قوله تعالى : يأيها الذين امنوا لاتقولوا راعنا .....ما هي الأحكام المستنبطة من الآيات.

ه. بين الرابطة بين الركوعين.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

أ. ترجم الآيات الكريمة ثم أذكر سبب النزول موضحة.

ب. كم قراءة فى قوله : "ننسخ و ننسها" اكتب ثم اذكر معنى النسخ لغة واصطلاحا، و ما الفرق بين النسخ والإنساء أوضح.

ج. هل النسخ عام لسائر الامم أم خاصة لهذه الأمة، فإن كان الثاني فلأية حكمة.

د. أوضح الإختلاف في جواز النسخ وعدمه، مع ذكر أقسام الناسخ والمنسوخ موضحا.

ه. قوله تعالى : ما ننسخ من آية ..... عَلٰى كل شيء قدير ـ ما هي التوضيح حول هذه الآية.

د. لم نسخ الله تعالى بعض الآيات بعد إنزاله على حبيبه ﷺ.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ـ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

أ. ترجم الآيتين ثم أذكر سبب النزول حيث ينكشف مراد الآيتين.

ب. قوله "تريدون" الخطاب لمن ؟ أكتب ثم أذكر كم شيئا سأل عنه قوم موسى إياه.

ج. بين حكم طلب الدعاء من الولى لحصول الدنيا مع بيان الفرق بينه وبين مراد هذه الآية.

د. أوضح المسائل المودعة فى قوله فاعفوا واصفحوا الخ.

ه. ما معنى الحسد وما دواعيه وكم نوعا له؟ بين كل واحد منها مع توضيح المثال والحكم.

و. ما هو ادعاء اليهود والنصارى وما هو الجواب فى القرآن من جانب اللّٰه.

রুকূ' : ১৪

ذِكْرُ افْتِرَاءِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَرَدُّ دَعْوَاهُمُ الْبَاطِلَةِ

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পরস্পর অপবাদ আরোপের বর্ণনা এবং তাদের ভ্রান্ত দাবির খণ্ডন

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পরস্পর সম্পর্কে বক্তব্য ও তার কারণ
- মসজিদে ইবাদতে বাধাদানকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি
- ইহুদি-খ্রিষ্টান কর্তৃক খোদার পুত্র সাব্যস্তকরণ ও তার উত্তর
- মক্কার কাফেরদের অসার দাবি ও তার উত্তর
- ইহুদি-খ্রিষ্টানরা রাসূল ﷺ-এর কাছে কী চায়?
- রাসূল ﷺ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কথা মেনে নিলে কী হবে?
- ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নেক ব্যক্তিদের বর্ণনা

١١٣. ﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ﴾ مُعْتَدٌّ بِهٖ وَكَفَرَتْ بِعِيْسٰى، ﴿وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ﴾ مُعْتَدٌّ بِهٖ وَكَفَرَتْ بِمُوْسٰى، ﴿وَّهُمْ﴾ أَيْ الْفَرِيْقَانِ ﴿يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ﴾ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، وَفِيْ كِتَابِ الْيَهُوْدِ تَصْدِيْقُ عِيْسٰى وَفِيْ كِتَابِ النَّصَارٰى تَصْدِيْقُ مُوْسٰى وَالْجُمْلَةُ حَالٌ. ﴿كَذٰلِكَ﴾ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ ﴿قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ أَيْ الْمُشْرِكُوْنَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ، أَيْ قَالُوْا لِكُلِّ ذِيْ دِيْنٍ : «لَيْسُوْا عَلٰى شَيْءٍ»، ﴿فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ﴾ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ، فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ.

১১৩. ইহুদিরা বলে, খ্রিষ্টানরা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর নেই। আর তারা হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে এবং খ্রিষ্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর নেই। আর তারা হযরত মূসা (আ.) কে অস্বীকার করে। অথচ তারা উভয় দলই তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পাঠ করে। ইহুদিদের কিতাবে হযরত ঈসা (আ.) এর সত্যায়ন আর খ্রিষ্টানদের কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে। وَهُمْ বাক্যটি حَال হয়েছে।
যেমন তারা বলে অনুরূপভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অর্থাৎ, আরবের মুশরিক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাদের মতো কথা বলে। مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো ذٰلِكَ-এর মর্মের بَيَان অর্থাৎ, তারা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে বলে যে, তাদের ধর্মে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সুতরাং ধর্ম সম্পর্কে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মীমাংসা করবেন। অনন্তর সত্যপন্থিদের জান্নাতে ও বাতিলপন্থিদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

١١٤. ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ﴾ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمَ ﴿مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ﴾ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيْحِ، ﴿وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا﴾ بِالْهَدْمِ أَوِ التَّعْطِيْلِ؟

১১৪. যে আল্লাহর মসজিদে যেমন- নামাজ ও তাসবীহ তাহলীল এবং তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে সেটাকে ধ্বংস করে বা রুদ্ধ করে তা ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় তদপেক্ষ বড় জালেম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ, তার চেয়ে অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কেউ নেই।

نَزَلَتْ إِخْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ خَرَّبُوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَوْ فِي الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا صَدُّوا النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ. ﴿أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَا إِلَّا خَآئِفِيْنَ﴾ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ أَخِيْفُوْهُمْ بِالْجِهَادِ، فَلَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ آمِنًا. ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ هَوَانٌ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ، ﴿وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ هُوَ النَّارُ.

রোমকরা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে অথবা মুশরিককা যখন হোদায়াবিয়ার বছরে রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণকে বায়তুল্লাহর জেয়ারত হতে বাধা প্রদান করেছিল, তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এদের পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়।

বাক্যটি আদেশসূচক জুমলায়ে খবরিয়া। অর্থাৎ, তোমরা জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করো। তাদের কেউ যেন নিরাপদে এই স্থানে প্রবেশ করতে না পারে। দুনিয়াতে রয়েছে তাদের জন্য লাঞ্ছনা হত্যা, বন্দি, জিযিয়া আরোপের অবমাননা, আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মহা শাস্তি। তা হলো, জাহান্নাম।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ: كَذٰلِكَ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ

كَذٰلِكَ- এর তারকীব বর্ণনা : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) এ কথা বুঝিয়েছেন যে, كَذٰلِكَ অংশটি পরবর্তী قَالَ ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে। অর্থাৎ, তা হলো উহ্য قَوْلًا মাসদারের সিফাত।

قَوْلُهُ: قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ..... وَغَيْرِهِمْ

لَا يَعْلَمُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : وَغَيْرِهِمْ অংশটি اَلْمُشْرِكُوْنَ এর উপর আতফ হয়েছে; اَلْعَرَب-এর উপর নয়। মুফাসসির (র.) اَيْ اَلْمُشْرِكُوْنَ..... অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আরবের মুশরিক এবং আরবের মুশরিকরা ছাড়া অন্যান্য কাফের। অর্থাৎ, সবাই নিজেদের ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য ধর্মকে নাকচ করে দিত।

قَوْلُهُ: مِثْلَ قَوْلِهِمْ. بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ

مِثْلَ قَوْلِهِمْ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ দ্বারা একটি আপত্তির নিরসন করেছেন। আপত্তিটি হলো, كَذٰلِكَ -এর পরে مِثْلَ قَوْلِهِمْ বলা অনর্থক। কারণ, كَذٰلِكَ ও مِثْلَ قَوْلِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য এক। মুফাসসির (র.) এ আপত্তির সমাধান এভাবে করেছেন যে, এখানে مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর বয়ান।

অবশ্য কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এ স্থলে পৃথক দুটি উপমা আছে। তাই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। كَذٰلِكَ দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের উক্তি ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরই অনুরূপ। তারা যেমন অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে, এরাও তেমনি নিজেদের ছাড়া অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে। আর مِثْلَ قَوْلِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আহলে কিতাব যেমন কোনো দলিল ছাড়া কেবল বিদ্বেষবশত এসব দাবি করে, তদ্রূপ পৌত্তলিকেরাও বিনা দলিলে কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিমতো এরূপ দাবি করে।

قَوْلُهُ: لَيْسُوْا عَلٰى شَيْءٍ

لَيْسُوْا-এর مَرْجِعْ নির্ণয় : لَيْسُوْا-এর বহুবচনের যমীর অর্থগতভাবে كُلّ- এর দিকে ফিরেছে। এজন্য বহুবচনের ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَمَنْ أَظْلَمُ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمَ

প্রশ্নটির উদ্দেশ্য নফী করা : এ তাফসীর করে প্রশ্নের উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো নফী করা।

قَوْلُهُ : وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ـ بِالْهَدَمِ أَوِ التَّعْطِيْلِ ..... عَنِ الْبَيْتِ

خَرَابِهَا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু দ্বারা আয়াতটির শানে নুযূলের দুটি সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১. আয়াতটি খ্রিষ্টানদের বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সেক্ষেত্রে خَرَاب দ্বারা خَرَابٌ بِالْهَدَمِ উদ্দেশ্য হবে।

২. আয়াতটি ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূল ﷺ কে মক্কার মুশরিকদের হজ করতে বাধা প্রদান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সেক্ষেত্রে خَرَاب এর ব্যাখ্যা হবে خَرَابٌ بِالتَّعْطِيْلِ ; এখানে اَوْ হরফটি تَنْوِيْع বা প্রকরণ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে; সন্দেহের জন্য নয়।

قَوْلُهُ : خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الخ

خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের জবাব দান : মূলত একটি প্রশ্নের জবাব প্রদানের জন্যই এ অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ

দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, বিধ্বংস ও বিরানকারী অর্থাৎ, খ্রিষ্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ তারা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল এবং নির্ভয়ে সেখানে প্রবেশ করেছিল। এমনকি তারা দীর্ঘ সময় তা দখল করে রেখেছিল।

এর উত্তরে মুফাসসির (র.) বলেছেন, এখানে خَبَر টি أَمْر-এর অর্থে। অর্থাৎ, مَا كَانَ ..... خَائِفِيْنَ জুমলাটি শব্দগতভাবে خَبَرِيَّة এবং অর্থগতভাবে إِنْشَائِيَّة হবে। অর্থাৎ, আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যেন মসজিদে হারাম ও বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে জিহাদের মাধ্যমে বাধাপ্রদান করি। [হাশিয়াতুস সাবী]

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তাদের জন্য গর্বভরে মসজিদ ধ্বংস করা ঠিক হয়নি। বরং সমীচীন ছিল, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে সেখানে প্রবেশ করা।

কারো কারো মতে, শব্দ ও অর্থ উভয় বিচারে এটি খবরিয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ এবং হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ঘটমান অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। এটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظ : **শব্দবিশ্লেষণ**

يَتْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت.ل.و) জিনস ناصى واوى অর্থ- তারা তেলাওয়াত করে, করবে।

يَحْكُمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح.ك.م) জিনস صحيح অর্থ- তিনি ফয়সালা করবেন।

كَانُوْا يَخْتَلِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْإِخْتِلَافُ মূলবর্ণ (خ.ل.ف) জিনস صحيح অর্থ- তারা মতানৈক্য করতো।

اَظْلَمَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ.ل.م) জিনস صحيح অর্থ- অধিক জুলুমকারী।

مَسَاجِدُ : শব্দটি مَسْجِد-এর বহুবচন। مَسْجِد শব্দটি اَلسُّجُوْدُ মাসদার থেকে ظرف مكان হওয়ার কারণে جِيْم বর্ণে যবর হওয়া উচিত ছিল। কেননা, যে ফে'লে مضارع-এর আইন কালেমায় পেশ হয়, তার ظرف হয় مفعل এর ওযনে। مَسْجِدٌ-এর جِيْم-এ কাসরা হয়েছে خِلَافِ قِيَاسٍ হিসেবে।

يُذْكَرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ (ذ.ك.ر) জিনস صحيح অর্থ- তাকে জিকির করা হয় বা স্মরণ করা হয়।

سَعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব فتح মাসদার اَلسَّعْيُ মূলবর্ণ (س.ع.ى) জিনস ناقص يائي অর্থ- সে চেষ্টা করে, প্রয়াসী হয়।

خَرَابٌ : কেউ বলেছেন خَرَابٌ শব্দটি تَخْرِيْبٌ-এর অর্থে اسم مصدر যা তার مفعول-এর দিকে مضاف হয়েছে। যেমন سَلَامٌ শব্দটি تَسْلِيْم-এর ওযনে। আর কেউ বলেন, এটি خرب -এর মাসদার, যা خَرِبَ بِالْمَكَانِ থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ, সেটির রক্ষণাবেক্ষণ বাদ দিয়েছে। যাতে তা নিজে নিজেই বিরান এবং বরবাদ হয়ে যায়।

خَائِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ.و.ف) জিনস اجوف واوي অর্থ- ভীতসন্ত্রস্ত।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ .... فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

فَاء হরফে ইস্তিনাফিয়া اَللّٰهُ মুবতাদা يَحْكُمُ ফে'ল ضمير ফায়েল بَيْنَهُمْ যরফে মুতা'আল্লিক يَحْكُمُ ফে'লের সাথে। يَوْمَ الْقِيَامَةِ যরফে মুতা'আল্লিক উহ্য ফে'লের সাথে فِيْمَا জার-মাজরূর মুতা'আল্লিক يَحْكُمُ ফে'লের সাথে। كَانُوْا ফে'লে নাকেস هُمْ ইসমে كَان - فِيْهِ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম يَخْتَلِفُوْنَ-এর সাথে, يَخْتَلِفُوْنَ জুমলা হয়ে খবরে كَانَ; অতঃপর জুমলা হয়ে فِيْمَا-এর مَا -مَوْصُوْلَه-এর صِلَة;

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَنْ أَظْلَمُ .... عَذَابٌ عَظِيْمٌ

مَنْ হলো মুবতাদা مَحَلًّا مَرْفُوْع আর .... اَظْلَمُ مِمَّنْ হলো তার খবর। আর اِسْتِفْهَام হলো اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِيْ; مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ; مَسَاجِدَ হলো مَنَعَ-এর প্রথম مَفْعُوْل এবং اَنْ يُّذْكَرَ হলো দ্বিতীয় : مَفْعُوْل; اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ : এখানে اِعْرَاب -এর দিক দিয়ে চারটি সুরত হতে পারে। যথা–

১. مَنْع-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل যেমন বলা হয় مَنَعْتُهُ كَذَا;
২. مَنْع-এর مَفْعُوْلِ لَهُ অর্থাৎ, مَنَعَ كَرَاهَةً اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ مَنَعَ دُخُوْلَ مَسَاجِدِ اللّٰهِ;
৩. مَسَاجِدَ اللّٰهِ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ অর্থাৎ, مَنَعَ ذِكْرَ اسْمُهُ فِيْهَا;
৪. مَنَعَ مَسَاجِدَ مِنْ اَنْ يُّذْكَرَ مَنْصُوْب অর্থাৎ, حَرْفُ الْجَرِّ ;

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ

شَيْء শব্দের লিখনশৈলী : ১১৩ নং আয়াতে উল্লিখিত شَيْء শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ي বর্ণের উপর হামযা যোগে شَيْء লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ى বর্ণের পর হামযাযোগে شَيْء লিখিত আছে।

✪ تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ : হাদীস তথ্যসূত্র

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে .. نَزَلَتْ إِخْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ خَرَّبُوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ বলে তাফসীরে ইবনে জারীর-এর নিম্নোক্ত দুটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ : أُولٰئِكَ أَعْدَاءُ اللّٰهِ النَّصَارٰى حَمَلَهُمْ بُغْضُ الْيَهُوْدِ عَلٰى أَنْ أَعَانُوْا بُخْتُنَصَّرَ الْبَابِلِيَّ الْمَجُوْسِيَّ عَلٰى تَخْرِيْبِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

[সূত্র তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী (র.): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪৬, হাদীস ১৮২৫]

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, হাদীসটি مَقْطُوْع; তবে এর সনদ صَحِيْح স্তরের।

মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে أَوْ فِى الْمُشْرِكِيْنَ ..... عَنِ الْبَيْتِ বলে তাফসীরে ইবনে জারীর-এর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: هٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكُوْنَ حِيْنَ حَالُوْا بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّة وَبَيْنَ أن يَّدْخُلَ مَكَّةَ حتّٰى نَحَرَ هَدْيَهُ بِذِيْ طُوًى وَهَادَنَهُمْ .

[সূত্র: তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪৬, হাদীস ১৮২৮] মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন, হাদীসটি مَقْطُوْع; তবে সনদের দিক থেকে صَحِيْح স্তরের]

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ ..... كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

এ আয়াতটির শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা–

১. ইহুদি সম্প্রদায় তাওরাত এবং খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিল পাঠ ও আলোচনা করে। উভয় কিতাবের মধ্যেই উভয় কিতাবের এবং উভয় রাসূলের বর্ণনা রয়েছে। অথচ ইহুদি সম্প্রদায় বলে, খ্রিষ্টানদের ধর্ম কোনো ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। অনুরূপভাবে নাসারারাও বলে ইহুদিদের ধর্ম কোনো ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। আহলে কিতাবের পরস্পরের এরূপ উক্তি শ্রবণ করে আরবদের কাফেররাও নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করে বলত, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উভয় ধর্মই ভিত্তিহীন। বরং আমরা সত্যের উপর রয়েছি। তাদের এহেন উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

২. অপর বর্ণনামতে আলোচ্য আয়াত নাজরানের খ্রিষ্টান ও ইহুদি নেতাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাজরানের খ্রিষ্টানরা যখন রাসূল ﷺ এর নিকট আসল, তখন তাঁর কাছে ইহুদি দলপতিরাও আসল। ফলে তারা পরস্পরে রাসূল ﷺ-এর সামনেই তর্কে লিপ্ত হলো। তখন ইহুদিরা ইঞ্জিল ও হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করল। একইভাবে খ্রিষ্টানরা তাওরাত ও হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করে বসল। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) এ শানে নুযূলটি উল্লেখ করেছেন।

[ফাতহুল কাদীর: খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা ১৩০; ইবনে কাসীর: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ..... عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। যথা–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কালবীর বর্ণনা হলো, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করে তাওরাত পুড়িয়ে দেয় এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে। ঘটনাটি এই যে, ইসলাম পূর্বকালে ইহুদিরা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করলে খ্রিষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাট তায়তাসের নেতৃত্বাধীন ইহুদিদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষতবিক্ষত করে সমগ্র শহর টিকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে দেয়। এতে বহু দিনের ইহুদিদের অর্জিত শক্তি ও তাদের পবিত্রত স্থান বায়তুল মুকাদ্দাস পরিত্যাক্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

ফারূকে আজম হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই আতা ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, এটা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নিছক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে হোদয়বিয়ার ঘটনায় মুসলিমগণকে বায়তুল্লাহ শরীফে যেতে বাধা দেয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتْ ..... فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাঈলের নবীগণের উপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাব ও সহীফাসমূহের সমষ্টি ও সংকলন, যা এখন বাইবেল পুরাতন নিয়ম নামে পরিচিত। ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই এ সহীফাগুলো পবিত্র হওয়ার দাবিদার। আর তারা উভয় গোত্রই এ আসমানি কিতাব ও সহীফাগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পাঠ করে। অথচ ইহুদিদের কিতাবে হযরত ঈসা (আ.) এর সত্যায়ন এবং খ্রিষ্টানদের কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে। এউপরও তারা পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যারোপ করছে। এ বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ দ্বারা বুঝিয়েছেন।

মুশরিক ও কাফেরদের বক্তব্য : قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা মুশরিক ও অন্যান্য কাফেরদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, আহলে কিতাবের কেউই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি আরব মুশরিকদের বক্তব্য ছিল। তবে আসমানি কিতাববিহীন যে কোনো ধর্মের অনুসারী এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা আসমানি কিতাবের ইলম উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে عِلْمٌ শব্দটি বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে ও বিশেষ্যরূপে ব্যবহার হয়েছে। এর দ্বারা ওহী ও নবুয়তের জ্ঞান উদ্দেশ্য। এ ধরনের আয়াত দিয়ে জাগতিক বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থ করা সঠিক নয়।

কুরআনে আহলে কিতাবের মতভেদ উল্লেখের কারণ: কুরআন মাজীদে আহলে কিতাবের মতবিরোধ ইত্যাদি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের সতর্ক করা। যাতে তারাও ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি। সুতরাং জান্নাত এবং নবী ﷺ এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

কারণ, শুধু দাবি করলে ও মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ কলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না; বরং মুসলমান হওয়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : মীমাংসার দ্বারা এখানে কার্যত বাস্তব মীমাংসা উদ্দেশ্য। আর বিতর্ক, আলোচনা ও যুক্তি প্রমাণভিত্তিক মীমাংসা অর্থাৎ, হক ও বাতিল এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে অকাট্য মীমাংসা তো এ পৃথিবীর বুকেই হয়ে রয়েছে।

قَوْلُهٗ بَيْنَهُمْ : তাদের মাঝে একদল হকপন্থি ও ঈমানদার এবং অপরদল বাতিলপন্থি ও কাফের উদ্দেশ্য। হকপন্থি ও বাতিলপন্থিদের মাঝে আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন।

অযথা দলভুক্ত হওয়ার মন্দতার বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা এমন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও দলভুক্তি থেকে হেফাজত করুন। যাতে করে كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ-এর শিকার না হয় এবং নিজকে ছাড়া অপরের ভালো কাজগুলোকে অস্বীকার না করে। স্বজনপ্রীতির পট্টি যখন চোখে বাধে, তখন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। নিজের মন্দসমূহ ভালো হয় এবং অপরের ভালো কাজগুলো মন্দরূপ ধরে সামনে আসে। এ বিনাশ ও দলভুক্তির চাহিদা তো এটাই যে إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا অর্থাৎ, স্বয়ং উক্ত উক্তির দ্বারাই উভয় ধর্মকে বতিল করা হয়ে গেছে। আর রহিত হওয়ার কারণে মুসলমানদের হিসেবে এক পর্যায়ে যদিও এ কথা সঠিক যে, উক্ত দুটি ধর্ম বর্তমানে কার্যকর নয়; কিন্তু স্বয়ং তাদের উদ্দেশ্যে এ বলার দ্বারা এটা নয় যে, তাদের ধর্ম ভিত্তিহীন ছিল বা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব এ তালীম হিসেবে বিশুদ্ধ ছিলনা, কিন্তু এ ইলমি ফয়সালা যখন আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে কিয়ামতের দিন বাস্তব কার্যকর ফয়সালা করে দুধ এবং পানি পৃথক করে দেওয়া হবে এবং সত্য ও মিথ্যার লড়াই সমাপ্তি করে দেওয়া হবে। [কামালাইন খ. ১, পৃষ্ঠা: ১২২]

মাশায়েখে কেরামের জন্য চিন্তা সূক্ষ্মতা : যে সকল আলেম ও মাশায়েখ নিজ নিজ তরীকার উপর এত মগ্ন ও আস্থাশীল যে, অন্যের হক ও সত্যকে দোষারোপ এবং তুচ্ছ করতেও লজ্জা করেন না। তাদের উচিত উক্ত আয়নায় একবার নিজ চিত্রকে দেখে নেওয়া।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ اَظْلَمُ ..... عَذَابٌ عَظِيْمٌ

বহুবচনের শব্দ مَسَاجِدُ ব্যবহারের কারণ : এ আয়াতে مَسَاجِدَ দ্বারা হয় বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। কেননা রোমের অগ্নিপূজক রাজা খ্রিষ্টানদের সহায়তায় একে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অথবা مَسَاجِد দ্বারা মসজিদে হারামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় ওমরা করতে নিষেধ করেছিল।

কিন্তু আলোচিত দুটি মসজিদই যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ও বরকত পূর্ণ তাই এ মসজিদদ্বয়ে ইবাদত করতে বাধা প্রদান বা তা ধ্বংস ও বিরান করে দেওয়া যেন সকল মসজিদকে ধ্বংস করার নামান্তর। এজন্য مَسْجِد-এর স্থলে مَسَاجِد বহুবচন ব্যবহার হয়েছে। তা ছাড়া বিধানের سَبَب নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও حُكْم-কে عَام হিসেবে উল্লেখকরণে কোনো অসুবিধা নেই।

মসজিদসমূহ বিনাশের ব্যাখ্যা : মুসান্নেফ (র.) আয়াতের শানে নুযূল দ্বারা তো মসজিদে হারাম ও মসজিদে বায়তুল মাকদিস বিনাশের সূত্র বের হয়ে আসে। কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে ইহুদিদের ঔদ্ধত্য সন্দেহসমূকে মিশ্রিত করে নিলে এবং সে সন্দেহগুলো স্বাভাবিকভাবে যদি মানুষের অন্তরে স্থান পেয়ে যায় তবে তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে নামাজ রোজাকেও মানুষ বিদায় দিয়ে দিত। যা দ্বারা মসজিদে নববী ও সকল মসজিদসমূহ বিনাশ হয়ে যেত। মোটকথা সে বিভিন্ন প্রকার কুচক্রের ফলাফল দ্বারা সাধারণ ও বিশেষ মসজিদসমূহ বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যেত।

মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ : অথচ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ খোদাভীরু লোকদের কাজ। অতএব কোথায় এ ইহুদিদের আহলে হক হওয়ার জোড়ালো দাবি ও ঢোল পিটানো । আর কোথায় তাদের এ অপকর্মসমূহ? লজ্জা লাগে না? মোটকথা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিক সকলেরই নির্লজ্জ আচরণ সামনে এসেছে এ কারণেই দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছনা হয়েছে যে, সকলেই ইসলামের নির্দেশে ট্যাক্সদাতা ও মুসলমানদের প্রজা হয়েছে। আর পরকালের ভরপুর সমাবেশে কুফর ছাড়া মসজিদসমূহ বিনাশের ব্যাপারে যা কিছু লাঞ্ছনা হবে, তা তো অতিরিক্ত।

মসজিদসমূহে তালা লাগানো : মসজিদকে বিনাশ ও ধ্বংস করা এবং নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইবাদত থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া যদিও উক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও নাজায়েজ প্রমাণিত হয়; কিন্তু মসজিদের সামানাদির হেফাজতের জন্য তালা লাগানো একটি পৃথক ব্যাপার। হ্যাঁ, মসজিদের বিনাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিস্তারিত বিধানাবলি মাসায়েলের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَنْ أَظْلَمُ

ইস্তেফহাম : আলোচ্য অংশে ইস্তেফহাম ব্যবহার হলেও উদ্দেশ্য হলো নফীর অর্থ বুঝানো। অর্থাৎ, لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ

قَوْلُهُ تَعَالٰى: لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

নাকেরা : আলোচ্য অংশে خِزْيٌ শব্দটি নাকেরা ব্যবহার করা হয়েছে লাঞ্ছনার ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ, خِزْيٌ؛ هَائِلٌ فَظِيْعٌ لَا يَكَادُ يُوْصَفُ لِهَوْلِهٖ

✪ اَلْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْآيَاتِ : আয়াত থেকে নির্গত বিধি-বিধান

মাসআলা : ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, মসজিদে জিকির করা ও প্রবেশে বাধা দেওয়া যদি কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন ও শরিতসম্মত স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়, তবে তা বৈধ। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা মসজিদের বিনাশসাধন নয়; বরং প্রত্যক্ষ সংস্কার।

ফকীহগণ এ আয়াত প্রসঙ্গে নিম্নের মাসআলাগুলোও উল্লেখ করেছেন–

১. শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা, যেমনি বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাজের ছওয়াব একলক্ষ রাকাত নামাজের সমান এবং মসজিদে নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাসে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সমান। এ নিয়তে উক্ত মসজিদ গুলোতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট ছওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

২. মসজিদে জিকির ও নামাজ বাধা দেওয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা হলো, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামাজ ও তেলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লিদের নামায ও জিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এমনিভাবে নামাজের সময় যখন মুসল্লিরা নফল নামাজ, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকে তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও জিকির করা এবং নামাজিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকহবিদগণ এক নাজায়েজ আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লি না থাকে, তখন সরবে জিকির অথবা তেলাওয়াত করায় কোনো দোষ নেই। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন মুসল্লিরা নামাজ, তাসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্য অথবা কোনো ধর্মীয় কাজে চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

৩. মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে, সবাই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদ বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদে জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদে জনশূন্য হওয়ার অর্থ হলো যে, সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামজির সংখ্যা হ্রাস পায়।

৪. মসজিদের জন্য সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার (إِذْنِ عَام) থাকা।

৫. মসজিদের দরজা ও প্রবেশপথ কোনো ব্যক্তি মালিকানার ভূমিতে না হওয়া।

মসজিদসমূহে তালা লাগানো : মসজিদকে বিনাশ ও ধ্বংস করা এবং নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইবাদত থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া যদিও উক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও নাজায়েজ প্রমাণ হয়; কিন্তু মসজিদের মালামাল হেফাজতের জন্য তালা লাগানো একটি পৃথক ব্যাপার।

مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا বাক্যাটির কারণে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, কাফেরের জন্য মসজিদে প্রবেশের অনুমতি আছে কি নেই?

ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত, কোনো মসজিদেই প্রয়োজন ব্যতীত কাফেরের জন্য প্রবেশের অনুমতি নেই ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে সর্বাবস্থায় কাফেরের প্রবেশ করা নাজায়েজ ও নিষেধ। উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে মুসলমানদের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত, মসজিদসমূহের আদব ও সম্মান রক্ষা করে কাফেররা সকল মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। উক্ত আয়াত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষে দলিল।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهٗ :আয়াতের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : সবচেয়ে বড় জালেম কে?

ক. জিকিরে বাধাদানকারী	খ. সাক্ষ্য গোপনকারী	গ. আল্লাহ সম্বধ্যে মিথ্যারোপকারী
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ. অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয়, তার চাইতে বড় জালেম আর কে? [সূরা বাকারা: ১১৪]	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللهِ. অর্থ : তার চাইতে বড় অত্যাচারী আর কে? যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে। [সূরা বাকারা: ১৪০]	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ. অর্থ: আর যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশনাবলিকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম আর কে? [সূরা আন'আম : ২১] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ৯ টি আয়াত রয়েছে যথা–

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
আন'আম	৯৩, ১৪৪, ১৫৭	আ'রাফ	৩৭
ইউনুস	১৭	হূদ	৮
সাজদা	২২	যুমার	৩২
আস সাফ	৭		

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে ক-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে লোকদেরকে আল্লাহর ঘরে জিকির করা থেকে বাধা প্রদান করে। খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সবচেয়ে বড় অত্যাচারী সে ব্যক্তি, যে নিজের কাছে সাক্ষ্য পোগন রাখে।

পক্ষান্তরে গ-অংশের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সবচেয়ে বড় অত্যাচারী সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তা থেকে বিমুখ হতে চায়। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বিভিন্ন শ্রেণির লোকদেরকে اَظْلَمُ তথা বড় জালেম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে অথচ اَظْلَمُ তথা বড় জালেম তো একজন ব্যক্তি হবে। অতএব, উল্লিখিত আয়াতগুলো বড় জালেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো-

১. উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ ভিন্ন ভিন্ন । যেমন ক-অংশের আয়াতের সারমর্ম হলো-

لَا أَحَدٌ مِنَ الْمَانِعِيْنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ الخ

অর্থাৎ, সৎকর্মসমূহ থেকে বাধা প্রদানকারী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে লোকদেরকে আল্লাহর ঘরে জিকির করা থেকে বাধা প্রদান করে । খ-অংশের আয়াতের সারমর্ম হলো-

لَا أَحَدٌ مِنَ الْكَاتِمِيْنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ .

অর্থাৎ, কোনো কিছু গোপনকারী লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় জালেম হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণিত সাক্ষ্য গোপন করে । এভাবে গ-অংশের আয়াতগুলোর মর্মার্থ হবে এটাই যে-

لَا أَحَدٌ مِنَ الْمُفْتَرِيْنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا.

অর্থাৎ, মিথ্যা অপবাদদাতা লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করতে চায় এবং

لَا أَحَدٌ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَلَا أَحَدٌ مَنَ الْكَاذِبِيْنَ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَلَا اَحَدٌ مَنَ الْمُعْرِضِيْنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهٖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا.

অর্থাৎ, মিথ্যা অভিহিতকারীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে এবং উপেক্ষাকারী ও পরিহারকারী লোকদের মধ্য থেকে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে স্বীয় পালনকর্তার আয়াতসমূহকে উপেক্ষা করে ও এড়িয়ে চলে ।

অতএব, এ প্রদ্ধতি অবলম্বন করলে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের সারমর্মের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় না । কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি اَظْلَمْ হওয়ার প্রকার সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

২. উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে জিকির থেকে বাধাদানকারী, সাক্ষ্য গোপনকারী, আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপকারীকে বড় জালেম বলা হয়েছে । এতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়নি । কেননা একাধিক সংখ্যক লোক একাধিক বিষয়ে (اَظْلَمِيَّتْ) বড় জালেম হওয়ার ক্ষেত্রে সমান হতে পারে । যেমন বলা হয়- لَا أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَ خَالِدٍ যায়েদ, আমর ও খালেদের চেয়ে বড় ফকীহ কেউ নেই) অর্থাৎ, এরা তিনজন সবচেয়ে বড় ফকীহ । পরিভাষায় এ কথার সারমর্ম হয় এটাই যে, এরা তিন ব্যক্তি বড় ফকীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান সমান এবং বাকি সব লোক তাদের তুলনায় নিচু স্তরের । [তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

✪ تَعَارُفُ الْأَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

হোদায়বিয়ার পরিচয় : حُدَيْبِيَّةِ শব্দটির উচ্চারণ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে । কারো মতে, ب ও ة -এর মধ্যবর্তী ي-টি তাশদীদ ও যবরযোগে হবে । কারো মতে, ي-টি তাশদীদবিহীন যবরযোগে হবে । ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথম অভিমতটিকে সঠিক ও দ্বিতয়িটিকে ভুল বলেছেন । তবে কেউ কেউ বলেন, উভয়টিই সঠিক । মদিনাবাসীরা শব্দটিকে তাশদীদসহ এবং ইরাকবাসীরা তাশদীদ ছাড়া উচ্চারণ করে ।

হোদায়বিয়া নামকরণের ব্যাপারে কেউ বলেন, সেখানে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক কূপের নামে স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে । তবে আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, সেখানে অবস্থিত حَدْبَاء নামক বৃক্ষের কারণে হোদয়বিয়া নামকরণ করা হয়েছে ।

হোদায়বিয়া মক্কার নিকটবর্তী একটি এলাকা । এর কিছু অংশ মক্কার হারামের অন্তর্ভুক্ত, আর কিছু অংশ এর বহির্ভূত । তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে, হোদায়বিয়া সম্পূর্ণভাবে মক্কার হারামের অন্তর্ভুক্ত । [মুজামুল বুলদান : খণ্ড২, পৃষ্ঠা ২২৯]

١١٥. وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُوْدُ فِيْ نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِيْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ : ﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ أَيْ الْأَرْضُ كُلُّهَا، لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا، ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا﴾ وَجُوْهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَمْرِهِ ﴿فَثَمَّ﴾ هُنَاكَ ﴿وَجْهُ اللّٰهِ﴾ قِبْلَتُهُ الَّتِيْ رَضِيَهَا. ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ﴾ يَسَعُ فَضْلُهُ كُلَّ شَيْءٍ ﴿عَلِيْمٌ﴾ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ.

১১৫. কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বা সফরে বাহনে আরোহণ করে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নফল নামাজ পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে ইহুদিরা সমালোচনা করলে তার জবাবে নাজিল হয়, আর পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহর অর্থাৎ, সমস্ত পৃথিবী। কেননা, পূর্ব-পশ্চিম পৃথিবীর দুই প্রান্ত। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুসারে নামাজে যেদিকেই তোমরা তোমাদের চেহারা ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক অর্থাৎ, সন্তুষ্টির কেবলা বর্তমান। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বব্যাপী সকল কিছুর উপর তাঁর অনুগ্রহ বিস্তৃত মহাজ্ঞানী সৃষ্টি পরিচালনা সম্পর্কে।

١١٦. ﴿وَقَالُوا﴾ بِوَاوٍ وَبِدُوْنِهَا أَيْ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ : ﴿اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا﴾ قَالَ تَعَالٰى : ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ تَنْزِيْهًا لَهُ عَنْهُ، ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا، وَالْمَلَكِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ، وَعَبَّرَ بِـ«مَا» تَغْلِيْبًا لِمَا لَا يَعْقِلُ. ﴿كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ﴾ مُطِيْعُوْنَ، كُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ، وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ.

১১৬. এবং তারা অর্থাৎ, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে যারা দাবি করে বলে قَالُوْا পরবর্তী واو-সহ (বহুবচনরূপে) এবং পরবর্তী واو ছাড়া (একবচনরূপে) পাঠ রয়েছে। আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি পবিত্র। এসব কিছু থেকে আমরা তার পবিত্রতা ঘোষণা করি। বরং মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস সকলরূপেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আর মালিকানা সন্তান হওয়ার অন্তরায়। এ স্থানে বোধহীন প্রাণীর প্রাধান্য দিয়ে مَا ব্যবহার করা হয়েছে। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। প্রতিটি বস্তুই তার বাধ্যগত যেকোনো বিষয়েই তার নিকট তলব করা হোক না কেন। قَانِتُوْن শব্দটির মধ্যে বোধসম্পন্ন প্রাণীর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : نَزَلَ لَمَّا طَعَنَ .... الخ

শানে নুযূল বর্ণনা : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কিত দুটি বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১. কেবলা পরিবর্তনের সমালোচনা করায় ইহুদিদের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

২. সফরে রাসূল ﷺ-এর বাহনের উপর নফল নামাজের সমালোচনা করায় ইহুদিদের ব্যাপারে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْ الْأَرْضُ كُلُّهَا

পূর্ব-পশ্চিম দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) اَلْأَرْضُ كُلُّهَا ইবারতটুকু দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, اَلْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ দ্বারা শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিক উদ্দেশ্য নয়; বরং পুরো পৃথিবী উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াতে শুধু اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ উল্লেখ করার কারণ হলো, দুটি দিক বর্ণনা করা।

قَوْلُهٗ : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فِيْ الصَّلَاةِ بِأَمْرِهٖ

উহ্য মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা تُوَلُّوْا এর উহ্য মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, أَيْ مَكَانٍ صَرَفْتُمْ وُجُوْهَكُمْ فِيْ الصَّلَاةِ

قَوْلُهٗ : وَقَالُوْا - بِوَاوٍ وَدُوْنَهَا أَيْ اَلْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرٰى

وَقَالُوْا-এর কেরাত ও যমীরের বর্ণনা : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) وَقَالُوْا-এর দুটি কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এখানে وَاو দ্বারা قَالُوْا-এর পরবর্তী وَاو উদ্দেশ্য।

اَي اَلْيَهُوْد এ অংশ দ্বারা قَالُوْا-এর مَرْجِعْ বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা ইহুদি, খ্রিস্টান ও কতিপয় মুশরিক উদ্দেশ্য। ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে দাবি করতো। এবং কতিপয় মুশরিক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা দাবি করতো। কিন্তু মুশরিকদের এ বক্তব্যটি প্রমাণিত নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ: শব্দবিশ্লেষণ

وَجْهٌ : অর্থ- চেহারা, অবয়ব। রূপক অর্থে পূর্ণ সত্তা ও অস্তিত্ব বুঝানো হয়। وَجْهُ اللهِ যখনই উল্লিখিত হবে, তখন সত্তাই উদ্দেশ্য হবে। এখানে এ রূপক অর্থই উদ্দেশ্য।

كُلٌّ : শব্দটি فُعْلٌ ওযনে ইসমে মাফ'উলের অর্থে মুবালাগা প্রকাশক শব্দ। كُلٌّ শব্দটি اِضَافَة ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না এবং مَا الْمَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّة প্রবিষ্ট হলে تَكْرَار-এর অর্থ প্রদান করে। যেমন- كُلَّمَا أَتَاكَ زَيْدٌ أَكْرِمْهُ (যায়েদ যখনই তোমার কাছে আসে, তুমি তার সম্মান করবে।)

আবার এটি نَكِرَة ও مَعْرِفَة-এর صفة-ও হয়ে থাকে এবং তার وَصْف-এর চূড়ান্ত বুঝায়। যেমন- هُوَ اَلْعَالِمُ كُلُّ الْعَالِمِ (সে বড় মহা জ্ঞানী।) আবার نكرة محدودة ও مَعْرِفَة-এর তাকীদস্বরূপও ব্যবহৃত হয়। যেমন- سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ وَاَقَمْنَا حَوْلًا كَامِلًا كُلَّهٗ; কখনো كُلٌّ শব্দটি একবচন, পুরুষবাচকের জন্য হয় এবং অর্থ ধর্তব্য হবে مُضَاف اِلَيْه হিসেবে। যদি نَكِرَة -এর দিকে اِضَافَة হয় তখন অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এর পরে যমীর مفرد مذكر, مفرد مؤنث, تثنية, جمع مذكر, جمع مؤنث সবগুলো আনা যাবে। যেমন উদাহরণসমূহ পর্যায়ক্রমে- كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ بِحِكْمَةٍ" وَ" كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" و" كُلُّ رَفِيْقَيْ كُلُّ رَجُلٍ وَإِنْ هُمَا "و" كُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ وَ كُلُّ مُصِيْبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا; আর যদি مَعْرِفَة এর দিকে اِضَافَة হয় তখন শব্দ এবং অর্থ উভয় হিসেবেই আনা যাবে। যেমন- كُلُّ الْقَوْمِ حَضَرَ، كُلُّ الْقَوْمِ كُلُّ حَضَرٍ "وَ" كُلُّ حَضَرُوْا আর اِضَافَة না হওয়া অবস্থায়ও শব্দ এবং অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। যেমন- مَا جَاءَ كُلُّ الْقَوْمِ সকলে আসেনি, কিছু এসেছে আর কিছু আসেনি। আর যদি كُلٌّ শব্দটি যদি نَفْيْ এর পরে পতিত হয় তখন কিছু সংখ্যকের نَفْى হবে। যেমন- كُلٌّ প্রথমে হয় এবং نَفْيْ পরে হয় তখন সকলের نَفْى হবে। যেমন- كُلُّهُمْ لَمْ يَقُوْمُوْا অর্থাৎ কেউই দাঁড়ায়নি। كُلٌّ এর পূর্বে اَلْ প্রবেশ করে না। তবে যদি مَضَاف اِلَيْه এর পরিবর্তে হয় অথবা উদ্দেশ্য كُلٌّ শব্দটিই হয় তখন اَلْ আনা হবে। যেমন- اَلْكُلُّ لِإِحَاطَةِ الْأَفْرَادِ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ: বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ..... وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

وَاو হরফে আতফ لِلّٰهِ জার-মাজরূর মিলে খবরে মুকাদ্দাম اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ মাতূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মুবতাদা মুয়াখখার। فَأَيْنَمَا-এর মধ্যে فاء হরফে ইস্তিনাফিয়া اَيْنَمَا ইসমে শর্ত تُوَلُّوْا ফে'ল যমীর ফায়েল, ফে'ল ও ফায়েল মিলে শর্ত فَاء জাযাইয়্যাহ ثَمَّ যরফে মাকান উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম وَجْهُ اللهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলে মুবতাদা মুয়াখখার, মুবতাদা মুয়াখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জাওয়াবে শর্ত। إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-এর মধ্যে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللهُ ইসমে اِنَّ আর وَاسِعٌ عَلِيْمٌ হলো খবরে اِنَّ;

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : كُلٌّ لَهٗ قَانِتُوْنَ

قَانِتُوْنَ শব্দের লিখনশৈলী : ১১৬ নং আয়াতে উল্লিখিত قَانِتُوْنَ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ق বর্ণের পর আলিফযোগে قَانِتُوْنَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ق বর্ণের উপর খাড়া যবর যোগে قٰنِتُوْنَ লিখিত আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ..... وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

দিক পূজার খণ্ডন : পৌত্তলিকদের ধারণা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু দেহধারী, সুতরাং তার অস্তিত্ব কোনো নির্দিষ্ট দিকে থাকা অনিবার্য। আর সূর্যদেবতার মর্যাদা সব পৌত্তলিক ধর্মেই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য ছিল। তাই সূর্য উদয় হওয়ার দিকটিকে সাধারণভাবে পবিত্র মনে করা হতো এবং সেদিকে অভিমুখী হয়ে পূজা করা হতো।

মুশরিকদের এ চিন্তাধারা কালক্রমে আহলে কিতাবের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম যেহেতু আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতে সমকালীন প্রভাবশালী ও প্রচলিত রোমান ধর্মের দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দিয়েছিল, এ কারণে এ ধর্মানুসারীরাও প্রকাশ্যে পূর্ব দিকের অভিমুখী হয়ে পূজা করতো। একইভাবে ইহুদিদের কোনো কোনো দলও পূর্ব দিকে ফিরে ইবাদত করতে লাগল। আর কোনো কোনো দল পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম অভিমুখী হলো।

খ্রিস্টধর্মে আজও পূর্বমুখিতার একটি ধর্মীয় পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে এবং গির্জা ইত্যাদি পূর্বমুখীই নির্মাণ করা হয়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি নির্দিষ্ট দিককে পবিত্র মনে করার এ ভ্রান্ত বিশ্বাসটি খণ্ডন করেছে। [তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯]

কেবলার ব্যাপারে কতিপয় মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য : কোনো কোনো মুফাসসির فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে নফল নামাজের বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাজেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাজরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ না থাকলে সে অবস্থায়ই নামাজ পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাজির জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাজি অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকেই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামাজ আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রামাণিত হয়, তবুও তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে না।

আল্লাহ তা'আলা সর্বদিকে বিরাজমান : আল্লাহ তা'আলা স্থান-কাল পাত্রের পরিবেষ্টন ও দিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। তাঁর পবিত্র সত্তা সবদিকে বিদ্যমান। যে দিকেই মুখ ঘুরাবে, তুমি তাকে পাবে। তাই وَاسِعٌ গুনবাচক নাম দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সর্বত্র ব্যাপক; বিশেষ কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। অথবা তিনি নিজেই অসীম-অপরিসীম। ফলে কোনো স্থান-পাত্র তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তবে বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান বা দিককে কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর عَلِيْمٌ গুণবাচক নাম দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, তিনি বান্দাদের অন্তরের অবস্থা ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তাদের জন্য কোনটি উপকারী, কোনটি অপকারী তাও তিনি পূর্ণ অবগত। সে হিসেবেই তিনি বিধান দিয়ে থাকেন। তিনি তার পূর্ণ জ্ঞান ও পরিপূর্ণ কুশলতায় যে দিককে ইচ্ছা কেবলা সাব্যস্ত করতে পারেন। তিনি উম্মতের ঐক্য স্থাপনের জন্য কেবলা স্থির করেছেন। তাতে কোনো দিকের পবিত্র হওয়ার কোনো দখল নেই।

কাবা অভিমুখী হওয়া ও মূর্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য : মুসলমানগণ শুধু আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করেন। কোনো মসজিদ, বায়তুল্লাহ কিংবা বায়তুল মুকাদ্দাসের উপাসনা করেন না; বরং মসজিদ হচ্ছে ইবাদতে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। আর সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে সমবেত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা একটি স্থানকে কেবলা নির্দিষ্ট করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের যোগ্য ও দীনের কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত।

মোটকথা, মুসলমানগণ মসজিদ বা কাবার পূজারী- এ ধরনের সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এ ধরনের আপত্তি ভিত্তিহীন। [কামালাইন: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬]

আয়াতের নির্দেশনাসমূহ : اَيْنَمَا শব্দটিকে যদি مَفْعُوْلٍ بِهٖ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এ আয়াতকে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দ্বারা রহিত মানতে হবে। ইমাম যাহিদ (র.) বলেন যে, পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম এ আয়াতটি রহিত হয়েছে। اِتْقَان-এর গ্রন্থকার এবং কাজী বায়যাভী (র.)-ও এ মত পোষণ করেছেন। অথবা আয়াতটি বাহনের উপর নফল আদায় করা বা কেবলার দিক সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আর যদি اَيْنَمَا শব্দটিকে مَفْعُوْلٍ فِيْهِ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এ আয়াতকে রহিত করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ .....

আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র : ইহুদিরা হযরত উযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মহান আল্লাহ তা'আলার পুত্র দাবি করে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তাঁর সত্তা এসব থেকে পবিত্র। সকলেই তাঁর অধীনস্থ ও সৃষ্টি। পাশাপাশি এ আয়াতে খ্রিস্টবাদীদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করার পরেও তাঁর সঙ্গে নির্বোধ মানুষের ন্যায় এ আত্মীয়তা সম্বন্ধের দাবি করে চলছে। আল্লাহ মাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের ধ্যানধারণা কতই না নীচ ও গর্হিত।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ

সকলেই সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্যকারী : আল্লাহ তা'আলার বিধানের অধীনতা ও তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি কারোরই নেই। চাই সে মুমিন ও কাফের, উঁচু-নিচু, ছোট-বড় প্রাণধারী ও নিষ্প্রাণ যাই হোক। [তাফসীরে কাশশাফ]

قُنُوْت-এর অর্থ হলো, মুখ, দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দেওয়া। মোটকথা كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ বলে সব মুশরিক ও অংশীবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে যে, তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র মানছ, তিনি আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা বরং সকলেই তাঁর শাসনাধীন। [তাফসীরে মাজেদী: পৃষ্ঠা ২১২]

আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্তের দাবি এবং তা প্রত্যাখ্যান : আয়াত وَقَالُوْا-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্তের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে চারটি পন্থায় বাতিল করা হয়েছে।

প্রথম لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ দ্বারা। দ্বিতীয় كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ দ্বারা। তৃতীয় بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ দ্বারা। চতুর্থ وَإِذَا قَضٰى اَمْرًا দ্বারা। আর এ চারটি বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট হওয়া বিরোধীদের মতেও স্বীকৃত। তাই তাদের পুত্রত্বের দাবি বাতিল হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তান থাকা যুক্তির দিক দিয়েও বাতিল। কেননা সেটা দু'অবস্থা থেকে খালি না। হয়তো সন্তান সে একই জাতের হবে। তা না হলে ভিন্ন জাতের হবে। সন্তান পিতার জাত থেকে ভিন্ন হওয়া তো দূষণীয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত দোষ থেকে পবিত্র। তাই আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন জাতের সন্তান থেকে পবিত্র। سُبْحَانَهٗ শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আর সন্তান এক জাতের হওয়া অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কোনো জাত নেই। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলি যা তার জাতের জন্য অবধারিত তা তার সাথে বিশিষ্ট। অন্য কারো মধ্যে সে গুণাবলি পাওয়া যায় না। আর لَازِمْ-এর নফী مَلْزُوْم-এর নফীকে চায়। অর্থাৎ সফলতার নফী সফলতা লাভকারীর নফীর প্রমাণ হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এমন কোনো সত্তা নেই যে, তার মতো বা তার সত্তার অংশীদার হতে পারে। আর যখন তাঁর মতো কিছুই নেই, তখন তাঁর সন্তানাদিও নেই। [কামালাইন: খণ্ড ১,পৃষ্ঠা ১২৮]

আকিদায়ে ইবনিয়াতের সূচনা : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য লোকেরা প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন উপমা পেশ করতো। কোথাও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করতো, কোথাও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সামনে রেখে মনের দাবি প্রকাশ করতো। এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে পরবর্তী লোকেরা উক্ত শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছে এবং সে ভিত্তির উপর نَحْنُ اَبْنَاءُ اللهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ দাবি করতে শুরু করেছে। ইসলাম সে সকল ছিদ্রকে বন্ধ করার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রমাণাদির শক্তির সাথে সেই বাতিলের ভিত্তি ও শিকড়ের উপর আঘাত করেছে এবং সে আকিদায়ে ইবনিয়াতের মূল শিকড় উৎপাটন করেছে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ : سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى : سُبْحَانَهٗ

জুমলায়ে মুতারিযা : আলোচ্য অংশটি আয়াতে জুমলায়ে মুতারিযা হিসেবে এসেছে। এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে বলে যারা দাবি করে তাদের দাবির তাৎক্ষণিকভাবে খণ্ডন করা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

তাগলীব : আলোচ্য অংশে আকেলদের উপর গায়রে আকেলদের প্রাধান্য দিয়ে ইসমে মাওসূল হিসেবে مَا ব্যবহার হয়েছে। আর غَيْرِ عَاقِلْ-এর তাগলীবের কারণ হলো, مِلْكِيَّةْ-এর পূর্ণতা প্রকাশ পায় كَثْرَةُ الْخَلْقِ দ্বারা। আর অধিকাংশ সৃষ্টিই হলো غَيْرِ عَاقِلْ;

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ

তাগলীব : আলোচ্য অংশে تَغْلِيْب প্রয়োগ করা হয়েছে। تَغْلِيْب হলো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে একাধিক শ্রেণির মাঝে একটি শ্রেণিকে প্রাধাণ্য দেওয়া। যেমন আলোচ্য আয়াতে قَانِتُوْنَ-এর মাঝে جَمْعُ الْعُقَلَاءِ ব্যবহারের দ্বারা বোধশক্তিসম্পন্ন সত্তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ আনুগত্যের পূর্ণতা আকেলদের মাঝে বেশি প্রকাশ পায়।

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَحُلُّهٗ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : ক. মাশরিক ও মাগরিব তথা পূর্ব ও পশ্চিমের সংখ্যা কত?

ক. একটি	খ. দুটি	গ. দুয়ের অধিক
وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ অর্থ: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ তা'আলারই। অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান। [সূরা বাকারা, আয়াত- ১১৫] এ আয়াতের সমর্থনে ২টি আয়াত রয়েছে। যথা-	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ অর্থ: তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। [সূরা আর রহমান : আয়াত ১৭]	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. অর্থ : তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের। [সূরা সাফফাত: আয়াত -৫] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১টি আয়াত রয়েছে। যথা- সূরা মাআরিজ, আয়াত- ৪০

সূরা	আয়াত
শুয়ারা	২৮
মুযযাম্মিল	৯

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াতে মাশরিক ও মাগরিবকে ক-অংশের একবচনের শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, মাশরিক ও মাগরিবের সংখ্যা একটি।

পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাশরিক ও মাগরিব দুটি দুটি। কারণ খ-অংশের আয়াতে শব্দদ্বয়কে দ্বিবচন শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর গ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাশরিক ও মাগরিব দুয়ের অধিক। সুতরাং আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ক-অংশের আয়াতে مَشْرِقْ ও مَغْرِبْ দ্বারা جِنْسِ مشْرِقْ ও جِنْسِ مَغْرِبْ তথা পূর্ব ও পশ্চিম দিক উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, যা কম ও বেশ সব সংখ্যা বুঝায়। অর্থাৎ মাশরিক ও মাগরিবের সবকটি সংখ্যা বুঝাবে।

এভাবে খ-অংশে সূরা আর রহমানের ১৭নং আয়াতে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মাশরিক ও মাগরিবের কথা বলা হয়েছে। এজন্য সেখানে দ্বিবচনের রূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা চন্দ্র ও সূর্যের মাশরিক ও মাগরিবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য দ্বিবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

গ-অংশের মধ্যে প্রত্যেক দিবসের মাশরিক ও মাগরিব বুঝানো হয়েছে। এজন্য বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা প্রতিদিন দৈনিক মাশরিক ও মাগরিব তথা উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বছরের দিনসমূহের সংখ্যা মোতাবেক তিনশ ষাটটি মাশরিক এবং তিনশ ষাটটি মাগরিব হয়।

অথবা উল্লিখিত মাশরিক ও মাগরিব থেকে তারকারাজির উদয় ও অস্ত বুঝানো হয়েছে। এজন্য বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

বিষয়: খ. নামাজে কেবলামুখী হওয়া অত্যাবশ্যক কি না?

ক. অত্যাবশ্যক নয়	খ. অত্যাবশ্যক
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ অর্থ: অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান। [সূরা বাকারা: আয়াত ১১৫]	وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. অর্থ: তোমরা যেখানেই থাক, সে দিকে মুখ করো। [সূরা বাকারা: আয়াত ১৪৪-১৫০]

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ তা'আলার সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসল্লির জন্য নামাজরত অবস্থায় কেবলামুখী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, কেবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করা জরুরি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব দেওয়া যায়।

১. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ এ নির্দেশ সেসব লোকের জন্য, যারা কেবলা নির্ণয়ে সংকটে পড়েছে। আর এ ধরনের লোক চিন্তাভাবনা করে যে কোনো একদিকে ফিরে নামাজ আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত দিকটি কেবলার দিকের পরিপন্থী হয়। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক যুদ্ধে লোকেরা কেবলার দিক নির্ণয় করতে অক্ষম হয়ে গেলেন। ফলে তারা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর যখন সকাল হলো, তখন প্রকাশ পেল যে, কেবলা পরিপন্থী দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ أَيْ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْكُمُ الْقِبْلَةُ وَإِذَا لَمْ تَشْتَبِهِ الْقِبْلَةُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

[রুহুল মা'আনী]

২. উপর্যুক্ত ক-অংশের আয়াত রহিত হয়ে গেছে খ-অংশের আয়াতের মাধ্যমে। যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে কোনো দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা বৈধ ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় এবং নতুন বিধান প্রচলিত হয় যে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন নামাজরত অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। [আল-ইতকান]

বিষয় : গ. সৃষ্টজগতের সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য।

ক. সাদৃশ্য আছে	খ. সাদৃশ্য নেই
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ . অর্থ: অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সেখানেই আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান। [সূরা বাকারা: আয়াত ১১৫] এ আয়াতের সমর্থনে আরো ১৮ টি আয়াত রয়েছে। যথা–	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থ: তাঁর অনুরূপ কোনো বস্তু নেই। [সূরা শুরা: আয়াত ১১]

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
রুম	৩৮-৩৯	আর রহমান	২৭
আন নাহল	২০	মায়েদা	৬৪
ইয়াসীন	৮৩	ফাতাহ	১০
যুমার	৬৭	হাদীদ	২৯
মূলক	১	আন'আম	১৫৮
আম্বিয়া	৪৪	ফুরকান	২৩,৫৯
ফাজর	২২	আরাফ	৪৪
ইউনুস	৩	ত্বাহা	৫

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ক-অংশের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার মুখমণ্ডল ও হাত আল্লাহ তা'আলার আগমন, আরশের উপর উপবেশন করার কথা পাওয়া যায়।

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টিজগতের মতো আল্লাহ তা'আলারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। আর মাখলুকের মতো তিনিও আসা-যাওয়া ও উপবেশন করেন। পক্ষান্তরে খ-অংশের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাকে কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা যায় না। কেননা তাঁর সমকক্ষ কোনো জিনিসই বিদ্যমান নেই এবং বিদ্যমান হবেও না। এজন্য তিনি দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সৃষ্টবস্তুর সদৃশ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র। অতএব, খ-অংশের আয়াতখানা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমে একথা জানা থাকতে হবে যে, যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে, সেসব আয়াতকে آيَاتٌ مُتَشَابِهَاتٌ বলা হয়। এসব আয়াতের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে দুটি মাসলাক (মত) রয়েছে। ১. مَسْلَكِ تَفْوِيْض ২. مَسْلَكِ تَأْوِيْل

১. মাসলাকে তাফভীজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এসব আয়াতের সারমর্ম আল্লাহ তা'আলার ইলমের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এটা বলা হবে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এসব আয়াতের তাৎপর্য ও উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে অবগত আছেন। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোনো তাবীল ও তাফসীর করতে সক্ষম নই। কেননা আমাদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা অসম্পূর্ণ ও সীমিত। সুতরাং যদি আমরা স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা ও রায় মোতাবেক সেসব আয়াতের কোনো তাফসীর বা তাবীল করি, তাহলে হতে পারে সেটি আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট বস্তুর পরিপন্থী হয়ে যাবে। এজন্য আয়াতগুলোর তাফসীর ও ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে। এ মাসলাক অবলম্বন করেছেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান, সাঈদ ইবনে মুয়ায মারওয়াযী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবূ মুয়ায খালেদ ইবনে সোলায়মান, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী ও কাজী আবুল আলা (র.)-সহ আরও অনেকে। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ কিতাবুল ইতেকাদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন–

لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَّنْطِقَ فِيْ ذَاتِ اللهِ بِشَيْءٍ وَلٰكِنْ يَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يَقُوْلُ فِيْهِ بِرَأْيِهِ شَيْئًا تَبَارَكَ اللهُ تَعَالٰى رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সত্তার ব্যাপারে কিছু বলা কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত হবে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেসমস্ত গুণাবলির মাধ্যমে নিজ সত্তাকে বর্ণনা করেছেন, সেসমস্ত গুণাবলির মাধ্যমে তার বর্ণনা তুলে ধরতে হবে। নিজ ধারণাপ্রসূত মতামতের মাধ্যমে কিছুই বলা যাবে না; বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা বরকতময় হোন। এভাবে হাফেজ ইবেন হাজার আসকালানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ তাঁর পরবর্তী যে তিনটি প্রজন্মকে خَيْرُ الْقُرُوْنِ বলেছেন, সে তিন প্রজন্মের সকল আলেম প্রথম মাসলাকের ব্যাপারে একমত।

শেখ আবুল মাআলী আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ রিসালায়ে নিজামিয়ার মধ্যে এ মাসলাকের কথাই উল্লেখ করেছেন। বিশেষজ্ঞ সুফীগণও এ মতকে পছন্দ করেছেন।

২. দ্বিতীয় মাসলাক হলো মাসলাকে তাবীল। আর তাবীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতে মোতাশাবিহাতের (রূপকার্থবিশিষ্টি আয়াতসমূহের) এমন সারমর্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বর্ণনা করা, যা আল্লাহ তা'আলার শান ও বড়ত্বের অনুকূলে হয়ে যায়। যার দ্বারা আল্লাহকে সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা বা তুলনা দেওয়া অত্যাবশ্যক হয় না। এ মাসলাক পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। ইমামুল হারামাইন শেখ আবুল মা'আলী আব্দুল মালেক ইবনে আবদিল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল ইরশাদ-এর মধ্যে মাসলাকে তাবীলকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেদিকে ধাবিত হয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালের আলেমগণের হৃদয়ে রূপকার্থবিশিষ্ট আয়াত বা শব্দাবলির এমন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের বিকাশ ঘটালেন, যা মহান আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের হুবহু উপযোগী হয়ে যায় এবং সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্য থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান। অতএব, উল্লিখিত রূপকার্থসম্পন্ন আয়াতসমূহের মধ্যে এ পদ্ধতিতে তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রথমোক্ত ৫ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার চেহারা থেকে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সত্তা। অনুরূপভাবে চেহারা বলে সত্তা উদ্দেশ্য নেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত পরিভাষায় রয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয়ে বলল যে, আজ থেকে তুমি আমাকে তোমার চেহারা দেখাবে না। এ কথার সারমর্ম এ নয় যে, চেহারা ব্যতীত শরীরের বাকি অংশ দেখাতে পারবে; বরং উক্ত কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও, আমার ধারে-কাছেও আসবে না। সুতরাং এ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে وَجْهٌ (চেহারা) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সত্তা (ذَات)।

এভাবে যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার হাত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে يَدٌ ও يَمِيْنٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সাহায্য ও সামর্থ্য। সুতরাং يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ-এর সারমর্ম হলো- قُوَّةُ اللهِ وَ نُصْرَتُهٗ فَوْقَ قُوَّتِهِمْ وَ نُصْرَتِهِمْ এবং مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ–এর মধ্যে يَمِيْن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য قُدْرَة (শক্তি) অর্থাৎ, আকাশ আল্লাহ তা'আলার কুদরতে গুটিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ-এর মধ্যে بَسْط يَدَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَخَاوَات (উদারতা বা দানশীলতা)। যেমন– দানশীল লোক সম্পর্কে বলা হয় যে, তার উভয় হাত উন্মুক্ত। অর্থাৎ, সে দানশীল। অথবা يَدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। তখন يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা'আলার উভয় নিয়ামত। অর্থাৎ, ইহকালীন ও পরকালীন নিয়ামতসমূহ বিস্তৃত ও ব্যাপক। অথবা এটা উদ্দেশ্য হবে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ বিশাল ও প্রাচুর্যবহ।

এভাবে যেসব আয়াতে جَاءَ رَبُّكَ ও يَأْتِيْ رَبُّكَ রয়েছে, সেখানে رَبُّكَ শব্দের পূর্বে اَمْر শব্দটি مُضَاف হিসেবে উহ্য আছে। সুতরাং এখানে আগমন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের আগমন। অনুরূপভাবে যে আয়াতে اَلْأَرْضُ রয়েছে, সেখানে শব্দের প্রারম্ভে أَمْرُ শব্দটি مُضَاف হিসেবে উহ্য আছে এবং যে আয়াতে قَدَّمْنَا রয়েছে, সেখানে এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য قَصَدْنَا অর্থাৎ, قَصَدْنَا إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ; এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। এভাবে যেসব আয়াতে اِسْتِوَاء রয়েছে, সেখানে শব্দের মর্মার্থ হলো اسْتِيْلَاء ও غَلَبَة (নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্তৃত্ব চালানো।) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকেন। কেউ তাঁকে পরাজিত করার কোনো ক্ষমতা রাখে না। তিনি সবসময় বিজয়ী থাকেন। অথবা اِسْتِوَاء শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য مِلْكِيَة তথা মালিকানা। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হলেন আরশের মালিক। এটাকে اِسْتِوَاء ও جُلُوْس শব্দ দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন আল্লামা যামাখশরী (রহ)-ও এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলেন– فُلَانٌ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (অমুক ব্যক্তি রাজসিংহাসনে বসেছেন), তখন এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, অমুক ব্যক্তি রাজসিংহাসনের মালিক হয়েছেন। এর দ্বারা কেউ একথা উদ্দেশ্য নেয় না যে, অমুক ব্যক্তি রাজসিংহাসনে বসে আছেন। কারণ এ কথা সে সময়ও বলা যায় যখন রাজা রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন না; বরং অন্যত্র ভ্রমণে চলে যান। সুতরাং এবার বুঝে আসল যে, اِسْتَوٰى ও جُلُوْس দ্বারা উপবেশন উদ্দেশ্য নয়; বরং মালিক হওয়াই উদ্দেশ্য, অথবা اِسْتَوٰى শব্দের অর্থ عَلَا গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ عَلَا عَلَى الْعَرْشِ তখনো উক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর উপবেশন করা সাব্যস্ত হবে না।

অতএব, উল্লিখিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর আল্লাহ তা'য়ালার দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তিনি সৃষ্টিজগতের সদৃশ হওয়া রহিত হয়ে যায়। ফলে ক-অংশের আয়াত খ-অংশের আয়াতের সাথে কোনোরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় না। [তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

١١٧. ﴿بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ مُوْجِدُهُمَا لَا عَلٰى مِثَالٍ سَبَقَ ﴿وَإِذَا قَضٰى﴾ أَرَادَ ﴿أَمْرًا﴾ أَيْ إِيْجَادَهُ ﴿فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ أَيْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ.

১১৭. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা কোনো পূর্ব নমুনা ছাড়াই এতদুভয়ের অস্তিত্ব দানকারী এবং যখন তিনি কিছু করতে তার অস্তিত্ব দানের সিদ্ধান্ত করেন ইচ্ছা করেন শুধু বলেন হও তখনই তা হয়ে যায়। يَكُوْن ক্রিয়াটি উহ্য মুবতাদা هُوَ-এর خَبَر; অপর এক কেরাতে তা جَوَابُ الْأَمْرِ হিসেবে نَصَبْ-সহ রয়েছে।

١١٨. ﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ﴿لَوْلَا﴾ هَلَّا ﴿يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ﴾ بِأَنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ﴿أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ﴾ مِمَّا اقْتَرَحْنَاهُ عَلٰى صِدْقِكَ ﴿كَذٰلِكَ﴾ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ ﴿قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ مِنْ كُفَّارِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ لِأَنْبِيَائِهِمْ ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ مِنَ التَّعَنُّتِ وَطَلَبِ الْآيَاتِ ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ﴾ فِي الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهَا آيَاتٌ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا فَاقْتِرَاحُ آيَةٍ مَعَهَا تَعَنُّتٌ.

১১৮. এবং যারা কিছু জানে না, তারা বলে অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, কেন لَوْلَا শব্দটি هَلَّا-এর অর্থে। আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না যে, তুমি তাঁর রাসূল অথবা আমাদের নিকট নিদর্শন আসে না? তোমার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আমরা যেমন চাই এভাবে তারা যেমন বলে তাদের পূর্ববর্তীগণও অর্থাৎ, অতীত জাতিসমূহের কাফেররা নবীগণকে ধৃষ্টতামূলক এবং মু'জিযার দাবি সম্বলিত কথা বলত। কুফরি ও অবাধ্যতার বিষয়ে তাদের অন্তর একই রকম। এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য অর্থাৎ, যারা জানে যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য নিদর্শনাবলি স্পষ্টভাবে বিবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং এরপরও নিদর্শনের দাবি করা অন্যায় জেদ ছাড়া কিছুই নয়।

١١٩. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿بِالْحَقِّ﴾ بِالْهُدٰى ﴿بَشِيْرًا﴾ مَنْ أَجَابَ إِلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ﴿وَنَذِيْرًا﴾ مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ بِالنَّارِ ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ﴾ النَّارِ أَيِ الْكُفَّارِ مَا لَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوْا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِجَزْمِ تَسْأَلُ نَهْيًا.

১১৯. হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে সত্যসহ অর্থাৎ, হেদায়েতসহ যারা তা গ্রহণ করে তাদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা ও যারা তা গ্রহণ করে না তাদের জন্য জাহান্নামের সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। জাহীম জাহান্নামবাসীদের অর্থাৎ, কাফেরদের সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না যে, তারা কেন ঈমান আনেনি। আপনার দায়িত্ব কেবল সত্য পৌঁছিয়ে দেওয়া। অপর এক কেরাতে لَاتُسْئَلْ ক্রিয়াটি জযমসহ রয়েছে نَهْي হিসেবে।

١٢٠ ﴿وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ﴾ دِيْنَهُمْ ﴿قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ﴾ أَيِ الْإِسْلَامَ ﴿هُوَ الْهُدٰى ؕ﴾ وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ ﴿وَلَئِنِ﴾ لَامُ قَسَمٍ ﴿اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ﴾ اَلَّتِيْ يَدْعُوْنَكَ إِلَيْهَا فَرْضًا ﴿بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ﴾ اَلْوَحْيِ مِنَ اللّٰهِ ﴿مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ﴾ يَحْفَظُكَ ﴿وَّلَا نَصِيْرٍ ۙ﴾ يَمْنَعُكَ مِنْهُ.

১২০. ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের ধর্মাদর্শের অনুসারী হন। বলুন, আল্লাহ তা'আলার পথ-নির্দেশই অর্থাৎ, ইসলামই প্রকৃত পথ-নির্দেশ। এটা ব্যতীত আর সবকিছু গোমরাহি। আর যদি لام-টি কসমের জন্য জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ওহী আসার পর আপনি উদাহরণত তাদের খেয়ালখুশির যে দিকে তারা আপনাকে আহ্বান করছে এর অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ তা'আলার মোকাবিলায় আপনার কোনো অভিভাবক হবে না যে আপনাকে রক্ষা করবে এবং কোনো সাহায্যকারীও হবে না যে আপনাকে তাঁর আজাব থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَ إِذَا قَضٰى . أَرَادَ

قَضٰى-এর অর্থ বর্ণনা : قَضٰى-এর শাব্দিক অর্থ হলো إِتْمَامُ الشَّيْءِ তথা কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণ করা। চাই সেটা قَوْلًا হোক। যেমন- وَقَضٰى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوْا ; কিংবা فِعْلًا হোক। যেমন- فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ; এখন কথা হলো, إِتْمَامُ الشَّيْءِ-এর পরে আবার كُنْ বলা সঠিক নয়। কেননা, এতে تَحْصِيْلُ الْحَاصِلِ আবশ্যক হয়। কেননা, মুখাতাব হওয়ার জন্য কোনো বস্তুর বিদ্যমান থাকা জরুরি। অন্যথায় অনুপস্থিত ও অবিদ্যমান বস্তুকে সম্বোধন করা আবশ্যক হয়, যা সঠিক নয়। মুফাসসির (র.) এ আপত্তি নিরসনের জন্য বলেছেন, قَضٰى শব্দটি أَرَادَ-এর অর্থে।

قَوْلُهٗ : أَيْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَ فِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ

فَيَكُوْنُ- এর কেরাত ও তারকীব বর্ণনা : আলোচ্য অংশটির উদ্দেশ্য হলো, فَيَكُوْنُ শব্দটির ن বর্ণে পেশযোগে কেরাত রয়েছে। সেক্ষেত্রে এটি জুমলায়ে ইসমিয়া হবে এবং মুবতাদা উহ্য থাকবে। মূল ইবারত হবে- فَهُوَ يَكُوْنُ; আর অপর একটি কেরাতে فَيَكُوْنَ আমরের জওয়াব হিসেবে নসবসহও রয়েছে। সে সুরতে فَاءِ سَبَبِيَّة-এর পর اَنْ উহ্য থাকবে।

قَوْلُهٗ : لَا يَعْلَمُوْنَ . أَيْ كُفَّارِ مَكَّةَ

كُفَّارِ مَكَّةَ বলে ব্যাখ্যা করার কারণ : এ সূরাটি মাদানী সূরা হওয়ার পরও اَلَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ-এর তাফসীরে كُفَّارِ مَكَّةَ বলার কারণ কয়েকটি হতে পারে-

১. পূর্ণ সূরা মাদানী, কিন্তু এ আয়াতটি মক্কী। তাই মুফাসসির (র.) كُفَّارِ مَكَّةَ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এ জবাবটি দূরবর্তী।
২. মক্কার কাফেররা রাসূল ﷺ-এর কাছে মদিনায় চিঠি বা দূত পাঠিয়ে প্রশ্ন করার কারণে মুফাসসির (র.) كُفَّارِ مَكَّةَ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

قَوْلُهٗ : وَ فِيْ قِرَاءَةٍ بِجَزْمِ تَسْأَلُ نَهْيًا

لَا تَسْئَلُ-এর কেরাতের পার্থক্য : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এক কেরাতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل-এর وَاحِدِ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ لَا تَسْأَلْ রয়েছে। অর্থাৎ, আপনি জাহান্নামিদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তাদের অবস্থা হবে খুবই মন্দ।

لَا تَسْأَلُ-এর স্থলে نَهْيْ حَاضِرْ-এর وَاحِدِ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ

قَوْلُهٗ : هُوَ الْهُدٰى . وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ

حَصْرٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত : আলোচ্য অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) ضَمِيْرُ الْفَصْلِ এবং আলিফ-লাম اَلْمَعْرِفَةُ-এর কারণে সৃষ্ট قَصَر-এর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

بَدِيْعٌ : এটি مُبْدِعٌ-এর সমার্থক আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। এর অর্থ হলো নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী। একই بَدِعٌ শব্দটি হলো সিফাতে মুশাব্বাহা। এটি اَلْإِبْدَاعُ থেকে ইসমে ফায়েলের অর্থে হতে পারে, আবার ইসমে মাফ'উলের অর্থেও হতে পারে। যেমন কুরআনে রয়েছে- قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِّنَ الرُّسُلِ;

مِلَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে مِلَلٌ; অর্থ- পথ, ধর্ম, মতবাদ, গোষ্ঠী। مِلَّةٌ শব্দটির মূল অর্থ হলো, অনুসৃত পন্থা। পরবর্তীতে আসমানি ধর্ম ও শরিয়তের অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। একই ধরনের অর্থে دِيْنٌ শব্দটিও ব্যবহার হয়। তবে উভয় শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলার দিকে ও উম্মতের একক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করলে دِيْن ব্যবহার হয়। যেমন- دِيْنُ اللهِ (আল্লাহ তা'আলার দীন)। دِيْنُ زَيْدٍ (যায়েদের দীন)। আর مِلَّة শব্দটি ব্যবহার হয় নবী ও তার অনুসারীদের সমষ্টির দিকে সম্বন্ধ করে। যেমন- مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ তথা ইবরাহীমি মিল্লাত। [রাগিব]

আলোচ্য আয়াতে مِلَّةَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিজস্ব মনগড়া মতবাদ।

أَهْوَاءٌ : শব্দটি বহুবচন। একবচনে هَوًى মূলবর্ণ (ه.و.ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ- কামনা, ইচ্ছা, চাহিদা। এটি ইসমে মাসদার। ইসমে মাফ'উলের অর্থে এসেছে। هَوًى শব্দটি ভালো-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। তবে মন্দ ও অপ্রশংসিত ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি। আলোচ্য আয়াতে أَهْوَاء দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব মতধারা ও ধ্যান-ধারণা উদ্দেশ্য, যার ভিত্তি জ্ঞান ও বাস্তব সত্যের পরিবর্তে প্রবৃত্তির চাহিদা ও খেয়ালখুশির উপরে। [বায়যাভী]

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ..... لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ

واو ইস্তিনাফিয়া قَالَ ফে'ল اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - مَوْصُوْل ও صِلَة মিলে ফায়েল। لَوْلَا হরফে তাহদীদ هَلَّا-এর অর্থে। يُكَلِّمُنَا ফে'ল نَا মাফ'উলে মুকাদ্দাম اَللهُ ফায়েল أَو হরফে আতফ تَأْتِيْنَا ফে'ল, نَا মাফ'উলে মুকাদ্দাম اٰيَةٌ ফায়েল, জুমলা হয়ে আতফ হয়েছে يُكَلِّمُنَا-এর উপর। كَذٰلِكَ জার-মাজরূর মিলে উহ্য মাফ'উলে মুতলাকের সিফাত। قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-এর قَالَ ফে'ল اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ মওসূল ও সেলা মিলে ফায়েল مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো كَذٰلِكَ-এর বদল। تَشَابَهَتْ ফে'ল ফায়েল قَدْ بَيَّنَّا ফে'ল ضَمِيْر ফায়েল اَلْاٰيَات মাফ'উলে বিহী لِقَوْمٍ জার-মাজরূর মিলে مُتَعَلِّق بَيَّنَّا-এর সাথে يُوْقِنُوْنَ হলো জুমলা হয়ে সিফাত।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ

فَيَكُوْن শব্দের কেরাত : ১১৭নং আয়াতে উল্লিখিত فَيَكُوْنُ শব্দের দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ن বর্ণে পেশযোগে فَيَكُوْنُ পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের (র.) শব্দটির ن বর্ণে যবরযোগে فَيَكُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَ لَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ

لَا تُسْئَلُ শব্দের কেরাত : ১১৯ নং আয়াতে উল্লিখিত لَا تُسْئَلُ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিতে ت যোগে لَا تُسْئَلُ পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে (র.) শব্দটিতে ي যোগে لَا يُسْأَلُ পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ: রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشٰبَهَتْ قُلُوْبُهُمْ

تَشٰبَهَتْ শব্দের লিখনশৈলী : ১১৮নং আয়াতে উল্লিখিত تَشٰبَهَتْ শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ش বর্ণের উপর খাড়া যবরযোগে تَشٰبَهَتْ পড়েছেন।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি ش বর্ণের পর আলিফযোগে تَشَابَهَتْ লেখা রয়েছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ ..... كُنْ فَيَكُوْنُ

আয়াতে بَدِيْع শব্দ ব্যবহারের কারণ : بَدِيْعٌ শব্দটির অর্থ হলো– অনন্য কিছুর স্রষ্টা, নমুনাবিহীন বস্তুর স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কোনো নমুনা ছাড়াই। তাই তাঁর একটি গুণবাচক নাম হলো بَدِيْعٌ।

আয়াতে بَدِيْعٌ শব্দের উল্লেখ সেসব মুশরিক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনের জন্য হয়েছে, যারা আল্লাহকে শুধু কারিগরের মর্যাদা দিত এবং আত্মা ও মূল উপকরণকে তাঁর সহযোগী মনে করতো। অর্থাৎ, যেন মূল ধাতু ও কোনো নমুনা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং তা ছিল অনাদি। আল্লাহ তা'আলা শুধু আত্মার সংযোজন ও বিন্যাসের কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। [তাফসীরে মাজেদী: খণ্ড১, পৃষ্ঠা ২১৪]

كُنْ: শব্দের ব্যাখ্যা : كُنْ فَيَكُوْنُ-এর অর্থ এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা এ দুই বর্ণের كُنْ শব্দটি উচ্চারণ করেন। কেননা, আল্লাহ পাক জিহ্বা, ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণের মুখাপেক্ষীও নন। বরং তাঁর সৃজন প্রক্রিয়াকে বান্দাদের বোধশক্তি উপযোগী বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

كُنْ বলা দ্বারা শুধু এতটুকু বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হওয়ামাত্রই কোনো মাধ্যম ও বিরতি ছাড়াই তা বাস্তবে প্রকাশমান হয়। তাফসীরে মাদারিকে আছে– وَهٰذَا مَجَازٌ عَنْ سُرْعَةِ التَّكْوِيْنِ وَالتَّمْثِيْلِ إِذْ لَا قَوْلَ ثَمَّ অর্থাৎ, এটি আজ্ঞা পালন ও সৃষ্টি হওয়া এর দ্রুততা বুঝাবার রূপক। কেননা, সেখানে তো আর কোনো কথার অস্তিত্ব নেই। [তাফসীরে মাদারিক]

মুশরিকদের দাবি ও তার খণ্ডন : ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকদের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলুক কিংবা ওহীর মাধ্যমে কালাম ব্যতীত অন্য কোনো নিদর্শন আমাদেরকে দেখানো হোক, যা দ্বারা আমরা সান্ত্বনা পেয়ে যাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত দাবিকে দু'ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রথমটি হলো, উক্ত দাবি মূর্খতা ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, যা তাদের পূর্বের নির্বোধ লোকদের পক্ষ থেকে চলে আসছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, এসব একই চিন্তাধারার ফলাফল। সকলে এক ধরনের কথাই চিন্তা করে যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলুন। এটা তো অজ্ঞতা ও মূর্খতা। [কামালাইন: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৩১]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ ..... مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

আয়াতের মর্মার্থ : আপনি ইহুদি-খ্রিস্টানদের যতই মন যুগিয়ে চলুন না কেন এবং তাদের সাথে সমবেদনা ও সহমর্মিতার আচরণই করুন না কেন তারা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। কেননা, তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। এর কোনো চিকিৎসা নেই। আপনি তাদের মনতুষ্টির জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়েছেন।

এতে তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের সীমা বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ এটা নয় যে, তারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান করছে আর আপনি তাদের সামনে সত্য প্রকাশ করতে কৃপণতা করছেন। বরং তাদের মনোবাসনা হলো আপনিও তাদের ধর্ম গ্রহণ করবেন। তবেই তারা আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সুতরাং যারা প্রকাশ্য মুশরিক এবং অমুসলিম তাদের সন্তুষ্টি কামনা ও তাদের সঙ্গে আপস-মিল রক্ষা করে চলার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

[জালালাইন: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২১৫]

হিংসুটে লোকদের অযথা বিতর্ক : হিংসুটে লোকদের উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলুক এবং এমনিভাবে দীনের বিধানাবলির ব্যাপারে অন্য কোনো পয়গাম্বরের মাধ্যমের প্রয়োজন না থাকে কিংবা পরবর্তীতে অবতরণের দিক দিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত ও রেসালাতের সত্যায়ন আমাদের দ্বারা করানো হোক। অথবা পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে কালাম ব্যতীত অন্য কোনো নিদর্শন আমাদেরকে দেখানো হোক, যা দ্বারা আমরা সান্ত্বনা পেয়ে যাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত দাবিকে দু'ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে যে, উক্ত দাবি মূর্খতার ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, যা তাদের পূর্বের ও পরের নির্বোধ লোকদের পক্ষ থেকে চলে আসছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, এসব একই থলির খেলনা। তাদের অন্তর পরস্পর সংযুক্ত। সকলে এক ধরনের কথাই চিন্তা করে যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি কথা হওয়ার সম্পর্ক। এটা তো এমন অজ্ঞতা ও মূর্খতার কথা যে, উত্তরের অপেক্ষাই রাখে না। হ্যাঁ, যে স্থানে প্রমাণের প্রয়োজন সেখানে শুধু একটি প্রমাণই নিয়ে ঘুরেছে। আর তা হচ্ছে মনের সন্ত্বনা চায়। অথচ আল্লাহ পাক সান্ত্বনাদায়ক অনেক প্রমাণাদিই পেশ করেছেন; কিন্তু যদি কেউ সঠিক রাস্তাই না চায় এবং একগুয়েমী ও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে, তবে সান্ত্বনা তার ভাগ্যে কোথেকে আসবে? তাই ইহুদি ও খ্রিস্টান আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মূর্খ বলা হয়েছে। কেননা ইলম থাকা না থাকাও তাদের বেলায় সমান। [কামালাইন খ.১, পৃষ্ঠা. ১৩১]

উল্টো আচরণ : ইহুদিগণের উক্ত ৪০টি বিভৎসতা বর্ণনা করে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, যারা এতো অধিক বক্র স্বভাবের ও স্বল্প বুদ্ধির অধিকারী তারা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল ও আপনার ব্যথার মূল্যায়ন করে। আপনার কাছ থেকে হেদায়েত অর্জন করা তো দূরের কথা; বরং তাদের উচ্চাভিলাষ হচ্ছে উল্টো তাদের পথে আপনাকে পরিচালনা করার চিন্তায় তারা সর্বদা মগ্ন থাকতো এবং ইসলাম গ্রহণের আশায় বৈধ কোনো পন্থায় রাসূল ﷺ-এর নরম আচরণকে ভুল দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের মনের চাহিদা ও উদ্দেশ্য পূরণ করার সূত্র বানাতে চেষ্টা করতো। আর যেহেতু রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের অনুসরণ করাটা অসম্ভব। তাই তাদের উক্ত চিন্তা-ধারাও অসম্ভব। কেননা তাদের বর্তমান ধর্ম রহিত ও বিকৃত হওয়ার কারণে শুধু একটি অকেজোর সমষ্টি হয়ে রয়েছে। অকাট্য ইলম ও ওহী আগমন সত্ত্বেও রাসূল ﷺ-এর জন্য সেটার অনুকরণ করা বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির দিকে আহ্বান করা এবং নবী করীম ﷺ-এর জন্য এ কাজ অসম্ভব। তাই রাসূল ﷺ-এর জন্য তাদের অনুকরণ অসম্ভব। আর তাদের অনুকরণ না করলে তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াটাও অসম্ভব। [প্রাগুক্ত]

সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য যোগ্য মাণিক্যের প্রয়োজন : সারকথা হচ্ছে এটা যে, তাদের পক্ষ থেকে [অর্থাৎ তারা ঈমান গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে] রাসূল ﷺ-কে একেবারে নৈরাশ হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। হ্যাঁ, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে তাবলীগ [দীনের প্রচার] ও চেষ্টা করা এর থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন না। যোগ্য মাণিক্য এবং উপযুক্ত পদার্থ তার আহ্বানের দিকে আগে বেড়ে স্বয়ং লাব্বাইক বলবে। সুতরাং যে চিরবঞ্চিত সে রাসূলের নিকটে থেকেও ঈমান গ্রহণ থেকে মাহরূম থাকবে। আর যে সৌভাগ্যবান, সে দূরে থাকা সত্ত্বেও তার কাছে চলে আসবেন।

হাফেজ শীরাজী (র.) বলেন–

حسن زبصره بلال از حبش صهيب زروم
زخاك مكه ابو جهل ايں چه بو العجبى ست

অর্থ– হযরত হাসান বসরী (র.) বসরা থেকে, হযরত বিলাল (রা.) হাবশা থেকে এবং হযরত সুহাইব (রা.) রোম থেকে এসে ঈমান গ্রহণ করেছেন। অথচ পবিত্র মক্কার জমিনে থেকে আবূ জাহেলের কি আশ্চার্যজনক আচরণ। [প্রাগুক্ত]

✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَنْ تَرْضٰى ..... مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

আলোচ্য আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. তাফসীরে বায়যাভীতে আছে, লোকেরা রাসূল ﷺ-এর কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতো। প্রশ্নের উত্তর পেলে হয়তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে, একথা ভেবে রাসূল ﷺ সেগুলোর উত্তর প্রদান করতেন। অথচ তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে নিজেদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলারূপে গ্রহণ করেছেন, তখন ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানদের এ আশা হয়েছিল যে, অবশেষে তিনি তাদের ধর্মকেই গ্রহণ করে নেবেন। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ হলে তারা নিরাশ হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْاٰيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَلَنْ تَرْضٰى ..... مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

পূর্বের আয়াতগুলোতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিভিন্ন হঠকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যারা এত অধিক বক্র স্বভাবের অধিকারী, তারা কখনো আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। আপনার কাছ থেকে হেদায়েত অর্জন করা তো দূরের কথা; বরং তাদের উচ্চাভিলাষ হচ্ছে, উল্টো তাদের পথে আপনাকে পরিচালনা করা।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ

মাজায : আলোচ্য অংশে কাফের-মুশরিকদেরকে বুঝানোর জন্য ভবিষ্যৎ অবস্থার বিবেচনায় أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ বলা হয়েছে। কারণ, তারা ভবিষ্যতে জাহান্নামবাসী হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُوَ الْهُدٰى

মারেফা ব্যবহার : আলোচ্য অংশে اَلْهُدٰى শব্দটি اَلْ দ্বারা মারেফা হয়েছে। একইভাবে তার পূর্বে هُوَ এই ضَمِيْرُ الْفَصْلِ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা هِدَايَةٌ গুণটিকে إِسْلَام-এর মাঝে قَصْر করা হয়েছে। এটিকে قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ বলা হয়।

١٢١. ﴿وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ﴾ مُبْتَدَأٌ ﴿يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ﴾ أَيْ يَقْرَؤُوْنَهُ كَمَا أُنْزِلَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْخَبَرُ ﴿اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ﴾ نَزَلَتْ فِيْ جَمَاعَةٍ قَدِمُوْا مِنَ الْحَبْشَةِ وَأَسْلَمُوْا ﴿وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ﴾ أَيْ بِالْكِتَابِ الْمُؤْتٰى بِأَنْ يُحَرِّفَهُ ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾ لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ.

১২১. যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, এটি মুবতাদা। তারা এটা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে। অর্থাৎ, যেমন অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি এটা পাঠ করে। يَتْلُوْنَهٗ বাক্যটি হাল হয়েছে। حَق শব্দটি مَفْعُوْلِ مُطْلَق হিসেবে মানসূব। খবর হলো এ বাক্যটি তারাই এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। হাবশা আবিসিনিয়া হতে একদল লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়। আর যারা এটা অর্থাৎ, তাদের প্রদত্ত কিতাব প্রত্যাখ্যান করে যেমন এতে বিকৃতি সাধন করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত চিরস্থায়ী জাহান্নামে গন্তব্য হওয়ার কারণে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَ حَقَّ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ

حَقَّ تِلَاوَتِهٖ-এর তারকীব বর্ণনা : এ ইবারতটুকুর উদ্দেশ্য হলো, حَقٌّ শব্দটি مَصْدَرْ অর্থাৎ, مَفْعُوْلِ مُطْلَقْ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। حَقَّ تِلَاوَتِهٖ উহ্য মাসদারের সিফাত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। মূলত ইবারতটি হবে এভাবে- يَتْلُوْنَهٗ تِلَاوَةً حَقَّ تِلَاوَتِهٖ; অতঃপর সিফাতকে আগে এনে মাওসূফের দিকে إِضَافَة করা হয়েছে।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ .... فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

أُولٰئِكَ ইসমে ইশারা হয়ে মুবতাদা يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ জুমলা হয়ে اولئك-এর খবর।

واو হরফে আতফ مَنْ ইসমে শর্ত يَكْفُرْ ফে'লে শর্ত بِهٖ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক يَكْفُرُ -এর সাথে। فَأُولٰئِكَ ইসমে ইশারা হয়ে মুবতাদা هُمْ দ্বিতীয় মুবতাদা اَلْخٰسِرُوْنَ হলো هُمْ মুবতাদার খবর। هُمُ الْخٰسِرُوْنَ জুমলা ইসমিয়া হয়ে أُولٰئِكَ-এর খবর। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَاب-এর ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফ'উল মিলে সেলাহ। ইসমে মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। أُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ হলো তার خَبْرْ; يَتْلُوْنَهٗ এই বাক্যটি حَال।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ أَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ .... هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

৪০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে ৩২ জন হাবশার এবং ৮ জন সিরিয়ার পাদ্রীও ছিলেন। এ দলটি হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব-এর নেতৃত্বে এসেছিল, যিনি রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী (রা.)-এর আপন ভাই ছিলেন।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ: আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ أَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ ..... هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

তাওরাতকে সঠিকভাবে তেলাওয়াত করা : اَلْكِتَاب দ্বারা আয়াতে তাওরাত উদ্দেশ্য। حَقَّ تِلَاوَتِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাতের রদবদল, সংযোজন বিয়োজন ও বিকৃতি সাধন না করে যথাযথ তেলাওয়াত করা।

التَّدْرِيْبَات: অনুশীলনী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة ثم اذكر ربطها بما قبلها .

ب. فسر الآية على نهج المصنف العلام حيث يتضح المرام.

ج. أذكر أسباب النزول عن هذه الأية.

د. كم ملة اشتهرت في العالم وما هي بين ثم اثبت الحق حقا والباطل باطلا بضوء الآية حيث ينكشف المراد.

ه. حل لغات الألفاظ الآتية : خراب، كل، قضى، أهواء، بديع.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : " وَمَنْ اَظْلَمُ " أي لا أحد أظلم " مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ" بالصلاة والتسبيح "وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا" بالهدم أو التعطيل نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس او في المشركين لما صدوا النبي ﷺ عام الحديبية عن البيت .

أ. ترجم العبارات المذكورة ثم اكتب ربط الآية الكريمة بما قبلها.

ب. فسر الآية الكريمة حيث يتضح معنى تعمير المسجد وخرابه ظاهرا وباطنا مع ايضاح المقصد من الآية، وافرا

ج. أذكر أسباب النزول عن هذه الآية .

د. اكتب الأحكام المستنبطة من الآيات .

ه. ما هي التعارض في هذه الآية وما حله .

و. بين تركيب قوله " اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ " ثم بين عاقبة من يسعى في خراب المسجد.

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

أ. أذكر سبب نزول الآية الكريمة موضحا .

ب. أوضح تفسير الآية بحيث يتم الرد على المعاندين ويسيل طعنهم بسيلان جواب المسلمين المحققين .

ج. قوله " ان الله واسع عليم" فسره بحيث يتأتى المقصد بنزوله وتثبت عقيدة اهل السنة والجماعة المشهورة في ذاته تعالى .

د. قوله تعالى : "الذين لا يعلمون" لم فسرت الآية بكفار مكة .

قَوْلُهُ تَعَالٰى : "وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دِيْنَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ اَيِ الْاِسْلَامَ هُوَ الْهُدٰى وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَلَئِنِ لَامُ قَسَمٍ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ اَلَّتِيْ يَدْعُوْنَكَ إِلَيْهَا فَرْضًا بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اَلْوَحْيِ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُكَ وَّلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُكَ مِنْهُ.

أ. ترجم العبارات المذكورة ثم اذكر سبب نزول الآية الكريمة .

ب. اكتب ربط الآية الكريمة بما قبلها .

ج. فسر قوله " ان هدى الله هو الهدى" بحيث يغلب الاسلام وشرائعه وتقفل على السنة اليهود والنصارى .

د. أوضح تفسير " العلم" مع بيان فضائله حيث يثبت انه هو العلم في الاصل دون غيره ولكن عليك برعاية الاعتدال كي لا تكتب قلوب الذين يطلبون علوم الدنيا ويدخل سائل المعارف في العلوم .

ه. بين محل اعراب قوله "مالك من الله من ولي ولا نصير" مع بيان القاعدة النحوية المودعة فيه .

রুকূ' : ১৫

قِصَّةُ بِنَاءِ إِبْرَاهِيْمَ لِلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ دُعَائُهُ

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাবা নির্মাণের ঘটনা এবং তাঁর দোয়া

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- বনী ইসরাঈলের প্রতি উপদেশ ও ভীতি প্রদর্শন
- হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা
- হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে ইবাদতকারীদের জন্য কাবা পবিত্র করার নির্দেশ
- হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া ও আল্লাহ তা'আলার উত্তর
- হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কা'বা নির্মাণ ও তাঁদের দোয়া

١٢٢. ﴿يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

১২২. হে ইসরাঈলের সন্তানগণ! আমার সেই নিয়ামতকে স্মরণ করো যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এই ধরনের আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٢٣. ﴿وَاتَّقُوْا﴾ خَافُوْا ﴿يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ﴾ تُغْنِيْ ﴿نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ﴾ فِيْهِ ﴿شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ فِدَاءٌ ﴿وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ﴾ يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় করো সন্ত্রস্ত হও, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না কাজে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোনো ক্ষতিপূরণ ফিদইয়া গৃহীত হবে না এবং সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না। আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে তাদেরকে রক্ষা করা হবে না।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰبَنِيْٓ إِسْرَائِيْلَ ..... عَلَى الْعٰلَمِيْنَ . تَقَدَّمَ مِثْلُهُ

উল্লিখিত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত : এ অংশটুকু দ্বারা মুফাসসির (র.) সূরা বাকারার ৪৭ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সে আয়াতের সাথে এর তাফসীর রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ . فِيْهِ

সিফাতের উহ্য عائد উল্লেখ : لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ জুমলা হয়ে يَوْمًا-এর صِفَتْ আর صِفَتْ জুমলা হলে عَائِدْ জরুরি। এখানে فِيْهِ বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) عَائِدْ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

لَا تَجْزِيْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ ج . ز . ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে যথেষ্ট হবে না। শব্দটি প্রতিদান দেওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন جَزٰى فُلَانًا بِكَذَا عَلٰى كَذَا ; যা দ্বারা প্রতিদান দেওয়া হয় তার সাথে بِ এবং যে কারণে প্রতিদান দেওয়া হয় তার শুরুতে عَلٰى আসে।

عِدْلٌ : শব্দটি ع বর্ণে যবরযোগে, অর্থ– বিনিময়, ফিদিয়া ফিদয়াকে عَدْلٌ বলার কারণ হলো, তা মূল্য ও পরিমাণে مُفْدٰى-এর সমান হয়। এক্ষেত্রে جنس-এর সমতা ধর্তব্য নয়। এর আরেক অর্থ হলো– ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা। কুরআনে শব্দটি বহু জায়গায় এ অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। যেমন– إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ عِدْلٌ শব্দটি ع বর্ণে যেরযোগে হলে অর্থ- مِثْل অর্থাৎ, আকৃতি ও جِنْس উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ..... فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

يَاء হরফে নেদা بَنِي মুযাফ, إِسْرَائِيْل মুযাফ ইলাইহি। উভয়টি মিলে মুনাদা, اُذْكُرُوْا ফে'ল ضَمِيْر ফায়েল نِعْمَتِي মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী, اَلَّتِيْ ইসমে মাওসূল, أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ জুমলা হয়ে সেলাহ, واو হরফে আতফ اَنِّيْ ও তার পরবর্তী অংশ نِعْمَتِيْ-এর উপর আতফ।

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-এর মাঝে فَضَّلْتُكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উল মিলে জুমলা হয়ে أَنِّيْ-এর খবর। عَلَى الْعٰلَمِيْنَ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক فَضَّلْتُكُمْ-এর সাথে।

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْنِ : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূর যোগসূত্র

পূর্বের রুকূতে ইহুদিদের বক্রস্বভাব সম্পর্কে প্রথমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর পর পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে তাদের উপর অবতীর্ণ নিয়ামতসমূহ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে প্রথমে বিস্তারিতভাবে, তারপর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো বিষয়টি শ্রোতার অন্তরে গ্রথিত করে দেওয়া। এটি বালাগাতের একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا ..... وَأَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

ইহুদিদের আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া : ইহুদিদেরকে বার বার তাদের উন্নতির কথা শুনিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য-মাহাত্ম্যের মূল একমাত্র এটাই যে, তারা ছিল তাওহীদ ও একত্ববাদের ধারকবাহক এবং তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরি। এখন যদি তারা আবার সে নিয়ামতের অধিকারে ধন্য হতে চায়, তবে তাদের আবার ফিরে আসতে হবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনের দিকেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّقُوْا يَوْمًا..... وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

ইহুদিদের পরকালের বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন : কালক্রমে ধীরে ধীরে ইহুদিদের থেকে পরকালের শাস্তির বিশ্বাসটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের এমন ধারণা জন্মেছিল যে, ভালো-মন্দ যা হওয়ার এ দুনিয়াতেই হবে। পরকালে তারা ক্ষমা পেয়ে যাবে। তাই পরকালের বিচার ও শাস্তির বিষয়টি তাদেরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের প্রতি নিয়ামতসমূহ : আয়াতে نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ দ্বারা বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া দশটি নিয়ামত উদ্দেশ্য। এ নিয়ামতগুলো পূর্বের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। নিয়ামতগুলো হলো-১. সমগ্র জগতের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব, ২. ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি, ৩. সমুদ্র বিদীর্ণ করা, ৪. হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদানের জন্য তূর পাহাড়ে নেওয়া, ৫. বাছুর পূজার গুনাহ থেকে তওবা গ্রহণ, ৬. বনী ইসরাঈলের সত্তর নেতাকে মৃত্যুর পর জীবন দান, ৭. তীহ প্রান্তরে ছায়া প্রদান, ৮.মান্না-সালওয়া প্রদান, ৯. তীহ প্রান্তরে পানির ব্যবস্থা করা, ১০. গাভীর মাধ্যমে হত্যা রহস্যের সমাধান।

বনী ইসরাঈলের মন্দ কর্মসমূহ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিয়ামতসমূহের পাশাপাশি তাদের মন্দকর্মসমূহেরও আলোচনা রয়েছে। তাদের মন্দকর্মগুলো হলো- ১. বাছুর পূজা করা, ২. আল্লাহকে সরাসরি দেখতে চাওয়া, ৩. মান্না-সালওয়া ত্যাগ করে সাধারণ খাদ্যের আবদার, ৪. শহরে প্রবেশের সময় আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বাক্যে বিকৃতি, ৫. নিষিদ্ধ দিনে তথা শনিবার মৎস্য শিকার, ৬. নবীদেরকে হত্যা করা, ৭. গাভীর ব্যাপারে টালবাহানা করা, ৮. নিদর্শনসমূহ দেখা ও বুঝার পরও ঈমান না আনা, ৯. তাওরাতের বক্তব্য বিকৃত করা, ১০. তাওরাতের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ না মানা ইত্যাদি।

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার শাস্তিসমূহ : বনী ইসরাঈলের নিয়ামত ও মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহের পাশাপাশি তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিভিন্ন শাস্তির কথাও পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। যথা- ১. বাছুর পূজার কারণে পরস্পরকে হত্যার বিধান, ২. আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার কারণে বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করা, ৩. শহরে প্রবেশের সময় আল্লাহ তা'আলার বলে দেওয়া শব্দ বিকৃত করার কারণে আসমানি শাস্তি, ৪.শনিবারে মাছ শিকারের কারণে বানর বানানো, ৫.দুনিয়াতে লাঞ্ছনার পাত্র বানিয়ে দেওয়া, ৬. পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তি।

١٢٤. ﴿وَ﴾ أُذْكُرْ ﴿إِذِ ابْتَلَى﴾ اِخْتَبَرَ ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ إِبْرَاهَامَ ﴿رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ بِأَوَامِرَ وَنَوَاهٍ كَلَّفَهُ بِهَا قِيْلَ هِيَ مَنَاسِكُ الْحَجِّ وَقِيْلَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَفَرْقُ الرَّأْسِ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالِاسْتِنْجَاءُ ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ ﴿قَالَ﴾ تَعَالَى لَهُ ﴿إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قُدْوَةً فِي الدِّيْنِ ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ﴾ أَوْلَادِيْ اِجْعَلْ أَئِمَّةً ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ﴾ بِالْإِمَامَةِ ﴿الظَّالِمِيْنَ﴾ الْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَنَالُهُ غَيْرُ الظَّالِمِ.

১২৪. এবং স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি অপর এক কেরাতে إِبْرَاهَامَ রয়েছে। তাঁর প্রতিপালক পরীক্ষা করলেন যাচাই করলেন কয়েকটি কথা দ্বারা অর্থাৎ, কিছু আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়ে। কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছিল হজ পালনের বিধি-বিধানসমূহ। কেউ কেউ বলেন, এগুলো হলো, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মিসওয়াক করা, গোঁফ কর্তন করা, চুলে সিঁথি কাটা, নখ কাটা, বগলতলার লোম উৎপাটন করা, নাভির তলদেশের লোম মুণ্ডন করা, খতনা করা এবং শৌচ করা। তখন সেগুলো সে পূর্ণ করল পরিপূর্ণভাবে সে এগুলো আদায় করল। তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা দীনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় করছি। সে বলল, আমার বংশধরগণের সন্তানদের মধ্য হতেও আপনি নেতা বানান। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার নেতা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের তাদের মধ্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। এতে প্রমাণ হয় যে, যারা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তারা তা পেতে পারে।

١٢٥. ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ﴾ الْكَعْبَةَ ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ مَرْجِعًا يَثُوْبُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿وَأَمْنًا﴾ مَأْمَنًا لَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ وَالْإِغَارَاتِ الْوَاقِعَةِ فِيْ غَيْرِهِ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى قَاتِلَ أَبِيْهِ فِيْهِ فَلَا يُهَيِّجُهُ ﴿وَاتَّخِذُوْا﴾ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ﴾ هُوَ الْحَجَرُ الَّذِيْ قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ ﴿مُصَلًّى﴾ مَكَانَ صَلَاةٍ بِأَنْ تُصَلُّوْا خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ خَبَرٌ ﴿وَعَهِدْنَآ إِلَى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ﴾ أَمَرْنَاهُمَا ﴿أَنْ﴾ أَيْ بِأَنْ ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴿لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ﴾ الْمُقِيْمِيْنَ فِيْهِ ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾ جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ الْمُصَلِّيْنَ.

১২৫. এবং (স্মরণ করুন) যখন এই গৃহকে কা'বাকে মানবজাতির মিলনস্থল প্রত্যাবর্তনক্ষেত্র অর্থাৎ, সকল দিক হতে এই দিকেই মানুষ ফিরবে ও নিরাপত্তাস্থল হিসেবে করেছিলাম। অর্থাৎ, যে নিপীড়ন ও লুটতরাজ অন্যান্য শহরে পরিলক্ষিত হতো তা হতে নিরাপদ ভূমিরূপে তাকে বানিয়েছিলাম। পিতার হত্যাকারীকে পেলেও কেউ সেখানে তাকে আক্রমণ করতো না। হে লোকসকল! তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে যে পাথরটিতে তিনি কাবাগৃহ নির্মাণকালে দাঁড়িয়েছেন মুসল্লারূপে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো অর্থাৎ, তার পিছনে তওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ আদায় কর। اِتَّخِذُوْا শব্দটি অপর এক কেরাতে خ অক্ষরে যবরসহ জুমলায়ে খবরিয়া হিসেবে রয়েছে এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম তাদেরকে নির্দেশ দিলাম যে, أَنْ-এর মূলরূপ হলো- بِأَنْ তোমরা দু'জন আমার ঘরকে প্রতিমা থেকে পবিত্র রাখো তওয়াফ ও ইতেকাফকারী অর্থাৎ, তাতে অবস্থানকারী এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের অর্থাৎ নামাজ আদায়কারীদের জন্য। اَلرُّكَّع শব্দটি رَاكِع-এর এবং اَلسُّجُوْد শব্দটি سَاجِد-এর বহুবচন।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : وَ. اذْكُرْ. إِذ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ

إِذ শব্দের আমেল নির্ণয় : এখানে উহ্য اُذْكُرْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إِذْ হরফটি উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের মা'মূল; اِبْتَلٰى এর নয়। এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলে এখানে إِذ হরফটি اِبْتَلٰى-এর মা'মূল। কেননা এ সুরতে عَامِلْ-এর উপর مَعْمُوْل মুকাদ্দাম হওয়া আবশ্যক হয়।

তাছাড়া মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ শব্দটি উহ্য ধরে এ দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সুরতে অর্থ হবে–

أُذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ وَقْتَ ابْتِلَاءِ إِبْرَاهِيْمَ عليه السلام لِيَتَذَكَّرُوْا مَا وَقَعَ فِيْهِ مِنَ الْأُمُوْرِ الدَّاعِيَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ فَيَقْبَلُوا الْحَقَّ وَيَتْرُكُوْا مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ.

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সুরতে অর্থ হবে– أُذْكُرْ يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقْتَ ابْتِلَاءِ اِبْرَاهِيْمَ; আর বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা।

قَوْلُهُ : رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. بِأَوَامِرَ وَنَوَاهٍ ..... الخ

كلمات-এর অর্থ : كلمات-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মুফাসসির (র.) كلمات-এর ব্যাখ্যা করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কিছু আদেশ-নিষেধ দ্বারা। এরপর তিনি অন্য আরো দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। ১. হজের বিধানাবলি। এটি তামীমী (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। ২. দশটি কাজ। যেমন– কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি। এ অভিমতটি তাউস (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

قَوْلُهُ : وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ. أَوْلَادِيْ. إِجْعَلْ أَئِمَّة

ذُرِّيَّتِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য ও তারকীব বর্ণনা: মূলত ذُرِّيَّة বলা হয় نَسْلُ الرَّجُلِ তথা পুরুষের বংশধারাকে এবং তার মূল ব্যবহার ছোট ছোট সন্তানদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ছোটবড় সকল বংশধরের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহার হতে থাকে। মুফাসসির (র.) এখানে ذُرِّيَّةٌ-এর তাফসীর اَوْلَاد দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে মূল অর্থ– اَوْلَادِ صِغَار উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য।

মুফাসসির (র.) اِجْعَلْ اَئِمَّةً ইবারত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, مِنْ ذُرِّيَّتِيْ উহ্য ফে'লের মুতা'আল্লিক। আর তা হলো اِجْعَل এবং তার مَفْعُوْلِ ثَانِيْ ও উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হলো– اِجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ أَئِمَّةً

قَوْلُهُ : قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ. بِالْإِمَامَةِ

عَهْدِيْ-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা : হযরত ইবরাহীম (আ.) তো আবেদন করেছিলেন اِمَامَتْ সম্পর্কে; কিন্তু জবাব দেওয়া হচ্ছে عَهْدٌ সম্পর্কে। তাই মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, এখানে عَهْدٌ দ্বারা اِمَامَتْ উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রশ্ন উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে।

কেউ কেউ عَهْدٌ এর তাফসীর করেছেন নবুয়ত দ্বারা। উভয়টির সারকথা একই। কেননা اِمَامَتْ দ্বারা নবুয়ত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. الْكَعْبَةَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. مَرْجِعًا

مَثَابَةً-এর তাফসীর : মুফাসসির (র.) مَرْجِعًا দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, مَثَابَةً শব্দটি ظَرْف اِسْم-এর সীগাহ। কেউ কেউ مَصْدَرِ مِيْمِيْ বলেও মত দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যায় প্রশ্ন হয় যে, ظَرْف اِسْم-এর সীগাহ হলে مَثَاب হওয়ার কথা ছিল। শেষে ة বৃদ্ধি করা হলো কেন? এর উত্তর হলো, এখানে আধিক্য বুঝানোর জন্য تاء বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَأَمْنًا ـ مَأْمَنًا لَهُمْ ـ مِنَ الظُّلْمِ

اَمْنًا-এর অর্থ ও মক্কার নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য : اَمْنًا-কে مَأْمَنًا-এর অর্থ নেওয়ার কারণ হলো اَمْنًا-কে اَلْبَيْت-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সত্তার উপর মাসদারের প্রয়োগ হয় না। মুফাসসির (র.) মক্কায় নিরাপত্তার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, অন্যান্য শহরে যে সমস্ত জুলুম, নির্যাতন ও উত্তেজনা বিরাজ করতো তা থেকে মুক্ত, এমনকি মক্কায় যদি স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে পায় তবুও তাকে আক্রমণ কিংবা প্রতিশোধ নিত না।

قَوْلُهٗ : مُصَلًّى ..... رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

তওয়াফের দুই রাকাত নামাজ উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে صَلٰوة দ্বারা তওয়াফের দু'রাকাত নামাজ উদ্দেশ্য। কারণ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের কাছে এসে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং বলেন– وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

এটি শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর হানাফী এবং মালেকী মাযহাবে ওয়াজিব; কিন্তু মাকামে ইবরাহীমে পড়াই আবশ্যক নয়; বরং মসজিদে হারামের যেখানে ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। তবে মাকামে ইবরাহীমে পড়ার ফজিলত বেশি। এ হিসেবে اِتَّخِذُوْا-এর নির্দেশটি اَمْرِ اِسْتِحْبَابِيْ;

কেউ কেউ বলেন, এখানে صَلٰوة দ্বারা সাধারণ নামাজ উদ্দেশ্য। কেউ বলেন, এখানে صَلٰوة দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য এবং মাকামে ইবরাহীম দ্বারা হরম উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ خَبَرٌ

اِتَّخَذُوْا-এর কেরাত বর্ণনা : اَتَّخَذُوْا শব্দটি অন্য এক কেরাতে خ বর্ণে যবরযোগে জুমলায়ে খবরিয়া হিসেবে রয়েছে। তখন সেটি উহ্য একটি ফে'লের উপর আতফ হবে। মূলরূপ হবে– فَثَابُوْا وَاتَّخَذُوْا

قَوْلُهٗ : وَعَهِدْنَا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ ـ أَمَرْنَاهُمَا

عَهِدْنَا-এর অর্থ নির্ণয় : اَلْعَهْد শব্দটির অর্থ হলো ওয়াদা করা। কিন্তু শব্দটি اِلٰي অব্যয়যোগে মুতাআদ্দী হলে এর অর্থ হয়– অসিয়ত করা। যেহেতু এখানে অসিয়তটি মূলত আদেশের পর্যায়ে ছিল তাই মুফাসসির (র.)-এর তাফসীর করেছেন اَمَرْنَاهُمَا;

قَوْلُهٗ : اَنْ اَيْ بِاَنْ ـ طَهِّرَا بَيْتِيْ ـ مِنَ الْأَوْثَانِ

উহ্য হরফুল জার উল্লেখ ও تَطْهِيْر-এর উদ্দেশ্য : আলোচ্য ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, اَنْ-টি مَصْدَرِيَّة যা তা পরবর্তী জুমলাটির সাথে মাসদারের তাবীলে উহ্য হরফুল জারের মাজরূর হিসেবে জরের স্থানে রয়েছে। তবে অনেকে اَنْ টিকে أَنْ لِلْمُفَسَّرَةِ বলেছেন। مِنَ الْأَوْثَانِ উল্লেখ করে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য মূর্তি থেকে কাবা পবিত্র রাখা। যেমন, মুজাহিদ ও কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে– هُوَ تَطْهِيْرُهٗ مِنَ الْأَصْنَامِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فِيْهِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ

قَوْلُهٗ : الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ..... الْمُصَلِّيْنَ

রুকূ'-সেজদাকারী দ্বারা উদ্দেশ্য : এটি اَلرُّكَّعِ السُّجُوْد এর তাফসীর। মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে جُزْء বলে كُلّ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং مَجَازِ مُرْسَل হিসেবে الرُّكَّعِ السُّجُوْد দ্বারা মুসল্লি উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : **শব্দবিশ্লেষণ**

مُصَلًّى : সীগাহ اِسْمِ ظَرْف বহছ وَاحِدْ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلصَّلٰوةُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِيْ অর্থ– সালাতের স্থান বা দোয়ার স্থান।

اَلْعَاكِفِيْنَ : সীগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمِ فَاعِلْ বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْعُكُوْفُ মূলবর্ণ (ع ـ ك ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– কোনো স্থানে অবস্থান করাকে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া। আর শরিয়তে ইতেকাফ বলা হয়– هُوَ الْاِحْتِبَاسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْقُرْبَةِ অর্থাৎ, ইবাদতের নিয়তে কোনো বিশেষ সময় মসজিদে অবস্থান বাধ্যতামূলক করা।

اَلرُّكَّع : শব্দটি বহুবচন, একবচনে رَاكِعٌ; বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّكُوْعُ মূলবর্ণ (ر.ك.ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- অধিক রুকূকারী।

اَلسُّجُوْد : শব্দটি বহুবচন, একবচনে سَاجِدٌ বাব نَصَرَ মাসদার السُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س.ج.د) জিনস صَحِيْح অর্থ- অধিক সেজদাকারী।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ ..... عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

এখানে اِبْرَاهِيْم শব্দটি مَفْعُوْلٍ مُقَدَّم হয়েছে। আর এই تَقْدِيْم বাধ্যতামূলক। কেননা নিয়ম হলো, যখন فَاعِلْ-এর সাথে এমন যমীর মিলে আসে, যা মাফ'উলের দিকে ফিরে তখন মাফ'উলকে আগে আনা আবশ্যক। অন্যথায় اِضْمَار قَبْلَ الذِّكْر আবশ্যক হয়, যা সঠিক নয়। جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا অংশটি إِنْ-এর খবর হয়েছে। جَاعِلْ হলো ইসমে ফায়েল যা তার প্রথম মাফ'উলের দিকে মুযাফ হয়েছে। لِلنَّاسِ হলো তার মুতা'আল্লিক আর إِمَامًا হলো দ্বিতীয় মাফ'উল। وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ অংশটি উহ্য ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে মাকুলা হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। মূলরূপ হলো- قَالَ إِبْرَاهِيْمُ اِجْعَلْ أَئِمَّةً مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ..... وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

جَعَلْنَا-কে صَيَّرْنَا-এর সমার্থক ধরলে مَثَابَةً শব্দটি তার দ্বিতীয় মাফ'উল। আর যদি جَعَلْنَا-কে خَلَقْنَا-এর সমার্থক ধরা হয়, তাহলে مَثَابَةً শব্দটি اَلْبَيْتُ থেকে حَالْ হবে। اِتَّخِذُوْا অংশটি جَعَلْنَا-এর উপর عَطْف হয়েছে এবং এটি উহ্য قُلْنَا-এর مَقُوْلَة; মূলরূপ হলো- قُلْنَا لَهُمْ اِتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

وَاْ হরফে আতফ عَهِدْنَا ফে'ল যমীর ফায়েল اِلٰى হরফে জার وَاِسْمٰعِيْلَ মাতূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক عَهِدْنَا ফে'লের সাথে। اِنْ তাফসীরিয়া اَىْ-এর অর্থে। طَهِّرَا ফে'ল যমীর ফায়েল بَيْتِىَ মাফ'উলে বিহী لِلطَّائِفِيْنَ-এর ل হরফে জার اَلطَّائِفِيْنَ মাতূফ আলাইহি وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ মাতূফ। মাতূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক طَهِّرَا-এর সাথে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

اِبْرَاهِمَ শব্দের কেরাত : ১২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত اِبْرَاهِمَ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ه বর্ণে খাড়া যের যোগে اِبْرَاهِمَ পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের (র.) শব্দটির ه বর্ণে যবর এবং তারপর আলিফযোগে اِبْرَهَام পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

اِتَّخِذُوْا শব্দের কেরাত : ১২৫ নং আয়াতে উল্লিখিত اِتَّخِذُوْا শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির خ বর্ণে যেরযোগে اِتَّخِذُوْا পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের ও নাফে (র.) শব্দটির خ বর্ণে যবরযোগে اِتَّخَذُوْا পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

اِبْرَاهِمَ শব্দের লিখনশৈলী : ১২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত ابراهم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ر বর্ণের পর আলিফ যোগে ابراهيم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির راء বর্ণের উপর খাড়া যবর যোগে ابرهم লিখিত আছে।

اَلرُّكَّع : শব্দটি বহুবচন, একবচনে رَاكِعٌ; বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّكُوْعُ মূলবর্ণ (ر.ك.ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- অধিক রুকূকারী।

اَلسُّجُوْد : শব্দটি বহুবচন, একবচনে سَاجِدٌ বাব نَصَرَ মাসদার السُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س.ج.د) জিনস صَحِيْح অর্থ- অধিক সেজদাকারী।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ ..... عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

এখানে اِبْرَاهِيْم শব্দটি مَفْعُوْلٍ مُقَدَّم হয়েছে। আর এই تَقْدِيْم বাধ্যতামূলক। কেননা নিয়ম হলো, যখন فَاعِلْ-এর সাথে এমন যমীর মিলে আসে, যা মাফ'উলের দিকে ফিরে তখন মাফ'উলকে আগে আনা আবশ্যক। অন্যথায় اِضْمَار قَبْلَ الذِّكْر আবশ্যক হয়, যা সঠিক নয়। جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا অংশটি إِنْ-এর খবর হয়েছে। جَاعِلْ হলো ইসমে ফায়েল যা তার প্রথম মাফ'উলের দিকে মুযাফ হয়েছে। لِلنَّاسِ হলো তার মুতা'আল্লিক আর إِمَامًا হলো দ্বিতীয় মাফ'উল। وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ অংশটি উহ্য ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে মাকুলা হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। মূলরূপ হলো- قَالَ إِبْرَاهِيْمُ اِجْعَلْ أَئِمَّةً مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ..... وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

جَعَلْنَا-কে صَيَّرْنَا-এর সমার্থক ধরলে مَثَابَةً শব্দটি তার দ্বিতীয় মাফ'উল। আর যদি جَعَلْنَا-কে خَلَقْنَا-এর সমার্থক ধরা হয়, তাহলে مَثَابَةً শব্দটি اَلْبَيْتُ থেকে حَالْ হবে। اِتَّخِذُوْا অংশটি جَعَلْنَا-এর উপর عَطْف হয়েছে এবং এটি উহ্য قُلْنَا-এর مَقُوْلَة; মূলরূপ হলো- قُلْنَا لَهُمْ اِتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

وَاْ হরফে আতফ عَهِدْنَا ফে'ল যমীর ফায়েল اِلٰى হরফে জার وَاِسْمٰعِيْلَ মাতূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক عَهِدْنَا ফে'লের সাথে। اِنْ তাফসীরিয়া اَىْ-এর অর্থে। طَهِّرَا ফে'ল যমীর ফায়েল بَيْتِىَ মাফ'উলে বিহী لِلطَّائِفِيْنَ-এর ل হরফে জার اَلطَّائِفِيْنَ মাতূফ আলাইহি وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ মাতূফ। মাতূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক طَهِّرَا-এর সাথে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

اِبْرَاهِمَ শব্দের কেরাত : ১২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত اِبْرَاهِمَ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির ه বর্ণে খাড়া যের যোগে اِبْرَاهِمَ পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের (র.) শব্দটির ه বর্ণে যবর এবং তারপর আলিফযোগে اِبْرَهَام পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

اِتَّخِذُوْا শব্দের কেরাত : ১২৫ নং আয়াতে উল্লিখিত اِتَّخِذُوْا শব্দটির দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটির خ বর্ণে যেরযোগে اِتَّخِذُوْا পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের ও নাফে (র.) শব্দটির خ বর্ণে যবরযোগে اِتَّخَذُوْا পড়েছেন।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

اِبْرَاهِمَ শব্দের লিখনশৈলী : ১২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত ابراهم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ر বর্ণের পর আলিফ যোগে ابراهيم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির راء বর্ণের উপর খাড়া যবর যোগে ابرهم লিখিত আছে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা-বিশ্বাস ও প্রমাণাদি : মু'তাযিলা সম্প্রদায় لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করে যে, ফাসেক ব্যক্তি ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। মুতাযিলাদের বক্তব্যের উত্তর হলো, اِمَامَتْ দ্বারা যদি প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ظَالِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কাফের ও মুশরিক। তখন আয়াতের অর্থ হবে, কোনো কাফের মুসলমানদের ইমাম ও শাসক হতে পারে না। আর اِمَامَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি اِمَامَتِ كُبْرٰى অর্থাৎ, নুবয়ত ও রেসালাত-এর দায়িত্ব নেওয়া হয়, তবে ظَالِمْ নিজ সাধারণ অর্থে থেকে যাবে এবং এর দ্বারা عِصْمَةُ الْاَنْبِيَاء প্রমাণিত হবে, যা সর্বসম্মত। অর্থাৎ, নবীর জন্য সম্ভব নয় যে, তিনি জালেম ও ফাসেক হবেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ..... وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

মাকামে ইবরাহীমের বিবরণ : এটা একটা বেহেশতী পাথর। এ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এর বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি নির্মাণস্থল উঁচু হলে সে অনুযায়ী উঁচু হয়ে যেত এবং উঁচু সিড়ির কাজ দিত। আর নিচু অংশ আসলে নিচু হয়ে যেত। এ পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের ছাপ বসে গিয়েছিল, যা আজও বিদ্যমান। এ পাথরটি কাবার দরজা ও মুলতাযাম সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে পানিতে ভেসে যাওয়ার কারণে পুনরায় সে পাথরটিকে বায়তুল্লাহ থেকে অল্প দূরে পুরাতন বাবুস সালাম, মিম্বার এবং জমজমের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

একবচন-দ্বিবচন সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিরসন : আলোচ্য আয়াতে طَهِّرَا দ্বিবচনের সীগাহ এসেছে; কিন্তু সূরা হজে একবচনের সীগাহ طَهِّرْ এসেছে। কারণ সূরা হজের নির্দেশ ছিল কাবা নির্মাণের পূর্বেকার। সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়নি। আর সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতের নির্দেশটি কাবার নির্মাণের পরে। ফলে এখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কেও সম্বোধন করা হয়েছে।

পয়গাম্বরগণ (আ.)-এর ইসমত বা নিষ্পাপতা : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে পয়গাম্বরগণ (আ.) নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সর্বপ্রকার ছোট ও বড় গুণাহসমূহ থেকে [যা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে] পবিত্র। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতের সাথে একমত পোষণ করেছে। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে নবীর দ্বারা কিছু ছোট গুনাহ হয়ে যাওয়া কেউ কেউ জায়েজ মনে করেছেন। অথবা স্খলন, ত্রুটি, ভ্রান্তি এবং ইজতেহাদী পদচ্যুতিসমূহ কতক মুহাক্কিকগণের মতে ওগুলোর উপর পয়গাম্বরকে স্থায়ী রাখা হয় না; বরং সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়ে তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু শীয়া সম্প্রদায়ের আকিদা বা বিশ্বাসের উপর হতবুদ্ধিতা প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা এক দিকে আম্বিয়া (আ.)-কে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র মানে। আর অপর দিকে ধার্মিকতা তাদেরকে কুফরি করারও অনুমতি দেয়।

নবীগণ (আ.)-এর পবিত্রতার পরিপন্থি ঘটনাবলির তাৎপর্য : যখনি কোনো কথা প্রকাশ্যভাবে নবীগণের পবিত্রতার বিরোধী বুঝা যাবে, তখন সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে নির্দেশনা চালু করা হবে–

১. যদি সেটা খবরে ওয়াহেদ হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশেষ কোনো এক স্থানে নিজ স্ত্রীকে 'বোন' বলে আখ্যায়িত করা। তবে নবীগণের পবিত্রতার অকাট্য আকিদার মোকাবিলায় সে ব্যাপারটিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

২. আর যদি নকলে মুতাওয়াতিরের সাথে সে ঘটনা প্রমাণিত হয়, তবে সে অকাট্য আকিদাকে অটল রাখার জন্য সে ঘটনাকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৩. অথবা উক্ত কথা বা ঘটনাকে উত্তম পদ্ধতির পরিপন্থি এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা বলে বিবেচিত করা হবে। যেমন– হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ঘটনা। তিনি সে নিষেধাজ্ঞাকে সহানুভূতিসূলভ নিষেধাজ্ঞা মনে করেছেন অথবা নাহীয়ে তানযীহী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিংবা তার দ্বারা ভুলে এমন হয়ে গিয়েছিল বা এ ঘটনা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ছিল। এ ধরনের সকল সম্ভাব্য নির্দেশনা হতে পারে।

৪. অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ এবং اِنِّىْ سَقِيْمٌ বলাটা কোনো ক্ষেত্রে রূপক কিংবা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা হিসেবে বিচেনা করা হবে।

৫. কিংবা হযরত মূসা (আ.) যে এক ক্বিবতীকে মেরে ফেলেছিলেন, সেটাকে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে অথবা অনিচ্ছার উপর বিবেচনা করা হবে।

৬. কিংবা হযরত দাউদ (আ.) সে মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন যাকে বিয়ে করার জন্য আওরিয়া নামক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়েছিল। আর এমন অন্যের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া মহিলাকে অপর যে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে অপর কারো জন্য বিয়ে করা জায়েজ নেই বরং হারাম।

৭. অথবা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আছরের নামাজ ছুটে যাওয়া তিনি ভুলে গিয়েছিলেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮. হযরত ইউনুস (আ.) নিজ ক্বওমের উপর অধিক ক্রোধ হওয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। [কামালাইন খ: ১, পৃ. ১৩৭]

আল্লাহ তা'আলার শাহী, পবিত্র স্থান ও তার বিধানাবলি : 'মাকামে ইবরাহীম' একটি বিশেষ পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ কাজ করেছিলেন। সে স্থানকে দু'কারণে নিরাপত্তার স্থান বলা হয়েছে। এক তো হজের কার্যাবলি আদায়ের কারণে, যেগুলোর মধ্যে এ স্থানটিও গণ্য, পরকালের আজাব থেকে নিরাপদে থাকবে। দ্বিতীয়ত ইহজগতের নিরাপত্তাও উদ্দেশ্য। হেরেম এর সীমার ভিতরে কোনো বড়র চেয়ে বড় অপরধী ও খুনী [কোনো এর মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী] এমন কি! নিজ পিতার হত্যাকারীও যদি প্রবেশ করে, তবে সেই শুধু জানের নিরাপত্তা পাবে এমন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সে শাহী, পবিত্র স্থানে ও আশ্রয়ের স্থানে সকল প্রাণী এবং বৃক্ষ তরুলতার ও নিরাপত্তা রয়েছে। হত্যাকারী অপরাধী থেকে হেরেম এর সীমার ভিতরে কিসাস বা প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। এদের জন্য প্রাণের ক্ষমা রয়েছে। হ্যাঁ, তার পানাহারের পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে করে সে স্বয়ং সেখান থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাকে বন্দি করে কিসাস নেওয়া যাবে। অন্যান্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে বিধানাবলি ভিন্ন রয়েছে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

অন্যান্য ইমামগণের ভিন্ন মতামত রয়েছে। যার ব্যাখ্যা وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আয়াতের অধীনে আসবে। আর এখানে আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য নিরাপত্তার বিধানাবলি বর্ণনা করা। এখন যদি কোনো জালিম ইনসাফ ধ্বংস করে এবং বিধানাবলিকে ভঙ্গ করে কখানো নিরাপত্তায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তবে এর দ্বারা বিধানাবলির কিছু আসে যায় না।

মসজিদে হারামের সীমা ও বিধানসমূহের উপর কিয়াস করে কেউ কেউ হারামে মদীনার বিধান এবং সীমাসমূহও নির্ধারণ করেছেন। যার ব্যাখ্যাসমূহ কালাম ও ফিক্বহ শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করলে জানা সম্ভব হতে পারে। [প্রাগুক্ত]

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

কাবা সংক্রান্ত মাসায়েল : আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়।

১. বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাজের চাইতে তওয়াফ উত্তম।

২. ফরজ হোক অথবা নফল কাবা গৃহের অভ্যন্তরে যেকোনো নামাজ পড়া বৈধ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামাজ সংক্রান্ত মাসায়েল : আলোচ্য আয়াতে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কাবা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন যে, কা'বা ছিল তার সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। [সহীহ মুসলিম]

এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন– যদি কেউ মাকামে ইবরাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে ইবরাহীম ও কাবা উভয়টিকে সামনে রেখে যেকোনো দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হেরেমই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ হলো, তওয়াফের পর যে দু'রাকাত নামাজ মাকামে ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হেরেমের যেকোনো অংশে পড়লেই চলবে। অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামাজ ওয়াজিব। [জাসসাস, মোল্লা আলী কারী]

তবে এ দু'রাকাত নামাজ বিশেষভাবে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হেরেমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'রাকাত নামাজ কাবাগৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত হয়েছে। মোল্লা আলী কারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকাত নামাজ মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোনো কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হেরেম অথবা হেরেমের বাইরে যে কোনো স্থানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرٰهِيْمَ ..... عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

মুরাজায়া : আলোচ্য সম্পূর্ণ আয়াতটির মাঝে فَنُّ الْمُرَاجَعَة প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো কথোপকথনকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং বলাগাতপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করা। আলোচ্য আয়াতে পনেরোটিরও কম শব্দে আল্লাহ তা'আলা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : إِنِّيْ جَاعِلُكَ

ওয়াদার অর্থে খবর ব্যবহার : আলোচ্য অংশে জুমলায়ে খবরিয়াটি প্রতিশ্রুতি দানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

মাজাযে মুরসাল ও অন্ত্যমিল : আলোচ্য অংশে রুকূ'-সেজদাকারী দ্বারা নামাজ আদায়কারী উদ্দেশ্য। কারণ রুকূ ও সেজদা হলো নামাজের গুরুত্বপূর্ণ দুটি রোকন। এখানে মাজাযে মুরসাল হয়েছে।

اَلرُّكَّعِ আগে এবং পরে اَلسُّجُوْدُ ব্যবহার করা হয়েছে رِعَايَةُ الْفَصْل-এর কারণে। কারণ পূর্বাপরের আয়াতগুলোর প্রতিটির শেষে মদের হরফ রয়েছে।

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিচয় : ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস মতেও একজন পয়গাম্বর। তাওরাতে তার নাম রয়েছে আব্রাম ও আব্রাহাম এ দু'ভাবে। ইবরাহীম শব্দটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হলো- أَبٌ رَحِيْمٌ তথা দয়াশীল পিতা। তাওরাতের [বাইবেল পুরাতন নিয়ম] বর্ণনা মতে, তার ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে দশ পুরুষের ব্যবধান ছিল। অর্থাৎ, তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর একাদশ অধস্তন পুরুষ। তবে কিছু শক্তিশালী যুক্তির কারণে তাওরাতের ব্যাখ্যাকারদের মতে, তাঁর বংশসূত্রে কিছু পুরুষের নাম তাওরাতে বাদ পড়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস মরিস্টনের সর্বশেষ গবেষণামতে, তাঁর জন্মসন খ্রিস্টপূর্ব ২১৬০ অব্দ। তাওরাতে তার বয়স উল্লিখিত হয়েছে ১৭৫ বছর। এ হিসেবে ওফাতের সন হবে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮৫। পিতার নাম ছিল তারাহ (تارح), যার আরবি উচ্চারণ আযার। প্রাচীন ভাষাগুলোতে এ নামটি বিভিন্ন শব্দে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান হলো ব্যাবিলনের কালদানিয়া [ইংরেজি উচ্চারণে কালডিয়া] যা বর্তমান ইরাকের একটি শহর। যে নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাওরাতে সেটি উজ নামে উল্লেখ হয়েছে।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিচয় : হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিসরীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র। ইসমাঈল শব্দটিও হিব্রু ভাষা থেকে আরবিতে এসেছে। এর অর্থ হলো- আল্লাহ যার কথা শোনেন। তাঁর জন্মসন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০৭৪ অব্দ। আর মৃত্যু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯২৭ অব্দ। তাওরাতের বর্ণনা মোতাবেক তিনি ১৩৭ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩২]

١٢٦. ﴿وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا﴾ اَلْمَكَانَ ﴿بَلَدًا اٰمِنًا﴾ ذَا أَمْنٍ وَقَدْ أَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفَكُ فِيْهِ دَمُ إِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهِ أَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ ﴿وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ﴾ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهِ وَكَانَ أَقْفَرَ لَا زَرْعَ فِيْهِ وَلَا مَاءَ ﴿مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ بَدَلٌ مِنْ "أَهْلَهُ" وَخَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ ﴿قَالَ﴾ تَعَالٰى ﴿وَ﴾ ارْزُقُ ﴿مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ﴾ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ ﴿قَلِيْلًا﴾ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ﴿ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ﴾ أُلْجِئُهُ فِي الْآخِرَةِ ﴿اِلٰى عَذَابِ النَّارِ﴾ فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ﴾ اَلْمَرْجِعُ هِيَ.

১২৬. স্মরণ করুন (যখন ইবরাহীম বলেছিল), হে আমার প্রতিপালক! এটাকে এই স্থানটিকে নিরাপদ নিরাপত্তার অধিকারী নগরে পরিণত করুন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়া কবুল করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এই শহরটিকে হারাম নির্ধারণ করেন। সুতরাং এ স্থানে কোনো মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা, কারো উপর নিগ্রহ চালানো, কোনো পশু শিকার করা, সজীব ঘাস উৎপাটন করা বৈধ না। আর তার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ বাক্যটি اَهْلَهٗ-এর بَدَلْ হয়েছে। উল্লিখিত বক্তব্য لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ-এর প্রতি লক্ষ্য করে ইবরাহীম (আ.) এই দোয়ায় কেবল মুমিনের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে ফলফলাদি দিয়ে রিজিক প্রদান করুন। আল্লাহ তা'আলা তায়েফকে শাম থেকে তুলে এনে এ আবেদন পূর্ণ করেছেন। মক্কা শস্যপত্রহীন, পানিশূন্য এক অনুর্বর বিরান ভূমি ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আর যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করবে, তাকেও জীবনোপকরণ দান করব। অনন্তর কিছুকালের জন্য অর্থাৎ, জীবনকালের জন্য রিজিক দান করতঃ জীবনোভোগ করতে দেব। اُمَتِّعُهٗ ক্রিয়াটির ت-টি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়রূপেই পঠিত। অতঃপর তাকে পরকালে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করে জবরদস্তি করে নিয়ে যাব। সে এটা হতে আর কোনো মুক্তির জায়গা পাবে না। আর এটা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا - اَلْمَكَانَ - بَلَدًا

দোয়ার সময় বর্ণনা : মুফাসসির (র.) هٰذَا-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হিসেবে اَلْمَكَان নির্ণয় করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে যে দোয়া করা হয়েছে তা শহর হওয়ার পূর্বেকার।

قَوْلُهٗ : بَلَدًا اٰمِنًا - ذَا أَمْنٍ

اٰمِنًا-এর নিসবত সংশ্লিষ্ট সংশয় নিরসন : এখানে শহরের দিকে أَمْنٌ তথা নিরাপত্তার নিসবত করা হয়েছে, অথচ নিরাপত্তার অধিকারী শহর হয় না; বরং শহরের অধিবাসীরা হয়ে থাকে। তাই মুফাসসির (র.) ذَا اَمْنٍ তাফসীর করে বুঝিয়েছেন যে, এখানে اِسْمِ فَاعِلْ-টি মাজাযীভাবে اَلْبَلَدْ-এর প্রতি নিসবত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : لَا يُسْفَكُ فِيْهِ دَمُ اِنْسَانٍ

হেরেমের ভিতরে কেসাসের বিধান : যদি কেউ হেরেমের বাইরে হত্যা করে হেরেমে প্রবেশ করে তাহলে হানাফী মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা হবে না; কিন্তু তাকে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সামাগ্রী বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে সে হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য হয়। সে বের হলে বাইরে গিয়ে তার কেসাস সম্পন্ন করা হবে।

শাফেয়ী মাযহাব মতে, বাহিরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর ভিতরে প্রবেশ করলে তার থেকে হেরেমে কেসাস নেওয়া হবে। আর যদি হেরেমের ভিতরেই হত্যা করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সেখানে কেসাস গ্রহণ করা হবে। [জামালাইন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৭]

قَوْلُهٗ : وَلَا يُصَادُ صَيْدُه

صَيْد দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য ইবারতে صَيْدٌ শব্দটি مُصَيَّدْ-এর অর্থে। صيد দ্বারা مؤذٍ বা ক্ষতিকর জন্তু বের হয়ে গেছে। ফলে ক্ষতিকর প্রাণীকে মারা যাবে। যেমন– কাক, চিল, বিচ্ছু। এমনিভাবে গৃহপালিত প্রাণীও বের হয়ে গেছে। যেমন– উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। কারণ এগুলো হেরেমের ভিতরে জবাই করা জায়েজ আছে।

قَوْلُهٗ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ

ঘাস কর্তনের হুকুম : হেরেমের তাজা ঘাস কর্তন করা যাবে না। আহনাফের মতে, যে সকল বৃক্ষ বা লতাপাতা নিজে নিজে গজায় সেগুলো কর্তন করা জায়েজ নেই। যেগুলো শুকিয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায়, তা কর্তন করা যাবে এবং বিশেষভাবে ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ

نَقْلِ الطَّائِفِ-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তায়েফকে শাম থেকে স্থানান্তরিত করে মক্কার অদূরে এনে আবাদ করে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে ফলমূল সারা বছর মক্কায় আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মুফাসসির (র.) এর দ্বারা একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করে ছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শামের একটি উর্বর অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে মক্কায় আনার হুকুম দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) শামের একটি উর্বর ভূখণ্ড তুলে এনে প্রথমে কাবা ঘরের চতুর্পার্শ্বে সাতবার তওয়াফ করিয়ে তারপর মক্কার অদূরে একটি স্থানে রেখে দিলেন। যাকে তায়েফ বলা হয়।

পর্যালোচনা : মুফাসসির (র.) এ ঘটনাটি تَلْخِيْصُ الْكَوَاشِ থেকে নকল করেছেন। কতিপয় মুফাসসির আলোচ্য অংশের তাফসীরে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন, এ ঘটনাটির উৎস হলো মানুষের মাঝে প্রচলিত গল্প। এ ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কোনো উৎস নেই। [তাফসীরে বাগাভী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৪; আল-মুফাসসাল ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম : পৃষ্ঠা ৬১]

قَوْلُهٗ : وَ– أَرْزُقُ – مَنْ كَفَرَ

ফে'ল উহ্য মানার কারণ : মুফাসসির (র.) এখানে وَارْزُقْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَنْ كَفَرَ অংশটি উহ্য ফে'লের মাফ'উল হিসেবে মানসূব হয়েছে এবং তা عَطْف হয়েছে مَنْ اٰمَنَ-এর উপর।

قَوْلُهٗ : فَأُمَتِّعُهٗ – بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ فِى الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ

فَأُمَتِّعُهٗ-এর কেরাতের বর্ণনা : فَأُمَتِّعُهٗ-এর মাঝে দুটি কেরাত রয়েছে। একটি তাশদীদ দিয়ে, এটি জমহুরের কেরাত। এ সুরতে শব্দটি بَابِ تَفْعِيْل থেকে مُضَارِع مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। অপরটি তাখফীফ করে। এটি ইবনে আমেরের কেরাত। এ সুরতে শব্দটি بَابِ اِفْعَال থেকে হবে।

قَوْلُهٗ : قَلِيْلًا – مُدَّةَ حَيَاتِهٖ

قَلِيلًا-এর তারকীবগত অবস্থান বনর্ণনা : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, قليلا তারকীবে مفعول فيه হিসেবে মানসূব হয়েছে; مفعول به হিসেবে নয়।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ أَضْطَرُّهٗ – اُلْجِئُه فِى الْآخِرَةِ

أَضْطَرُّ-এর অর্থ বর্ণনা : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে اِضْطِرَار মাজাযী বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : بِئْسَ الْمَصِيْر – الْمَرْجِعُ هِىَ

مَخْصُوْص بِالذَّمِّ-এর উল্লেখ : মুফাসসির (র.) এখানে هِىَ মাহযূফ ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। আর সেটি হলো- اَلنَّار; আর اَلْمَرْجِعُ দ্বারা বুঝিয়েছেন, اَلْمَصِيْر শব্দটি ইসমে যরফ; মাসদার নয়।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَضْطَرُّ : সীগাহ متكلم واحد বহছ مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الاضطرار মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমি বাধ্য করব। اِضْطِرَار হলো اِخْتِيَار-এর বিপরীত। اِضْطِرَار বলা হয়, কারো থেকে কোনো কর্ম অনিচ্ছাকৃত সংঘটিত হওয়া। অনুরূপভাবে এমন স্থানেও اِضْطِرَار ব্যবহার হয় যেখানে কাজটি নিজেই করে; কিন্তু তা থেকে বিরত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করে। যেমন- প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃতজন্তু ভক্ষণ করা।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ ..... وَبِئْسَ الْمَصِيْر

اِجْعَلْ ফে'ল উহ্য যমীর ফায়েল هٰذَا ইসমে ইশারা মাফ'উলে বিহী بَلَدًا اٰمِنًا মাওসূফ-সিফাত মিলে দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। وَارْزُقْ আতফ হয়েছে اِجْعَلْ-এর উপর اَهْلَهٗ মাফ'উলে বিহী مِنَ الثَّمَرَاتِ মুতা'আল্লিক اُرْزُقْ ফে'লের সাথে। مَنْ ইসমে মাওসূল اٰمَنَ ফে'ল, উহ্য هُوَ যমীর ফায়েল بِاللّٰهِ মুতা'আল্লিক اٰمَنْ ফে'লের সাথে। وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আতফ হয়েছে بِاللّٰهِ-এর উপর।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ ..... اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ

اِبْرَاهِيْم ও اَلثَّمَرَات শব্দদ্বয়ের লিখনশৈলী : ১২৬নং আয়াতে উল্লিখিত اِبْرَاهِيْم ও اَلثَّمَرَاتِ শব্দদ্বয়ে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে ه বর্ণের পর ي এবং ء বর্ণের পর আলিফযোগে اَلثَّمَرَاتِ ও اِبْرَاهِيْم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দদ্বয় যথাক্রমে ه বর্ণে খাড়া যের এবং ء বর্ণে খাড়া যবরযোগে اِبْرَاهِم ও اَلثَّمَرٰت লিখা আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا

فَاُمَتِّعُهٗ শব্দের কেরাত : ১২৬নং আয়াতে উল্লিখিত فَاُمَتِّعُهٗ শব্দে দু'ধরনের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে بَابِ تَفْعِيْل থেকে নির্গত ধরে فَاُمَتِّعُهٗ পড়েছেন।

খ. ইবনে আমের (র.) শব্দটিকে بَابِ اِفْعَال থেকে নির্গত ধরে فَاُمْتِعُهٗ পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَات : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ ..... وَبِئْسَ الْمَصِيْر

পূর্বের আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরকাল সংক্রান্ত দোয়ার আলোচনা ছিল। আর এখানে পার্থিব নিয়ামত রিজিকের দোয়া করা হয়েছে।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ ..... وَبِئْسَ الْمَصِيْر

পুনরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া করার কারণ : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন- جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا; তারপর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার কারণ কী? এর কারণ হলো, পূর্বের নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল اَلْاَمْنُ مِنَ الْاَعْدَاءِ وَالْخَسْفِ وَالْمَسْخِ তথা শত্রু, ধ্বসে যাওয়া এবং বিকৃতি থেকে নিরাপত্তা। আর এখানে উদ্দেশ্য اَلْاَمْنُ مِنَ الْجُدَبِ وَالْقَحْطِ অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন থেকে নিরাপত্তা।

তা ছাড়া আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে দোয়া করেছিলেন। তা হলো মক্কা নগরী গোড়াপত্তন হওয়ার আগে। এখানে শহর আবাদ হওয়ার এবং সেই সাথে নিরাপত্তার দোয়াও করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর আয়াতে যে اِجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا রয়েছে, সেখানে শুধু নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা হয়েছে। কেননা, সেটি শহর আবাদ হওয়ার পরের দোয়া। এজন্য সেখানে هٰذَا الْبَلَدَ এবং এ আয়াতে هٰذَ بَلَدًا বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন দোয়া। কেউ কেউ উভয়টিকে একই দোয়া মনে করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বাস্তবতা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এসব দোয়া কবুল হয়েছে। প্রথম দোয়া ছিল, মক্কা নগরীকে নিরাপদ করে দেওয়া। ইসলামি শরিয়তে মক্কা শহর ও শহরতলীকে হারাম ঘোষণা করেছে। এর চতুঃসীমার কোনো প্রাণীকে শিকার করা যায় না। কোনো খুনী ব্যক্তিও কাবা ঘরে এসে আশ্রয় নিলে তাকে সেখানে হত্যা করা যায় না ইত্যাদি। মক্কা নগরী ও কাবা ঘরের এ মর্যাদা জাহেলী যুগের লোকেরাও রক্ষা করতো।

দ্বিতীয় দোয়া ছিল, মক্কাবাসীরা যেন ফলফলাদি খাদ্যরূপে পেতে থাকে। মক্কা এমন একটি ভূখণ্ডে অবস্থিত, যেখানকার সব ভূমি হয়তো ধু ধু বালুকাময় কিংবা কঠিন পাথুরে। বৃষ্টির পরিমাণ অতি অল্প। এরপরেও শহরের তাজা ফলমূল, তরিতরকারী ও শস্য-ফসলের চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে।

ঈমানসংক্রান্ত দুটি বিষয় উল্লেখ করার কারণ : ঈমান সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ২. আখেরাতের প্রতি ঈমান। এ দুটির দ্বারা ঈমানের অন্যান্য জরুরি অঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান ঈমানযোগ্য সকল বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : بَلَدًا اٰمِنًا

ইসনাদে মাজাযী : আলোচ্য অংশে بَلَدٌ-এর দিকে اٰمِنٌ-এর ইসনাদটি মাজাযী। কারণ بَلَدٌ কখনো اٰمِنٌ হয় না; বরং أَهْلُ الْبَلَدِ (এলাকাবাসী) اٰمِنٌ হয়। এখানে এর দ্বারা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুবালাগা প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এলাকার অধিবাসীদের মাঝে اٰمِنٌ-এর গুণটি এতো প্রবল যে, এলাকাটি যেন اٰمِنٌ হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ : اَضْطَرُّهٗ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ

ইস্তিয়ারা : আলোচ্য অংশে ইস্তিয়ারা রয়েছে। এখানে কাফেরের অবস্থার সাথে অনোন্যপায় হয়ে কিছু গ্রহণ করেছে এমন ব্যক্তির অবস্থার উপমা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর مُشَبَّهٌ بِهٖ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শব্দকে مُشَبَّهٌ-এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

✪ تَعَارُفُ الْاَمَاكِنِ : স্থান পরিচিতি

তায়েফের পরিচয় : তায়েফ হলো মক্কার নিকটবর্তী একটি এলাকা। এলাকাটিতে খেজুর, আঙ্গুর ও বাদামসহ বিভিন্ন ফলফলাদি উৎপন্ন হয়। মক্কাবাসীর ফলের চাহিদা তায়েফে উৎপাদিত ফলফলাদি দ্বারা পূর্ণ হতো। তায়েফ গোড়াপত্তন হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে। বর্তমানে এটি সৌদি আরবের একটি শহর। শহরটির নামকরণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে। এর মাঝে সঠিকতম হলো, জাহেলী যুগে বনু সাকীফ শহরের চারপাশে দেয়াল তৈরি করেছিল। তাই শহরের এ নামকরণ হয়েছে।

শামের পরিচয় : শাম একটি বিরাট অঞ্চলের নাম। আরবদের যুগে ফিলিস্তিন, জর্দান এবং বর্তমান সিরিয়ার দামেস্ক, হিমস ও কুনছারীন-এর সমন্বিত অঞ্চলকে শাম বলা হতো। পরবর্তীতে সাধারণত শাম বলতে সিরিয়াকে বুঝাত। বর্তমানে শাম বলে দামেস্ককে বুঝানো হয়। শামের নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। একটি অভিমত হলো, হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, মহাপ্লাবনের পর সে এই এলাকায় এসে বসতি গড়েছিল। শামের এলাকাটি ইংরেজি ভাষায় Levant (লেভ্যান্ট) নামেও পরিচিত।

١٢٧. ﴿وَ﴾اُذْكُرْ ﴿إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ﴾ اَلْأُسُسَ أَوِ الْجُدُرَ ﴿مِنَ الْبَيْتِ﴾ يَبْنِيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَرْفَعُ ﴿وَإِسْمٰعِيلُ ط﴾ عَطْفٌ عَلٰى إِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلَانِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ بِنَاءَنَا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ﴾ لِلْقَوْلِ ﴿الْعَلِيْمُ﴾ بِالْفِعْلِ.

১২৭.আর স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল শব্দটি إِبْرَاهِيْم-এর উপর আতফ হয়েছে। কাবাগৃহের বুনিয়াদ ভিত্তি বা দেয়ালসমূহ উঠাচ্ছিল অর্থাৎ, তা স্থাপন করছিল। مِنَ الْبَيْتِ অংশটি يَرْفَعُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। তখন তারা বলছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নির্মাণ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সকল কথার ও সর্বজ্ঞ সকল কাজ সম্পর্কে।

١٢٨. ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ﴾ مُنْقَادِيْنِ ﴿لَكَ وَ﴾ اِجْعَلْ ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ أَوْلَادِنَا ﴿أُمَّةً﴾ جَمَاعَةً ﴿مُسْلِمَةً لَكَ ص﴾ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ وَأَتٰى بِهٖ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهٖ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿وَأَرِنَا﴾ عَلِّمْنَا ﴿مَنَاسِكَنَا﴾ شَرَائِعَ عِبَادَتِنَا أَوْ حَجِّنَا ﴿وَتُبْ عَلَيْنَا ج﴾ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ سَأَلَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا تَوَاضُعًا وَتَعْلِيْمًا لِذُرِّيَّتِهِمَا.

১২৮.হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত বাধ্যগত করুন এবং আমাদের বংশধর সন্তানদের থেকে আপনার অনুগত এক উম্মত জামাত গঠন করুন مِنْ تَبْعِيْضِيَّة শব্দটি مِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর مِنْ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি অনুসারে এ স্থানে مِنْ تَبْعِيْضِيَّة ব্যবহার হয়েছে। আর আমাদেরকে মানসিক ইবাদতের নিয়ম-কানুন বা হজের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন শিখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরববশ হোন। নিঃসন্দেহে আপনি ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। তাঁরা মাসূম ও নিস্পাপ হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশ এবং বংশধরগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তওবা প্রার্থনা করেছেন।

١٢٩. ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ﴾ أَيْ أَهْلِ الْبَيْتِ ﴿رَسُوْلًا مِّنْهُمْ﴾ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَقَدْ أَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ﴿يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ﴾ الْقُرْآنَ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ﴾ الْقُرْآنَ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أَيْ مَا فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ﴿وَيُزَكِّيْهِمْ ط﴾ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ﴾ الْغَالِبُ ﴿الْحَكِيْمُ﴾ فِيْ صُنْعِهٖ.

১২৯.হে আমাদের প্রতিপালক! প্রেরণ করুন তাদের মাঝে অর্থাৎ, মক্কাবাসীদের মাঝে তাদের নিজেদেরমধ্য হতে এক রাসূল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণ করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছিলেন। যে আপনার আয়াতসমূহ অর্থাৎ, আল কুরআন তাদের নিকট তিলাওয়াত করে শোনাবে, তাদেরকে কিতাব কুরআন ও হেকমত তার মধ্যস্থিত বিধি-বিধান শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। শিরক হতে সুপবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী অতিপ্রবল ও কাজে কৌশলে প্রজ্ঞাময়।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُه : يَبْنِيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَرْفَعُ

يَرْفَعُ-এর অর্থ বর্ণনা : এটি يَرْفَعُ-এর তাফসীর। মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, يَرْفَعُ দ্বারা রূপকার্থে بَنى উদ্দেশ্য। بِنَاء [নির্মাণ]-কে رَفْع [উত্তোলন] দ্বারা বর্ণনা করার কারণ হলো, কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল না। বরং পূর্ব থেকেই কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল। তা ধ্বসে যাওয়ার পর এখন নতুন করে তা নির্মাণ করা হচ্ছিল। নির্মাণের পূর্বে ভিত্তিটি নিচু ছিল। তাই يَرْفَعُ শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاِسْمٰعِيْلُ - عَطْفٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

اِسْمٰعِيْل শব্দের আতফ নিয়ে সন্দেহ নিরসন : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। সন্দেহটি হলো اِسْمٰعِيْل শব্দটি جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة; কেননা, যদি اِسْمٰعِيْل শব্দটি اِبْرَاهِيْمَ-এর উপর عَطْف হতো তাহলে اِسْمٰعِيْل-কে اَلْقَوَاعِدَ তথা مَفْعُوْل-এর পূর্বে আনা হতো। তা যেহেতু আনা হয়নি তাই বুঝা যায় যে, নতুন জুমলা হিসেবে মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা হলো, কাবা নির্মাণে উভয়েই শরিক ছিলেন। তাই মুসফাসসির (র.) عَطْف বলেছেন। বাকি اَلْقَوَاعِدَ-এর আগে না আনার কারণ হলো, একথা বুঝানো যে, মূল হলেন ইবরাহীম (আ.) আর ইসমাঈল (আ.) হলেন তাঁর সহায়ক।

قَوْلُهُ : يَقُوْلَانِ - رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا بِنَاءَنَا

بِنَاءَنَا ও يَقُوْلَانِ উহ্য ধরার কারণ : মুফাসসির (র.) এখানে رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا-এর পূর্বে يَقُوْلَانِ উহ্য ধরেছেন দুটি কারণে।

১. এর দ্বারা এ কথা বুঝিয়েছেন যে, পরবর্তী رَبَّنَا অংশটি উহ্য يَقُوْلَانِ-এর মাকুলা হয়ে يَرْفَعُ-এর ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। يَقُوْلَانِ উহ্য ধরা ছাড়া رَبَّنَا-কে হাল বলা শুদ্ধ হয় না। কারণ رَبَّنَا বাক্যটি হলো اِنْشَائِيَّة; আর جُمْلَة اِنْشَائِيَّة হাল হতে পারে না।

২. যদি يَقُوْلَانِ উহ্য না ধরা হয়, তাহলে একই সম্বোধনে একই ব্যক্তির عَطْف ছাড়াই غَائِبْ ও مُتَكَلِّمْ হওয়া লাযেম আসে। কেননা, يَرْفَعُ ابْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ الخ হলো غَائِبْ আর رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا الخ হলো مُتَكَلِّمْ; সুতরাং যখন يَقُوْلَانِ উহ্য ধরা হয়েছে তখন উভয় জুমলা غَائِبْ হয়ে গেছে।

উহ্য মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত : بِنَاءَنَا - تَقَبَّلْ مِنَّا-এর দ্বারা মুফাসসির (র.) تَقَبَّلْ ফে'লে মুতা'আদ্দীর مَفْعُوْلِ بِهٖ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

قَوْلُهُ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا - اَوْلَادِنَا - اُمَّةً - جَمَاعَةً ..... وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ

مِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর من-কে تَبْعِيْضِيَّة সাব্যস্ত করার কারণ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর মধ্যে مِنْ-কে تَبْعِيْضِيَّة সাব্যস্ত করার কারণ হলো, উপরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমামতের প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশধরদের জন্য নয়; বরং তাদের জন্য যারা ঈমানদার ও নেককার হবে। যদি مِن-কে تَبْعِيْضِيَّة না মানা হয়, তাহলে لَا يَنَالُ عَهْدِى ও وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। কারণ, তখন কোনো ইসতিসনাবিহীন সমস্ত বংশধরের জন্য ইমামতের দোয়া সাব্যস্ত হবে।

أمة-এর অর্থ বর্ণনা : امة শব্দটি কখনো একক ব্যক্তির উপরেও প্রয়োগ হয়। যেমন কুরআনে আছে- إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ ; মুফাসসির (র.) তাই جماعة বলে বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে امة দ্বারা দল ও গোষ্ঠী উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : أَرِنَا - عَلِّمْنَا - مَنَاسِكَنَا

إِرَاءَةٌ-এর অর্থ নির্ণয় : إِرَاءَةٌ শব্দটি কাউকে কোনো কিছু দেখিয়ে দেওয়া এবং শিখিয়ে দেওয়া, এ দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথম অর্থের ক্ষেত্রে এটি তিন মাফ'উল দাবি করে। আর দ্বিতীয় অর্থে দুটি মাফ'উল দাবি করে। মুফাসসির (র.) عَلِّمْنَا বলে বুঝিয়েছেন যে, اَرِنَا এখানে إِرَاءَةٌ [দেখানো] ক্রিয়ামূল চোখে দেখিয়ে দেওয়ার অর্থে নয়; বরং শিখিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়ার অর্থে। কেননা أَرَى ক্রিয়া দুটি مَفْعُوْل-এর দিকে مُتَعَدِّىْ হলে তার অর্থ দর্শন না হয়ে শিক্ষাদান হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ اَىْ اَهْلِ الْبَيْتِ

ذُرِّيَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : وَابعَثْ فِيْهِمْ-এর هُمْ যমীরটি ذُرِّيَّةٌ-এর দিকে ফিরেছে। অথচ ذُرِّيَّة হলো مُؤَنَّثْ তাই এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, এখানে ذُرِّيَّةٌ দ্বারা اَهْلَ الْبَيْتِ উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনো আপত্তি থাকল না।

قَوْلُهٗ : اَلْحِكْمَةَ - مَا فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ

حِكْمَةٌ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) حِكْمَةٌ-এর তাফসীর করেছেন কুরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান দ্বারা। এ ব্যাপারে মুফাসসির গণের আরো অভিমত রয়েছে। যেমন– কাতাদা (র.)-এর মতে, হেকমত দ্বারা সুন্নত উদ্দেশ্য। মালেক (র.) বলেন, দীনের ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য হলো হেকমত। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, হেকমত দ্বারা কুরআন বুঝার উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

اَلْقَوَاعِدَ : এটি قَاعِدَة-এর বহুবচন। قُعُوْدٌ بِمَعْنٰى ثُبُوْتٌ-থেকে নির্গত। তারপর তাতে مَعْنٰى اِسْمِيَّتْ প্রবল হওয়ার কারণে মাওসূফ ছাড়াই ব্যবহার হওয়ার শুরু হয়েছে।

يُزَكِّيْ : সীগাহ اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْكِيَةَ মূলবর্ণ (ز - ك – و) জিনস وَاوِىْ ناقص অর্থ- তিনি পবিত্র করবেন।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ ..... اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وَاوْ হরফে ইস্তিনাফিয়া اِذْ হলো اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের মাফ'উলে বিহী। يَرْفَعُ ফে'ল اِبْرَاهِيْم ফায়েল اَلْقَوَاعِدَ মাফ'উলে বিহী مِنَ الْبَيْتِ জার-মাজরূর মিলে يَرْفَعُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। اِسْمٰعِيْلَ আতফ হয়েছে اِبْرَاهِيْمَ-এর উপর। رَبَّنَا হলো مُنَادٰى مُضَاف হরফে নেদা উহ্য রয়েছে تَقَبَّلْ ফে'ল مِنَّا জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক تَقَبَّلْ ফে'লের সাথে। اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল كَ হলো اِنَّ-এর ইসম اَنْتَ মুবতাদা اَلسَّمِيْعُ প্রথম খবর اَلْعَلِيْمُ দ্বিতীয় খবর। মুবতাদা তার উভয় খবর মিলে খবরে اِنَّ; اِنَّ তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ ..... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

وَاوْ হরফে আতফ اِبْعَثْ ফে'ল যমীর ফায়েল فِيْهِمْ মুতা'আল্লিক اِبْعَثْ ফে'লের সাথে। رَسُوْلًا মাফ'উলে বিহী مِنْهُمْ وَاوْ মুতা'আল্লিক হয়ে رَسُوْلًا-এর সিফাত। يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ জুমলা হয়ে মাতূফ আলাইহি وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ জুমলা হয়ে মাতূফ, মাতূফ আলাইহি ও মাতূফ মিলে জুমলায়ে আতিফা। اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ইবারতটুকুর তারকীব اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-এর মতো।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে ওসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

اِبْرٰهِيْم শব্দের লিখনশৈলী : ১২৭নং আয়াতে উল্লিখিত اِبْرٰهِيْم শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ه বর্ণের পর ي যোগে اِبْرٰهِيم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ه বর্ণে খাড়া যেরযোগে اِبْرٰهِم লিখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ ..... السَّمِيْعُ الْعَلِيْم

আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা : আলোচ্য আয়াতে কা'বা নির্মাণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হচ্ছে। সেই সাথে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর মর্যাদা তুলে ধরে প্রকারান্তরে রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের নবী।

কাবা নির্মাণের ইতিহাস : হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কা'বাগৃহের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছিল। হযরত আদম ও তাঁর সন্তানদের জন্য কাবাকেই সর্বপ্রথম কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ তা'আলা কাবাগৃহকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেন এবং হাজরে আসওয়াদটি হযরত জিবরাঈল (আ.) আবূ কুবাইস পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন। প্লাবনের পর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত কা'বার স্থানটি খালি ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কাবা নির্মাণের হুকুম দিলে তিনি তার স্থানটি দেখিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কা'বার স্থান দেখিয়ে দেন এবং হাজরে আসওয়াদের সংবাদও জানিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বা পুনরায় নির্মাণ করেন।

কাবাগৃহ সর্বমোট দশবার নির্মিত হয়েছে-

১. ফেরেশতাদের নির্মাণ
২. হযরত আদম (আ.)-এর নির্মাণ।
৩. হযরত শীস (আ.)-এর নির্মাণ।
৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণ।
৫. আমালেকা সম্প্রদায়ের নির্মাণ।
৬. জুরহাম গোত্রের নির্মাণ।
৭. কুসাই গোত্রের নির্মাণ।
৮. কুরাইশের নির্মাণ। সে নির্মাণে রাসূল ﷺ শরিক ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর।
৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর নির্মাণ।
১০. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্মাণ। বর্তমানে সেভাবেই রয়েছে। স্মরণে রাখার সুবিধার্থে জনৈক কবি কবিতাকারে এই দশটি নির্মাণ একত্রে রচনা করেছেন।

بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرٌ فَخُذْهُمْ ✡ مَلٰئِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ وَآدَمُ
فَشِيْثٌ فَاِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ عَمَالِقُ ✡ قُصَيٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمُ
وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَنٰى كَذَا ✡ بِنَاءُ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا مُتَمِّمُ

[হাশিয়ায়ে জামাল : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬০]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا ..... التَّوَّابُ الرَّحِيْم

বংশধর সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া : হযরত ইবরাহীম (আ.) وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ বলে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার অনুগত একটি গোষ্ঠী বানানোর দোয়া করেছেন। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনো সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলি যুগে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনও হযরত ইবরাবহীম (আ.)-এর বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন– যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল। [বাহরে মুহীত]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ ..... أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ

ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার ব্যাখ্যা ও তার ফলাফল : হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণের দোয়া করেছেন। এখানে رَسُوْلًا শব্দটি একবচন। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, এখানে মাত্র একজন রাসূল প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে প্রেরণের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার ফসল। রাসূল ﷺ হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর থেকে আগমন করা একমাত্র নবী। এর দ্বারা اِبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا যে, রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা আরও স্পষ্ট হয়।

রাসূল ﷺ-এর দায়িত্বসমূহ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া থেকে রাসূল ﷺ-এর দায়িত্বসমূহ বুঝা যায়। রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব হলো চারটি। যথা–

১. কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো। এটি يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ থেকে বুঝা যায়।
২. কুরআনের বিধানাবলি শিক্ষা দেওয়া। এটি وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ থেকে বুঝা যায়।
৩. হেকমত শিক্ষা দান করা। এটি وَالْحِكْمَةَ অংশ থেকে বুঝা যায়। আলোচ্য অংশে হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য কী, সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে।
   কেউ বলেছেন, এর দ্বারা ইজতিহাদের জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন, দীনের সহীহ বুঝ উদ্দেশ্য। তবে অধিকাংশের উদ্দেশ্য হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্নত।
৪. উম্মতের আত্মশুদ্ধি করা। এটি وَيُزَكِّيْهِمْ থেকে বুঝা যায়।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ

মুযারে ব্যবহার : আলোচ্য অংশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কা'বা নির্মাণের ঘটনাটি অতীত কালে ঘটেছে। কিন্তু এর জন্য মুযারের ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে ঘটনাটির দৃশ্যরূপ জাগিয়ে তোলার জন্য।

✪ اَلْاَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاٰيَاتِ : আয়াত থেকে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ..... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم

সৎকাজের পর দোয়া করা : হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বাঘর নির্মাণের সময়ে বা পরে বংশধরসহ সকলের জন্য দোয়া করেছেন। এর কারণে ফকীহগণ বলেছেন, যে কোনো ভালো কাজের পরে দোয়া করা মোস্তাহাব। যেমন– নামাজের পর দোয়া এবং রোজার ইফতারের পর দোয়া করা। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৮]

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة ثم بين كم سؤالا يتعلق بابتلاء اللّٰه ابراهيم وما هى؟

ب. فسر الآية حيث تتضح الاسئلة المتعلقة بالآية.

ج. ركب قوله " لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ثم ترجمه فصيحة.

د. أوضح ما استفدت من أخر جزء الآية حيث تتضح مسئلة الامامة المختلف فيها بين اهل السنة والمعتزلة.

ه. هل كان ابتلاء ابراهيم كابتلائنا للإمامة او لا؟ بين مع ايضاح المستفاد منه.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَّاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. فسر قوله" مثابة وامنا " ثم اوضح المسألة المتعلقة بها -

ج. حقق قوله البيت، مقام ابراهيم، وعهدنا، العاكفين والركع، السجود، حيث يندفع الانغلاق.

د. فسر فوله " اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ " بحيث تقفل لسان من ينتهك شانه المسجد ويلعب به.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة.

ب. متى دعا ابراهيم عليه السلام بهذه الكلمات وأين؟ اكتب ثم اوضح حل التعارض بين قوله "رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا" بغير الف ولام وبين قولهٗ فِى سُوْرَةِ اِبْرَاهِيمَ "رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا" بِاَلِفٍ وَلَام.

ج. قولهٗ "وارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ الخ ما معنى الثمرات وما المراد هنا اوضح كى يغلق باب السؤال القلق فى حيز معاشهم من دون اسبابه فيهم ثم بين وجه تخصيص الْمُؤمنين بالذكر مع بيان ما يشكل عليه والجواب عنه.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذ يَرفَعُ اِبْرٰ هِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ واسْمٰعِيلُ ربَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

أ. ترجم الايتين الكريمتين فصيحة.

ب. كيف بنى بيت الله بين تاريخه من بدايته الى زمن ابراهيم عليه السلام مفصلا موضحا.

ج. بين فائدة الفرق "ابراهيم "و" اسماعيل " بالمفعول، ثم بين كيفية بناء البيت فى زمانهما بالايضاح التام.

د. لم حمدا لله بقوله فى هذا المقام " السميع والعليم" دون البصير والخبير او غيرها؟ اجب بالتيقظ التام مع بيان اسباقك منه.

ه. ما معنَى الامةِ؟ وَكم معنى يُطْلَقُ على لفظ "الأمة" ؟ وما المراد ههنا؟ اكتب بالدلائل القطعية، ثم بين فائدة ذكر مِنْ فى قوله "ومن ذريتنا".

و. ما استفدت من بناء ابراهيم البيت ودعائه عقب البناء بالكلمات المذكورة؟ اوضح بحيث تحثوا التراب فى افواه اليهود والنصارى والمشركين الضالين وتثبت به غلبة الاسلام على سائر الملل الباطلة.

রুকূ' : ১৬

وَصِيَّةُ إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَبْنَاءَهُمَا

হযরত ইবরাহিম ও ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক স্বীয় সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রদান

خُلَاصَةُ الرُّكُوْعِ : রুকূ'র সারসংক্ষেপ

- একমাত্র নির্বোধরাই মিল্লাতে ইবরাহীম ত্যাগ করে
- দুনিয়া ও আখেরাতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মর্যাদা
- আল্লাহ তা'আলার প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আনুগত্য
- সন্তানদের প্রতি হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.)-এর অসিয়ত
- মৃত্যুশয্যায় হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রশ্ন ও সন্তানাদির উত্তর
- ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের পরিচয়
- হেদায়াতের মানদণ্ড উল্লেখ
- কুরআন দ্বারা আল্লাহ কাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন
- ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি ভর্ৎসনা

١٣٠. ﴿وَمَنْ﴾ أَيْ لَا ﴿يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ﴾ فَيَتْرُكُهَا ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ جَهِلَ أَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ يَجِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ أَوِ اسْتَخَفَّ بِهَا وَامْتَهَنَهَا ﴿وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ﴾ اخْتَرْنَاهُ ﴿فِي الدُّنْيَا ۚ﴾ بِالرِّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ ﴿وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ اَلَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى.

১৩০. ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে কে মুখ ফেরায়? অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তিই তা ছেড়ে দেয় না। কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে নির্বোধ করে রেখেছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সুতরাং তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করা তার কর্তব্য। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি অজ্ঞ অথবা এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি নিজেকে নিকৃষ্ট ও হীন করে তুলেছে। পৃথিবীতে তাঁকে আমি রিসালাত ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব দ্বারা মনোনীত করেছি গ্রহণ করে নিয়েছি। পরকালেও সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।

١٣١. وَاذْكُرْ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ﴾ اِنْقَدْ لِلّٰهِ وَأَخْلِصْ لَهُ دِيْنَكَ ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾.

১৩১. আর স্মরণ করো তাঁর প্রতিপালক যখন তাঁকে বলেছিলেন, অনুগত হও আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করো এবং দীনকে তার জন্যই নিখাদ করো, তিনি বলেছিলেন, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আমি আত্মসমর্পণ করলাম।

١٣٢. ﴿وَوَصّٰى﴾ وَفِيْ قِرَاءَةٍ أَوْصٰى ﴿بِهَا﴾ بِالْمِلَّةِ ﴿إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۘ﴾ بَنِيْهِ قَالَ ﴿يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ﴾ دِيْنَ الْإِسْلَامَ ﴿فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ نَهٰى عَنْ تَرْكِ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ إِلٰى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ.

১৩২. এবং হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.) এই সম্বন্ধে অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে অসিয়ত করে গিয়েছেন। এক কেরাতে أَوْصٰى রয়েছে। তিনি বলেছেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ দীনকে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। এই আয়াতটিতে আমৃত্যু ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে এবং তা পরিত্যাগ না করতে বলা হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَمَنْ اَىْ لَا - يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابْرَاهِيْمَ فَيَتْرُكُهَا

يَرْغَبُ ও مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে مَن হলো اِسْمِ اِسْتِفْهَام এবং اِسْتِفْهَام-টি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। সুতরাং এটি نَفي-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর رَغِبَ-এর صِلَة হিসেবে যখন عَنْ আসে, তখন تَرْك وَاِعْرَاض অর্থাৎ, বর্জন ও বিমুখতার অর্থ দেয়। মুফাসসির (র.) فَيَتْرُكُهَا উল্লেখ করে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : سَفِهَ نَفْسَهٗ - جَهِلَ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ

سَفِه-এর ব্যাখ্যা جَهِل দ্বারা করার উদ্দেশ্য : মুফাসসির (র.) سَفِه-এর তাফসীর جَهِل দ্বারা করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, سَفِه শব্দটি লাযেম ফে'ল। তারপর نَفْسه মানসূব হলো কীভাবে?

এর উত্তর হলো, এখানে سَفِه শব্দটি جَهِل-এর অর্থ পোষণ করে। আর جَهِل মুতা'আদ্দী ফে'ল। অতএব, তার পরে মাফ'উল হওয়া শুদ্ধ। এখানে اِنَّهَا-এর ضَمِيْر مَنْصُوْب-টি نَفْس-এর দিকে ফিরেছে।

আর اِسْتَخَفَّ بِهَا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, سَفِهَ অন্য কোনো অর্থ পোষণ করা ছাড়াই مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হতে পারে, অর্থাৎ, সেটি اِسْتَخَفَّ-এর অর্থে। কেননা, سَفِهَ-এর মূল অর্থে خِفَّة وَاِذْلَال রয়েছে। তখন আয়াতের মর্ম হবে ইবরাহীমী ধর্ম থেকে কেবল সে-ই বিমুখ হতে পারে, যে নিজের নফসকে লাঞ্ছিত করল।

قَوْلُهٗ : وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ - اِخْتَرْنَاهُ

اِصْطَفَيْنَاهُ-এর মর্মার্থ : প্রকৃতপক্ষে اِصْطِفَاء-এর অর্থ হলো اِتِّخَاذُ صَفْوَةِ الشَّيْءِ তথা কোনো বস্তুর সারনির্যাস বা নির্বাচিত অংশ গ্রহণ করা। যেহেতু নির্ধারিত বস্তুর প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে এবং তারা সেটি গ্রহণ করে তাই মুফাসসির (র.) اِخْتَرْنَاهُ বলে ব্যাখ্য করেছেন।

قَوْلُهٗ : اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ - اِنْقَدْ لِلّٰهِ

اَسْلِم-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اَسْلِم দ্বারা মুসলমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং বাহ্যিক আনুগত্য উদ্দেশ্য। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ.) তো পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ বলতে এখানে ইসলামের উপর অটল থাকার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ - دِيْنَ الْاِسْلَامِ

اَلدِّيْن-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اَلدِّيْن-এর ব্যাখ্যা دِيْنَ الْاِسْلَامِ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছে যে, اَلدِّيْن-এর الف لام-টি নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক। তা দ্বারা নির্দিষ্ট একটি দীন অর্থাৎ, ইসলাম উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ : فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ - نَهٰى عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ

আমৃত্যু ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা আবশ্যক : মুফাসসির (র.) نَهٰى عَنْ تَرْك ..... فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যা দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সর্বদা ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা আবশ্যক এবং তা বর্জন করা আমার্জনীয় অপরাধ। কারণ, ঈমানহীন অবস্থায় মারা গেলে সর্বদা জাহান্নামে থাকতে হবে। এর দ্বারা মৃত্যুবরণ থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয়। তাই মুফাসসির (র.) বলেছেন- نَهٰى عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, এখানে নিষেধাজ্ঞাটা মৃত্যুর ব্যাপারে নয়; বরং ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ সম্পর্কে করা হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

سَفِهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ معروف مطلق ماضى اثبات فعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّفَهَ মূলবর্ণ (س - ف - ه) জিনস صحيح অর্থ- সে নির্বোধ হলো। سَفِهَ نَفْسَه অর্থ হলো- حَمَلَهَا عَلَى السَّفَهِ অর্থাৎ, নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল, নিজেকে নির্বোধ বানাল।

وَصّٰى : সীগাহ غائب বহছ واحد مذكر ماضى مطلق معروف اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْصِيَةُ মূলবর্ণ (و - ص - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তিনি অসিয়ত করলেন। وَصَّاهُ بِشَيْءٍ- তাকে কোনো কিছুর আদেশ করল। যেমন কুরআনে আছে- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا একই অর্থে باب افعال থেকে أَوْصَاهُ بِشَيْءٍ-ও ব্যবহার হয়।

اِصْطَفٰى : সীগাহ غائب বহছ واحد مذكر ماضى مطلق معروف اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি মনোয়ন করলেন।

اِصْطَفٰى শব্দটি صَفْو থেকে নির্গত, যার অর্থ দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাথরকে اَلصَّفَا বলা হয়। যেমন- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। اِصْطِفَاء-এর অর্থ হলো কোনো কিছুর উত্তম অংশ গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুইভাবে اِصْطِفَاء করেন-

১. জন্মগতভাবে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করে সৃষ্টি করা, একে اِصْطِفَاءِ خَلْقِيٌّ বলা হয়। এটি নবীগণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

২. জন্মগত বা জন্মের পর আল্লাহ তা'আলা কাউকে পছন্দ করেন।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّرْغَبُ ..... لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

مَنْ হলো اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِيْ এবং মুবতাদা। আর يَرْغَبُ বাক্যটি হলো খবর। তার মধ্যকার যমীরটি مَنْ-এর দিকে ফিরেছে। إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ-এর মাঝে إِلَّا হলো أَدَاةُ الْحَصْرِ; আর مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ অংশটি মাওসূল-সেলা মিলে يَرْغَبُ-এর যমীর থেকে বদল হিসেবে রফার স্থানে রয়েছে অথবা তার استثناء হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ ..... وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ ..... وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ

وَصّٰى ফে'ল بِهَا মুতা'আল্লিক وَصّٰى ফে'লের সাথে। اِبْرَاهِيْم শব্দটি وَصّٰى-এর ফায়েল بَنِيْهِ মাফ'উলে বিহী واو হরফে আতফ يعقوب শব্দটি اِبْرَاهِيْم-এর উপর আতফ হয়ে فَاعل-এর অন্তর্ভুক্ত।

يٰبَنِيَّ মুনাদা মুযাফ, اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ হলো اِنَّ-এর ইসম اِصْطَفٰى ফে'ল ضمير فاعل لكم মুতা'আল্লিক اصْطَفٰى ফে'লের সাথে। اَلدِّيْنَ মাফ'উলে বিহী জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর اِنَّ;

وَاوْ হরফে আতফ اَدَاةُ الْحَصْر-এর জন্য لَاتَمُوْتُنَّ ফে'ল إِلَّا হলো فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-এর মাঝে فَاء-টি فَصِيْحِيَّة; হালিয়া اَنْتُمْ মুবতাদা مُسْلِمُوْنَ খবর وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ জুমলা হয়ে হাল হিসেবে نَصَبْ-এর স্থানে রয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ ..... وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ

اِبْرٰهِيْم শব্দের লিখনশৈলী : ১৩০ ও ১৩২ নং আয়াতে اِبْرٰهِيْم শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির رَاء বর্ণে খাড়া যবর এবং ه বর্ণের পর ي-যোগে اِبْرٰهِيْم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি راء ও ه বর্ণে যথাক্রমে খাড়া যবর ও খাড়াযের যোগে اِبْرٰهِم লিখা আছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ

اِصْطَفٰى শব্দের লিখনশৈলী : ১৩২ নং আয়াতে উল্লিখিত اِصْطَفٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি ف বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে اِصْطُفٰى লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির ف বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফযোগে اِصْطَفٰى লিখা আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ وَالرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : কেরাতের ভিন্নতা ও রসমে ওসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ

وَصّٰى শব্দের কেরাত ও লিখনশৈলী : ১২৩ নং আয়াতে উল্লিখিত وَصّٰى শব্দে দু'ধরনের কেরাত ও লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে بَابِ تَفْعِيْل থেকে নির্গত ধরে وَصّٰى পড়েছেন, আর রসমে উসমানীতে শব্দটির ص বর্ণের পর ইয়ায়ে মারূফযোগে وَصّٰى লিখিত রয়েছে।

খ. ইমাম নাফে ও ইবনে আমের (র.) শব্দটিকে بَابِ اِفْعَال থেকে নির্গত ধরে اَوْصٰى পড়েছেন।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الرُّكُوْعَيْن : পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রুকূর যোগসূত্র

ইতঃপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া- وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ-এর মাঝে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এখন এ আয়াতে সে ধর্মের ফজিলত এবং তা অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এর দ্বারা ইহুদি নাসারাদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। কারণ, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নেতা মানে, কিন্তু তার ধর্মের অনুসরণ করে না। অথচ এ ধর্মের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.) পরবর্তী সন্তানদেরকে অসিয়ত করে গেছেন।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ الخ

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তার দুই ভাতিজা সালামা ও মুহাজিরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বললেন, তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে ইরশাদ করছেনে যে, বনী ইসমাঈল গোত্রে একজন নবী প্রেরণ করব, যার নাম হবে আহমদ। যে ব্যক্তি তাকে নবী মানবে সে সফল হবে। আর যে মানবে না সে অভিশপ্ত হবে। একথা শুনে সালামা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّرْغَبُ ..... لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

ইসলাম ধর্মকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধের কারণ : এখানে ইসলাম ধর্মের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলা নিজের ও রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে না করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে করেছেন। কারণ, এখানে সম্বোধিত জনগোষ্ঠী মূলত ইহুদি-খ্রিস্টান ও আরব মুশরিকরা। এ তিনটি সম্প্রদায়ই মুসলমানদের ন্যায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পয়গাম্বর বলে মান্য করে। তাই এ বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করে এ উপলব্ধি জাগরূক করা হয়েছে যে, কুরআন তোমাদেরকে কোনো নতুন ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে না; বরং তোমাদেরই পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ ..... لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَسْلَمْتُ لَكَ না বলে اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলার কারণ : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন, اَسْلِمْ (আনুগত্য অবলম্বন করো), তখন তিনি বললেন, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম)। এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ তা'আলার اسلم (আনুগত্য অবলম্বন করো।) সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে اَسْلَمْتُ لَكَ (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম।) বলা যেত, কিন্তু হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।) কারণ প্রথমত এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তা'আলার স্থানোপযোগী গুণকীর্তন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ ..... وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

ইসলাম ধর্ম সমগ্র মানুষের অনুসরণীয় ধর্ম : ইসলামই সমস্ত পয়গাম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী রাসূল ﷺ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁরা এই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .

(ইসলামই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করে, তা কখনো কবুল হবে না।)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, একমাত্র ইসলাম ধর্মই হলো গ্রহণীয় এবং মুক্তির চাবিকাঠি।

জগতে পয়গাম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ তা'আলার কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম- যদিও বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন– হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্ম, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, তথা ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলোর স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহিমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলো, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে-মুসলিমাহ' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন– رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ অর্থ– 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.)-কে মুসলিম (আনুগত্যশীল) করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী বানাও।' হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন– فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ (তোমরা মুসলামান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছে– مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ (এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম। তিনিই ইতঃপূর্বে তোমাদের মুসলমান নামকরণ করেছেন এবং কুরআনেও এ নামই রাখা হয়েছে।)

ধর্ম ও নৈতিককতার শিক্ষা, সন্তানের জন্যে বড় সম্পদ : পয়গাম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যেও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা হলো, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা দরকার মনে করে। তেমনি মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালোবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত।

পয়গাম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরো একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল কামনা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনোযোগ দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। পিতামাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দুটি রহস্য নিহিত রয়েছে-

প্রথমত : প্রকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতামাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত : এটাই সত্য প্রচারের সব চেয়ে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলে– يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا (হে মুমিনগণ নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।)

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّرْغَبُ

ইস্তেফহাম : আলোচ্য অংশে প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিষয়টিকে অস্বীকার করা। ফলে এতে নফীর অর্থ চলে এসেছে। অর্থাৎ لَا يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا السَّفِيْهُ; একইভাবে এ প্রশ্নের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদেরকে ভর্ৎসনা করা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِنَّهٗ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

তাকীদ : আলোচ্য অংশে বক্তব্যকে إِنَّ ও لَ দ্বারা তাকীদ করা হয়েছে। কারণ, এ বাক্যটি দ্বারা কেয়ামতের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যা সবার অজ্ঞাত এবং দৃষ্টির আড়ালে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : إِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ

ইলতিফাত : আলোচ্য অংশে متكلم থেকে غائب-এর প্রতি التفات হয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতটি উহ্য قُلْنَا-এর মাকুলা ছিল। التفات হলো عِلْمُ الْبَيَان-এর অন্তর্ভুক্ত একটি শৈলী।

١٣٣.وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصٰى بَنِيْهِ بِالْيَهُوْدِيَّةِ نَزَلَ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ﴾ حُضُوْرًا ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ﴾ بَدَل مِنْ إِذْ قَبْلَهُ ﴿قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي﴾ بَعْدَ مَوْتِيْ ﴿قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ﴾ عَدُّ إِسْمَاعِيْلَ مِنَ الْآبَاءِ تَغْلِيْبٌ وَلِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ﴿اِلٰهًا وَّاحِدًا﴾ بَدَلٌ مِنْ "إِلٰهَكَ" ﴿وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾ وَأَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ أَيْ لَمْ تَحْضُرُوْهُ وَقْتَ مَوْتِهِ فَكَيْفَ تَنْسُبُوْنَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيْقُ بِهِ.

১৩৩.ইহুদিরা নবী করীম ﷺ-কে বলেছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.) মারা যাওয়ার সময় তার সন্তানদেরকে ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, এই কথা আপনি কি জানেন না? তখন আয়াতটি নাজিল হয়। ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন সম্মুখে ছিলে, উপস্থিত ছিলে? সে যখন বাক্যটি পূর্বোক্ত إِذْ-এর بَدَلْ পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পর আমার মৃত্যুর পর তোমরা কীসের ইবাদত করবে? তারা তখন, বলেছিল আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করব, تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পিতৃ-পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর পিতৃব্যের স্থান পিতার মতোই। যিনি এক اِلٰهًا وَاحِدًا অংশটি اِلٰهَكَ-এর بَدَلْ এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পনকারী। أَمْ শব্দটি هَمْزَةُ اِنْكَارِيْ-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যুর সময় তোমরা উপস্থিত ছিলে না। সুতরাং যে কথা তার পক্ষে সমীচীন নয় তার উপর তোমরা কেমন করে সে কথা আরোপ করছ?

١٣٤.﴿تِلْكَ﴾ مُبْتَدَأٌ وَالْإِشَارَةُ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِمَا وَأُنِّثَ لِتَأْنِيْثِ خَبَرِهِ ﴿أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ سَلَفَتْ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ مِنَ الْعَمَلِ أَيْ جَزَاؤُهُ اِسْتِئْنَافٌ ﴿وَلَكُمْ﴾ الْخِطَابُ لِلْيَهُوْدِ ﴿مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ كَمَا لَا يُسْأَلُوْنَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَالْجُمْلَةُ تَأْكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا.

১৩৪.এই উম্মত অর্থাৎ ইবরাহীম, ইয়াকূব ও তাদের পুত্রগণ। تِلْكَ শব্দটি মুবতাদা, تِلْكَ-কে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে এর খবর أُمَّةٌ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে। অতিবাহিত হয়েছে অতীত হয়েছে। তারা যা যে আমল অর্জন করেছে তা তাদের অর্থাৎ, এর প্রতিফল তাদেরই হবে এটি জুমলায়ে মুসতানিফা। আর তোমরা সম্বোধন ইহুদিদের উদ্দেশ্যে, যা অর্জন করবে তা তোমাদের। তারা যা করতো সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসা করা হবে না। যেমন- তোমাদের আমল সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। لَا تُسْئَلُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের تَأْكِيْد

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ

শানে নুযূল বর্ণনা : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা সামনের আয়াতের শানে নুযূলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। একবার জনৈক ইহুদি এসে রাসূল ﷺ-কে বলল- أَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنَّ يَعْقُوْبَ يَوْمَ مَاتَ اَوْصٰى بَنِيْهِ بِالْيَهُوْدِيَّةِ (আপনি কি জানেন না যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) ইন্তেকালের দিন তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদি ধর্মের অনুসরণের অসিয়ত করে গেছেন?) তার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ : اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ حُضُوْرًا

شُهَدَاء-এর অর্থ নির্ণয় : মুফাসসির (র.) شُهَدَاء-এর ব্যাখ্যা حُضُوْرًا-এর মাধ্যমে করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে شُهَدَاء শব্দটি حَاضِرْ-এর সমার্থক شَهِيْدٌ-এর বহুবচন; شَاهِدْ [সাক্ষ্যদাতা]-এর নয়।

قَوْلُهٗ : قَالُوْا نَعْبُدُ .... عَدُّ اِسْمَاعِيْلَ مِنَ الْاٰبَاءِ تَغْلِيْبٌ

হযরত ইসমাঈল (আ.) তাগলিবের ভিত্তিতে পিতৃপুরুষের অন্তর্ভুক্ত : হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বাবা নন; বরং চাচা ছিলেন। এতদত্ত্বেও তাকে اٰباء-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বড় চাচা ছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানগণ নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে تَغْلِيْبًا তাকেও ইয়াকূব (আ.)-এর পিতৃকুলে গণনা করেছিল। যেভাবে বাপ-চাচাকে এক স্তরে গণ্য করা হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জবানে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর জন্যও اَبٌ শব্দ উচ্চারিত হয়েছে– هٰذَا بَقِيَّةُ اٰبَائِىْ অর্থাৎ, আমার মুরব্বী বা প্রবীণদের মাঝে একমাত্র তিনিই এখন অবশিষ্ট রয়েছেন।

২. চাচা পিতার সমতুল্য। এ হিসেবে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পিতার কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِلٰهًا وَاحِدًا - بَدَلٌ مِنْ "اِلٰهَكَ"

একাধিক ইলাহ হওয়ার সংশয় নিরসন : মুফাসসির (র.) بَدَلٌ مِنْ اِلٰهَكَ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, اِلٰهًا وَاحِدًا পূর্বের اِلٰهَكَ থেকে بَدَلْ হয়েছে। আর এখানে بَدَلْ উল্লেখ করার কারণ হলো পূর্বের اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ অংশটি দ্বারা সৃষ্ট একাধিক ইলাহ হওয়ার সংশয়টি নিরসন করা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَأَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ

ام শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَمْ শব্দটি এখানে مُنْقَطِعَةْ তথা هَمْزَةٌ ও بَلْ-এর অর্থে। আর بَلْ শব্দটি اِضْرَابٌ عَنِ الْكَلَامِ الْاَوَّلِ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার হয়। ফলে এখানে তা হলো রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদিরা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ব্যাপারে ইহুদিবাদের যে দাবি করছে তার খণ্ডনের আলোচনার দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। এ সুরতে اِسْتِفْهَام-টি اِنْكَار-এর জন্য হবে। মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারত দ্বারা এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, اِسْتِفْهَام-টি تَقْرِيْر-এর জন্য এবং সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো তাদের পূর্বপুরুষগণ। মূলরূপ হলো–

كَانَتْ اَوَائِلُكُمْ حَاضِرِيْنَ حِيْنَ وَصّٰى بَنِيْهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْاِسْلَامِ وَاَنْتُمْ عَالِمُوْنَ بِذٰلِكَ فَمَا لَكُمْ تَدَّعُوْنَ عَلَيْهِ خِلَافَ مَا تَعْلَمُوْنَ.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تِلْكَ - مُبْتَدَأٌ وَالْاِشَارَةُ

তারকীব বর্ণনা : এ অংশটুকু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, تِلْكَ অংশটি মুবতাদা। আর পরবর্তী ..... أُمَّةٌ অংশটুকু হলো তার খবর। আর تِلْكَ-এর مَرْجِعْ হলো হযরত ইবরাহীম, ইয়াকূব (আ.) এবং তাঁদের পুত্রগণ। কিন্তু খবর (أُمَّةٌ)-এর দিকে লক্ষ্য করে مُؤَنَّثٌ-এর ইসমে ইশারা ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَهَا مَا كَسَبَتْ - مِنَ الْعَمَلِ اَى جَزَاؤُهٗ اِسْتِأْنَافٌ

لَهَا مَا كَسَبَتْ-এর তারকীবগত অবস্থান বর্ণনা : এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, لَهَا مَا كَسَبَتْ হলো جملة مستأنفة; পূর্ববর্তী خَلَتْ-এর ফায়েল থেকে হাল নয়। কারণ পরবর্তী وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ অংশটি لَهَا مَا كَسَبَتْ-এর উপর আতফ হয়েছে। এখন এটিকে خَلَتْ-এর ফায়েল থেকে হাল ধরা হলে خَلَتْ-এর সময় এবং হালের সময়ের মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে। কারণ خَلَتْ শব্দটি অতীত কালবাচক। আর لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ অংশটি বর্তমান কাল সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهٗ : وَالْجُمْلَةُ تَأْكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا

পুনরুক্তিরক কারণ বর্ণনা : وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ জুমলাটি পূর্বের জুমলা لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ-এর تَأْكِيْد স্বরূপ হয়েছে। এর দ্বারা তাকরার বা পুনরুক্তির ফায়েদা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

شُهَدَاء : শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো شَهِيْدٌ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صَحِيْح অর্থ– উপস্থিতগণ, সাক্ষীগণ। شَهِيْد শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। যথা–

১. শহীদ, জিহাদে শাহাদাত বরণকারী, ২. সাক্ষ্য প্রদানকারী, ৩. উপস্থিত ব্যক্তি, দর্শক, দর্শনার্থী। সবগুলোর বহুবচনই شُهَدَاء; আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য। شُهَدَاء শব্দটি شَاهِد-এর বহুবচন হিসেবেও আসে। شَاهِد শব্দটি সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং উপস্থিত ব্যক্তি উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ..... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ

أم-টি مُتَّصِلَة-ও হতে পারে, আবার مُنْقَطِعَة-ও হতে পারে। তারকীবে এর কোনো স্থান নেই। شُهَدَاء হলো كُنْتُمْ-এর খবর; إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ অংশটি মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে شُهَدَاء-এর যরফ হয়েছে। পরবর্তী إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ অংশটি إِذْ حَضَرَ-এর বদল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ-এর মাঝে مَا হলো প্রশ্নজ্ঞাপক ইসম। مَحَلًّا মানসূব হয়েছে مَفْعُوْلٍ مُقَدَّمْ-এর হিসেবে। কেউ কেউ বলেছেন, مَا-টি مَوْصُوْلَة মহল হিসেবে مَرْفُوْع; আর تَعْبُدُوْنَ-এর মাঝে عَائِد উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تِلْكَ أُمَّةٌ ..... عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

تِلْك মুবতাদা أُمَّة হলো মাওসূফ قَدْ خَلَت জুমলা হয়ে أُمَّةٌ-এর সিফাত। لَهَا জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। مَا ইসমে মাওসূল كَسَبَتْ জুমলা হয়ে সেলা। ইসমে মাওসূল ও সেলা মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر; وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ পূর্বের জুমলার উপর আতফ।

وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-এর মধ্যে وَاو হরফে আতফ لَا تُسْئَلُوْنَ ফে'ল ضمير নায়েবে ফায়েল عَن হরফে জার ما ইসমে মাওসূল كَانُوْا ফে'লে নাকেস ضمير ইসমে كَانُوْا - يَعْمَلُوْنَ জুমলা হয়ে খবরে كَانُوْا অতঃপর জুমলা হয়ে مَا ইসমে মাওসূলের সেলা। মাওসূল সেলা মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক لَا تُسْئَلُوْنَ ফে'লের সাথে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهُ : تَعَالٰى : قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

اِبْرَاهِيْم শব্দের লিখনশৈলী : ১৩৩নং আয়াতে উল্লিখিত اِبْرَاهِيْم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি رَاء বর্ণের পর আলিফ এবং ى বর্ণের পর ইয়াযোগে اِبْرَاهِيْمَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে ওসমানীতে শব্দটির رَاء বর্ণে খাড়া যবর এবং ى বর্ণে খাড়াযের যোগে اِبْرٰهِم লিখা আছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : اَيْ جَزَاؤُهُ اِسْتِئْنَافٌ

اِسْتِئْنَافٌ শব্দের নুসখা : ১৩৪নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اِسْتِيْنَافٌ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ت বর্ণের পর ي-যোগে اِسْتِيْنَاف লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটি ت বর্ণের পর হামযাযোগে اِسْتِئْنَاف লিখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের যোগসূত্র হলো, পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বীয় সন্তানদেরকে ইসলাম ধর্ম অনুসরণের অসিয়ত করেছিলেন। আর এখানে সে অসিয়তটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ..... وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ

ইহুদিরা প্রিয়নবী ﷺ-এর মহান দরবারে হাজির হয়ে বলে ছিল আপনি কি জানেন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর মৃত্যুর সময় তদীয় পুত্রদেরকে একত্র করে অসিয়ত করেছিলেন এ মর্মে যে, তোমরা সকলে ইহুদি ধর্মের প্রতি অনুগত থেকো। অথচ আপনি ইহুদি ধর্ম বর্জনের তালিম দিচ্ছেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। [তাফসীরে তাবারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ..... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ

ইহুদিদের মিথ্যা দাবি খণ্ডন : ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজেই তো মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তানদের অসিয়ত করে গেছেন যে, তোমরা ইহুদি ধর্মের অনুসরণ করবে। অথচ আপনি বলছেন ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করতে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ অসার দাবি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, তোমরা যে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নামে অসার কথা বলছ, তখন তো তোমাদের অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে তোমরা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নামে মিথ্যা কথা বলছ কেন?

قَوْلُهُ تَعَالٰى : مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ

مَنْ ব্যবহার না করে مَا শব্দটি ব্যবহারের কারণ : .... مَا تَعْبُدُوْنَ আয়াতে مَا শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হলো, হযরত ইয়াকূব (আ.) যখন মিশরে গমন করেন, তখন তিনি সেখানে অনেক মানুষকে আগুনের পূজা করতে দেখেন। তা ছাড়া সে সময় যত ভ্রান্ত উপাস্য ছিল তা সবই ছিল غَيْرِ ذَوِي الْعُقُوْل; যেমন– মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। তাই তিনি নিজ সন্তানদের ব্যাপারে আশঙ্কা করে مَا দ্বারা প্রশ্ন করেছেন। আর اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাওয়া।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ..... عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

اُمَّةٌ-এর মর্মার্থ : تِلْكَ اُمَّةٌ দ্বারা ইহুদিদের পিতৃপুরুষ উদ্দেশ্য, যারা নবীগণের জামাতে পরিগণিত। এখানে বিবরণের লক্ষ্য ইহুদিরা, যারা পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করতো। ইসলাম আমলবিহীন শুধু পূর্বপুরুষের সম্বন্ধ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন সমর্থন করে না। নবীদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক আছে বলে তোমরা তাদের নেক আমলের কারণে মুক্তি পেয়ে যাবে, এ আশা করবে না। বরং শুধু তোমাদের নেক আমলই তোমাদের উপকারে আসবে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াতাংশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সান্তনরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদিদের সে দাবিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করব। আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهُ تَعَالٰى : آبَائِكَ

তাগলীব : এখানে آبَاء দ্বারা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) উদ্দেশ্য। এদের মাঝে ইসহাক ইবরাহীম (আ.) হলেন দাদা, হযরত ইসমাঈল (আ.) হলেন চাচা এবং হযরত ইসহাক (আ.) হলেন পিতা। কিন্তু تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে সবাইকে آبَاء বলা হয়েছে। এটি মাজাযের একটি প্রকার।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ

কিনায়া : আলোচ্য অংশে اَلْمَوْت দ্বারা مُقَدَّمَاتُ الْمَوْتِ উদ্দেশ্য। কারণ, মৃত্যুর সময় কিছু বলা যায় না।

✪ تَعَارُفُ الْأَشْخَاصِ : ব্যক্তি পরিচিতি

হযরত ইসহাক (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমা পত্নী হযরত সারা (আ.)-এর গর্ভজাত। জন্মসন আনুমানিক ২০৬০ এবং ইন্তেকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৮৮০ সালে। তাওরাতে তার বয়স ১৮০ বছর উল্লিখিত হয়েছে। তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, তার জন্মের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯]

اِسْحَاق শব্দটি উচ্চারণ হিসেবে يَضْحَقُ (ইয়াসহাক) ছিল। এটি হিব্রু শব্দ। এর আরবি অনুবাদ হলো يَضْحَكُ অর্থাৎ সে হাসছে। এ নামের কারণ হিসেবে বলা হয়, ফেরেশতাগণ যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত সারা (আ)-কে পুত্র সন্তানের সংবাদ দিয়েছেন তখন হযরত সারা এ বিস্ময়কর সংবাদ শুনে হেসে ফেলেছিলেন। যেমন কুরআনে আছে-

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ. (هُوْدُ - ٧١)

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী يَضْحَكُ হলো فِعْلِ مُضَارِعْ ; আর আরবদের মাঝে فِعْلِ مُضَارِعْ-এর রূপকে নাম হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। [কাসাছুসুল কুরআন (অনুবাদ) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬]

তাওরাতের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত ইসহাক (আ.) রাফকাহ নামক এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই নারীর গর্ভে হযরত ইসহাক (আ.)-এর দুই যমজ পুত্র ঈসা ও ইয়াকূব জন্মগ্রহণ করে। সে সময় হযরত ইসহাক (আ.)-এর বয়স ছিল ষাট বছর।

১৩৫.আর তারা বলে, ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হও, সঠিক পথ পাবে। اَوْ শব্দটি تَفْصِيْل-এর জন্য। প্রথম উক্তিটি মদিনার ইহুদিদের। আর দ্বিতীয় উক্তিটি নাজরান অধিবাসী খ্রিস্টানদের। আপনি বলুন তাদেরকে, বরং আমরা অনুসরণ করি ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ যিনি ছিলেন সত্যপন্থী। حَنِيْفًا শব্দটি اِبْرَاهِيْم থেকে হাল। অর্থাৎ, সকল দীন থেকে বিমুখ হয়ে সঠিক ধর্মের প্রতি অনুসারী এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

١٣٥. ﴿وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا أَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُوْا﴾ أَوْ لِلتَّفْصِيْلِ وَقَائِلُ الْأَوَّلِ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِيْ نَصَارٰى نَجْرَانَ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿بَلْ﴾ نَتَّبِعُ ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا﴾ حَالٌ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ مَائِلًا عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

১৩৬.তোমরা বলো, এই সম্বোধন মুমিনদের প্রতি আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি অর্থাৎ, আল-কুরআন, আরো যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীমের প্রতি অর্থাৎ, তাঁর দশ সহীফা এবং ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও আসবাতের প্রতি অর্থাৎ তার বংশধরদের প্রতি ও যা দেওয়া হয়েছে মূসাকে অর্থাৎ, তাওরাত ও ঈসাকে অর্থাৎ, ইঞ্জিল এবং যা অর্থাৎ, যে সকল কিতাব ও আয়াত অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে। আমরা পার্থক্য করি না তাদের কারো মাঝে। অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো কতেকজনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর কতকজনকে অস্বীকার করলাম আমরা এমন করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত।

١٣٦. ﴿قُوْلُوْا﴾ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ اِلَيْنَا﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ﴾ مِنَ الصُّحُفِ الْعَشْرِ ﴿وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ أَوْلَادِهِ ﴿وَمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى﴾ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴿وَعِيْسٰى﴾ مِنَ الْإِنْجِيْلِ ﴿وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ مِنَ الْكُتُبِ وَالْآيَاتِ ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى ﴿وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾.

১৩৭.এখন যদি তারা অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ঈমান আনে যেভাবে مِثْل শব্দটি অতিরিক্ত তোমরা তার প্রতি ঈমান এনেছ, তাহলে তারাও সত্য পথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা এর উপর বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তোমাদের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত। হে মুহাম্মদ! তাদের বিরোধিতার মুখে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাদের সকল কথা সম্পর্কে অতি শ্রোতা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিলেন বনূ কুরাইযাকে হত্যা, বনূ নযীরকে বহিষ্কার ও তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করার মাধ্যমে।

١٣٧. ﴿فَإِنْ اٰمَنُوْا﴾ أَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ﴿بِمِثْلِ﴾ مِثْلِ زَائِدَةٌ ﴿مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عَنِ الْإِيْمَانِ بِهٖ ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ﴾ خِلَافٍ مَعَكُمْ ﴿فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ﴾ يَا مُحَمَّدُ شِقَاقَهُمْ ﴿وَهُوَ السَّمِيْعُ﴾ لِأَقْوَالِهِمْ ﴿الْعَلِيْمُ﴾ بِأَحْوَالِهِمْ وَقَدْ كَفَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ.

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَوْ لِلتَّفْصِيْلِ وَقَائِلُ الْأَوَّلِ الْيَهُوْدُ ....

أو-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) আলোচ্য ইবারতটুকু দ্বারা أَوْ-এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, أَوْ এখানে تَفْصِيْل-এর জন্য। অর্থাৎ, كُوْنُوْا هُوْدًا এবং كُوْنُوْا نَصَارٰى; দুটি ভিন্ন ভিন্ন দল। ইহুদিরা বলেছে, كُوْنُوْا هُوْدًا تَهْتَدُوْا, আর খ্রিস্টানরা বলেছে كُوْنُوْا نَصَارٰى تَهْتَدُوْا

قَوْلُهُ تَعَالٰى : بَلْ - نَتَّبِعُ - مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا - حَالٌ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ

مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-এর তারকীবগত অবস্থান বর্ননা : نَتَّبِعُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, مِلَّة শব্দটি উহ্য ফে'লের মাফ'উল হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর حَنِيْفًا ইবরাহীম থেকে হাল। সাধারণত মুযাফ ইলাইহি থেকে হাল হওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু মুযাফের যায়গায় যদি মুযাফ ইলাইহিকে রাখা বৈধ হয়, তখন মুযাফ ইলাইহি থেকেও হাল হতে পারে। এখানে এমনই ঘটেছে। কারণ, ইবরাহীমকে مِلَّة-এর জায়গায় রাখার পরও উদ্দেশ্য ঠিক থাকে। কেউ বলেন, حَنِيْفًا শব্দটি مِلَّةْ থেকে হাল। এক্ষেত্রে مِلَّةْ-কে دِيْن-এর সমার্থক ধরা হবে।

قَوْلُهُ : قُوْلُوْا - خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

সম্বোধিত ব্যক্তি নির্ণয় : আলোচ্য অংশটুকু মুফাসসির (র.) قُوْلُوْا-এর সম্বোধিত ব্যক্তি কারা, সেটা উল্লেখ করেছেন। মুফাসসির (র.)-এর মতে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুমিনদেরকে। কিন্তু কারো কারো মতে, এ সম্বোধনটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالْاَسْبَاطِ - اَوْلَادِهٖ

اَلْاَسْبَاطِ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اَلْاَسْبَاطُ-এর ব্যাখ্যা করেছেন, اَوْلَادِهٖ দ্বারা এবং এখানে اَوْلَاد দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরসজাত সন্তানাদি উদ্দেশ্য। কারণ, কখনো ছেলের সন্তানকেও وَلَد বলা হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ - مِنَ الْكُتُبِ وَالْآيَاتِ

مَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) مَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ-এর ব্যাখ্যা مِنَ الْكُتُبِ وَالْآيَاتِ দ্বারা করে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সকল গ্রন্থ ও সহীফা, যা নবী ও রাসূল উভয়কে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَانُفَرِّقُ ..... فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى

لَا نُفَرِّقُ শব্দ কর্তৃক দ্বন্দ্ব নিরসন : মুফাসসির (র.) فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ الخ বলে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে تَفْرِيْق দ্বারা تَفْرِيْقٌ فِى الْاِيْمَان (ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য) উদ্দেশ্য; تَفْرِيْق فِى الْاَقْضِيَة তথা মর্যাদাগত বা স্তরগতভাবে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, রাসূলগণের স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ আমরা ইহুদি-নাসারাদের মতো নবীদের মাঝে পার্থক্য করি না। ইহুদিরা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং হযরত ঈসা (আ.) ও রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করেছে। আর নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে; কিন্তু রাসূল ﷺ এবং হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করেছে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ اٰمَنُوْا - اَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى

اٰمَنُوا-এর যমীরের মারজা নির্ণয় : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে اٰمَنُوْا-এর যমীর ফিরেছে ইহুদি-নাসারাদের দিকে। আলোচ্য আয়াতে রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের সম্বোধন করে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা হচ্ছে যে, যদি এখনো তারা ঈমান গ্রহণ করে, তবে তাদের বিগত কুফরি তাদের নাজাতের অন্তরায় হতে পারে না।

قَوْلُهٗ : بِمِثْلِ - مِثْلِ زَائِدَةٌ

এখানে مِثْل শব্দটি অতিরিক্ত : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসিস (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হলো, আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের বলা হয়েছে যে, যদি তারা 'তার অনুরূপ' এর উপর ঈমান আনে, যার উপর ঈমান এনেছে মুসলমানগণ, তাহলে তারা হেদায়েত পাবে। মুসলমানগণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই ঈমান এসেছে। এখন তার مِثْل-এর উপর ঈমান আনতে হলে তো আল্লাহ তা'আলার مِثْل হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার কোনো مِثْل নেই।

এর জবাব হলো, এখানে مِثْل শব্দটি অতিরিক্ত। এ জবাবের সমর্থন ঐ কেরাত দ্বারা হয়, যার মাঝে بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ-এর স্থলে بِمَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ রয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَاِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ - خِلَافٍ مَعَكُمْ

شِقَاقٌ-এর তাফসীর : অভিধানে شِقَاق নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে আসে-

১- اَلْخِلَافُ. وَمِنْهُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا.
২- اَلضَّلَالُ. مِثْلُ : وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ.
৩- اَلْعَدَاوَةُ.

মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে شِقَاق প্রথম অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهٗ : فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ - يَا مُحَمَّدُ شِقَاقَهُمْ

উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত : আলোচ্য অংশে شِقَاقَهُمْ দ্বারা মুফাসসির (র.) বুঝিয়েছেন যে, يَكْفِى-এর দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহীতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হবে- فَسَيَكْفِيْكَ اللّٰهُ شِقَاقَهُمْ

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

شِقَاق : এটি বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার। অর্থ পরস্পর ঝগড়া করা, পরস্পর কলহ করা। এটি মূলত شَق থেকে নির্গত। شَق অর্থ হলো, দিক, পার্শ্ব। ঝগড়ার দুই পক্ষ যেহেতু দুই পার্শ্বে থাকে তাই একে شِقَاق বলা হয় কিংবা এটি বাবে نَصَرَ-এর মাসাদর اَلشَّقُّ থেকে এসেছে। اَلشَّقُّ অর্থ হলো, কাউকে কষ্টে ফেলা। ঝগড়ার সময় যেহেতু একপক্ষ অপর পক্ষকে কষ্টে ফেলার চেষ্টা করে, তাই شِقَاق বলা হয়।

✪ حَلُّ الْاِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا .... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

وَاو বর্ণটি ইস্তিনাফিয়া, قَالُوْا ফে'ল-ফায়েল, كُوْنُوْا ফে'লে নাকেস, যমীর ইসমে নাকেস, هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى খবরে নাকেস, ফে'লে নাকেস জুমলা হয়ে اَمْر; تَهْتَدُوْا জবাবে امر; আমর ও জওয়াবে আমর মিলে مَقُوْلَة مَفْعُوْلٍ بِهٖ হয়েছে। قَالُوْا ফে'ল, ফায়েল ও মাকুলা মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলায়ে মুস্তানিফা হয়েছে। قُلْ ফে'ল-ফায়েল, بَل হরফে اِضْرَاب আর نَتَّبِعُ ফে'লটি উহ্য রয়েছে, مِلَّة মুযাফ, اِبْرَاهِيْم জুলহাল, حَنِيْفًا প্রথম হাল, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ জুমলা হয়ে দ্বিতীয় হাল, হাল ও জুলহাল মিলে মুযাফ ইলাইহি মাফ'উলে বিহী, نَتَّبِعُ উহ্য ফে'ল জুমলা হয়ে মাকুলা মাফ'উলে বিহী, অতঃপর قُلْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে جملة فعلية انشائية مستانفة হয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِىُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ ..... وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

اِبْرٰهِيْمَ শব্দের লিখনশৈলী : ১৩৫ ও ১৩৬নং আয়াতদ্বয়ে উল্লিখিত اِبْرَاهِيْم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির رَاء বর্ণে খাড়া যবর এবং ه বর্ণের পর ي যোগে اِبْرٰهِيْم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি رَاء এবং ه বর্ণে যথাক্রমে খাড়া যবর ও খাড়াযের যোগে اِبْرٰهِم লিখা আছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى

عيسي শব্দের লিখনশৈলী : ১৩৬ নং আয়াতে উল্লিখিত عِيْسٰى শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটি س বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে عِيْسٰے লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটির س বর্ণের পর ইয়ায়ে মারুফযোগে عِيْسٰى লিখা আছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَائِلُ الْاَوَّلِ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِىْ نَصٰرى نَجْرَانَ

نَصَرٰى শব্দের নুসখা : ১৩৫নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত نَصٰرى শব্দের দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ص বর্ণে খাড়া যবর এবং راء বর্ণের পর ইয়ায়ে মাজহুলযোগে نَصٰرے লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ص বর্ণের পর আলিফ এবং رَاء বর্ণের পর ইয়ায়ে মারুফযোগে نَصَارٰى লিখা আছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى - مِنَ التَّوْرٰىةِ

اَلتَّوْرٰىة শব্দের নুসখা : ১৩৬নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَلتَّوْرٰىة শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণে খাড়া যবরযোগে اَلتَّوْرٰةُ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফযোগে اَلتَّوْرَاةُ লিখিত আছে।

قَوْلُهٗ : فَاِنْ اٰمَنُوْا - اَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرى

اَلنَّصٰرى শব্দের নুসখা : ১৩৭নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَلنَّصٰرى শব্দে দু'ধরনের নসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ص বর্ণে খাড়া যবরযোগে اَلنَّصٰرى লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ص বর্ণের পর আলিফযোগে اَلنَّصَارٰى লিখিত আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْل : শানে নুযূল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا ..... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনে সুরিয়া একবার নবী করীম ﷺ-কে বলল, যা আমরা অবলম্বন করেছি তা-ই হেদায়েত। অতএব আমাদের অনুসরণ করুন। এরূপ কথা ইতঃপূর্বে খ্রিস্টানরাও বলেছিল। আল্লামা বাগভী (র.) লিখেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মদিনার বিখ্যাত ইহুদি যেমন কা'ব ইবনে আশরাফ, মালেক ইবনে হানীফ, ওহাব ইবনে ইয়াহুযাম, ইয়াসিব আখতাব এবং নাজরানের খ্রিস্টানরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। প্রত্যেক দলই নিজেদের হকপন্থি বলে দাবি করতে লাগল। ইহুদিরা বলল, আমাদের নবী হযরত মূসা (আ.) সমস্ত নবীর চেয়ে উত্তম এবং আমাদের তাওরাত সমস্ত কিতাব থেকে উত্তম। আমাদের ধর্ম সকল ধর্মের উপর। তারা হযরত ঈসা (আ.) ও ইঞ্জিল, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করে বসল। এমনিভাবে খ্রিস্টানরাও তাদের নবী, কিতাব ও ধর্মকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করল এবং মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের অস্বীকার করল। পরে সকলেই মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাজিল করেন।

[তাফসীরে তাবারী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪০, ইবনে কাছীর (সংক্ষিপাত) : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩২]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى ..... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ইহুদি বা খ্রিস্টান হওয়ার প্রতি আহ্বান : ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই নওমুসলিম ও আধা মুসলমানদেরকে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিল। তারা বলত, সফলতা ও মুক্তি পেতে চাইলে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো। ঐ নতুন ধর্মে তেমন কী-ই বা আছে? মুসলমানদেরও এ জবাব শুনিয়ে দেওয়া হলো। যেমন- তোমাদের ওখানে রদবদল ও বিকৃতি ছাড়া আর আছেই বা কি? আর আমাদের ধর্ম তো নতুন নয়। তা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন তৌহিদী ধর্ম এবং আমরাই তার প্রকৃত ও অবিষ্কৃত রূপরেখার ধারক ও বাহক।

ইহুদি ও নাসারাদের প্রতি কটাক্ষ : وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলে সূক্ষ্মভাবে ইহুদি-নাসারাদের প্রতি শিরকের ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ইবরাহীমের অনুসারী বলে দাবি কর। কিন্তু তিনি তো মুশরিক ছিলেন না। তাহলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পুত্র সাব্যস্ত করার মাধ্যমে শিরক কর কেন?

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ .... وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

اِبْرَاهِيْم-এর উপর আতফের কারণ : আলোচ্য আয়াতে উক্ত তিন জন নবীর কারো উপরই কোনো কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণ হয়নি; বরং দশটি সহীফা যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছিল। তারপরও উক্ত তিন জনের عطف হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর। কারণ, তাঁদের উপর কিতব বা সহীফা নাজিল না হলেও যেহেতু এ তিন জন নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার মুকাল্লাফ ছিলেন। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর তাঁদেরকেও আতফ করা হয়েছে।

اَلْاَسْبَاط-এর পর্যালোচনা : কুরআন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরকে اَسْبَاط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سِبْط-এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বারো জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বারো জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবিলার পর হযরত মূসা (আ.) যখন মিসর থেকে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ ..... وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সাহাবায়ে কেরাম প্রকৃত ঈমানের মাপকাঠি : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, ইহুদি খ্রিস্টানদের সৎপথ প্রাপ্তির জন্য তোমাদের মতো ঈমান আনা আবশ্যক। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে প্রকৃত ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এর থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا

ঈজায : আলোচ্য আয়াতে বিভিন্ন অংশ উহ্য রেখে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় একে إِيْجَاز বলে। মূলরূপ হলো- قَالَ الْيَهُوْدُ : كُوْنُوْا هُوْدًا تَهْتَدُوْا وَقَالَ النَّصٰرٰى كُوْنُوْا نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ

ঈজায : আলোচ্য ইবারতটুকুতে মুযাফ উহ্য রেখে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মূলরূপ হতে পারে-

يَكْفِيْكَ اللّٰهُ شَرَّهُمْ أَوْ شِقَاقَهُمْ.

আর يَكْفِى-এর পূর্বে سَوْف না এনে س ব্যবহার হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, অচিরেই এমনটি ঘটবে।

١٣٨. ﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ﴾ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِآمَنَّا وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ صَبَغَنَا اللّٰهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنُهُ الَّذِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لِظُهُوْرِ أَثَرِهِ عَلٰى صَاحِبِهِ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ ﴿وَمَنْ﴾ أَيْ لَا أَحَدَ ﴿أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً﴾ تَمْيِيْزٌ ﴿وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ﴾

১৩৮. আল্লাহ তা'আলার রং صِبْغَةٌ শব্দটি آمَنَّا-এর مصدر مؤكد; উহ্য ফে'লের কারণে শব্দটি মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার রঙে বিভূষিত করেছেন। صِبْغَةُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহপ্রদত্ত দীন যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। রং যেমন কাপড়ের সকল স্থানে গিয়ে প্রবেশ করে, তেমনি স্বভাব ধর্মের প্রভাবও তার অধিকারী জনের সর্বত্রে গিয়ে প্রকাশ পায়। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? অর্থাৎ কেউ নয় এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

١٣٩. قَالَ الْيَهُوْدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَقِبْلَتُنَا أَقْدَمُ وَلَمْ تَكُنِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿أَتُحَآجُّوْنَنَا﴾ تُخَاصِمُوْنَنَا ﴿فِي اللّٰهِ﴾ إِنْ اصْطَفٰى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ فَلَهُ أَنْ يَصْطَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَّشَاءُ ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا﴾ نُجَازٰى بِهَا ﴿وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ تُجَازَوْنَ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرَامَ ﴿وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ﴾ اَلدِّيْنَ وَالْعَمَلَ دُوْنَكُمْ فَنَحْنُ أَوْلٰى بِالِاصْطِفَاءِ وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ أَحْوَالٌ.

১৩৯. ইহুদিরা মুসলিমদেরকে বলত, আমরা আল্লাহ প্রেরিত প্রথম গ্রন্থের অধিকারী। আমাদের কেবলাও প্রাচীন। আরবে পূর্বে কোনো নবীও প্রেরিত হননি। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ যদি প্রকৃতই নবী হতেন, তবে আমাদের গোত্রভুক্ত হতেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হলো, তাদের বলো, আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে বিবাদে লিপ্ত হতে চাও? যদি তিনি আরব হতে একজন নবী মনোনীত করেন আর তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক সুতরাং বান্দাদের হতে যাকে ইচ্ছা নবী হিসেবে মনোনীত করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। আর আমাদের কর্ম আমাদের আমাদেরকে তারই প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের তোমরা তারই প্রতিদান পাবে। সুতরাং আমাদের কর্মের মধ্যে এমন কিছু থাকা অসম্ভব নয় যে, যা দ্বারা আমরা সম্মানের অধিকারী হতে পারি এবং দীন ও আমলের বিষয়ে তোমরা নও; বরং আমরাই তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ। সুতরাং মনোনীত হওয়ার ব্যাপারে আমরাই অধিক যোগ্য। أَتُحَاجُّوْنَنَا এই স্থানে همزة-টি অস্বীকারবাচক। আর বাক্যত্রয় হাল হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : صِبْغَةَ اللّٰهِ - مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِآمَنَّا وَنَصْبُهٗ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ صَبَغَنَا اللّٰهُ

صِبْغَةٌ-এর আমেল নির্ণয় : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে صِبْغَةَ হলো উহ্য ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক এবং آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ الخ-এর বিষয়বস্তুর তাকীদস্বরূপ। তার আমেল উহ্য রয়েছে। صِبْغَةَ اللّٰهِ মূলত صَبَغَنَا اللّٰهُ صِبْغَةً ছিল। যেমন, وَعَدَ اللّٰهُ-এর মূলরূপ হলো- وَعَدَ اللّٰهُ وَعْدًا;

قَوْلُهٗ : وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنُهٗ

صِبْغَةَ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার দীন। যাকে অন্য এক আয়াতে فِطْرَةَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا অর্থাৎ, যে স্বভাবজাত ধর্মের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এখানে صِبْغَةَ দ্বারা সে دِيْنُ الْفِطْرَةِ-ই উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা খতনাকে বুঝানো হয়েছে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের বিশেষ প্রতীক। কেউ কেউ বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য تَطْهِيْرُ اللّٰهِ বা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রকরণ।

قَوْلُهٗ : لِظُهُوْرِ أَثَرِهٖ عَلٰى صَاحِبِهٖ

ইসতেয়ারা তাসরিহিয়া : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে اِسْتِعَارَة تَصْرِيْحِيَّة হয়েছে। কারণ, এখানে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান ঈমানের বৈশিষ্ট্যসমূহকে কাপড়ের রঙের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মুশাব্বাহকে উহ্য রেখে তার পরিবর্তে মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ করা হয়েছে। دِيْنُهُ الَّذِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ দ্বারা মুশাব্বাহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। لِظُهُوْرِ أَثَرِهٖ عَلٰى صَاحِبِهٖ দ্বারা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে তথা اَلْوَصْفُ الْجَامِع বর্ণনা করা হয়েছে। كَالصَّبْغِ فِى الثَّوْبِ অংশটুকু দ্বারা مُشَبَّه بِهٖ ও أَدَاةُ التَّشْبِيْه উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : قَالَ الْيَهُوْدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ الخ

শানে নুযূল বর্ণনা : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) সামনের ..... قُلْ أَتُحَاجُّوْنَنَا আয়াতটির শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, একবার ইহুদিরা মুসলমানদেরকে বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কিতাবের অধিকারী। আমাদের কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাকস কাবার চেয়ে প্রাচীন এবং সকল নবী আমাদের মধ্য হতে। আরবের কোনো নবী নেই। যদি মুহাম্মদ নবী হতো, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ - اَلدِّيْنَ وَالْعَمَلَ - دُوْنَكُمْ

مُخْلِصُوْنَ-এর উহ্য মাফ'উল নির্ণয় : যেহেতু مُخْلِصُوْنَ শব্দটি মুতা'আদ্দী মাসদার থেকে নির্গত তাই মুফাসসির (র.) এর ইবারতটুকু দ্বারা তার مَفْعُوْل-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর دُوْنَكُمْ বলে মুফাসসির (র.) এ কথা বুঝিয়েছেন যে, وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ-এর মাঝে مُسْنَد اِلَيْه আগে আনা হয়েছে قَصْر-এর জন্য। অর্থাৎ, একমাত্র আমরাই মুখলিস তোমরা নও।

قَوْلُهٗ : وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ

اَتُحَاجُّوْنَنَا-এর হামযা দ্বারা উদ্দেশ্য : এ অংশটুকু দ্বারা আলোচ্য আয়াতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, اتحاجون-এর মাঝে হামযাটি হলো অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য। অর্থ হলো- لَا يَنْبَغِى لَكُمْ اَنْ تُحَاجُّوْنَنَا; এ থেকে এ সংশয়ও দূর হয়ে যায় যে, প্রশ্ন করা আল্লাহ তা'আলার জন্য অনুচিত। কেননা, তিনি তো সবকিছু জানেন।

قَوْلُهٗ : وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ اَحْوَالٌ

আপত্তির জবাব দান : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তা হলো, وَاو-এর মূল হলো عَطْف হওয়া। সুতরাং উক্ত তিনটি বাক্যেই- (১. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ২. وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ৩. وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ) واو আতফের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তার معطوف عليه হলো أَتُحَاجُّوْنَنَا যা جملة انشائية আর তিনটি বাক্যই হলো جملة خبرية; তাহলে এখানে جملة خبرية-কে جملة إنشائيه-এর উপর عطف করা হচ্ছে, যা সঠিক নয়।

এর উত্তর হলো, وَاو ঐ স্থানে عَطْف-এর জন্য হয়, যেখানে عَطْف হওয়ার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এখানে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান আছে। তা হলো جملة خبرية-কে جملة انشائية-এর উপর عطف করা যায় না। সুতরাং এখানে واو-টি عَاطِفَة নয়; বরং و বর্ণটি হালিয়া।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

مُخْلِصُوْنَ : সীগাহ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার اَلْإِخْلَاصُ মূলবর্ণ (خ - ل - ص) জিনস صحيح অর্থ- নিখাদ, খাঁটি, একনিষ্ঠ। أَخْلَصَ لَهُ الْعَمَلَ কাজটি তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে করল। أَخْلَصَ لِلّٰهِ دِيْنَهٗ দীনকে আল্লাহ তা'আলার জন্য খালিস করল, রিয়ামুক্ত করল।

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا ..... وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ

قُلْ ফে'ল যমীর ফায়েল। হামযা ইস্তেফহাম تَحَاجُّوْنَ ফে'ল যমীর ফায়েল نَا মাফ'উল فِى اللّٰه জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক تُحَاجُّوْن ফে'লের সাথে। وَاو হালিয়া هُوَ মুবতাদা رَبُّنَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতূফ আলাইহি, وَاو হরফে আতফ رَبُّكُمْ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতূফ। মাতূফ আলাইহি-মাতূফ মিলে هُوَ মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে হাল।

وَلَنَا أَعْمَالُنَا-এর وَاوْ হালিয়া لَنَا জার-মাজরূর মিলে খবরে মুকাদ্দাম اَعْمَالُنَا মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা মুয়াখখার وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। وَاوْ হালিয়া نَحْنُ মুবতাদা لَهُ জার-মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম مُخْلِصُوْنَ-এর সাথে। مُخْلِصُوْنَ হলো نَحْنُ মুবতাদার খবর। জুমলা হয়ে হাল হয়েছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْاِمْلَاءِ : লিখনশৈলীর ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ

لَمْ يَكُنْ শব্দের লিখনশৈলী : ১৩৯নং আয়াতের তাফসীরাংশে لَمْ يَكُنْ শব্দের দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসাখায় শব্দটি وَاحِد مذكر غائب হিসেবে لَمْ يَكُنْ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. মুহাক্কাক নুসখাসমূহে শব্দটি واحد مؤنث غائب হিসেবে لَمْ تَكُنْ লিখা রয়েছে। কারণ শব্দটির ফায়েল হলো اَلْاَنْبِيَاء; যা বহুবচন হওয়ায় مؤنث-এর পর্যায়ে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهُ : وَالْجُمَلُ الثَّلٰثُ اَحْوَالٌ

اَلثَّلٰثُ শব্দের নুসখা : ১৩৯নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَلثَّلٰثُ শব্দের দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির ل বর্ণে খাড়া যবরযোগে اَلثَّلٰثُ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির ل বর্ণের পর আলিফযোগে اَلثَّلَاثُ লিখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَات : আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

قَوْلُهُ تَعَالٰى : صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ ..... وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ

পূর্বের আয়াতে মুমিনদেরকে ঈমান আনার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারীদের চক্রান্তের জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদি-নাসারারা প্রতিনিয়ত এ চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তোমাদেরকেও তাদের রঙে রঞ্জিত করে দেবে। হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদেরকে বলে দাও আমাদেরকে তো আল্লাহ নিজের রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছেন, তোমাদের রঙের কোনো প্রয়োজন নেই।

✪ اَسْبَابُ النُّزُوْلِ : শানে নুযূল

قَوْلُهُ تَعَالٰى : صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ ..... وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রাচীনকাল হতেই একটা প্রথা চলে আসছে যে, তারা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিনে তাকে এক প্রকার হলুদ পানিতে চুবাত। পরে তাদেরকে খ্রিস্টধর্ম সংঘের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করে বলত, اَلْآنَ صَارَ نَصْرَانِيًّا حَقًّا অর্থাৎ এখন সে প্রকৃত খ্রিস্টান হয়েছে। (ইংরেজিতে একে ব্যাপ্টিজ তথা অপসুদীক্ষা বলে) আল্লাহ তা'আলা এই কুসংস্কার দূর করার জন্য এই আয়াত নাজিল করেন। [বায়যাবী : খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ১১৪, আসবাবে নুযূল : পৃষ্ঠা ৪১]

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : صِبْغَةَ اللّٰهِ ..... وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ

صِبْغَةَ اللّٰهِ-এর মর্ম : আলোচ্য আয়াতে صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ইসলাম ধর্ম যা ইবরাহীমী মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে মিল্লাত বা ধর্মকে صِبْغَةَ اللّٰهِ বলা হয়েছে দুটি কারণে–

১. নাসারাদের অভিমত খণ্ডনের জন্য। তাদের রীতি হলো, যখন কোনো শিশুর জন্ম হতো অথবা কেউ তাদের ধর্মে দীক্ষিত হতো, তখন তাকে হলুদ রঙের পানিতে ডুবানো হয়। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এর মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ খ্রিস্টান হয়। এটিকে পরিভাষায় Baptism (ব্যাপ্টিজম) তথা অপসুদীক্ষা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বলে দাও, তাদের পানির রং ধুলে শেষ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলার রং হলো ঈমানের রং যা মুমিনদের শিরায় প্রবেশ করে। ফলে তা কোনোভাবেই দূর হয় না।

২. দীনকে রং বলে এ এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রং যেরূপ চোখে অনুভব করা যায় অনুরূপ মুমিনের ঈমানেরও আলামত রয়েছে, যা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সকল কাজকর্মে ফুটে উঠে।

قَوْلُهٗ : وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنُهٗ

صِيْغَةٌ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এর ব্যাখ্যা :

১. আয়াতে বর্ণিত صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার দীন। যাকে অন্য এক আয়াতে فِطْرَتْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
অর্থাৎ যে ফিতরী ধর্মের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এখানে সে فِطْرَتْ دِيْن-ই উদ্দেশ্য।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা খতনাকে বুঝানো হয়েছে, যা ইবরাহীম ধর্মের বিশেষ প্রতীক।

৩. কেউ কেউ বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য تَطْهِيْرُ اللّٰهِ বা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রকরণ।

قَوْلُهٗ : لِظُهُوْرِ أَثَرِهٖ عَلٰى صَاحِبِهٖ

صبغة الله-এর ব্যাখ্যা دِيْنُ الله দ্বারা করার কারণ : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে اِسْتِعَارَة تَصْرِيْحِيَّة হয়েছে। এভাবে যে, আয়াতে دِيْنُ اللّٰهِ রঙ্গিন কাপড়ের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর مُشَبَّه উহ্য রয়েছে এবং مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লিখিত। আর উভয়ের মাঝে وَجْه شِبْه হলো ظُهُوْرُ اَثَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلٰى صَاحِبِهٖ তাইতো ঈমানের প্রতিক্রিয়া মু'মিনের মাঝে প্রকাশ পায় যেমন কাপড়ে রঙ ফুটে উঠে।

قَوْلُهٗ : قَالَ الْيَهُوْدُ

শানে নুযূল বর্ণনা : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) সামনে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, একবার ইহুদিরা মুসলমানদেরকে বলল, আমরা আহলে কিতাবদের মধ্যে অগ্রবর্তী। আমাদের কেবলা সবার চেয়ে প্রাচীন এবং সকল নবী আমাদের মধ্য হতে, আরবের কোনো নবী নেই। যদি মুহাম্মদ নবী হতো, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ : اَهْلُ الْكِتٰبِ الْأَوَّلِ

একটি প্রশ্নের উত্তর : এর মধ্যে الْكتاب الْأَوَّل-এর মিসদাক হলো তাওরাত। আপত্তি জানায় তাওরাতের পূর্বেও তো বহু কিতাব অতীত হয়েছে। তারপরও তাওরাতকে প্রথম কিভাবে বলা হলো?

জবাব : তাওরাতের اَوَّلِيَّتْ বা প্রথমে হওয়াটা কুরআন এবং ইঞ্জিলের নিসবতে করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَ قِبْلَتُنَا اَقْدَمُ

أَقدم-এর ব্যাখ্যা : এর মধ্যে قِبْلَتُنَا-এর মিসদাক হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। আর اَقْدَمْ শব্দটি اِسْمُ تَفْضِيْل-এর সীগাহ। এখানে مُفَضَّلْ عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে।
اَىْ اَقْدَمُ مِنَ الْكَعْبَةِ اَىْ بَلْ كَانَتْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بَعْدَ اِسْرَائِيْلَ : قَوْلُهٗ وَلَمْ يَكُنِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ

قَوْلُهٗ : لَهٗ فِي اللّٰهِ

الله-এর مضاف এর বিবরণ : এখানে মুযাফ মাহযূফ রয়েছে- اَىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰه اَوْ فِىْ شَأْنِ اللّٰهِ اَو اصْطَفَائُه نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ

قَوْلُهٗ : هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

আয়াতটির ব্যাখ্যা : اَيْ اَتُجَادِلُوْنَنَا وَالْحَالُ اَنَّهٗ لَا وَجْهَ لِلْمُجَادَلَةِ اَصْلًا لِأَنَّهٗ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اَيْ مَالِكُ اَمْرِنَا وَاَمْرِكُمْ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ

আয়াতটির ব্যাখ্যা : وَاْو আতেফা, পূর্বের সাথে عَطْف হয়েছে। مُخْلِصُوْن শব্দটি اِخْلَاص থেকে নির্গত। اِخْلَاص-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১- رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ سَأَلْتُ جَبْرِيْلَ عَنِ الْاِخْلَاصِ مَا هُوَ فَقَالَ سَأَلْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَقَالَ سِرٌّ مِنْ اَسْرَارِىْ اَسْتَوْدِعُه قَلْبَ مَنْ اَحْبَبْتُهٗ مِنْ عِبَادِىْ -

২- وَقَالَ حُذَيْفَةُ (رض) اَنْ تَسْتَوِىَ اَفْعَالُ الْعَبْدِ فِى الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ -

৩- وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَلْاِخْلَاصُ اَنْ لَا تُشْرِكَ فِىْ دِيْنِهٖ وَلَا تُرَائِيَ اَحَدًا فِىْ عَمَلِهٖ -

ইখলাসের বিপরীত বস্তু হলো رِيَاءٌ তথা লোক দেখানো। তার তিনটি আলামত রয়েছে-

১- اَلْكَسَلُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِى الْوَحْدَةِ. ২- اَلنَّشَاطُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِى الْكَثْرَةِ. ৩- حُبُّ الثَّنَاءِ عَلَى الْعَمَلِ -

✪ اَلْبَلَاغَةُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ : কুরআনের ভাষা-অলংকার

قَوْلُهٗ : تَعَالٰى : صِبْغَةَ اللّٰهِ

ইস্তিয়ারায়ে তাসরিহিয়া : আলোচ্য অংশ اِسْلَام-কে صِبْغَة (রং)-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর مُشَبَّهٌ بِهٖ-কে উহ্য রেখে مشبه-কে উল্লেখ করা হয়েছে। مُشَبَّهٌ আর مُشَبَّهٌ بِهٖ-এর মাঝে اَلْجَامِعُ হলো- اَلظُّهُوْرُ وَالتَّأْثِيْرُ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَتُحَاجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ

ইস্তিফহাম : আলোচ্য অংশে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো ভর্ৎসনা করা এবং কাজটির মন্দত্ব তুলে ধরা।

١٤٠. ﴿أَمْ﴾ بَلْ ﴿يَقُوْلُوْنَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ ﴿إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى ط قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ط﴾ أَيِ اللّٰهُ أَعْلَمُ وَقَدْ بَرَّأَ مِنْهُمَا إِبْرَاهِيْمُ بِقَوْلِهِ ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ وَالْمَذْكُوْرُوْنَ مَعَهُ تَبَعٌ لَهُمْ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ﴾ أَخْفَى عَنِ النَّاسِ ﴿شَهَادَةً عِنْدَهُ﴾ كَائِنَةً ﴿مِنَ اللّٰهِ ط﴾ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ كَتَمُوْا شَهَادَةَ اللّٰهِ فِي التَّوْرَاةِ لِإِبْرَاهِيْمَ بِالْحَنِيْفِيَّةِ ﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ.

১৪০. বরং এ স্থানে أَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহার হয়েছে তারা কি বলে يَقُوْلُوْنَ ক্রিয়াটি ى ও ت উভয় অক্ষর সহকারেই পঠিত রয়েছে। যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল। তাদেরকে বলো, তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ? নিশ্চয় আল্লাহই অধিক জানেন। আর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এতদুভয় হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করে ইরশাদ করেন– مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি বা খ্রিস্টান কোনো সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন না। আর এই আয়াতে উল্লিখিত অন্যান্য নবীগণ ছিলেন তাঁরই অনুসারী। আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে মানুষের নিকট লুকায় তদপেক্ষা অধিকতর সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? অর্থাৎ, তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী নেই। তারা হলো ইহুদি। হযরত ইবরাহীম (আ.) দীনে হানীফের অনুসারী ছিলেন বলে তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা যে সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন, তারা তা গোপন করেছিল। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। এই আয়াতটি তাদের প্রতি ধমকিস্বরূপ।

١٤١. ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

১৪১. এরা ছিলেন এক সম্প্রদায়, যারা বিগত হয়েছেন। তারা যা অর্জন করেছেন সেটাই তাদের কাজে আসবে। আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের কাজে আসবে। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাও করা হবে না তাদের কর্ম সম্পর্কে। পূর্বে এই ধরনের আয়াত উল্লিখিত হয়েছে।

জালালাইন সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ : أَمْ - بَلْ - يَقُوْلُوْنَ

أَمْ শব্দের ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) এখানে أَمْ-এর পরে بَلْ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে أَم-টি مُنْقَطِعَةْ যা بَلْ এবং همزة استفهام-এর অর্থে। প্রচলিত জালালাইনের নোসখায় بَلْ-এর পরে همزة الاستفهام নেই। কিন্তু সেটা ধরে নিতে হবে। কোনো কোনো নোসখায় أَ بَلْ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, أَمْ-টি مُتَّصِلَة যে ক্ষেত্রে اِسْتِفْهَام দ্বারা উদ্দেশ্য হবে উভয়টিকে অস্বীকার করা।

أَمْ مُتَّصِلَةْ-এর সুরতে এ সংশয় জাগে যে, সম্ভবত দুটি বাক্যের যে কোনো একটি বাক্য সংঘটিত হয়েছে এবং প্রশ্ন শুধু تَعْيِيْن বা নির্ধারণ সম্পর্কে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা উভয় বিষয়টিই সংঘটিত হয়েছে। এজন্য মুফাসসির (র.) مُنْقَطِعَة-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَوْلُهُ : كَتَمَ - أَخْفَى مِنَ النَّاسِ - شَهَادَةً

كَتَمَ-এর মাফ'উলের বর্ণনা : كَتَمَ শব্দটি সাধারণত দুই মাফ'উল সহকারে ব্যবহার হয়। তাই মুফাসসির (র.) اَلنَّاسَ দ্বারা كَتَمَ-এর উহ্য প্রথম মাফ'উলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মূলরূপ হলো– كَتَمَ النَّاسَ شَهَادَةً

قَوْلُهٗ : شَهَادَةً عِنْدَهٗ كَائِنَةً - مِنَ اللّٰهِ

দ্বিতীয় সিফাতের প্রতি ইঙ্গিত : মুফাসসির (র.) مِنَ اللّٰه-এর পূর্বে كَائِنَةً উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, অংশটি شَهَادَةً-এর দ্বিতীয় উহ্য সিফাতের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। كَتَمَ-এর সাথে নয়।

قَوْلُهٗ : وَهُمُ الْيَهُوْدُ كَتَمُوا شَهَادَةَ اللّٰهِ فِي التَّوْرَاةِ لِإِبْرَاهِيْمَ بِالْحَنِيْفِيَّةِ

আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনা : আলোচ্য অংশ দ্বারা মুফাসসির (র.) ..... وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ আয়াতটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, أَظْلَمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহুদিরা। এ ব্যাপারে অন্যান্য মুফাসসিরগণ একমত। আর মুফাসসির (র.) شَهَادَةً-এর ব্যাখ্যা করেছেন তাওরাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দীনে হানীফের অনুসারী হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য। এ অভিমতটি হযরত মুজাহিদ, হাসান বসরী, রবী, কাতাদা ও ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। আর হযরত কাতাদা ও ইবনে যায়েদ (র.)-এর অপর আরেকটি অভিমত হলো, شَهَادَةً তাওরাতে বর্ণিত নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলি ও তাঁর নবুয়ত সংক্রান্ত সাক্ষ্য উদ্দেশ্য।

✪ حَلُّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ : শব্দবিশ্লেষণ

كَتَمَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب বাব نصر মাসদার اَلْكِتْمَانُ মূলবর্ণ (ك - ت - م) জিনস صحيح অর্থ- সে গোপন করল। كَتَمَ فُلَانٌ الْحَدِيْثَ কিংবা كَتَمَ مِنْ فُلَانٍ الْحَدِيْثَ সে অমুকের থেকে কথাটি গোপন করল।

أُمَّةٌ : শব্দগত একবচন, অর্থগত বহুবচন। যেমন- قَوْم ও رَهْط; শব্দটির মূল অর্থ- كُلُّ جَمَاعَةٍ يَجْمَعُهُمْ اَمْرٌ مَّا اِمَّا دِيْنٌ وَاحِدٌ اَوْ زَمَانٌ وَاحِدٌ اَوْ مَكَانٌ وَاحِدٌ অর্থাৎ, ধর্মীয় কারণে বা যুগের কারণে অথবা ভৌগলিক কারণে যাদের মাঝে বসবাস এক সাথে হয়ে থাকে। এতে তাদের ইচ্ছা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। যেমন- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ আয়াতে প্রথভ্রষ্ট হওয়ার দিক থেকে একজাতি উদ্দেশ্য। أُمَّةٌ-এর ব্যবহার কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে-

১. প্রাণীর প্রতিটি শ্রেণি একটি জাতি, যেমন- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

২. দ্বীন, ধর্ম। যেমন- اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَائَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ

৩. কখনো শুধু একজন ব্যক্তির জন্যও أُمَّةٌ ব্যবহার হয়, যদি তিনি কোনো বিশেষ কারণে একটি জাতির পর্যায়ে হন। যেমন- اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ

✪ حَلُّ الْإِعْرَابِ : বাক্যবিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : أَمْ يَقُوْلُوْنَ ..... عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

أم হলো হরফুল আতফ, يَقُوْلُوْن হলো ফে'ল ও ফায়েল, وَالْاَسْبَاط ..... إِبْرٰهِيْم হলো إِنَّ-এর ইসম আর كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى হলো খবর। এই জুমলায়ে ইসমিয়াটি মাকুলা হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ-এর মাঝে হামযাটি اِسْتِفْهَام -এর জন্য। اَنْتُمْ হলো মুবতাদা এবং اَعْلَمُ হলো খবর। أَمِ اللّٰهُ আতফ হয়েছে। اَنْتُمْ-এর উপর। এ জুমলায়ে ইসমিয়াটি قُلْ-এর মাফ'উল হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে।

✪ اَلرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ : রসমে উসমানী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

إِبْرٰهِيْم শব্দের লিখনশৈলী : ১৪০নং আয়াতে উল্লিখিত إِبْرٰهِيْم শব্দে দু'ধরনের লিখনশৈলী বর্ণিত আছে। যথা-

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির رَاء বর্ণে খাড়া যবর এবং ه বর্ণের পর ي-যোগে إِبْرٰهِيْم লিখিত পাওয়া যায়।

খ. রসমে উসমানীতে শব্দটি رَاء এবং ه বর্ণে যথাক্রমে খাড়া যবর ও খাড়াযের যোগে اِبْرٰهٖم লিখা আছে।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখায় ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : كَتَمُوْا شَهَادَةً فِى التَّوْرٰةِ

اَلتَّوْرٰةُ শব্দের নুসখা : ১৩৬নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَلتَّوْرٰةَ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা–

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির رَاء বর্ণে খাড়া যবরযোগে اَلتَّوْرٰةَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির رَاء বর্ণের পর আলিফযোগে اَلتَّوْرَاةَ লিখা আছে।

✪ اِخْتِلَافُ الْقِرَاءَةِ : কেরাতের ভিন্নতা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ

يَقُوْلُوْنَ শব্দের কেরাত : ১৪০নং আয়াতে উল্লিখিত يَقُوْلُوْنَ শব্দে দু'ধরণের কেরাত বর্ণিত আছে। যথা–

ক. বিখ্যাত কেরাত-বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফস (র.) শব্দটিকে جمع مذكر حاضر ধরে تقولون পড়েছেন।

খ. ইমাম নাফে, আবু আমর ও আসেম হতে আবূ বকর (র.) শব্দটিকে جمع مذكر غائب হিসেবে يَقُوْلُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

يَعْمَلُوْنَ-এর কেরাতের পার্থক্য : يَعْمَلُوْنَ শব্দটির মাঝে দু'ধরনের কেরাত রয়েছে।

ক. আবূ আমর শব্দটিকে ى-সহকারে يَعْمَلُوْنَ পড়েছেন।

খ. কূফীগণ ও আবূ আমের (র.) শব্দটিকে ت-যোগে تَعْمَلُوْنَ পড়েছেন। আমাদের মাঝে প্রচলিত কেরাত এটিই।

✪ تَبَايُنُ النُّسْخَةِ : নুসখার ভিন্নতা

قَوْلُهٗ : كَتَمُوْا شَهَادَةَ اللّٰهِ فِى التَّوْرٰةِ

اَلتَّوْرٰةُ শব্দের নুসখা : ১৪০নং আয়াতের তাফসীরাংশে উল্লিখিত اَلتَّوْرٰةَ শব্দে দু'ধরনের নুসখা বর্ণিত আছে। যথা

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত জালালাইনের নুসখায় শব্দটির راء বর্ণে খাড়া যবরযোগে اَلتَّوْرٰةَ লিখিত পাওয়া যায়।

খ. কোনো কোনো নুসখায় শব্দটির راء বর্ণের পর আলিফযোগে اَلتَّوْرَاةَ লিখা আছে।

তাফসীর সংশ্লিষ্ট আলোচনা

✪ اَلرَّابِطَةُ بَيْنَ الْآيَاتِ : আয়াতসমূহের পারস্পরক সম্পর্ক

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ এবং আখেরী জমানার নবী সম্পর্কে ইহুদিদের বিতর্ক ও হঠকারিতার আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল ও ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের তর্ক-ভ্রান্ত দাবির আলোচনা করা হলো।

✪ تَوْضِيْحُ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ : আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ ..... بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

ইহুদি আলেমদের সত্য গোপনের জবাব : আলোচ্য আয়াতে মূলত ঐ সকল ইহুদি আলেমদের প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে, যারা ভালো করেই জানত যে, ইহুদি ধর্মে বর্তমান বৈশিষ্ট্যাবলিসহ অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা সত্য গোপন করে শুধু নিজেদেরকে হকপন্থী মনে করতো। তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াত যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ইহুদি ছিলেন। ইহুদি আলেমদের এই মিথ্যা দাবির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে বলছ, আল্লাহ তা'আলা তা খুব ভালোভাবেই জানেন। বাস্তব সত্য হলো, তাঁরা সকলেই তাওহীদের বাণীর প্রচারক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন– مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا "হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না"।

قَوْلُهُ : تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ..... عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

পূর্বের আয়াতের ধমকির তাকীদ : এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ দ্বারা ধমকি দিয়েছিলেন। এখন এ আয়াতে সে ধমকির তাকীদ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের প্রতিদান তাদের দেবেন এবং তাদের আমল সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। আর তোমাদের আমলের প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। تِلْكَ أُمَّةٌ দ্বারা ইসরাঈল জাতির পূর্বসূরি হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.) উদ্দেশ্য, যাদের বংশধর হওয়ার সূত্রে ইহুদিরা গর্বিত ছিল। [তাফসীরে মাজেদী : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৭]

একজনের আমল অন্যের জন্য উপকারে আসবে না একটু পূর্বেই এরূপ হুবহু একটি আয়াত আলোচিত হয়েছে। তারপরও এখানে হুবহু সে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তির কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন–

১. আহলে কিতাবদের অন্তরে তাদের বংশীয় আভিজাত্যবোধের কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ যতই মন্দ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করবেনই। তাই এ অবান্তর ধারণা বাতিল করার জন্য এ আয়াতের পুনরাবৃত্তি দ্বারা বক্তব্যকে আরো জোরদার করা হয়েছে।

২. পূর্বের আয়াতে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ আয়াতের সম্বোধন রাসূল ﷺ-এর উম্মতের প্রতি। তাদের বলা হচ্ছে যে, আহলে কিতাবের মতো তোমরা আবার এ ধারণা পোষণ করো না। [তাফসীরে উসমানী : পৃষ্ঠা ২৬]

✪ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْآيَاتِ وَحَلُّهُ : আয়াতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

বিষয় : সবচেয়ে বড় জালেম কে?

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব-নিরসন : এ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও নিরসনের জন্য সূরা বাকারার ১১৪নং আয়াত দেখুন।

التَّدْرِيْبَات : অনুশীলনী

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

أ. اكتب سبب نزول الآية الأولى ثم ترجمها فصيحة .

ب. حقق الكلمات الآتية ١. ملة ابراهيم، ٢. من سفه نفسه، ٣. اصطفيناه، ٤. الصالحين، ٥. اسلم، ٦. العالمين، ثم فسرها بحيث يتضح المرام.

ج. بين مكانة ملة ابراهيم ومزاياها مع ايضاح فضائل من جعلها حظ نفسه وخسارة من اعرض عنها.

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

أ. ترجم الآية الكريمة فصيحة .

ب. حقق قوله"ووصى كم قراءة فيها وما معناه؟ بين بحيث لا يبقى الخلل فى فهم مراد قوله تعالى" يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ.

ج. ما معنى "الدين" وكم معنى يطلق عليه الدين وما المراد هنا ولم؟ اوضح بذكر مواضع اطلاقه متيقظا.

د. اكتب خطبة وجيزة مثيرة على ما استفدت من وصية ابراهيم ويعقوب لأبنائهما ليتضح على الناس ان اسوة الاب فى الدين وعهدته فى الاولاد ما هى؟ ثم اوضح حل الايراد على اتيانه تعالى بلفظ "بنيه" دون اولاده.

ه. فسر قوله " فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ." بحيث لا يبقى الايراد والتكلف بالجواب عنه.

و. ما معنى الايمان والاسلام وما النسبة بينهما اكتب ثم اوضح حل الاعتراض تقريره انه ذكر هنا السلام عند الموت وفى الدعاء المشهور "ومن توفيته منا فتوفه على الايمان" ذكر الايمان .

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

أ. ترجم الآيتين الكريمتين فصيحة.

ب. فسر الآيتين على نهج المصنف العلم رح.

ج. بين ما استفدت من ظاهر الآيتين مع ايضاح اسباق الامة المسلمة منهما .

د. ظاهر الآية الثانية يشعر بشناعة اليهود والنصارى فكم شناعة لهم وكيف عالجها اللّٰه تعالى بين موجزا وموضحا .

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ.

أ. على أى داعية نزلت الآية الآولى اوضح ثم بين سبب نزول الآية الثانية.

ب. ترجم الآيتين الكريمتين ثم اوضح تفسير المصنف بحيث يتضح المرام.

ج. ما معنى الاخلاص وماهى ضرورته؟ اكتب مع بيان فضائله، اثبت نتيجة المحاجة بعد ان تقيم الصغرى والكبرى، بحيث ينكسوا رؤوسهم الى يوم التناد .

د. ما حكم اليهود والنصارى فى عصر نا الراهن، وما فريضتنا فى حقهم بين بالتيقظ التام.

ইসলামিয়া কুতুবখানা | ঢাকা